# শুকতারা

শারদীয়া ১৩৯৮

# চুল নিয়ে সমস্যা ?

## চুল পড়া ? অকালপক্কতা ? খুস্কি ?

### ডাঃ সরকার বলেন–

**চুলের কোনও রোগই নয়, রোগের উপসর্গ মাত্র। তাই শুধু মাথায় ওষুধ লাগালেই হবে না সঙ্গে ওষুধ খেতেও হবে।**

খুস্কি বিহীন, ঘন, কালো, মসৃণ চুল যদি চান,
আর্ণিকাপ্লাস লাগান আর ট্রায়োফার খান।
এ দুটি চুল পড়া বন্ধকরে, চুলের পুষ্টি জোগায়,
অকালপক্কতা রোধ করে, মাথার খুস্কি তাড়ায়।
মাথা ঠাণ্ডা রাখে, পেটের গোলমাল সারায়,
চুলের উপাদান বাড়ায়, তাই নতুন চুল গজায়।
রূপ হয় অপরূপ হোমিওপ্যাথির ছোঁয়ায়,
আর সুফল ছাড়া, কোনও কুফল না হয়।

# আর্ণিকাপ্লাস-ট্রায়োফার

ট্রিপ্‌ল অ্যাক্‌শন হেয়ার ভাইট্যালাইজার
কেশ সমস্যা সমাধানে পরীক্ষিত ও প্রমাণিত
হোমিও ওষুধ

# বিশ্বে সর্বপ্রথম

## কেশ সমস্যা সমাধানে

ডাঃ সরকারের এক ফলপ্রসূ
আবিষ্কার (সি,সি, আই-পুরস্কৃত)
ট্রায়োফার খাওয়ার সঙ্গে
আর্ণিকাপ্লাস লাগানোর ওষুধ।

**ব্যবহার বিধি ঃ**

আর্ণিকাপ্লাস-হেয়ার ভাইট্যালাইজার স্নানের পরে ও রাতে শোয়ার আগে চুলের গোড়ায় লাগান, সঙ্গে ট্রায়োফার-হেয়ার টনিকটিও-সেবন করুন সকালে ও রাত্রে, যত দিন না চুল নিয়ে সমস্যা দূর হয়।

বিপণন সংস্থা ঃ ফোন-৫৯-৪০৫১
**অ্যালেন্স ইণ্ডিয়া মার্কেটিং প্রাঃ লিঃ**
অ্যালেন ভবন, কৃষ্ণপুর রোড, কলিকাতা-৭০০ ০৫৯

প্রস্তুতকারক ঃ ফোন ৩৫-২৯৬১
**এ্যালেন ল্যাবরেটরিজ প্রাঃ লিঃ**
এ্যালেন হাউস ঃ ২২৪/এইচ্, মানিকতলা মেন রোড, কলি-৫৪

Allopathic, Ayurvedic & Homoeopathic Medicine Manufacturers

Bringing Science To Life

যাদের যত্নেই আপনার আরোগ্য ও আস্থা।

Dr. SARKAR Group

Allen's Ad. India

# তুমি অনন্যা –

তন্তুজ
বাংলার তাঁতের কাপড়

জামদানী
টাঙ্গাইল
বেগমপুরী
ধনেখালি
সূতী ও
সিল্ক শাড়ী
এবং ড্রেস
মেটেরিয়ালস্

T/1038/91

# নানা মলমে করে যা, একা করে

# ইউথেরিয়া

একাই একশ।
কেননা ইউথেরিয়া এমন এক বিশেষ ফরমূলায় তৈরী যা শুধু মাথাব্যথা বা সর্দিতেই চটপট আরাম দেয় না, গাঁটের ব্যথা, পেশীর যন্ত্রনার দাওয়াই হিসেবেও অব্যর্থ। যেমন বড়দের তেমনি ছোটদের ত্বকেও ইউথেরিয়া শতকরা একশভাগ নিরাপদ। তাই, হাতের কাছেই রাখুন ইউথেরিয়া— পরিবারের প্রতিরক্ষা।

**ব্যথা বেদনায় চটজলদি পারিবারিক প্রতিরক্ষা**

**বেঙ্গল কেমিক্যালস্ এ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যালস্ লিঃ**
(ভারত সরকারের উদ্যোগ)

ASP/BCP/2/89/R/91

# ডায়মন্ড কমিকস্ -এর নিবেদন

মূল্য ঃ 12.00

সারা বিশ্বে ১৫০ টিরও বেশী দেশে বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত ফ্যান্টম -এর কাহিনী বাচ্চা-বুড়ো-সবার পক্ষে সমান মনোরঞ্জনের পাত্র। এই শক্তিশালী এবং রহস্যময় পাত্রের সৃষ্টিকর্তা হলেন শ্রী লী ফক্, যিনি জনপ্রিয় ম্যান্ড্রেক-এরও সৃষ্টি করেছিলেন।

প্রতি মাসে ফ্যান্টমের নতুন নতুন কাহিনী ইংরাজী ও হিন্দী ভাষার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষাতেও প্রকাশিত হয়।

---

কার্টুনিষ্ট প্রাণের প্রসিদ্ধ চরিত্র চাচা চৌধুরী একজন বুদ্ধিমান মানুষ, যার কাছে সব সমস্যার সমাধান মজুত থাকে। জুপিটার বাসী অসীম শক্তিমান সাবু চাচা চৌধুরীর সাহায্যকারী। শক্তি আর বুদ্ধির এই অপূর্ব সংমিশ্রণ তোমাদের আনন্দ দিয়ে আসছে এবং ভবিষ্যতেও দেবে, এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

চাচা চৌধুরী ও সাবুর দুটো পোস্টার ফ্রী

চঞ্চল, দুষ্ট পিঙ্কী কার্টুনিষ্ট প্রাণের আরেকটি স্মরণীয় সৃষ্টি। পিঙ্কী, ওর দাদু আর প্রতিবেশী ঝপটজীর অদ্ভুত অদ্ভুত কান্ড-কারখানা দেখে হাসতে হাসতে তোমাদের পেটে খিল ধরে যাবে।

আগামী দুটি বাম্পার ডাইজেষ্ট চাচা চৌধুরী ডাইজেষ্ট viii, (পৃষ্ঠা-160) মূল্য ঃ 20/- এবং পিঙ্কী ডাইজেষ্ট iv, মূল্য ঃ 15/-

---

## এ পর্যন্ত প্রকাশিত বাংলা ডায়মন্ড কমিকস

চাচা চৌধুরী ও রাকা
চাচা চৌধুরীর দুমদাম
চাচা চৌধুরী জন্তরীক্ষে
চাচা চৌধুরী ও দক্ষযজ্ঞ
চাচা চৌধুরী ও বাচ্চু লুটেরা
চাচা চৌধুরী ও সাবুর অন্তরধন
চাচা চৌধুরী ও আকবরী গাত্তানা
চাচা চৌধুরী ও গোলামের বিপ্তি
চাচা চৌধুরী ও রাকার সাপ্তা সংঘর্ষ
চাচা চৌধুরী আর কারবেকের সোনা
চাচা চৌধুরী আর চাইওয়ের চাকাত
চাচা চৌধুরী আর ইস্কুল মাস্টার
চাচা চৌধুরী আর বিলেশী গাড়ী
চাচা চৌধুরী আর আরমান আলী ফারমান আলী
চাচা চৌধুরী আর এককোটির হীরে

চাচা চৌধুরী আর ধুর্মিষ্ঠিরের মুকুট
চাচা চৌধুরীর সুস্কিয়ার
চাচা চৌধুরী ও দশ্বর সিং-এর মোকাবিলা
চাচা চৌধুরী ও বোতালের দৈত্য
চাচা চৌধুরী ও শিকারী শক্তরসপ্পা সিং
চাচা চৌধুরী ও ক্রাউন সম্রাট
চাচা চৌধুরী ও সাবু কালো শ্বীপে
চাচা চৌধুরী ও হাতীর বাসনা
চাচা চৌধুরী ও সাবুর ওপর আক্রমণ
চাচা চৌধুরী ও চন্দন-সন্দন
চাচা চৌধুরী ও সাবুর হাড়ুড়ী
চাচা চৌধুরী ও পটলার কোমর
চাচা চৌধুরী ও পোপটলাল
চাচা চৌধুরী ও হাকিম জামালগোটা

চাচা চৌধুরী ও রাকার পুনরাগমন
চাচা চৌধুরী ও রাকার প্রতিশোধ
চাচা চৌধুরী ও আততায় জোরো
চাচা চৌধুরী ও উড়ন্ত কার
চাচা চৌধুরী ও রহস্যময় চোর
চাচা চৌধুরী ও সাবুর বুট
চাচা চৌধুরী ও সাবুর বিয়ে
চাচা চৌধুরী ও হীরের চাষ
চাচা চৌধুরী ও ক্রিকেট ম্যাচ
চাচা চৌধুরী ও ব্লাঁবাচাই
চাচা চৌধুরী বিল্লু ও পিঙ্কী
চাচা চৌধুরী আমেরিকায়
চাচা চৌধুরী চোরের খোঁজে
চাচা চৌধুরী আর ব্লোরকী জ্যোত্যোর

চাচা চৌধুরী জুপিটারে
চাচা চৌধুরী ডাইজেষ্ট i
চাচা চৌধুরী ডাইজেষ্ট ii
চাচা চৌধুরী ডাইজেষ্ট iii
চাচা চৌধুরী ডাইজেষ্ট iv
চাচা চৌধুরী ডাইজেষ্ট v
চাচা চৌধুরী ডাইজেষ্ট vi
চাচা চৌধুরী ডাইজেষ্ট vii
চাচা চৌধুরী ডাইজেষ্ট viii
পিঙ্কীর পূর্বী
পিঙ্কীর ক্যামেরা
পিঙ্কীর জন্মদিন
পিঙ্কীর কৃকুরছানা
পিঙ্কীর মা ও বাবা

পিঙ্কী আর ডোকরা
পিঙ্কী আর হামতরভাই
পিঙ্কী আর দিদিমার নন্দ
পিঙ্কী আর সাবানের বুদবুদ
পিঙ্কী আর চাচা সুলেমানী
পিঙ্কী আর ঝপটজীর ঘুড়ি
পিঙ্কী আর লোরিটার টিকিট
পিঙ্কী আর বিল্লা পরমার কূপ
পিঙ্কী আর কুলদানাদ পাগড়িওয়ালা
পিঙ্কী আর কুতমন্ত্রী
পিঙ্কীর জুতো
পিঙ্কী ডাইজেষ্ট i
পিঙ্কী ডাইজেষ্ট ii
পিঙ্কী ডাইজেষ্ট iii
পিঙ্কী ডাইজেষ্ট iv

---

চঞ্চল চরিত্র বিল্লু

কার্টুনিষ্ট প্রাণের আরেকটি চঞ্চল চরিত্র বিল্লু-র দুষ্টুমীভরা কাহিনী খুব শীঘ্রই বাংলা ভাষায় প্রকাশ পেতে চলেছে। কিশোর বিল্লুর সঙ্গে ওর সঙ্গীসাথী গান্দু, জোজি ও বজরঙ্গী পালোয়ানের হাসিঠাট্টা আর দুষ্টুমী যেমন একদিকে তোমাদের মজা দেবে, আবার হাসাতে হাসাতে পেটে খিলও ধরিয়ে দেবে। খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের কাছের বুকষ্টলে আসছে কার্টুনিষ্ট প্রাণের প্রসিদ্ধ চরিত্র বিল্লু-র কান্ডকারখানা।

---

## ডায়মন্ড পকেট বুকস-এর নিবেদন

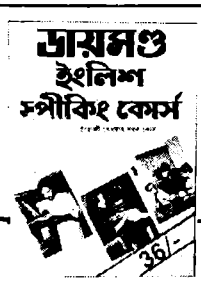


ডায়মন্ড পকেট বুকস্-এর সগর্ব নিবেদন 'ডায়মন্ড ইংলিশ স্পিকিং কোর্স'-যা আপনাকে ইংরাজী ঠিকমত বলতে না পারার হীনমন্যতার হাত থেকে মুক্তি পেতে সাহায্য করবে। নিজের কাজ, ব্যবসায় ও বন্ধুদের সঙ্গে শুদ্ধভাবে ইংরাজীতে কথা বলে নিজের মান ও প্রতিষ্ঠা বাড়ান।

ডায়মন্ড পকেট বুকস্-এর আরেকটি সগর্ব প্রকাশন-'ডায়মন্ড বেঙ্গলী লার্নিং এ্যান্ড স্পিকিং কোর্স গুরু ইংলিশ'-এই বইটি আপনাকে ভারতের পনেরোটি রাষ্ট্রীয় ভাষার মধ্যে অন্যতম এবং সম্ভবত সবচেয়ে মিষ্টি ভাষা 'বাংলা ভাষা' শেখাতে সাহায্য করবে।

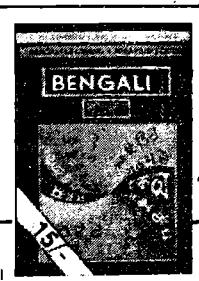


**DIAMOND COMICS PVT. LTD.**

2715, DARYA GANJ, NEW DELHI-2.

DISTRIBUTORS : VISHAL BOOK CENTRE, 4, TOOTI LANE CALCUTTA-16.

# শারদীয়া

আশ্বিন —১৩৯৮ সূচীপত্র সেপ্টেম্বর—১৯৯১


□ **অপ্রকাশিত লেখা** □

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর — হাফে লীগ অনওয়ার্ড ভুশুণ্ডির মাঠ ওয়ার্ড ১০

□ **সম্পূর্ণ উপন্যাস** □

লীলা মজুমদার — কুশলদার কৌশল ১৯০
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় — নিজের দেশে ম্যাণ্ডেলা ১১২
সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় — হাসি কান্না চুনী পান্না ২৮
শিশিরকুমার মজুমদার — খুঁজে ফেরা ৬৮
অনিল ভৌমিক — চিকামার স্বর্ণমূর্তি ১৫৪
শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় — ছদ্মবেশী ২৬৬

□ **সম্পূর্ণ ট্রেকিং কাহিনী** □

তপনকুমার দাস — এভারেস্টের কাছাকাছি ২৪৮

□ **বড় গল্প** □

আশাপূর্ণা দেবী — যত্তোসব ২৭৮

□ **গল্প** □

গজেন্দ্রকুমার মিত্র — কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে ৪৪
মহাশ্বেতা দেবী — জয় পরাজয় ৯৭
প্রফুল্ল রায় — জোড়া গোয়েন্দা ১৯
সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় — দি গ্রেট বাতাসা রহস্য ৪৭
নলিনী দাশ — বড়দি ৬৫
নটরাজন — প্যাটন ১৩৫
দেবল দেববর্মা — শুভঙ্কর স্যার এবং জীবনের লক্ষ্য ১৪৯
মঞ্জিল সেন — গদাইয়ের ইংরেজি শেখা ১৩০
অগ্নিমিত্র — ডুংরিবাবা ১৮১
অরবিন্দ মুখোপাধ্যায় — রাঙাদাদু ২১৫

□ **কল্পবিজ্ঞানের গল্প** □

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় — ইচ্ছা গ্রহ ১২
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় — গ্রহান্তরে ১৬
রেবন্ত গোস্বামী — চন্দ্রাহত সাত্যকি সোম ১৮৬

□ **ভূতের গল্প** □

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ — সেই সব ভূত ২৩
বরেন গঙ্গোপাধ্যায় — মেছোভূত ১২৬
মানবেন্দ্র পাল — নিষেধ ১৭৭

□ **রহস্য ও গোয়েন্দা গল্প** □

অজেয় রায় — ঘোষবাগানের দানো ১০২
সঙ্কর্ষণ রায় — চোরাবালির নক্‌শা ৯৪

□ **শিকারের গল্প** □

সুকুমার ভট্টাচার্য — চিতার কবল থেকে ২০৭

□ **হাসির গল্প** □

গৌরী দে — গিলিগিলি ফুঃ ২১২

□ **প্রকৃতির গল্প** □

নারায়ণ সান্যাল — গাছ-মা ২২৭
বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — দাও ফিরে সে অরণ্য ২৩৭

□ **গল্প হলেও সত্যি** □

রাহুল মজুমদার — মৃত্যুহীন প্রাণ ৬২

□ **মহাযুদ্ধের গল্প** □

জ্যোতির্ময় মজুমদার — হিটলার বনাম নরউইজীয়ান ইলেভেন ২৬০

□ **আবিষ্কারের গল্প** □

ডাঃ বিশ্বনাথ রায় — একটি আবিষ্কারের কাহিনী ১৪৬

□ **পৌরাণিক গল্প** □

নন্দলাল ভট্টাচার্য — গণেশ পরশুরামের যুদ্ধ ২২১

□ **বিস্ময় বিচিত্রা** □

দেবব্রত মুখোপাধ্যায় — শরীর ছেড়ে বেরিয়ে ১৪১
সুরভি বসু — হেরডের স্বপ্ন সিজারিয়া ৫৪
হারিয়ে যাচ্ছে যারা (ফোটো ফিচার) ৪২

□ **বিজ্ঞান বিচিত্রা** □

ডাঃ অমিয়কুমার হাটি — পৃথিবীর অসুখ ২৩৬
সুনীত রায় — ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটনরা আতঙ্কিত ২৩৫

□ **মহাজীবনের কথা** □

প্রণবেশ চক্রবর্তী — ট্রেনে প্রথম পরিচয় ৪২

□ **ভ্রমণ** □

সুমন ভট্টাচার্য — মিঙ রাজাদের সমাধিক্ষেত্রে ২৪৭

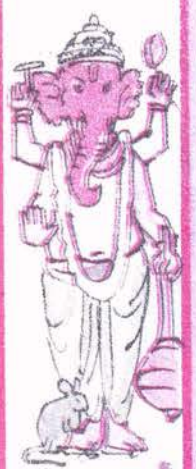

# শুকতারা

□ **কবিতা** □

| | | |
|---|---|---|
| অন্নদাশঙ্কর রায় | ধরি মাছ না ছুঁই পানি | ৯ |
| সুভাষ মুখোপাধ্যায় | লাইনে | ১১ |
| নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী | তিনপাহাড়ি | ১৫ |
| সুনীল বসু | খেই | ২৭৭ |
| কৃষ্ণ ধর | সেই নদী | ৪৩ |
| কালিদাস ভট্টাচার্য | পাল্‌কি | ২১১ |
| ভবানীপ্রসাদ মজুমদার | কৈলাসপতির কলকাতা দর্শন | ২৪৬ |
| মুস্তাফা নাশাদ | পাপান | ২৫৫ |
| কমল লাহিড়ী | এককড়ির তীর্থদর্শন | ২০৬ |
| সুখেন্দু ভট্টাচার্য | একুশ শতকী চাঁদ | ২৮৫ |
| বীরেন সাহা | শিউলি তোমায় | ২৭ |
| অশোক সী | শব্দদূষণ রোধ করতে | ১৭৬ |
| সুধীন্দ্র সরকার | জামা বদল | ১৮৫ |
| রবিদাস সাহারায় | গ্রন্থকীটের ভাবনা | ৪৬ |
| সলিল মিত্র | এখন কলকাতা | ২২০ |
| রূপক চট্টরাজ | মিঠির চিঠি | ২৬৫ |
| রঞ্জন ভাদুড়ী | নাই-তো-মামার বাড়ি | ১৮৯ |
| দেবাশিস বসু | পুজোর ছুটি | ৬৭ |
| প্রণব মুখোপাধ্যায় | ফিরবে ঘরে | ৯৩ |
| অপূর্ব দত্ত | বাঘের হাসি | ১১১ |
| পলাশ মিত্র | শালিকটা | ১২৫ |
| নীলিমা সেন-গঙ্গোপাধ্যায় | ওলিম্‌পিকের ছড়া | ৩০৩ |
| রমেন দাস | চাল ভাজাতে ঘি | ১৮০ |
| পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় | আক্কেল গুড়ুম | ২৩৬ |
| ধূর্জটি চন্দ | ডাং খেলব | ২৬৫ |
| ডাঃ অরুণকুমার দত্ত | শরৎ যেও না ফিরে | ১৩৪ |

□ **খেলা** □

| | | |
|---|---|---|
| পি. টি. উষা | শুধুই অন্ধকার, তবু স্বপ্ন দেখি | ২৯২ |
| অমল দত্ত | বাংলাদেশও এগোচ্ছে, আমরা শুধুই পিছোচ্ছি | ২৯৩ |
| লেসলি ক্লডিয়াস | হকি—সেকাল একাল | ২৯৪ |
| সৌরভ গাঙ্গুলি | আমার বন্ধুরা | ২৯৭ |
| রাজু মুখার্জি | বিশ্বকাপ ঃ ভারতের চান্সই নেই | ২৯৬ |
| শ্যামল ব্যানার্জি | বড় দলের ছোটোরা | ২৯৮ |
| রতন চক্রবর্তী | বাংলার সুমিতা এশিয়ার সেরা | ৩০০ |
| শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় | স্কুলের দুই সেরা ক্রিকেটার —জয়ন্ত ও বিশ্বজিৎ | ৩০২ |

□ **জাগলিং** □

| | | |
|---|---|---|
| অভয় মিত্র | এসো শিখি জাগলিং | ২৯১ |

□ **স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য** □

| | | |
|---|---|---|
| তুষার শীল | কি খাব, কি খাব না | ২৯০ |

□ **ম্যাজিক** □

| | | |
|---|---|---|
| যাদুকর পি. সি. সরকার (জুনিয়র) | উল্টো সোজা তাসের খেলা (রঙিন কমিকসে) | ৫০ |

□ **বিভাগীয় লেখা** □

| | | |
|---|---|---|
| দাদুমণির চিঠি | | ২৪০ |
| তোমাদের পাতা | | ২৪১ |
| মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি) | | ৩০৪ |
| এই মাসে | সুবন্ধু শর্মা | ৪১ |

□ **কার্টুন** □

| | | |
|---|---|---|
| সুফি | | ১২৯ |

□ **কমিকস** □

| | | |
|---|---|---|
| নারায়ণ দেবনাথ | বাঁটুল দি গ্রেট (রঙিন) | ৫ |
| নারায়ণ দেবনাথ | হাঁদা-ভোঁদা | ২৫৬ |
| নারায়ণ দেবনাথ | বাহাদুর বেড়াল (রঙিন) | ৬০ |
| সুফি | সোনা চোর | ২৮৬ |

□ **প্রচ্ছদ** ঃ বিজন কর্মকার



দাম ঃ ত্রিশ টাকা মাত্র

APPROVED BY THE DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION/WEST BENGAL AS CHILDREN'S MONTHLY MAGAZINE VIDE MEMO NO. 456(17)—T.B.C. (Dated 5-7-88)

R.N.I Registration No. 2621/57

# ৫ টাকা বাঁচান

## কমপ্লান ম্যাংগো কিনে

আপনার মনের মত কমপ্লান ম্যাংগো এখন সুবিধেজনক ৫০০ গ্রাম রিফিল প্যাকে পাওয়া যাচ্ছে। এতে আপনি টিন প্যাকের চেয়ে ৫ টাকা কমে কমপ্লান ম্যাংগো-র সমস্ত পুষ্টিগুণ ও স্বাদ পুরোপুরি পাচ্ছেন!

**কমপ্লান®**

সুপরিকল্পিত সম্পূর্ণ আহার

**নতুন রিফিল প্যাক**

শুধু কয়েকটি বাছাইকরা বাজারে পাওয়া যাচ্ছে।

GX 40/203 BEN

# বাঁটুল দি গ্রেট

এই অঞ্চলটায় চুরি ছিনতাই বন্ধ হয়েছে। মিচকে শয়তান দুটোও চুপচাপ আছে—আ-আ-আই-হাই উঠছে, একটু নিদ্রা দিয়ে নিই।

কিন্তু
এই জায়গাটা আমার কাজের পক্ষে আদর্শ স্থান। কিন্তু যে ছেলেদুটো আমার সাগরেদি করে আমাকে মাল যোগাবে বললো তাদের পাত্তা নেই—আহ্!
ঐযে এসেছে!

আমার চ্যালা হয়ে পয়লা দিনের গুরু দক্ষিণা তুই কি মাল দিয়ে শুরু করছিস, বাচ্চু ?
এই যে, দ্যাখো, ছিনতাই করা সোনার হার দিয়ে।

দারুণ মাল এনেছিস, বাচ্চু! তোর পাটনার কোথায় গেলো রে ?
সেও ভালো মাল নিয়ে আসবে, গুরু! তোমাকে পেয়ে আমাদের মনোবল বেড়ে গিয়েছে।

এইযে, গুরু আমার দক্ষিণা। একটা টাকা ভর্তি পেট মোটা ব্যাগ!
সাবাশ, বাচ্চুরা! তোরা স্মাটা ওস্তাদের উপযুক্ত চ্যালা। তোদের দিয়ে আমার ম্যালা কাজ হবে!

তোরা তেজের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যা, তোদের পেছনে আমি আছি!
দারুণ! চমৎকার! তুমি আমাদের পিছনে থাকলে আমরা পরের ধনে পোদ্দারি করবো!

কয়েক দিন পরে
আরে! আপনারা! কি ব্যাপার?
তোমার হস্তক্ষেপে বেশ কিছুদিন শান্তিতে কাটার পর কোন সাটা মস্তান এসে চুরি ছিনতাই শুরু করে দিয়েছে।
আবার কোন সাটা এখানে এসে জুটলো! এর সঙ্গে আবার বিচ্ছু দুটো ভিড়ে যায়নি তো! দেখতে হচ্ছে তো ব্যাপারটা!
সেদিন রাত্রে
একটু টহল দিয়ে দেখি কোথায় কি ব্যাপার ঘটছে!
কি মাল আছে, ছাড়ুন, না হলে হাল খুবই খারাপ হয়ে যাবে।
ওখানে হচ্ছেটা কি?
মরেচে! ভাগ রে দোস্ত! বাঁটলো আসছে!
কি ব্যাপার? এখানে হচ্ছিলোটা কি?
দুটো ক্ষুদে মস্তান আমার টাকা ঘড়ি ছিনতাইয়ের চেষ্টা করছিলো।
ডাগ্যিস টাইমলি ওকে তুই দেখেছিলি, দোস্ত! না হলে ও আমাদের পিলে চটকে দিতো।
কিরে, বাচ্চুরা! খালি হাতে যে! মাল কই?
মাল! আর একটু হলে ছাল ছাড়িয়ে নিতো আমাদের। খুব তাল মতো বাঁটুলদার নজর এড়িয়ে পালিয়ে এসেছি।
সামান্য কে এক বাঁটুল, তার এতো হিম্মত সে এই সাটা ওস্তাদের কাজে বাধা দিচ্ছে। আমাকে একবার ওকে দেখিয়ে দিবি তারপর দেখবো এটা ও হজম করে কি করে!
ঠিক আছে, গুরু! তোমাকে দেখিয়ে দেবো।
ওকে হটাতে পারলেই কেল্লা ফতে!

ঐযে যাচ্ছে, ঐহচ্ছে,বাঁটুল!
ঐ তোদের বাঁটুলদা। ছোঃ! আমার এই পাঁচ কিলোর বোমাটা যখন মাথায় লাগবে তখন মাথার জায়গায় মাথা থাকবে না! হেঃহেঃ!
ওদ্দিকটা ঠিক আছে এবার এদ্দিকটা একটু টহল মেরে যাই।
তুমি আবার কে? কোত্থেকে উদয় হলে?
আমি উদয় হয়েছি, এবার তুই অস্ত যাবি!
আচ্ছা, তাহলে এই পেটো ঝেড়ে আমার দফা সেরে ফেলতে চাইছো? কিন্তু আমার খুবই আপত্তি আছে ভাই—
হাঃ হাঃ! আমার পাঁচ কিলোর বোমা ও ফুঁ মেরে উড়িয়ে দেবে! হোঃহোঃ!
ইরক!
দুড়ুম!
এখান থেকে কাটো। আর কোন ঝামেলা নয়!
পয়লা রাউণ্ডে জিতেছিস-তবে আমিও সাটা, ফাইনাল চাঁটাটা আমিই তোকে মারবো!

একি, গুরু! তোমার হাল দেখে বুক যে দুরু দুরু করছে!
আমার পাঁচ কেজি আমারই ওপর ফাটিয়ে!
আমার এই হাল করেছে!
আমি ওর খাল খিঁচে নেবো।
কিছুক্ষণ পরে
এবার দেখবো ও কতো শক্ত মানুষ! এটা আর ফুঁ দিয়ে ওড়াতে হবে না। কিন্তু শিকারকে পাই কোথায়?
ছিপ নিয়ে নদীতে মাছ ধরতে গেছে! এই মওকায় তোমার এই হাতিয়ার দিয়ে যদি ওকে খতম করতে পারো, গুরু!
চমৎকার সুযোগ! চুপচাপ পেছন থেকে আমার এই ব্রহ্মাস্ত্র ওর ব্রহ্মতালুতে বসিয়ে ওকে জলে ফেলে দেবো। সাটা ও স্তাদের পথের কাঁটা নদীর জলে ভেসে যাবে।
এবার তোর খেল খতম—
ইয়াআঃ!
ঠকাস!
হাঃ হাঃ! ওদের বাঁটুলদার মস্তক বিদীর্ণ এবার জলে ফেলে দেওয়া।
তারপর ডাকাতি আর ছিনতাইয়ের ফোয়ারা ছুটিয়ে দেবো— হর্‌ক!
আজ আর মাছ উঠবে না। উঠে পড়া যাক!
এতো দেখছি সেই সাটা! ওকে চলে যেতে বলেছিলুম আর ও আমার কথা না শুনে এখানে কাটা কলাগাছের মতো পড়ে ঘুম লাগাচ্ছে!
একে আর বাইরে ছেড়ে রাখা সমীচীন নয় ওকে থানেদারের জিম্মা করে দি!
গুরু! শেষপর্যন্ত তুমি কয়েদখানার দিকে যাত্রা শুরু করবে তা ভাবতেই পারি নি!

# শুকতারা

৪৪শ বর্ষ ● শারদীয়া সংখ্যা ● আশ্বিন ১৩৯৮/সেপ্টেম্বর ১৯৯১

## ধরি মাছ না ছুঁই পানি

অন্নদাশঙ্কর রায়

ভাবছি আমার এই জীবনে
কী হল না করা
বঁড়শি দিয়ে পুকুরপাড়ে
হল না মাছ ধরা।
গেলেই দেখি ছিপটি হাতে
বালক থেকে বুড়ো
কেউ বা কারো ঠাকুরদাদা
কেউ বা কারো খুড়ো।
সবার মুখে কুলুপ আঁটা
ঠারে ঠারে চালায়
মাছের কানে পড়লে কথা
মাছটা পাছে পালায়।
এক আসনে উপবেশন
সকাল থেকে সন্ধ্যে
যোগী ঋষির মতন ভোর
কিসের আনন্দে!

কী একাগ্র দৃষ্টি, আহা!
কী অভিনিবেশ হে!
কী অসীম ধৈর্য আর
কী অসহ্য ক্লেশ হে!
কত যে কৌশল লাগে
খেলতে ও খেলাতে
দাঁড়িয়ে হাঁ করে দেখি
একটুকু তফাতে।
ধরি মাছ না ছুঁই পানি
সেই যে মহা তত্ত্ব
স্বচক্ষে দর্শন করি
সেটা কেমন সত্য।
ধৈর্য ধরা শক্ত, তাই
হল না মাছ ধরা
তার চাইতে অনেক সোজা
এগজামিনের পড়া।

ছবি: সুফি

# হাফে লীগ অনওয়ার্ড
# ভুশুণ্ডির মাঠ ওয়ার্ড

## অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Half a league, half a league onward
Into the jaws Hell into the valley of death
Forward backward—

ভিতর দিকে ফিকে ফিকে তিমির সঞ্চার
বাহির দিকে কিট্‌কিটে নিবিড় অন্ধকার!
সেইস্থানে বাস করে উপদেবতাগণ
চলাচল নাহি করে সেস্থানে পবন।
কজ্জলকান্তি অঞ্জনকান্তি কৃষ্ণকান্তি মণি
সেই মাঠে আলো দেয় দিবস-রজনী।
সর্বচিত্তহরা সেই ভূচণ্ডীর পুর
চৌখণ্ডী মাঠের পার আছে বহুদূর।
গড়ের বাহিরে বদ্ধ পাঁচটি দুয়ার
হুনর মানুষ ছাড়া তালা খুলা ভার—
চর্চরি ঝর্ঝরি হিন্তাল বাঁশঝাড়
শব্দকল্পদ্রুম্ তথা দুম্‌দুমি বাজায়।

সয় না দেরি, আয় না চলি সন্ধ্যাঘোরে—
পেনেটি হতে পান্‌সি ছেড়ে কোন্নগরে।
কোন্নগরে ও কোন্ নগরে?
ডি ওয়াল্‌ডির ওয়াল টোপ্‌কে—
রিশড়া মাহেশ ছিলামপুরে

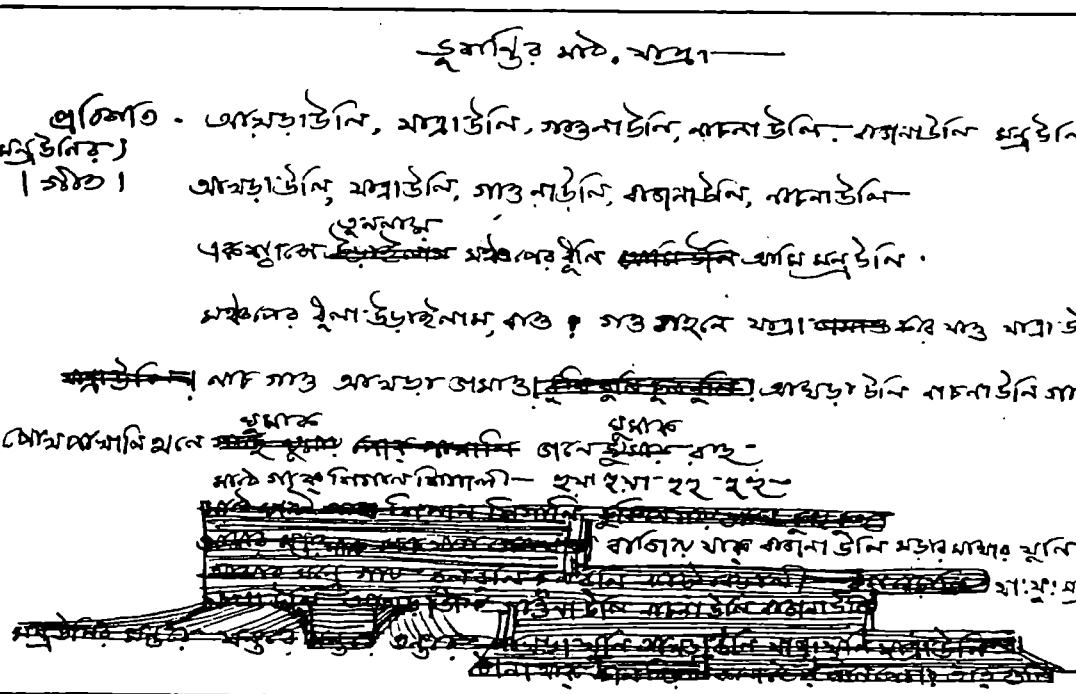

ক'রে চুলাচুলি কিলাকিলি
চলে যাই শেওড়াপুলি !
বৈদ্যবাটির হুদ্দো ধরে
ছেড়ে চাঁপদানির চটকলের কুলিওয়ার্ড
Half a league, half a league onward
Come forward go onward
No go backward
চলো northward !

---

Half a league, half a league onward

into the jaws Hell into the valley of death

forward backward

# লাইনে // সুভাষ মুখোপাধ্যায়

রবি ভাস্কর সূর্য তপন অরুণ মিহির অর্ক।
দুই পন্ডিত দেখা হলেই বাধবে তুমুল তর্ক॥

ইন্দু শশী মৃগাঙ্ক চাঁদ বিধু সোম সুধাংশু।
বাবার পায়ে হাওয়াই চটি, দাদুর পায়ে পাম্‌শু॥

জগৎ ভুবন বসুন্ধরা পৃথিবী মহী বিশ্ব।
ট্রেন চললে দেখবে বাইরে পিছু হাঁটছে দৃশ্য॥

আকাশ গগন দ্যৌ আশমান নভ অম্বর ব্যোম।
ভয়ের কথা মনে পড়লেই খাড়া হয়ে যায় লোম॥

জল অপ্ পানি নীর পয় বারি অম্বু।
বাস্কেটবল খেলায় দ্যাখো একাই একশো লম্বু॥

স্রোতস্বতী তরঙ্গিনী গাঙ নদী সরিৎ।
ও তো কেবল বন্ধু নয়, প্রকৃতই সুহৃৎ॥

জমি মাটি স্থল ভূমি মৃত্তিকা ভূপৃষ্ঠ।
কেরোসিনের লাইনে দাঁড়িয়ে প্রাণটা হলো অতিষ্ঠ॥

ছবি : সৃফি

## যাত্রাপালার গান ঃ রচনাপ্রসঙ্গ

*রাজশেখর বসুর (পরশুরাম) 'গড্ডালিকা' বইয়ের বিখ্যাত গল্প 'ভুষন্ডির মাঠে' অবলম্বনে অবনীন্দ্রনাথ একটি যাত্রার পালা লিখেছিলেন। নীল মলাটের সেকালের SWAN খাতার (২ নম্বর ৩২ পৃষ্ঠা) উপরে তিনি লিখে রেখেছেন, 'ভূশণ্ডীর মাঠ যাত্রা/ শ্রী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর/গড্ডলিক পরশুরাম হইতে'। ২১ পৃষ্ঠার মধ্যে পালা শেষ করেছেন। অবনীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি যেমন হয়, এটিও তাই। কাটাকুটির মধ্যে থেকে ছবি উঠে এসেছে; সে-ছবি অধিকাংশই অদ্ভুত ধরনের পাখির। পরশুরামের ঐ গল্পটি পড়ে অবনীন্দ্রনাথের এত ভালো লেগেছিল যে তিনি গল্পটি নিয়ে যাত্রার পালা লিখে ফেলেন। শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, অবনীন্দ্রনাথের হাতে গল্পটি অন্যরকম দাঁড়িয়ে গেছে। সে যা-ই হোক্। ওই পালার মধ্যে মাঝে মাঝেই আছে ছড়া আর গান। এ-সব না থাকলে যাত্রা জমে কি করে! সেইরকম একটি গান এবার 'শুকতারা'র পাঠক-পাঠিকাদের জন্যে ছাপা হলো। এটি ভূতদের সমবেত গান। যাঁরা গলা মিলিয়েছেন, তাঁরা অধিকাংশই মনুষ্যসমাজে এককালে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন, যেমন—বদ্যি, ডাক্তার, কবিরাজ, চোংদার, মাস্টার আর সেই বেচারা শিবু, যে কিনা ইহজীবনে অনেক কষ্টভোগের পর ভূত হয়ে ওই মাঠের একটা গাছে আশ্রয় নিয়েছিল। পরশুরামের গল্পটি অবশ্য তোমাদের অনেকেরই পড়া আছে।*

*যে গানটি এখানে ছাপা হলো, তার আরম্ভ আর শেষ একটি বিখ্যাত ইংরেজি কবিতার অংশ ওলটপালট করে। কবিতাটি টেনিসনের 'চার্জ অব দ্য লাইট ব্রিগেড'। গানটির মধ্যে নানাভাবে জড়িয়ে আছে কলকাতার আশেপাশের কতকগুলি জায়গার নাম। এইসব জায়গার সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের পরিচয় সেই ছেলেবেলা থেকে। তাঁর 'জোড়াসাঁকোর ধারে', 'ঘরোয়া' পড়লে বুঝতে পারবে এই জায়গাগুলির সঙ্গে তাঁর কতদিনের গভীর যোগ।*

*অনাথনাথ দাস*

# ইচ্ছা গ্রহ

## সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি যাচ্ছে। একটা পাথরের আড়ালে দাঁড়িয়ে সেই গাড়িটার দিকে তাকিয়ে গুটুলি বললো, ইস্, কতদিন আইসক্রিম খাইনি!

রণজয় পা ছড়িয়ে বসে আছে একটা গাছতলায়। সে জিজ্ঞেস করলো, হঠাৎ তোর আইসক্রিমের কথা মনে পড়লো যে?

গুটুলি বললো, কী জানি! হঠাৎ আইসক্রিমের কথা ভেবে মনটা হু-হু করে উঠলো!

রণজয় বললো, এই জঙ্গলে তুই আইসক্রিম পাবি কোথায়?

গুটুলি বললো, আমরা কাছাকাছি যে গ্রামগুলোতে রাত্তিরবেলা চুপিচুপি যাই, সেখানেও কেউ আইসক্রিম বানায় না!

রণজয় বললো, আইসক্রিম পাওয়া যায় শহরে। দূর দূর, আমি আর কিছুতেই কোনো শহরে যাবো না!

গুটুলিও অবশ্য শহরে যেতে চায় না। শহরের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে ওদের দু'জনেরই। রণজয় আট ফিট লম্বা, সাধারণ মানুষের প্রায় দেড় গুণ, আর গায়ের রংটা নীল। তাকে দেখলেই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা দৈত্য ভেবে ভয় পায়.আর বড়োরা তাকে মারতে আসে। চেহারাটা বদলে গেলেও সে যে অন্যদের মতনই একজন মানুষ, তা কেউ বোঝে না। আর গুটুলি দারুণ বেঁটে। রণজয়ের কোমরের চেয়েও নীচে থাকে। তাকে দেখলে সবাই হাসে আর মাথায় চাঁটি মারে। অথচ অন্য মানুষদেরই মতন গুটুলির দুঃখ আছে, ভালোবাসা আছে।

চেহারা দিয়ে যে মানুষকে বিচার করা যায় না, তা বেশির ভাগ মানুষই আজও বোঝে না!

রণজয় জিজ্ঞেস করলো, কী গাড়ি যাচ্ছে রে?

গুটুলি বললো, একটা বাস। তাতে কত মানুষ বসে আছে। বাসটা থামিয়ে ওদের একটু ভয় দেখাবে?

বাসটা থামানো রণজয়ের পক্ষে খুবই সহজ। রাস্তার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেই হলো। কোনো গাড়িই তার অত বড় শরীরটাকে ধাক্কা মেরে সরাতে পারবে না। তা ছাড়া গাড়ির ড্রাইভাররা হঠাৎ তাকে দেখেই আঁতকে ওঠে। যারা ভূত-প্রেতে একদম বিশ্বাস করে না, তারাও ভাবে এই একটা সত্যিকারের ভূত!

রণজয় বললো, ওদের ভয় দেখিয়ে কী হবে?

গুটুলি বললো, তবু খানিকটা সময় কাটবে। খানিকটা হাসা যাবে। কিছুই যে করার নেই।

রণজয় বললো, ও খেলাটাও আর ভালো লাগে না। তুই আইসক্রিম খেতে চাইলি, তার একটা ব্যবস্থা করা যাক। এক কাজ করলে হয়। খানিকটা দুধ আর বরফ খেয়ে নিলেই তো পেটের মধ্যে গিয়ে আইসক্রিম হয়ে যাবে!

গুটুলি খানিকটা নাকি কান্নার সুরে বললো, নাঁ, আমি ওঁ রকম চাঁই না, আঁসল আঁইসক্রিম খাঁবো।

রণজয় বললো, তাহলে তো আইসক্রিম বানাতে হয়! দাঁড়া অন্ধকার হোক!

রাত্রি গভীর হলে রণজয় গুটুলিকে কাঁধে নিয়ে জঙ্গল পেরিয়ে চুপিচুপি একটা গ্রামে ঢুকলো। সবাই এখন ঘুমিয়ে আছে। শুধু দু'চারটে কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে লাগলো রণজয়কে দেখে। রণজয় একবার ঘুরে দাঁড়াতেই কুকুরগুলো ভয়ে ল্যাজ তুলে পালালো।

এ গ্রামের একটা মিষ্টির দোকান ওরা আগে থেকেই চেনে। মাঝে মাঝে ওরা এরকম রাত্তিরে এসে এই দোকান থেকে চুরি করে মিষ্টি খেয়ে যায়। ঠিক চুরি নয়, তার বদলে ওরা জঙ্গল থেকে অনেক আম, কাঁঠাল ও নানারকম ফল রেখে যায় এখানে। আজ এনেছে দু'ছড়া কলা।

প্রথমে ওরা দু'জনে টপাটপ করে কিছু রসোগোল্লা আর সন্দেশ খেয়ে নিল। জঙ্গলে শুধু পাখির মাংস আর খরগোশের মাংস আর ফলমূল খেতে খেতে ওদের একঘেয়ে লাগে। একটা ডাকাতকে ওরা রাঁধুনি হিসেবে রেখেছিল, সে পালিয়েছে।

মিষ্টি খেয়ে পেট ভরাবার পর রণজয় বললো, ঐ দ্যাখ একটা কড়াই ভর্তি দুধ জ্বাল দেওয়া আছে।

গুটুলি বললো, না, আমি দুধ খাবো না!

রণজয় বললো, তোকে দুধ খেতে হবে না। কী করে এর খানিকটা দুধ সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া যায় দ্যাখ তো! কিছু পাত্র-টাত্র আছে?

গুটুলি বললো, একটা ডেকচি আছে দেখছি। ঢাকনাও আছে।

রণজয় বললো, ডেকচিটাতে দুধ ভরে ভালো করে মুখটা বেঁধে নে। ছলকে যেন না পড়ে!

রণজয় নিজেই এক ঠোঙা চিনি আর একটা দেশলাইও খুঁজে নিল। তারপর বললো, চল গুটুলি, আমি আইসক্রিম বানাবো!

গুটুলি জিজ্ঞেস করলো, বরফ কোথায় পাবে?

রণজয় বললো, পৃথিবীতে কি বরফের অভাব আছে? কত পাহাড়—!

যে-জঙ্গলে ওরা থাকে, তার পেছনে পাহাড় আছে বটে কিন্তু সেখানে বরফ নেই। বরফের টুপি-পরা পাহাড় অনেক দূরে।

গুটুলিকে কাঁধে নিয়ে রণজয় একটার পর একটা পাহাড় পেরিয়ে যেতে লাগলো। ওদের তো আর কোনো কাজ নেই। এখন আইসক্রিম বানাবার ঝোঁকটা পেয়ে বসেছে।

বরফের পাহাড়ে পৌঁছোলো পর দিন সন্ধ্যেবেলা।

কোথাও কোনো জন-মনুষ্য নেই, জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে জমে আছে বরফ। শীতকাল, তাই পাহাড়ের চূড়ায় ওঠার দরকার নেই, অনেক নীচেই বরফ রয়েছে।

গুটুলিকে কাঁধ থেকে নামিয়ে রণজয় খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিল।

গুটুলি বললো, দোকানটা থেকে আমি এক তাল ছানাও নিয়ে এসেছি। এই নাও দাদা, ছানা খেয়ে গায়ে একটু জোর করে নাও!

রণজয় বললো, তুই খা। ছানা খেতে আমার বিচ্ছিরি লাগে। আমি আইসক্রিম বানিয়ে তবে খাবো।

কী করে আইসক্রিম বানাতে হয়, জানো?

খুব সোজা। দুধটা ফুটিয়ে ক্ষীরের মতন করতে হবে, তার মধ্যে চিনি আর বরফ মেশালেই দেখবি চমৎকার আইসক্রিম হয়ে যাবে। কুলপি-মালাইও হতে পারে। যা চাইবি!

দুটো সমান সাইজের পাথর যোগাড় করে উনুন বানালো রণজয়। গুটুলি কিছু শুকনো কাঠ-কুটো এনে গুঁজে দিল তাতে। আগুন জ্বালিয়ে ডেকচিটা চাপানো হলো।

কাঠগুলো ভিজে, তাই আগুন নিভে যাচ্ছে বারবার।

গুটুলি মাটিতে শুয়ে পড়ে ফুঁ দিয়ে দিয়ে আবার আগুন ধরাচ্ছে। রণজয় চেয়ে আছে সামনের দিকে। হঠাৎ সে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখলো।

কাছেই খোলা জায়গায় জমে আছে চাপ চাপ বরফ। একটু একটু জ্যোৎস্না পড়েছে তার ওপর। চাঁই চাঁই বরফ যেন আপনা আপনি শূন্যে উঠে যাচ্ছে। এ আবার কী ব্যাপার?

রণজয় ভালো করে লক্ষ্য করলো।

এবার দেখতে পেল, একটা মস্ত বড় লোহার হাত যেন মুঠো মুঠো করে সেই বরফ তুলে নিচ্ছে।

অন্য যে-কেউ এ দৃশ্য দেখলে ভয় পেত। কিন্তু রণজয়ের ভয় ডর নেই। সে বললো, গুটুলি, তুই দুধটা জ্বাল দে, আমি একটু আসছি।

রণজয় আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল সামনের দিকে।

তার চোখের ভুল নয়, সত্যিই একটা প্রকাণ্ড লোহার হাত বরফ তুলে নিয়ে যাচ্ছে পেছন দিকে।

রণজয় বুঝতে পারলো, এটা একটা রোবটের হাত। হাতটা যদি এত বড় হয়, তাহলে রোবটটা কত বড়!

রণজয় আরও খানিকটা এগিয়ে গেল। রোবটটাকে দেখতে পেল না, আবছা আলোয় তার চোখে পড়লো, খানিকটা সমতল জায়গার ওপর রয়েছে একটা গোলমতন রকেট। সেই রকেটের ভেতর থেকে লোহার হাতটা বেরিয়ে এসে বরফ তুলছে, তুলে ফেলে দিচ্ছে রকেটের মধ্যে।

বাইরে থেকে কারা যেন বরফ চুরি করতে এসেছে!

কোনো মানুষ বা অন্য ধরনের প্রাণীদের দেখা যাচ্ছে না, শুধু যেন রকেটের কাছাকাছি কয়েকটা জোনাকি জ্বলছে আর নিভছে। বেশ বড় ধরনের জোনাকি!

গুটুলি একা থাকতে ভয় পায়। বরফ তোলার শব্দ শুনে সেও ছুটে এলো রণজয়ের কাছে। ব্যাপারটা দেখে সে ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করলো, দাদা, এটা কী হচ্ছে?

রণজয় বললো, রাত্তিরের অন্ধকারে পৃথিবীতে কত কী যে ঘটে যায়, মানুষ টেরও পায় না। বুঝতে পারছিস না, অন্য কোনো গ্রহের প্রাণীরা এসে আমাদের বরফ নিয়ে যাচ্ছে। এই রকম ভাবে বোধহয় গাছপালা, নদীও নিয়ে যায়। আজকাল প্রায়ই শুনিস না, জঙ্গল সাফ হয়ে যাচ্ছে, নদী মরে যাচ্ছে, সে সব এদেরই কীর্তি!

গুটুলি বললো, দাদা, পালিয়ে চলো। অত বড় লোহার হাত!

রণজয় বললো, ভয়ের কী আছে! এই চুরি আটকাতে হবে না?

রণজয় তার বজ্রের মতন গম্ভীর গলায় হুঙ্কার দিল, এই, কে রে? কে বরফ চুরি করে?

সঙ্গে সঙ্গে সেই লোহার হাত এদিকে ঘুরে এলো। একসঙ্গে রণজয় আর গুটুলিকে মুঠোয় ভরে তুলে নিল শূন্যে। রণজয়ের শরীরে অসীম শক্তি, তবু সে ছাড়াতে পারলো না নিজেকে। লোহার হাতটা ওদের ছুঁড়ে দিল রকেটের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে দু' জনেই জ্ঞান হারালো।

## ॥ ২ ॥

জ্ঞান ফেরার পর রণজয় ধড়মড় করে উঠে বসলো। সে শুয়েছিল খোলা আকাশের নীচে। গুটুলি ঘুমিয়ে আছে তার পাশে। ঠিক রোদ্দুরও নয়, ছায়াও নয়, একটা আবছা মতন আলো রয়েছে চারদিকে। আকাশের রং কালো। মেঘলা আকাশ যে-রকম কালো হয়, সে রকম নয়, সম্পূর্ণ আকাশটাই স্লেট রঙের।

রণজয়ের বুঝতে দেরি হলো না যে তারা একটা অন্য গ্রহে এসে পড়েছে। তাতেও রণজয় ভয় পেল না। এরকম অভিজ্ঞতা তার আগেও অনেকবার হয়েছে।

গুটুলির দিকে সে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো অবাক হয়ে। এই বেঁটে লোকটিকে সে চেনে বটে, কিন্তু কিছুতেই ওর নাম মনে করতে পারছে না। রণজয়ের নিজেরই বা নাম কী? তাও মনে নেই।

গুটুলিকে সে ধাক্কা দিয়ে জাগালো।

গুটুলিও উঠে চোখ রগড়ে অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, এটা কোন জায়গা?

রণজয় বললো, সেটা পরের কথা। আমাকে তুমি চেনো?

গুটুলি বললো, বাঃ, তোমাকে চিনবো না কেন? এ কী জিজ্ঞেস করছো। তুমি তো তুমি!

আমার নাম কী?

তোমার নাম? তাই তো, তাই তো, মনে পড়ছে না।

হুঁ! আমরা কোথা থেকে এসেছি মনে আছে?

আমরা কোথা থেকে এসেছি? এই যাঃ! জানি না তো! তুমি বলে দাও!

আমরা কোথা থেকে এসেছি তাও মনে নেই? এই জায়গাটা অচেনা লাগছে, তা হলে নিশ্চয়ই আমরা অন্য কোথাও ছিলাম। সেই জায়গাটা কেমন?

কিচ্ছু মনে পড়ছে না যে!

রণজয় এবার একটু দমে গেল। কোন জায়গা থেকে এসেছে, তাই-ই যদি মনে না থাকে, তা হলে ফিরবে কী করে?

গুটুলি একটুখানি সামনে ঘুরে এলো। কোনো গাছ বা প্রাণী কিছুই দেখা যাচ্ছে না। মাটিটা নরম, কিন্তু কাদা নেই।

গুটুলি বললো, খিদে পেয়েছে। কতদিন ভাত খাইনি। গরম গরম ভাত...

রণজয় বললো, ইস্, আইসক্রিম খাওয়া হলো না।

সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিকের মতন কাণ্ড ঘটলো। কোথা থেকে দুটো থালা ফুটে উঠলো ওদের সামনে। তার একটাতে ধোঁয়া ওঠা গরম ভাত। আর একটাতে আইসক্রিম।

ওদের একেবারে চক্ষু ছানাবড়া!

রণজয় বললো, আমাদের নাম মনে নেই। কোথা থেকে একসঙ্গে এসেছি তা মনে নেই। কিন্তু ভাত আর আইসক্রিমের কথা মনে থাকলো কী করে?

গুটুলি বললো, কী জানি!

ভাতের সঙ্গে আর কী খায়?

মনে নেই। এগুলো কে দিয়ে গেল?

তা কী করে জানবো।

ভাতটা গরম, আইসক্রিমটা ঠাণ্ডা। এ দুটোকে কি একসঙ্গে খায়?

তাও জানি না।

খিদে পেয়েছে, খেয়ে তো নিই!

গুটুলিই আগে ভাতের সঙ্গে আইসক্রিম মিশিয়ে দলা পাকিয়ে মুখে দিয়ে বললো, আঃ! চমৎকার!

দু'জনে খুব তাড়াতাড়ি সবটা শেষ করে ফেললো।

তারপর দু'জনেই হেঁটে দেখতে লাগলো জায়গাটা। রণজয়ের বুকটা ফাঁকা ফাঁকা আর হাল্‌কা লাগছে। অনেক কথা তার মনে নেই। ভাত আর আইসক্রিম ছাড়া আর একটা খাবারের কথাও মনে পড়ছে না। অন্য কোনো মানুষের মুখ মনে পড়ছে না। জঙ্গল বা পাহাড়ের কথা মনে পড়ছে না।

এই গ্রহটা একেবারে সমতল। মানুষের থাকার মতন কোনো বাড়ি-ঘর চোখে পড়ছে না। অনেক দূরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কয়েকটা কারখানা আছে মনে হলো। মাঝে মাঝে শূন্য দিয়ে উড়ে যাচ্ছে রকেট। কয়েকটা অদ্ভুত ধরনের গাড়িও চলে গেল ওদের পাশ দিয়ে, কিন্তু তার যাত্রীদের দেখা যাচ্ছে না। শুধু ভেতরে জোনাকির মতন আলো জ্বলছে আর নিভছে।

খানিকটা দূরে একটা মাঠের মধ্যে ঘুরছে কয়েকটা গরু, ছাগল, ঘোড়া, জিরাফ, জেব্রা, খরগোশ আরও অনেক জন্তু, যা ওরা আগে কখনো দেখেনি। গরু-ছাগল-ঘোড়াগুলো দেখে ওরা চিনতে পারলেও তাদের নাম মনে নেই।

রণজয় একটা গরুর দিকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো, এটা কী?

গুটুলি বললো, এটা, এটা, এটা, তাই তো কী এর নাম?

রণজয় একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো, আমরা অনেক কিছু ভুলে গেছি। এ কোন এক ভোলার দেশে এসে পড়লাম।

সেখানে ওদের কেটে গেল তিন দিন।

মাটিতেই শুয়ে থাকতে কোনো অসুবিধে নেই। এখানে রোদ ওঠে না, বৃষ্টি পড়ে না। যে-কোনো জায়গায় গেলে কেউ বাধা দেয় না।

ওরা খায় শুধু গরম ভাত আর আইসক্রিম। খিদে পেলে ঐ দুটোর কথাই মনে পড়ে অমনি দুটো থালা ভর্তি চলে আসে।

রণজয় বুঝতে পেরেছে যে এই গ্রহের অধিবাসীদের মানুষের চোখের লেন্সে দেখা যায় না। মানুষের কাছে তারা অদৃশ্য। শুধু তাদের চোখগুলো জোনাকির মতন জ্বলে-নেভে।

এখানে ইচ্ছেশক্তির খুব জোর আছে। ইচ্ছেটাই বস্তু হয়ে যায়। কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক, স্মৃতিশক্তি এমনই কমে যায় এখানে যে বেশি কিছু স্মৃতিতে থাকেই না।

এখানে থাকার কোনো অসুবিধে নেই। যেখান থেকে এসেছে, সেই পৃথিবীর কথা ওদের একটুও মনে নেই, তবু বুকের মধ্যে টনটন করে। কিসের যেন একটা দুঃখ ঘুমের মধ্যেও ওদের সঙ্গে থাকে।

এখানকার মাটি নরম। হাত দিয়ে দাগ কাটা যায়। গুটুলি একদিন নানা রকম দাগ কাটছে, হঠাৎ রণজয় বললো, দাঁড়াও, দাঁড়াও, এই যে তিনটে দাগ কাটলে এটা কিসের মতন দেখাচ্ছে বলো তো!

গুটুলি বললো, জানি না তো!

রণজয় বললো, একটা সোজা দাগ, আর বাঁ পাশে দুটো দাগ কোনাকুনি জোড়া। এটা হলো ব।

ব? তার মানে কি?

ব হলো একটা অক্ষর। আমরা যে কথা বলি, তার ব।

ঠিক তো। আমরা যে কথা বলি, তা লেখাও যায়। ব, তারপর কী? মনে করতে পারছি না।

ব-এর পাশে একটা হাতের মতন দিলে ক হয় না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ক। ঠিক। ক-এর মানে কী?

তা তো জানি না। তা হলে দুটো পেলাম, ব আর ক। বক! বক! খুব চেনা চেনা লাগছে। বক বলে কিছু একটা আছে না?

হ্যাঁ, আছে। ওড়ে।

সঙ্গে সঙ্গে একটা বক ওদের সামনে দিয়ে উড়ে গিয়ে মাটির ওপর বসলো।

ওরা দু-জন তাকালো পরস্পরের দিকে। এবার স্পষ্ট হয়ে গেল যে

এখানে যে-কোনো জিনিসের নাম উচ্চারণ করলেই সেটা বাস্তব হয়ে উঠবে। সেদিন আর কিছু মনে পড়লো না।

পরদিন সকাল থেকে প্রবল উদ্যমে মাটিতে দাগ কাটতে লাগলো রণজয়। বারবার লিখছে ব আর ক, বক, বক। আর প্রত্যেকবার ম্যাজিকের বক উড়ে যেতে লাগলো সেখান দিয়ে।

অনেক আঁকিবুকি কাটার পর আবার একটা অক্ষর চিনতে পারলো রণজয়। ন।

গুটুলিও বললো, ন। হ্যাঁ, ন!

রণজয় ক-এর পাশে ন বসালো। তারপর কন। কন মানে কি?

গুটুলি বললো, তা তো জানি না! তুমি ব-এর পাশে বসাও তো!

রণজয় সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে উঠলো, বন, বন! বন মানে জানিস তো!

গুটুলি বললো, জানি, জানি! বড় বড় গাছপালা। আমরা সেখানে ছিলাম।

ঠিক বলেছিস, গাছ! গাছ খুব লম্বা হয়। অনেক হাত থাকে।

ঐ দ্যাখো। একটা গাছ!

যেমন ভাবে বক উড়ে গিয়েছিল, সেই রকমভাবে পরপর কয়েকটা গাছ গজিয়ে গেল সামনে। গজাতেই লাগলো, একটা বন হয়ে গেল।

রণজয় বললো, বন কোথায় ছিল। ভাবো তো। সেটা অন্য গ্রহ। সেটার নাম কী?

গুটুলি বললো, বনের পাশে ছিল পাহাড়। বরফ!

রণজয় শূন্যে এক লাফ দিয়ে বলে উঠলো, মনে পড়েছে। পৃথিবী! পৃথিবীতে বরফ থাকে। বন থাকে। মানুষ থাকে। গরু-ছাগল-ঘোড়া থাকে। সব হয়ে যাক।

তক্ষুণি বিরাট এক গর্জন শোনা গেল। যেন শত শত বজ্রপাত হচ্ছে। মাটি দুলছে। রণজয় আর গুটুলি চোখে অন্ধকার দেখলো, চোখ ঢেকে শুয়ে পড়লো।

খানিকবাদে থেমে গেল সব আওয়াজ। মাটিও আর কাঁপছে না।

চোখ মেললো ওরা দু'জন।

আবার বিষম অবাক হবার পালা। ওদের সামনে তৈরী হয়ে গেছে এক পাহাড়। তার গায়ে কিছু কিছু জঙ্গল। সামনে ছড়ানো আছে বরফ।

একটা ডেকচিতে দুধ ফুটছে!

রণজয় বললো, তোর নাম তো গুটুলি। আমার নাম রণজয়। মনে পড়ে গেছে। দ্যাখ গুটুলি, এই জায়গাটা আমাদের পৃথিবীর মতন হয়ে গেছে। অবিকল একরকম।

গুটুলি বললো, কিন্তু এই দুধের ডেকচিটা? মিষ্টির দোকান থেকে এনেছিলাম, সেটাও এখানে এলো কী করে?

রণজয় বললো, সেটাও এখানে তৈরী হয়ে গেছে। আমরা যা ভাববো, তাই-ই হয়ে যাবে। ভালোই হলো, অন্য একটা গ্রহ আমাদের পৃথিবীর মতন হয়ে গেল!

গুটুলি বললো, দাদা, এটা কি অন্য গ্রহ? নাকি আমাদের সেই পৃথিবীটাই? দ্যাখো, দেশলাইয়ের পোড়া কাঠি পর্যন্ত পড়ে আছে। আমরা তো দেশলাইয়ের কথা বলিনি!

রণজয় বললো, তাই তো! তাহলে কি ওরা আমাদের ফিরিয়ে দিয়ে গেল?

গুটুলি বললো, ফিরিয়ে দিল? আমরা কি কোথাও গিয়েছিলাম, না এখানেই ছিলাম? তিন চার দিন ধরে কী এই দুধ ফুটছে? অথচ কত আইসক্রিম খেলাম!

রণজয় বললো, আমার আঙুলের কোণে ভিজে ভিজে মাটি কেন? আমি মাটিতে আঁকিবুকি কাটছিলাম। এখানে তো মাটি নেই, শুধু পাথর! তা হলে?

গুটুলি বললো, কী জানি দাদা, কিছুই বুঝতে পারছি না!

ওরা বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে রইলো পরস্পরের দিকে।

**ছবি: বিজন কর্মকার**

# তিনপাহাড়ি

## নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

পাহাড় দিয়ে পাঁচিল গাঁথা,
ছোট্ট একটা নদীও আছে,
সারাটা দিন দোলায় মাথা
শাল-মহুয়া বাড়ির কাছে।

দৃশ্য দ্যাখে বিশ্বনিখিল
চুপটি করে। আর কী জানো,
বৃষ্টি থামলে আকাশটা নীল,
জায়গা-জমি ঢেউ-খেলানো।

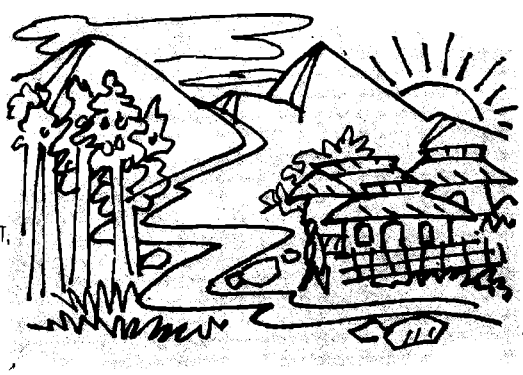

রাস্তাঘাটে ভিড় কিছু নেই,
মাটির বাড়ি, বাঁশের বেড়া।
রোদ কিছুটা ঝিমিয়ে গেলেই
হাঁটতে বেরোয় লোকজনেরা।

ইচ্ছে করছে এক্ষুণি যাই,
সেই মুলুকে জমাই পাড়ি।
জায়গাটা কী, কেউ জানো ভাই?
নাম শুনে নাও–তিনপাহাড়ি।

**ছবি: সুফি**

# গ্রহান্তরে

## শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

জীবনের ওপর ঘেন্না ধরে গেছে বরুণবাবুর। সকাল থেকে গভীর রাত্রি অবধি খেটেখুটে যা আয় হয় তাতেও সংসারটা ঠিকমতো চালানো যাচ্ছে না। বাড়িতে নিত্য খিটিমিটি লেগেই আছে। ছেলেপুলেগুলো ঠিকমতো মানুষ হচ্ছে না। বাড়িওয়ালা বাড়ি ছাড়ার জন্য চোখ রাঙাচ্ছে। চাকরির জীবন প্রায় শেষ হয়ে এল। আয়ুও কি আর বেশীদিন আছে। বরুণবাবুর খুব ইচ্ছে করে সংসারের ঝামেলা থেকে বিদায় নিয়ে কোনও নির্জন জায়গায় গিয়ে শান্তিতে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে। তিনি টের পাচ্ছেন সংসারের ওপর তাঁর আর কোনও টান বা মোহ নেই। সারাদিনের শেষে বাড়ি ফিরতেও তাঁর ইচ্ছে করে না।

দূরের একটা টিউশানি সেরে শেষ ট্রামে বাড়ি ফিরছিলেন বরুণবাবু। মনটা বড়ই খারাপ। বুড়ো হতে চললেন, অথচ জীবনে একটা দিনও সুখে বা শান্তিতে কাটিয়েছেন বলে মনে পড়ে না। নিজের ওপর, সংসারের ওপর, গোটা দুনিয়ার ওপর তাঁর বিরক্তি ধরে গেছে।

ট্রাম ফাঁকা। একেবারেই ফাঁকা। শুধু আর একটা লোক র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে সামনের সীটে বসা। আর কেউ নেই।

হঠাৎ লোকটা ফিরে তাকিয়ে বলল, কেমন আছেন বরুণবাবু?

আর যাই হোক বরুণবাবুর স্মৃতিশক্তি খুবই ভাল। লোকটা রীতিমতো সুপুরুষ, বয়সও কম, চব্বিশ-পঁচিশের মধ্যেই হবে। কিন্তু লোকটাকে বরুণবাবু কিছুতেই চিনতে পারলেন না।

ভদ্রতা করে বললেন, চলে যাচ্ছে কোনওরকম। কিন্তু আপনাকে তো ঠিক—

লোকটা ঝকঝকে দাঁত দেখিয়ে হাসল, চিনতে পারছেন না তো! চেনার কথাও নয়। আপনি জীবনে এই প্রথম আমাকে দেখছেন।

বরুণবাবু অবাক হয়ে বললেন, তাহলে—

লোকটা বলল, আমিও আপনাকে চিনতাম না। এই ট্রামেই আমাদের প্রথম দেখা হলো।

তাহলে আমার নামটা জানলেন কি করে?

লোকটা তেমনি হাসি-হাসি মুখ করে বলে, সেটাও শক্ত কিছু নয়। চেষ্টা করলেই পারা যায়। আপনি যে বরুণ সরকার সেটা অহরহ তো আপনার মনের মধ্যে ভুরভুরি কাটছেই। সেই স্পন্দনটা ধরতে পারলেই হলো।

বরুণবাবু অবাক হয়ে বললেন, অ্যাঁ! স্পন্দন ধরতে পারলেই হলো! সেটাই কি খুব সহজ কাজ?

লোকটি হেসে বলল, চেষ্টা করলেই সহজ। অভ্যাসে কি না হয় বলুন।

আপনি কি থট-রিডার?

লোকটা ভ্রু কুঁচকে বলল, কথাটা মন্দ বলেননি। ওরকমই ধরে নিতে পারেন।

বরুণবাবু একটু আগ্রহের সঙ্গে বললেন, আচ্ছা, আমি এখন কি ভাবছি তা বলতে পারেন?

পারি। আপনি আমার সম্পর্কে ভাবছেন, হুঁ হুঁ বাবা তুমি একখানি আস্ত বুজরুক।

ও বাবা! আপনি তো সাঙ্ঘাতিক লোক দেখছি!

বললাম তো অভ্যাসে সব হয়। এইমাত্র আপনি ফুলকপির পোড়ের ভাজা আর সোনা মুগডালের কথা ভাবলেন....এইমাত্র ভাবলেন আপনার চলে-যাওয়া ছেলে ছোটকুর কথা...এইমাত্র ভাবলেন...

থাক থাক, আর বলতে হবে না। আপনার ঠিকানাটা একটু দিন তো। সময় করে আপনার সঙ্গে একদিন বসতে হবে। আপনি যখন এত জানেন তখন আপনার কাছ থেকে কিছু জেনে নিতে হবে। কোথায় থাকেন আপনি?

লোকটা মিটিমিটি হাসল, আমার ঠিকানা খুঁজে বের করা খুবই কঠিন। আমি অনেক দূরে থাকি। যদি যেতে চান তো আমিই নিয়ে যাবো আপনাকে।

কলকাতা শহরটা আমি টিউশানি করে করে হাতের তেলোর মতো চিনি। এই তো খিদিরপুর থেকে ফিরছি।

কলকাতা চিনলে তো হবে না। আমি যে অনেক দূরের লোক।

কত দূরের?

আপনাদের হিসেবে অন্তত আড়াই হাজার লাইট ইয়ার।

দূর মশাই, আপনি এবার গুল মারতে শুরু করেছেন। ঠিক আছে ঠিকানা না হয় না-ই বললেন, দেখা তো হতে পারে আমাদের।

লোকটি মাথা নেড়ে বলে, আমি এই সামনে ময়দানে নেমে যাবো। আর দেখা হওয়ার সুবিধে নেই।

ময়দানে নামবেন! সেখানে কি আছে?

সেই কথাই তো বলতে চাইছি। আপনার তো আর সংসার-টংসার ভাল লাগছে না, তাই না?

আজ্ঞে না।

বেঁচে থাকার আনন্দটাই আর তেমন টের পাচ্ছেন না!

না। কিন্তু—

দাঁড়ান। আমি সব জানি। আপনাকে তাই একটা প্রস্তাব দিচ্ছি। বেশ চটপট জবাব দেবেন।

আজ্ঞে সে আর বলতে!

ধরুন যদি আমি আপনার বয়স কমিয়ে দিই, যদি অমর করে দিই, শরীরটা যদি সুস্থ করে দিই, তাহলে কেমন হয়?

উঃ মশাই, এ তো স্বপ্নের কথা বলছেন!

স্বপ্ন নয়। সত্যি। আমরা ময়দানে পৌঁছে গেছি। শুভস্য শীঘ্রম্। নেমে পড়ুন।

বরুণবাবু একটু দ্বিধা করলেন। নামিয়ে ছিনতাই করবে না তো!

লোকটা বলল, আপনার পকেটে ছ'টাকা পঁচাত্তর পয়সা আছে। হাতঘড়িটা পুরোনো, ওটা বেচলে পঁচিশ টাকাও পাওয়া যাবে না। জীবন তার চেয়ে অনেক মূল্যবান। নেমে পড়ুন।

বরুণবাবু নেমে পড়লেন। লোকটা আজগুবি কথা বলছে বটে, কিন্তু একবার এই গুলবাজকে একটু বাজিয়েই দেখা যাক না।

ময়দানে বেশ ঘোর অন্ধকার। কুয়াশা চেপে পড়েছে। লোকটা একটা ফাঁকা জায়গায় এসে পকেট থেকে রিমোট কন্ট্রোলের মতো একখানা জিনিস বের করে বোতাম টিপতেই সামনে একখানা ডিমের মতো দেখতে মোটরগাড়ির মতো জিনিস দেখা গেল। একখানা অ্যাম্বাসাডার গাড়ির চেয়ে বেশী বড় নয়।

বরুণবাবু সভয়ে বললেন, এটা কি?

আমরা বলি মনোরথ। আলোর গতির চেয়ে মনের গতি অনেক বেশী। এক লহমায় কোটি কোটি লাইট ইয়ার পেরিয়ে যেতে পারে। আমাদের এ গাড়িও তাই।

বলেন কি মশাই! ইয়ার্কি মারছেন না তো!

ইয়ার্কি হলে না হয় কান মলে দেবেন। আসুন।

লোকটা কলকাঠি নেড়ে একটা দরজা খুলল। ভিতরে বিশেষ যন্ত্রপাতি দেখা গেল না। বসার জন্য বেশ আরামদায়ক গদি আছে। শীত বা গরম কিছুই লাগছে না।

বরুণবাবু, আপনার খিদে পায়নি তো?

আজ্ঞে না।

পেলেও একটু চেপে রাখুন। একেবারে পৌঁছে খাবারের ব্যবস্থা হবে।

বরুণবাবু দুশ্চিন্তায় একটু ঘামতে লাগলেন।

কোনও ঝাঁকুনি লাগল না, শব্দও হলো না। তবে শরীরটা হঠাৎ খুব হালকা লাগতে লাগল বরুণবাবুর। লোকটা মুখোমুখি বসে হাতের ছোট্ট যন্ত্রটা নিয়ে কি সব যেন করছে।

বরুণবাবু বাইরের দিকে চাইলেন। যা দেখলেন তাতে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠল। ঘোর অন্ধকার আকাশে বিশাল বড় বড় সব সূর্য দেখা যাচ্ছে, সাঁ সাঁ করে পেরিয়ে যাচ্ছে আশপাশ দিয়ে।

লোকটা একটু হেসে বলল, আমরা এক সেকেণ্ডেই পৌঁছে যেতে পারতাম। ইচ্ছে করেই একটু নীহারিকাটা পাক দিয়ে নিলাম। এসে গেছি।

শরীরটা আবার স্বাভাবিক লাগল বরুণবাবুর। লোকটা দরজা খুলে বলল, আমাদের গ্রহ আপনাকে স্বাগতম জানাচ্ছে বরুণবাবু। আসুন।

বরুণবাবু নামলেন। নেমেই টের পেলেন, পরিষ্কার বাতাসে তাঁর বুক ভরে গেল। অনেক তরতাজা লাগছে নিজেকে। চারদিকে চেয়ে দেখলেন, বাড়ি-ঘর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। রাস্তাঘাটও নয়। চারদিকে শুধুই নিবিড় জঙ্গল। আকাশে দু'দুটো চাঁদ, তার আলোয় চারদিকটা জ্যোৎস্নায় একেবারে ভেসে যাচ্ছে। বিশাল বড় বড় গাছ যেন মেঘ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের গায়ে মোটা মোটা লতা পাকিয়ে উঠেছে। সুন্দর ফুলের গন্ধে ম-ম করছে বাতাস।

বরুণবাবু বললেন, এ তো দেখছি শুধুই জঙ্গল!

লোকটা মাথা নেড়ে বলে, ওপরটা আমরা জঙ্গলের আবরণই রেখে দিয়েছি। তাতে আবহমণ্ডল সুস্থ থাকে। বন্যজন্তুরও অভাব নেই। আমরা থাকি ভূগর্ভে।

এখানে দেখছি শীত নেই!

না। শীত গ্রীষ্ম কিছুই নেই। সবসময়েই বসন্তকাল। তবে মাঝে মাঝে বৃষ্টি হয়।

এসব গাছপালা কি পৃথিবীর মতোই?

না। তবে তুলসী, নিম এরকম কিছু গাছ এখানেও পাবেন। আর সব অন্যরকম।

আচ্ছা, আমি তো পৃথিবী থেকে আসছি, আমার কোনও ইনফেকশানের ভয় নেই তো এখানে?

লোকটা হাসল, না। কারণ মনোরথের মধ্যেই আপনাকে সূক্ষ্ম রশ্মি দিয়ে সম্পূর্ণ জীবাণুমুক্ত করা হয়েছে। আর আমাদের এই গ্রহে কোনও ক্ষতিকারক জীবাণুই নেই। এখানে কারও কখনও কোনও অসুখ করে না।

কক্ষণো না?

না বরুণবাবু। আমরা সম্পূর্ণ রোগমুক্ত। আমাদের কোনও হাসপাতাল নেই। ওষুধ তৈরি হয় না।

বরুণবাবু উত্তেজিত হয়ে বলেন, কিন্তু হার্ট অ্যাটাক হলে?

তাও হয় না। আমার চল্লিশ হাজার তিন শো একানব্বই বছর বয়েসে কখনও কোনও অসুখ-বিসুখ হয়নি।

অ্যাঁ! কত বললেন?

চল্লিশ হাজার তিন শো একানব্বই বছর, আপনাদের হিসেবে। আমাদের এখানে অবশ্য এক বছর আপনাদের সাড়ে তিনশো বছরের সমান।

এই বলে লোকটা হাতের যন্ত্রটা টিপতেই পায়ের নিচে একটা আলোকিত সিঁড়ির মুখ খুলে গেল।

নিচে সারি সারি প্রকোষ্ঠ। লম্বা লম্বা হলঘর। করিডোর। চলন্ত সিঁড়ি। চলন্ত মেঝে। সব ঝকঝক তকতক করছে। কাচের আড়ালে দেখা যাচ্ছে অনেক মানুষ নানা ধরনের অদ্ভুত যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করছে।

আপনার নামটি কিন্তু আমাকে বলেননি স্যার।

আমার নাম ধৃতি। আসুন, এই ঘর।

ঘরটা একটা কাচের বর্তুলাকার চেম্বার। তাঁকে একখানা যন্ত্রের সামনে টুলের মতো জিনিসে বসিয়ে ধৃতি বলল, আপনার বয়সটা কমিয়ে দিচ্ছি। কত বছর বয়সে ফিরে যেতে চান?

বরুণবাবু ভয়ে ভয়ে বললেন, পঁচিশ।

ঠিক আছে। বলে ধৃতি একটা বোতাম টিপে তাড়াতাড়ি বাইরে গিয়ে চেম্বারের দরজাটা সেঁটে দিল।

কোনও শব্দ নেই, কম্পন নেই। অথচ বরুণবাবু টের পাচ্ছেন তাঁর শরীরের ভিতরে কি যেন একটা হয়ে যাচ্ছে। তিনি বদলে যাচ্ছেন। মাত্র কয়েক সেকেণ্ড পর তিনি বুঝতে পারলেন, প্রক্রিয়াটা থেমে গেছে। সামনে একটা ঘষা কাচের পর্দায় বাংলা অক্ষরে এই ক'টা কথা ফুটে উঠল, অভিনন্দন! আপনি এখন পঁচিশ বছরের যুবক।

বরুণবাবু যন্ত্রকেই জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, আবার যখন বুড়ো হবো তখন ফের বয়স কমানো যাবে কি?

পর্দায় ফুটে উঠল, আর কখনোই পঁচিশের বেশী বয়স হবে না আপনার। যেমন আছেন তেমনই চিরকাল থাকবেন।

চিরকাল বলতে ?

চিরকাল বলতে চিরকাল। ইটারনিটি।

উরেব্বাস। তাহলে কতদিন বাঁচবো ?

চিরকাল।

হার্ট অ্যাটাক, ব্লাড প্রেশার, স্ট্রোক এসব হবে না ?

কস্মিনকালেও নয়।

খুব রিচ খাবার খেলেও নয় ?

খাবার কেন খাবেন ?

খাবো না ?

না। আপনার আর কখনও খিদেই হবে না।

বলেন কি ?

খিদে হবে না, ঘুম পাবে না, ক্লান্তি আসবে না।

বটে ! তাই তো আমার খিদের ভাবটা আর টের পাচ্ছি না, না ?

কখনও পাবেন না।

তাহলে পুষ্টি হবে কি করে ?

শরীরের ক্ষয় না হলে পূরণেরই বা কি প্রয়োজন ?

আচ্ছা জলতেষ্টা পাবে তো ?

কেন পাবে ?

বাথরুমও তো পাবে, তখন শরীরের জল বেরিয়ে যাবে না ?

বাথরুমও পাবে না।

বড় বাইরে বা ছোটো বাইরে কোনওটাই নয় ?

না।

ব্যায়াম করার দরকার আছে কি ?

করতে পারেন, কিন্তু তাতে বিশেষ লাভ নেই।

আচ্ছা ধরুন কেউ যদি আমাকে গুলি করে, কি ছোরা মারে বা আমি যদি আগুনে পুড়ে যাই তাহলেও মরব না ?

না। আমাদের বায়োনিক ল্যাবরেটরির অটোমেটিক মেশিন আবার আপনার সব কিছু নতুন করে দেবে। আপনি কিছুতেই মারা যেতে পারবেন না এখানে।

ব্যথা তো লাগবে।

তাও লাগবে না। ব্যথার স্নায়ু এখানে আনন্দের তরঙ্গ তোলে, ব্যথার নয়।

ওরে বাবা ! এ তো সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড দেখছি !

কিছুই সাঙ্ঘাতিক নয়। খুব সোজা ব্যাপার।

আমি কিন্তু খুব ঘুম-কাতুরে মানুষ।

শুয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু ঘুমোনো অসম্ভব।

আর একটা কথা। পৃথিবীতে আমার বউ আর ছেলেপুলে, আত্মীয় আর বন্ধুবান্ধবেরা আছে, তাদের কথা তো আমার মনে পড়বে !

পড়বে। স্মৃতিঘর বলে একটা চেম্বার আছে। সেখানে গিয়ে আপনি ইচ্ছে করলে যে-কোনও স্মৃতিকে মুছে ফেলতে পারবেন। আবার যে-কোনও স্মৃতিকে জাগিয়েও তুলতে পারবেন। আপনার যা ইচ্ছা।

মন যদি খারাপ হয় ?

এখানে মন খারাপ হয় না। পাশেই আনন্দ-ঘর আছে। সেখানে গিয়ে আনন্দের মাত্রাটা একটু বাড়িয়ে নেবেন, তাহলেই হবে।

সবসময়ে আনন্দে থাকতে পারব ?

অবশ্যই।

এ সময়ে দরজা খুলে ধৃতি ঘরে ঢুকল। বলল, বাঃ, এই তো যুবক হয়ে গেছেন।

আচ্ছা, আমি যদি আর একটু সুপুরুষ হতে চাই ?

কোনও বাধা নেই। আসুন।

এরপর ধৃতি তাঁকে বিভিন্ন ঘরে নিয়ে গিয়ে সুপুরুষ করে দিল। আনন্দের মাত্রা বাড়িয়ে দিল। পৃথিবীর স্মৃতি খানিকটা আবছা করে দিল।

সব হয়ে যাওয়ার পর বরুণবাবু বললেন, এবার কি হবে ধৃতি ?

এখানে তো কিছুই হয় না।

একটা কাজ-টাজ কিছু দেবে না ?

কাজ অনেক আছে। সেগুলো সবই যন্ত্র-মানুষেরা করে। ইচ্ছে করলে আপনিও করতে পারেন।

কিন্তু আমি যে ইনজিনিয়ারিং জানি না।

চিন্তা নেই। বলে আর একটা ঘরে নিয়ে গিয়ে ইনজিনিয়ারিং মস্তিষ্ক চালু করা হলো বরুণবাবুর। তিনি দিব্যি কলকব্জার ব্যাপার বুঝতে শুরু করলেন।

যদি ডাক্তার হতে চাই ?

তাও পারেন।

কবি ?

তাও।

নাঃ, এ যে দেখছি সব পেয়েছির দেশ। এখানকার মানুষেরা তাহলে বেশ আরামেই আছে বলো ! তোফা আছে।

মানুষ ! এখানে মানুষও নেই।

ওই যে কত জনকে দেখছি। কাজ-টাজ করছে।

কেউ মানুষ নয়। সব যন্ত্রের তৈরি।

বরুণবাবু আঁতকে উঠে বললেন, বলো কি হে ! মানুষ কি তাহলে তুমি একা ! অ্যাঁ !

ধৃতি একটু হেসে বলে, তাও নই।

মানে ?

আমিও মানুষ নই বরুণবাবু। যন্ত্র মাত্র। এই গ্রহে বহু লক্ষ বছর কোনও মানুষ নেই। একসময়ে ছিল। তারা আমাদের হাতে এই গ্রহ ছেড়ে দিয়ে অন্যান্য গ্রহে, নীহারিকার ওপাশে অন্য নীহারিকায় চলে গেছে। পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য আমাদের একজন মানুষ বড় দরকার ছিল। তাই আপনাকে আনা।

অ্যাঁ !

ভয় পেলেন নাকি ?

হ্যাঁ, আমার যে ভয় হচ্ছে।

ওই একটা জিনিসকেই আমরা জানতে চাই। ভয়। মানুষের ভয়কে আমরা জয় করতে পারিনি। কেন পারিনি তা জানার জন্যই আপনাকে আনা।

বরুণবাবু হঠাৎ বিকট গলায় বললেন, তাহলে কি এই গ্রহে আমি একা একটা মানুষ !

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ওরে বাবা রে ! আমি কিছুতেই এখানে থাকব না...কিছুতেই না...ও ভাই ধৃতি, শীগগির আমাকে আমার নোংরা পৃথিবীতেই দিয়ে এসো। রোগ-ভোগ বয়স মৃত্যু ওসব নিয়েই আমি থাকতে চাই...ও ভাই ধৃতি, তোমার পায়ে পড়ি...

এসপ্লানেড আ গয়া বাবু। উঠিয়ে।

পটাং করে চোখ মেললেন বরুণবাবু। ট্রাম এসপ্লানেডে এসে গেছে। চোখ কচলে তিনি চারদিকে চাইলেন। যা দেখছেন তা অতি সত্য। এ কলকাতাই বটে। তিনি পৃথিবীতেই আছেন।

মস্ত একটা স্বস্তির শ্বাস ছাড়লেন তিনি। নেমে পড়লেন। মনটায় বড় আনন্দ হচ্ছে।

শ্যামবাজারমুখো একখানা বাসে উঠে দেখলেন, বেশ লোকজন আছে। প্রথম যার সঙ্গে দেখা হলো তাকেই আনন্দের চোটে বললেন, খুব বাঁচা বেঁচে গেছি মশাই !

লোকটা কিছু বুঝতে না পেরে হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

**ছবি : বিজন কর্মকার**

# জোড়া গোয়েন্দা

## প্রফুল্ল রায়

স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফিরে দোতলার ড্রইংরুমে বসে রেডিও থেকে হেমন্ত মুখার্জির গাওয়া একখানা রবীন্দ্রসঙ্গীত টেপ করে নিচ্ছিল বিনু। রবীন্দ্রনাথের গান তার দারুণ প্রিয়। আর সেই গান যদি হেমন্তর গলায় শোনা যায় তো কথাই নেই।

বিনুর ছোটকাকা আমেরিকায় থাকেন। ফি বছর দু'মাসের ছুটিতে কলকাতায় আসেন। কোনোবার বিনুর জন্য আনেন ক্যামেরা, কোনোবার ইলেকট্রনিক ঘড়ি লাগানো ফাউন্টেন পেন, কোনোবার বা দামি জিনসের প্যান্ট আর শার্ট। দেড় মাস আগে এবার যখন এসেছিলেন, বিনুকে চমৎকার একটা টেপ রেকর্ডার দিয়ে গেছেন। ছোট, চৌকো, চ্যাপ্টামতো রেকর্ডারটা ন'ইঞ্চি লম্বা আর দু'ইঞ্চি চওড়া। অনেকটা বাচ্চাদের টিফিন বক্সের মতো দেখতে। ছোট হলে কি হবে, ভীষণ পাওয়ারফুল। পঁচিশ-তিরিশ ফিট দূরের যে কোনো শব্দ হুবহু ধরে নিতে পারে।

বিনু পড়াশোনায় বেশ ভাল। একটা নাম-করা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে সে ক্লাস সেভেনে পড়ে। পড়াশোনা আর গান ছাড়াও নানা ব্যাপারে তার দারুণ উৎসাহ। বিশেষ করে ডিটেকটিভ গল্প পেলে সে প্রায় নাওয়া-খাওয়া ভুলে যায়। শার্লক হোমস থেকে আরম্ভ করে ব্যোমকেশ, কিরীটী আর ফেলুদার সমস্ত কীর্তিকলাপ তার মুখস্থ। ইদানীং আগাথা ক্রিস্টির উপন্যাসগুলোও সে গোগ্রাসে গিলতে শুরু করেছে। অবশ্য এই ব্যাপারটায় তার একটি জুড়িদার আছে। সে হলো রাজা—বিনুর সঙ্গে এক স্কুলে, এক ক্লাসে এবং এক সেকশানে পড়ে। রাজাও গোয়েন্দা গল্পের একটি পোকা।

ডিটেকটিভ গল্প পড়ে পড়ে দুই বন্ধুর মাথায় ঢুকে গেছে যে তারাও শার্লক হোমস কি হারকুল পয়রোর মতো যে কোনো খুনী কি ডাকাতকে তিন দিনে তুড়ি মেরে ধরে ফেলতে পারে। কিন্তু বড়ই আফশোসের ব্যাপার, এখন পর্যন্ত ব্যাঙ্ক রবারি বা হত্যা রহস্যের জট ছাড়িয়ে দিতে কেউ তাদের কাছে আসেনি। তবে দু'জনেই তক্কে তক্কে আছে, কোনো একটা কেস টেস পেলে লালবাজারকে দেখিয়ে দেবে, গোয়েন্দাগিরি কাকে বলে।

তেমন একটা কেস যে দুম করে আজই হাতে এসে পড়বে আর তাদের গোয়েন্দাগিরির হাতেখড়িটা হয়ে যাবে, কে ভাবতে পেরেছিল!

হেমন্তর গানটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, হঠাৎ দক্ষিণ দিকের একটা ঘর থেকে মায়ের চেঁচামেচি শোনা যায়। মা এমনিতে খুব ঠাণ্ডা, ভালমানুষ। কোনোদিন গলা চড়িয়ে কথা বলেন না। কি এমন হয়েছে, যে তিনি এত রেগে গেলেন! বিনু হকচকিয়ে যায়, টেপটা বন্ধ করে উঠে পড়ে।

বিনুর ঠাকুরদা অমরনাথ সেন সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের বড় অফিসার ছিলেন, বছর তিনেক হলো রিটায়ার করেছেন, ঠাকুমা নিরুপমা সেন একটা কলেজে ফিজিক্স পড়ান। তার মা-বাবার নাম সুচরিতা আর চারুব্রত। বাবা হাইকোর্টের বড় অ্যাডভোকেট, মা মেয়েদের একটা কলেজের ফিলজফির লেকচারার।

কাজের লোক সবসুদ্ধ তিনজন। সীতা, লক্ষ্মণ আর সহদেব। সীতা আর লক্ষ্মণ বছর পনেরর বেশি বিনুদের বাড়িতে আছে। সহদেব নতুন, মাস দুই হলো কাজে লেগেছে। সীতা আর লক্ষ্মণ সারাদিন কাজের পর রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে একতলায় বাবার চেম্বারে গিয়ে শোয়। সীতার শোবার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে দোতলাতেই, ডাইনিং রুমের একধারে।

টেপ রেকর্ডারটা বসার ঘরে ফেলে রেখে এক দৌড়ে মায়ের ঘরে চলে আসে বিনু। মা সমানে কাঁদছেন আর বলে যাচ্ছেন, 'আমার সর্বনাশ হয়ে গেল। এখন আমি কি করি!'

মায়ের চেঁচামেচি শুনে ঠাকুমা ঠাকুরদাও বিনুর মতো মা-বাবার ঘরে ছুটে এসেছেন। ঠাকুমা কলেজ থেকে সাতদিন ছুটি নিয়েছেন। তিনি বাড়িতেই ছিলেন। আর ঠাকুরদার দু'পায়ে বাতের যন্ত্রণা, তিনি পারতপক্ষে বাড়ি থেকে বেরোন না। মা অবশ্য কলেজে গিয়েছিলেন।

লক্ষ্মণ, সীতা আর সহদেবও হাতের কাজ ফেলে চলে এসেছে। তারা অবশ্য ঘরে ঢোকেনি। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

ঠাকুমা, বিনু আর দাদু একসঙ্গে প্রশ্ন করে যান, 'কি হয়েছে? কাঁদছ কেন?'

মা একেবারে ভেঙে পড়েন। কাঁপা, জড়ানো গলায় যা বলেন, তা এইরকম। কাল তাঁর এক সহকর্মীর মেয়ের বিয়ে। বিয়েবাড়িতে যাবার জন্য আজ কলেজে যাবার পথে ব্যাঙ্কের লকার থেকে হার আর চুড়ি-টুড়ি বার করে নিয়েছিলেন। তারপর কলেজে গিয়ে ক্লাস-টাস নিয়ে খানিকক্ষণ আগে বাড়ি ফিরেছেন। গয়নাগুলো ছিল তাঁর ব্যাগে। ব্যাগটা বিছানায় রেখে তিনি গিয়েছিলেন অ্যাটাচড্ বাথরুমে। ফিরে এসে দেখেন, ব্যাগটা পড়ে আছে কিন্তু গয়নাগুলো নেই।

ঠাকুরদা ভীষণ অস্থির মানুষ। বলেন, 'কেউ নিশ্চয়ই চুরি করেছে। দাঁড়াও, এক্ষুণি পরমেশকে ফোন করছি।' বলেই লম্বা লম্বা পা ফেলে চলে যান।

পরমেশ বড়াল বিনুদের এলাকার থানার ও.সি. তার বাবার দারুণ বন্ধু। বিনু তাঁকে বলে পরমেশকাকু। সে আর রাজা যে দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা হবার জন্য তৈরি হচ্ছে, সে খবরটা রাখেন তিনি। এই নিয়ে একটু-আধটু মজাও করেন।

এ বাড়িতে আগে কখনও চুরি হয়নি। চুরিটা করবেই বা কে? সীতা আর লক্ষ্মণ তো খুবই বিশ্বাসী। তার জন্মের আগে থেকে রয়েছে। সহদেব যদিও নতুন এসেছে কিন্তু বুদ্ধিসুদ্ধি খুব একটা আছে বলে মনে হয় না। কিছু বললে গরুর মতো তাকিয়ে থাকে। বাড়ি থেকে বড় একটা বেরোয়ও না।

দাদু ফোন করে ফিরে আসেন। বলেন, 'পরমেশ এক্ষুণি আসছে। নন্টুকেও ফোন করেছি। ও যত তাড়াতাড়ি পারে ফিরে আসবে।' নন্টু বিনুর বাবার ডাক নাম।

চারিদিকে চোখ বুলোতে বুলোতে হঠাৎ রাজার কথা মনে পড়ে যায় বিনুর। রাজাকে গয়না চুরির খবরটা দিতে হবে। ফোন তলে

ডাকলে একবারেই রাজাকে পাওয়া যায়। তাকে সমস্ত ঘটনাটা জানিয়ে বিনু বলে, 'এই সঙ্কট ছাড়া ঠিক হবে না। চোরকে আমাদের ধরতেই হবে। তুই কি বলিস?'

রাজা বলে, 'নিশ্চয়ই।'

বিনু বলে, 'তা হলে সুরমা মাসিকে বলে এক্ষুণি চলে আয় তুই।' সুরমা রাজার মা।

রাজা বলে, 'না রে, আজ যেতে পারব না। মা আজ দাঁত তোলাতে যাবে। মায়ের সঙ্গে ডাক্তারের কাছে যেতে হবে।'

একটু ভেবে বিনু বলে, 'তা হলে—তা হলে—কাল শনিবার, আমাদের ছুটি আছে। চলে আসবি, সারাদিন থাকবি। চোর ধরার একটা প্ল্যান করতে হবে।'

'কাল তো তোদের বাড়ি যাবার কথাই আছে। আমি সকালেই যাচ্ছি।'

বিনুর মনে পড়ে যায়, প্রতি শনিবার রাজা তাদের বাড়ি আসে। বাড়ির পেছন দিকে রেললাইনের ধারে যে টানা বিরাট বস্তিটা রয়েছে সেখানে গরীব ছেলেদের পড়ানোর জন্য একটা ফ্রি প্রাইমারি স্কুল বসানো হয়েছে। সেখানে নানা স্কুলের ছেলেরা পালা করে পড়িয়ে আসে। বিনু আর রাজা শনিবার ক্লাস নিতে যায়।

ঘণ্টা খানেক বাদে পরমেশকাকু জিপে করে দুই কনস্টেবল সুদ্ধু এসে হাজির। প্রথমে সারা বাড়ি ঘুরে ঘুরে দেখেন, প্রতিটি ঘরে তল্লাশি চালান, তারপর দাদু ঠাকুমা মায়ের সঙ্গে কথা বলে, কাজের লোকেদের জেরা করে, ফিরে যাবার মুখে বিনুকে বলেন, কী ব্যাপার শার্লক হোমস সাহেব, বাড়িতে এত বড় একটা কাণ্ড হয়ে গেল, মায়ের গয়নাগুলো উদ্ধার করতে তো হবে।'

বিনু বলে, 'তা তো হবেই।'

পরমেশ চলে যাবার পর খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে বিনু। ভাবে কাল সকালে রাজা আসবে। তার সঙ্গে পরামর্শ করে আসল কাজে নামতে নামতে অনেকটা দামী সময় নষ্ট হয়ে যাবে। তার ভেতর চোর বা চোরের দল এমন কিছু করে বসবে যাতে ইমপর্টান্ট সব ক্লু হাতছাড়া হয়ে যাবার সম্ভাবনা। তাই খানিকটা কাজ আজই এগিয়ে রাখা ভাল। এখন কী করতে হবে, মনে মনে ঠিক করে নিয়ে সোজা মায়ের ঘরে চলে আসে সে।

মা হাঁটুতে মুখ রেখে বিছানায় বসে আছেন।

বিনু আস্তে আস্তে মায়ের পাশে গিয়ে বসে। খানিকক্ষণ তাঁকে লক্ষ্য করে। তারপর বলে, 'আচ্ছা মা—'

মা যেমন ছিলেন তেমনি বসে থাকেন। বিনুর দিকে না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করেন, 'কী বলছিস?

'একটা জিনিস খুব ভাল করে মনে করতে চেষ্টা কর। ভুল করে গয়নাগুলো অন্য কোথাও রেখে দাও নি?'

'কোথায় রাখব?'

'সেটাই তো মনে করতে বলছি।'

'না না, সব ব্যাগেই ছিল।'

একটু চিন্তা করে বিনু এবার জিজ্ঞেস করে, 'ঠিক আছে, ওগুলো ব্যাগে রেখেই তুমি বাথরুমে ঢুকেছিলে। যখন বাথরুমে ছিলে, এ ঘরে কেউ এসেছিল?'

মা বলেন, 'কী করে বলব? বাথরুমের দরজা বন্ধ। কেউ এলে কি দেখা যায়?'

'পায়ের শব্দ-টব্দ শুনতে পাওনি?'

'বাথরুমে কল খুলে দিয়েছিলাম। কিছুই শোনা যায়নি।'

'ঠিক আছে।'

পরের দিন সকালে রাজা আসতেই দু'জনে কনফারেন্সে বসে গেল। গয়না চুরির ব্যাপারে খুঁটিনাটি সব দিক নিয়ে তারা আলোচনা করল। তারপর বিনু জিজ্ঞেস করে, 'তোর কী মনে হয়?'

রাজাও দেখা গেল তার সঙ্গে একমত, বাইরের কেউ এসে চুরিটা করেনি। সে বলে, 'বাড়ির কাজের লোকেদের ওপর নজর রাখতে হবে।'

বিনু জানায় লক্ষ্মণ আর সীতা অনেকদিন এ বাড়িতে আছে, ভীষণ বিশ্বাসী, আর সহদেবটা এক নম্বরের গবেট। এদের দিয়ে আর যাই হোক, চুরিটা হওয়া সম্ভব নয়।

কিন্তু রাজা কোনো কথাই শুনল না। সে বলল, 'কখন কার মাথায় লোভ চাগিয়ে উঠবে এবং তার ফলে কী করে বসবে, তা বলা যায় না। অনেক ভালমানুষও হাতের কাছে হঠাৎ প্রচুর টাকাপয়সা দেখলে মাথার ঠিক রাখতে পারে না।'

তাই ঠিক হলো, তিনটি কাজের লোকের ওপর নজর রাখতে হবে। কনফারেন্সের পর বিনু আর রাজা বাড়িময় ঘুরে ঘুরে খুব সতর্কভাবে ওদের হাবভাব লক্ষ্য করতে লাগল। কিন্তু অস্বাভাবিক কিছুই বোঝা গেল না।

পাঁচটা বাজলে লুচি তরকারি সন্দেশ খেয়ে বিনু আর রাজা রেললাইনের ধারের বস্তিতে পড়াতে চলে গেল। সেখানে আড়াই ঘণ্টা পড়াবার পর স্কুল ছুটি হলে রাজা আর বিনু যখন বেরিয়ে আসছে সেই সময় পেছন থেকে তাদের ডাকতে ডাকতে দৌড়ে আসে কার্তিক। বিনুরা দাঁড়িয়ে পড়ে।

এই বস্তির পড়ুয়াদের ভেতর সবচেয়ে চৌকস হলো কার্তিক। দারুণ চালাক চতুর, লেখাপড়াতেও বেশ ভাল।

সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছিল। রাস্তার আলোগুলো জ্বলে উঠেছে। সেই আলোয় দেখা গেল, কার্তিকের চোখেমুখে চাপা উত্তেজনা।

বিনু জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে কার্তিক? ডাকলে কেন?'

চারিদিকে বস্তির প্রচুর লোকজন। কার্তিক বিনুদের সঙ্গে করে একটু ফাঁকামতো জায়গায় নিয়ে যায়। নিচু গলায় বলে, 'বিনুদা, শুনলাম তোমাদের বাড়িতে চুরি হয়েছে।'

বিনু বলে, 'হ্যাঁ।'

এদিক সেদিক তাকিয়ে ফিসফিস করে কার্তিক এবার বলে, 'একটা খবর দিচ্ছি, কাউকে বলবে না।'

'না না, তুমি বল।'

'আমাদের এই বস্তিটা আগে ভাল ছিল। এখন অন্য জায়গা থেকে তাড়া খেয়ে নানারকম খুনী ডাকাত আর বদমাইসেরা এখানে এসে লুকিয়ে আছে।'

এই খবরটা আগেই কার কাছে যেন শুনেছিল বিনু। সে স্থির চোখে কার্তিকের দিকে তাকিয়ে থাকে।

কার্তিক থামেনি, 'মোহন সিং নামে একটা লোক ক'মাস ধরে এখানে আছে। শুনেছি, তিনটে খুন করেছে সে। আর—' বলতে বলতে হঠাৎ থেমে যায় সে।

বিনু কী বলতে যাচ্ছিল, ঠোঁটে আঙুল ঠেকিয়ে ইশারায় চুপ করে থাকতে বলে কার্তিক। একটা অদ্ভুত চেহারার ঢ্যাঙা লোক, গাল পর্যন্ত জুলপি, লম্বা মুখ, পরনে চোঙা প্যান্ট আর শার্ট, পায়ে চটি পরে বিনুদের পাশ দিয়ে বস্তির ভেতর চলে যায়।

কার্তিক বলে, 'জানো বিনুদা রাজাদা, এই লোকটা কাল থেকে আমাদের বস্তিতে ঘোরাঘুরি করছে। মনে হয়, ব্যাটার খারাপ কোনো মতলব রয়েছে।'

রাজা আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে, 'হুঁ—'

বিনু আসল ব্যাপারটা ভোলেনি। সে কার্তিককে বলে, 'মোহন সিংয়ের কথা কী যেন বলছিলে?'

কার্তিক বলে, 'ও হ্যাঁ, তোমাদের বাড়িতে নতুন যে কাজের লোকটা এসেছে, তার নাম যেন কী?'

বিনু বলে, 'সহদেব। কেন বল তো?'

কার্তিক বলে, 'ঐ লোকটা মাঝে মাঝে মোহন সিংয়ের কাছে আসে। পাঁচ দশ মিনিটের বেশি থাকে না। ও এলেই মোহন সিং দরজা বন্ধ করে দেয়।'

বিনু আর রাজা চমকে ওঠে। রাজা বলে, 'হাইলি সাসপিসাস।'

বিনু জিজ্ঞেস করে, 'এর মধ্যে সহদেব এসেছিল?'

কার্তিক জানায়, 'আমি দেখিনি।'

বিনু বলে, 'একটু লক্ষ্য রেখো। বস্তিতে আবার ওকে দেখলেই আমাকে খবর দেবে।'

'আচ্ছা।'

'আমরা এখন চলি।'

বাড়ির দিকে ফিরতে ফিরতে বিনু বলে, 'কার্তিক যা বলল, এ তো আমি ভাবতেই পারি না। দেখে তো মনে হয় সহদেবটা রাম ইডিয়ট। মোহন সিংয়ের মতো একটা মার্ডারের কাছে ওর কী দরকার?'

রাজা বলে, 'সেটাই আমাদের খুঁজে বার করতে হবে।'

বিনু বলে, 'সারাদিনই তো লোকটা বাড়িতে থাকে। রাত্তিরে লক্ষ্মণদার সঙ্গে নিচে বাবার চেম্বারে শুতে নামে। এর মধ্যে বস্তিতে যায় কী করে?'

'আমার কী মনে হয় জানিস?'

'কী?'

'কার্তিককে জিজ্ঞেস করলে জানা যাবে, ডেফিনিটলি সহদেব রাত্তিরে যায়। লক্ষ্মণদা ঘুমিয়ে পড়লে চুপচাপ বেরিয়ে পড়ে।'

বিনু আস্তে মাথা নাড়ে,'দিস ইজ পসিবল।'

রাত্তিরে খাওয়াদাওয়ার পর দুই বন্ধু একই বিছানায় পাশাপাশি শুয়ে প্ল্যান করতে থাকে। কার্তিকের কাছে যে খবরটা পাওয়া গেছে তাতে সহদেব যে মায়ের গয়নাচুরির সঙ্গে জড়িত, এতে কোনো সন্দেহ নেই বিনুর। রাজারও তা-ই ধারণা। কিন্তু মুখে বললেই তো হবে না যে সহদেব চোর। সাক্ষ্যপ্রমাণ চাই। এর জন্য ফাঁদ পাততে হবে।

নানা দিক থেকে আলোচনা করে শেষ পর্যন্ত মাঝ রাতে ওরা নিখুঁত একটি পরিকল্পনা ছকে ফেলে। তখনই শক্ত ব্রাউন পেপারের ভেতর কিছু পুরে একটা ছোট্ট প্যাকেট বানিয়ে রেখে দেয়। সব যদি প্ল্যান অনুযায়ী চলে, চোর বাছাধনকে তাদের ফাঁদে পড়তেই হবে। খুব খুশি হয়ে দুই বন্ধু এবার ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ-টুখ ধুয়ে, ব্রেকফাস্ট সেরে সেই প্যাকেটটা নিয়ে বিনু আর রাজা সোজা বস্তিতে চলে আসে। কার্তিককে রেললাইনের ওধারে একটা নির্জন জায়গায় ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে, 'তোমাকে একটা কাজ করতে হবে ভাই। কেউ যেন টের না পায়।'

কার্তিক বলে, 'কেউ পাবে না। তোমরা শুধু বল কী করতে হবে।'

'তার আগে একটা কথা জানতে চাই।'

'কী?'

'মোহন সিং কি সারা দিনরাতই ঘরে থাকে? একবারও বেরোয় না?'

'একবার মোটে বেরোয়। তবে কখন বেরুবে, ঠিক নেই।'

সেই প্যাকেটটা এবার কার্তিকের হাতে দিয়ে বিনু বলে, 'এটা লুকিয়ে যে কোনো ভাবে মোহন সিংয়ের ঘরের ভেতর এমন জায়গায় রাখতে হবে, যাতে লোকটা টের না পায়। পারবে?'

ঠোঁট কামড়ে, কপাল কুঁচকে কিছুক্ষণ ভেবে নেয় কার্তিক। তারপর বলে, 'পারব।'

'কী করে?'

'আমাদের এখানে সবই ভাঙাচোরা টিনের চালের নিচু নিচু ঘর। মোহন সিংয়ের ঘরটার ওপর দিয়ে জামরুল গাছের মোটা ডাল চলে গেছে। ডালটায় উঠে চালের ফাঁক দিয়ে তোমাদের জিনিসটা ঢুকিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখব।'

'গাছের ডালে উঠলে বস্তির লোকেরা তো দেখে ফেলবে।'

'মোহন সিংয়ের ঘরটা যেদিকে, সেখানে লোকজন খুব একটা যায় না। সন্ধ্যের পর লুকিয়ে লুকিয়ে ঠিক কাজ সেরে ফেলব। তোমরা ভেবো না। আর কী করতে হবে?'

'নজর রাখবে সহদেব কবে, কখন যায়। ও মোহন সিংয়ের সঙ্গে দেখা করে চলে যাবার পর প্যাকেটটা নামিয়ে আমাকে দিয়ে আসবে। অন্য কাউকে দেবে না। মনে থাকবে?'

'নিশ্চয়ই।'

দেখতে দেখতে তিনটে দিন কেটে যায়। এর মধ্যে রোজই কার্তিক এসে খবর দিয়ে গেছে, সহদেব আর বস্তিতে যায়নি। বিনু একটু হতাশই হয়।

এদিকে মায়ের গয়না চুরির পর থেকে পরমেশ রোজই একবার করে তাদের বাড়ি আসছেন। মা বাবা দাদু ঠাকুমার সঙ্গে কথা বলার পর বিনুকে জিজ্ঞেস করেন, 'তারপর শার্লক হোমস সাহেব, হারকুল পয়রো আর তোমার ইনভেস্টিগেসন কিরকম এগুচ্ছে?'

পরমেশকাকু যেন রোজই একবার করে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছেন। এখন পর্যন্ত কাজের কাজ কিছুই হয়নি, তবু বিনু দমে যায় না। বলে, আপনারা কতদূর এগুলেন?'

কৌতুকে ভুরু নাচিয়ে পরমেশকাকু বলেন, 'দু চার দিনের ভেতর সমস্যার সমাধান করে ফেলব।'

একটু চমকে ওঠে বিনু। বলে, 'আমরাও চেষ্টা করছি। মনে হয়, ঐ টাইমের মধ্যে আমরাও সলভ করতে পারব।'

'বেস্ট অফ লাক। দেখা যাক, কারা আগে পারে।'

চতুর্থ দিন সকালে, সবে ব্রেকফাস্ট শেষ হয়েছে বিনুর, কার্তিক এসে হাজির। আড়ালে তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে সেই ব্রাউন পেপারের প্যাকেটখানা ফেরত দিতে দিতে সে বলে, 'কাল রাত্তিরে তোমাদের সহদেব মোহন সিংয়ের কাছে গিয়েছিল।'

কার্তিকের পিঠে একখানা হাত রেখে বিনু বলে, 'তুমি যে কী হেল্প করেছ, বলে বোঝাতে পারব না। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। এখন বাড়ি যাও, পরে তোমাকে খবর দেবো।'

কার্তিক চলে যাবার পর প্যাকেটটা নিয়ে সে নিজের ঘরে চলে যায়। কিছুক্ষণ পর তার উল্লাসিত চিৎকার শোনা যায়, 'হুর-রে-এ—'

এত জোরে বিনু চেঁচিয়েছে যে মা বাবা দাদু ঠাকুমা দৌড়ে আসেন। বলেন, 'কী হয়েছে রে বিনু?'

বিনু চটপট প্যাকেটটা বইয়ের আলমারিতে ঢুকিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। বলে, 'দারুণ একটা ব্যাপার।' বলে দৌড়ে ড্রইংরুমে গিয়ে প্রথমে রাজাকে ফোন করে বলে, 'কার্তিক সেটা দিয়ে গেছে। আমরা যা ভেবেছিলাম তাই। সব প্রমাণ পেয়ে গেছি। সুরমা মাসিকে বলবি, বিকেলে স্কুল ছুটির পর আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ি আসবি।'

রাজা বলে, 'ও কে। দারুণ থ্রিলিং লাগছে।'

রাজার পর থানায় পরমেশকে ফোন করে বিনু বলে, 'রহস্যটা কিন্তু আপনাদের আগেই আমরা ভেদ করে ফেলেছি কাকু।'

'কী আশ্চর্য, তোমাকে ফোন করে এই খবরটাই তো দিতে যাচ্ছিলাম।' পরমেশ বলেন, 'আমরাও মিস্ট্রিটা সলভ্ করে ফেলেছি।'

'কবে?'

'আজই। চোরেদের ধরাটাই যা বাকি।'

'আমরাও তো আজই করেছি।'

'স্ট্রেঞ্জ।' বলে একটু থামেন পরমেশ, তারপর ফের শুরু করেন, 'তোমাদের বাড়িতে আমি বিকেলে যাচ্ছি। তখন দেখা যাবে কারা কিভাবে সমস্যার সমাধান করেছে। মা বাবা দাদু ঠাকুমাকে বলে রেখো, আমার সঙ্গে ছ' সাত জন থাকবে। ভাল চাইনীজ ডিশের ব্যবস্থা করতে বলো।'

'বলব।'

বিকেল পাঁচটা নাগাদ বিনুদের দোতলার ড্রইংরুমে জমজমাট আসর বসে গেল। ভেতরে দাদু ঠাকুমা মা বাবা বিনু রাজা এবং কার্তিক রয়েছে। সীতা, সহদেব এবং লক্ষ্মণকেও থাকতে বলা হয়েছিল, তারা একধারে বসে আছে। তাদের ভীষণ চিন্তিত দেখাচ্ছে। মনে হয় খুব ভয় পেয়েছে। ঘন ঘন ঘাম মুছছে

তারা। আর আছেন পরমেশকাকু। তাঁর সঙ্গে ছ'জন আর্মড কনস্টেবল এসেছিল। তারা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। এ ছাড়া বাবার দু-তিনজন বন্ধু আর বিনুদের পাড়ার কয়েকজন বয়স্ক ভদ্রলোকও এসেছেন।

পরমেশ একটা সোফায় বসে ছিলেন। উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, 'আপনারা যাঁরা উপস্থিত আছেন, শুনে সুখী হবেন, বৌদি মানে শ্রীমতী সুচরিতা সেনের দামী গয়না কারা চুরি করেছে আমরা জানতে পেরেছি। তাদের আজই অ্যারেস্ট করা হবে। আর গয়নাগুলো উদ্ধারেরও ব্যবস্থা করা হয়েছে।' একটু থেমে ঘরের প্রতিটি মানুষের মুখের দিকে চোখ বুলোতে বুলোতে ফের বলতে থাকেন, 'এই প্রসঙ্গে আরো একটা খবর আপনাদের দিতে চাই। পুলিশের তরফ থেকে আমি আর আমার সহকর্মীরা চুরির কেসটায় তদন্ত চালাচ্ছিলাম। পাশাপাশি, একেবারে আলাদাভাবে আমার দুই তরুণ বন্ধু শ্রীমান বিনু এবং শ্রীমান রাজাও ইনভেস্টিগেশন চালিয়ে যাচ্ছিল। ওরা দাবি করছে, চুরি রহস্যের সমাধান ওরাও করে ফেলেছে। এখন আমি কাউকে না দেখিয়ে গোপনে একটুকরো কাগজে চোরেদের নাম লিখে মেসোমশায় অর্থাৎ শ্রীযুক্ত অমরনাথ সেনের হাতে দেবো। শ্রীমান বিনু বা রাজাও ঠিক একই ভাবে নাম লিখে মেসোমশায়কে দেবে। মেসোমশায় মিলিয়ে দেখবেন, আমরা একই নাম লিখেছি কিনা।' বলে একটু দূরে গিয়ে কাগজে কিছু লিখে এনে ভাঁজ করে দাদুর হাতে দেন। বিনুরাও তাই করে।

পরমেশ এবার দাদুকে বলেন, 'নামগুলো দেখুন কিন্তু এখন কাউকে বলবেন না। যদি মিলে যায় মাথা নেড়ে জানিয়ে শুধু দেবেন।'

দাদু ভাঁজ-করা কাগজ দুটো খুলে মাথা নাড়েন—মিলেছে।

পরমেশ এগিয়ে গিয়ে বিনু আর রাজাকে জড়িয়ে ধরে বলেন, 'কনগ্রাচুলেসনস। কিন্তু কিভাবে ধরলে বল তো?'

বিনু বলে, 'আগে আপনার প্রসেসটা বলুন, তারপর আমাদেরটা শুনবেন।'

পরমেশ বলেন, 'ঠিক হ্যায়।' বলে একজন কনস্টেবলকে হুকুম দেন, 'পান্নালালকে ডেকে আনো।'

একটু পরেই যে লোকটা ড্রইং রুমে এসে ঢোকে তাকে দেখে চমকে ওঠে রাজা আর বিনু। সেই অচেনা ঢ্যাঙা লোকটা, যে কিনা ক'দিন ধরে সন্দেহজনকভাবে বস্তিতে ঘোরাফেরা করছিল। একে চোর চোট্টা খুনে ডাকাত, কত কীই না ভেবেছে বিনুরা।

পরমেশ বলেন, 'এই পান্নালাল হলো আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্টের একটি রত্ন। বৌদির গয়না চুরি হবার পর একে লাগিয়ে দিয়েছিলাম। চারিদিকে ঘুরে ঘুরে পান্নালাল আসল অপরাধীদের খোঁজ পায়। তারপর তাদের ওপর দিন রাত নজর রাখা হয়। জাল ফেলে রেখেছি, আজই মহাপুরুষদের মাছের মতো টেনে তোলা হবে।' বিনুদের দিকে তাকিয়ে বলেন, 'এবার তোমাদের প্রসেসটা বল।'

বিনু আর রাজা কার্তিককে ধরে এনে সবার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। বিনু সেই ব্রাউন রঙের প্যাকেটটা আগেই নিয়ে এসেছিল। সেটার ভেতর থেকে ছোটকাকার দেওয়া পাওয়ারফুল টেপ রেকর্ডারটা বার করে বলে, 'আমাদের বন্ধু কার্তিকের হেল্প নিয়ে আর এই টেপটা কাজে লাগিয়ে চোরেদের খোঁজ পাই।' বলে কিভাবে মোহন সিংয়ের ঘরে কার্তিককে দিয়ে টেপ রেকর্ডারটা রেখে প্রমাণ যোগাড় করেছে, জানিয়ে দিতে দিতে বোতাম টিপে ওটা চালিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে দু'জনের কথাবার্তা শোনা যেতে থাকে।

প্রথম জন, 'ঘাবড়াও মাত সহদেব। মোহন সিং তোমাকে সাহারা (আশ্রয়) দিয়েছে। ঠিক যেমন বোকা বুদ্ধু সেজে আছ, ঐরকমই থাকবে। কেউ সন্দেহ করবে না।'

দ্বিতীয় জন, 'মোহন সিংজি, রোজ পুলিশ আসছে। ওদের বাড়ির ছেলে বিনু এই বস্তিতে পড়াতে আসে। যদি টের পায় গয়নাগুলো এখানে তোমার কাছে আছে—'

প্রথম জন, 'আমি কি গরু না বকরী যে ঐ চোরাই মাল নিজের কাছে রেখে দেবো! ওগুলো পার্ক সার্কাসে সেলিমের কাছে পাচার করে দিয়েছি। ঘাবড়াও মাত। যে পাড়ায় আছ সেখানে অনেক পয়সাওয়ালা লোক থাকে। তাদের বাড়ি গিয়ে টাকা, সোনা, জহরতের খবর নেবে....'

টেপ থামিয়ে দিয়ে বিনু পরমেশের দিকে তাকিয়ে বলে, 'বুঝতে পারলেন কাকু?'

পরমেশ প্রচণ্ড তারিফের গলায় বলেন, 'ফাইন ফাইন। একেবারে সায়েন্টিফিক পদ্ধতিতে তদন্ত চালিয়েছ! কোর্টে যখন কেসটা উঠবে ঐ টেপটা এভিডেন্স হিসেবে দারুণ কাজে লাগবে। সাবাস।'

এই সময় একটা কাণ্ড ঘটে যায়। টেপটা যখন চলছিল সবার চোখ গিয়ে পড়েছিল সহদেবের ওপর। হঠাৎ সে লাফিয়ে উঠে দরজা দিয়ে পালাবার জন্য দৌড় লাগায়। কিন্তু কনস্টেবলরা ওৎ পেতেই ছিল, খপ করে তারা তাকে ধরে ফেলে।

পরমেশ বলেন, 'শয়তানকে হ্যাণ্ডকাফ পরিয়ে নিচে ভ্যানে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে রাখো। লক্ষ্য রাখবে, পালাতে যেন না পারে।' সহদেবকে নিয়ে যাবার পর ঘড়ি দেখে বলেন, 'এখন ছ'টা বাজে। এতক্ষণে পার্ক সার্কাসের বস্তিতে সেলিম আর মোহন সিং ধরা পড়ে গেছে। মোহন আজ সকালে ওখানেই গেছে। পালের গোদা দুটোকে এক জায়গায় পাওয়া যাবে, এই খবরটা পেয়ে কাল রাত থেকেই সাদা পোশাকের পুলিশ সেলিমদের বস্তিটাকে ঘিরে রেখেছিল।' বিনুর মাকে বলেন, 'চা করুন। বৌদি, দু-চার দিনের ভেতর আপনার গয়নাগুলো ফেরত পেয়ে যাবেন এখন বলুন আমাদের চাইনিজ রেডি আছে তো?'

মায়ের মুখে হাসি ফোটে। তিনি বলেন, 'একদম রেডি।'

'এবার আমাদের জেতা জয়েন্দার নামে জয়ধ্বনি দেওয়া যাক: হিপ হিপ হুর—'

ঘরসুদ্ধ সবাই চেঁচিয়ে ওঠে, 'বিনু অ্যাণ্ড রাজা।'

ছবি: সুফি

দুঃখিত

*আমরা দুঃখিত। কথা দিয়েও সত্যজিৎ রায় অসুস্থতার জন্যে শেষ পর্যন্ত লেখা দিতে পারলেন না। নার্সিংহোম থেকে তিনি জানিয়েছেন, সুস্থ হয়ে উঠলেই শুকতারার পাঠক-পাঠিকাদের জন্যে কলম ধরবেন। জানিয়েছেন, এবারের পুজো সংখ্যায় লিখতে পারলেন না বলে তিনি দুঃখিত। দুঃখিত আমরাও।*

*সম্পাদক*
*শুকতারা*

# সেই সব ভূত

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

আমাদের গাঁয়ে একসময় প্রচুর ভূত ছিল। শুধু রাতবিরেতে নয়, দিনদুপুরেও তারা একলা-দোকলা মানুষকে বাগে পেলে ভয় দেখিয়ে দুষ্টুমি করত।

দুষ্টুমিই বলা উচিত। কারণ কখনও তারা কারুর ঘাড় মটকেছে বা ঠ্যাং ভেঙেছে বলে শুনিনি। তবে ভয়ের চোটে কেউ ভিরমি খেয়ে মারা পড়লে কিংবা দৌড়ে পালাতে গিয়ে কারুর ঠ্যাং ভাঙলে সেজন্য তো আর ভূতকে দায়ী করা চলে না। যার যা কাজ। ভূতের কাজটাই হলো মানুষকে ভয় দেখানো। যে ভূত ভয় দেখায় না, সে আবার কিসের ভূত?

কথাটা বলতেন আমার বড়মামা।

বড়মামা রেলে চাকরি করতেন। ছুটিছাটায় আমাদের বাড়ি আসতেন। সাংঘাতিক সাংঘাতিক সব ভূতের গপ্প বলে আমাদের রক্ত জল করে ফেলতেন। গপ্প শোনার পর আমরা যারা ছোট তাদের অবস্থা তখন শোচনীয়। কিন্তু তারপরই বড়মামা হো হো করে হেসে বলতেন, ওরে! ভূতকে কক্ষণো ভয় পাবি না। কারণ কী জানিস? মানুষ যেমন ভূতকে ভয় পায়, ভূতও মানুষকে খুব ভয় পায়। ভূত যদি ভয় দেখায়, তোরাও তাকে ভয় দেখাবি। দেখবি, ব্যাটাচ্ছেলে তক্ষুণি কেটে পড়েছে।

সে-কথা শুনেও যে খুব একটা সাহস পেতাম, তা নয়। আমার তো খালি ভাবনা হতো, ভূত বড়দের ভয় পেতেও পারে, কিন্তু আমাদের মতো ছোটদের কি আর ভয় পাবে?

আমাদের বাড়ির পিছনদিকটায় ছিল একটা বাগান। তার ওধারে একটা ঝিল। ঝিলের ওপারে ছিল ঘন জংগল। ঠাকমা বলতেন, ঝিলের জংগলে থাকে এক কন্ধকাটা। আর ঝিলের ধারে থাকে এক শাঁকচুন্নি। শাঁকচুন্নিটা রোজ রাত্তিরে আলো জেলে ঝিলের ধারে কী যেন খুঁজে বেড়ায়। কন্ধকাটা আলো সইতে পারে না। তাই সে এসে শাঁকচুন্নির সংগে খুব ঝগড়া বাধায়। ঝগড়ার চোটে সারারাত্তির ঘুমোতে পারিনে।

ঠাকমা থাকতেন বাড়ির পিছনের ঘরে। কখনও-কখনও রূপকথা শোনার লোভে আমি ঠাকমার কাছে শুতে যেতাম। রূপকথা বলতে বলতে ঠাকমা হঠাৎ থেমে গেলে বলতাম, তারপর কী হলো বলো না?

ঠাকমা আস্তে বলতেন, ওই আবার বেধেছে।

কী বেধেছে?

কন্ধকাটার সংগে শাঁকচুন্নির ঝগড়া। শুনতে পাচ্ছিস না তুই?

কৈ, না তো!

জ্বালাতন! বলে ঠাকমা উঠে গিয়ে ওদিকের জানালাটা বন্ধ করে দিতেন। তারপর বলতেন, এর একটা বিহিত করা দরকার। কালই মোনা ওঝাকে ডেকে পাঠাতে হবে।

মোনা ছিল ভূতের ওঝা। ভূতগুলোর সংগে নাকি বেজায় ভাব। তারা তাকে খুব সমীহ করে। একবার হলো কী, সিংগি মশাই রাত নটার বাসে শহর থেকে ফিরছেন। হাতে ছিল এক ভাঁড় রসমালাই। ঠাকরুনতলার বটগাছের কাছে যেই এসেছেন, অমনি গাছ থেকে ঝুপ ঝুপ করে কয়েকটা ছায়ামূর্তি

লাফিয়ে পড়ে তাঁকে ঘিরে ধরেছে। রসমালাইয়ের ওপর ভূতদের লোভ হতেই পারে। 'দেঁ দেঁ' করে তারা চেঁচাচ্ছিল।

এসব ক্ষেত্রে নিয়ম হলো, 'দেব-দিচ্ছি' করে বাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে হয়। কিন্তু সিঙ্গিমশাই নিয়মটা ভুলে গিয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে পালালেন। পালাতে গিয়ে পড়লেন একটা গর্তে। আর একটা ঠ্যাংও গেল ভেঙে। রসমালাইয়ের ভাঁড়টা হাত থেকে ছিটকে পড়েছিল। ভূতেরা আহ্লাদ করে রসমালাই সাবাড় করল। সিঙ্গিমশাই যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে সবই দেখলেন। কিন্তু কী আর করা যাবে?

তাঁর কাতরানি রামু ধোপা শুনতে পেয়েছিল। সে বেরিয়েছিল তার গাধাটাকে খুঁজতে। গাধাটার ছিল বিচ্ছিরি স্বভাব। প্রায় রাত্তিরেই দড়ি ছিঁড়ে খেলার মাঠে চলে যেত এবং পছন্দসই কোনও ভূতকে পিঠে চাপিয়ে ছুটোছুটি করত। আসলে রামুর গাধার সঙ্গে ভূতদের ছিল বেজায় গলাগলি, বন্ধুতা।

তো রামু সিঙ্গিমশাইকে কাঁধে করে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল। তারপর শহরের হাসপাতালে কয়েকমাস কাটিয়ে সিঙ্গিমশাই ফিরে এলেন বটে, কিন্তু একটি ঠ্যাং হাঁটুর ওপর থেকে বাদ। ক্রাচে ভর করে হাঁটতেন এবং নতুন নাম পেয়েছিলেন 'খোঁড়াসিঙ্গি'।

সব্বাই ঢুকে পড় এই খুলির ভেতর।

খোঁড়াসিঙ্গি ভূতের ওপর খাপ্পা হয়ে মোনা ওঝাকে তলব করেছিলেন। বলেছিলেন, শুধু ঠাকরুনতলার নয়, গাঁয়ের সব ভূতকে গঙ্গার ওপারে তাড়িয়ে দিয়ে আয় তো মোনা। যা চাস, পাবি।

মোনা ওঝা বলল, তাড়িয়ে দেওয়া কি ঠিক হবে সিঙ্গিমশাই? কাউকে ভিটেছাড়া করা যে মহাপাপ। তা ছাড়া ওদের সঙ্গে আমার কতকালের সম্পর্ক। যা বলি, তা-ই শোনে। এ কাজ আমি পারব না সিঙ্গিমশাই।

খোঁড়াসিঙ্গি তর্জনগর্জন করে বললেন, তা হলে তোকেই ভিটেছাড়া করব বলে দিচ্ছি। বেশ বুঝেছি, তুই-ই যত নষ্টের গোড়া। তোরই আস্কারা পেয়ে হারামজাদাগুলোর এত বাড় বেড়েছে। দাঁড়া! কালই পঞ্চগেরামি করে তোর বিচারের ব্যবস্থা করছি।

সে আমলে 'পঞ্চগেরামি' অর্থাৎ পঞ্চগ্রামী মানে পাঁচ গাঁয়ের মাতব্বর লোকদের ডেকে বিচারসভার আয়োজন সেই বিচারসভা বসল চণ্ডীমণ্ডপে। মোনাকে ডেকে আনা হলো। মোনা ওঝা কিন্তু একটুও দমে যায়নি। সে মুচকি হেসে বলল, বাবুমশাইরা! ওপরে দেবতা, নিচে মা বসুমতী। ন্যায্য বিচার করে বলুনদিকি দোষটা কার? সিঙ্গিমশাইয়ের ঠ্যাং কি ভূতগুলো ভেঙেছে, নাকি নিজেই গর্তে আছাড় খেয়ে নিজেই ভেঙেছেন? জিজ্ঞেস করুন তো সিঙ্গিমশাইকে।

সবাই একমত হলেন যে, ভূতগুলো সিঙ্গিমশাইয়ের শরীরে আঘাত করেনি, এটা সত্যি। কিন্তু পাশের গাঁয়ের চক্কোত্তি মশাই বললেন, মানছি, ওরা সিঙ্গিমশাইয়ের ঠ্যাং ভাঙেনি। তবে এ-ও তো ঠিক যে, ভূতগুলো ওঁকে ভয় না দেখালে উনি দৌড়ে পালাতেন না এবং গর্তেও পড়তেন না, ঠ্যাংও ভাঙত না।

মোনা ওঝা হাত নেড়ে বলল, ভুল! একেবারে ভুল। ভূতগুলো ওঁকে কক্ষণো ভয় দেখায়নি। মা-চণ্ডীর দিব্যি করে বলুন উনি।

মাতব্বররা সিঙ্গিমশাইকে জিজ্ঞেস করলেন কথাটা। সিঙ্গিমশাই গাঁইগুই করে বললেন, না-মানে, ঠিক ভয় দেখায়নি। তবে আমার হাতে রসমালাইয়ের ভাঁড় ছিল। সেটা কেড়ে নিতে এসেছিল।

মোনা ওঝা বলল, আবার ভুল হলো বাবুমশাইরা! কেড়ে নিতে এসেছিল, নাকি চেয়েছিল? মা-চণ্ডীর দিব্যি, সত্যি কথাটা বলুন।

আমাদের গাঁয়ের মা-চণ্ডী জাগ্রত দেবী। তাঁর ভয়ে খোঁড়াসিঙ্গিকে স্বীকার করতে হলো রসমালাইগুলো কেড়ে নেবে বলে মনে হচ্ছিল বটে, তবে ওরা 'দেঁ দেঁ' করে চেঁচাচ্ছিল সেটা মিথ্যা নয়।

তা হলে? মোনা ওঝা একগাল হেসে বলল, এবার বলুন দোষটা কার? হাতে রসমালাই দেখলে কেউ চাইতেই পারে। আপনি ইচ্ছে হলে দেবেন, নয় তো দেবেন না, আপনি বললেই পারতেন, দেব না। তা না করে আপনি দৌড়ে পালালেন। গর্তে পড়ে ঠ্যাংটি ভাঙলেন আর দোষটা দিচ্ছেন অন্যকে?

মামলা ভেস্তে যাচ্ছে দেখে খোঁড়াসিঙ্গি বললেন, কিন্তু আমার নালিশ তো এই মোনার বিরুদ্ধে। মোনার আস্কারাতেই এ গাঁয়ের ভূতগুলোর বড্ড বাড় বেড়েছে

মোনা ওঝা বলল, প্রমাণ ?

মাতব্বররাও বলে উঠলেন, হ্যাঁ। প্রমাণ চাই। সাক্ষী চাই। সিংগিমশাই, কৈ আপনার সাক্ষীদের ডাকুন।

সাক্ষী পাওয়া গেল না। আমাদের গাঁয়ের লোকেরা বলল, ভূতগুলো বাড়াবাড়ি করলে বরং মোনা ওঝাই এসে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাদের তাড়িয়ে দেয়। কাজেই মোনা তাদের আস্কারা দেয় বলা চলে না। তাছাড়া আজ অব্দি মোনা ওঝা কারুর পেছনে ভূতকে লেলিয়ে দিয়েছে বলেও জানা নেই।

'পঞ্চগেরামি' বিচারসভায় মোনা ওঝা বিলকুল খালাস পেয়ে গেল।

কিন্তু খোঁড়াসিংগির রাগ পড়েনি। কিছুদিন পরে উনি কোত্থেকে এক সাধুবাবাকে নিয়ে এলেন। সাধুবাবা ঠাকরুনতলায় ত্রিশূল পুঁতে মড়ার খুলির সামনে ধুনি জ্বেলে ধ্যানে বসলেন। গাঁ-সুদ্ধু ছোটবড় সবাই ভিড় জমাল সেখানে। আমরা, ছোটরাও ব্যাপারটা দেখতে গেলাম।

সাধুবাবা একসময় ধ্যান ভেঙে লালচোখে চারদিক দেখে নিয়ে মড়ার খুলিটা তুলে নিলেন। মন্তর আওড়ে গর্জন করলেন, আয় আয় ! যে যেখানে আছিস, চলে আয়। এই খুলির মধ্যে ঢুকে পড় সবাই। বেম্মদত্যি, কন্ধকাটা, শাঁকচুন্নি, মামদো, পেঁচো, গোদানো, হাঁদা, নুলো, ভুলো, কেলো, ক্যাংলা-খ্যাংলা দুই ভাই, জটা-জটি, পিশাচ, গলায় দড়ে, যখবুড়ো সব্বাই আয় ! সব্বাই এসে ঢুকে পড় এই খুলির ভেতর।

এই বলে সাধুবাবা মড়ার খুলিটা দু'হাতে চেপে ধরে ঝুলিতে ঢোকালেন। ত্রিশূল তুলে হুংকার দিতে দিতে এগিয়ে গেলেন ঝিলের দিকে। ঝিলের জলে মড়ার খুলিটা বের করে ছুঁড়ে ফেলে বললেন, থাক্ তোরা জলের তলায়। আর বলে দিচ্ছি, যে এই খুলি তুলবে, তার মুখে রক্ত উঠে মারা পড়বে।.....

এরপর বেশ কিছুদিন আমাদের গাঁয়ে আর ভূতের সাড়াশব্দ ছিল না। মোনা ওঝা নাকি মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়াত। লোকেরা রাতবিরেতে বুক ফুলিয়ে চলাফেরা করত। মাঝেমাঝে দেখতাম, রামু ধোপার গাধাটা ঝিলের ধারে ঘাস খেতে খেতে হঠাৎ মুখ তুলে তাকাত। ওর দৃষ্টিটা খুব করুণ মনে হতো। তার খেলার সংগীরা জলের তলায় খুলির ভেতর বন্দী। বেচারার দুঃখ হতেই পারে।

হঠাৎ একদিন হইচই পড়ে গেল।

রামু ধোপা গিয়েছিল ঝিলের জলে কাপড় কাচতে। সে দেখেছে সেই মড়ার খুলিটা ঝিলের ধারে পড়ে আছে। জল থেকে নিশ্চয় কেউ ভূতবোঝাই খুলিটা তুলেছে।

সারা গাঁ ভেঙে পড়ল ব্যাপারটা দেখতে। খোঁড়াসিংগিও ক্রাচে ভর করে হাঁফাতে হাঁফাতে সেখানে হাজির হলেন। আমারও দেখার ইচ্ছে করছিল। কিন্তু বড়রা কিছুতেই ছোটদের যেতে দিলেন না। জলের তলার খুলি থেকে খালাস পাওয়া ভূতগুলো খাপ্পা হয়েই আছে। কাজেই অবোধ আর দুর্বল ছোটদের ওপর তাদের নজর পড়ার সম্ভাবনা আছে।

পরে শুনলাম, দায়টা চেপেছে মোনা ওঝারই কাঁধে। মোনাও তন্ত্রমন্ত্র জানে। কাজেই সাধুবাবার ফেলে দেওয়া খুলি সে ছাড়া জল থেকে তুলবে সাধ্য কার ? তাছাড়া মোনা নিশ্চয় কোনও বড় ওঝার কাছে নতুন বিদ্যে রপ্ত করে এসেছে। তবে

শেষ পর্যন্ত এতে মোনা ওঝারই জয়-জয়কার পড়ে গেল। মুখে রক্ত উঠে সে মারা পড়েনি। তার মানে, আমাদের গাঁয়ের এই ওঝা সেই সাধুবাবার চেয়ে এখন আরও ক্ষমতাশালী। সিঙ্গিমশাই কেঁচো হয়ে ঘরে ঢুকলেন। কদাচিৎ বাইরে বেরুতেন তিনি। বেরুলেই দিনদুপুর ছাড়া নয়। মোনা ওঝার এতে দাপট বেড়ে গেল।

এদিকে আবার ভূতের সাড়াশব্দ পাওয়া গেল সেদিন থেকেই। পন্ডিতমশাই পাঠশালার ছুটির পর বাড়ি ফিরছেন। হঠাৎ গাছ থেকে টুপ-টাপ করে ঢিল পড়ল। পন্ডিতমশাইয়ের বেলায় এ কোনও নতুন ঘটনা নয়। বরং ঢিলপড়া বন্ধ হওয়াতে তাঁর খারাপ লাগত। আবার ঢিল পড়ায় খুশি হয়েছিলেন। বললেন, কীরে তোরা সব কেমন আছিস? গদাই মোড়ল সন্ধ্যাবেলা মাঠ থেকে ফিরছেন। একটা কালো বেড়াল তাঁর সঙ্গ নিল। মোড়ল খুব খুশি হয়ে বললেন, ভাল ছিলিস তো বাবা? নাকি জলবন্দী হয়ে খুব কষ্টে ছিলিস?

এইসব ঘটনা সন্ধ্যাবেলায় ছোটকাকা খুব জমিয়ে বর্ণনা করতেন। আমি কিন্তু তখনও কোনও ভূত দেখিনি বা সে-রকম কোনও সাড়াশব্দও পাইনি। বড়রা বলতেন, ভূত আছে। আমরা ছোটরাও মেনে নিতাম, ভূত আছে। তাছাড়া বড়মামা এসে ভূতের স্বভাবচরিত্র কীর্তিকলাপ শুনিয়ে ভূতের ব্যাপারটাকে আরও পাকাপোক্ত করে ফেলতেন।

তো অমন একটা ঘটনার কিছুদিন পরে ঠাকমার মুখে ঝিলের ধারের শাঁকচুন্নি আর জঙ্গলের কন্ধকাটার ঝগড়ার কথা শুনেছিলাম। বলেছিলেন, মোনা ওঝাকে ডাকতে হবে। মোনা ছাড়া এর বিহিত হবে না।

মোনা ওঝা পরদিন এসেছিল। ঠাকমার মুখে সব শুনে সে বলল, বড় সমিস্যে দিদিঠাকরুন। ওদের ঝগড়া-ঝাঁটির কথা আমার অজানা নয়। অনেক চেষ্টা করেও মিটমাট করাতে পারিনি। আসলে শাঁকচুন্নিটা আলো ছাড়া এক পা হাঁটতে পারে না। মেয়েটা রাতকানা। ওদিকে কন্ধকাটার চোখে ঘা। আলো লাগলেই জ্বালা করে। কাকে দোষ দেব বলুন?

তুই কন্ধকাটাকে বরং অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে বল্ মোনা!

যাবেটা কোথায়? সব জায়গাই তো দখল হয়ে আছে।

খুঁজলে নিশ্চয় কোথাও পাওয়া যাবে। তুই খুঁজে দ্যাখ্ না।

মোনা ওঝা একটু ভেবে নিয়ে বলল, মুসলমানপাড়ার গোরস্তানে একটা শ্যাওড়া গাছ আছে। গাছটাতে এক মামদো থাকত দেখেছি। কাল রাত্তিরে গিয়ে তাকে ডাকলাম, চাচা আছ নাকি? কোনও সাড়া পেলাম না। আমার সন্দ হচ্ছে, মামদোচাচা ডেরা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। প্রায়ই বলত, গাছটা পছন্দ হচ্ছে না রে। হাত পা ছড়িয়ে বসা যায় না। বড্ড বেশি ডালপালা। হাওয়া-বাতাস ঢোকে না।

ঠাকমা খুব উৎসাহ দেখিয়ে বললেন, তাহলে তুই কন্ধকাটাকে গিয়ে কথাটা বল্ মোনা! ওদের ঝগড়ার জ্বালায় সারারাত্তির ঘুমোতে পারিনে!

মোনা ওঝা কিন্তু কিন্তু করে বলল, দেখি, বলে কয়ে। তবে গোরস্তানে কন্ধকাটা যেতে রাজী হবে বলে মনে হয় না।

কেন? রাজী না হওয়ার কী আছে?

বুঝলেন না? কন্ধকাটা হলো গিয়ে হিন্দু। মুসলমানদের গোরস্তানে যেতে চাইবে কি?

ঠাকমা ফোকলা দাঁতে হেসে বললেন, ধুর পাগল! ভূতের আবার হিন্দু-মুসলমান কী রে? ভূত হলো ভূত। মানুষের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান আছে। ভূতের মধ্যে নেই। তুই কন্ধকাটাকে একবার বলেই দ্যাখ গে না! বলবি, গোরস্তানের তল্লাটে একেবারে সুনসান অন্ধকার। আরামে থাকবে। ....

ক'দিন পরে মোনা ওঝা এসে বলল, কেলেংকারি হয়ে গেছে দিদিঠাকরুন! কন্ধকাটাকে বলে কয়ে রাজী করিয়েছিলাম। কাল সন্ধ্যেবেলায় সে গোরস্তানের শ্যাওড়াগাছে ডেরা বাঁধতে গিয়েছিল। কিন্তু মামদোচাচা আবার ফিরে এসেছে। তাড়া খেয়ে কন্ধকাটা পালিয়ে এল।

ঠাকমা নিরাশ হয়ে বললেন, মুখপোড়া মামদোটা ফিরে এল কেন জানিস?

বলতে গেলে সে অনেক কথা! মোনা ওঝা শ্বাস ছেড়ে বলল। বেঁচে থাকতে এক কাবুলিওলার কাছে দেনা করেছিল। এদিকে কাবুলিওলাও যে মরে ভূত হয়েছে আর মেদিপুরের গোরস্তানের কাছে বাজপড়া তালগাছের ডগায় ডেরা খুঁজে নিয়েছে, মামদোচাচা জানত না। ওকে দেখেই কাবুলিওলা লাঠি নিয়ে তাড়া করেছিল। তাড়া খেয়ে কাঁহা কাঁহা মুল্লুক ঘুরে মামদোচাচা বাড়ি ফিরেছে।

হ্যাঁরে মোনা, তাহলে এক কাজ কর না তুই। ঠাকমা মিটিমিটি হেসে বললেন, ঘটকালিতে লেগে যা। শাঁকচুন্নির সঙ্গে কন্ধকাটার বিয়ে দিয়ে দে। তাহলেই মিটমাট হয়ে যাবে।

মোনা ওঝা ফিক করে হাসল। সেই চেষ্টাই তো করছি দিদিঠাকরুন। শুধু একটাই সমিস্যে। কন্ধকাটার চোখের ঘা সারিয়ে দেওয়া দরকার। তাহলে শাঁকচুন্নির পিদিমের আলো ওর চোখের ঘায়ে খোঁচা দেবে না। দেখি, তেমন বদ্যি-কোবরেজ কোথাও পাই নাকি!

মোনা চলে গেলে বললাম, আচ্ছা ঠাকমা, কন্ধকাটাদের তো মুন্ডু নেই শুনেছি। ছোটকাকা বলছিলেন। ওদের চোখ কোথায় থাকে তাহলে?

ঠাকমা বললেন, ধুর বোকা! চোখ থাকে ওদের বুকের ওপর।

কন্ধকাটার বুকে চোখের কথা শুনে খুব ভয় পেয়ে গেলাম। তারপর থেকে দিনদুপুরেও আর ঝিলের জঙ্গলের দিকে তাকাতে সাহস পেতাম না। বড়মামা বলতেন বটে, ভূতকে কক্ষণো ভয় পাবি না। কিন্তু কন্ধকাটার একে তো মুন্ডু নেই, তার ওপর বুকে দুটো চোখ। মুখোমুখি দেখা তো দূরের কথা, কল্পনা করতেই যে রক্ত হিম হয়ে যায়!

তো শেষ পর্যন্ত মোনা ওঝা ভূতের কোবরেজ খুঁজে পেয়েছিল। সেই কোবরেজের মলমে নাকি কন্ধকাটার চোখের ঘা সেরে যাচ্ছিল। আগামী কালীপুজোয় অমাবস্যার রাত্তিরেই কন্ধকাটার সঙ্গে শাঁকচুন্নির বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হয়েছিল। মোনা রোজই এসব খবর দিয়ে যেত। বিয়েতে খরচাপাতির ব্যাপার আছে। ঠাকমা সবই দিতে রাজী হয়েছিলেন।

কিন্তু হঠাৎ এক অঘটন ঘটে গেল।

হঠাৎই বলা চলে। কারণ ইতিমধ্যে আমাদের গাঁয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিকল্পনা হয়েছে এবং খুঁটি পোঁতার কাজও

শেষ, কিন্তু বিদ্যুতের পাত্তা ছিল না। লোকেরা হাল ছেড়ে দিয়েছিল। এতদিনে খবর পাওয়া গেল, সামনে দুর্গাপুজোয় বিদ্যুৎ আসছে। উদ্বোধন করতে আসছেন বিদ্যুৎমন্ত্রী। সাজো সাজো রব পড়ে গেল খবর শুনে। শহর থেকে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি আসার হিড়িক পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। ছোটকাকা আমাদের বাড়িতে মিস্ত্রি এনে বিপুল উৎসাহে কাজে নেমে পড়লেন। বাগানের দিকে আলোর ব্যবস্থা করা হলো। তারপর ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যাবেলায় খেলার মাঠে জনসভা হলো। বিদ্যুৎমন্ত্রী এসে সুইচ টিপে উদ্বোধন করলেন। চারদিক উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল।

সে রাত্তিরে আমরা প্রায় জেগেই কাটালাম। এত আলো, এমন উজ্জ্বল আলো ছেড়ে কি ঘুমোতে ইচ্ছে করে?

শুধু ঠাকমার মুখ গম্ভীর। কেন গম্ভীর, তা সকালবেলায় জানতে পারলাম। বাগানের কোণায় একটা বেলগাছ ছিল। সেই গাছে থাকত এক বেহ্মদত্যি। সকালে দেখি, ঠাকমা বেলতলায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। দৃষ্টি ঝিলের দিকে।

ঠাকমার কাছে গেছি, সেই সময় মোনা ওঝা ঝিলের দিক থেকে হন্তদন্ত এসে ধপাস করে বসে পড়ল। ঠাকমা বললেন, খুঁজে পেলি?

মোনা ওঝা ফোঁস করে শ্বাস ফেলে বলল, নাহ্। সব পালিয়েছে। কেউ নেই।

ঠাকমা বেলগাছের ডগার দিকে মুখ তুলে বললেন, এ বুড়োও পালিয়েছে। কাল রাত্তিরে পষ্ট দেখলাম, যেই ওই আলোটা জ্বলেছে, অমনি বুড়ো গাছ থেকে নেমে পালিয়ে গেল। ওই দ্যাখ্, হাত থেকে হুঁকোটা পড়ে গেছে। কল্কেটাও পড়ে আছে দেখতে পাচ্ছিস?

মোনা উদাস চোখে হুঁকোটার দিকে তাকিয়ে বলল, দিদিঠাকরুন যদি হুকুম দেন, বাবা বেহ্মদত্যির হুঁকোকল্কে আমিই নিয়ে যাই।

নিয়ে যা। ঠাকমা করুণ মুখে বললেন। তবে এঁটো করিসনে যেন। বামুন বুড়ো জানতে পারলে কষ্ট পাবে। রোজ রাত্তিরে বুড়ো হুঁকো খেত আর খকখক করে কাসত। আহা, কোথায় ভিটেছাড়া হয়ে চলে গেল সব?

মোনা ওঝা হুঁকোকল্কে কুড়িয়ে নিয়ে বলল, আমার সবচেয়ে দুঃখটা কী জানেন দিদিঠাকরুন? শাঁকচুন্নি আর কন্ধকাটার বিয়েটা ভন্ডুল হয়ে গেল। এ আলো কি যেমন-তেমন আলো? ইলেকটিরি বলে কথা। আমি যে মানুষ, আমারও চোখ জ্বালা করে। তবে দেখবেন দিদিঠাকরুন, এ পাপ সইবে না। আমি বরাবর বলে আসছি, কাউকে ভিটেছাড়া করার মতো পাপ আর নেই। এই মহাপাপ কি ভগবান সইবেন ভাবছেন? কক্ষণো না।....

ঠিক তা-ই।

মোনা ওঝার কথা ফলেছে বলা চলে। এখন আমি বড় হয়েছি। কলকাতায় থাকি। খবর পাই, আমাদের গাঁয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন বিদ্যুৎ থাকে না। মোনার ভগবান নাকি লোডশেডিং নামে এক সাংঘাতিক দানো পাঠিয়ে দিয়েছেন। সে ভিটেছাড়া ভূতগুলোকে ফিরিয়ে এনেছে। তাছাড়া চোখে সইয়ে সইয়ে বিদ্যুতের আলো দিয়ে ভূতগুলোকে সে চাঙ্গা করে তুলেছে। সেইসব ভূতই নাকি তার কাটে। ট্রান্সফর্মার চুরি করে। কত উপদ্রব বাধায়। ঠাকমা বেঁচে নেই। মোনাও বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে শাঁকচুন্নি আর কন্ধকাটার বিয়েটা লোডশেডিংয়ের দৌলতে ঘটা করেই ওঁরা দিতেন।

বললে তোমরা হয়তো বিশ্বাস করবে না। গত পুজোয় গাঁয়ের বাড়িতে গিয়েছিলাম। রাত্তিরে হঠাৎ লোডশেডিং। অভ্যাসমতো ঠাকমার সেই ঘরে শুয়েছিলাম। রাত দুপুরে বাগানে হঠাৎ খকখক করে কাশির শব্দ শুনে জানলায় উঁকি মেরে দেখি, সেই বেলগাছে হুঁকোর আগুন জ্বগজ্বগ করছে।

খুব খুশি হলাম। মানুষের জীবনে ভূতটুত না থাকলে কি চলে? জীবনটাই যে নীরস হয়ে যাবে, যদি না থাকে ভূতপেত্নী, যদি না থাকে অন্ধকার! ....

ছবি: বিজন কর্মকার

# শিউলি তোমায়

বীরেন সাহা

ভোরের বেলার ও শিউলি
একটি কথা তোমায় বলি,
এতদিনে হলো তবে
তোমার ফোটার পালা সবে?

দেখেছো কি নরম আলো
ছড়িয়ে পড়ে তালপুকুরে?
শালুক শোভা দিক ভোলালো
ধানের ক্ষেতে দুচোখ জুড়ে?

শিউলি তোমায় শোনাব গান
ঘাসের ওপর শিশিরে যে তান,
কাশের বনের হাওয়ার সুরে
ভেসে বেড়ায় নিকট দূরে

হৃদয় আমার সুনীল আকাশ,
জলহারা মেঘ আমাকে কি চাস?
সময় আমার একটুও নেই,
ভাসিস এখন আবছায়াতেই।

সোনালি রোদ ধরব হাতে
খুশির খেলায় ভোরবেলাতে,
ছুটব পথে ঘাসে ঘাসে
পদ্ম চাঁপার আশেপাশে।

শোনো শোনো লাল দোপাটি
ঢাকে পড়ল ঐ যে কাঠি,
মা দুর্গা এলেন পাড়ায়,
ঘরে কি আজ আর থাকা যায়?

ছবি: রজতবরণ চক্রবর্তী

# হাসি কান্না চুনী পান্না

## সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

আমি যখন ছোট ছিলুম তখন আমার খুব কাশি হত। হলেই হল। শুকনো কাশি, সে বড় ভয়ঙ্কর। তার কোনো কমা, ফুলস্টপ থাকে না। খ্যাকোর

খ্যাকোর চলছে তো চলছেই। যে কাশে তার তো কষ্ট হয়ই, যাঁরা শোনেন, তাঁদের কষ্ট আরো বেশি। কাশি তো আর গান নয়, যে সবাই শুনে মোহিত হয়ে যাবেন। কোনো কারণে থামলে বলবেন, 'থামলে কেন, থামলে কেন, চলুক চলুক, বেশ হচ্ছে।' কাশির ধর্মই হল সূর্য ডোবার পরই বাড়বে। অন্ধকারে যেমন প্যাঁচা বেরোয়, বাদুড় বেরোয়, সাপ, কীট-পতঙ্গ বেরিয়ে আসে গর্ত ছেড়ে পিলপিল করে, কাশিও তেমনি মনের আনন্দে গলার গর্ত ছেড়ে বেরোতে থাকে। যত রাত বাড়ে তত কাশি বাড়ে।

আমার বাবা বলতেন, 'ভাগ্য ভাল হলে এই রকমই হয়, বিনা আয়াসে কাশীবাস।' মাঝে মাঝে গবেষণা করতেন, ' আচ্ছা কিভাবে তুমি এটা করো? কায়দাটা কি? পড়ার ভয়ে নকল কাশি বলেও তো মনে হয় না। শতকরা একশো ভাগ খাঁটি কাশি। মুখ আড়াই ইঞ্চি ফাঁক, চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে, একেবারে খোলতাই কাশি। আচ্ছা, তোমার একটু বিশ্রাম নিতে ইচ্ছে করে না! সিনেমার হাফটাইম আছে, ফুটবল খেলার হাফটাইম আছে, বড় বড় যুদ্ধেও কয়েক ঘণ্টার যুদ্ধবিরতি হয়। তোমার কি একটু ইন্টারভ্যাল নিতে ইচ্ছে করে না!'

এর আমি কি উত্তর দোবো। কাশি একেবারে একটা স্বাধীন জিনিস। গলার গর্তে বসবাস করে। যেই রাত নামে খোল-খত্তাল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। বাবাকে উত্তর দিলেন জ্যাঠামশাই।

'তোমার মতো বুদ্ধিমান, বিবেচক এক মানুষ, এমন একটা ছেলেমানুষী প্রশ্ন করতে পারলে?'

'হ্যাঁ, পারলুম। কাশিটা হল শুকনো কাশি। আসছে পেট থেকে। গঙ্গার উৎস যেমন গোমুখী, শুকনো কাশির উৎস হল তেমন পেট। পেট থেকে কাশি বেরিয়ে আসছে কি ভাবে?

গরমে। উপমা ছাড়া তুমি বুঝবে না। আমাদের চৌকিতে ছারপোকা হলে কি করি? গরম জল ঢালি।'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'প্রশ্ন আছে। পেট কি চৌকি? কাশি কি ছারপোকা? অসম উপমা হল। তুমি উপমা পাল্টাও। প্রাণীর সঙ্গে অপ্রাণী, অপ্রাণীর সঙ্গে প্রাণীর উপমা চলে না।'

'কেন চলে না? আমরা বলি না, খেয়েদেয়ে সে তাকিয়ার মতো পড়ে আছে। আমরা বলি না, শোকে পাথর হয়ে গেছে। আমরা পড়িনি, পলাশীর যুদ্ধে মিরজাফর দাঁড়িয়ে রইলেন কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ, রোগা, শীর্ণ মানুষকে আমরা বলি বৃষকাষ্ঠ। তোমার স্বভাবটাই হল, কারণে অকারণে প্রতিবাদ।'

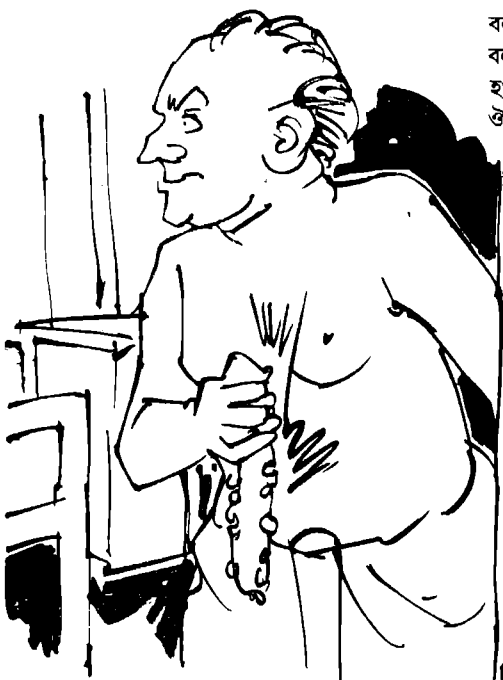

জ্যাঠামশাই হারবার মানুষ নন। তিনি বললেন, 'ও-সব উপমাগুলো দীর্ঘদিন চলে আসছে। তুমি হঠাৎ একটা নতুন উপমা যথেষ্ট প্রচার ছাড়াই চালাতে চাইছ। সুধিজন নেবে কেন! তুমি যদি গায়ের জোরে বলতে চাও, শসার ইংরেজি শসকুইটো!'

'সে আবার কি? আমি তা বলব কেন?'

'কেন বলবে না! মশা যদি মসকুইটো হয়, শসা কেন শসকুইটো হবে না! তুমি বলতেই পারো। তোমার পক্ষে সবই সম্ভব।'

'আজ্ঞে না। সম্ভব নয়। ল্যাঙ্গোয়েজ পাল্টানো যায় না। উপমা আমি মাথা খাটিয়ে নতুন নতুন বের করতে পারি। সে স্বাধীনতা আমার আছে। তোমারও আছে।'

'বেশ, তাহলে আমার প্রতিবাদ তুলে নিলুম। বলো তুমি।'

'আর বলো! এমন ঘুরপাক খাইয়ে দিলে সব গুলিয়ে গেল। তার ওপর কানের কাছে এই ননস্টপ কাশি।'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'আমার যত দূর মনে পড়ছে তুমি ভাগীরথীর উৎস সন্ধানের কথা বলছিলে।'

আমি কোনোরকমে কাশির দমক চেপে বললুম, 'আজ্ঞে না, কাশির উৎস-সন্ধানে।' বলার ফাঁকে ফাঁকে ভুক্‌ভুক্‌ হচ্ছিল। শেষ হওয়ামাত্রই মাঝরাতের কুকুরের মতো ভৌ ঔ ঔ করে পেল্লায় এক ডাক ছাড়লুম।

বাবা অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ফ্যান্টাস্টিক! মানুষ যে এইভাবে ডাকতে পারে আমার কোনো ধারণাই ছিল না। তুমি একটা দেখালে বটে!'

জ্যাঠামশাই সংশোধন করে দিলেন, 'ওটা ডাক নয়। কাশি। বাঁধ ভেঙে যেমন জল বেরিয়ে আসে সেইরকম। চাপা ছিল, তেড়ে বেরিয়ে এল।'

'পেট গরম হয়েছে। কেন হয়েছে? না কুপথ্য করেছে। তেলেভাজা, চানাচুর, আচার, ঝাল আলুর দম। পেঁয়াজি, পাঁপড়। এর পেছনে কাঁচা পয়সার খেলা আছে। দুপুরবেলা আইসক্রিম আছে।'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'আইসক্রিম ঠাণ্ডা।'

বাবা বললেন, 'সংশোধনের প্রয়োজন আছে। ধারণার সংশোধন। আইসক্রিম ঠাণ্ডা নয়, গরম। যত আইসক্রিম খাবে ততই পেট গরম হবে। এখন একটু অনুসন্ধানের প্রয়োজন হয়ে পড়ছে। এর হাতে কাঁচা পয়সা দিচ্ছে কে? পয়সার উৎসটা কোথায়?'

'তুমি তো কাশির উৎস সন্ধান করছিলে হঠাৎ পয়সায় চলে গেলে? পয়সার উৎস তো টাঁকশাল।'

'আবার আমাকে গোড়া থেকে শুরু করতে হবে। এর কাশি। শুকনো কাশি। মানে পেট গরম। পেটে গরমাগরম জিনিস ঢুকছে। জিনিস এমনি আসে না। পয়সা লাগে। সেই পয়সা এ পাচ্ছে কোথা থেকে? কেউ দিচ্ছে আদর করে। সেই কেউটা কে?'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'সেই কেউ তো তোমার সামনে বসে আছে। আমিই তো সেই কেউ।'

'তুমি? তুমি এইভাবে ওর ফিউচারটা নষ্ট করছ! তুমি পয়সা দিচ্ছ, আর ও সেই পয়সায় যা-তা কিনে কিনে খাচ্ছে। আর কেশে কেশে আমাদের শুধু নয়, গোটা পাড়ার জীবন অতিষ্ঠ করে তুলছে। কোনো অচেনা মানুষ আমাদের বাড়ি জানতে চাইলে, পাড়ার লোক কিভাবে চেনায় জানো, সোজা চলে যান, কাশির শব্দ শুনতে পাবেন। ওইটাই প্রকাশবাবুদের কাশীধাম। এর চেয়ে লজ্জার, এর চেয়ে অপমানের কি আছে!'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'এইটাই তো খাওয়ার বয়স। এই বয়সে খাবে, না তো কোন বয়সে খাবে?'

'কাঁচা পয়সা হাতে না দিয়ে, ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা জিনিস কিনে দাও।'

'কোন কোন জিনিস ঠাণ্ডা?'

'যেমন ধরো, বাতাসা, কুমড়োর বরফি, পাকা পেঁপে, ডুমুর, মুড়কি, খই, চিঁড়ে, কদমা।'

'খাস্তা কচুরি, ঝুরিভাজা, ডালবড়া।'

'বিষ, বিষ। ঘিয়ে ভাজা কোনো কিছু চলবেই না। হালকা, সহজে হজম হয় এমন জিনিস খেতে হবে।'

'আচ্ছা, ওর টনসিলটা একবার দেখালে হয় না। কাশি টনসিল থেকেই হয়।'

'পেট থেকেও হয়।'

'বুক থেকেও হয়।'

'এটা পেটের।'

'এটা গলার।'

'আমি বলছি, এটা পেটের।'

'আই সে ইট ইজ থ্রোট।'

'আই সে দিস ইজ বেলি।'

'থ্রোট।'

'বেলি।'

'থ্রোট, বেলি, বেলি, থ্রোট', শুনে অন্দরমহল থেকে সবাই ছুটে এলেন। সবার আগে এলেন দাদু। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'কিসের এই শব্দকল্পদ্রুম!'

আমি ভয়ে ভয়ে বললুম, 'কাশির।'

'ইংরিজী কাশি?'

'বাংলা কাশিটাই হঠাৎ কি ভাবে ইংরিজী হয়ে গেল।'

'সায়েবদের কীর্তি। ছিল কাশি, হল বারাণসী, শেষে বেনারস। তা তোমাদের এই ভয়ঙ্কর ফাটাফাটির কারণটা জানতে পারি? আমার পুজো মাথায় উঠে গেল।'

দাদু পুজোর কাপড় পরে আছেন। হাতে জপের মালা দুলছে।

বাবা বললেন, 'এ কাশি পেটের।'

জ্যাঠামশাই টেবিল চাপড়ে বললেন, 'আলবাত নয়। এ কাশি গলার।'

দাদু বললেন, 'কার কাশি!'

বাবা আমাকে দেখিয়ে বললেন, 'এই যে এর খ্যাঁকখেঁকে কাশি। আপনিই বলেছিলেন, শুকনো কাশি পেটের কাশি। পেট গরম হলেই হয়।'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'ও, আপনি বলেছিলেন, তাহলে আমি তর্ক করতুম না। বেশ, এটা পেটের কাশি। নেক্স্ট পয়েন্ট, সারবে কিসে?'

দাদু বললেন, 'ভেরি সিম্পল। নেচারোপ্যাথি। গঙ্গার মাটি গুঁড়ো করে, মিহি করে, তিলের তেল মিশিয়ে জল দিয়ে কাদাকাদা করে, তলপেটে লেপে দাও। আর তিন দিন শুধু লাউপথ্য।'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'লাউপথ্য কাকে বলে?'

দাদু বললেন, 'ভেরি সিম্পল। লাউ যার পথ্য। তুমি তো আবার সায়েবমানুষ, নিরামিষের খবরই রাখো না। সাদা সাদা, লম্বা লম্বা এক ধরনের ফল আছে, তার নাম লাউ। সংস্কৃত হল অলাবু। চিংড়ির সঙ্গে ভোগীর প্রিয়, প্লেন এ্যাণ্ড সিম্পল হল যোগীর আহার। শুদ্ধ-সত্ত্ব। সেই লাউ সেদ্ধ করা থাকবে। ক্ষিদে পেলেই খাও।'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'মরে যাবে। কাশির সঙ্গে কেশো দুজনেই চলে যাবে। তাছাড়া পেটে ওই মাটির প্রলেপ, নিমোনিয়া হয়ে যাবে।'

বাবা বললেন, 'তোমার অ্যানাটমির জ্ঞান সাংঘাতিক। কোথায় পেট আর কোথায় লাংস। এগুলো তো একটু শিখতে পারো। ভাস্ট ইগনোরেন্স। অজ্ঞানের আটলান্টিক।'

দাদু বললেন, 'সংযম, সংযম। ব্রাইড্‌ল ইওর টাং। যে জানে না, তাকে তিরস্কার কোরো না। তাকে বোঝাও। তবে হ্যাঁ, একটা সম্ভাবনা আছে, আমাশা হয়ে যেতে পারে। সে তবু মন্দের ভাল। বিনিদ্র রজনী কাটাতে হবে না। আর আমাশার সহজ ওষুধ, থানকুনি পাতা। বাটো আর খেয়ে নাও একদলা।'

আমি বললুম, 'দাদু, আপনি বলেছিলেন, আমাশার ওষুধ গাওয়া ঘিয়ে ভাজা লুচি।'

'হ্যাঁ, সেটাও হতে পারে।'

'তাহলে আজই আমার পেটে মাটি লেপে দিন।'

'এই রাতে তো তা সম্ভব নয়। কাল নিজে পুলটিস তৈরি করে তোমাকে অয়েল ক্লথে ফেলে হবে।'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'হোয়াই নট হোমিওপ্যাথি?'

বাবা বললেন, 'হোয়াই নট নেচারোপ্যাথি!'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'কারণটা রোগীর পক্ষে অতিশয় অপমানজনক। ওর বয়সের একটা ছেলে অয়েল ক্লথের ওপর উলঙ্গ হয়ে পড়ে আছে, আর তলপেটে একগাদা মাটি। সেই সময় ওর বন্ধুরা যদি কেউ ডাকতে আসে!'

বাবা বললেন, 'তখন বলা হবে, দেখা হবে না। ও এখন নেচার-ক্লিনিকে মাড বাথ নিচ্ছে। হয়ে গেল, মিটে গেল ঝামেলা।'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'এটা একটা টর্চার।'

দাদু বললেন, 'আর এক হয় কবিরাজী।'

বাবা বললেন, 'কবিরাজীতে আমার অ্যাবসলিউটলি কোনো ফেথ নেই। খল, নুড়ি, ডালপালা।'

দাদু বললেন, 'তোমার তো কোনো কিছুতেই বিশ্বাস নেই। তা তুমি তাহলে তোমার মতেই চলো।'

'আজ্ঞে না, আমি ডিকটেটার নই। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। ছেলে হল, একটা স্টেট, একটা রাজ্যের মতোই। এই বাড়ির সবাই যা ব্যবস্থা নেবেন তাই হবে। আর আমি তো আপনার কর্দমচিকিৎসা সমর্থন করেছি। এর পর তো আর কোনো কথা নেই।'

অন্দরমহল থেকে ডাক পড়ল, 'আর ভাল লাগছে না কাশিপর্ব, এইবার আহারপর্বে আসতে হবে। বাবা, আপনার পুজো শেষ করে নিন তাড়াতাড়ি।'

## ॥ দুই ॥

খাবার ঘরে পরপর আসন পড়েছে রান্নাঘরে বামুনদি প্রাণ খুলে লুচি ভাজছেন গন্ধে জিভে জল এসে যাচ্ছে নতুন ফুলকপি উঠেছে। বড় বড় বেগুনভাজা। মা আর জ্যাঠাইমা খুব ব্যস্ত। আমি ছোট বলে, আমার ছোট থালা। দুখানা ধবধবে সাদা ফুলকো লুচি পড়েছে পাতে। বেগুনভাজা পাশ ফিরে শুয়ে আছে। হঠাৎ বাবা বললেন, 'না, না, অসম্ভব। লুচি খাবে কি? যার এই ভয়ঙ্কর কাশি পেটে বেশি লোড চাপানো ঠিক হবে না লাইট, ভেরি লাইট।'

জ্যাঠামশাই ফুলকো লুচিতে একটু আঙুল ঢোকালেন ফুস্ করে একটু ধোঁয়া বেরিয়ে গেল। দাদু চোখ বুজিয়ে ঈশ্বরকে নিবেদন করছেন। দাদু চোখ খুলে বললেন, 'কি বললে?'

'ওর লাইট কিছু খাওয়াই উচিত লুচি, কপি,

# নকল হইতে

আমার দীর্ঘ দিনের পরিশ্রম
ও অভিজ্ঞতায়
তালমিছরি
অর্ধশতাব্দী ধরে
আসছেন
কেনার সময়
সাবধান
শিশি ও প্যাকের
ও সই সহ আসল

প্রস্তুত যে
আপনারা
ব্যবহার করে
এখন থেকে তা
নকল থেকে
হওয়ার জন্য
গায়ে আমার ছবি
তালমিছরি কিনুন।

বিনীত

## ছবি ও সই দেখে আসল দুলাল চন্দ্র ভড়ের তালমিছরি কিনুন

প্রস্তুত কারক
**শ্রী দুলাল চন্দ্র ভড়**
২৮, বনমালী সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা-৫
ফোনঃ ৩৮-৮২৮৪, ৩৮৮১৯৩

STANDARD

ব্যবসায়িক যোগাযোগঃ ৫ নং মনোহর দাস স্ট্রীট, বড়বাজার, কলিকাতা-৭

ভেটকি মাছ রাত্তিরে চলবে না।'

'কি চলবে তাহলে?'

'খই, দুধ।'

'ও খই-দুধ খাবে। আমরা খাবো রাজভোগ? এ যে দেখি কাজীর বিচার!'

'ওর কাশি ভদ্রতার সমস্ত লিমিট ছাড়িয়ে গেছে। এরপর আমাদের ওপর পাড়া ছাড়ার নোটিস আসবে।'

'শোনো, বাইবেলে আছে, হেট দি সিন, নট দি সিনার। কাশিকে মারো, ছেলেটাকে মেরো না। ও যা খাচ্ছে তাই খাবে। তোমাদের ঘরে শুলে যদি অসুবিধে হয়, ও আমার কাছেই শোবে। আমি সারারাত জেগে থাকি, ও-ও সারারাত জাগবে আমার সঙ্গে। সংস্কৃতে উইক। সারারাত ওকে আমি সংস্কৃত পড়াবো। দেখো অসুখটার নাম কাশি। মহাতীর্থের নাম কাশী। কাশির কল্যাণে যদি মহাপণ্ডিত হতে পারে, সেটা হবে শাপে বর।'

সংস্কৃতের নাম শুনে লুচি আমার মাথায় উঠে গেল। বললুম, 'থাক গে, আমি খাবো না।'

জ্যাঠামশাই আমার হাত চেপে ধরে বললেন, 'নির্ভয়ে খাও। আমি আছি। তুমি আমার কাছে শোবে। তেমন হলে সারারাত তোমাকে আমি গল্প শোনাবো। এভারেস্ট অভিযানের গল্প, অ্যান্টার্টিক অভিযানের গল্প। সাহারার গল্প।'

'সমস্ত দায়িত্ব তোমাদের।' বাবা আহার শুরু করে দিলেন।

জ্যাঠামশাই আমাকে বললেন, 'নির্ভয়ে চালিয়ে যাও। লুচি তোমার ফেরারিট সাবজেক্ট। ফুল মার্কস পাওয়া চাই।'

শেষ পাতে এল ক্ষীর। বাবা বললেন, 'চূড়ান্ত বাড়াবাড়ি। হোল ফ্যামিলি আজ জাগবে।'

দাদু বললেন, 'কেন অশান্তি করছ। তুমি তো সারারাত জেগে জেগে অঙ্ক করো। কত ঘুমোও, সে তো জানাই আছে। শেষ পাতে ক্ষীর শাস্ত্রের বিধান। অশাস্ত্রীয় কাজ কেমন করে হয়!'

'আর একটু পরে শাস্ত্র, অশাস্ত্র সব বেরোবে গলা ফেঁড়ে।'

খাওয়া শেষ হল। জ্যাঠামশাই কানে কানে বললেন, 'তুমি কিছুক্ষণ আমার ঘরে থাকো। দুম করে এখনি শুতে যেয়ো না।'

লুচি দেখলে আমার জ্ঞান থাকে না। খেয়েছিও তেমনি। পরিণামের কথা না ভেবেই। পেট ফুলে জয়ঢাক। এতক্ষণ কাশি বন্ধ ছিল। লক্ষ্য করেছি অন্যমনস্ক থাকলে কাশতে ভুলে যাই। পড়তে বসলেই কাশি

আসে। স্কুলে গেলেই কাশি পায়। আবার অঙ্কের স্যার ক্লাসে এলেই মারের ভয়ে কাশি চুপ করে যায়। আমার কাশিটা মহাপাজি আছে।

সব কাজ শেষ করে জ্যাঠাইমা ঘরে এলেন। জ্যাঠাইমা আমাকে ভীষণ ভালবাসেন। আঁচল থেকে একটা কাগজের মোড়ক খুলে আমার হাতে দিয়ে বললেন, 'এতক্ষণ বসে বসে তোমার জন্যে এই দাওয়াইটা করে এনেছি। আমার মায়ের কাছে শেখা। তালমিছরি, যষ্টিমধু, মরিচ, পিপুল আর লবঙ্গ সব একসঙ্গে হামানদিস্তেতে ফেলে গুঁড়ো করা। খেতেও ভাল। যেই কাশি পাবে মুখে একচিমটে ফেলে দেবে। সঙ্গে সঙ্গে কাজ।' জ্যাঠামশাইকে বললেন, 'দুজনে মুখোমুখি বসে থ্রোট, বেলি, বেলি, থ্রোট না করে, ছেলেটাকে একজন ভাল ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও না।'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'একার মতে হবে না। মিটিং কল করে, সকলের পরামর্শ নিয়ে করতে হবে। কোন ডাক্তার? অনেক ডাক্তার আছেন।'

'তাহলে কাল সকালে, চায়ের সময় মিটিং ডাকো।'

'তাহলে আজ রাতেই নোটিস দিতে হবে।'

'দিতে হবে তো দিয়ে এসো। আর ফেলে রাখা যায় না। ছেলেটার কষ্ট হচ্ছে।'

বাবা বলছিলেন, 'ছোটরা যত কাশে ততই ভাল। পেট বড় হয়। বেশি খেতে পারে। এই বয়সে যত খাবে ততই স্বাস্থ্য বাড়বে।'

'আর পেট বেড়ে দরকার নেই। তুমি কাজের কাজ করো।'

জ্যাঠামশাই ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। জ্যাঠাইমা বললেন, 'তোমার মাকে দিয়ে হবে না। নিরীহ, ভালমানুষ। ব্যাটাছেলেরা কিছু না করলে, এইবার আমাকেই চেঁচামেঁচি করে একটা কিছু করতে হবে। ডক্টর ভট্টাচার্য আমাকে খুব চেনেন। চেম্বারে নয়, সোজা বাড়িতে নিয়ে যাবো। তোমাকে একটা কায়দা শিখিয়ে দি, যখনই কাশি পাবে, একটা ভাল কিছু ভাববে। মনে করবে, তুমি একা একটা সমুদ্রে ভাসছ। ছোট্ট একটা নৌকো। ঘন কালো রাত। আকাশে ছড়িয়ে আছে খইয়ের মতো তারা। শুধু জল আর জল। ফসফরাস জ্বলছে ঢেউয়ের মাথায়। বহুদূরে একটা জাহাজ যাচ্ছে। কেবিনে কেবিনে পুটপুট আলো জ্বলছে। তোমার কাছে রেডিও সংকেত পাঠাবার একটা যন্ত্র। তুমি চেষ্টা করছ জাহাজের ক্যাপটেনের সঙ্গে যোগাযোগ করার। মাঝে মাঝে পারছ, মাঝে মাঝে কেটে যাচ্ছে। নৌকোটা তোমার দুলছে। ঢেউ ছিটকে আসছে। জাহাজটার সঙ্গে যোগাযোগ করতে না পারলে মহাবিপদ। চোখের সামনে দেখার চেষ্টা করবে সমুদ্র, আকাশ, তারা, জাহাজ, ঢেউ। গায়ে তোমার ঠাণ্ডা বাতাস লাগবে। এইটা যদি করতে পারো, তোমার কাশি থেমে যাবে। আরো একটা কায়দা আছে, মনে করো তুমি একটা মই বেয়ে ধাপে ধাপে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছ। নারকেল গাছের মাথা। মাথা ছাড়িয়ে আরো উঁচু। আরো আরো উঁচু। পৃথিবীর বাড়িঘর সব অদৃশ্য। মেঘের মধ্যে ঢুকে গেছ। মেঘ ছাড়িয়ে আকাশের আরো উঁচুতে। তারাগুলো ক্রমশই বড় হচ্ছে। চাঁদ ছাড়িয়ে উঠে যাচ্ছে আরো ওপরে। তুমি উঠছ, তুমি উঠছ। কি মজা! জানো তো এইভাবে ধ্যান করতে হয়। এতে মন ভাল হয়। মন একাগ্র হয়। লেখা-পড়া ভীষণ ভাল হয়। তুমি রাতে শুয়ে শুয়ে অভ্যাস করবে।'

জ্যাঠামশাই ঘরে এলেন, এসে বললেন, 'ঘরে ঘরে গিয়ে নোটিস জারি করে এলুম। সকাল সাড়ে সাতটায় মিটিং। তোমরা সব যোগ দেবে, উইদাউট ফেল।'

আমার পেল্লায় একটা হাই উঠল। জ্যাঠামশাই আমাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, 'ঘুম আসছে বাপী?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'এই ছেলেটা ভীষণ ভাল। কাশি একটু কম?'

'এখন আর হচ্ছে না।'

'তাহলে শোয়ার চেষ্টা করে দেখবে?'

'তাই দেখি।'

'গুড নাইট।'

'গুড নাইট। জ্যাঠাইমা গুড নাইট।'

'গুড নাইট সোনা।'

দাদুর ঘরের সামনে দিয়ে যেতে যেতে দেখলুম, দাবাবোড়ের ছক সাজিয়ে বসেছেন। বৃদ্ধ মানুষ, রাতে ঘুম আসে না, একা একা

# প্রশংসায় পঞ্চমুখ

মঞ্জুষার শাড়ি–"সকলই শোভন,
সকলই নবীন, সকলই বিমল" – **সুচিত্রা মিত্র**

[illegible] শুদ্ধ, লঘু শট বা যে কোন
[illegible]পে মঞ্জুষা পারফেক্ট – **অপর্ণা সেন**

নৃত্যের তালে তালে মঞ্জুষার শাড়ি
আমার নিত্যসঙ্গী – **মমতাশঙ্কর**

মঞ্জুষার শাড়িতে ভাষা, রুচি ও ছন্দের কি
অপূর্ব সমন্বয় – **মহাশ্বেতা দেবী**

মঞ্জুষার শাড়ি মানেই হাই ফার্স্ট ক্লাস – **ভারতী রায়**

**২০% রিবেট**

**২রা সেপ্টেম্বর হইতে**
**১৪ই অক্টোবর**

**পুজোর ভীড়ে নজর কাড়ে**

**মঞ্জুষা**

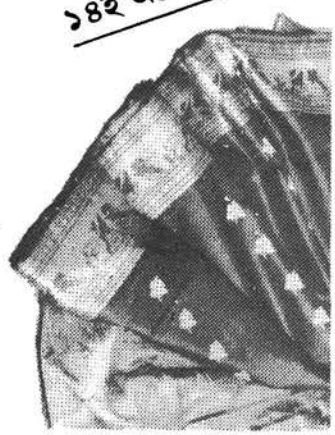

**পশ্চিমবঙ্গ হস্তশিল্প উন্নয়ন নিগম**
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা)
৭১, পার্ক স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০ ০১৬

**বিপণন কেন্দ্র :** লিন্ডসে স্ট্রীট, লেক মার্কেট, ঢাকুরিয়া, মানিকতলা, হাওড়া সাবওয়ে, কলকাতা এয়ারপোর্ট, বাঁকইপুর, গুসকরা, বনগাঁ, হলদিয়া, বোলপুর, বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, রায়গঞ্জ, মালদা, শিলিগুড়ি, বালুরঘাট, দার্জিলিং, সিউড়ি, শ্রীরামপুর, নিউদিল্লী, ব্যাঙ্গালোর, জয়পুর, মাদ্রাজ, বহরমপুর, পুরী, আসানসোল, বারাসত, বেহালা।

Printadex 91B

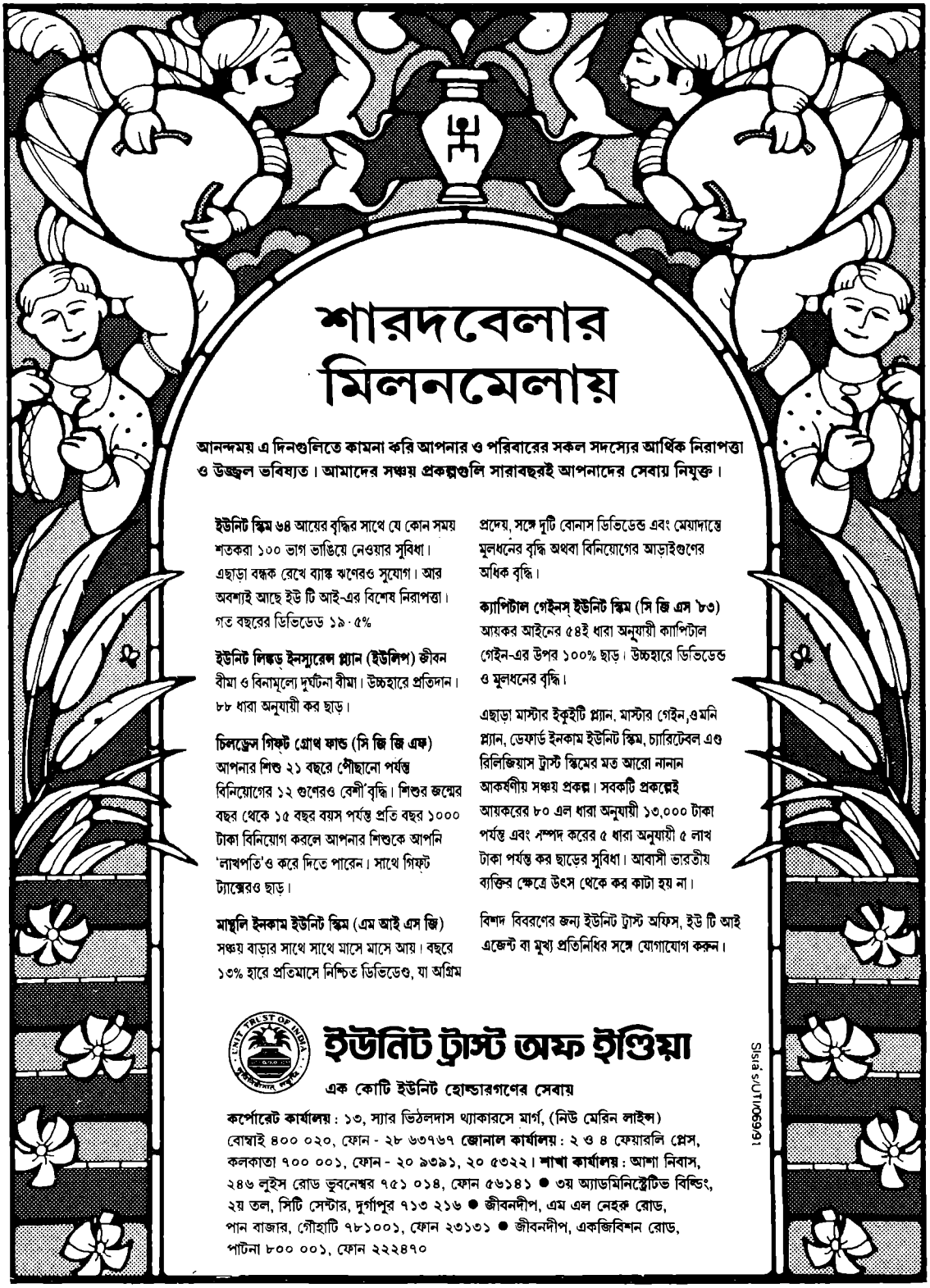

# শারদবেলার মিলনমেলায়

**আনন্দময় এ দিনগুলিতে কামনা করি আপনার ও পরিবারের সকল সদস্যের আর্থিক নিরাপত্তা ও উজ্জ্বল ভবিষ্যত। আমাদের সঞ্চয় প্রকল্পগুলি সারাবছরই আপনাদের সেবায় নিযুক্ত।**

**ইউনিট স্কিম ৬৪** আয়ের বৃদ্ধির সাথে যে কোন সময় শতকরা ১০০ ভাগ ভাঙিয়ে নেওয়ার সুবিধা। এছাড়া বন্ধক রেখে ব্যাঙ্ক ঋণেরও সুযোগ। আর অবশ্যই আছে ইউ টি আই-এর বিশেষ নিরাপত্তা। গত বছরের ডিভিডেন্ড ১৯·৫%

**ইউনিট লিঙ্কড্ ইন্স্যুরেন্স প্ল্যান (ইউলিপ)** জীবন বীমা ও বিনামূল্যে দুর্ঘটনা বীমা। উচ্চহারে প্রতিদান। ৮৮ ধারা অনুযায়ী কর ছাড়।

**চিলড্রেন্স গিফ্ট গ্রোথ ফান্ড (সি জি জি এফ)** আপনার শিশু ২১ বছরে পৌঁছানো পর্যন্ত বিনিয়োগের ১২ গুণেরও বেশী বৃদ্ধি। শিশুর জন্মের বছর থেকে ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত প্রতি বছর ১০০০ টাকা বিনিয়োগ করলে আপনার শিশুকে আপনি 'লাখপতি' ও করে দিতে পারেন। সাথে গিফ্ট ট্যাক্সেরও ছাড়।

**মান্থলি ইনকাম ইউনিট স্কিম (এম আই এস জি)** সঞ্চয় বাড়ার সাথে সাথে মাসে মাসে আয়। বছরে ১৩% হারে প্রতিমাসে নিশ্চিত ডিভিডেণ্ড, যা অগ্রিম প্রদেয়, সঙ্গে দুটি বোনাস ডিভিডেন্ড এবং মেয়াদান্তে মূলধনের বৃদ্ধি অথবা বিনিয়োগের আড়াইগুণের অধিক বৃদ্ধি।

**ক্যাপিটাল গেইনস্ ইউনিট স্কিম (সি জি এস ৮৩)** আয়কর আইনের ৫৪ই ধারা অনুযায়ী ক্যাপিটাল গেইন-এর উপর ১০০% ছাড়। উচ্চহারে ডিভিডেন্ড ও মূলধনের বৃদ্ধি।

এছাড়া মাস্টার ইকুইটি প্ল্যান, মাস্টার গেইন, ওমনি প্ল্যান, ডেফার্ড ইনকাম ইউনিট স্কিম, চ্যারিটেবল এণ্ড রিলিজিয়াস ট্রাস্ট স্কিমের মত আরো নানান আকর্ষণীয় সঞ্চয় প্রকল্প। সবকটি প্রকল্পেই আয়করের ৮০ এল ধারা অনুযায়ী ১৩,০০০ টাকা পর্যন্ত এবং সম্পদ করের ৫ ধারা অনুযায়ী ৫ লাখ টাকা পর্যন্ত কর ছাড়ের সুবিধা। আবাসী ভারতীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে উৎস থেকে কর কাটা হয় না।

বিশদ বিবরণের জন্য ইউনিট ট্রাস্ট অফিস, ইউ টি আই এজেন্ট বা মুখ্য প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

## ইউনিট ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়া

**এক কোটি ইউনিট হোল্ডারগণের সেবায়**

**কর্পোরেট কার্যালয়** : ১৩, স্যার ভিঠলদাস থ্যাকারসে মার্গ, (নিউ মেরিন লাইন্স) বোম্বাই ৪০০ ০২০, ফোন - ২৮ ৬৩৭৬৭ **জোনাল কার্যালয়** : ২ ও ৪ ফেয়ারলি প্লেস, কলকাতা ৭০০ ০০১, ফোন - ২০ ৯৩৯১, ২০ ৫৩২২। **শাখা কার্যালয়** : আশা নিবাস, ২৪৬ লুইস রোড ভুবনেশ্বর ৭৫১ ০১৪, ফোন ৫৬১৪১ ● ৩য় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিং, ২য় তল, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর ৭১৩ ২১৬ ● জীবনদীপ, এম এল নেহরু রোড, পান বাজার, গৌহাটি ৭৮১০০১, ফোন ২৩১৩১ ● জীবনদীপ, একজিবিশন রোড, পাটনা ৮০০ ০০১, ফোন ২২২৪৭০

Sisir s/UTI/069/91

জাগেন। ভোরের দিকে শুয়ে পড়েন। ঘণ্টাখানেকের ঘুম। বাবা টেবিলে। টেব্‌ল ল্যাম্প জ্বলছে। গণিতের মোটা বই খোলা। অঙ্ক তাঁর খেলা।

মায়ের পাশে আস্তে আস্তে শুয়ে পড়লুম। টেবিলের আলোটা এমনভাবে ঢাকা দেওয়া যাতে আমাদের চোখে না লাগে। বাবার সামনে মা আমাকে আদর করার সাহস পান না। বাবা বলে দিয়েছেন, ছেলেদের বেশি আদর দেবে না। বেশি আদরে সব আলালের ঘরের দুলাল তৈরি হয়। আদর মনে রাখবে।

বাবা অঙ্কে ডুবে আছেন। এই সুযোগে মা আমাকে একটু আদর করে নিলেন। মা আমাকে পাশ-বালিশের মতো জড়িয়ে ধরে শুতে ভীষণ ভালবাসেন। আর ওই সময়টায় মনে হয়, আমি যেন স্বর্গে আছি। আমার মা তো ভীষণ ভাল। জ্যাঠাইমা বলেন, 'ভগবান তোকে কোন মাটি দিয়ে তৈরি করেছিল রে উমা।' মায়ের বুকে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকার সময় মনে হয়, আমার কোনো ভয় নেই, দুঃখ নেই, কষ্ট নেই, কাশি নেই, মা ছাড়া পৃথিবীতে আমার কেউ নেই। মায়ের একটা নরম হাত আমার পিঠের ওপর দিয়ে ওপাশে চলে গেছে। ভারি একটা পা আমার কোমরে। আলতো একটা হাত আমার চুলে। মায়ের শরীর সব সময় বরফের মতো শীতল। গা দিয়ে হালকা একটা গোলাপের গন্ধ বেরোয়। জ্যাঠাইমা বলেন, সারাক্ষণ যাঁরা ভগবানে মন ফেলে রাখেন, তাঁদের চেহারায় একটা আলো ফোটে, শরীর পদ্মফুলের মতো নরম, ঠাণ্ডা হয়। সুবাস আসে।

মায়ের কোলের ভেতর আরামসে ঢুকে গিয়ে জ্যাঠাইমার শেখানো সেই ধ্যানটা অভ্যাস করতে লাগলুম। আমার মা যেন একটা সাদা, নরম, প্যাঁজা তুলোর মতো মেঘ। আমি সেই মেঘে শুয়ে আছি। মেঘটা ধীরে ধীরে আমাকে নিয়ে আকাশের দিকে উঠছে। ওপরে, আরো ওপরে। শেষে চলে এলুম চাঁদের কাছে।

হঠাৎ বাবা, অঙ্কের খাতা থেকে মুখ তুলে বললেন, 'কি হল আর কাশছে না কেন?'

আমি তখন চাঁদের পাহাড়ে। পাহাড়টা রুপোর। হীরের ফুল ফুটে আছে। দুধের ঝরনা। মা বলছেন, 'পেট খালি থাকলেই কাশি বাড়ে।'

বাবা বলছেন, 'অ্যাবসলিউটলি ভুল ধারণা, পেট ভরা থাকলে কাশি আরো বাড়ে।'

মা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। আমি আমার দু-আঙুল দিয়ে মায়ের পাতলা পাতলা ঠোঁট দুটো চেপে ধরলুম। মায়ের নাকে ছোট্ট একটা নোলক আছে। আমার দাদু পরিয়ে দিয়েছেন। পাতলা নাকে নোলক নাকি ভীষণ মানায়। দুর্গা ঠাকুরের নাকে নোলক আছে। সেই নোলকটা আমার আঙুল ছুঁয়ে আছে।

আমি কখন একসময় ঘুমিয়ে পড়লুম।

## ॥ তিন ॥

দাদু সকালে বেশ কিছুক্ষণ গীতাপাঠ করেন অপূর্ব ভরাট সুরে। মা দাদুর সঙ্গে হারমোনিয়াম বাজান। রাজস্থানী গালচে। সামনে বাগান থেকে তুলে আনা টাটকা কিছু ফুল সুন্দর একটা সাজিতে। দূরে ঘরের কোণে একটা ধূপ জ্বলছে। সামনের দেয়ালে শ্রীকৃষ্ণের ছবি। রথ চালাতে চালাতে অর্জুনের দিকে ফিরে তাকিয়ে কিছু বলছেন।

বাবা এই সময়টায় ভয়ঙ্কর ব্যায়াম করেন। দেখলেই ভয় করে। ডন মারছেন তো মারছেন। লাফা বৈঠক। আমি একদিন বাবার দেখাদেখি দুপুরে চেষ্টা করতে গিয়ে ঘাড়মুখ গুঁজড়ে অ্যায়সা উল্টে পড়েছিলুম, শব্দে মা আর জ্যাঠাইমা দুজনেই বোনা ফেলে ছুটে এসেছিলেন। ধরাধরি করে তুলে, জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথা থেকে পড়লে? ঘরে তো কিছুই নেই। জানলায় উঠেছিলে বুঝি!'

'বাবার মতো লাফা বৈঠক মারার চেষ্টা করেছিলুম।'

ব্যাপারটা কিন্তু বহুত সুন্দর, আর বাবা এত তাড়াতাড়ি মারেন, যেন ছবির মতো। এক লাফে সামনে অনেকটা এগিয়ে গিয়ে বসে পড়েন, আবার এক লাফে পেছনের জায়গায় এসে দাঁড়িয়ে পড়েন। কোনো সময় গোড়ালি মাটিতে ঠেকে না। শরীরটা সামনে একটু ঝুঁকে থাকে। বৈঠকের স্পিডও খুব সাংঘাতিক। পেণ্ডুলামের মতো যাচ্ছেন, আসছেন, আসছেন, যাচ্ছেন।

দুটো বিশাল মুগুর আছে। সব শেষে সেই মুগুর ভাঁজা। ঘেমে একেবারে নেয়ে যাবেন। সারা শরীরের গুলি ঠেলে ঠেলে উঠবে। বুকটা পাথরের মতো চওড়া হয়ে যাবে। তখন বাবার কাছে যেতে ভয় করে।

জ্যাঠামশাই এই সময়টা সবচেয়ে ভাল কাটান, আমার মতে। ধবধবে সাদা একটা ধুতি দুভাঁজ করে পরা। দুধের মতো সাদা হাতঅলা গেঞ্জি। নিচের বাগানে বিশাল এক বাঁধানো চৌবাচ্চা। ভর্তি জল, টলটল করছে। সেই জলে অসংখ্য মাছ। জ্যাঠামশাই একটা একটা করে মুড়ি ফেলছেন। এক একটা মাছ লাফিয়ে উঠে কপাক কপাক করে খাচ্ছে। কখনো এক মুঠো ফেলছেন, মাছের ঝাঁক তেড়ে আসছে। গাছের ডালে পাখি। নানারকম। দোয়েল, বুলবুলি, শালিক, গাংশালিক, ছাতারে, টুনটুনি, চড়াই। তাদের জন্যেও ব্যবস্থা আছে। মুঠো মুঠো ডাল। জ্যাঠামশাই একবার পাখিদের দিচ্ছেন, একবার মাছেদের। আমি সবসময় জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গী।

জ্যাঠাইমা এই সময় ব্যস্ত থাকেন চায়ের পাট নিয়ে। খুব ভোরে তাঁর স্নান হয়ে যায়। মা জগদ্ধাত্রীর মতো জ্বলজ্বল করে তাঁর মুখ। পরিষ্কার শাড়ি। কুচকুচে কালো চুল। দাদু চায়ের ব্যাপারে ভয়ঙ্কর খুঁতখুঁতে। জ্যাঠাইমা চা না করলে তিনি খেতে পারেন না। একটু খেয়েই ফেলে দেন। জ্যাঠাইমার একেবারে ঘড়ি ধরা সময়। ঠিক সাতটা বাজল। জ্যাঠাইমা দোতলার বারান্দা থেকে ডাকলেন, 'সব চলে এসো। চা হয়ে গেছে।'

জ্যাঠামশাই সব মুড়ি একবারে চৌবাচ্চায় ফেলে দিলেন, ডালগুলো ছড়িয়ে দিলেন মাটিতে। দিয়ে বললেন, 'চলো চলো, মিটিং অ্যাটেণ্ড করতে হবে।'

'আমার যে মাস্টারমশাই আসবেন।'

'আরে কতক্ষণের ব্যাপার। মাস্টারমশাইকেও আমরা মিটিং-এ নিয়ে নোবো। তাঁর মতামতেরও দাম আছে। তিনি তোমার শিক্ষক। প্রবীণ মানুষ।'

ঠিক সাড়ে সাতটার সময় শুরু হল। বাইরের ঘর একেবারে জমজমাট। দাদুর পাশে আমার মাস্টারমশাই। উল্টোদিকে পাশাপাশি, বাবা আর জ্যাঠামশাই। বাঁ দিকে মা আর জ্যাঠাইমা। ডানদিকে আমি একা পড়ে গেছি। ভয় ভয় করছে। অস্বস্তি লাগছে। হঠাৎ যদি সবাই বলেন, 'একে হাসপাতালে ভর্তি করে দাও। টনসিল অপারেশান।'

দাদু বললেন, 'কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে সাতটা। লেট আস বিগিন। শঙ্করবাবু....।'

শঙ্করবাবু আমার মাস্টারমশাইয়ের নাম। ভয়ঙ্কর রাশভারি মানুষ। গম্ভীর গলা। তেমনি পণ্ডিত।

দাদু বলছেন, 'শঙ্করবাবু, আমাদের প্রধান সমস্যা হল কাশি। কাশি কমছে না।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'কার কাশি?'

'আপনার ছাত্রের।'

'ছোটদের কাশি-সর্দি হতেই পারে। তার জন্যে এত চিন্তার কি আছে!'

বাবা বললেন, 'কাশি সমস্ত ভদ্রতার সীমা লঙ্ঘন করে যাচ্ছে। ও তো আর কথা বলারই সুযোগ পাচ্ছে না, শুধু কেশেই যাচ্ছে। ওর জন্যে তো তাহলে নতুন ভাষা তৈরি করতে হবে, কাশির ভাষা, পাখির ভাষার মতো।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'এই তো এতক্ষণ বসে আছে, একবারও কেশেছে?'

সবাই হাঁ করে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। আমি যেন এক বীর। না কেশে ফার্স্ট হয়েছি। সোনার মেডেল পেয়েছি। বাবা বললেন, 'সত্যিই তো, তখন থেকে বসে আছে, খুক্‌খুক্, খ্যাঁকখ্যাঁক কিছুই নেই। কি করে এমন হল?'

মাস্টারমশাই বললেন, 'বুঝতে পারলেন না। সাইকোলজিক্যাল কারণ। যখন নিজেতে নিজে থাকে মনটা চলে যায় কাশিতে। কাশি হল গলার ইরিটেশান। সেই জায়গাটা উত্তেজিত হয়। আর ও যখন দেহের বাইরে নিজেকে ভুলে থাকে তখন কাশি হয় না। এটা নার্ভের ব্যাপার।'

বাবা বললেন, 'তাহলে ও বাইরেই থাক না।'

জ্যাঠামশাই মনে হয় একটু অন্যমনস্ক ছিলেন, চমকে উঠে বললেন, 'বাইরে থাকবে কি? এই রোদে রাস্তায় রাস্তায় কোথায় ঘুরবে!'

বাবা বললেন, 'ঠিক এইরকম। তোমার দেহটা এইখানে, মনটা অন্য জায়গায়, আগের কথা কিছুই শোনোনি। সত্যি কথা বলবে, একটু আগে তুমি কোথায় ছিলে?'

'নাটাগড়ের একটা পুকুরের ধারে।'

'সেখানে কি করতে গিয়েছিলে?'

'মাছ ধরতে।'

'ঠিক সেইরকমের বাইরে থাকা। মনটাকে দেহের বাইরে বেড়াতে পাঠিয়ে দেওয়া।'

জ্যাঠাইমা বললেন, 'কাল ওকে আমি সেই কায়দাটা শিখিয়ে দিয়েছি। মনটাকে বেড়াতে পাঠিয়ে দেওয়া।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'ওয়েল ডান।'

দাদু বললেন, 'তাহলে তো হয়েই গেল। কাশি তো ওকে সাধনার দিকে নিয়ে যাবে।'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'ওকে একবার জিজ্ঞেস করা যাক। আমি তো নাটাগড়ে বেড়াতে গিয়েছিলুম, ও তখন থেকে কোথায় গেছে।' জ্যাঠামশাই দু'বার তালি বাজিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এই যে তুমি কোথায় আছো!'

আমি বললুম, 'তখন থেকে আমি এখানেই আছি।'

বাবা প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে কাশছ না কেন?'

'আজ্ঞে, মাস্টারমশাইয়ের ভয়ে। উনি কাল যে টাস্ক দিয়েছিলেন তার একটাও হয়নি।'

বাবা আঁতকে উঠলেন, 'টাস্ক করোনি? কি সর্বনাশ! কাল সারাদিন তাহলে কি করলে? মোস্ট ডিসগ্রেসফুল। অফুরন্ত ফাঁকি। এই ভাবে তো কেরিয়ারটাই জখম হয়ে যাবে। আজ বাদে কাল কাশি ভাল হয়ে যাবে; কিন্তু জীবন

গঠনের জন্যে সময় তো বসে থাকবে না। দুপুরবেলা এর দায়িত্বে কে আছে? কাম ফরোয়ার্ড।'

জ্যাঠাইমা বললেন, 'আমি আছি।'

বাবা একটু সমীহ হলেন। জ্যাঠাইমাকে ভয়. শ্রদ্ধা দুটোই করেন। বেশ নরম গলায় বললেন, 'একটা দুপুর যে নষ্ট হয়ে গেলো বউদি! অমূল্য একটা দুপুর!'

'নষ্ট তো হয়নি ঠাকুরপো। তুমি যে টাস্ক দিয়েছিলে, সেই টাস্ক করতে করতেই সন্ধ্যে। ছেলে তো একটাই ঠাকুরপো!'

'মাস্টারমশাই দিয়েছেন জানলে আমি দিতুম না। আমারটা না করলেই হত।'

জ্যাঠাইমা বললেন,'তাহলে কুরুক্ষেত্র হত।'

মাস্টারমশাই মৃদু হেসে বললেন, 'আপনারা কি আমার ওপর বিশ্বাস হারিয়েছেন?'

বাবা বললেন, 'না, না, তা কেন, তা কেন?'

'তাহলে আপনি কেন টাস্ক দিচ্ছেন? আমি তো একটা লাইন ধরে চলেছি, একটা মেথড। আমার পরিশ্রমের তো তাহলে কোনো মানে হয় না। এ তো আমার ইনসাল্ট! আমি আর পড়াব কি না, আমাকে ভাবতে হচ্ছে।'

মাস্টারমশাইয়ের কথায় সকলের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। দাদু হঠাৎ হাসতে হাসতে বললেন, 'মাস্টারমশাই, আপনাকে আমরা ভয়ঙ্কর শ্রদ্ধা করি। পরিবারেরই একজন ভাবি। আপনি জিনিসটাকে ওই ভাবে নেবেন না। না জেনে হয়ে গেছে। যেমন ভুল করে চায়ে দুবার চিনি, বা মনে করুন আমার দুই বউমা রান্নাঘরে। ডাল ফুটছে, এ একবার এক খাবলা নুন দিলে, ও আবার আর এক খাবলা। উদ্দেশ্য কারোরই অসৎ নয়। সবাই ভাল করারই চেষ্টা করছেন। একজন আর একজনকে সাহায্যই করতে চাইছেন।'

জ্যাঠাইমা বললেন, 'আপনাদের অনুমতি নিয়েই বলছি, টাস্কের ধরনটা সেই একই, অঙ্ক, ইংরেজি থেকে বাংলা, বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদ, জ্যামিতির একস্ট্রা।'

দাদু বললেন, 'আহা, তাই তো হবে! ভাত, ডাল, তরকারি, তরকারি, ডাল, ভাত এই তো আমাদের পথ্য। মাস্টারমশাই, আপনি তাহলে প্রশান্ত চিত্তে মার্জনা করে দিন।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'দিলুম।'

দাদু বললেন, 'তাহলে আমরা পূর্ব বিষয়ে ফিরে যাই, কাশিতে।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'কেন অকারণ কালহরণ করছেন, এতক্ষণ ছেলেটাকে পড়ালে কাজ হত।'

দাদু বললেন, 'আর পাঁচটা মিনিট। প্রসঙ্গটা যখন উঠেছে, তখন আপনার উপস্থিতিতে একটা সমাধান করে ফেলা যাক। ব্যাপারটা যখন নার্ভের, মানে মনস্তাত্ত্বিক কারণ, তখন সেইরকম কোনো ডাক্তারের পরামর্শ নিলে কেমন হয়।'

বাবা বললেন, 'মানে কোনো পাগলের ডাক্তার? এটা কি তাহলে পাগলের কাশি। শব্দটা করে কিন্তু ছাগলের মতো।'

মাস্টারমশাই গম্ভীর মুখে বললেন, 'পাগল কখনো কাশে না। পাগলদের কখনো কোনো অসুখ করে না, কারণ তারা অবোধ। বিশ্বাস করুন, আমার আর কাশি কাশি ভাল লাগছে না। পাগল ও নয়, পাগল আপনারা।'

দাদু বললেন, 'সংসারে একটিমাত্র ছেলে তো, তাই সবাই একটু বেশি উতলা হয়ে পড়ি।'

মাস্টারমশাই বললেন, 'একটা কথা বলি মুকুজ্যেমশাই, বেশি মনোযোগ দেবেন না। ছেলেকে একটু হেলাফেলা করে মানুষ করাই ভাল। তাতে ভবিষ্যৎ ভাল হয়। আজ আপনারা ঘিরে আছেন, কাল যখন আপনারা থাকবেন না! কেউই চিরকাল থাকবে না। জগৎ-সংসারের নিয়ম আগে এলে আগে যেতে হবে, পরে এলে পরে। যাই হোক আমি এক কথায় সব সমাধান করে দিচ্ছি, ওকে আমি ডক্টর মজুমদারের কাছে নিয়ে যাচ্ছি। শিক্ষার দায়িত্ব যখন আমার, স্বাস্থ্যের দায়িত্বও আমার।'

বাবা বললেন, 'পারফেক্ট সলিউশান।'

জ্যাঠামশাই বললেন, 'আমি বলেছিলুম, মাস্টারমশাই ঠিকই একটা রাস্তা বের করবেন।'

জ্যাঠাইমা বললেন, 'সকাল থেকেই আজ বেশ উত্তরে বাতাস ছেড়েছে, গলায় কি একটা মাফলার জড়িয়ে দেবো?'

মাস্টারমশাই বললেন, 'হ্যাঁ, হঠাৎ একটু ঠাণ্ডা পড়েছে, সাবধান হওয়াই ভালো।'

গলায় মাফলার জড়ালে ভীষণ বোকা বোকা লাগে। তবু জড়াতেই হল। গুরুজনের আদেশ।

**॥ চার ॥**

মাস্টারমশাইকে দেখেই ডাক্তারবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। গলায় স্টেথিসকোপ। ঘরভর্তি রোগী। কেউ কোঁত পাড়ছেন। একজন অনবরত হেঁচেই চলেছেন। আমার কাশিরোগের মতো তাঁর হাঁচি রোগ। ডাক্তারবাবুকে খুব সুন্দর দেখতে।

ডাক্তারবাবু বললেন, 'বলুন, মাস্টারমশাই। কার অসুখ?'

'এই ছেলেটাকে দেখতে হবে। আমার খুব প্রিয় ছাত্র। মুকুজ্যেমশাইয়ের নাতি। কাশি হয়েছে। কিছুতেই কমছে না।'

'আপনি পাশের ঘরে বসুন মাস্টারমশাই, আমি এখনি আসছি।'

পাশের ঘরটা খুবই সুন্দর। বেশ সাজানো। দেয়ালে মানুষের দেহের ভেতরের ছবি। আমাদের দেহের ভেতরটা বিশ্রী দেখতে। ঘেন্না করে। পেশি, শিরা-উপশিরা। দেখলেই ভয় করে। মাস্টারমশাই টেবিল থেকে একটা ম্যাগাজিন তুলে নিলেন। আর দেখতে দেখতে তলিয়ে গেলেন। আমি ছবি দেখছি। বাচ্চা ছেলে হাসছে। মায়ের কোলে ছেলে। বসে আছি। বসেই আছি। ঘরে একটা ঘড়ি। প্রায় একঘণ্টা পার হয়ে গেল। মাস্টারমশাই তন্ময় হয়ে পাতার পর পাতা উল্টেই যাচ্ছেন। গলায় আমার সাতপাট মাফলার। গরমে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। দেড়ঘণ্টা হয়ে গেল। শেষে ভয়ে ভয়ে মাস্টারমশাইকে বললুম, 'দেড়ঘণ্টা হয়ে গেল।'

পড়ায় ডুবে আছেন, বললেন, 'হুঁ।'

আরো পনের মিনিট পার হয়ে গেল, বললুম, 'মাস্টারমশাই, দু'ঘণ্টা যে হয়ে গেল!' এইবার চমকে উঠলেন, কারণ যে-প্রবন্ধটা পড়ছিলেন, সেটা শেষ। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সে কি দু'ঘণ্টা হয়ে গেল! আশ্চর্য! চলো দেখি।'

পাশের রোগী দেখার ঘর একেবারে খালি। কেউ কোথাও নেই। পরিষ্কার সাজানো টেবিল। যেন ভোজবাজি। যাদুদণ্ড ঘুরিয়ে সব অদৃশ্য করে দিয়েছেন কোনো যাদুকর! মাস্টারমশাই বললেন, 'কি হলো ব্যাপারটা।' ওপাশে আরো একটা ঘর। সেই ঘরে কম্পাউণ্ডারবাবু ওষুধ তৈরি করেন। আমাদের

গলা শুনে তিনি বেরিয়ে এলেন। মাস্টারমশাই প্রশ্ন করলেন, 'আমাদের বসতে বলে কোথায় চলে গেল!'

কম্পাউণ্ডারবাবু বললেন, 'আপনারা বসেছিলেন পাশের ঘরে? ডাক্তারবাবু তো চেম্বার শেষ করে জরুরি কলে বেরিয়ে গেলেন।'

'কখন ফিরবে?'

'তা তিনটে চারটে তো হবেই। অনেক কল আজ। আজকাল ওঁর ভীষণ ভুলোমন হয়েছে।'

'ডাক্তারের ভুলোমন হলে তো রোগীদের সমূহ বিপদ।'

'আজ্ঞে, অল্প-বিস্তর বিপদ যে হচ্ছে না তাই বা বলি কেমন করে!'

মাস্টারমশাই আমার কাঁধে হাত রেখে সোজা রাস্তায় বেরিয়ে এসে বললেন, 'জগৎটা কেমন মৌখিক, আন্তরিকতা-শূন্য, কমার্শিয়াল হয়ে যাচ্ছে দেখেছো! সবাই যেন সেলসম্যান। সবই যেন কথার কথা। আমার সবচেয়ে প্রিয় ছাত্রের ব্যবহার দেখে অবাক। কখনো আর এর কাছে আসব না। পসার হয়েছে, পয়সা হয়েছে। চলো, আমরা ক্যাপ্টেন মজুমদারের কাছে যাই। আমার সমবয়সী বন্ধু।'

ক্যাপটেন মজুমদারের একখানা চেহারা বটে। আর্মিতে ছিলেন বোঝাই যায়। ক্রু-কাট চুল। সে আবার কি! জ্যাঠামশাই চুল কাটার সময় নানা ছাঁটের কথা বলেন। আমি শুনে শিখেছি। মাথার চারপাশ হোলসেল কামানো। মাঝখানে একেবারে টুথব্রাশ। দেখলে হাসিই পায়। ইচ্ছে করে নিজের মাথাটাকে কেউ এমন করে! কিন্তু করে। ক্যাপ্টেন মজুমদারের গোঁফ জোড়াও সেইরকম। এপাশে, ওপাশে দুপাশে শুঁড়ের মতো বেরিয়ে আছে। লোহার মতো পেটানো শরীর।

'মাস্টারমশাই আপনি?' বললেন,. যেন বোমা ফাটল।

মাস্টারমশাই বললেন, 'হ্যাঁ আমি। কোনো অসুবিধে আছে?'

'না, অসুবিধে কিসের? তবে আপনার তো কখনো অসুখ করে না!'

'করেও নি। অসুখ করেছে আমার এই ছাত্রটির।'

'দেখেই বুঝেছি। অসুখের ডিপো। ওই কয়লার ডিপো, কেরোসিনের ডিপোর মতো। ওর তো টনসিল! পুরোপুরি টনসিলের চেহারা। নার্ভেরও গোলমাল আছে।'

'টনসিলটা হয়তো ঠিক বলেছ, এইটুকু ছেলের আবার নার্ভ কি?'

'জিজ্ঞেস করুন, ও ভীষণ নার্ভাস। খোকা, তুমি আরশোলা দেখলে দৌড়োও না?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, একবার এমন দৌড়েছিলুম বারান্দা থেকে বেরিয়ে চলে গিয়েছিলুম আমাদের একতলার কলঘরের ছাতে।'

'আহা বেরিয়ে কেন বলছ? বলো রেলিং ভেঙে।'

'আজ্ঞে, তাই হয় তো হবে।'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'মাস্টারমশাই আপনার এই ছাত্রটি বড় উকিল হবে।'

'আমারও সেইরকমই ধারণা। এই বয়সেই যে-সব প্যাঁচ মারে, সাঙ্ঘাতিক। আমিই হেরে যাই। আচ্ছা! তুমি এইবার দেখো। আমার সময় খুব কম।'

ডাক্তারবাবু ডাকলেন আমাকে, 'কাছে এসো, হাতের নাগালের মধ্যে এসো।'

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলুম। একটানে আমার মাফলারটা খুলে ফেললেন, 'এসব কি জড়িয়ে বসে আছ? ছাগল না কি!'

কলার মতো মোটা মোটা আঙুল দিয়ে, নিচের চোয়ালে গলার কাছে খোঁচা মারতে লাগলেন আর প্রশ্ন করলেন, 'লাগে, লাগে?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'লাগবেই তো। লাগার জন্যেই তো খোঁচাচ্ছি। বেশ ভালই। গ্ল্যাণ্ডের আড়ত। করেছ কি? এই বয়সেই এত, বুড়ো বয়েসে তো মা কালীর মুণ্ডমালার মতো হবে। ইশ্ শরীরটাকে একেবারে ড্যামেজ করে ফেলেছ হে। দেখি হাঁ করো। অমন পুঁচকে হাঁ নয়, জলহস্তীর মতো।'

তাই করলুম। ভাগ্যিস চিড়িয়াখানায় জলহস্তী দেখা ছিল!

ডাক্তারবাবু বললেন, 'গুড, ভেরি গুড। আ করো। সা আ।'

'সা আ।'

'আরো জোরে সা আ।'

'সা আ।'

'আরে বাপরে! গলার দু'পাশে দুটো ভোজপুরী দারোয়ান। যাও বোসো।'

চেয়ারে বসলুম। সা আ করতে বেশ মজা লাগছিল। মনে হচ্ছিল, আবার করি। অনবরত করি।

মাস্টারমশাই বললেন, 'উপায়?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'কিছু না। একমাত্র উপায় ছুরি। ধরো আর কচাত করে কেটে ফেলে দাও।'

'কাটাকাটি চলবে না। অন্য কিছু ভাবো।'

'অন্য কিছু ভাবার নেই মাস্টারমশাই।'

'আমি সেদিন একটা মেডিকেল জার্নালে পড়লুম, টনসিল হল গলার প্রহরী। তারও প্রয়োজন আছে। জার্মস আটকায়, কাটাটা ঠিক নয়। শরীরের ক্ষতি হয়। অন্য অসুখের আক্রমণ বাড়ে। বিদেশে আর কথায় কথায় টনসিল কাটে না।'

'ঠিক বলেছেন মাস্টারমশাই। তবে সেপ্টিক টনসিল থেকে চোখ খারাপ হতে পারে, বাত হতে পারে। আপাতত একটা কাজ করি, একটা লোশান তৈরি করে দি। সকাল সন্ধ্যে তুলি দিয়ে লাগাক। আর একটা বলি যোগাসনে অনেক সময় উপকার হয়। আর হয় সাঁতারে। টনসিলের আর একটা মজা হল বয়েস বাড়লে সেরে যায়।'

ওষুধের শিশিটা নিয়ে আমরা বেরিয়ে এলুম। মাস্টারমশাই বললেন, 'মিলিটারি ডাক্তার তো, ছোরাছুরি ছাড়া আর কিছু ভাবতেই পারে না। তোমাকে আমি আসন করাবো আর সাঁতার কাটা শেখাবো।'

বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে মাস্টারমশাই চলে গেলেন। মা বললেন, 'ছেলেবেলায় আমার খুব কাশির ধাত ছিল।'

জ্যাঠাইমা বললেন, 'তোর কি ছিল না উমা! কাশির ধাত, পেট খারাপের ধাত, স্বপ্ন দেখার ধাত। সব তোর ছেলে পেয়েছে।'

মা বললেন, 'যাদের টনসিল থাকে তারা গাইয়ে হয়। শিল্পী হয়।'

সেই কারণেই ডাক্তারবাবু আমাকে সা আ, সা আ করালেন। ওই করতে করতেই গাইয়ে হয়ে যাবো। ডাক্তারবাবুর দেওয়া সেই লোশানটার রঙ লালচে। আমার মা আমার মতোই ছেলেমানুষ। কোনো কিছুতেই তর সয় না। সঙ্গে সঙ্গে কাঠির মাথায় জড়ানো হয়ে গেল তুলো, তৈরি হয়ে গেল তুলি। বারান্দার চড়চড়ে রোদের আলোয় টেনে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'হাঁ কর।'

জ্যাঠাইমা বললেন, 'উমা, কাশি এখন কম আছে। এখনই কেন থ্রোট পেন্ট লাগাচ্ছিস!'

'লাগিয়ে দেখি না কি হয়!'

যা হল সে আর বলার নয়। গলায় ওষুধ লাগানো তুলি ঢোকা মাত্রই, মা বোধহয় একবার বুলিয়েছেন, পেটে যা ছিল সব ঠেলে উঠতে চাইল মুখে। কোনো রকমে সামলে বসে পড়লুম। মা তুলি ফেলে দৌড়। জ্যাঠাইমা বললেন, 'কি হল রে উমা!'

মা বললেন, 'খুব বাঁচা বেঁচে গেছি! কি রকম একটা শব্দ করে কামড়াতে আসছিল ভাই।'

জ্যাঠাইমা সুন্দর গান গাইতে পারেন। গান ধরলেন,

একদা এক বাঘের গলায়
হাড় ফুটিয়াছিল
এমন সময় বাঘামামা
বার করলে তার বুদ্ধির ধামা
শেষে কোস্তাকুস্তি ধস্তাধস্তি
প্যাঁ অ্যাঁক করে হাড় বেরিয়ে গেল॥

বাড়িতে যখন পুরুষরা কেউ থাকেন না, দুই বোনের খুব মজা। কোরাসে গান। মাঝে মাঝে নাচ। চোর চোর খেলা। সব ছেড়ে বাগানে গিয়ে পিকনিক। গাছে গাছে কাপড় বেঁধে তাঁবু তৈরি করে স্টোভ জ্বেলে টুকটাক কিছু রান্না। আলুর দম, আলুকাবলি, ছোলার ঘুগনি, ছোটো ছোটো ফুলকো লুচি। কখনো শুধুই ঝালঝাল ডাঁটা চচ্চড়ি। খাওয়াটা বড় কথা নয়, বড় হল পরিবেশ। গাছ, পাখি, লতা, ঝুমকো ফুল, ঘাস। মাটির সঙ্গে সমান সমান বাঁধানো বড় চৌবাচ্চা, সেই চৌবাচ্চায় পদ্মফুল করেছেন বাবা।

চারপাশে বেঁচে থাকার এত আনন্দ! তার মাঝে একটুই নিরানন্দ, যত রাত বাড়ে, ততই বাড়ে আমার কাশি।

## ॥পাঁচ॥

আমাদের স্কুলের প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশান। খুব ঘটা করে হয়। বিশাল প্যাণ্ডেল। এককালের বিখ্যাত জমিদার, পরে মন্ত্রী, রায়চৌধুরী মশাই সভাপতি। সাঙ্ঘাতিক ভারিক্কি চেহারা। চওড়া গোঁপ। মাঝখানে সিঁথে। দু'পাশে দু'ভাগ করা চুল। ফিনফিনে খদ্দরের পাঞ্জাবি। চওড়া পাড় কোঁচানো ধুতি। চোখে চশমা। কথা খুব কম বলেন। দেখলেই ভয় করে। বিশাল সভা। অভিভাবক, ছাত্র, প্রাক্তন ছাত্র, গিজগিজ করছে চারপাশ। হেডমাস্টারমশাই তাল রাখতে পারছেন না। এদিক ছুটছেন, ওদিক ছুটছেন। স্কুলের সেক্রেটারি বিখ্যাত ব্যারিস্টার। অন্যদিন সায়েবী পোশাক, অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিপাট বাঙালী। মঞ্চে সভাপতির পাশে বসে আছেন। মেজাজের লড়াই চলেছে। কে কতটা গম্ভীর হতে পারেন, তার প্রতিযোগিতা। টেবিলের দু'পাশে দুটো বিশাল ফুলদানি। থেকে থেকেই উল্টে যাওয়ার চেষ্টা করছে। সভাস্থ সকলে গেল, গেল করে উঠছেন। গেম টিচার নরেশবাবু শেষ মুহূর্তে বাঁচিয়ে দিচ্ছেন প্রতিবারই।

ব্যারিস্টার সেক্রেটারি এক সময় বলেই ফেললেন, 'টপ হেভি।'

জমিদার মশাই মানবেন কেন। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'বটম লাইট।'

অঙ্কের স্যার পাশেই ছিলেন, বললেন, 'দুটোই এক।'

অঙ্কের শিক্ষক কুমুদবাবুও রাশভারি মানুষ। তেমনি অহঙ্কার। পৃথিবীর যত অঙ্ক সব মুখে মুখে কষে ফেলতে পারেন। তাঁর চোখে আমরা ছাত্ররা সব দ্বিপদ গাধা। মাঝে মাঝে দুঃখ করে বলেন, 'তোদের বাপমায়ের কথা ভেবে আমার চোখ ফেটে জল আসে। তাঁরা হয়তো তোদের মানুষ ভেবেই খাওয়াচ্ছেন, পরাচ্ছেন। ছেলে আমার বিলেত যাবে। এদিকে দুই আর দুয়ে কত? চুলকে চুলকে মাথার সব চুল উঠে গেল।'

আমাদের যে-ভাবে প্রায়ই ঘাড় ধরে ক্লাস থেকে বের করে দেন, সেই ভাবে দু'হাতে ফুলদানিদুটোর গলা ধরে টেবিল থেকে নামিয়ে দিলেন। সভায় হাততালি পড়ে গেল। অভিভাবকরা বলে উঠলেন, 'ওয়েল ডান, ওয়েল ডান।'

সামনের সারিতে নিচু ক্লাসের ছেলেরা, তারা হোও করে উঠতেই, পণ্ডিতমশাই ঠাই ঠাশ, ঠাই ঠাশ করে পালের গোদাদের পিটিয়ে দিলেন। সবাই অমনি চিৎকার করলেন, 'পিস, পিস। শান্তি, শান্তি।'

হেডমাস্টারমশাই উইংসের কাছে গিয়ে কাকে বললেন, 'ঘাড় ধরে ওটাকে একেবারে বাইরে বের করে দিয়ে এসো। সব কটা বাঁদরকে গঙ্গার জলে ফেলে দিয়ে এসো। সব লুচি আলুর দম চুরি করে মেরে দিলে। আমার এত আর্টিস্ট, তাদের মুখে আমি কি দোবো! আমার স্কুলটা চোরে ভরে গেল। স্কুলের বদলে এইবার এটাকে থানা করে দিলেই হয়। আমি হেডমাস্টার না, থানার বড় দারোগা!'

উইংসের কাছ থেকে মাইকের সামনে সরে এলেন। হাতে একটা কাগজ। মাইকের সামনে বার কতক টুসকি মারলেন। মেরেই বললেন, 'ভল্যুম, ভল্যুম।'

সঙ্গে সঙ্গে সামনের আসনের এক গাদা কুঁচো চিৎকার করে উঠল, 'ভল্যুম, ভল্যুম।'

পণ্ডিতমশাই তেড়ে এলেন, 'অ্যায়, চপ্ চপ্।'

এক ডেঁপো কোথা থেকে বলে উঠল, 'কোথায় আলুর চপ স্যার।'

প্রেসিডেন্ট রায়চৌধুরী, ব্যঙ্গের হাসি হেসে হেডমাস্টারমশাইকে বললেন, 'আপনার স্কুলের ডিসিপ্লিন একেবারে ভেঙে পড়েছে। আর কোনোমতেই স্কুল বলা যায় না। মোর এ গাব্বা হাউস, দ্যান এ স্কুল।'

লজ্জায়, অপমানে হেডমাস্টারমশাইয়ের মুখ একেবারে লাল হয়ে গেল।

ব্যারিস্টার সেক্রেটারি বললেন, 'ভালমানুষের যুগ শেষ হয়ে গেছে। আমাদের হেডমাস্টার, আওয়ার হেডমাস্টার ইজ এ সেন্ট্‌লি ম্যান। ওঁর স্থান হওয়া উচিত আশ্রমে। আমাদের এখানে টেগার্ট সায়েবের মতো জাঁদরেল একজন মানুষ দরকার।'

হেডমাস্টারমশাই আর কোনো কথায় কান না দিয়ে ঘোষণা শুরু করলেন। সকলকে স্বাগত জানালেন। রায়চৌধুরী মশাই ও অন্যান্য মহামান্য, অভিভাবক ও প্রিয় ছাত্ররা সমবেত হয়েছেন, এর জন্যে প্রধান শিক্ষক হিসেবে তিনি সকলের কাছে অসীম কৃতজ্ঞ।

এখন উদ্বোধন সংগীত। নবম শ্রেণীর ছাত্ররা পরিবেশন করবে।

প্যাঁক্ করে বেজে উঠল হারমোনিয়াম। হারমোনিয়ামের বেলোতে ছেঁদা। অনেকবার ভটাস ভটাস করে বেলো করলে, তবেই প্যাঁক করে একবার শব্দ বেরোয়; যেন হাঁসের পেট টেপা হল। ক্লাস নাইনের পরেশ অনেকক্ষণ প্যাঁক প্যাঁক করছে, গান আর ধরছে না।

তখন পেছনের আসন থেকে কে একজন হাঁক মারল, 'অনেকক্ষণ প্যাঁক প্যাঁক করছ এইবার ডিমটা পেড়ে ফেল।'

সঙ্গে সঙ্গে তুমুল হাসি।

সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার, 'সাইলেন্স, সাইলেনস্। চুপ্, একদম চুপ।'

পরেশ গলা সাধা শুরু করল, সা, রে, গা, মা-

হেডমাস্টারমশাই আর পারলেন না, অবাক হয়ে বললেন, 'হোয়াট ইজ দিশ। এটা কি হচ্ছে?'

আমাদের সঙ্গীতশিক্ষক নিত্যানন্দবাবু পাশেই ছিলেন, তিনি বললেন, 'গলাটা একটু চৌরস করে নিক স্যার, তা না হলে চড়ার দিকে দেবে যাবে।'

প্রেসিডেন্ট মশাই বললেন, 'গলা কি রাস্তা! রোলার চালাতে হবে!'

পরেশ কালবিলম্ব না করে ধরে ফেলল। যেন পড়ে যাচ্ছিল খপ করে কার্নিস ধরে ফেলেছে।

অ্যায় আগুনের পরোশমণি ছুঁয়াও প্রাণে
অ্যা জীবোন পূর্ণ করো দহোন-দানে॥
আমার এই দেহখানি তুলে ধরো

প্রেসিডেন্ট সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ঘুষি পাকিয়ে বললেন, 'রামাধর ইসকো উঠাকে বাহার ফেকদো। গান গাইছে গান! উদ্বোধন না উদ্বন্ধন সঙ্গীত। যেন গরুর লেজ মলছে গাড়োয়ান। অ্যায় জানোয়ার কাম হিয়ার।'

পরেশ পায়ে পায়ে এগিয়ে এল।

'কান ধর।'

পরেশ ইতস্তত করছে। জমিদারী মেজাজে এক ধমক,

'কান পাকড়ো।'

পরেশ কাঁপা কাঁপা হাতে কান ধরল।

'দর্শকদের দিকে ফের।'

পরেশ তাই করল।

'বল, জীবনে আমি আর কখনো গান গাইবার চেষ্টা করব না।'

পরেশ কেঁদে ফেলেছে, 'জীবনে, আমি আর কখনো গান গাইবার চেষ্টা করব না।'

'যাও। একেবারে ত্রিসীমানা ছেড়ে চলে যাও।'

সঙ্গীতশিক্ষকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এটা কি রবীন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধানুষ্ঠান! অ্যায়, আগুনের পরোশমণি? অ্যায় কোথায় পেলেন?'

'আজ্ঞে ওটা একস্ট্রা, ধরতাই হিসেবে ফিট করে দিয়েছিলুম।'

'রবীন্দ্রসঙ্গীত চেয়ার না আলমারি! হাতল ফিট করছেন? আপনি সঙ্গীতশিক্ষক না ছুতোর! পরোওশমণি? পাপৌষ। গেট আউট। এক্ষুণি বেরিয়ে যান। ক্লিয়ার আউট। ক্লিয়ার আউট।'

ছেলেরা আবার চিৎকার ছাড়ল, 'ইসকো উঠাকে বাহার ফেক দো।'

সৌম্য চেহারার এক অভিভাবক মাঝসারি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সাংস্কৃতিক ব্যাপারটা বন্ধ করে কাজের কাজে আসুন। বিজনেস অফ দি মিটিং।'

প্রেসিডেন্ট মশাই এক কালের জমিদার। একস্ জমিন্দার। অন্যের নির্দেশে চলবেন! অভিজাত হাসিতে মুখ ভরে গেল। ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এটা লিমিটেড্ কোম্পানীর ডিরেক্টর বোর্ডের মিটিং নয়। হিতকারী সভার কমিটি মিটিং নয়। দিস ইজ অ্যান এডুকেশানাল ইন্সস্টিট্যুশান। সিট অফ লারনিং। হোয়্যার ইজ পণ্ডিতমশাই। পণ্ডিতমশাই কোথায়!'

একজন বললেন, 'এই তো এখানে ছিলেন। বেত হাতে ছেলেদের ঠেঙ্গাচ্ছিলেন।'

আর একজন বললেন, 'মনে হয় পান খেতে গেছেন।'

হঠাৎ যেন কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার হল, 'এই তো পণ্ডিতমশাই। এখানে ঘুমিয়ে পড়েছেন।'

প্রেসিডেন্ট মশাই একটু বাঁকা গলায় বললেন, 'সবাই মিলে উৎপাটন করে নিয়ে আসুন। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে নিদ্রার ঘনিষ্ঠ সংযোগ।'

পণ্ডিতমশাইয়ের কাঁচা ঘুম ভেঙেছে। তিনি হকচকানো মুখে মঞ্চে উঠলেন। হাতজোড় করে প্রেসিডেন্ট মহোদয়কে বললেন, 'আমাকে যে প্রয়োজন হতে পারে, এ আমি বুঝিনি।'

'আপনাকেই তো প্রয়োজন। যান উদ্বোধন করুন।'

'আজ্ঞে কি উদ্বোধন। সম্যক অধিগম্য হল না।'

'এই সভার উদ্বোধন। সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ করুন। যান মাইকের সামনে।'

'অনুমতি করুন আমি তাহলে শাস্ত্রীয় বেশ ধারণ করে আসি।'

'কোনো প্রয়োজন নেই। বেশ আপনার চমৎকার আছে। একেবারে শাস্ত্রসম্মত।'

মাইক্রোফোনের সামনে পণ্ডিতমশাই চোখ বুজিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। সভায় সবাই ফিসফিস করছেন, 'আজ পণ্ডিতমশাইয়ের হয়ে গেল। জীবনে কখনো মাইকের সামনে দাঁড়াননি। নরঃ নরৌ, নরাঃ করেছেন ক্লাসে। আর ডাস্টার পেটা। আজ পড়েছেন ফাঁপরে।'

'ওঁ।'

এক ওঙ্কার ধ্বনিতে সভা কেঁপে উঠল। ভরাট গলা তেমনি সুর। পণ্ডিতমশাইয়ের চেহারা পাল্টে গেল। শরীরে একটা জ্যোতি খেলছে। সভা একবারে নিস্তব্ধ। সামনের সারির কুঁচোগুলোও চুপ। পণ্ডিতমশাই হাত জোড় করে অপূর্ব সুরে পাঠ করছেনঃ

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা ত্বমহং বন্দে পরমানন্দমবিবম্॥
যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র-রুদ্র-মরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।

দীর্ঘ স্তব। প্রেসিডেন্ট মশাই অবাক। হেডমাস্টারমশাই স্তম্ভিত। পাশেই গঙ্গা। হুহু বাতাসে সুর উড়ে যাচ্ছে। কেউ জানত না, পণ্ডিতমশাইয়ের এত সুন্দর গলা, সুরের ওপর এত দখল! আগুনের ফুলকির মতো উচ্চারণ।

পণ্ডিতমশাই শেষ করছেন ঃ

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ।।

পণ্ডিতমশাই যেই শেষ করলেন, সভা একেবারে ফেটে পড়ল, 'সাধু, সাধু।'

প্রেসিডেন্ট মশাই উঠে নিজের গলার পাট করা সিল্কের চাদর পণ্ডিতমশাইয়ের গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, 'অপূর্ব, অপূর্ব! আপনি আমাকে মোহিত করেছেন।' সভার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই ঋষিকে আমি দু'কাঠা দশ ছটাক জমি দান করলুম।'

সভা আবার চিৎকার করে উঠল, 'সাধু, সাধু।'

পণ্ডিতমশাই চলে যাচ্ছিলেন। প্রেসিডেন্ট মশাই বললেন, 'না, না, আপনি মঞ্চে বসুন।'

সভার সুরটাই পাল্টে দিলেন পণ্ডিতমশাই। এর পরেই শুরু হল সেই বিশ্রী ব্যাপার। সেক্রেটারি ইংরেজিতে পড়তে লাগলেন বাৎসরিক রিপোর্ট। সে আর শেষ হয় না। হাঁউ হাঁউ করে সব হাই তুলছেন। কেউ আবার বলছেন, 'ওরে বাবা। আর পারি না।'

এক ঘণ্টা পনের মিনিট। সেক্রেটারি বসলেন। ডাক পড়ল আমার। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি। এতক্ষণ বেশ বসেছিলুম। কোনো কাশিটাশি ছিল না, শুরু হল গলা খুসখুস। মঞ্চে ওঠার আগে কচমচ করে একটা লবঙ্গ চিবোলুম। ভীষণ ঝাল। নমস্কার করে শুরু করলুম, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের, খুক্, নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ, খুক্‌খুক্।

আজি এ প্রভাতে রবির কর খ্যাঁক্
কেমনে পশিল প্রাণের' পর, কোঁক
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে ঘকঘক
প্রভাতে পাখির গান, খক্ খকর খক্ খক্
খক্ খক্।।

প্রেসিডেন্ট মশাই বলছেন, 'এটা কি রবীন্দ্রনাথের কোনো স্পেস্যাল কবিতা?'

হেডমাস্টার মশাই বলছেন, 'ছেলেটি ভাল আবৃত্তি করে। খুব কাশি হয়েছে।'

আমি বেশ একটু ভাব দিয়ে গলাটাকে টেনে বলতে গেলুম ঃ

না জানি কেন রে এতদিন পরে
খুক্ খক্ খুক খক্ খাক্ খাক্ খাক্।

প্রেসিডেন্ট মশাই ভয়ঙ্কর বিরক্ত হয়ে

বললেন, 'তোমাকে আর জানতে হবে না, আমরা তোমার কাশি শুনতে আসিনি। দয়া করে বিদায় হও।'

সভায় চিৎকার উঠল, 'এতক্ষণ আপনাদের কেশে শোনাল....'

লজ্জায় অপমানে সোজা বাড়ি। আমারও পুরস্কার ছিল। সে সব ফেলেই চলে এলুম। জ্যাঠাইমার বুকে মুখ গুঁজে অনেকক্ষণ কাঁদলুম। জ্যাঠাইমা বললেন, 'আশ্চর্য কাশি। কিছুতেই কমে না।' আমার এই অপমান যেন সভামধ্যে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ। সবাই বিষণ্ণ হয়ে বসে রইলেন রাত বারোটা পর্যন্ত।

।।ছয়।।

কাশিটাশি সব মাথায় উঠে গেল। জ্যাঠামশাই ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। আমাদের পরিবারে কেন, আমাদের পাড়ায়, আমাদের গ্রামে জ্যাঠামশাইয়ের মতো সুন্দর মানুষ, প্রিয় মানুষ আর দ্বিতীয় ছিলেন কি না সন্দেহ! সকলের ভালবাসার মানুষ। নিজের জীবন দিয়ে অন্যের উপকার করেন। জ্যাঠামশাই যেখানে, সেখানেই জমজমাট পরিবেশ। গান, গল্প, হাসি, খাওয়াদাওয়া। চলে গেলেই সব শূন্য।

অল্প অল্প জ্বর আসে সন্ধ্যের দিকে। ক্রমশই দুর্বল হয়ে পড়ছেন। অসুখটা ঠিক ধরা যাচ্ছে না। ডাক্তারবাবুরা দেখছেন। বড় বড় প্রেসক্রিপসান। ওষুধের ছড়াছড়ি। বাবার মুখের হাসি মিলিয়ে গেছে। মায়ের নাচ, জ্যাঠাইমার গান আর হয় না। দাদু ঠাকুরঘরে ঢুকলে আর বেরোতে চান না। মূর্তির মধ্যে যে-ভগবান তাঁকে শোনাতে চান দুঃখের কথা। মানুষ ডাক্তার যা পারেন না, কেঁদে কেঁদে ভগবানের কাছে তাই প্রার্থনা করেন। জ্যাঠামশাইয়ের আরোগ্য।

বাড়ির সুর কেটে গেল। আমি খক্ খক্ কাশি, সে-কাশি কেউ শুনেও শোনে না। মাস্টারমশাই আসেন, পড়িয়ে চলে যান। আমি স্কুলে যাই। স্কুলের মাঠের বিশাল শিশুগাছ দুটোর দিকে তাকিয়ে থাকি। তোমরা কত বড় হলে। কত দিন বেঁচে আছ, আরো কত দিন থাকবে! মানুষ কেন পারে না। মানুষ কেন হেরে যায়। কেন মানুষের অসুখ করে। তোমাদের তো অসুখ করে না। গাছের বিশাল গুঁড়ি বেয়ে পিঁপড়ের ওঠা নামা দেখি। উঁচু উঁচু ডালে টিয়ার ঝাঁক। পশ্চিমের সূর্য গঙ্গার ওপারে নেমে যায় সোনার থালার মতো। কখনো সাদা, কখনো নীল পাল তুলে বড় বড় নৌকো চলে যায় এক দেশ থেকে আর এক দেশে। ভরা গঙ্গার জল ঘাটের পৈঠায় ছলাত ছলাত করে। শ্মশানের কাঠকয়লা ভেসে আসে। সন্ধ্যাতারার দিকে তাকিয়ে আমি কেঁদে ফেলি। বেলুড় মঠের দিকে তাকিয়ে হাতজোড় করে বলি, ভগবান রামকৃষ্ণ আমার জ্যাঠামশাইকে সুস্থ করে দিন।

সবাই বললেন, এই অসুখটার নাম কনসাম্পসান। শরীর ক্ষয়ে যাচ্ছে। অসুখটা ধরেছে লাংসে। একবার চেঞ্জে নিয়ে গিয়ে দেখা যেতে পারে। বেশ শুকনো কোনো পাহাড়ী জায়গায়। যেখানে বাতাসে ইউক্যালিপ্টাসের গন্ধ। জলে ধাতুচূর্ণ। হজমীর কাজ করবে। অল্প অল্প বেড়ানো, ভাল খাওয়া। আর বিশ্রাম।

হাজারিবাগ রোড স্টেশানে আমাদের সম্পর্কে এক কাকা থাকেন। সুন্দর বাগানবাড়ি। জায়গাটাও খুব স্বাস্থ্যকর। ঠিক হল, দাদু আমি জ্যাঠামশাই আর জ্যাঠাইমা যাবেন। আর যাবে এক শক্ত চেহারার যুবক। তার নাম প্রফুল্ল। জ্যাঠামশাই তাকে চাকরি করে দিয়েছিলেন। ধরাবাঁধার চাকরি তার ভাল লাগেনি। ছেড়ে দিয়েছে। আমাকে বলেছিল, দুপুরের মেঘ-ভাসা নীল আকাশ, সবুজ মাঠ, হাঁস-ভাসা পুকুর, গাছের ডালে ডালে পাখির ডাক ছেড়ে, সারাটা দিন কারখানায় বসে থাকতে ভাল লাগে? আমি তার সঙ্গে একেবারে এক মত। পেটের জন্যেই চাকরি। পেটটা কত বড়? যে তার জন্যে সব ছেড়ে দিতে হবে!

রাত নটার ট্রেনে আমরা উঠে বসলুম। বাড়ি থেকে বেরোবার আগে জ্যাঠামশাই গোটা বাড়িটা একবার ঘুরে ঘুরে দেখে নিলেন। ছাতে গিয়ে টবের সব ফুলগাছের সঙ্গে কথা বললেন। ঘরের কোণে তিন জোড়া মাছ ধরার ছিপ। তাঁর

বড় প্রাণের জিনিস। মাছ ধরার ভীষণ নেশা। ছিপগুলোকে বললেন, লক্ষ্মী হয়ে থাকো। ফিরে এসে মাছের সঙ্গে খেলা করতে নিয়ে যাবো। জ্যাঠামশাইয়ের বুকে মাথা রেখে মা কাঁদছিলেন। মায়ের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে জ্যাঠামশাই বলছেন, 'পাগলী মেয়ে, আমি কি একেবারে চলে যাচ্ছি। এক মাস পরে তোমরা সবাই যাবে। এবারের পুজো আমরা বিহারে দেখবো।'

বলতে বলতে, জ্যাঠামশাইয়ের চোখেও জল এসে গেল। কাজের মহিলাটির হাতে একশো টাকার একটা নোট দিয়ে বললেন, 'ছেলের অসুখ, ভাল করে চিকিৎসা করাও।'

সে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। পাড়ার প্রায় সবাই এসে দাঁড়ালেন ভিড় করে। সকলের চোখেই ছলছলে জল। আমার জ্যাঠামশাই বিদেশে যাচ্ছেন।

আমাদের গাড়ি ছেড়ে দিল। বাবা, আরো অনেকে প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছেন। ক্রমশই তাঁরা ছোট হয়ে যাচ্ছেন। হঠাৎ প্ল্যাটফর্ম শেষ। রেল ইয়ার্ড, লোহালক্কড়, এখানে ওখানে কেন্নোর মতো গাড়ি। রেলের কেবিন। সিগন্যাল ঘর। সব পেছন দিকে ছুটছে। হঠাৎ ফাঁকা মাঠ। আকাশে একটা ঘোলের মতো চাঁদ। ট্রেনের ঘুমপাড়ানি শব্দ। জ্যাঠামশাই শুয়ে পড়লেন। পুরো একটা ক্যুপ রিজার্ভ করে আমরা চলেছি। আমার পাশে দাদু। জ্যাঠাইমার কোলে জ্যাঠামশাইয়ের পা দুটো। আমি হাঁ করে তাকিয়ে আছি জানালার বাইরে। পৃথিবীটা কি বিশাল আর কত সুন্দর! স্বপ্নের মতো রাত। নির্জন গ্রাম। ঘুমঘুম স্টেশান। ট্রেন চলেছে।

প্রায় দুপুরবেলা খড়খড়ে রোদে আমরা হাজারিবাগ স্টেশানে এসে নামলুম। প্রফুল্লদা একাই একশো। ঝপাঝপ মালপত্র সব নামিয়ে ফেলল। বুক চিতিয়ে বললে, 'ওয়াণ্ডারফুল জায়গা। সবু তারের মতো বাতাস।' জ্যাঠামশাই একটা বেঞ্চিতে বসতে গিয়ে লাফিয়ে উঠলেন। চাটুর মতো গরম। দাদু বিশাল ছাতাটা জ্যাঠামশাইয়ের মাথার ওপর মেলে ধরলেন। আমার টুকটুকে ফর্সা জ্যাঠাইমা সিল্কের শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছেন। বাতাসে চুল উড়ছে। আঁচল উড়ছে। রঙ যেন জ্বলছে।

হঠাৎ ওভারব্রিজে বেশ মোটাসোটা এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়ালেন। সাদা ট্রাউজার, সাদা হাফশার্ট, মাথায় শোলার হ্যাট। তিনি চিৎকার করে বললেন, 'চলে আসুন, চলে আসুন, বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।' সেই অত উঁচুতে রোদের আকাশ মাথায় দিয়ে রাজহাঁসের মতো এক মানুষ। তলায় এক জোড়া ইস্পাতের লাইন। রোদে ঝলমল করছে।

জ্যাঠামশাইয়ের এক হাত আমার কাঁধে, আর এক হাতে ছাতা। ছাতার ওপর ভর রেখে সিঁড়ি ভাঙছেন। বিশাল উঁচু ওভারব্রিজ। অনেক সিঁড়ি। জ্যাঠামশাইয়ের উঠতে কষ্ট হচ্ছে। আমার ছাড়া আর কারোর সাহায্য নেবেন না। প্রফুল্লদা এগিয়ে এসেছিল। জ্যাঠামশাই বললেন, 'তুই মোটঘাট সামলা।' জ্যাঠাইমা দাদুকে সাহায্য করছেন।

আমাদের কাকাবাবুর মটোরগাড়িটা বেশ সুন্দর। মাথার হুডটা ক্যানভাসের। দু'পাশে পাদানি। সামনে স্টিয়ারিং-এর ডানদিকে চোঙা লাগানো একটা বিশাল হর্ন। চারটে বড় বড় চাকা। চকচকে চকোলেট রঙ। বেশ বড় গাড়ি। আসন বেশ চওড়া। হাঁটু রাখার অনেক জায়গা। দরজা ছোট ছোট। পুরোটা খুলে যায়। ঢুকতে অসুবিধে হয় না। ভেতরটা বেশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। সুন্দর একটা গন্ধ।

কাকাবাবু আমাদের জন্যে বেশ একটা ভালো বাগানবাড়ি ঠিক করেছিলেন। আমি আর প্রফুল্লদা সামনে বসেছি। কাকাবাবু গাড়ি চালাচ্ছেন। সোজা লম্বা রাস্তা। খাঁ খাঁ রোদ। কোনো লোকজন নেই। তবু কাকাবাবু মাঝে মাঝে হর্ন বাজাচ্ছেন ভ্যাঁক ভ্যাঁক করে। হাসি খুশি মজার মানুষ। বলছেন, 'মাঝে মাঝে হর্ন না বাজালে গাড়ি বলে বোঝা যাবে কি করে! গরু যদি না ডাকে, আর গাড়ি যদি হর্ন না দেয় তাহলে কি মানায়!'

বাগানবাড়িটার নাম খুব সুন্দর, 'ফুলের জলসা'। সত্যই তাই। তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো বাগান। জ্যাঠামশাই বাগান, ফুল, পুকুর কত ভালবাসেন শরীর কত ক্লান্ত, যে একবার মাত্র থমকে দাঁড়িয়ে একবারই বাঃ বললেন। কাকাবাবুকে বললেন, 'শরৎ, বাড়িটা তুমি বড় ভাল ঠিক করেছ। এর আগের বার আমরা যখন এসেছিলুম, তখন তো এই বাড়িটা ছিল না।'

'মেজদা এটা আমার হাতে তৈরি। কলকাতার এক ব্যারিস্টারের। কত খরচ করে করলে, একবারও আসে না। কেবল শুনি বিলেত গেছে। আচ্ছা, ভেতরে সব ছবির মতো করা আছে। কোনো কিছুর অভাব নেই। সাহায্য করার জন্যে একটি মেয়ে আছে। সুন্দর নাম, সুর্মা। আমি এখন একবার আমার কাজের সাইটে যাবো। রাত্তিরে আসব।'

জ্যাঠাইমা বললেন, 'এত বেলা হল। খেয়ে যাবেন না।'

'বউদি, ব্যাচেলার মানুষ আমি। আমার সকালের দিকের খাওয়া টুকটাক। কন্ট্রাক্টার সকালে বেশি খেলে ব্যবসা লাটে উঠে যাবে বউদি। রাত্তিরে খাবো। আমি পাম নদীর দিকে যাচ্ছি। আসার সময় ভেটকি নিয়ে আসবো। দেখবেন কি টেস্ট!'

তিনবার হর্ন বাজিয়ে শরৎকাকুর গাড়ি চলে গেল। দুপুরের রোদে ঝিম মেরে জলসা করছে হরেক রকমের গোলাপ। ফর ফর করে কাগজের টুকরোর মতো উড়ছে নানা রঙের প্রজাপতি। সাদা রঙ করা ইটের কেয়ারি। সাদা নুড়ি বিছানো চওড়া পথ। প্রফুল্লদা বললে, 'তোমাকে বলছি, এতদিনে আমি আমার মনের মতো একটা দেশ খুঁজে পেয়েছি। এ ছেড়ে আমি আর যাচ্ছি না। তোমরা যখন ফিরবে, তোমাদের আমি ট্রেনে তুলে দিয়ে আসবো। এই তো আমার স্বর্গ!'

হাজারিবাগে সেই ফুলের জলসায় আমরা তিন মাস ছিলুম। বড় বড় ঘর। কুচকুচে কালো স্লেট পাথরের মেঝে। বিশাল ঘেরা বারান্দা চারপাশে। বারান্দায় বারান্দায় বেতের সোফাসেট। আর্ম চেয়ার। ইজি চেয়ার। সামনে ফুল। পেছনে ফুল আর ফল। বাগানে ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হলে বসার জন্যে সিমেন্ট বাঁধানো গোল গোল বেদী। রোজ সকালে একজন মালী এসে গাছের পরিচর্যা করে যায়। আমাদের সঙ্গে ভীষণ ভাব হয়ে গিয়েছিল।

সাত দিনের মধ্যেই জ্যাঠামশাইয়ের শরীরে বেশ জোর ফিরে এল। ফ্যাকাস রঙে লাগল লালের আভা। দাদু আমাকে ফিসফিস করে বললেন, 'থ্যাঙ্ক গড। শরীরে রক্ত লাগছে। বলতে নেই তোমার চেহারাও বেশ ইমপ্রুভ করেছে। তোমার কাশি কোথায় গেল?'

'আর খুঁজে পাচ্ছি না।'

'ব্যাটা পালিয়েছে।'

সে কি আনন্দের দিন। আট দিনের মাথায় আমাদের ভোরে বেড়ানো শুরু হল। ভোরের আকাশে আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে প্রফুল্লদার প্রাইমাস স্টোভের সাঁ সাঁ শব্দ। দাদুর স্তোত্রপাঠ। চা তৈরি হতে হতেই আমাদের সাজগোজ শেষ।

ফুটফুটে সকাল। সার সার ইউক্যালিপটাস আর দেবদারু খাড়া উঠে গেছে আকাশের দিকে। আকাশের রঙ গা ধোয়া নীল। পাথর ছড়ানো পথে আমরা হাঁটছি। কোনো তাড়া নেই, উদ্বেগ নেই, উৎকণ্ঠা নেই। চামরের মতো বাতাস। কত রকমের গল্প, গান, প্রফুল্লদাকে নিয়ে দাদুর মজা। জ্যাঠাইমার নরম হাত আমার হাতে। যেন সুখের পাখি চলেছে।

হাটের দিনে আমরা হাট ঘুরে বাড়ি ফিরে

আসতুম। সঙ্গে বিশাল সওদা। আসার পথে হালুইকরের দোকানে একটা হল্ট্। অপূর্ব কচুরি, মোহনভোগ, বালুসাই, দুধঘন চা। দুপুরে আমাদের খাওয়ার পরিমাণ এত বেড়ে গেল, প্রফুল্লদা বলতে শুরু করল, 'এইবার আমাদের কোম্পানি ফেল করবে গো।' আমার যে ছোটখাট একটা ভুঁড়ি হচ্ছে, সেটা আমি টের পেতুম প্যান্ট পরতে গিয়ে। আর কাশি! দিনে বার চারেক ইঁদারার জলে আমার ও প্রফুল্লদার হাতির চান হত। তাতেও কাশির দেখা নেই।

প্রফুল্লদা আর আমার রাতটাও ছিল ভীষণ সুন্দর। পাঁচ শেলের বিশাল একটা টর্চ আর হাতে একটা লাঠি নিয়ে আমরা হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতুম স্টেশানে। স্টেশান আজও আমাকে পাগল করে দেয়। জীবনের পরম সত্যের মতো। মানুষ আসে, মানুষ যায়। শেষ পর্যন্ত কেউই থাকে না। প্রাণহীন রেললাইন সব সময় ভীষণ একটা প্রতীক্ষা বুকে নিয়ে পড়ে আছে। ট্রেন আসবে। আমরা দেখার বা শোনার আগেই রেললাইন শুনতে পায়। রেললাইনের কান যে অনেক বড়। একা একা আলো জ্বলে থাকে। দাঁড়িয়ে থাকে গাছ। ঝিম মেরে বসে থাকে দু'একজন দেহাতী যাত্রী। তারবাবু খটখট আওয়াজ করেন যন্ত্রে—টরে টরে টক্কা টরে, এই হল বর্ণপরিচয়। ঝাঁ ঝাঁ করে টেলিগ্রামের তার।

আমরা দু'জনে ওভারব্রিজে উঠে মাঝখানটায় বসে থাকি, রেলিং ধরে নিচে পা ঝুলিয়ে। আমাদের আকর্ষণ, রাত এগারোটায় আসবে ডাউন মেল। বিশাল ট্রেন। আমাদের পায়ের নিচে এসে থেমে পড়বে। আমরা অনেকটা ওপর থেকে দেখতে পাবো ট্রেনের ছাত। সার সার ডুমো ডুমো ডিম বসানো। পরিষ্কার। ছাই ছাই রঙ। শান্ত স্টেশান হঠাৎ ছটফট করে উঠবে। হকার হাঁকবে চাগ্রম। পানি পাঁড়ে বলবে জল। হঠাৎ তীক্ষ্ণ একটা বাঁশি বাজবে। ট্রেন তখন কয়লায় চলত। ইঞ্জিন বুককাঁপানো শব্দে স্টিম ছাড়বে। কোনো কিছু ছেড়ে যেতে হলে হয়তো এইরকমই একটা শব্দ করতে হয়। কোনো শব্দ শোনা যায়, কোনো শব্দ শোনা যায় না। যেমন মানুষ চলে যাওয়ার শব্দ। ট্রেনটা ধীরে ধীরে প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে চলে যাবে। গার্ডের কামরা। একজন মানুষ, হাতে ফ্ল্যাগ। কে যেন পেছন থেকে তাঁর জামার কলার ধরে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে চলেছে। তাঁর ঘরটা গোটা ট্রেনের তুলনায় রেলিং ঘেরা ছোট্ট একটা দেশলাইয়ের বাক্স। ট্রেনটা চলে যাওয়ার পর স্টেশান রাতের মতো ঘুমিয়ে পড়বে। কাঠের সিঁড়িতে আমাদের পায়ের শব্দ। ভীষণ নির্জন পথ, দু'পাশে নিঝুম বাগানবাড়ি। ঘুমঘুম চোখে বাড়ি ফিরে এসে সোজা বিছানায়। তিন মাসের মাথায়, বাবার যেমন আসার কথা ছিল মাকে নিয়ে, এসে গেলেন। পুজো সবে শেষ। শীত আসছে। সকালে আর সন্ধ্যের পর বেশ ঠাণ্ডা। মরসুমী ফুলে বাগান হাসছে। গোলাপের বাহার। ভেলভেটের মতো পাপড়ি। তার ওপর মধুর মতো সকালের শিশির।

জ্যাঠামশাইয়ের চেহারা দেখে বাবার কি আনন্দ! বহুবার হাজারিবাগে এসেছেন। সেইসব স্মৃতি মনে খইয়ের মতো ফুটছে। ভোরের বেড়ানো যেন আরো আনন্দের। রাস্তার বাঁকে বাঁকে পুরনো দিনের ঘটনা বাঘের মতো ওত পেতে আছে। মেজদা মনে আছে, বলে বাবা শুরু করছেন, আর অতীত উড়ে উড়ে আসছে ঝাঁক ঝাঁক পাখির মতো। মা আর জ্যাঠাইমা, দাদু বলছেন, 'আহা! কতকালের দুই সখী। কেমন হাত ধরাধরি করে মশগুল হয়ে চলেছে দেখো।'

আর তিন দিন। ফিরতে হবে কলকাতা। শরৎকাকু টিকিট রিজার্ভ করে দিয়েছেন। পাম নদীর ধারে পিকনিক হল একদিন। শরৎকাকুর গাড়ি হর্ন দিতে দিতে চলল। যেন সিনেমার শূটিং পার্টি চলেছে। কাঁচের মতো নদী। তলায় চিকচিক করছে বালি, অভ্রের কণা। ছোট ছোট মাছ, যেন প্রকৃতির নিজস্ব অ্যাকোয়ারিয়াম। গাছের ছায়ায় ছায়ায় সারাটা দিন কেটে গেল স্বপ্নের মতো। জ্যাঠামশাইয়ের কত রকমের গল্প। ছেলেবেলার গল্প, স্কুলের কলেজের গল্প। মা আর জ্যাঠাইমা দাদুর জন্যে একটা বিছানা নিয়ে গিয়েছিলেন। গোল একটা বালিশ।

সন্ধ্যের কিছু পরে আমরা ফিরে এলুম। আর মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আমরা আছি। সকলেই তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লেন। বেশ শীত এসে গেছে। অনেক দিন পরে মাকে জড়িয়ে শুয়েছি। স্বপ্নের মতো চোখে ভাসছে নদী, বন, রোদ, ছায়া, মাছ। কানে হাসি, গান, গল্প।

মনে হয় সকাল হয়েছে। প্রফুল্লদা ভীষণ জোরে জোরে ডাকছে। পাশে মা নেই। সবাই বাগানের দিকে ছুটছেন। সাদা গোলাপগাছ। টাটকা ফুল ফুটে আছে। ঘামের মতো শিশির মাখা। গাছের গোড়ায় মুখ থুবড়ে পড়ে আছেন জ্যাঠামশাই। ডান হাতে একটা সাদা গোলাপ। জ্যাঠামশাই মারা গেছেন। চলে গেছেন তিনি একটি গোলাপ হাতে নিয়ে। ডাক্তারবাবু এসে বললেন, হার্ট অ্যাটাক।

## ।। সাত ।।

কাশি? এত বছর বয়েস হয়ে গেল, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মানুষ কোনো না কোনো সময়ে কাশছে, আমি জানি, আমার আর যাই হোক কাশি কোনো দিন হবে না। কেন? নিজের জীবন দিয়ে আমার ছাগুলে কাশি সারিয়ে দিয়ে গেছেন আমার জ্যাঠামশাই। হাজারিবাগে তো কত মানুষই আগে আগে চেঞ্জে যেতেন। একটু বায়ুপরিবর্তন। স্বাস্থ্যে সামান্য চেকনাই। এর বেশি কার কি হয়েছে! আমার যে ধাতটাই পাল্টে গেল। সে হাজারিবাগের জন্যে নয়। আমার জ্যাঠামশাইয়ের জন্যে।

হাজারিবাগ হল আমার কাশী, আমার বারাণসী।

বছরে একবার, শীতকালে আমি হাজারিবাগে যাবই। কয়েকদিন থেকে চলে আসি। প্রথমে যাই ফুলের জলসায়। সেই বাড়ি আর নেই। ধ্বংসাবশেষ। সুখের দিন, মানুষের বোলবোলা বেশি দিন থাকে না। সে বাগান নেই। স্থানীয় এক কাঠ-ব্যবসায়ী কিনে নিয়েছেন। বড় বড় কাঠের গুঁড়ির ডাঁই। অমন সুন্দর বাড়ি যেন একটা খাটাল! তবু আমি সব দেখতে পাই। কল্পনায়। তারপর যাই পাম নদীর ধারে। নির্জন সেই জায়গাটায়, যেখানে জ্যাঠামশাইকে সৎকার করা হয়েছিল। গাছের ফাঁক দিয়ে সকালের রোদ এসে পড়ে। বালি চিকচিক করে। নদী বছরের পর বছর আমার জ্যাঠামশাইকে গান শোনায়। সেদিন যাঁরা ছিলেন আমি ছাড়া আজ আর কেউ নেই। আমি শেষ প্রতিনিধি। আমি মৃদু গলায় ডাকি, 'জ্যাঠামশাই!'

উত্তর পাই, 'কি বাপি! কেমন আছ তুমি?'

আমি বলি, 'আমার বয়েস বেড়ে গেছে জ্যাঠামশাই। এখনো আমাকে বাপি বলছেন?'

জ্যাঠামশাই হাসেন, না নদী হাসে, না গাছে হনুমান হাসে আমি বলতে পারব না। সেই অদ্ভুত মিষ্টি হাসি শুনতে পাই। জ্যাঠামশাই বলেন, 'তুমি তো অতীতে চলে এসেছ। তোমার বারো বছর বয়েসটা এই গাছের ছায়ায় নদীর ধারে পড়ে আছে বাপি! খামে ভরা চিঠির মতো।'

আমি তখন এক মুঠো বালি তুলে বাতাসে ছেড়ে দি। অভ্রের কণার মতো ছড়িয়ে পড়ে। হাসি কান্না হীরে পান্না।

ছবি : বিজন কর্মকার

# এই মাসে

সুবন্ধু শর্মা

## উল্লেখযোগ্য ঘটনা

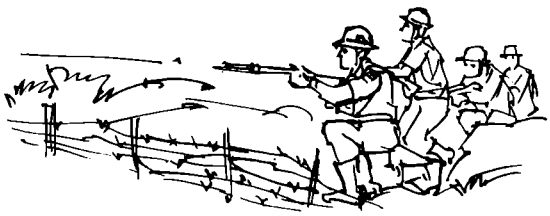

**১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ঃ** পাকিস্তানের হানাদার ফৌজ এদিন কাশ্মীরের যুদ্ধ-বিরতি রেখা অতিক্রম করে ভারতে এসে আক্রমণ শুরু করলো।

**৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৮৮ঃ** ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণানের জন্ম। ১৯৬২ সাল থেকে দিনটি শিক্ষক দিবস রূপে পালিত হয়।

**৬ সেপ্টেম্বর, ১৬৫৭ঃ** রাজধানী দিল্লীতে মুঘল সম্রাট সাজাহান এদিন অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মুঘল রাজবংশে সিংহাসনের অধিকার নিয়ে ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী গৃহবিবাদ শুরু হয়।

**৯ সেপ্টেম্বর, ১৯১৫ঃ** উড়িষ্যার বুড়িবালামের তীরে ইংরেজ পুলিশের বিরুদ্ধে বিপ্লবী বাঘা যতীন এবং তাঁর সংগীদের ভয়ংকর যুদ্ধ।

**৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ঃ** হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করা হলো।

**১০ সেপ্টেম্বর, ১৮৭২ঃ** বিখ্যাত ভারতীয় ক্রিকেটার প্রিন্স রণজিৎ সিংজীর জন্ম।

**১৩ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯ঃ** লাহোর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী অবস্থায় ৬৩ দিন অনশনের পর বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ দাসের মৃত্যুবরণ।

**১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৯ঃ** দিল্লীতে প্রথম টেলিভিশন অনুষ্ঠান প্রচার শুরু।

**২০ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭ঃ** বিদ্রোহী সিপাহীদের পরাস্ত করে বৃটিশ সেনাবাহিনী পুনরায় দিল্লী শহর দখল করলো।

**২১ সেপ্টেম্বর, ১৮৫৭ঃ** শেষ মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ বৃটিশের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। ইংরেজের বিচারে তিনি রাষ্ট্রদ্রোহী প্রতিপন্ন হন ও তাঁকে রেংগুনে নির্বাসন দেওয়া হয়।

**২২ সেপ্টেম্বর, ১৫৯৯ঃ** লন্ডনের চব্বিশজন ব্যবসায়ী মিলিত হয়ে ভারতবর্ষে বাণিজ্য চালানোর জন্য সর্বপ্রথম একটি কোম্পানী গঠন করলো। পরবর্তীকালে এটিই 'ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী' নামে পরিচিত হলো এবং কালক্রমে 'বণিকের মানদন্ড রাজদন্ড' রূপে দেখা দিল।

**২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ঃ** স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম মহিলা শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার এদিন তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

**২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮২০ঃ** মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে এক সিংহশিশুর জন্ম হলো–নাম ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

**২৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৮ঃ** মিহির সেন প্রথম ভারতীয় সাঁতারু, যিনি ইংলিশ চ্যানেল পার হয়েছিলেন।

**২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৪২ঃ** এইদিন তমলুকের বীরাংগনা মাতংগিনী হাজরা বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে আন্দোলনে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দেন। এই বীর বিপ্লবী মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত স্বাধীনতার পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে রেখেছিলেন।

ছবি: বিজন কর্মকার

# ট্রেনে প্রথম পরিচয়

## প্রণবেশ চক্রবর্তী

শ্রীরামকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন ১৮৮৬ সালে। তারপর তাঁর প্রধান শিষ্য এবং ভারত-আত্মার প্রতিমূর্তি স্বামী বিবেকানন্দ প্রায় পাঁচ বছর ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত পরিব্রাজক বেশে ঘুরে বেড়ান।

অবশ্য তাঁর পরিব্রাজক জীবনের প্রথম পর্বে তিনি স্বামী বিবিদিষানন্দ নাম গ্রহণ করেছিলেন। মধ্য পর্বে তাঁর নাম ছিল স্বামী সচ্চিদানন্দ। এবং শেষ পর্বে তিনি স্বামী বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করেন এবং সেই নামেই তিনি হয়েছিলেন বিশ্ববিজয়ী।

পরিব্রাজকের বেশে ঘুরতে ঘুরতে তিনি গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন দাক্ষিণাত্যে। সময়টা ১৮৯২ সালের জুলাই মাস। তখনও তিনি পরিচয়হীন, সম্বলহীন এক যুবক সন্ন্যাসী। কখনও পায়ে হেঁটে, কখনও ট্রেনে, কখনও রাজার দরবারে, কখনও অন্ত্যজের কুটিরে, কখনও অনাহারে,কখনও অনিদ্রায় অতিবাহিত হচ্ছে তাঁর কঠিন পরিব্রাজকজীবন।

সে সময় একদিন ট্রেনে করে বিবেকানন্দ দাক্ষিণাত্যে যাচ্ছিলেন। ট্রেনের যে কামরায় তিনি যাচ্ছিলেন, সেই কামরায় তাঁর সহযাত্রী ছিলেন সেকালের একজন বিখ্যাত দেশনায়ক। তাঁর নাম লোকমান্য বাল গংগাধর তিলক। তাঁকে বলা হয় মারাঠা-কেশরী। সেই সময় ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যেমন বাঙলাদেশে বিপ্লব আন্দোলন দেখা দিয়েছিল, তেমনি মহারাষ্ট্রেও পরাধীনতার বিরুদ্ধে শুরু হয়ে গিয়েছিল সংগ্রাম।

সেই সময় তিনজন দেশনেতা ছিলেন সকলের বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন। সেই তিনজন হলেন লালা লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল এবং বাল গংগাধর তিলক।

সে যাই হোক, সেই ট্রেনযাত্রার কথায় ফিরে আসি।

স্বামীজী একটা কম্বল মুড়ি দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে কামরার একদিকে শুয়ে আছেন। আরেক দিকে লোকমান্য তিলক এবং একজন মহারাষ্ট্রীয় ব্যারিস্টার বসেছিলেন। কথায় কথায় তিলকের সংগে সেই ব্যারিস্টারের হিন্দুধর্মের বিভিন্ন প্রথা ও পদ্ধতি নিয়ে তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে যায়। সেকালের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত এবং বিলাতফেরত সেই ব্যারিস্টার যথারীতি হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে নানারকম যুক্তি দেখাচ্ছিলেন। তিনি গলার জোরে ভারতের বেদ-বেদান্তকেও অলীক বলে প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লাগেন।

লোকমান্য তিলক পাল্টা যুক্তি দিয়ে হিন্দুধর্মের পক্ষ সমর্থন করছিলেন। একসময় তর্ক-বিতর্কটা বেশ জোরালো হয়ে ওঠে। তাঁরা দুজনেই কিন্তু নিজেদের তর্কে এতই ব্যস্ত হয়ে ছিলেন যে কামরায় একজন সাধুর উপস্থিতি খেয়ালই করেননি। স্বামীজী নাকে-মুখে কম্বল মুড়ি দিয়ে এতক্ষণ ধরে একমনে তিলক ও ব্যারিস্টারের তর্ক-বিতর্ক শুনছিলেন।

তর্ক চলতে চলতে এমন একটা সময় এল, যখন লোকমান্য তিলক ওই ঝানু ব্যারিস্টারের সংগে ঠিক এঁটে উঠতে পারছিলেন না।

এই অবস্থায় স্বামীজী আর কম্বল দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে শুয়ে থাকতে পারলেন না। কম্বলটা ফেলে দিয়ে এক লাফে ঠিক সিংহের মতো তিনি উঠে বসলেন। তারপর সেই ব্যারিস্টারের যাবতীয় যুক্তিতর্ককে নস্যাৎ করে দিয়ে তিনি ভারতের মহান বেদবেদান্তের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাতে শুরু করলেন।

একজন অপরিচিত তরুণ সন্ন্যাসীর এই বিস্ময়কর প্রতিভা এবং পান্ডিত্য দেখে লোকমান্য তিলক হলেন বিমুগ্ধ। আর সেই ব্যারিস্টার হলেন বিস্মিত। তাঁরা ভেবেই পাচ্ছেন না, কে এই গৈরিক বসনধারী প্রদীপ্ত সন্ন্যাসী?

স্বামীজীকে প্রথম দর্শনেই শ্রদ্ধার আসনে বসালেন লোকমান্য তিলক। তিনি পরিব্রাজক সন্ন্যাসীকে অনুরোধ করলেন, যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমার বাড়িতে চলুন। আমার অতিথি হয়ে আমাকে ধন্য করুন।

তখনও কিন্তু শিকাগো ধর্ম মহাসম্মেলনে স্বামীজীর যাওয়ার কোনো স্পষ্ট সম্ভাবনা ছিল না। তিনি তখনও অখ্যাত একজন সন্ন্যাসী। অথচ লোকমান্য তিলক পরবর্তীকালে তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, সেদিন প্রথম দর্শনেই তিনি বুঝেছিলেন, স্বামীজী যে কোনো ব্যক্তি থেকে শ্রেষ্ঠতরভাবে হিন্দুধর্মের পক্ষ সমর্থন করতে পারেন।

তিলকের পুনা-ভবন বাড়িতে কয়েকদিন অবস্থান করে পরিব্রাজক সন্ন্যাসী আবার পথে পা বাড়িয়েছিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই, ১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আমেরিকার শিকাগো বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলনে স্বামী বিবেকানন্দ আবির্ভূত হলেন বিশ্ববিজয়ী সন্ন্যাসীর বেশে। স্বদেশে অখ্যাত সন্ন্যাসী হলেন বিশ্বে বিখ্যাত। সেদিন সেই সংবাদে মৃতপ্রায় গোটা ভারত নতুন প্রাণশক্তিতে জেগে উঠেছিল। আর লোকমান্য তিলক সেই সংবাদ পেয়ে নিশ্চিতভাবে বুঝেছিলেন, সেদিন ট্রেনে যে অজ্ঞাতপরিচয় সন্ন্যাসীর দেখা তিনি পেয়েছিলেন, সেই সন্ন্যাসীই বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ ছাড়া আর কেউ নন। গর্বে তাঁর বুকটা ফুলে উঠেছিল।

॥ ২ ॥

স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা ও মারাঠা সেদিন একাত্ম হয়ে

গিয়েছিল। আর সমকালীন ভারত ইতিহাসের দুই প্রধান নায়ক ছিলেন সেদিন স্বামী বিবেকানন্দ এবং লোকমান্য তিলক। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, স্বামীজীর প্রতি যেমন তিলকের শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম, তেমনি স্বামীজীর ভাবধারায় তিলক অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন নানা দিক থেকে।

এই দুই ঐতিহাসিক পুরুষের মধ্যে সরাসরি দেখাসাক্ষাৎ হয়েছিল দুবার। প্রথমবার তিলক ট্রেনে-দেখা স্বামীজীকে চিনতে পারেননি। সে-ঘটনা আমরা জেনেছি। আর দ্বিতীয়বার বিশ্ববখ্যাত স্বামীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে তিলক এসেছিলেন বেলুড় মঠে।

এবার সে-কথাই বলছি।

১৯০১ সালের ডিসেম্বর মাস।

সেবার কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন বসেছে। সেই উপলক্ষে তিলক এসেছেন কলকাতায়। জাতীয় আন্দোলনের নায়ক তিনি। আর স্বামীজী ভারতের আধ্যাত্মিক জাগরণের অগ্নিঋষি।

লোকমান্য তিলক ঠিক করলেন স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করার জন্য বেলুড় মঠে যাবেন। সে-সময় স্বামীজী রীতিমত অসুস্থ। কারোর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করছেন না। প্রসঙ্গত স্মরণে রাখা প্রয়োজন, এই ঘটনার মাত্র মাস ছয়েক পরেই স্বামীজী দেহত্যাগ করেছিলেন।

লোকমান্য তিলক একদিন বিকেলে নৌকা করে গঙ্গা দিয়ে বেলুড় মঠে এলেন। মঠের দক্ষিণ দিকে বেলতলায় এসে নামলেন তিনি। সে-সময় কলকাতা থেকে নৌকায় করে বেলুড় মঠে আসাটাই সহজ ছিল। কারণ, গাড়ি-ঘোড়া বা রাস্তাঘাটের অবস্থা তখন সুবিধের ছিল না।

তিনি মঠ-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করতেই এক বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর দেখা হলো। সেই সন্ন্যাসী তিলককে চিনতেন না। তিলক নিজের নাম লেখা একটি কার্ড সেই সন্ন্যাসীর হাতে দিয়ে বললেন, "আমি স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা করতে চাই। আপনি এই কার্ডটি দয়া করে তাঁর কাছে পৌঁছে দিন।" তিলক মঠ-প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কিন্তু যে কোনো কারণেই হোক, সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী সম্ভবত বিষয়টির গুরুত্ব বুঝতে পারেননি। তিনি একটু এদিক ওদিক ঘুরে এসে তিলককে জানালেন, "স্বামীজী খুব অসুস্থ। তিনি এখন দেখা করবেন না।"

অর্থাৎ অন্য সকলকে তিনি যা বলে থাকেন, তিলককেও তাই বলে দিলেন।

এ-কথা শুনে তিলক অতি বিনীতভাবে বললেন, "ঠিক আছে, আপনি সময়মত স্বামীজীকে এই কার্ডটি দেবেন।" এই বলে তিনি নৌকা করে আবার কলকাতায় ফিরে গেলেন।

সেদিন সন্ধ্যার পর স্বামীজী নিজের ঘর থেকে নিচে নামলে সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী যথারীতি ওই কার্ডটি তাঁর হাতে দিলেন। কার্ডে চোখ বুলিয়ে স্বামীজী অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে বললেন, "কোথায় তিনি? তিলক কোথায়?"

উত্তরে বৃদ্ধ সন্ন্যাসী জানালেন, তিনি বিকেলে এসেছিলেন। চলে গেছেন।

এ কথা শুনে স্বামীজী দারুণ বিচলিত ও দিশেহারা হয়ে পড়লেন। তিনি তাঁর সন্ন্যাসী-শিষ্য স্বামী নিশ্চয়ানন্দকে খুব রাগারাগি করে বললেন, "তুই তো মারাঠি, তুই তো তিলককে চিনিস, তাহলে তুই কেন আমাকে খবর দিসনি?"

তারপর আর সময় নষ্ট না করে স্বামীজী নিজের হাতে একটি পত্র লিখলেন তিলককে। তিনি তাঁকে আরেকবার বেলুড় মঠে আসার জন্য সাদরে আমন্ত্রণ জানালেন।

সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ নিজে হাওড়ায় গিয়ে চিঠিটি ডাকঘরে দিয়ে এলেন।

এই পত্র পাওয়ার দু-এক দিনের মধ্যে তিলক আবার মঠে এলেন। এই দুই ঐতিহাসিক পুরুষ একান্তে নিজেদের মধ্যে অনেক কথা বলেছিলেন।

তাঁরা মঠ-প্রাঙ্গণে ঘুরতে ঘুরতে কথা বলছিলেন। সেখানে কারোর যাওয়ার অধিকার ছিল না। সকলে শুধু দূর থেকে দেখেছেন, স্বামীজী উত্তেজিত হয়ে হাত নেড়ে কথা কইছেন, আর তিলক ধীর ও শান্তভাবে সেইসব কথা শুনছেন।

আগে তিলক মারাঠা দেশের ব্রাহ্মণদের জন্যই নানারকম কাজকর্ম করছিলেন। স্বামীজী তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, একটা জাতিকে উন্নত করতে হলে মাত্র একটা অংশকে তুললে চলবে না। গরিব, দুঃখী, নিম্নশ্রেণীর সকলকে না তুলতে পারলে জাতি সামনের দিকে এগিয়ে চলতে পারে না।

স্বামীজীর প্রভাবে তিলকের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটেছিল। স্বামীজী প্রথম এদেশের বুকে দাঁড়িয়ে কম্বুকণ্ঠে উচ্চারণ করেছিলেন, "পরাধীনতাই পাপ। স্বাধীনতা অর্জনই একমাত্র ধর্ম।" এই বাণী কি তিলকের জীবনেও অভ্রান্ত সত্যে পরিণত হয়নি?

---

## সেই নদী • কৃষ্ণ ধর

এখনো তাকে মনে পড়ে সেই নদীটির কথা
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ভরা স্রোতের টান
মনে পড়ে তার দুতীরে কী অপরূপ শোভা
মাঝির গলায় ভাটিয়ালি গান।

নদী তুমি যাচ্ছো কোথায়? আসছো কোথা থেকে?
এই প্রশ্ন জাগত শিশুর বুকে
হাসত নদী কলকলিয়ে, কে বোঝে তার কথা
নদীর জলের এমনি সরলতা।
ভাঙছে দুপাড়, ভাঙছে বাড়ি, দুরন্ত যে নদী
এমনি ছিল স্রোত সে নিরবধি,
হঠাৎ কখন তারই বুকে জাগত নতুন চর
গড়ে উঠত মানুষজনের ঘর।

এই ছিল তার ভাঙাগড়া, এই ছিল তার খেয়াল
কখনো সে স্বপ্ন, কখন ভাঙছে স্মৃতির দেয়াল।
এই তো নদী ইচ্ছানদী এই ছিল তার চলা
তারই সঙ্গে চলত আমার স্বপ্নে কথা বলা।
মনে পড়ে সেই নদীটি আপন খুশির তালে
নাচাত সে বাদল দিনের মেঘে
আশ্বিনে সে শিউলিতলায় রোদ বিছাতো হেসে
ধানের শীষে, কাশের বনে মাঠ উঠত জেগে।

সৃষ্টি

# কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে

## গজেন্দ্রকুমার মিত্র

ভবেশবাবু কেষ্টনগর গিছলেন একটা মামলার জন্যে। আগেও এসেছেন। আজই শেষ মামলা। খুশিমনে বেরিয়ে এসে ঘড়ি দেখলেন। কলকাতার গাড়ির একটু দেরি আছে, এখন একটু চা আর তার সঙ্গে যদি খাওয়ার মতো ভাল কিছু থাকে খেয়ে ধীরেসুস্থে স্টেশনে যাবেন।

সামনেই একটি চায়ের দোকান, সিঙ্গাড়া, নিমকি সবই সাজানো আছে। গরম ভাজাও হচ্ছে।

ওদিকেই পা বাড়াবেন, একটি অল্পবয়সী ছেলের গলা শুনতে পেলেন, 'বাবু, এই যে এদিকে, ভাল ব্যবস্থা, চায়ের কাপ পরিষ্কার করা হয়—দেখে নেবেন।'

ভবেশবাবু থমকে দাঁড়িয়ে দেখলেন ছেলেটিকে, বয়স খুবই অল্প। বছর বারোর বেশি নয়। দেখতে মোটামুটি সুশ্রী। জামা-কাপড় বলতে একটা হাফপ্যান্ট আর গেঞ্জি, তবে খুব অপরিষ্কার নয়। বুদ্ধিও আছে। আর সেটা ওর চোখে-মুখে বোঝা যায়।

বললেন,'তুমি এখানে কাজ করো?'

ছেলেটার মুখটা একটু করুণ বলে মনে হলো। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'না বাবু, এখানে লোক সব আছে। মালিক যিনি, আমার বাবু, আমার অবস্থা দেখে দয়া করে এই কাজটা দিয়েছেন; বলেছেন, তুমি ঐ বাইরে থেকে খদ্দের ডাকবে, বেশ ভালভাবে বলবে, যাতে অন্য দোকানে না ঢোকে। যদি পারো, এখানে তোমার দু'বেলা খাওয়ার ব্যবস্থা করব। তাই এই কাজ করছি।'

'তা তোমার আর কেউ নেই?'

চোখটা ছলছল করে উঠল ছেলেটির, বললে, 'না বাবু, আমার যখন ছ'বছর বয়স, আমার বাবা মারা যান। একটা দোকানের খাতা লিখতেন। ছোট একটা বাড়ি ছিল। মাটির বাড়ি। বাবার অসুখে সেটাও বিক্রি হয়ে গেল। মা আমাকে নিয়ে শহরে এলেন। এক বাড়িতে রান্নার কাজ করতেন। তারা দয়া করে আমাকে খেতে দিতেন। তারপর গিন্নিমার আমাকে দেখে কি মনে হলো, আমাকে একটু পড়াশুনোর ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। সেইভাবে বছর দুই কাটল। ওঁরা এখান থেকে বোম্বে চলে গেলেন; আর একজনকে বলে মায়ের কাজের ব্যবস্থা করে দিলেন, আমার পড়ার কোনো কিছু করতে পারলেন না।'

ভেতর থেকে মালিক হাঁক দিলেন, 'এই নিতাই, এত কথা কি, কত লোক চলে যাচ্ছে ওদিকের দোকানে!'

ভবেশবাবু মামলা বোঝেন, আর এ যাঁরা বোঝেন তাঁরা বুদ্ধিমান তো হবেনই। তিনিও একটু হাঁক দিয়ে বললেন, 'আমি আদালত থেকেই এসেছি, এখানের সব দোকানের হাল দেখতে। তা আপনার এই নিতাই তো বেশ চালু ছেলে, আপনারই খুব গুণকীর্তন করছে।'

মালিক শশব্যস্তে এসে ভবেশবাবুকে বসিয়ে, চা খাওয়ার জন্যে অনুরোধ করলেন, নিতাইকে বললেন, 'তুমি এখানেই

থাকো, ওঁকে দেখো।'

নিতাইয়ের সুবিধে হলো, সারাদিন দাঁড়িয়ে খদ্দের ডাকা–এ তবু একটু বসবার সুযোগ পেল। ভবেশবাবু ওকে জিজ্ঞেস করলেন,'তোমার বাবার নাম কি ? ব্রাহ্মণ তোমরা ?'

'হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের পদবী হলো সিংহ।'

'ও, এটাও জানো। বাঃ, তা, তোমার কি পড়ার ইচ্ছে আছে ?'

'বাবু, তাহলে আমি তো বেঁচে যাই, আর কিছু চাই না। আপনার সব কাজ করে দেব, যদি একটু পড়াশুনো করতে পারি। দেবেন বাবু এমনি একটা কাজ ?'

হাসলেন ভবেশবাবু, 'তা বাবা সব কাজ করবে বলছো যে, কিন্তু ইস্কুল গেলে তো দশটা থেকে চারটে পর্যন্ত ওখানেই থাকতে হবে।'

নিতাই মুখ নামাল। কিন্তু ভবেশবাবু দেখলেন, নিতাইয়ের কপাল ঘেমে উঠেছে।

ভবেশবাবু চা-খাবার খেতে শুরু করলেন, নিতাই মুখ নামিয়ে বসে রইল।

ভবেশবাবু বোধহয় ভাবতে লাগলেন কতটা কি করা যায়, একটা ছেলের জন্যে কত খরচ হবে, তা ছাড়া চোর-ডাকাত হবে কিনা শেষ পর্যন্ত–কোনো সিদ্ধান্ত নেবার আগে এগুলো ভেবে দেখা উচিত বৈকি !

তবু খাওয়া শেষ হতে বললেন, 'নিতাই, আমি যদি তোমাকে নিয়ে যাই, আমার সংগে যাবে ?'

মুখ তুলল নিতাই, 'আমি পড়তে পারব তো ?'

'হ্যাঁ, তা পারবে, তবে তোমার তো অনেকটা সময় নষ্ট হয়েছে, এখন ভাল করে মন দিয়ে পড়বে তো ?'

'হ্যাঁ বাবু, দেখবেন।'

আগ্রহে যেন নিতাইয়ের হাত দুটো কাঁপছে।

'চোর-ডাকাত হবে না তো ?'

একটু চুপ করে থেকে বলল নিতাই, 'বাবু, কি বলব এখন, যদি যেতে চান তো আমার গ্রাম দেখিয়ে দিচ্ছি, সেখানকার লোকদের জিজ্ঞাসা করবেন–বাবা কেমন লোক ছিলেন ! সবাই বলে–দেবতুল্য লোক !'

ভবেশবাবু মন ঠিক করে ফেললেন, 'যদি এখন যাই, আমার সংগে যেতে পারবে ?'

'হ্যাঁ। এখনই। একজনের রকে শুই, আর জামা-কাপড় বলতে এই দুটো, আর একটা হাফপ্যান্ট আছে।'

'তা হলে চলো।'

এই বলে মালিকের টাকাকড়ি চুকিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই নিতাইকে নিয়ে আমি ইস্টিশান পর্যন্ত যাব।'

তিনি কে, কত বড় অফিসার জানা নেই তো, কাজেই মালিক কিছু বলতে পারলেন না।

ভবেশবাবুর এখানে এসেই–বাড়ির কাজ সব মাথায় তুলে নিল নিতাই। অবশ্য ভবেশবাবুর বাড়ি ছোট, ছেলেমেয়ে তিনটি–তারা সবাই ছোট-ছোট, বড়ছেলে ক্লাশ সেভেনে উঠেছে সবে।

নিতাই ঘরমোছা, কাপড় কাচাকাচি, দুধ আনা, বাজার করা সবই করে। সব কাজই সে হাসিমুখে করে।

এর মধ্যেই পড়াশুনোও করে–তাতেই ভবেশবাবু অবাক হয়ে যান। অবশ্য বই-খাতা ভবেশবাবু এনে দেন–ওর উৎসাহ দেখে যতটা পারেন সময় থাকলে পড়া-লেখাও বলে বুঝিয়ে দেন। বেশি বয়সে পড়তে এসেছে বলে ভবেশবাবু ওকে ইস্কুলে দিলেন না, বললেন, 'তুমি মন দিয়ে বাড়িতেই পড়ো, তারপর ইস্কুলের পাঠ শেষ করে পাস করো। ভালভাবে পাস করলে আমি তোমাকে কলেজে দেব।'

তা নিতাই অসাধ্যসাধনই করল।

তিন বছরেই সে স্কুল ফাইনাল দিল। শুধু তাই নয়–জলপানি পেয়ে পাস করল।

এবার কোন কলেজে দেবেন সেইটেই ভাবছেন ভবেশবাবু, হঠাৎ ভবেশবাবুর এক মামা এসে গেলেন।

তিনি সব শুনে আর দেখে ভবেশবাবুকে বললেন, 'ভবেশ, ওকে আমাকে দাও। নিতাইকে আমি নিয়ে যাই।'

মামা থাকেন পাটনায়, তিনি প্রায় ভবেশবাবুর বয়সী, তাঁর দুটো ছেলে নাকি পড়াশুনা করে না, মামা ওকালতি করেন, তাঁর সময় কম, ছেলে দুটোকে দেখতেও পারেন না।

ভবেশবাবুর ইচ্ছা ছিল না, নিতাইয়ের তো একেবারেই ভাল লাগেনি ব্যাপারটা–সে নিজেই আগবাড়িয়ে বলেছে, 'না না, এখানের এত কাজ, বাবু এখন কিছুই করতে পারেন না। এরা আছে–'

কিন্তু মামা একেবারে নাছোড়বান্দা। বললেন, 'ভবেশ, তোমার ছেলেমেয়েরা অনেকটা মানুষ হয়ে গেছে–কিন্তু আমার ছেলে দুটো একেবারে বাউন্ডুলে হয়ে যাবে।....তুমি বরং অন্য লোক রাখো, তার সব খরচ আমিই দেব।'

তা সম্ভব নয়, ভবেশবাবু কেন, নিতাইও বুঝেছে।

তবু শেষ পর্যন্ত দিতে হলো ছেড়ে। নিতাইয়ের মনে হলো–এখন তার যেন ক্রীতদাসের অবস্থা, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় বিক্রি করে দেওয়া হলো তাকে।

তবে পাটনায় গিয়ে তার অনেক ভাল লাগল, ওঁদের ব্যবহার ভাল, মামা বাড়ির কাজ ওকে দিয়ে করালেনই না। দুধ আনা, বাজার করা–তাও সবসময় করতে হয় না। কাজ শুধু ওঁর দুটো ছেলেকে দেখা।

নিতাই ওদের দেখেই বুঝেছিল, এরা নিতাইকে দেখেই মাস্টারের মতো ভেবেছে একরকম। নিতাই সে পথেই গেল না। একেবারে ওদের বন্ধুর মতো মিশে গেল। খেলাধুলো, এদিকে ওদিকে ছবি দেখা, আড্ডা দেওয়া–এইসব চলতে লাগল।

মামা প্রথমে বুঝতে পারেননি, কিন্তু পরে বুঝেছিলেন, বন্ধুর মতো গোড়াতে না হলে ওঁর ছেলেদের সামলাতে পারবে না। আর সত্যিই তাই হলো। কিছুদিনের মধ্যেই তারা বন্ধু হয়ে গেল। ওরা আর বাইরে ঘুরে বেড়ায় না, নিতাইদার সংগে গল্প-গুজব করতেই এখন ভাল লাগে ওদের।

মামা নিশ্চিন্ত হলেন। তিনি ওকে ভাল কলেজে ভর্তি করে দিলেন। মাইনেপত্তর, বই-খাতার সব খরচই উনি দিতেন। নিতাই দেখতে দেখতে অধ্যাপকদেরও প্রিয়পাত্র হয়ে পড়ল। তাঁরাও অনেক সাহায্য করতে লাগলেন। চার বছর কেটে গেল। নিতাই বেশ ভালভাবেই বি এ পাস করল।

নিতাইয়ের ইচ্ছা ছিল এম এ পাস করার। কিন্তু মামা বললেন, 'না, দ্যাখো–এম এ পাস করলেই কি ভাল কোনো কাজ পাবে ? তুমি বরং আইনের ক্লাশে ভর্তি হও। এম এ পড়তে চাও তাও পড়ো। এদিকে আইন পড়ে নিলে আমি

তোমাকে সঙ্গে করে আদালতে নিয়ে যাব। আমার চেয়ে বড় উকিল হয়ে যাবে–তোমার যা মাথা!

নিতাই বুঝল। সে রাজী হলো। আইন কলেজে ভর্তি হয়ে গেল।

মাস চারেক কেটে গেছে। নিতাই 'ল'-এর সঙ্গে এম এ-ও পড়তে লাগল। ভবেশবাবু খুব বাহবা দিলেন, আশীর্বাদ করলেন। তাঁকেই দেবতার মতো ভেবে নিতাই মনে মনে প্রণাম করে। ওঁর দৌলতে সে উন্নতির পথে যাচ্ছে। হয়তো মানুষের মতো মানুষ হতে পারবে, ভদ্রসমাজে মুখ দেখানোর মতো হবে। বাবা-মার নাম রাখবে।....

কিন্তু হঠাৎ-ই একটা টেলিগ্রাম এল বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো।

ভবেশবাবু মারা গেছেন। হঠাৎ-ই। এক কাপ চা খেতে যাচ্ছেন সকালবেলায়, সে চা আর মুখে তোলার সময় পেলেন না। এক মিনিটের মধ্যে চোখ বুজলেন।

নিতাই কান্নাকাটি করল না, পাথরের মতো কিছুক্ষণ বসে থাকার পর শুধু মামাকে বলল, 'এখন কলকাতা যাবার কি ট্রেন আছে?'

'এই ঘণ্টাখানেক পরেই গাড়ি আছে একটা। তুমি কিছু খেয়ে নাও, আমি গিয়ে তোমায় তুলে দেব।'

'এখন খাওয়ার কথা ভাবতে পারছি না। বরং ঐ ব্যাগটা বাবু দিয়েছিলেন–ঐটেতেই জামা-কাপড় গুছিয়ে নিই।'

অন্য সকলকে বিভিন্ন নামে ডাকে বা দাদা-দিদি বলে, ভবেশবাবুই ওর কাছে একমাত্র বাবু।

'তা নাও। অবশ্য এ অবস্থায় তোমার খাবার কিছু ইচ্ছা থাকবে না। কদিন পরে ফিরবে মনে করো? দু'দিকের ক্লাশ, বেশি দেরি করলে পার্সেন্টেজ কাটা যাবে যে আবার।'

নিতাই শান্তসুরে বলল, 'আর বোধহয় আসা হবে না।'

'সেকী? আর ফিরবে না? তোমার কেরিয়ার নষ্ট করবে? না, না, চলে এসো।'

মাথা হেঁট করেই বলল নিতাই, 'তিনি বড় উড়নচণ্ডি গোছের ছিলেন–তা তো জানেনই। টাকা জমাবার কথা কখনও ভাবেননি। আমি সেটা ভালো করেই জানি। তিনটি ছেলে-মেয়ে। মা কি বিপন্ন হয়ে পড়েছেন–না, না, আমাকেই ঋণ শোধ করতে হবে যে!'

কলকাতায় পৌঁছে বাড়িতে এসে দাঁড়াতে, ভবেশবাবুর স্ত্রী চীৎকার করে উঠলেন, একেবারে নিতাইয়ের বুকে যেন আছড়ে পড়লেন। 'ওরে কি সর্বনাশ হয়ে গেল! ছেলেমেয়ে সব কোথায় দাঁড়াবে, কী করব আমি? কি খাবে ওরা?'

নিতাই তাঁকে বসিয়ে বলল, 'মা, আপনি তো আমাকে আপনার বড়ছেলে বলেন, তাহলে কেন এত চিন্তা করছেন? মা, আমি যেমন করেই হোক ওদের মানুষ করব। বোনের বিয়েও দেব।'

সত্যিই অসাধ্যসাধন করল নিতাই।

সে ভোর চারটেয় উঠে বাড়িঘর সেই আগের মতো ধোওয়া-মোছা করে, দুধ আনতে যায়, তার সঙ্গে বাজার। তারপর একটু কিছু খেয়ে–ততক্ষণে মা উঠে রান্নার কাজ শুরু করেন–বেরিয়ে পড়ে ছেলে পড়ানোর কাজে। সারাদিনে ছ'টা বাড়িতে যায়, ইস্কুল নয় শুধু, কলেজের ছাত্রও পড়ায়। আর ভালই পড়ায়। সে কথাটা চালু হতে অনেকেই তাকে চায়, আর টাকাও বেশি দেয়।

সারা দিনরাতে বোধহয় ছ' ঘণ্টার বেশি বিশ্রাম পায় না নিতাই। ভবেশবাবুর স্ত্রী বলেন, 'তুই অত খাটলে মরে যাবি যে।'

নিতাই বলে, 'মা, দেনা শোধ করার অনেক আনন্দ আছে, তাই তো আমার খাটুনি গায়ে লাগে না।'

ছবি: বিজন কর্মকার

# গ্রন্থকীটের ভাবনা

রবিদাস সাহারায়

সারি সারি বই সাজানো ভরা বইয়ের তাকটা,
সেই বাড়িরই বড় ছেলে বাড়িয়ে দেয় ফাঁকটা।
পড়বে বলে অনেক বই টেনে টেনে নামায় সে,
পাতার পরে উলটে পাতা মাথা কত ঘামায় যে।
কাজ ফুরালে হাতে তুলে সাজিয়ে আবার রাখে ঠিক,
ছেলেটা খুব কাজের বটে, নজর রাখে সকল দিক।
'বইয়ের পোকা' বলে কেন খেপায় তাকে বাড়ির লোক,
মানুষ হবে পোকা কেন, স্বভাব যতই মন্দ হোক?
একটার পর একটা পড়ে, বই তো মোটে খায় না,
তবে কি সে এতই বোকা, ফন্দি খুঁজে পায় না?
পুঁচকে পোকা হয়েও আমি কাজ করি তো ঠিকঠাক,
বইয়ের ক্ষতি করি বলে যে যা খুশি বলে যাক্।
ঐ ছেলেটা হোক না বড়, বুদ্ধিতে সে বাচ্চা,
'বইয়ের পোকা' বদনামটা হজম করে আচ্ছা!
কেটে কুটে বইগুলোকে শেষ যদি সে করতো,
এমনভাবে দিন রাত্তির খেটে কি আর মরতো?

ছবি: অমল চক্রবর্তী

# দি গ্রেট বাতাসা রহস্য

সুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

কুট্টি আর নন্দন শেষ পর্যন্ত ঠিক করে ফেলল ওরা একটা ডিটেকটিভ এজেন্সি খুলবে। ওরা হয়তো খুলতো না, কারণ একজন তোপসের মতো অ্যাসিসটেন্ট ছিল না বলে ওরা একটু ধন্দের মধ্যে ছিল। কিন্তু কুট্টির বড় ভাইপো যখন আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে এল তখন সেই বুদ্ধি দিল। ছোটকাকা, এরকম বসে থাকার কোনো মানে হয় না। তোমরা একটা সাইন বোর্ড টানিয়ে দাও, তাতে লিখে দিও তোমাদের একজন আমেরিকান এ্যাসিসটেন্ট আছে। এখানে তো বিদেশী জিনিসের কদর খুব। আমার ঠামার জামা দেখে লোকে বলে, কি সুন্দর, নিশ্চয় আমেরিকায় তৈরি!

সেই মতো নন্দনের জেঠু একটা সাইনবোর্ড করিয়ে দিলেন,

"কুট্টি-নন্দন অ্যাসোসিয়েটস"

আমরা গোপন অনুসন্ধান করিয়া থাকি

আমাদের সঙ্গে মার্কিন সহকারী আছে।

দুটো দিন কিছুই হলো না। তৃতীয়দিনে নন্দনের মার সোনার দুল হারিয়ে গেল। তখন আমেরিকান সহকারী তার খেল দেখালো। হাতে কি একটা যন্ত্র নিয়ে সারা বাড়ি ঘুরে বেড়ালো। আর যেখানেই কট্ কটকট শব্দ হয় সেখানেই দাঁড়িয়ে যায় আর খোঁজে। খুব গম্ভীরভাবে বললো, এই লাঠিটার আগায় একটা ছোট্ট মেটাল ডিটেকটার আছে। ওই লাঠিটার দৌলতে দুল তো পাওয়া গেলই, সঙ্গে সঙ্গে বহুদিন আগে হারানো চাবির গোছাও পাওয়া গেল।

ওই লাঠির তখন খুব নাম হয়ে গেল পাড়াতে। সবাই বলতে লাগলো, ওইটুকু ছেলে কিন্তু কি দারুণ বুদ্ধি! কেউ কেউ অবশ্য বললো, ওইরকম লাঠি পেলে আমরাও করতে পারতাম। তাতে কিছু আসে যায় না, কারণ কিছু লোক ওই রকমই হয়। তবে কোনো গম্ভীর ব্যাপারে মেয়েদের নিতে নেই। ওরা হ্যা হ্যা করে সব গোলমাল করে দেয়। টুকুদি সারাদিন ওই লাঠিটা নিয়ে আদাড়ে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। ফলে অনেক ভাঙা মগ, ভাঙা টিন খুঁজে বের করল। সে এক কেলেঙ্কারি। তবে বাড়িতে ওই বয়সের মেয়ে থাকলে কেলেঙ্কারি অবশ্যম্ভাবী। সবচেয়ে খারাপ জিনিস হলো টুকু ওই টিনফিন বিক্রিয়ালার কাছে বিক্রি করে সেই টাকা দিয়ে ফুচকা খেল, আর রুরুকে বলল, ভাগ, তোর আমেরিকান পেটে সহ্য হবে না।

একদম বাজে কথা। রুরু পাল্লা দিয়ে আম খেতে পারে, ফুচকা খেতে পারে। কিচ্ছু হয় না। ও টুকুদিকে চিনে রাখলো।

তারপর একদিন নানীর ঠামিরা ব্যান্ডেল থেকে কলকাতায় চলে এলেন। আর তারপরেই নন্দন-কুট্টি এ্যান্ড আমেরিকান এ্যাসিসটেন্টের নাম ছড়িয়ে পড়ল।

নানীর ঠামি ভক্তিমতী মহিলা। তিনি ঠিক করেছেন রোজ নারায়ণকে বাতাসা দেবেন। সাদা বাতাসা। সাদা বাতাসা সব সময়ে পাওয়া যায় না, তাই ঠামি এক টিন ভর্তি বাতাসা কিনে রেখেছিলেন। কিন্তু রহস্যজনকভাবে বাতাসারা অদৃশ্য হয়ে যেতে লাগলো। নানীর মার সঙ্গে নন্দনদের বেশ ভাব। খাওয়ায়-দাওয়ায় ভাল। সুতরাং ভাব হওয়াটাই স্বাভাবিক।

নানীর মার ডাকে তিনমূর্তি গিয়ে হাজির হলো নানীদের বাড়ি। ভুল বললাম, শুধু নন্দন আর কুট্টি। আমেরিকান এ্যাসিসটেন্ট বললো, আমি পরে যাচ্ছি, তোমরা এগিয়ে যাও।

কুট্টি যত তার ভাইপো-কাম-এ্যাসিসটেন্টকে দেখে তত ওর সন্দেহ দৃঢ়মূল হতে থাকে যে, বর্তমানে বাচ্চারা একেবারে জ্যাঠামশায় হয়ে জন্মায়। তোমরাও আগে রুরুর কথাই ধর। যে কোনো ব্যাপারে ও একটা চিন্তিত মতামত দেবে। আর সে বললে কাজ হয় জানে, তাই বলবে বাচ্চারা যা চায় সে-দেরকে সেটা দিতে হয়। কুট্টির ইচ্ছা হয় বলতে, আর সঙ্গে সঙ্গে সে-দেরকে বেশ ভাল করে কান মুলতে হয়। কিন্তু গুণধর ভাইপোর গায়ের কাছে হাত নিয়ে গেলেই ভাইপোর দাদু-ঠাকুমারা হাঁইহাঁই করে ছুট আসবেন।

সুতরাং কিছু ইচ্ছা দমন করতেই হবে।

কিছুক্ষণ বাদে রুরু এলেন, সঙ্গে পান্নাকাকা,বাপ্পাকাকা।

নানীদের বাড়িতে কলিংবেল বাজলেই সুর বেজে ওঠে–Do a deer a female deer, Re a drop of golden sun,

Me a name I call myself, Fa a long long way to run.রুরু ঢুকলো, তারপরই তার আরেক কাকা বাপ্পার দিকে তাকিয়ে খুব বিজ্ঞের মতো বললো, বাপ্পা কাকা, এই সিনেমার গানটার বদলে তুমি এই বাজনাটাতে মেঘের কোলে রোদ হেসেছে সুরটা ঢুকিয়ে দিতে পার না? বাপ্পা কম্পিউটার পড়ছে, তাই আদেশটা তাকে।

রুরু একজন পাকা মাস্টার। এখানে এসে তার বাংলা জ্ঞান দেখিয়ে সকলকে তাক লাগাচ্ছে। নয়ন, কেশ, কর্ণ তো বলছেই, এ ছাড়া ছাতুয়ালা বাজমোহনের পাশে বসে ছাতু বিক্রি দেখছে। পাড়ার সন্দীপের কাকার দোকানে গিয়ে বলছে, ক্যাডবেরী চকোলেটের মতো ভাল চকোলেট আমেরিকায় পাওয়া যায় না। মিষ্টির দোকানে গিয়ে বলছে, আমি যে কালজাম খেতে চাই।

সবাই মুগ্ধ।

এখন ও পান্নাকাকাকে নিয়ে এসেছে। তাকে কি জ্ঞান দিয়েছে কে জানে! পান্নাদার মুখ যে রকম উদ্ভাসিত তাতে মনে হয় ভালই জ্ঞান দিয়েছে।

রুরু এসে বললো, এ বাড়ি থেকে হরদম বাতাসা চুরি যাচ্ছে। কোন চোর আর বাতাসা চুরি করবে! যদিও বাতাসা অতি উত্তম। আমার বাবা ছোটবেলায় ক খ গ বলতে ত থ দ বলতো, তাই বাতাসাকে বাকাসা বলতো।

কুট্টির মনে হলো বলে, হ্যাঁ, তুমি তো তোমার বাবাকে কোলে নিয়ে ঘুরতে। রুরু ততক্ষণে পান্নাদাকে বলছে, পান্নাকাকু, তুমি এমন একটা ব্যবস্থা করে দাও যাতে এই বাতাসার টিনটা কেউ নড়ালেই বাড়ির কলিংবেলটা বেজে ওঠে। পান্নাদা অনেকক্ষণ দেখলো, তারপর বললো, তুমি যখন বলছো তখন করে দেব। নন্দন মনে মনে বললো, মজুরীটাও ওর কাছ থেকেই নিও। তারপর কুট্টির দিকে তাকিয়ে বললো, তোমার ভাইপো খুব মিষ্টি ছেলে। ও বড় হয়ে আমার মতো ইলেকট্রিকের কাজ করবে বলেছে। কাল থেকে দোকানে বসে থাকবে। আমাকে একটা খাতা করতে বলেছে যাতে লেখা থাকবে কে কখন আমায় ডাকতে এসেছিল। হবে না কেন, আমেরিকায় শিক্ষা পাচ্ছে তো!

কুট্টি আর পারলো না। বললো, তুমি ওর ঠাকুরদা, ওর বাবাকে চেনো তো! আমার জেঠু, বাবা, দাদা এরা তো এদেশী, এরাও তো কাজ করে ঘড়ি ধরে।

পান্নাদা একটু থতমত খেলো। রুরুর দিকে তাকিয়ে কুট্টি মনে মনে বললো, gas master হয়েছো। রুরু খুব ভক্তিভরে কুট্টির দিকে তাকিয়ে বললো, ছোটকা কিছু বলছো? ছোটকা জ্বলন্ত দৃষ্টি দিয়ে বললো, না।

ততক্ষণে নানীর ঠাকুমা-দাদু এসে গেছেন। তাঁদের দিকে তাকিয়ে রুরু বললো, আমি কিছু বলতে চাই।

ওঁরা বললেন, বলো, বলো। তখন রুরু জিজ্ঞাসা করলো, তোমরা ইঞ্জিরি না বাংলা?

ওঁরা সবাই যখন বললেন, আমরা বাঙালী, তখন রুরু একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিল ডাইনাসুরদের ক্রমবিবর্তনের ওপর। মাঝে মাঝে পকেট থেকে প্লাস্টিকের এক একটা ডাইনাসুর বার করে ও বুঝিয়ে দিচ্ছিল কি করে হার্বিভোরাস বা তৃণভোজী থেকে ডাইনাসোরাস টিরানোসেরাস হয়ে মাংসভোজী হলো। শুধু টিরানোসেরাস নয়, টিরানোসেরাস রেক্স বা রাজা। এইটা বলার সময় ও ওর দুটো হাত তুলে কচি কচি মাসল ফুলিয়ে এমনভাবে দাঁড়ালো যেন ওই টিরানোসেরাস রেক্স। পাকামিতে যে রুরু রাজা, এটা কুট্টি স্বীকার করে নিল। অন্যরা ওর বিদ্যাবুদ্ধি ইত্যাদিতে মোহিত হয়ে গিয়ে বলতে লাগলো, বংশের মান রাখবে। কুট্টি তখন ওর বাড়ির সব বাবা কাকা দাদা দিদিদের মুখ স্মরণ করে বললো, না না, ওর মাথা ঠিক আছে, ও কেন পাগল হতে যাবে! আমি ওকে পড়াব। তখন রুরু খুব গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করল, ছোটকা, তুমি কি শেয়াল পন্ডিত!

রুরুকে আদর করবার জন্য আরেকদিকে কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। পরে ঠিক হলো, নন্দন-কুট্টি আর রুরু পালা করে রাত্রে জেগে থাকবে। আর সঙ্গে থাকবে একটি শক্তিশালী টর্চ। কারণ কখন লোডশেডিং হয় বলা যায় না। বেলটাকে ইন্‌ভারটারের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়ে গেছে পান্নাদা।

রাত তখন একটা, সারা বাড়ি ঘুমোচ্ছে, এমন সময় do re me বেল বেজে উঠলো। শক্তিশালী টর্চ পড়লো বাতাসা রাখার জায়গায়।

ওমা! রুরু আর কুট্টি দেখল ছোট্ট ছোট্ট হাতে নানী চেয়ারটা এনে মিটসেফের পাশে রাখলো তারপর ছোট্ট পা আর হাত দিয়ে মিটসেফের ওপরতলায় গিয়ে দাঁড়িয়ে বাতাসার টিনটা নামালো। তারপর সেটা নিয়ে এগিয়ে চললো, বাসন-কোসনের জায়গা থেকে একটা চামচে নিল। তারপর গুটিগুটি পায়ে গিয়ে হাজির হলো যেখানে ওদের পুজোর ঘর সেখানে। সেখানে গিয়ে নানী টিনটা খুললো, তারপর একটা বাতাসা বার করে ছোট্ট দুটি হাত দিয়ে নমস্কার করলো ঠাকুরকে, তারপর দুটো বাতাসা সামনের থালিতে রাখল।

তারপরই আবার সেইরকম নমস্কার করে বাতাসা দুটো তুলে নিল আর মাথায় ঠেকিয়ে মুখে চালান করে দিল। রুরু-কুট্টি একেবারে হাঁ হয়ে গেল। টুকুদি, নানীর দাদু, ঠামি সবাই এই অপরূপ দৃশ্য দেখলেন। কুট্টি-নন্দন এ্যান্ড দেয়ার আমেরিকান এ্যাসিসটেন্টের প্রথম রহস্যভেদ হলো। চোরকে নিয়ে প্রায় লোফালুফি চলতে লাগলো। আর ঠিক হলো দুটো জিনিস–

(১) নানীর জোড়া দাদু ঘোষণা করলেন বাড়িতে সব সময় যথেষ্ট বাতাসা রাখা হবে। যাতে নানী তার ইচ্ছেমতো খেতে পারে।

(২) কুট্টি-নন্দন-এ্যাসোসিয়েটসদের বাতাসা-রহস্য ভেদের জন্য ভালোমতো পারিশ্রমিক দিতে হবে।

কিন্তু শেষবেশ বাতাসা একটু তেতো হয়ে গেল একটা গোলমালে। গোলমালটা টুকুদি করলো। ও বললো, নানী তো এ রকমই করে, আমি অনেকবার দেখেছি। এই তোদের গোয়েন্দাগিরি, ছ্যা ছ্যা ছ্যা!

আগেই বলেছিলাম না মেয়েরা কোনো কম্মের না।

ক্ষুদে ডিটেকটিভরা একদম পারিশ্রমিক পায়নি বললে ভুল বলা হবে।

ওরা পূজায় খরচ করবার জন্য হাতখরচ পেয়েছিল। আর একেবারে বিরাট আকারের একটা করে ক্যাডবেরী পেয়েছিল।

সে ক্যাডবেরীগুলোর কি হলো?

ঠিকই আঁচ করেছো। রুরু ঘোষণা করল, আমি ক্যাডবেরী খেতে চাই। আর ছোটরা কিছু খেতে চাইলে সেটা সে-দেরকে দিতে হয়, সুতরাং তিনটে চকলেটের বেশির ভাগটা রুরুর উদরস্থ হলো। অ্যামেরিকান এ্যাসিসটেন্ট বলে কথা!

# হারিয়ে যাচ্ছে যারা

*পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে যেতে বসেছে যে সব বন্যপ্রাণী তাদের শ্রেণীসংখ্যা হাজারের ওপর। এবং আরও কয়েকশ প্রজাতির অস্তিত্বও বিপন্ন হবে যদি না এখনই তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ভালোমত ব্যবস্থা নেওয়া হয়।*

## ফ্লোরিডা প্যান্থার

ফ্লোরিডা প্যান্থার হারিয়ে যাচ্ছে শুধু অভ্যস্ত পরিবেশের অভাবে। প্রাণীবিদ্‌দের ধারণা বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো খাঁটি ফ্লোরিডা প্যান্থারের সংখ্যা কমতে কমতে ত্রিশ কি পঞ্চাশে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য বিভিন্ন চিড়িয়াখানায় এবং অভয়ারণ্যে পালিত হচ্ছে কিছু কিছু, যেমন পালিত হচ্ছে আরও অনেক বন্যপ্রাণী।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে মানুষের আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত নিরাপদ জীবন কাটাতে কাটাতে বন্য প্রাণীদের বন্য সৌন্দর্য কতটা বজায় থাকবে! প্যান্থার-মা ও সিংহ-পিতার এই তিন বছরের শাবকটির চোখেও বুঝি সেই ক্রুদ্ধ জিজ্ঞাসা। বুঝি সে বলতে চায়, কেন তোমরা বল যে বন্যেরা বনে সুন্দর! আর কেনই বা আমাদের সুন্দর সুন্দর বন-জঙ্গলগুলো কেটে কুটে তছনছ কর! কেন? কেন?

## কালো গণ্ডার

আফ্রিকার প্রাণীজগৎ থেকে যারা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে কালো গণ্ডার তাদের অন্যতম। নাকের ওপর পরিপুষ্ট খাঁড়াজোড়াই ওদের শত্রু। কালোবাজারে ওদের একজোড়া খাঁড়ার দাম পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ সতের লক্ষ টাকা। চোরাগোপ্তা শিকারীরা তাই সুযোগ পেলেই এদের মারে।

## হ্যামাড্রিয়াস বেবুন

হ্যামাড্রিয়াস বেবুন। আফ্রিকার প্রাণীজগতের এক অতি পুরোনো সদস্য। বেশ একটু পণ্ডিত পণ্ডিত হাবভাব। প্রাচীন মিশরীয়রা তো রীতিমত সম্মান করত এদের, এমনকি পুজোও করত জ্ঞানের দেবীর অনুচর হিসেবে। এখন কিন্তু গোটা মিশরে আর একটিও এই জাতীয় বেবুন নেই। আছে কেবল ইথিওপিয়ায়। তাও সংখ্যায় অতি নগণ্য। এরা সার্কাসের খেলা রপ্ত করতে পারে খুব তাড়াতাড়ি আর পোষ মানলে মনিবকে আগলায় একান্ত আপন জনের মতো করে। বন্ধুবান্ধব কাউকে মনিবের ধারে কাছে ঘেঁষতে দেয় না।

(ছবি ঃ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির সৌজন্যে)

# উল্টো সোজা তাসের খেলা

যাদুকর পি. সি. সরকার (জুনিয়র)

ছবি ঃ অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়

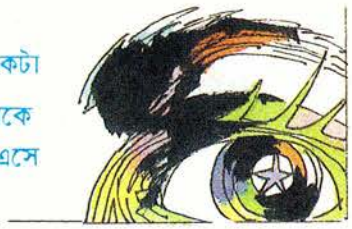

সেদিন বিকেলে আমরা ক'বন্ধু ঘরে বসে গল্প করছিলাম। ছোটরা অন্য একটা ঘরে তাস খেলছিলো। আমরা নানা বিষয়ে আলোচনা করছিলাম। রাজনীতি থেকে খেলাধূলা কিছুই বাদ যাচ্ছিলো না। হঠাৎ আমার ছোট মেয়ে মমতাজ ছুটতে ছুটতে এসে ঘরে ঢুকলো।

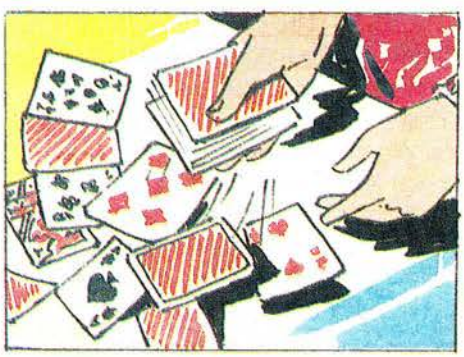

তাই আপনার মেয়ে এসে বললো, তাসগুলো সব নষ্ট হয়ে গেছে।
তা মিঃ সরকার ঐ উল্টো-পাল্টা তাসগুলো দিয়ে আমাদের একটা ম্যাজিক দেখান না!
এ আর এমন কি কথা! এক্ষুণি দেখাচ্ছি.....
প্রথমে দশটা তাস নিচ্ছি–যার মুখগুলো সোজা আছে। মানে আমাদের
দিকে ফেরানো আছে.....
আরও দশটা তাস নিলাম যার মুখগুলো নিচের দিকে ফেরানো.....
দেখুন, এই কুড়িখানা তাস মুখোমুখি সোজা হয়ে আছে....
এবার তাসগুলোকে মুখোমুখি মিলিয়ে দিলাম.....
এই নিন, তাসগুলো খুব ভালো করে সাফল করে দিন.....
বেশ তো, তাই করে দিচ্ছি!
খুব ভালো করে করুন– যাতে সমস্ত তাস উল্টো-পাল্টা হয়ে যায়।
এই নিন, সব তাসই এখন একদম উল্টো সোজা হয়ে গেছে।

আমায় দিতে হবে না। ওপর থেকে দশটা তাস সোজা-উল্টো যেমন আছে তেমনি করেই একদিকে রাখুন.....

দেখুন, আমি পেছন ফিরে আছি। আমার পক্ষে নিশ্চয়ই কিছু দেখা সম্ভব নয়.....

এই নিন মিঃ সরকার, হয়ে গেছে.....

তাসগুলোর ক'টার মুখ সোজা আর ক'টার মুখ উল্টো তা কি আমি দেখেছি ?

না, না! আমি তো তাসগুলো আপনার আড়ালে রেখেছি।

ঠিক মতো লক্ষ্য রেখেছিলেন তো ?

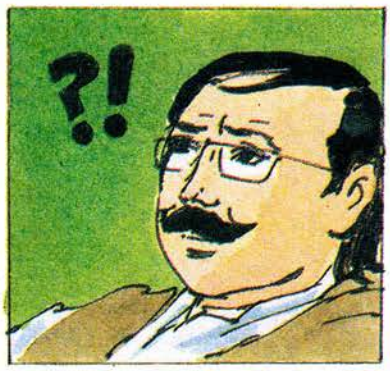
?!

ঠিক আছে, বাকি তাসগুলো এবার আমি টেবিলের ওপর বিছিয়ে দিচ্ছি

আপনার যতোগুলো সোজা তাস আমারও ততোগুলো সোজা হোক, আপনার যতোগুলো উল্টো তাস আমারও ততো গুলো উল্টোই হোক !

দেখি তো কেমন মিলেছে আপনার ? আমার হলো গিয়ে সাতখানা সোজা....তিনখানা উল্টো.....

এই যে মিলিয়ে নিন..... আমারও সাতখানা সোজা.... তিনখানা উল্টো..... কি মিলেছে তো ?

সেদিন ভীষণ অবাক হয়ে গিয়ে বারবার জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও বন্ধুদের কাছে এই ম্যাজিকের রহস্য ফাঁস করিনি। এসো, তোমাদের খেলাটা শিখিয়ে দিই। এটা কিন্তু একরকম অঙ্কের খেলা। মোট দশটা সোজা আর দশটা উল্টো তাস ছিলো। ধর, সাফল করার পর দর্শক টানলেন সাতটা সোজা আর তিনটে উল্টো তাস। তাহলে বাকী রইলো তিনটে সোজা আর সাতটা উল্টো তাস তাই তো.....

কারণ যোগফল কোনো অবস্থাতেই দশের বেশি হতে পারবে না..... এখন তোমার কাছে সাতটা উল্টো আর তিনটে সোজা তাস আছে.....

যদি তুমি দর্শকদের অলক্ষ্যে তাসগুলো যেমন আছে তেমনভাবেই ধরে উল্টে দাও তাহলে অবস্থাটা কি দাঁড়াচ্ছে ?

উল্টো তাসগুলো সোজা হয়ে যাবে আর সোজাগুলো উল্টো হয়ে যাবে–তাই না ? তাহলে তিনটে সোজা তাস উল্টে গিয়ে হয়ে যাবে তিনখানা উল্টো তাস আর সাতখানা উল্টো তাস উল্টে গিয়ে হয়ে যাবে সাতটা সোজা তাস। ব্যাপারটা বুঝলে তো ?

ব্যাস, দর্শকের তাস যা ছিলো–তোমারও তাই হয়ে গেলো। দর্শককে কথায় ভুলিয়ে রেখে তোমার তাসগুলোকে এ হাত থেকে অন্য হাতে নেওয়ার মধ্যেই তাসগুলো উল্টো নেবে। এমন ভাব করে কাজটা সারবে যাতে দর্শকরা ভাবেন, তুমি শুধু হাত বদলে নিলে।

# হেরডের স্বপ্ন সিজারিয়া

সুরভি বসু

১৯ জানুয়ারি, ১৯৯১। গোটা পৃথিবীর মানুষ চমকে উঠল একটি ভয়ংকর সংবাদে। এ কোন দিকে মোড় নিতে চলেছে উপসাগরীয় যুদ্ধ! ইরাক থেকে জর্ডন পেরিয়ে ইজরায়েলে উড়ে আসতে শুরু করেছে স্কাড ক্ষেপণাস্ত্র! লক্ষ্য টেল আভিভ ও হাইফা! ইজরায়েলবাসীর মতো বিশ্ববাসীও সেদিন আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। শুধু আতঙ্কিত নয়, কিছুটা উত্তেজিতও। যদি এরপর ইরাক প্রয়োগ করে তার রাসায়নিক অস্ত্র..... যদি ইজরায়েল উদ্যত হয় ইরাকের ক্ষেপণাস্ত্র আক্রমণের জবাব দিতে..... যদি তৈলযুদ্ধ রূপ নেয় ধর্মযুদ্ধে..... যদি..... যদি..... যদি.....। কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত জয় হয়েছে শুভ প্রচেষ্টার, জয় হয়েছে শুভবুদ্ধির। বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে মানুষ। তবে আধুনিকতম অস্ত্রের আঘাতে আঘাতে কুয়েত, বাগদাদ, বসরা, রিয়াদের মতোই ক্ষতবিক্ষত হয়েছে টেল আভিভ ও হাইফা। ঠিক যেমনটি হয়েছিল ৭০০ বছর আগে।

সেদিন, সেই ১২৯১তে মিশর সুলতানের আক্রমণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল বর্তমান টেল আভিভ ও হাইফার মধ্যবর্তী অঞ্চলে গড়ে ওঠা স্বপ্নের মতো সুন্দর একটি নগর। তার নাম সিজারিয়া। রোম সম্রাট অগাস্টাস সিজারকে অন্তরের শ্রদ্ধা জানাতে জুডিয়ার রাজা হেরড স্থাপন করেছিলেন এই নগর ও তার সংলগ্ন বিরাট একটি বন্দর। আর তাই তাঁর নামেই নগরের নামকরণ করেছিলেন সিজারিয়া মারিটিমা ও বন্দরের নাম রেখেছিলেন সিবাসটস, গ্রীক ভাষায় যার অর্থ অগাস্টাস।

খ্রীস্টপূর্ব ১৫ অব্দের কোনো এক সময়। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব

তীরে সিজারিয়া নগরে সেদিন দারুণ উত্তেজনা। রোম থেকে সম্রাটের প্রতিনিধি আসছেন। দলে দলে নগরবাসী তাই চলেছে বন্দরের দিকে। আজ তাদের নগরে এত বড় একটা ঘটনা ঘটতে চলেছে আর তারা কিনা বসে থাকবে ঘরে! সম্রাটের প্রতিনিধি নগরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে সিজারিয়া স্বীকৃত হবে রোমের বন্ধু বলে। সিবাসটস বন্দরও চিহ্নিত হবে শক্তিশালী রোম সাম্রাজ্যের একটি নৌ-ঘাঁটি হিসেবে। একি কম গৌরবের কথা। পুব ও পশ্চিমের দেশগুলোর কাছে সিজারিয়ার মান-মর্যাদা শতগুণে বেড়ে যাবে। সিজারিয়াকে আক্রমণ করার আগে তাদের দ্বিতীয়বার ভাবতে হবে।

রোমের প্রতিনিধিকে রাজকীয় অভ্যর্থনা জানাতে নগরবাসীর সঙ্গে রাজা হেরডও এসেছেন বন্দরে। সম্রাটের কাছে তাঁর ঋণের শেষ নেই। তিনি হেরডের জীবনরক্ষা করেছেন। জুলিয়াস সিজারের মৃত্যুর পর রোমে যখন গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল তখন হেরড প্রথমে অগাস্টাসের বিপক্ষ দলে যোগ দিয়েছিলেন। সাহায্য করেছিলেন অগাস্টাসের শত্রু মার্ক এন্টনীকে। কিন্তু এন্টনী হেরে যাবার পর হেরড দলত্যাগ করে চলে এসেছিলেন অগাস্টাসের পক্ষে। শপথ নিয়েছিলেন যে তিনি রোম সম্রাটের অধীনে একজন আশ্রিত রাজা হয়ে থাকবেন। আপদে-বিপদে সাহায্য করবেন রোমকে। সম্রাট তাঁকে বিশ্বাস করেছিলেন। বিশ্বাস করে যে শুধু তাঁর জীবনরক্ষা করেছিলেন তাই নয়, জুডিয়া ও সামারিয়ার উপকূলে নতুন কিছু এলাকা দিয়েছিলেন হেরডকে। হেরডও সেদিন কৃতজ্ঞচিত্তে সংকল্প করেছিলেন যে সম্রাটের সম্মানে তিনি এমন কিছু তৈরি করবেন যার মধ্য দিয়ে চিরকাল বেঁচে থাকবে তাঁর নাম। রাজার এই ইচ্ছে থেকেই জন্ম নেয় সম্রাটের দেওয়া উপকূল এলাকায় নগর ও বন্দর গড়ে তোলার পরিকল্পনা। আর তার সার্থক রূপায়ণই সিজারিয়া মারিটিমা নগর। খুশি হয়েছেন রাজা হেরড। তিনি ঠিক যেমনটি চেয়েছিলেন তেমনটি হয়েছে তাঁর স্বপ্নের নগর। একটি রোমান শহরের মতো করে তৈরি করা হয়েছে সিজারিয়াকে। নগরের চারদিকে উঠেছে উঁচু প্রাচীর। প্রাচীরের মধ্যে রয়েছে নগরবাসীদের ঘরবাড়ি, মন্দির, বাজার এলাকা, রাজকার্যের বিভিন্ন দপ্তর আর একটি ফোরাম। এখানে বিচারের কাজে বা অন্য কোনো ব্যাপারে নগরবাসীরা একত্রিত হতে পারবে।

হেরডের সিজারিয়া বন্দর।

প্রাচীরের বাইরে তৈরি হয়েছে অভিজাতদের সুরম্য উদ্যানগৃহ। নগরের কেন্দ্র থেকে ঠিক দক্ষিণ দিকে সমুদ্রের মধ্যে জেগে আছে যে উঁচু ভূমি, দিনশেষে যেখান থেকে দেখা যায় সমুদ্রের জল আবীর রাঙা করে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, সেখানে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে নগরের বিশাল থিয়েটার। আর নগরের পুব সীমায় চ্যারিয়েট প্রতিযোগিতা ও অন্যান্য প্রমোদ অনুষ্ঠানের জন্য তৈরি হয়েছে হিপপোড্রোম। এ ছাড়া রোমান শহরের অনুকরণে সিজারিয়াতেও আছে অনেকগুলো স্নানাগার, জায়গায় জায়গায় ফোয়ারা ও ছোট-ছোট জলাশয়। এসবে যাতে ঠিকমতো জল সরবরাহ হয় তার জন্য সুড়ঙ্গ কেটে জল আনা হয়েছে সেই ন'মাইল দূরের মাউন্ট কারমেলের ঝরনা থেকে। কোথাও এতটুকু খুঁত রাখতে দেননি রাজা হেরড। এ নগর তৈরি হয়েছে সম্রাটের সম্মানে। কোথাও এতটুকু ত্রুটি থাকলে সে তো সম্রাটেরই অসম্মান। সেই জন্যই তো ঘরবাড়ি, প্রাসাদ, মন্দির তৈরি করতে যত মার্বেল লেগেছে সব আনিয়েছেন রোম থেকে। এমনকি নগর সাজানো হয়েছে যেসব মূর্তি দিয়ে সেগুলি পর্যন্ত। রাজা হেরডের স্থির বিশ্বাস নিপুণ হাতে সাজানো তাঁর এই সুন্দর নগরটিকে দেখে শুধু রোমের অতিথি কেন স্বয়ং রোম সম্রাটও মুগ্ধ হবেন।

ঠিক এই একই কথা ভাবছিলেন সম্রাটের প্রতিনিধি মার্কস অ্যাগ্রিপ্পা। সম্রাট যদি এ বন্দর দেখতেন তাহলে মুগ্ধ হতেন। এত জাঁকজমকে বন্দর গড়ে উঠেছে যে দেখে তাক লেগে যায়। সিবাসটসে ঢোকার মুখে জাহাজ থেকে তিনি দেখেছেন প্রবেশপথের দুই ধারে সমুদ্র থেকে উঠে এসেছে দুটি সুউচ্চ বেদী। প্রত্যেক বেদীর ওপর বসানো তিনটে করে প্রকাণ্ড মূর্তি। ভেতরে ঢুকেই একদিকে বন্দর প্রধানের দপ্তর। যেসব জাহাজ সিবাসটস বন্দরে আসে তাদের কাছ থেকে কর নেওয়া হয় এখানে। দপ্তরের ঠিক মুখোমুখি প্রবেশপথের আর একদিকে জাহাজকে দিনেরাত্রে আলো দেখিয়ে নিরাপদে বন্দরে আনার জন্য তৈরি করা হয়েছে একটি বাতিঘর। তাঁর জাহাজ যত ভেতরে ঢোকে ততই অবাক হন অ্যাগ্রিপ্পা। কি বিরাট এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছে এ বন্দর। তরঙ্গের প্রচণ্ড বেগকে আটকাতে বন্দর এলাকা ঘিরে লম্বা বাঁধ। বাঁধের ওপর সমুদ্রের দিকে তোলা হয়েছে উঁচু প্রাচীর। প্রাচীরের মধ্যে

সমুদ্রে তলিয়ে যাওয়া বন্দর খোঁজার কাজ চলছে।

মধ্যে একটি করে বুরুজ। অ্যাগ্রিপ্পা দেখলেন বুরুজে বুরুজে মোতায়েন আছে প্রচুর সৈন্য। মনে মনে খুশি হলেন তিনি। সমুদ্রের দিক থেকে যাতে কোনো বিপদ না আসে সেদিকেও ঠিক নজর দিয়েছেন হেরড। সিবাসটস যে ক্রমশ ভূমধ্যসাগরের একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর হয়ে দাঁড়াবে তাতে কোনো সন্দেহ রইল না তাঁর। কি বিশাল কর্মকান্ডের আয়োজন হয়েছে এখানে। বাঁধের ওপর সার সার তৈরি হয়েছে পণ্যসামগ্রী রাখার অসংখ্য গুদামঘর, জেটি, আরো কত কী। অনেকগুলো জাহাজ এখানে একসঙ্গে নোঙর করতে পারবে।

মূল বন্দর পেরিয়ে একটি সরু প্রণালী দিয়ে অ্যাগ্রিপ্পার জাহাজ প্রবেশ করে ভেতরের আর একটি ছোট বন্দরে। এখানে থাকে হেরডের যুদ্ধজাহাজ। এই পোতাশ্রয়েই অপেক্ষা করছিলেন হেরড। অ্যাগ্রিপ্পার জাহাজ বন্দরে পৌঁছতেই নগরবাসী রোম ও অগাস্টাসের জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস ভরিয়ে তুলল। অ্যাগ্রিপ্পা জাহাজ থেকে নামতে হেরড এগিয়ে এসে স্বাগত জানালেন তাঁকে। তিনি যেমন রোমকে বন্ধু হিসেবে পেলেন তেমনি রোমও তার বন্ধুর কাছ থেকে পেল প্রয়োজনে ব্যবহার করার মতো একটি শক্তিশালী নৌ-ঘাঁটি।

রোমের মাননীয় অতিথিকে হেরড নিয়ে গেলেন পোতাশ্রয়ের ধারে, সম্রাটের জন্য তিনি যে মন্দির নির্মাণ করেছেন সেখানে। মন্দিরটি একটি উঁচু প্ল্যাটফরমের ওপর তৈরি। বহুদূর থেকে দেখা যায় একে। জাহাজে আসতে অ্যাগ্রিপ্পাও দেখেছেন। দূর থেকে সে চিনিয়ে দেয় সিজারিয়াকে। এই মন্দিরেই আজ হেরড ও অ্যাগ্রিপ্পা প্রার্থনা করবেন। কামনা করবেন সম্রাটের দীর্ঘায়ু ও সৌভাগ্য। সেইসঙ্গে চাইবেন দুই দেশের শান্তি ও চিরবন্ধুত্ব।

রাজা হেরডই তাঁর রাজত্বকালে তৈরি করেছিলেন জেরুজালেমের মন্দির, জেরিকোর শীতকালীন প্রাসাদ ও মাসাদার দুর্গ। কিন্তু সিজারিয়া আর সিবাসটস ছিল সবার সেরা। সিবাসটসকে ঠিকমতো তৈরি করতে তো রোম থেকে ইঞ্জিনিয়ার আনিয়েছিলেন হেরড। তাঁরা নতুন নতুন প্রযুক্তির সাহায্যে বন্দরটিকে সবদিক দিয়ে সুরক্ষিত করেছিলেন। ক্রমে ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্যে সিজারিয়া আর তার বন্দর যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। পূব থেকে পশ্চিমে যাওয়ার একটি প্রধান বাণিজ্যপথের ওপরই ছিল সিজারিয়া। এ পথেই এশিয়া থেকে আসত রেশম ও মশলা। স্থানীয় পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে সিবাসটস বন্দর থেকে এগুলো রপ্তানী করা হতো পশ্চিমের রাজ্যগুলোতে। তাছাড়া সমুদ্রপথে রোম ও বাইজান্টিয়ান খুব বেশি দূরে ছিল না। তাই ব্যবসা-বাণিজ্য করার সুযোগ খুঁজতে ও অন্য জীবিকার সন্ধানে এখানে আসে নানা দেশের মানুষ। ধীরে ধীরে ধনে-জনে মান-মর্যাদায় সিজারিয়া মহান সিজারের নাম বহন করার উপযুক্ত হয়ে উঠেছিল।

তবু হেরডের সব আশা পূর্ণ হয়নি। সম্রাটের নাম নিয়ে সিজারিয়া চিরকাল বেঁচে থাকতে পারেনি। কারণ কি শুধুই ইতিহাসের কালচক্র? বোধহয় না।

স্বপ্ননগরী সিজারিয়াতে একদিন মানবতার সঙ্গে বিরোধ বাধল ক্ষমতার, অহংকারের ও স্বার্থপরতার। পনটিয়াস পাইলট তখন সিজারিয়ার গভর্নর। বংশপরিচয়ে তিনি

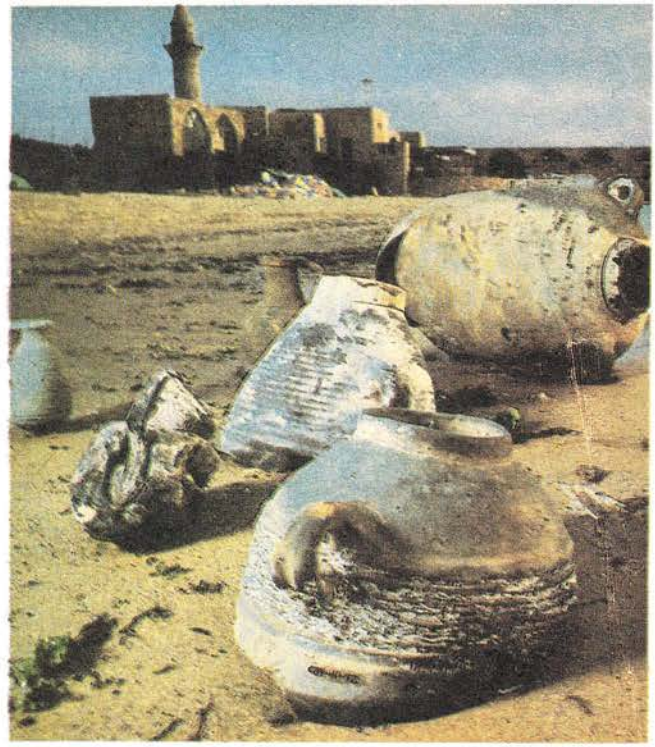

সমুদ্রের তলা থেকে উদ্ধার করা সামগ্রী।

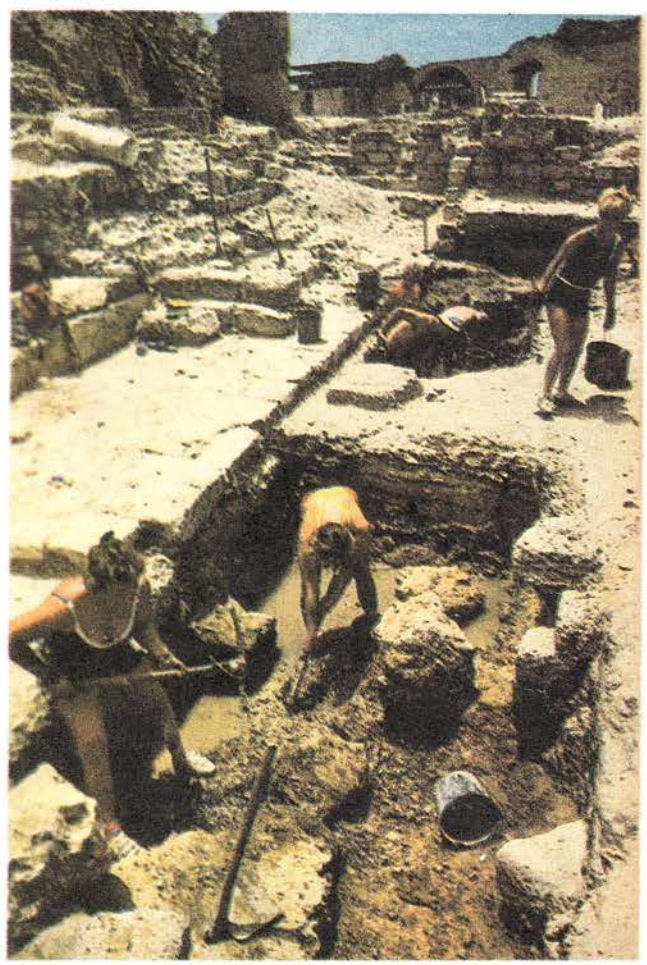

মাটি খুঁড়ে বের করা হচ্ছে সিজারিয়ার ধ্বংসাবশেষ।

মাটি থেকে উঁচু নালা। নয় মাইল দূর থেকে এইভাবে জল আনার ব্যবস্থা করেছিলেন হেরড।

রোমান। তাঁর কাছে বিচারপ্রার্থী হয়ে এসেছিল কিছু স্থানীয় মানুষ। অভিযোগ তাদেরই এক তরুণ স্বদেশবাসীর বিরুদ্ধে –যার নাম যীশু। সে নিজেকে ইহুদিদের রাজা বলে প্রচার করছে। মানুষকে রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুলছে। পনটিয়াস পাইলট দেখলেন সেই বন্দী তরুণটিকে। সত্য, ন্যায় ও মানবতার প্রতিমূর্তিকে চিনতে অসুবিধা হলো না তাঁর। তবু তিনি নিরুপায়। মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের স্বার্থ ও প্রভাব তাঁর বিচারকে বিভ্রান্ত করল। পনটিয়াস যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার আদেশ দিলেন। আদেশ দিয়ে তিনি হাত ধুয়েছিলেন দায়মুক্ত হবার জন্য।

ক্রুশবিদ্ধ হলেন যীশু। এরপর এগিয়ে এলেন যীশুর দুই শিষ্য পল ও পিটার। সিজারিয়ার পথেঘাটে তাঁরা যীশুর বাণী প্রচার করতে শুরু করলেন। আর সেই অপরাধেই পলকে দু'বছর কারারুদ্ধ করে রাখা হলো সিজারিয়াতেই।

তারপর সেই শহরে হত্যা করা হয় কুড়ি হাজার ইহুদিকে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদের আগুন জ্বলে ওঠে। রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ইহুদিরা। কিন্তু শক্তিশালী রোমান শাসকদের তুলনায় তাদের ক্ষমতা অতি সামান্য। চার বছর পর বিদ্রোহের আগুন পুরোপুরি নিভে যায় শত শত ইহুদি বন্দীর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে।

সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত সিজারিয়া অধিকার করে বসেছিল আরবরা। এর মধ্যে একাদশ শতাব্দীতে শুরু হয়ে গিয়েছিল ধর্মযুদ্ধ। ১১০১ খ্রীস্টাব্দে খ্রীস্টধর্মাবলম্বী যোদ্ধারা আরবদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেও খুব বেশিদিন সিজারিয়াকে রাখতে পারেনি। ১২৯১তে মিশরের সুলতান নিরাপত্তার কারণে ধ্বংস করে দিলেন সিজারিয়াকে।

আজ স্বপ্ননগরী সিজারিয়ার ধ্বংসাবশেষ দেখতে ভিড় করে আসেন ভ্রমণার্থীরা আর সমুদ্রে ডুবে যাওয়া সিবাসটসকে নিয়ে নিরলস গবেষণা করে চলেছেন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা।

খুঁজে পাওয়া গেছে মূল্যবান ভগ্ন সব অলঙ্কার।

(ছবি ঃ ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক সোসাইটির সৌজন্যে)

# বাহাদুর বেড়াল

পাহারাদারের নজর এড়িয়ে দেখি কিছু মাছ ধরা যায় কি না।
মাছ ধরা নিষেধ
ঘরেচে! এযে পাহারাদার, সঙ্গে আবার ওর কুকুর।
জৌ জৌ!
কেওখানে?
ওর পেছনে ছোট, ভুটে!
ওরে বাবা! ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়োতে হবে!
গরর! জৌ জৌ!
সবই বৃথা হলো ভুটে – উফস্ ও আমাদের চেয়েও বেশী জোরে ছোটে। আমাদের চাতুরী দিয়ে চেষ্টা করতে হবে!
এক মাইল দূর থেকেও বাহাদুর আমাকে চিনতে পারবে, তাই ওকে বোকা বানাতে হলে আমাকে ছদ্মবেশ ধরতে হবে।
যা ভেবেছি! একজন ভবঘুরে বাউলকে দেখে বাহাদুর আর দৌড় পালাচ্ছে না!

শেষ পর্যন্ত ধরেছি!
অ্যাই! মতলবটা কি? মরেচে! এযে ছদ্মবেশী পাহারাদার!
কিন্তু তখনই
গরর! ভৌ ভৌ!
হোঃ হোঃ! পাহারাদারের ছদ্মবেশ এতো ভালো হয়েছে যে নিজের কুকুরকেও বোকা বানিয়েছে!
থাম, হতচ্ছাড়া কুকুর এটা আমি, বুদ্ধু কোথাকার!
গরর! ভৌ ভৌ!

# মৃত্যুহীন প্রাণ

রাহুল মজুমদার

ওই তো চলেছে ওরা। সূর্যের প্রখর কিরণে বিশাল একখন্ড হীরের মতো ঝলসাচ্ছে এভারেস্টের শিখর। তার শ্বেতশুভ্র শরীরে দুটো চলন্ত কালো বিন্দু। ধীরে ধীরে উঠছে ওপরের দিকে। শিখর আর সাত-আটশো ফুট দূরেও নয়। খুব বেশি হলে আর এক ঘন্টা লাগবে ওদের শিখর জয় করতে। আহ্–এতদিন বাদে এভারেস্টের সমস্ত প্রতিরোধের প্রতিকূলতা পরাজিত হবে। ঘড়ির দিকে তাকালো ওডেল–দুটো বাজে। পাঁচটা বাজার আগেই তাহলে ওরা ফিরে আসতে পারবে ষষ্ঠ শিবিরে। এতো রোদ থাকা সত্ত্বেও তাপমাত্রা শূন্যের অনেক নিচে; ওডেল তাড়াতাড়ি তাঁবুতে ঢুকে আরেক প্রস্থ গরম জামা চাপিয়ে নিলো গায়ে। বাইরে এসে আবার ঘাড় তুলে শিখরের দিকে তাকালো। প্রায় এক সপ্তাহ ২৫,৫০০ ফুট ওপরে এই পঞ্চম শিবিরে অসহ্য ঠান্ডা সহ্য করেও এই মুহূর্তের জন্যেই অপেক্ষা করছে ওডেল। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে থাকতে চায় ও। কিন্তু বিধি বাম, কোত্থেকে একখন্ড কালো মেঘ এসে আটকে দাঁড়ালো ওর দৃষ্টিপথ। কাটতে লাগলো মিনিটের পর মিনিট। দেখতে দেখতে আধ ঘন্টা কেটে গেল, মেঘ তো সরলোই না, উল্টে আকাশটা ঢেকে ফেলতে লাগলো দ্রুত। ঐ মেঘের আড়ালে ঘটতে চলেছে পৃথিবীর সবথেকে উত্তেজনাময় ঘটনা; পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখর এভারেস্ট–চো মো লাঙমা–সাগরমাথা হতে চলেছে মানুষের পদানত। যে দুজন এই দুঃসাহসিক প্রায় অচিন্ত্যনীয় অঘটনটি ঘটাতে চলেছে, তারা ছাড়া একমাত্র যে মানুষটা এই উত্তেজনাকর মুহূর্তটার সাক্ষী হতে পারতো, সেই ওডেল অসহায়ের মতো অপেক্ষা করতে লাগলো প্রকৃতির করুণার। হায়, মেঘ সরলো না। ঘন্টা দেড়েক অপেক্ষা করে তাঁবুতে ঢুকলো ওডেল, যোগাযোগ করলো দলনেতা নর্টনের সঙ্গে–'হ্যালো, হ্যালো–দারুণ খবর, দারুণ খবর–এভারেস্ট পরাজিত–'

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামলো। মেঘ সরে মুহূর্তের জন্য উঁকি মারলো এভারেস্ট শিখর–সেখানে কোনো কালো বিন্দু নেই। এর মানে শিখরজয়ের পর ওরা ফিরে এসেছে বা আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই টর্চের বা ম্যাগনেসিয়াম তারের আলোর সংকেত দেখা যাবে।

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নামলো। আর বাইরে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। তাপমাত্রা নামছে হু হু করে। বাধ্য হয়ে তাঁবুতে ঢুকলো ওডেল। ওরা কি তবে একেবারে এই পঞ্চম শিবিরে নেমে আসছে? তাঁবুর পর্দাটা ফেললো না ওডেল। হু হু করে হিমশীতল হাওয়া তুষারকণা নিয়ে ঢুকছে। স্লীপিং ব্যাগের ভেতরেও হাত-পা জমে যেতে চাইছে, তবু খোলা পর্দার সামনে চোখ মেলে অন্ধকারের দিকে চেয়ে শুয়ে রইলো ও। একটা অশুভ চিন্তা এসে বাসা বেঁধেছে ওর মনে–কোনো বিপদ হয়নি তো ওদের!

এভারেস্টের রোষ বড় ভয়ানক। আজ পর্যন্ত সে কাউকে তার মাথায় উঠতে দেয়নি। বারবার তুষার-ঝড় আর তুষার-ধসের অস্ত্র হেনেছে, প্রাণ নিয়েছে কতো দুঃসাহসীর!

তবে ওদের দুজনের একজন প্রবাদপ্রতিম ম্যালোরি, এভারেস্টকে যাঁর থেকে ভালো আর কেউ চেনেন না; বাইশ বছরের তরুণ সংগী আরভিনকে নিশ্চয়ই তিনি সামলে নিয়ে গেছেন সাফল্যের পথে।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে যখন প্রথম এভারেস্ট অভিযান হয়, তখন ম্যালোরিই ১৯,১০০ ফুট উঁচুতে উঠে আবিষ্কার করেন এভারেস্টের শিখর অঞ্চলে প্রবেশের দুই পথ–নর্থ আর সাউথ কল।

১৯২২-এর দ্বিতীয় অভিযানে ২৬শে মে তারিখে ২৭,৩০০ ফুট উঁচুতে উঠে পর্বতারোহণের ক্ষেত্রে এক নতুন নজির স্থাপন করেন। সেবার ৬ই জুন এক মর্মন্তুদ দুর্ঘটনা ছেদ টেনে দিলো অভিযানে–তুষার-ধসে প্রাণ হারালো সাতজন শেরপা।

তারপর এই ১৯২৪-এর অভিযান। দুর্ভাগ্য এবারও যেন সংগ ছাড়েনি। গত অভিযানের নেতা ব্রুসই ছিলেন এই অভিযানেরও নেতা। কিন্তু অভিযানের শুরুতেই তিনি হয়ে পড়লেন অসুস্থ। দলের ভার তুলে নিলেন নর্টন। তৃতীয় শিবির পর্যন্ত আর কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। তারপরই এভারেস্ট ধরলো তার রুদ্র রূপ–পাঁচ দিন ধরে টানা তুষার-ঝড় চললো। অসুস্থ হয়ে পড়লো দলের প্রায় সবাই–কেউ-বা আক্রান্ত হলো তুষার-অন্ধত্বে, কারো হলো তুষার-ক্ষত, কয়েকজনকে ধরলো নিউমোনিয়ায়। শেরপা মানবাহাদুরের তুষার-ক্ষতে পচন ধরলো। কিছুতেই কিছু হলো না। মারা গেল মানবাহাদুর। আরেকজন শেরপা শমশের তো কোনো সুযোগই দিলো না, মগজে রক্ত জমাট বেঁধে, দলের প্রায় ভেঙেপড়া মনোবলকে আরেকটু নড়িয়ে দিয়ে চলে গেল একবেলায়।

ঝড় থামতে বিধ্বস্ত পুরো দলটা নেমে এলো রঙবুকে। সেখানকার বৌদ্ধমঠের লামার কাছ থেকে আশীর্বাদ আর মনোবল আহরণ করে আবার তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো এভারেস্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধে।

দেখতে দেখতে কেটে গেছে তিন মাস, সময় কমে এসেছে। বর্ষা এসে গেলে সব আশা শেষ হয়ে যাবে। ২১শে মে এভারেস্ট আবার ফুঁসে উঠলো। তৃতীয় শিবিরে বেশ উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা। বারোজন শেরপার চতুর্থ শিবির স্থাপন করে নেমে আসার কথা তৃতীয় শিবিরে। বেলা গড়াতেই চারদিক আঁধার করে উঠলো তুষার-ঝড়। শেরপারা ফিরলো না। দুশ্চিন্তায় মুখ কালো দলনেতা নর্টনের; সকলের ভালোমন্দের দায়িত্ব তাঁরই। কিন্তু তিনি অসহায়। ২১ তারিখ পেরিয়ে ২২ তারিখ এলো। তুষার-ঝড় সমানে চলেছে। বাইরে তাপমাত্রা এখন–২৫° সে.। বেলা বাড়ছে, সেটা বোঝার উপায় শুধু ঘড়ি দেখে–বাইরে তুষার-ঝড়ের তান্ডবে চারদিক প্রায় অন্ধকার। সেই অন্ধকার ফুঁড়ে হঠাৎ বেরিয়ে এলো কতগুলো বিধ্বস্ত মনুষ্যমূর্তি; শেরপারা ফিরে এসেছে! আনন্দের ঢেউ খেলে গেল শিবিরে।

'এ কী! তোমরা তো দেখছি আটজন', প্রায় চীৎকার করে উঠলেন নর্টন, 'বাকী চারজন কোথায়?'

'ওরা পথের মাঝে তাঁবুতে,মরণাপন্ন'। কোনোমতে জবাব দিলো একজন।

'সে কী!'

'হ্যাঁ। কাল আমরা মাঝপথে ঝড়ের কবলে পড়ি। একটা তাঁবুতে কোনোমতে বারোজন গাদাগাদি করে রাত কাটিয়েছি, তবু ঠান্ডার হাত থেকে রেহাই পাইনি। দয়া করে ওদের বাঁচান সাব।'

'নিশ্চয়ই–এ আর বলতে হয়!'

–২৫°-র কামড়, তুষার ঝড়, আর পথ হারাবার ভয়কে তুচ্ছ করে কয়েকজন শেরপাকে সংগে নিয়ে ম্যালোরি আর সামারভেলের সংগে নর্টন বেরিয়ে পড়লেন তাদের উদ্ধারের উদ্দেশ্যে। উদ্ধারপর্ব সম্পন্ন করে ফিরলেন যখন সকলে, তখন রাত নেমেছে।

ঝড় চললো টানা আট দিন।

ঝড় থামলো, কিন্তু বর্ষা এসে গেল দোরগোড়ায়। ঠিক হলো, ছোটো ছোটো দলে দ্রুত শিখরজয়ের চেষ্টা হবে। ১লা জুন বেরোলেন ম্যালোরি আর জিওফ্রে ব্রুস। কিন্তু পঞ্চম শিবিরে পৌছবার আগেই শুরু হলো মহাপ্রলয়। দিকদিগন্ত কাঁপানো মেঘের ডাক আর মুহুর্মুহু তুষার-ধসের গর্জন বুকে কাঁপন ধরিয়ে দিলো। কোনোমতে প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরলেন ওঁরা। দুর্যোগ চললো দুদিন ধরে।

এবার পালা নর্টন আর সামারভেলের। পঞ্চম শিবিরে পৌছবার আগেই অসুস্থ হয়ে ফিরে এলো সামারভেল। তিনজন শেরপা নাপবুজমে, শেখ চুম্বে আর লাকপা ছেদিকে নিয়ে নর্টন ২৬,৮০০ ফুটে স্থাপন করলেন ষষ্ঠ শিবির। পরদিন শুরু হলো শিখর অভিযান। আবহাওয়া পরিষ্কার। কিন্তু হায়–তুষার-অন্ধত্বে আক্রান্ত হয়ে ২৮,১৫০ ফুট থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হলেন নর্টন।

ম্যালোরি দেখলেন এভারেস্ট যেন উদ্ধত মাথা তুলে সদম্ভে অট্টহাস্য করছে। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠলো ম্যালোরির। তিনি মনে মনে বললেন, 'ঠিক আছে, চো মো লাঙমা, তোমার ছুঁড়ে দেওয়া চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম আমি।'

৬ই জুন আরভিন আর ওডেলকে নিয়ে পঞ্চম শিবিরে উঠে এলেন ম্যালোরি। সেখানে ওডেলকে রেখে পরদিন ম্যালোরি আর আরভিন উঠে গেলেন ষষ্ঠ শিবিরে। চিঠি পাঠালেন ওডেলকে–'আবহাওয়া পরিষ্কার। কম্পাসটা পঞ্চম শিবিরে ফেলে এসেছি, যত্ন করে রেখো।'

ভাবতে ভাবতে রাত ফুরিয়ে এলো। উঠে পড়লো ওডেল। নাঃ, ওদের জন্য অপেক্ষা করবে না, নিজেই উঠে যাবে ষষ্ঠ শিবিরে। এভারেস্ট-বিজয়ীরা এটুকু সম্মান আশা করতেই পারে।

ভোরের আলো ফোটার আগেই বেরিয়ে পড়লো ও। উত্তেজনায় ছ ঘণ্টার পথ সাড়ে চার ঘণ্টায় উঠে এলো। ঐ তো তুষারের মাঝে তাঁবুটা সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে।

দূর থেকেই হাঁক দিলো ওডেল, 'ম্যালোরি....আরভিন....'

কোনো উত্তর নেই।

আবার হাঁক, এবার গলায় উৎকণ্ঠা, 'ম্যালোরি....আরভিন....'

প্রত্যুত্তরে এবারও নিস্তব্ধতা।

বুক কেঁপে উঠলো ওডেলের। ছুটে গিয়ে তাঁবুর পর্দা সরালো–কেউ নেই। তাঁবুর ভেতর মৃত্যুপুরীর শূন্যতা।

ভোরের এভারেস্টের মতোই শীতল, নিস্তব্ধ, নির্জন ষষ্ঠ শিবির। হাঁটু ভেঙে বসে পড়লো ওডেল। ও বুঝতে পারছে এই ভয়ংকর শূন্যতা আর নিস্তব্ধতার অর্থ–ম্যালোরি আর আরভিন হারিয়ে গেছেন এভারেস্টের বুকে, চিরকালের মতো।

রহস্যময়ভাবে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া ম্যালোরি আর আরভিন আজও পর্বতপ্রেমীদের কাছে এক ধাঁধা–কোথায় গেলেন ওঁরা? ম্যালোরির তুষার গাঁইতিটা ছাড়া তো আজ অবধি কিছু পাওয়া যায়নি!

এভারেস্ট কি ওঁদের পদানত হয়েছিলো?

এই প্রশ্নের মতো এই দুই মহাবীরও পর্বতপ্রেমী মানুষের মনে আজও অমর।

উনিশ হাজার ফুট ওপর থেকে তোলা ছবি।

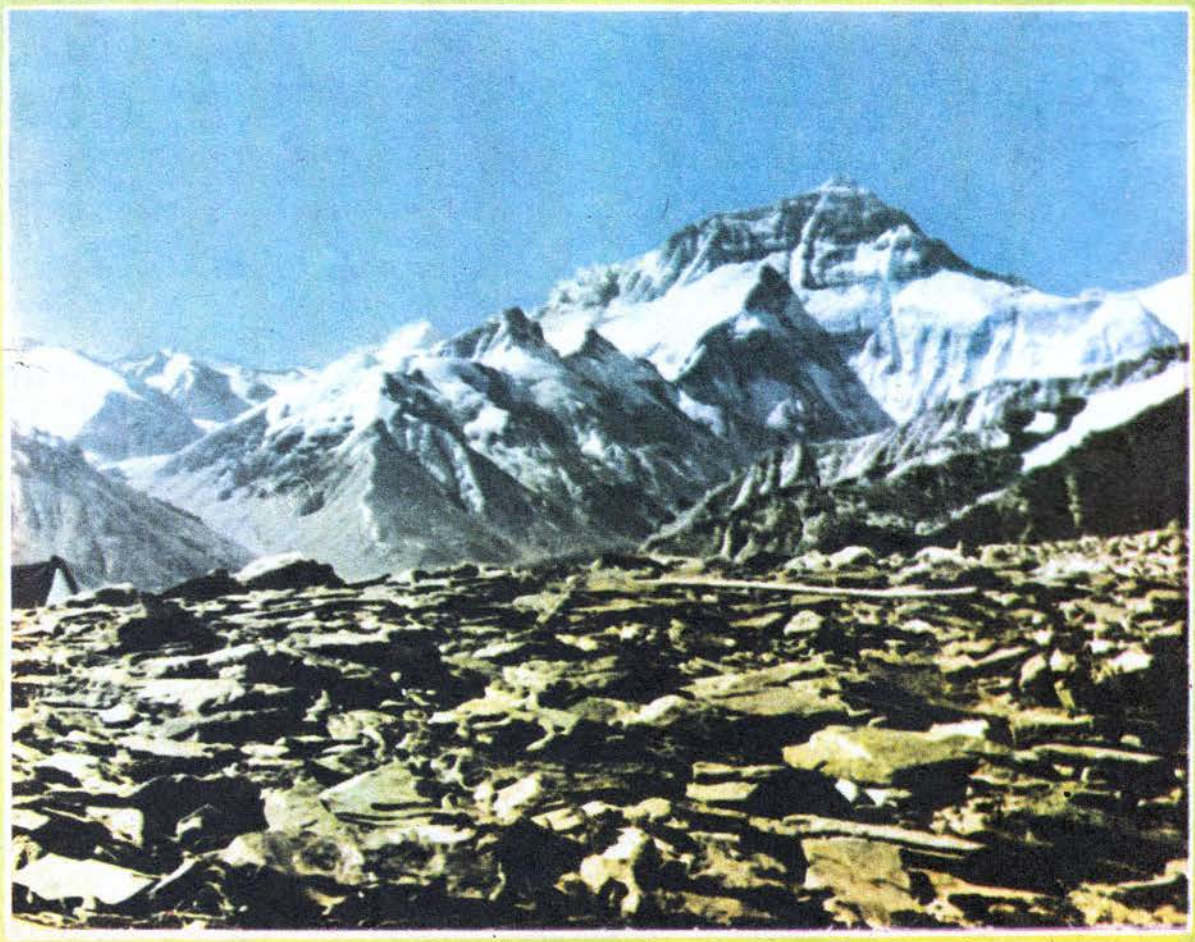

# বড়দি

নলিনী দাশ

কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল শান্তি। কোনো কথা বলতে পারল না! তার কান দুটো গরম হয়ে উঠেছিল। বিদ্যুৎ বলেছিল, 'লক্ষ্মীটি বড়দি, এর চেয়ে দেরিতে গেলে একখানা কোর্টও খালি পাব না!'

'বড়দি'!! শান্তি বুঝি সব সময়ে সকলের ওপর সর্দারি করে, 'বড়দি-গিরি' করে বেড়ায়?

ললিতা, মাধুরী, বীণা, শর্মিলা ওরা কেউ কিছু না বলেই সবাই বিদ্যুতের সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে খেলার মাঠে ছুটল। তাদের একবারও মনে পড়ল না যে ক্লাস ছেড়ে যাবার আগে ঘরটা গুছিয়ে রেখে যাওয়া দরকার। নাহলে মিস্ রায়–হেডমিসট্রেস খুব রাগ করেন! ছমাস আগে কি এটা সম্ভবপর হতো? তখন শান্তির সামান্যতম ইঙ্গিতে এই মেয়েরাই সমস্ত ঘর গুছিয়ে পরিষ্কার করে রাখত।

ধীরে ধীরে শান্তি একাই সব ডেস্ক আর চেয়ার সোজা করে সাজিয়ে রাখল। ব্ল্যাকবোর্ড মুছে পরিষ্কার করে ডাস্টার ঠিক জায়গায় রেখে দিল। সব কাজ শেষ করে শান্তি যতক্ষণে খেলার মাঠে পৌঁছল তখন বেলা বেশি বাকি নেই। তখনই বিদ্যুৎ একটা 'গেম' শেষ করে দাঁড়িয়েছে।

'শান্তির সঙ্গে বিদ্যুতের একটা গেম হোক' এই বলে মেয়েরা কলরব করে উঠেছিল। বিদ্যুৎ একগাল হেসে এগিয়ে এসে একখানা ব্যাডমিন্টন র‍্যাকেট বাড়িয়ে ধরল। কিছুটা অনিচ্ছার সঙ্গে হলেও শান্তি রাজী হয়ে গেল। স্বাভাবিক দক্ষতার সঙ্গে সে খেলা শুরু করল। বিদ্যুৎ প্রথমে খেলছিল কতকটা যেন হালকাভাবে। মনে হচ্ছিল, সে কিছুতেই শান্তির সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না। তারপর হঠাৎ থেমে গা-ঝাড়া দিয়ে নিল বিদ্যুৎ। র‍্যাকেটটা দুবার শূন্যে ঘুরিয়ে আবার লুফে নিল। তারপরেই একের পর এক এমন আশ্চর্য চমকপ্রদ মার দিতে শুরু করল যে শান্তি আর দাঁড়াতেই পারল না। সমস্ত মেয়েরা হাততালি দিয়ে উঠল। অনায়াসে ম্যাচ জিতে নিয়ে একগাল হেসে শান্তির দিকে হাত বাড়িয়ে দিল বিদ্যুৎ। নিয়মমাফিক ভদ্রতার হাসি হেসে তার সঙ্গে করমর্দন করল শান্তি।

মেয়েদের মধ্যে এখন একটা প্রধান আলোচ্য বিষয় হলো আগামী আন্তঃশ্রেণী ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে এবার কে চ্যাম্পিয়ন হবে ক্লাস টেনের নতুন মেয়ে বিদ্যুৎ, না একাদশ শ্রেণীর অঞ্জলি? গত বছরের চ্যাম্পিয়ন শান্তির নামটা তেমন শোনা গেল না।

পড়াশোনাতেও সেই একই অবস্থা! এই ক্লাসের প্রথম স্থানটি বেশ কয়েকবছর শান্তির অধিকারে আছে। এবার কি তার সে আসন বেদখল হতে চলেছে? কথাবার্তা, ক্লাসের পড়া, চাল-চলন, সব কিছুতেই বিদ্যুতের বুদ্ধিদীপ্ত ঝকঝকে ব্যবহারে টিচারেরা প্রীত,মেয়েরা অনেকেই মুগ্ধ। এমন সুন্দর, চঞ্চল, সপ্রতিভ মেয়েকে কে না পছন্দ করবে। শান্তিও পছন্দ না করে পারে না, তবু তার মনে হয় যেন বিদ্যুতের সবটাই খাঁটি নয়–তার মধ্যে কিছুটা কি ওপরচালাকি আছে? হয়তো তার প্রতি কিছুটা ঈর্ষা আছে তাই অমন মনে হয়! ঈর্ষা? ছিঃ, ঈর্ষা হবে কেন? বহুবছর ক্লাসে শীর্ষস্থান অধিকার করে বসেছিল শান্তি, সবাই খেলায়, পড়ায়, কাজকর্মে তার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিয়েছিল। এখন না হয় আর কেউ ফার্স্ট হলোই বা।

আসল কথা, বিদ্যুৎ বড় বেশি চঞ্চল, অতিরিক্ত ছটফটে। তাই ধীর স্থির স্বভাবের শান্তি তার ওপর খুব বেশি ভরসা

ভাঙা চশমার টুকরোগুলো কুড়োতে বসল।

রাখতে পারে না।

সেদিন খেলার মাঠ থেকে ফিরে মুখ হাত ধোবার সময়ে শান্তি তার চশমা খুলে রেখে মুখ হাত ধুতে গেল, হঠাৎ দেখে যে চশমাজোড়া বিদ্যুতের চোখে! 'ওমা, কি আশ্চর্য, তোমার চশমা কেবল দেখতেই হুবহু আমারটার মতন নয়, পাওয়ার নিশ্চয় এক। আমারটা পরে দেখ একবার–ঠিক মনে হবে যেন নিজের চশমা পরে আছ।' দুজনেরই পাওয়ার খুব বেশি।

অনুরোধ এড়াতে না পেরে শান্তি বিদ্যুতের চশমা একবার পরল, সায় দিল যে দুটো হুবহু এক। নিজের চশমাটা যতক্ষণ না নিরাপদে ফেরত পেল, ততক্ষণ কিন্তু তার ভারি নার্ভাস বোধ হচ্ছিল। যা ছটফটে মেয়ে ঐ বিদ্যুৎ–হঠাৎ মাটিতে ফেলে চশমা ভেঙে দেওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। যাক! অঘটন কিছু ঘটল না। সব মেয়েরা মুখ হাত ধুয়ে পড়তে বসে গেল। ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টের উত্তেজনা থাকলে কি হবে? তারপরেই যে বার্ষিক পরীক্ষা আছে, সেটা ভুলে থাকা যাবে কি করে?

এই স্কুলে দশম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষার খুব বেশি গুরুত্ব আছে। এই পরীক্ষায় যে প্রথম হবে সে যে কেবল একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর–দুবছর বিনা খরচে হোস্টেলে থেকে পড়তে পারবে তাই নয়, দু বছর ধরে একটা মূল্যবান বৃত্তিও পাবে।

এই বৃত্তিটা যে শান্তিই পাবে এটা অনেকেই প্রায় অবধারিত বলে ধরে নিয়েছিল, যদিও এই নিয়ে তেমন আলোচনা করেনি কেউ। সম্প্রতি জল্পনা-কল্পনা চলেছে, এবছর কি বৃত্তিটা বিদ্যুৎ পাবে?

শান্তি এসব আলোচনা পছন্দ করে না। তবু অন্য মেয়েদের কথাবার্তা তার কানেও যায়। বিদ্যুতের ভক্ত মেয়েরাও আড়ালে তার নিন্দে করে অনেকে। অন্ততঃ হাসি-ঠাট্টা করে, সমালোচনা করে।

মাধুরী নাকি খুব বিশ্বাসযোগ্য সূত্রে শুনেছে যে, বিদ্যুৎদের বাড়ির অবস্থা খুব খারাপ, সব কাজ নিজেরা করে। ঝি-চাকর রাখতে পারে না।

'ওমা! সে কি কথা?' বীণা আর ললিতা বলল, 'এখানে তো দেখি সব সময়ে হাসি-তামাসা নিয়ে আছে আর সাজগোজ করছে।'

শর্মিলা একটু ভেবে বলল, 'লক্ষ্য করে দেখিস, বিদ্যুৎ কিন্তু কখনও দামী কাপড় পরে না, সুন্দর কাপড় সুন্দরভাবে পরে, তাই মনে হয় কত যেন সেজেছে'–

মাধুরী আবার বলল, 'আমি খুব ভাল করে জানি যে, এরকম ভাল স্কুলে পড়ার মতন বাড়ির অবস্থা ওদের নয়।'

'বুঝেছি, তাই ঠিক মতলব করে দশম শ্রেণীতে এসে ভর্তি হয়েছে। বার্ষিক পরীক্ষায় ফার্স্ট হতে পারলে তারপর দুবছরের জন্য নিশ্চিন্ত!' বলল ললিতা।

মেয়েরা যদিও আস্তে আস্তে কথা বলছিল, তবু সব কথাই শান্তির কানে যাচ্ছিল। মেয়েরা তাহলে ধরেই নিয়েছে যে বার্ষিক পরীক্ষায় এবার বিদ্যুৎই ফার্স্ট হবে! হোক না ফার্স্ট! শান্তির মনে এ ব্যাপারে কোনো ক্ষোভ ছিল না। বিশেষতঃ বিদ্যুতের পারিবারিক অবস্থা যদি সত্যিই অত খারাপ হয়ে থাকে, তাহলে বৃত্তিটা পেলে তার খুবই উপকার হবে।

বিদ্যুতের মনে কোনো চিন্তাভাবনা থাকলেও তার ব্যবহারে তা বিন্দুমাত্র প্রকাশ পায় না। কথাবার্তা, চলাফেরায় সে আগের মতই ছটফটে। চাঞ্চল্যের এতটুকু অভাব দেখা যায় না।

শেষ পরীক্ষার দিন সকালবেলা পরীক্ষা দিতে যাবার আগে বিদ্যুৎ বইখাতার সঙ্গে ধপাস করে চশমাটাও টেবিলে রাখল। সেটা যে মাটিতে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল তা সে টেরও পেল না।

সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত। শান্তির মনে হলো সে ছাড়া আর কেউ এই কান্ডটা দেখতেই পায়নি। নিজেকে কিছু চিন্তা করার অবসর না দিয়ে শান্তি নিজের চশমাজোড়া বিদ্যুতের বইখাতার পাশে রেখে বিদ্যুতের ভাঙা চশমার টুকরোগুলো কুড়োতে বসল।

'কি সর্বনাশ! পরীক্ষা শেষ হবার আগেই চশমা ভেঙে বসলে!!' বলে উঠল শর্মিলা।

'এখন তো আর নতুন চশমা করাবার সময় নেই–কি হবে?'

বলল মাধুরী।

বীণা বলল, 'তোমার যা চোখ খারাপ, বিনা চশমায় পরীক্ষা দেবে কি করে? মিস রায়কে বলে আর একদিন পরীক্ষা দেবার অনুমতি পেতে পার না?' আরো অনেক মেয়ে সহানুভূতি জানাতে এল। জোর করে মুখে হাসি টেনে এনে শান্তি বলল, 'একটা তো মাত্র পরীক্ষা বাকি, চোখ বুজে যা হোক লিখে দেব, পাশ করে যাব মনে হয়।'

পরীক্ষার ঘন্টা পড়ে গেল। বাধ্য হয়ে সবাই তাড়াতাড়ি পরীক্ষার হলে গিয়ে বসল।

বিনা চশমাতেই কোনোমতে লিখতে আরম্ভ করল শান্তি। প্রশ্নপত্র ভালই ছিল। উত্তরও তার তৈরি। কিন্তু চোখে যে প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না! কিছুক্ষণ পরে এমন দারুণ মাথার যন্ত্রণা শুরু হলো যে আর কোনো কিছু তার মাথায় ঢুকল না। প্রশ্নগুলো ভাল করে বুঝতেই পারল না। সব লিখতে পারল না। যা লিখল তাও কি যে লিখল, নিজেই বুঝল না।

পরীক্ষার পর মাথা ধরার ওষুধ খেয়ে চুপ করে একলা বসেছিল শান্তি। ধীরে ধীরে এসে বিদ্যুৎ তার স্বভাবের বিপরীত সুরে চাপা গলায় বলল, 'এটা কি করলে? কেন করলে? কেন? কেন?'

শান্তি কি বলবে ভেবে পেল না।

বিদ্যুৎ বলে চলল, 'আমি কিছুই টের পাইনি। এখনই একটি মেয়ে বলল। আগে জানলে কখনই এমন হতে দিতাম না। এখন কি করি? বল কেন এমন করলে?'

মৃদু হেসে শান্তি তার দুটি হাত ধরে বলল, 'ঠিকই করেছি, আমি যে বড়দি।'

হাস্যমুখী মেয়েটির চোখে এই প্রথম জল দেখা গেল। ধরা গলায় সে বলল 'সত্যি বলছ? সত্যি তুমি আমার বড়দি? আমার কোনো দিদি নেই'–

শান্তি বলল, 'আমারও ছোটবোন ছিল না, এতদিনে বোন পেলাম।'

ছবি: বিজন কর্মকার

# পুজোর ছুটি

দেবাশিস বসু

পুজোর ছুটি
চলরে মাঠে
লাফাই, নাচি
খেলছে ডালে,

শরৎ এলো
শিউলী ফোটে
উছল নদী
তাই তো খুশি,

আকাশ-নদী
ওই সুদূরে
সূয্যি মামার
খেয়াল খুশির,

ছুটির পড়া
কাশের দোলা
আজকে কেন
বলছে মনে,

পুজোর ছুটি!
আমরা জুটি;
চেঁচাই, ছুটি,
শালিখ দুটি!!

বর্ষা যায়!
দোয়েল গায়;
হিমেল বায়,
অচিন্ গাঁয়!!

মেঘের খেলা!
ভাসায় ভেলা;
সারা বেলা,
রঙীন মেলা!!

পড়বো আজ!
বনের মাঝ;
সকাল-সাঁঝ,
বাজনা বাজ!!

ছবি: রাহুল মজুমদার

# খুঁজে ফেরা

## শিশিরকুমার মজুমদার

নিচে গাড়ি থামার শব্দে পরেশবাবু বইটা মুড়ে রেখে উঠে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। একটা ট্যাক্সি এসে থেমেছে ফটকের কাছে। দরজা খুলে হালকা স্যুটকেস হাতে যে নামল গাড়ি থেকে তাকে দেখে ভীষণ অবাক হলেন পরেশবাবু! ছেলে বাবলু এসেছে! এমন অসময়ে আসার তো তার কোনও কারণ নেই! কেন এল ও? মনে মনে বেশ অস্বস্তিই হলো ওঁর। ভাড়া মিটিয়ে বাবলু ফটক খুলল। তখনি হরিহর প্রায় ছুটে বাড়ি থেকে বার হয়ে এল। হাত থেকে স্যুটকেসটা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'খোকা, তুমি! এমন অসময়ে! সব খবর ভাল তো?'

ভিতরে ঢুকতে ঢুকতে বাবলু যা বলল, তাও শুনতে পেলেন পরেশবাবু। শুনে আশ্বস্ত হলেন। বাবলু বলল, 'সব খবর ভাল হরিদা। প্লিজ জলদি এক কাপ কড়া কফি করে দাও। তোমাদের চমকে দেব বলে....' বাকি কথা আর শুনতে পাননি পরেশবাবু।

সিঁড়ির মুখে তখন হাঁক-ডাক শুরু হয়ে গেছে, 'মা, মা, ওমা, কোথায় তুমি? বাবা বাড়ি আছে?'

অবাক মা মালতী ঘরের বার হয়ে এসে বেজায় খুশি হয়ে বললেন, 'ও মা, তুই! হ্যাঁরে সব খবর ভাল তো! এমন হঠাৎ এলি যে!'

'ফার্স্ট ক্লাস সব খবর। ঘাবড়াও মত্ মা। বাবা কই?'

পরেশবাবুও বার হয়ে এসে বললেন, 'ব্যাপার কি, এমন খবর না দিয়ে হঠাৎ! সত্যিই সব ঠিক আছে তো?'

'বিলকুল। তোমার সঙ্গে আমার একটা বিষয়ে গভীর আলোচনা আছে। ঠিক এখন নয়। এই ধর কাল সকালে। আমি পনের দিনের ছুটি নিয়ে এসেছি, তবে তোমাদের কাছে থাকতে নয়, তা আগেই বলে দিচ্ছি। যদি পারমিশন দাও তো একটা দারুণ কাজে হাত দেবার ইচ্ছা রাখি। তাতে বাইরে বাইরেই ঘুরতে হবে। পারমিশন দাও যদি তো তবেই ও কাজে হাত দেব, নচেৎ নয়!'

মা বললেন, 'কি যে হেঁয়ালি করিস! বুঝি না কিছু! ঘুরবি কোথায় শুনি? একা, না সঙ্গে থাকবে আর কেউ?'

'সঙ্গে আর কাকে পাব মা?'

'কেন রাধা! অনেক দিন কিন্তু ওরও খবর পাই না রে! কেমন আছে সে? আর কত দিন আমাদের বসিয়ে রাখবি রে খোকা! কাজে তো পাকা হয়েছিস সেই কবে। তবে?'

'ওঃ মা....ডোন্ট ওয়ারি। সব ঠিক আছে। সবাই ঠিক আছে। আমি যা করতে চাইছি, তাতে রাধারও মত আছে। এখন তোমরা হ্যাঁ বললেই হয়।'

'ব্যাপারটা যে কি, আমি কিন্তু তার কোনও আভাস পাচ্ছি না। আমার কাল সকাল পর্যন্ত ধৈর্য থাকবে, তবে তোমার মার ব্যাপার মা-ই জানেন। যাও ভেতরে যাও। মুখ হাত ধোও, বিশ্রাম কর।' বললেন পরেশবাবু।

'থ্যাঙ্ক ইউ ড্যাড।' বলে বাবলু ওর মাকে জড়িয়ে ধরে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল।

আবার নিজের ঘরে এসে বসলেন পরেশবাবু। বইটা হাতে তুলে নিলেন। কিন্তু পড়াতে মন বসাতে পারলেন না। কিসের ইঙ্গিত দিল ছেলে! এখন সে বড় হয়েছে। এখন তাকে তার পথে তো চলতে দিতেই হবে। না, কোনো কাজেই বাধা দেবেন না উনি। ওর মাও দেবে না বোধহয়। ছেলেকে ওঁরা ভাল করেই চেনেন। সে যাই করুক না কেন, কারও মনে আঘাত দেবার মতো কিছুই করবে না। তাছাড়া যা সত্য, তাকে তো মেনে নিতেই হবে, আজ হোক কাল হোক!

নাঃ, বইটা মিছে চোখের সামনে ধরে থেকে লাভ নেই আর। ওতে তো আর মন বসবে না। চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন পরেশবাবু। ইচ্ছা হলো একবার ওঘরে গিয়ে দেখেন, ছেলে তাঁর কি করছে মার সঙ্গে। যেতে গিয়েও থামলেন। না, কাল সকাল পর্যন্তই অপেক্ষা করবেন উনি। মার সঙ্গে ছেলের কি আলোচনা, তা না শুনলেও চলবে ওঁর। শুধু ছেলে ওঁকে কি বলে, তাই উনি শুনতে চান। মা আর ছেলের মাঝে উনি আর নিজেকে নিয়ে যাবেন না।

হরিহর দরজার কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করল, 'খোকাকে কফি দিয়েছি। আপনাকেও দেব নাকি একটু, খাবেন?'

পরেশবাবু বললেন, 'দাও। সে কোথায়, কি করছে এখন?'

'মার সঙ্গে বসে কথা বলছে। ডাকব?'

'না না, কফি তুমি দিয়ে যাও এখানে। আবার কি এখুনি বাইরে যাবে নাকি ও? এই এল এত দূর থেকে!'

'না, আজ আর কোথাও যাবে না বলেছে। আপনার সঙ্গে আর মার সঙ্গে গল্প করবে। মুসুরির ডাল আর প্যাঁয়াজের বড়া করতে বলেছে। রাতে ও ভাত খাবে। আমি কফি দিয়ে বাজারে যাচ্ছি। দেখি বিকেলের বাজারে টাটকা মাছ পাই কিনা। কিছু আনতে হবে আপনার?'

'না না।' বললেন পরেশবাবু।

ছেলে ওঁর ইঞ্জিনিয়ার। সরকারি বড় অফিসার। মধ্যপ্রদেশে যে কাজ হচ্ছে তার একটা অংশের পুরো চার্জে। বয়স? তা, হবে আঠাশ উনত্রিশ। বিয়ে করেনি এখনও। থাকে, দেহাতি শহর পুরান্দায়। সরকারি কোয়ার্টার পেয়েছে। পরেশবাবু স্ত্রীকে নিয়ে ঘুরে এসেছেন বেশ ক'বার। ভাল জায়গা, জলহাওয়াও ভাল। সেখানেই আলাপ হয়েছে চিফ্ ইঞ্জিনিয়ার দত্ত সাহেবের সঙ্গে। তাঁরই একমাত্র মেয়ে রাধা। অপরূপ সুন্দরী নয়। তবে শান্ত স্নিগ্ধ সুন্দর। মেয়েটিকে মনে ধরেছিল দুজনেরই। কিন্তু বলি বলি করেও আজ পর্যন্ত কোনো বারই সে কথা দত্ত সাহেবকে বলতে পারেননি। কি যেন একটা ভয় ওঁদের দুজনের মুখ বন্ধ করে রেখেছিল। এ দেশ এখনও তো ঐতিহ্যের শেকল ছিঁড়তে পারেনি। শেষে কারও ভাল করতে গিয়ে ওঁরা তো কারও ক্ষতি করতে পারেন না!

পরে ক্রমে ক্রমে জানতে পেরেছেন ওঁরা, রাধার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছে ওঁদের ছেলের। সে ঘনিষ্ঠতা নিবিড় হবার আগেই পরেশবাবু তাঁর কর্তব্য করেছিলেন। ছেলেকে ডেকে বলেছিলেন, 'খোকা, তুমি নিশ্চয়ই বুঝবে, কোনোও মিথ্যার আড়ালে, সুন্দর সত্য কিছুই গড়ে উঠতে পারে না। তুমি নিশ্চয়ই ভয় পাবে না, সত্যির সামনে দাঁড়াতে?'

সেদিন ছেলে ওঁর আর ওঁর স্ত্রীর পা ছুঁয়ে

বলেছিল, 'বাবা, সে শিক্ষা তো আমি তোমাদের কাছে পাইনি। আমি কখনও কাউকে কোনো দিনও ঠকাব না। তোমরা যে আমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস কর। ও কাজ আমি কি করে করব।'

সেই দিন থেকেই নিশ্চিন্ত পরেশবাবু।

'কি এত ভাবছ তুমি বাবা, বল তো?' ঘরে ঢুকল বাবলু। ঢুকেই চেঁচিয়ে ডাকল, 'মা, ওমা, এসো তো এ ঘরে। দেখে যাও বাবার কাণ্ড! বেশ, বেশ, কাল সকালে নয়, এখুনি এখানে আমার কি মতলব তোমাদের বলছি। ও মা এসো তাড়াতাড়ি।'

মা ঘরে ঢুকে বললেন, 'হ্যাঁরে এমন কিছু বলবি না তো, যাতে আমরা দুঃখ পাই।'

'আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে বলে ভাবছ নাকি মা।'

'ছিঃ, ও কি কথা বলছিস তুই।'

'বাবা বসো তো তোমার ইজিচেয়ারে। মা, তুমি এখানটায় বসো।' বলে বাবুল নিজে উঠে বসল টেবিলটার ওপরে, সামনে দু'পা ঝুলিয়ে।

'রাধা, সেদিন আমাকে একটা ইয়া মোটা বই পড়তে দিল, নাম তার 'রুটস্'। দারুণ বই বাবা! এনেছি সঙ্গে করে, তোমাকে পড়তে দেব। এক নিগ্রো ভদ্রলোক, তাঁর পূর্বপুরুষদের খোঁজ নিতে নিতে কিভাবে তাঁদের শেষে খুঁজে পেয়েছিলেন সেই গল্প। বোধহয় সত্যি ঘটনা। তিনি আফ্রিকার এক গাঁয়ে গিয়ে তাঁর পূর্বপুরুষদের পরিবারের অন্য বংশধরদের খুঁজে পেয়েছিলেন। আলাপ করেছিলেন তাঁদের সঙ্গে।'

মা বললেন, 'এ কথা কেন বলছিস রে?' গলায় ওঁর আশঙ্কার সুর মেশানো।

'মা-বাবা, তোমরা যদি অনুমতি দাও, তাহলে আমিও আমার অতীতটা খুঁজে বার করার চেষ্টা করতে পারি।' বলল বাবলু।

সভয়ে মা বললেন, 'না, আজ আর তার কোনোও দরকার নেই খোকা। তুই আমার ছেলে। রাধার বাবা-মা যদি বিয়েতে আপত্তি করে থাকে তো তোর আমরা অন্য জায়গায় বিয়ে দেব। খোকা, ওই সর্বনাশা খেলায় আর তুই মাতিস না বাবা! কি হতে কি হয় তা কে বলতে পারে!'

পরেশবাবু চুপ করে রইলেন। বাবলুও কিছুক্ষণ কিছুই বলতে পারল না। শেষে বলল, 'মা, তোমাকে ছাড়া আমি তো কাউকে চিনিই না মা। যা কিছু হোক না কেন, তুমিই আমার মা। তবুও মা তুমি মত দাও। আমি শুধু খুঁজে দেখব কোথা থেকে আমি এসেছি। আর তো এত দিন বাদে সেখানে ফিরে যাবার কোনো কথাই ওঠে না মা। আর রাধাও বলছিল, খুঁজে দেখা ভাল। যাই কেন না আমার অতীত হোক, ওর তাতে কিছু আসবে না। তাছাড়া মা আরও একটা কথা আছে।'

পরেশবাবু বললেন, 'তখন তোমার বয়স দেড় কি দুই হবে। ভিড়ের মধ্যে তোমাকে আমি পাই। দেহাতি মেলা চলছিল হুসেন শা পীরের দরগা ঘিরে। হিন্দু-মুসলমান সবাই ওই পীরবাবাকে মানে। তুমি সেখানে ভিড়ের মাঝে হারিয়ে গেছিলে। ওখানকার থানার ইনচার্জ ছিল সৈয়দ রেজ্জাক আলি। আমার বাল্যবন্ধু, লক্ষ্ণৌতে আমরা একসঙ্গে থেকেছি পড়াশোনা করেছি। চারদিকে অনেক খোঁজ করেছিল ও। কোথাও কোনো যোগাযোগ করতে পারেনি। না পারাতে তোমার মা খুশিই হয়েছিলেন। তুমি তো জান, কেন আমরা পীরের দরগায় গিয়েছিলাম। তাই বলছিলাম কি, এত দিন বাদে, নতুন করে খুঁজে তুমি আর কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে বল?'

হাসল বাবলু। বলল, 'বাবা, তুমি বললে, আমার তখন বয়স দেড় কি দুই হবে। ওটা তোমার আন্দাজের কথা। রুটস বইটা পড়তে পড়তেই আমার মাথায় আমার অতীত খোঁজার চিন্তাটা আসে। জান বাবা, তখনি আমার মনে হয়, তোমার ওই প্রথম অনুমানটা ভুল। হয়তো আমি রোগা পাতলা দুর্বল ছিলাম, তাই তোমার অমন মনে হয়েছিল। কারণ, বাবা আমার মনের ভিতরে অতীতের ভাসা ভাসা কিছু স্মৃতি বরাবরই ছিল। যা অত ছোট বাচ্চার মনে থাকা সম্ভব নয়! কিন্তু কি জান! যার ছায়া আমার মনের মাঝে থাকলেও প্রথম জীবনে আমার ছেলেমানুষি মন তার গুরুত্ব বুঝতে পারেনি, বোঝার চেষ্টাও করেনি। বড় হবার পরেও কিন্তু তা কাজে লাগাবার কথা আমার মনে হয়নি, কারণ তোমাদের প্রাণঢালা ভালবাসা, আমাকে কখনও ভাবতে দেয়নি যে, ওই স্মৃতির কোনও মূল্য আছে। আজ, মনের আবছা অন্ধকার থেকে সেগুলোকে টেনে বার করেছি বাবা। তাই কাজে লাগিয়ে আমি একবার খুঁজে দেখতে চাই আমার অতীতটাকে। নিগ্রো ভদ্রলোক তাঁর বহুপুরুষ আগের অতীত খুঁজে বার করতে পেরেছিলেন। আমাকে তো তেমন অতীতে যেতে হবে না। বড়জোর সাতাশ আঠাশ বছ.. অতীত আমার সামনে। তোমরা মত দাও। খোঁজার শেষে আমি নিশ্চয়ই আবার ফিরে আসব তোমাদের কাছে।'

মা বললেন, 'আমার যে ভীষণ ভয় করছে রে!'

'কিসের ভয় মা? মনে আছে তোমার সেই দিনটার কথা, আমার ভীষণ অসুখ করেছিল। তুমি আমার মাথার কাছে বসেছিলে। তুমি ভেবেছিলে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। ডাক্তারবাবুকে তুমি বলেছিলে, খোকনের কিছু হয়ে গেলে আমি বাঁচব না। আমি চোখ খুলে সঙ্গে সঙ্গে বলেছিলাম, কিছু হবে না আমার মা, তুমি দেখো। তোমাকে ছেড়ে আমি মরবই না। দুহাতে তুমি আমাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়েছিলে। সেদিন থেকেই তো জানি, তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতেই পারব না। তবু বলছি মা, তুমি আমাকে যেতে দাও। কদিন তো মাত্র। তাছাড়া....'

'এর মধ্যে অন্য কথাও আছে বাবলু।' বললেন পরেশবাবু।

'কি কথা বাবা? আমিও তো অন্য আর একটা কথা ভাবছি।'

'তুমি কি জান, তোমাকে আমরা কিভাবে পেয়েছিলাম?'

'ও নিয়ে তো এ বাড়িতে বেশি আলোচনা কখনও হয়নি বাবা। সোনাপিসি আর পিসেমশাইকে বারবার জিজ্ঞাসা করে যতটুকু জেনেছি, তাতে মনে হয় আমি আর যাই হই না কেন, বাঙালী ছিলাম না। এই পর্যন্তই জানি আমি।'

'হ্যাঁ। সে কথা ঠিক। তবে তোমার পিসি পিসেমশাইও হয়তো খুব বেশি কিছু জানেন না। কারণ যা কিছু ঘটার তা তো ঘটেছিল তাঁদের চোখের আড়ালে। তোমাকে পাবার পরও অন্তত তিন মাস আমরা হুসেনগঞ্জে ছিলাম। চাচা অনেক চেষ্টা করেছিল তোমার বাবা-মাকে খুঁজে বার করতে। পারেনি। তারপর আমি আর তোমার মা, আইনমতই তোমাকে আমাদের আপন করে নিয়েছি। খোকা, আমরা দুজনে জীবনে কখনও তার জন্য এতটুকুও অস্বাচ্ছন্দ্য অতৃপ্তি বোধ করিনি। আমরা সুখী।'

'থ্যাঙ্ক ইউ ড্যাড। সেই দিনকার সব কথা আমাকে আজ খুলে বলবে তুমি?'

মা বললেন, 'ওরে খোকা, দোহাই তোর। শুনলি তো, আমরা সুখী। আমরা তো আর কিছুই চাই না জীবনে। শুধু তোর বিয়ে দিয়ে তোকে সংসারী দেখতে চাই। তা হ্যাঁরে, তার জন্য তো আর তোকে ওসব খুঁজে বের করতে হবে না। দয়া-মায়ার যদি কোনো দামই না দিস তুই, তবুও বলব, আজ দেশের আইন তো তোকে আমাদের আপন করে দিয়েছে। তবে?'

টেবিল থেকে নামল বাবলু। মার কাছে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরল। বলল, 'কেন যে তুমি ভয় পাচ্ছ মা! আচ্ছা ধর আমি সত্যিই চলে গেলাম, তাহলে তোমার কি হবে বল তো?'

ব্যাকুলভাবে মা তাকালেন শুধু তাঁর ছেলের দিকে। চোখে মুখে ক্রমে যেন আতঙ্ক ফুটে উঠল। মুখে কিছুই উনি বলতে পারলেন না।

'কই, কিছু বলছ না কেন মা। ধর আমি একেবারে চলে গেলাম তোমাদের ছেড়ে....' কথা ও শেষ করতে পারল না। মা হাত দিয়ে শুধু ওর মুখে চাপা দিলেন। দুচোখে ততক্ষণে ওঁর জল এসে গেছে।

'তোমার ভীষণ দুঃখ হবে, না, মা? অথচ, আমি কিন্তু বাচ্চা নই। আর তাছাড়া গত দুবছর ধরে তো বেশি সময় কাজের জায়গাতেই থাকি। তা সে জায়গাও হবে এখান থেকে অন্তত আট ন'শো কিলোমিটার। রোজ তো তুমি আমাকে দেখতেই পাও না। তাহলে আমি চলে যাব বলাতে তোমার মুখে কথা নেই কেন? কেন তোমার চোখে জল?' বলে তাকাল বাবলু ওর মার চোখের দিকে। বলল, 'উত্তরটা আমিই দিচ্ছি মা, কারণ তুমি আমার মা। সত্যিকারের মা। তুমি জান আমি তোমার। তাই আমাকে দূরে পাঠালেও তোমার ভয় ছিল না মনে। আজ ভয় পাচ্ছ, যদি আমি সত্যি চলে যাই ভেবে। না মা, না, আমি যাব না। তোমাকে বলব শুধু ভাবতে, আজ থেকে প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ বছর আগে, আর একটা মা, আজ তোমার যা মনের অবস্থা, তেমন অবস্থায় পড়েছিল। সেও চায়নি তার ছেলেকে হারাতে। কিন্তু তাকে হারাতেই হয়েছিল। কে জানে সে কে! হিন্দু, না মুসলমান। বাঙালী না পশ্চিমের কোনো জায়গার আধিবাসী। বড়লোক, না গরীব লোক! এমনও তো হতে পারে, সে ছিল অছ্যুৎ। তা সে যেই হোক না মা, সেও তো ছিল আমার মা। আজ তোমাকে দেখে আমার বারবার মনে হচ্ছে, তার মনেও তো এই একই ব্যথা, এই হাহাকারই তো তাকে পাগল করছে। মা, তোমরা আমাকে মানুষ করেছ। আমাকে জীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার যোগ্যতা অর্জন করার সুযোগ করে দিয়েছ। আমি তো তোমাদের ভালবাসায় মানুষই হয়েছি মা। বল, তুমিই বল, আমার ওই মা'টার জন্য এখন আমার কি করা উচিত? মা, তুমি যা বলবে, তাই করব আমি। আগেই তো বলেছি, তোমাদের না বলে কিছুই করব না আমি। কখনও আর তোমাদের জীবনে ব্যথা দেব না।'

ছেলের দুহাতের মাঝেই ধরা দিলেন মা। তাঁর দুচোখে জল। সে জল উনি মোছার চেষ্টাও করলেন না। বললেন, 'রোদ্দুরে ঘুরবি না। যা তা খাবি না। আর চিঠি দিবি নিয়মিত। সেই মা'টাকে পেলে, আমাকে কিন্তু কাঁদাতে পারবি না বলে দিলাম।'

'ও মাম্মা, ইউ আর রিয়েলি গ্রেট। সেই মা'টাকে যদি খুঁজে পাই তো দুটো মা'র ভার নেবার মতো বুকের পাটা আছে আমার। এই দেখ তাকিয়ে।' বলে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াল বাবলু।

পরেশবাবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'তাহলে তোমাকে সেদিনের সব কথা আমি খুলেই বলি। তুমি তো জান, মটর এক্সিডেন্টে তোমার মা ভীষণভাবে আহত হন। প্রাণে বাঁচেন। কিন্তু শরীরে একটা পাকা ক্ষত হয়ে যায়। সুস্থ হয়ে উঠলেও মনে মনে উনি খুবই অশান্তি ভোগ করতে থাকেন। আমার বাল্যকাল কাটে লক্ষ্মৌতে। সেখানেই তোমার চাচার সঙ্গে আমি একই কলেজে পড়তাম। পাশ করে আমি সরকারি অফিসে যোগ দিই। ও যায় পুলিশে। আমাদের মধ্যে যোগাযোগ চিরকালই ছিল, আজও আছে। ওই একদিন চিঠি লিখে জানাল, ও হুসেনগঞ্জ থানার চার্জ পেয়েছে। পীর হুসেন শা, জাগ্রত পীর। গোটা অঞ্চলের অনেকেই আসে মানত করতে। তা সে, কি হিন্দু, কি মুসলমান। হুসেনগঞ্জের জলহাওয়াও খুব ভাল। ক'মাস থেকে গেলে এমনিতেই ওর ভাবী, মানে আমার স্ত্রীর শরীর মন ভালো হবে। তাছাড়া পীরের দরগায় মানত করলে মিরাকেলও তো ঘটতে পারে। আমাদের তাই ওখানে ক'মাসের জন্য যেতে লিখল ও। গেছিলাম আমরা। পীরের দরগার উরস শরিকের সময় হিসাব করে।

শীতকাল। হুসেনগঞ্জ ছোট্ট সুন্দর শহর। চারদিকে পাহাড়ঘেরা। মনোরম জায়গা। খুব ভাল লেগেছিল আমাদের। ছোট্ট একটা বাড়ি ভাড়া করে দিয়েছিল রেজ্জাক। খুব আরামেই ছিলাম আমরা। দুদিনের মেলা। প্রথম দিনই মানত করতে হয়। খুব সকালে, থানার দুজন সেপাই সঙ্গে নিয়ে আমরাও গেছিলাম পীরের দরগায়। তোমার মা শুদ্ধাচারে গেছিলেন তাঁর মানত জানাতে। মানত সেরে ফিরছি আমরা, তখনি পথে এক জায়গায় ভিড় দেখে থামি। দেখি তোমাকে ঘিরে জটলা। সবাই জিজ্ঞাসা করছে সবাইকে, কার বাচ্চা। তোমার কান্না দেখে তোমার মা সহ্য করতে পারেননি। এগিয়ে গিয়ে তোমাকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। তোমার কান্না থেমেছিল। তুমি কিন্তু তখনও ভয়ে থরথর করে কাঁপছিলে। আর তোমার ছোট্ট দুটো হাত দিয়ে ওঁকে ভীষণভাবে আঁকড়ে ধরেছিলে! সেই হাতের বাঁধন আর উনি খুলতে পারেননি কোনোদিন!'

'তারপর তোমরা কোথায় কোথায় খুঁজেছিলে বাবা? কি করে খুঁজেছিলে?' জিজ্ঞাসা করল বাবলু।

'আমরা তোমাকে নিয়ে থানায় গেছিলাম। রেজ্জাক নিজে চারদিকে লোক পাঠিয়েছিল। আশপাশের থানায় থানায় খোঁজ নিয়েছিল। কোথাও কেউ কোনো খবর দিতে পারেনি। তোমার মা কিছুতেই তোমাকে থানায় জমা দিতে রাজী হলেন না। রেজ্জাকও বলল, ও বাচ্চা থাক না ভাবীর কাছে। থানায় কে দেখবে ওকে। একটা একটা করে বহুদিন কেটে গেল। শেষে আমাদের দেশে ফেরার সময় এসে গেল। ততদিনে তুমি আমাদেরই হয়ে গেছ। ফেরত দেবার আর কোনো প্রশ্নই ছিল না। রেজ্জাকই সব ব্যবস্থা করে দিল। আমরা তোমাকে নিয়ে মহকুমা শহরে গেলাম। থানার অনুমতি নিয়ে নিজেদের যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে আইনসম্মতভাবে তোমাকে আপন করে নিয়েছিলাম আমরা। সে তো আজ বহুদিন হয়ে গেল। তবে হ্যাঁ, একটা কথা আমাদের দিতে হয়েছিল, স্থানীয় থানা যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তোমার পরিবারের আসল লোকজনদের খুঁজে পায়, তারা যদি তোমাকে ফেরত নিতে তখনও আগ্রহী থাকেন, তখন তোমাকে ফেরত দিতে আমরা বাধ্য থাকব। তোমাকে নিয়ে কলকাতা ফিরে এসেছিলাম আমরা।

'আমি অবশ্য তোমার মার অজান্তেই চিঠি দিতাম রেজ্জাককে, তোমার আপনজনদের খবর পাওয়া গেল কিনা জানতে চেয়ে। বেশ ক'খানা চিঠির পর রেজ্জাক রাগ করে লিখেছিল, তুমি কেমন বল তো দোস্ত! কেন মিছিমিছি ভাবীর মনে দুঃখ দিচ্ছ। আর তোমাকে বাবলু সম্বন্ধে চিঠি লিখতে হবে না। খবর পেলে আমিই জানাব তোমাকে। ওই বিষয়ে আর কোনোদিনই আমি তোমার কোনো প্রশ্নের উত্তর দেব না বলে দিলাম। ব্যস, তারপর আর তোমার অতীত নিয়ে কোথাও কেউ কোননোদিন ভাবেনি।'

একটু চুপ করে থেকে বাবলু বলল, 'আমাকে যখন তোমরা পাও, তখন আমার চেহারা কেমন ছিল, একটু বলতে পারবে কি বাবা? এই কত লম্বা ছিলাম, রোগা না মোটা, ফর্সা না কালো? মাথায় চুল কেমন ছিল? কি পরে ছিলাম আমি? এইসব আর কি?'

'দাঁড়াও।' বললেন পরেশবাবু, 'মালতী, তোমার হাতবাক্সটা খুলবে আজ? আমার মনে হয় খোকা ঠিকই বলেছে, তোমার আর আমার আজ আর হারাবার কিছুই নেই। জানি না, হয়তো কোথাও কারও কিছু পাওনা রয়ে গিয়েছে। দাও না তাকে তা পেতে। আনবে তোমার হাতবাক্সটা এখানে?'

'মার হাতবাক্সটা! ওটা কোথায় আছে আমি জানি বাবা। মা তুমি থাকো, আমিই আনছি ওটা। ওর মধ্যে তাহলে অনেক রহস্য ভরা আছে। তাই ওটা খুলতে গেলে বারবার মার হাতে চাঁটি খেয়েছি। এক দুবার কানও মলে দিয়েছ, মনে আছে তোমার? দাঁড়াও, আনছি ওটা।' কথার শেষে ঝড়ের মতো ঘর থেকে বার হয়ে গেল বাবলু।

পরেশবাবু বললেন, 'মন খারাপ কর না তুমি। আমরা তো কখনও কোনো কিছু গোপন করিনি ওর কাছ থেকে। আর ও তো অবুঝ অবিবেচকও নয়। ও কখনও এমন কিছু করবে না যা তোমার-আমার দুঃখের কারণ হতে পারে। এ ও ভালই করছে মালতী। সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাওয়া ভাল। তাতে দেখবে অনেক বেশি শান্তি।'

ছোট্ট একটা স্টিলের হাতবাক্স নিয়ে ঘরে ঢুকল বাবলু। বাক্সটা রঙ করা, নক্সা কাটা। সেটা টেবিলের ওপর রেখে বলল, 'মা, চাবিটা দাও,আজ কান মলো আর চড়ই মার, এ বাক্স আমি খুলবই। দেখতে হবে, কি তুমি এতদিন আমার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিলে!'

হাসি আর কান্না মেশানো গলায় মা বললেন, 'তোর ছেলেবেলা,তোর কাছ থেকে এতে বন্দী করে আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম। কেন জানি না আমার খালি ভয় হতো, যদি তারা এসে তোকে কেড়ে নিয়ে যায়। সর, সরে দাঁড়া, আমি খুলে তোকে দেখাচ্ছি কি আছে ওর ভিতরে।'

এগিয়ে গিয়ে মা তাঁর আঁচলে বাঁধা চাবির গোছার একটা চাবি লাগিয়ে ওটা খুলে ফেললেন। ডালাটা তুলে ধরলেন। বাবলু ঝুঁকে পড়ার আগেই তুলে ধরলেন একটা ছোট ফটো এলবাম।

সেদিকে তাকিয়ে বাবলু প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'ওতে আমার ছেলেবেলার ফটো আছে মা? আমার ছেলেবেলার! বাড়িতে এত দিন যত ফটো দেখেছি আমি, সে তো সবই আমার বারো তের বছর বয়সের পরের ছবি। আমি তো তোমাদের কতবার জিজ্ঞাসা করেছি, আমার ছেলেবেলার কোনো ছবি নেই কেন মা? কথাটা তোমরা এড়িয়ে গেছ। পিসি এলে তাকেও জিজ্ঞাসা করেছি, পিসি বলেছে, দাদা-বৌদির যা কাণ্ড, ছবি তুলে রাখতে যে হয় তাও খেয়াল ছিল না ওদের। তার মানে পিসিও আমাকে মিথ্যা কথা বলেছিল। দেখি দেখি এলবামটা।'

প্রথম ছবিটা একটা রোগা পাতলা ফর্সা ছেলের। পরনে তার ঝুলপাঞ্জাবি আর চুস্ত। পায়ে শুঁড় তোলা নাগরা। চোখে অসহায় চাহনি। মুখ চোখ ফ্যাকাসে। দেখলে মনে হয় ওই ছেলেটার বয়স বড়জোর দুই। ওই বয়সের ছেলেকে অমন পোশাক পরানো মানেই তাকে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পরেশবাবু বললেন,'ঠিক এভাবেই তোমাকে আমরা প্রথমে পাই পথে! তুমি হাপুস নয়নে কাঁদছিলে। এ ছবিটা অবশ্য ক'দিন পরে তোলা।'

পাতা ওল্টাল বাবলু। পরের ছবিটা সেই ছেলেটারই খালি গা। চুস্ত পরা। গলায় ওর ঝুলছে সরু সুতোয় বাঁধা একটা লকেটের মতো জিনিস। অবাক বাবলু ঝুঁকে পড়ে ভাল করে দেখল ছবিটা। হাড়জিরজিরে চেহারা বাচ্চাটার। পাঁজরার প্রত্যেকটা হাড় গোনা যায়। আর অমন চেহারা বলেই, বয়স ওর অত কম বলে মনে হয়।

পরেশবাবু বললেন, 'তোমার গলায় তখন ওই তাবিজটা ছিল। ওটা রুপোর তাবিজ। বোধহয় হুসেন শা পীরবাবার থানের তাবিজ। কারণ, ওর গায়ে উর্দুতেই আল্লার বাণী লেখা আছে।'

বাবলু সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'এমনও তো হতে পারে বাবা, আসলে ছেলেটা মুসলমান ছিল। তাই অমন তাবিজ ছিল ওর গলায়?'

মা বললেন, 'মুচি, মেথর, ডোম, চাঁড়াল, যে বাড়িরই হোস না তুই খোকা, তুই আমার। মুসলমান হলেই বা কি আসে যায়? তোকে পাবার পরই বুঝেছি রে জাত-পাত উঁচু-নিচু, ছোট-বড় সব বাজে কথা। মানুষ তো মানুষই, তার আবার জাত ধম্মো কি?'

পরেশবাবু বললেন, 'তোমার অনুমানও সত্যি হতে পারে খোকা। তবে আমি নিজে খোঁজ নিয়ে জেনেছি হুসেন শা পীরের তাবিজ, হিন্দু-মুসলমান, সবাই পরতো। আর তোমার যা চেহারা ছিল তখন, তাতে মনে হয় তোমাকে পীরের দরগায় আনা হয়েছিল তোমার স্বাস্থ্যের কথা ভেবেই বোধহয়। ওখানেই তোমার গলায় আশীর্বাদী তাবিজ পরানো হয়েছিল। তারপর তুমি হারিয়ে যাও।'

'এমন ভাবার কারণ কি বাবা?'

'দেখ, তাবিজের কারটা, মানে কালো সুতুলিটা আমার মনে হয়েছিল নতুন। তাবিজটাও তখন চকচক করছিল। বলেছি তো ওটা আসল রুপোয় তৈরি।'

পরের আরও কটা ছবি আছে। সেগুলো অনেক হাসিখুশি ছেলের। তার স্বাস্থ্য ফিরছে। আর প্রত্যেকটা ছবিতেই সে আছে তার মার সঙ্গে। এমন সব ছবি আছে ছেলেটার পাঁচ ছয় বছর বয়স পর্যন্ত। তার কটাতে পরেশবাবুও আছেন। আছে সোনা পিসি, পিসেমশাই, তাদের ছেলে সমীর। সেও প্রায় বাবলুর বয়সী। ওই বয়সের পরের আর কোনো ছবি ওই এ্যালবামে নেই। এ্যালবামটা বন্ধ করে পাশে রাখল বাবলু, হাতবাক্সের নিচ থেকে বার করল একটা কাগজের প্যাকেট। তার মধ্যে ভাঁজ করে রাখা আছে সেই জামা আর চুস্তটা। আর একটা ছোট্ট কৌটোর মধ্যে আছে কালো কারে বাঁধা সেই তাবিজটা। তার গায়ে উর্দু বা ফার্সী লেখা স্পষ্ট। আর কিছুই নেই হাতবাক্সটাতে।

সব আবার গুছিয়ে হাতবাক্সে তুলে রাখল বাবলু। বলল, 'মা, আমি কিন্তু খুঁজতে যাবার সময়, এগুলো সঙ্গে নিয়ে যাব। নিশ্চয়ই আবার ফেরতও নিয়ে আসব।'

মা বললেন, 'হারাস না কিন্তু ওগুলো। ওগুলো যে আমার কাছে কি, তা তোকে বলে বোঝাতে পারব না রে। কি জানি, বোধহয় ভাবতাম, ওগুলো লুকিয়ে রাখতে পারলেই আমি আর তোকে হারাব না। আমার এখনও ভীষণ ভয় রে খোকা।'

বাবলু জিজ্ঞাসা করল, 'আমি কি তখন কথা বলতে পারতাম বাবা। কিসে তোমরা বুঝেছিলে আমি বাঙালী নই?'

'তোমার ওই পোশাক আর তাবিজটাই প্রথম প্রমাণ যে তুমি বাঙালী নও।'

'বাঃ, আজকাল তো সব বাচ্চারাই অমন ঢিলে পাঞ্জাবি আর চুস্ত পরে। তবে নাগরার আর তেমন চল নেই এখন।'

'না, নাগরার চল নেই বটে। তাছাড়া অত বছর আগে, বাঙালী ঘরের বাচ্চারাও অমন পোশাক পরত না। তবে তুমি বলতে পার, ইউ.পি, সি.পি'র বাঙালী ঘরের ছেলেরা তো অমন পোশাক পরতে পারে। সে দেশের বাঙালী বাচ্চাদের মধ্যে ওর চল ছিল। তা নিশ্চয়ই হতে পারে। তা যদি হয় তো আমাদের সিদ্ধান্ত ভুলই হবে। তবে কি জান, তোমার চাচা সময় সুযোগ পেলেই তোমাকে নিয়ে বসত। তোমার সঙ্গে ওদিকের ভাষায় কথা বলত। তুমি নাকি তা শুনে খুব খুশি হতে। ওর কথায় সাড়াও দিতে। ততদিনে তুমি তোমার মাকেও ভালবেসে ফেলেছ। অথচ তোমার মার কি কষ্টই না হতো তোমাকে কথা বোঝাতে। কি উনি বলতে চান, তা তো তুমি প্রথমে বুঝতেই পারতে না! আমার মনে আছে, যে দু'একটা কথা তখন তুমি বলতে, তাও বাংলা ছিল না। তোমার নাম জিজ্ঞাসা করলে, একটুও না ভেবে বলতে বাবল্। তাই থেকেই তোমার ডাকনাম হয়ে যায় বাবলু। তাছাড়া এও সত্যি, হুসেনগঞ্জে যে ক'টি বাঙালী পরিবার ছিল, যাঁরা পীর বাবার মাজারে মানত করতে এসেছিলেন তখন,

তাঁদের কারও ছেলে হারায়নি। যদি বল, বাইরের বাঙালীর ছেলে তুমি, তোমার বাবা-মা ওই একদিনের জন্যই মেলায় এসেছিলেন, তাহলে বলতে হবে, তাঁরা ছেলে হারিয়ে চুপ করে বসে থাকতেন না। মেলা তোলপাড় করতেন, থানায় যেতেন। তাই বলা যায়...'

বাবলু বলল, 'আমি অবাঙালীদের বাড়ির ছেলে। এই তো?'

পরেশবাবু বললেন, 'সত্যি যা তা মানতে গেলে তো তাই বলতে হয়। আর এও বলতে হয়, তুমি হয়তো হিন্দুবাড়ির ছেলেই নও। মুসলমান বাড়ির ছেলে।'

বাবলু বলল, 'তোমার এমন অনুমান করার কারণ, বাবা?'

'দেখ, পীরের দরগায় হিন্দুরা যান, ওখানেও অনেকেই যেতেন। কিন্তু দেহাতী হিন্দুদের বাচ্চার পোশাক, আর যাই হোক অমন ঝুল পাঞ্জাবি আর চুস্ত হবে না। দ্বিতীয়ত, তাদের গলার তাবিজে সাধারণত হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি খোদাই করা থাকে। উর্দু বা ফার্সীতে কোরাণের বয়েৎ লেখা থাকে না। এটা তো তুমি মানবে?'

'কিন্তু বাবা, এমনও তো হতে পারে, ওটা হুসেন শা পীরের দরগার দেওয়া তাবিজ, এ কথা তো তখন তুমিই বললে, তবে?'

'হ্যাঁ, তা বলেছি, তবে তুমি যখন অতীত খুঁজতে যাচ্ছ, তখন এই কথাগুলোও তোমার সারাক্ষণ মনে রাখা উচিত।'

'ঠিক বলেছ বাবা। তবে আমার মনের গভীরে স্মৃতির যে অস্পষ্ট ছবি এত দিন ধরে আমি মিছিমিছি বয়ে বেড়িয়েছি, তোমার বলা সব কথাগুলো, এখন আমাকে তার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হবে। বাবা, আমার মনে হচ্ছে, সব রহস্যের সমাধান হয়তো হলেও হতে পারে।'

পরেশবাবু বললেন, 'তোমার মনের সেই অস্পষ্ট ছবিগুলোর কথা কি আমরা শুনতে পাই না?'

'কেন শুনবে না। আমি তো বলতেই যাচ্ছিলাম। যদি তোমাদের দেখা জানা বা শোনা কিছুর সঙ্গে সব কিছু মিলে যায়, তাহলে তো আমার খোঁজা খুব সহজ হয়ে যাবে।'

'তোমার মনে কি কোনও লোকের কথা আছে? বা কি অন্য কিছুর কথা বা ছবি? যা বলবে, চেষ্টা কর তা স্পষ্ট করে বলতে।' বললেন পরেশবাবু।

অল্প কিছুক্ষণ ভাবল বাবলু। বলল, 'লোক আছে একজন, সে খুব কাঁদে! বড়। খুব আদর করে। মনে হয় সেই মা!'

'কেমন দেখতে তাঁকে?'

প্রথম ছবিটা একটা রোগা পাতলা ফর্সা ছেলের।

বেশ ভাবতে চেষ্টা করল বাবলু। কিছুক্ষণ পরে বলল, 'চেঁচিয়ে কাঁদে না! এখন আমার এই মন নিয়ে বলছি, লুকিয়ে কাঁদে সে। মানে সেই মহিলা। তার কথা ভাবতে আমার খুব ভাল লাগে। কারণ আমাকে খুব ভালবাসত।'

'ব্যস! আর কিছুই তুমি মনে করতে পারছ না? ইনি তোমার মা ছাড়া কি আর অন্য কেউ হবেন? আরও একটু ভাবতে চেষ্টা কর।'

মা বললেন, 'তুই কিন্তু রাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোতিস। আমার মনে হতো, তা তুই ভয়ে করতিস। বোধহয় তোর মনে হতো ঘুমের মধ্যে আবার কেউ তোকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাবে!'

'একটা অন্ধকার ঘর। একটা ছেঁড়া বিছানা। একটা বিরাট উঁচু পাঁচিল, মাঝখানে তার বোধ হয় একটা ফটক। সেটাও বড়। তবে সব সময় বন্ধ থাকে। কাছে যেতে আমার ভয় করত! ভয় পেলে আমি ছুটে চলে যেতাম অন্ধকার ঘরে। সেখানেই সে বসে বসে কাঁদত!'

'ঘুমের মধ্যে তুই মাঝে মাঝে বিড়বিড় করতিস। কতবার শুনেছি বলছিস, আম্মা! তোর বাবা বলত, ও নাকি আদরের ডাক মাকে।'

'আচ্ছা বাবা, অমন উঁচু পাঁচিলঘেরা বাড়ি, যার মাঝখানে অমন একটা ফটক, তা কি তোমরা হুসেনগঞ্জের আশপাশে কোথাও দেখেছ?'

'না হে।' বললেন পরেশবাবু, 'তোমার চাচাই তো খোঁজখবর নেওয়া শুরু করেছিল। ও যেখানে যেখানে তোমাকে আর আমাকে নিয়ে গিয়েছিল, তেমন কোথাও, অমন কোনো বাড়ি আমার নজরে পড়েনি।'

বাবলু বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ ড্যাড। আমার কাজ তুমি খুব সহজ করে দিলে। তাহলে আমার সার্চ চলবে প্রধানত ওই উঁচু পাঁচিলঘেরা বাড়ির ব্যাপারে। সেটা মুসলমান বাড়ি হলে ভাল হয়। কারণ, এ তো জানা কথা, ওরা খুব আবরু মেনে চলে। উঁচু পাঁচিল তাই। তাছাড়া ওই তাবিজটার কথাও মনে রাখতে হবে বইকি! ও মা, এবারে তোমার জাত গেল বলে দিলাম! কোথাকার কোন একটা মোছলমানের ছেলে, হয়তো জালালুদ্দিন, না হয়তো আব্বাস আলি, চাইকি রহমৎ নাম তার। তাকে এতদিন ঘাঁটাঘাঁটি করেছ, খাইয়ে দিয়েছ, অসুখের সময় মাথার কাছে বসে থেকেছ। গেছে, গেছে, তোমার জাতপাত সব গেছে! যাও, এক তাল গোবর খেয়ে প্রাচিত্তির কর গিয়ে। বাবা, গোটা বাড়ির সবার গঙ্গাচানের ব্যবস্থা কর। আমি যাই আগে পুরুতমশাইকে গিয়ে খবর দিয়ে আসি, আর কি কি করতে হবে তার বিধান যেন দিয়ে যান এসে।'

মা এতক্ষণ বাদে হাসলেন। সে হাসিও করুণ। বললেন, 'পাগল ছেলে, তোর জন্য না হয় আমিই মোছলমান হয়ে যাব। গরু খেতে পারব না, বলে দিলাম। তুই খেলেও, কান ছিঁড়ে দেব।'

পরেশবাবু বললেন, 'তোমার কি আর কিছু মনে পড়ে না খোকা? মানে, যা বললে তুমি, তাতে তো তোমার বাড়ি, আর বাড়ির একজনের সম্বন্ধে ভাসা ভাসা একটা পরিচয় পাওয়া গেল। কিন্তু সে বাড়ি থেকে, তোমাকে যেখানে আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম, তার তো কিছুটা দূরত্ব আছে। সেটা তুমি কিসে পাড়ি দিলে? মানে, কিভাবে ওখানে এলে? আমি কি বোঝাতে চাইছি শোন, যদি মানতের জন্য তোমাকে আনা হয়ে থাকে তবে তো তোমার সঙ্গে কোনও আপনজন এসেছিলেন। সে ক্ষেত্রে আসার সময় তোমার মনে কোনো ভয় ছিল না। তাই সেই স্মৃতি হয়তো তোমার মনে থাকবে না। কিন্তু ধর, যদি তোমাকে তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওখানে জোর করে আনা হয়ে থাকে....' কথাটা পরেশবাবু শেষ করতে পারলেন না।

বাবলু হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'বাবা, একটা রহস্যের চাবিকাঠি বোধহয় পেলাম আজ। না, না, আমাকে হুসেন শা পীরের দরগায় মানত পুজোর জন্য নিয়ে যাওয়া হয়নি! আমি বোধহয় ওখানে গেছিলাম আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে! একটা ঘোড়ার গাড়ি খুব জোরে ছুটছে! ভীষণ জোরে! দারুণ ভয় করছিল আমার! উঃ সে কি ভয়! কে যেন ভয় দেখাচ্ছিল। মাথায় পাগড়ি মুখে দাড়ি গোঁফ নেই! সে দাঁত বার করে ভয় দেখাচ্ছিল! আর হঠাৎ হঠাৎ গাড়ির ঘণ্টাটা বেজে উঠছিল ঘররাং ঘররাং! আমি আতঙ্কে চমকে উঠছিলাম। এই আতঙ্ক ধরানো স্বপ্ন আমি বহুবার দেখেছি বাবা। যখন ছোট ছিলাম এই স্বপ্ন দেখেই কেঁদে ভয়ে মাকে জড়িয়ে ধরতাম। মা, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, তুমি মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলতে, ও কিছু নারে, ও স্বপ্ন। আয় আমার কাছে এসে বুকের মধ্যে শো। জান বাবা, বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে এই স্বপ্নটা আর তত দেখি না। তবে এখনও দেখি! তেমনি আতঙ্ক জাগে মনে। ঘুম ভেঙে যায়। মা, এখনও ঘুমজড়ানো চোখে হাত বাড়িয়ে আমি তোমাকেই খুঁজি। পুরো ঘুম ভাঙলে বুঝি, ওটা সেই ভয়ঙ্কর স্বপ্ন।'

'তুমি কি বলতে চাও, তাহলে তোমাকে জোর করে ওখানে নিয়ে গিয়ে ফেলে আসা হয়েছিল?' জিজ্ঞাসা করলেন পরেশবাবু।

'একটা দেহাতী মেলায় যত ভিড়ই হোক না কেন, একটা ছেলে হারিয়ে গেল, আর কেউ তার খোঁজই করল না! এটাও ভাবার মতো কথা বাবা।'

'তাহলে এখন তুমি কি করতে চাও?' জিজ্ঞাসা করলেন পরেশবাবু।

'প্রথমে হুসেনগঞ্জে যাব। সেখানে থাকার ব্যবস্থা করে, আশপাশে খোঁজা শুরু করব। মুসলমান বাড়ি, হিন্দু বাড়িও হতে পারে, উঁচু পাঁচিলঘেরা, মাঝে উঁচু ফটক। যে বাড়িতে ছিলেন একজন দুঃখী মহিলা, প্রায় বন্দী! একটা তেজী ঘোড়ার গাড়ি, একটা দাড়ি গোঁফ ছাড়া লোক, তার মাথায় বিরাট পাগড়ি। আর হারিয়ে যাওয়া একটা ছেলে, বয়স আড়াই তিন, গলায় তার হুসেন শা পীরের তাবিজ বাঁধা। যদি সবগুলো পরপর জুড়তে পারি বাবা, তাহলে তোমাদের গোবর খাওয়া আর গঙ্গাস্নান ঠেকায় কে! পুরুতমশাইয়ের খরচা? আমিই দিয়ে দেব।'

'কবে রওনা দেবে তুমি?' জিজ্ঞাসা করলেন পরেশবাবু।

'কাল। বাবা আর দেরি করতে ইচ্ছা করছে না। তাছাড়া ছুটির কথা তো ভাবতে হবে! ওদিকে চাকরি।' বলল বাবলু।

'যেখানে সেখানে থাকতে পারবি না তুই।' বললেন মা। 'তুমি চিঠি লিখে দাও রেজ্জাক ঠাকুরপোকে, সেখানেই ও থাকবে। ওদের গাঁ তো শুনেছি পীরবাবার স্থানের থেকে বেশি দূরে নয়। তাহলে ওর অসুবিধা হবে না বিশেষ।'

হেসে বাবলু বলল, 'তুমি কি আমাকে অত বোকা পেয়েছ মা? ওসব চিঠিফিটি লাগবে না। হৈ হৈ করে গিয়ে উঠে পড়ব। ব্যস, ফ্রি থাকা খাওয়া আর রোজ রোজ বড় গোস্তের ঝোল, চচ্চড়ি খেয়ে ইয়া মোটা হয়ে ফিরব। তুমি আর চিনতেই পারবে না। চিনবে কি করে বল? যাবে বাবলু চন্দর, ফিরবে তো বরকতউল্লা খাঁ। নেড়া মাথা ইয়া লম্বা দাড়ি। গা দিয়ে প্যাঁজ রসুনের ভুরভুরে গন্ধ। উঃ সে যা একখানা কাণ্ড হবে না!'

মা বললেন, 'পাগল কোথাকার। খুব হয়েছে, এখন চল তো, কিছু খেয়ে ঠাণ্ডা হবি। হুসেন শা পীরবাবা বড় জাগ্রত রে! আমার মতো হতভাগীও মানত করে সঙ্গে সঙ্গে ফল পেয়েছিল। বাবা, আর যাই করিস, পীরের দরগায় ভাল করে পুজো দিস। অনেক গরিব দুঃখীজন থাকে সেখানে, তাদের ভাল করে দিস খুস। ওগো তুমি নয় খোকাকে তার জন্য কিছু টাকা দিয়ে দিও। বুঝলে?'

বাবলু বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ মাম্মি। এ তো দেখছি থাকা খাওয়া ফ্রি। এমন কি যাতায়াতের রাহা খরচও উসুল হয়ে যাচ্ছে। নাঃ হুসেন শা পীরবাবা দেখছি দারুণ জাগ্রত। বাবা, তাহলে একটু বেশি করেই স্যাংকশন করে দিও। তাহলে, তোমার ছেলের হার্ড আর্ন ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সে আর হাত পড়ে না।

ওদিক থেকে হরিহর তখন বলল, 'আঃ অত বোকো না তো খোকা, চল, খাবে চল। ওদিকে সব ঠাণ্ডা হচ্ছে।'

ভোর ভোর ট্রেনটা পৌঁছল হুসেনগঞ্জে। স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে ট্রেন থেকে নেমে পড়ল বাবলু। প্রায় পাঁচ বছর আগে শেষ এসেছিল এদিকে। তখন অবশ্য চাচা থানার কোয়ার্টারেই ছিল। ক'বছর আগে রিটায়ার করে দেহাতে জমি কিনে বাড়ি করে উঠে গেছে। সেখানে বাবলুর যাওয়া হয়নি। স্টেশন থেকে বার হয়ে সামনের টাঙ্গাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করল ও। 'হজরতগঞ্জ যায়েগা?'

'যায়েগা।' বলল টাঙ্গাওয়ালা, 'বহুত দূর রাস্তা, বিশ রুপিয়া লাগেগা বাবুজী।'

'কতক্ষণ লাগবে পৌঁছাতে?'

'তিন ঘণ্টা লাগ যায়েগা বাবুজী। বিশ মাইল হোগা ইঁহা সে।

'বাস চলে না? ট্যাক্সি বা স্কুটাররিক্সা?'

'বাস মিলেগা, বাবুবাজার সে আধা ঘণ্টা বাদ বাদ। বাসমেই যাইয়ে বাবুজী, জলদি হোগা।' বলল টাঙ্গাওয়ালা।

'তুমি তাহলে আমাকে বাজারেই পৌঁছে দাও।' বলে টাঙ্গায় উঠে বসল বাবলু। টাঙ্গা ছেড়ে দিল টাঙ্গাওয়ালা। ঘোড়ার পিঠে ক'ঘা ছিপটি হাঁকড়ে বলল, 'বাবু, হজরতগঞ্জমে কিসকা পাস যায়েঙ্গে আপ?'

'সৈয়দ রেজ্জাক আলি সাহেবের বাড়িতে যাব আমি।'

'থানেদার সাব কা কোঠি?'

'হ্যাঁ, একসময় তিনি এখানকার দারোগা ছিলেন বটে। তুমি চেন তাঁকে?'

'সবকোই পহেচানতা উনকো।' বলল টাঙ্গাওয়ালা, 'বাবুজী আপ থোড়া ইসট্যান্ডমে রুক যাইয়ে, দশ পন্‌রো মিনট।' বলে বাসস্ট্যান্ডে বাবলুকে নামিয়ে দিয়েই টাঙ্গাওয়ালা বলল, 'মত যাইয়ে, হাম আভি আয়া।' বলে টাঙ্গা ছুটিয়ে বাজারের অন্য দিকে চলে গেল ও। ভাড়াটাও নিয়ে গেল না যাবার সময়। ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ল বাবলু। ওদিকে একটা বাস ছাড়ব ছাড়ব হয়েছে। কন্ডাক্টর যে সব জায়গার নাম বলে যাত্রীদের ডাকছে তার মধ্যে হজরতগঞ্জের নামও আছে। বাসে গিয়ে উঠবে যে সে উপায় নেই। ভাড়া না নিয়ে টাঙ্গাওয়ালা যে কোথায় উধাও হলো?

ফিরল ও মিনিট কুড়ি পরে। তার অনেক আগেই বাসটা ছেড়ে চলে গেছে। স্ট্যান্ডে তখন আর কোনো বাস নেই। টাঙ্গাওয়ালা কাছে এসে একগাল হেসে বলল, 'উঠিয়ে বাবুজী ফির টাঙ্গামে, হাম আপকো ঠিক জাগাহ্ পর পৌঁছা দুঙ্গা।'

অবাক বাবলু বলল, 'কোথায় যেতে হবে আমাকে? আমি তো যাব হজরতগঞ্জ। অন্য কোথাও নয়।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ বাবুজী,ওহী জাগাহ্‌মে তো আপকো পৌঁছায়গা হাম। চলিয়ে।'

কি যে করবে ঠিক ভেবে পাচ্ছিল না বাবলু। ওকে ইতস্তত করতে দেখে টাঙ্গাওয়ালা বলল, 'থানেদার সাবকা ছোটা লেড়কা ইঁহা রহতা হ্যায়। কালিজমে পড়া লিখা করতা হ্যায়। উনকো পাশ আপকো লে যায়েগা হাম।'

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাবলু বলল, 'আবদুর রহমান এখন এখানে থাকে নাকি? তা হ্যাঁ এতদিনে ওর তো কলেজে পড়ার বয়স হয়েছে। চল চল, আগে বলবে তো? আমি তো ভয় পেয়ে গেছিলাম।'

থানা পেরিয়ে শহরের ঘিঞ্জি এলাকা ছাড়িয়ে একটা ছোট্ট বাড়ির সামনে টাঙ্গা থামাল টাঙ্গাওয়ালা। বাড়ির সামনে ছোট্ট সুন্দর বাগান। বেড়া দেওয়া বাগানের মাঝে ফটক। বাবলু নামতে নামতে দেখল দরজা খুলে হন্তদন্ত হয়ে আবদুর রহমান বার হয়ে আসছে। চোখে মুখে বেশ লজ্জিত ভাব।

টাঙ্গাওয়ালা বলল, 'আজ ছুট্টি কা দিন, ইসলিয়ে ও শো রহা থা। হাম উঠা দিয়া।'

প্রায় ছুটেই কাছে এসে ফটক খুলে আবদুর রহমান বলল, 'আইয়ে ভাইসাব, আইয়ে। ছুট্টি ছিল, তাই উঠতে দের হলো।' বলে প্রায় জোর করেই বাবলুর হাতের স্যুটকেসটা কেড়ে নিল। ঘুরে দাঁড়িয়ে টাঙ্গাওয়ালাকে বলল, 'ধনিরাম ভাই তুম যাতে বখত্ মুবারককো বোলকে জানা, উস্‌কো ছুট্টি ক্যানসেল হো গয়া। উসকো জলদি আনে বোলো। আতে বখত্ ডবল রোটি, আন্ডা, গোস্ত সব লেকে আনা। বোল দেনা ঘরপে ভাইসাব আয়ে হ্যায়।'

টাঙ্গাওয়ালাকে পাঁচটা টাকা দিল বাবলু। সেলাম করে ও চলে গেল। কথা বলতে বলতে ওরা দুজনে ঘরে এসে বসল। দু'কামরার ছোট্ট বাড়ি, সামনে পিছনে বাগান। বেশ সাজানো গোছানো সব কিছু।

বাবলু জিজ্ঞাসা করল, 'এ কি তোমাদের ভাড়াবাড়ি?'

'না ভাইসাব।' বলল আবদুর রহমান, 'বাবা বোলেন, শোহোরে কামকাজ হবে তো কুথায় থাকা যাবে। তাই এ কোঠি বানালো।'

'এখন তুমি একলা থাক এখানে?'

'হাঁ, কালেজ করি। ছুট্টি হোলে শনিচার এতোয়ার ঘর যাই। আজ ছুট্টি, আজ যাবার বাত ছিল। লেকিন তুমি এলে, ছুট্টি ক্যানসেল হলো। ভাইসাব, কয় রোজ ঠাহরে গা তো?'

'আমি একটা কাজে এসেছি আবু। জরুরী কাজ। থাকব ক'দিন এখানেই তোমার সঙ্গে এ বাড়িতে। তবে আজ নয়। চল আজ আমিও তোমার সঙ্গে তোমাদের গাঁয়ের বাড়িতে যাব। সেখানে চাচাজীর সঙ্গে কাজ নিয়েই আমার অনেক পরামর্শ আছে। চল, বার হয়ে পড়ি। কিন্তু তোমার কাজের লোক যে জিনিসপত্র সব কিনে ফেলবে।'

'ফিকির না কিজিয়ে ভাইসাব। আজ ঘর যাবে। কাল ভি ছুট্টি। পরসু রোজ ফির দোনো এক সাথ ইঁহা লোট আয়েগা।'

'সেই ভাল।' বলল বাবলু, 'আসলে চাচাজীর সঙ্গে কথা না বলে আমি কাজটা আরম্ভ করতেই পারব না। দুদিন ওঁর সঙ্গে থাকতে পারলে ভালই হবে।'

'কাজটা কি আছে ভাই সাব?' অবাক আবু জিজ্ঞাসা করল।

একটু ভাবল বাবলু। বলল, 'তুমি কি কিছু জান আমার সম্বন্ধে আবু?'

'মতলব?'

'মানে, আমি লোকটা কে, কি • আমার পরিচয়? হিন্দু না মুসলমান, মুচি না মেথর। বাঙালী না কি বিহারী, না কি হিন্দিভাষী অন্য কোনো অঞ্চলের লোক? এইসব ভাল করে খুঁজে বার করতে হবে আমাকে। বুঝলে?'

প্রায় হাঁ হয়ে গেছিল আবু। কোনোমতে মুখ বন্ধ করে মুখ তুলে তাকাল বাবলুর দিকে। ভোর সকালে ছয় সাতশ কিলোমিটার দূর থেকে হঠাৎ ছুটে এসে ভাইসাব এ কি সব কথা বলছে? ভাইসাবের কি...।

বাবলু বলল, 'না, না, মাথা আমার বিলকুল ঠাণ্ডা আছে। রোগন বব্বর মাখতে হবে না। আমি যে কে, তাই আমি নিজেই জানি না। ভেবে ভেবে আমিই বলে হাঁ হয়ে গেছি, তুমি তো হবেই। তাই বলছিলাম, আগে চাচাজীর সঙ্গে পরামর্শ। তারপর কাজে হাত। চল রওনা দাও।'

আবু বলল, 'চায়-পানি-নাস্তা তো হোবে আগে। পিছে গাড়ি আয়েগা, তব না যানা। লেকিন তোমার ব্যাপারটা যে কি হলো, ও তো

ঠিক বুঝলাম না!'

'গাড়ি!' এবার অবাক হয়ে তাকাল বাবলু।

'হাঁ, হাঁ, আব্বা গাড়ি মোলা। গাড়ি আবেগা হামকো লে যানেকে লিয়ে। থোড়া দের হ্যায়, নাস্তা পানি হো যায়েগা, উসকা বিচ মে। লেকিন আপনে যো কুছ বোলা আভি...।'

বাবলু জিজ্ঞাসা করল, 'গাড়ি চালায় কে?'

'আবু বক্কর। এক মসুর ড্রাইভার। বুড়্ঢা হ্যায় না?'

'বুড়ো ড্রাইভার। কত বয়স হবে?'

'এবাউট ফিফটি ফাইভ, সিক্সটি।'

'স্থানীয় লোক? আগে কি করত?'

'বাস চালাতা থা। আভি হামলোগকো গাড়ি চালাতা হ্যায়।'

'ওকেই আমার দারুণ কাজে লাগবে। বুঝলে আবু, ওকে বোধহয় ভগবান পাঠিয়েছেন! ভগবান বোধহয় এবারে মুখ তুলে তাকাবেন।'

'ই ক্যায়া উলঝনমে আপনে আপকো ফাঁসায়া ভাইসাব। বাত কেয়া হ্যায় বাতইয়ে তো সহি।'

'বাঃ, ওই তো বললাম, আমি যে কে তা খুঁজতে এসেছি। ব্যাপারটা সত্যি। আমার বাবা-মা, এই হুসেনগঞ্জের মেলাতেই প্রায় পঁচিশ বছর আগে আমাকে কুড়িয়ে পায়। অনেক খুঁজেছিল তারা। কিন্তু আমার কোনো হদিস করতে পারেনি। সেই থেকে আমি ওদের ছেলে। আবু তাই আমি থাকতেও চাই। তবে কেন যেন আমার বিবেক বলছে, খুঁজে দেখাটা আমার কর্তব্য। তাই এসেছি এখানে।'

ভীষণ উৎসাহ নিয়ে আবু বলল, 'অজিব সা বাত। এইসা ভি হোতা হ্যায়। ভাইসাব হামভি ছুট্টি লে কর আপকে সাথ ঘুমেগা। কলেজ কে বারেমে মত কুছ বোলিয়ে। হামি মানবো না। হাম আপকে সাথ জরুর ফিরেগা। কিন্তু কোথায় খুঁজবে?'

'আরে, কলেজ কামাই করলে পড়াশুনার ক্ষতি হবে না।' বলল বাবলু।

'হোনে দিজিয়ে। লেকিন ক্যায়সে ঢুঁড়না শুরু করেঙ্গে।'

'প্রথমে আবু বক্করকে জিজ্ঞাসা করব, হুসেনগঞ্জের আশেপাশে কোথায়ও সে উঁচু পাঁচিল ঘেরা কোনো বাড়ি দেখেছে কি না? রাজবাড়ি, নবাববাড়ি বা কোনো জমিদারের বাড়ি। দেখে থাকলে সেই সেই বাড়িতে যাব। আর ও যদি না দেখে থাকে তো তেমন একটা বাড়িই আমাদের খুঁজে বার করতে হবে। পঁচিশ বছর আগে সে বাড়ি থেকে ঘোড়ার গাড়ি হাঁকিয়ে আমাকে এখানে এনেছিল একজন দাড়ি গোঁফ ছাড়া লোক, যার মাথায় বিরাট পাগড়ি ছিল।

'পাগ থা শির পর?' ফের জিজ্ঞাসা করল আবু। 'তব তো ও হিন্দু হোগা ভাইসাব। ইধার মুসলমান লোগ পাগ নহী বাঁধতা। পাগড়ি পোরে না।'

'তুমি ঠিক বলছ?'

'জেনারেলি এইসাহি হোতা।'

'তাহলে কি মুসলমান বাড়ি বাদ দেব? না কি কোনো মুসলমান বাড়ির হিন্দু কর্মচারী ছিল সে? গলায় কিন্তু আমার হুসেন শা পীরের থানের তাবিজ ঝোলানো ছিল।'

'বহোৎ সা হিন্দু বাচ্চোঁ কো দরগা শরিফ সে তাবিজ দিয়া যাতা হ্যায়। ও কোই বাত নেহি।'

কাজের লোক এসে গেল। চা টোস্ট অমলেট করে দিল। গাড়িও এসে গেল ততক্ষণে। দরজায় পৌঁছে ড্রাইভার গাড়ির হর্ন বাজাল। আবু বলল, 'চলিয়ে ভাইসাব গাড়ি এসে গেল। এখন ওকে কিছু বলবে না। আব্বার সাথ আগে বাত চিত বলে নাও। পিছে বোলা যাবে।' আবুর হিন্দি বাংলা উর্দু মেশানো কথাগুলো মজার।

'বেশ তাই হবে।' বলল বাবলু। 'মোট কথা এ যাত্রায় আমাকে অমন একটা বাড়ি খুঁজে বার করতেই হবে। তা সে যেভাবেই হোক।'

খাওয়া শেষ করে উঠে আবু বলল, 'সিধা রাস্তায় আমরা যাব না। যাব ঘুর পথে। বড় রামপুর হয়ে। শুনেছি সেখানে রাজার বাড়ি আছে। সে বাড়ির সম্বন্ধে যা শুনেছি, তাতে মনে হয় তোমার সেই পাঁচিল ঘেরা বাড়ির মতোই। সে বাড়ি তুমি নিজের চোখেই দেখে যেতে পারবে।' কথাগুলো ও অবশ্য ওর সেই খিচুড়ি ভাষায় বলল। খুশি হয়ে বাবলু বলল, 'সে তো খুব ভালই হবে তাহলে।'

সোজা পথে হজরতগঞ্জ মাইল কুড়ির মতো। কিন্তু বড় রামপুর হয়ে গেলে আরও দশ পনের মাইল ঘুর পড়বে। ও পথে যাবার কথা শুনে আবু বক্কর প্রথমে আপত্তি করেছিল। বলেছিল, বাড়ি পৌঁছাতে দেরি হবে। ওদিকে সবাই ভাববে। আবু পেড়াপীড়ি করতে শেষ পর্যন্ত রাজী হলো।

ধান ক্ষেত, গম ক্ষেত, চাষের জমি পার হয়ে বহু দেহাতি গ্রাম ছাড়িয়ে, বড় বড় বাগান পার হয়ে ঝোপ জঙ্গল পাশে রেখে একসময় গাড়ি বড় রামপুর পৌঁছাল। ধুলো ময়লা শহর। ঘিঞ্জি ঘরবাড়ি, রাস্তার ওপর দোকানপাট আর পথে ভিড় আর ভিড়। তার মধ্যে দিয়ে গরু, ছাগল, ষাঁড় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঘন ঘন হর্ন বাজাতে বাজাতে কিছুটা এগোতেই আবু বলল, 'ড্রাইভারজী, রামপুরের রাজার বাড়িটা কোন দিকে? আমরা একবার ওটা দেখে যাব।'

আবু বক্কর বলল, 'কেন সেখানে কি দরকার?'

'না, ও বাড়িটা একবার আমরা দেখতে চাই। তাই তো এদিকে এলাম।'

'সে বাড়িতে তোমাদের কাজ কী?' অবাক আবু বক্কর ফের জিজ্ঞাসা করল।

'না না, কাজ কিছু নেই। তবু দেখতে চাই। ওটা দেখব বলেই না এ পথে এলাম।

'সে তাহলে বাজার ছাড়িয়ে সামনে বাঁ-হাতি রাস্তা ধরে গেলে ময়দান পার হয়ে রাজবাড়ি। উঁচু পাঁচিল ঘেরা। ভিতরে ঢুকতে দেবে না। রাজার পরিবারের সবাই এখনো ওখানেই থাকে।' কথাগুলো ওরা ওদের ভাষাতেই বলছিল।

'না, না, বাড়ির মধ্যে ঢোকার কথা তো হচ্ছে না। শুধু দেখব বাইরে থেকে।' বলল বাবলু, 'একবার চলুন না সেখানে।'

বাঁ-হাতি সরু গলিতে গাড়ি ঢুকিয়ে হর্ন বাজাতে বাজাতে একটু একটু করে এগিয়ে চলল আবু বক্কর। ভীষণ ঘিঞ্জি পথ হঠাৎ সোজা মাঠের মাঝে পৌঁছে শেষ হলো। মাঠ পার হয়েই রাজবাড়ি। উঁচু দোতলা বাড়ি। দেশ গাঁয়ের সব হিন্দুস্থানীদের বাড়ির মতোই তার গড়ন। তবে বিশাল। আর তা চারদিকে উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। রাস্তাটা সোজা গিয়ে শেষ হয়েছে পাঁচিলের ফটকের সামনে। সাদা ধপধপে পাঁচিল, দু মানুষ সমান উঁচু। আর ওটা ফটক নয়। বোধহয় একেই বলে সিংদরজা। অবশ্য মাথায় বা আশেপাশে কোথাও কোনো সিংহের মূর্তি নেই। গাড়িটা আবু বক্কর প্রায় ফটকের সামনে এনেই থামিয়ে দিল। অবাক আবু দেখল, কোনো কথা না বলে ওর ভাইসাব হঠাৎ দরজা খুলে লাফিয়ে নেমে পড়ল নিচে। তারপর অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বাড়িটার দিকে।

আবুও নেমে পড়ল নিচে। পাশে গিয়ে দাঁড়াল ওর ভাইসাবের। খেয়াল নেই কিছু যেন তার। কি এত অমন অবাক হয়ে দেখছে ভাইসাব!

অবাক আবু বলল, 'এই কি সেই বাড়ি ভাইসাব?'

'বাড়িতে তো লোক থাকেন, বললেন ড্রাইভারজী। আমি একবার তাঁদের সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করব আবু। তোমার দেরি হলে তুমি চলে যাও। আমি পরে বাস ধরে চলে যাব।' কেমন যেন ঘোরের মধ্যে বলল বাবলু।

'তুমি এখনই দেখা করতে চাও রাজাবাবুদের সঙ্গে?' অবাক আবু জিজ্ঞাসা করল।

'যদি দেখা করেন তিনি, তবে দেখাটা করে যেতেই চাই। তোমাকে ধরে রাখব না। তুমি

দুজন সান্ত্রী গেটে দাঁড়িয়ে আছে।

যাও।' আবারও তেমনি ঘোরের মধ্যে বলল বাবলু।

'পাগল হলে তুমি! তোমাকে ফেলে রেখে যাব! তবে কি জান ভাইসাব, এদিকের কি হিন্দু, কি মুসলমান সবাই বড় সেকেলে। তুমি দেখা করতে চাইলেই যে তাঁরা দেখা করবেন তা নাও হতে পারে।' বলল আবু।

'সে কথা পরে ভাবব। এখন দেখা করার চেষ্টা করতে দোষ কি?'

'চল, তাহলে এগোও। দেউড়িতে কেউ আছে কিনা দেখা যাক।' বলে আবু এগোলো।

ক'পা এগোতেই ওরা দেখল, খাকি উর্দিপরা পুরনো বন্দুক হাতে দু'জন সান্ত্রী গেটে দাঁড়িয়ে আছে। তারাও অবাক হয়ে গাড়ি আর গাড়ির যাত্রীদের দেখছে। কাছে যেতেই দুজনে সেলাম ঠুকল।

আবু আর বাবলু সে সেলামের জবাব দিল। আবু বলল, 'গড়ে কি মহারাজা আছেন এখন?'

একজন সান্ত্রী বলল, 'মালিক, ছোটকুমারসাব এখন গড়েই আছেন।'

'এত্তালা দাও। কলকাতা থেকে বাবু এসেছেন দেখা করতে, জরুরী কাজ।'

দুজন সান্ত্রীর একজন ফটকের ঘুলঘুলি গলে ভেতরে চলে গেল। অন্যজন ঠায় কাঠপুতুলির মতো দাঁড়িয়ে রইল।

বাবলু বলল, 'আবু ওকে জিজ্ঞাসা কর তো পাঁচিলের ওদিকে বিরাট উঠোন আছে নাকি? আর তার মাঝখানে বিশাল একটা গাছ। নিচে বাঁধানো বেদী। তা যদি থাকে এ বাড়িতে, তাহলে আমার অনেক পরিশ্রম বাঁচবে।'

আবু স্থানীয় ভাষায় প্রশ্নটা রাখল সান্ত্রীর কাছে। ও একটুও না ভেবে বলল, 'হাঁ হুজুর, বিশাল চত্বরের মাঝে বাঁধানো বেদীতে পিপল গাছ আছে। তবে তা পিছন বাড়িতে, অন্দর মহলে। সেখানে আমাদের যাতায়াত কম। এ খবর জানতে চাইছেন কেন?'

থতমত খেয়ে আবু বলল, 'মানে, কলকাতায় এই বাবু যখন খুব ছোট ছিলেন তখন একবার এ বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন ওঁর মার সঙ্গে। তখন ওই গাছতলায় অনেক খেলা করেছেন। সে গাছ এখনও আছে কিনা তাই জানতে চাইছেন?'

খুশি হয়ে সান্ত্রী বলল, 'হাঁ হাঁ সে গাছ এখনও আছে। রাজবাড়ির বাচ্চারা এখনও সেখানে তেমনি খেলা করে। বাবুজী কত দিন আগে এখানে এসেছিলেন?'

'তা হবে কুড়ি পঁচিশ বছর আগে। তখন আপনি কি এখানে কাজে লেগেছিলেন?'

'না সাব। আমার বাবা তখন এখানে কাজ করত। আমার তখন দু' আড়াই বছর বয়স হবে বড় জোর।'

বাবলু সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার বাবা এখন থাকেন কোথায়?'

'বাবা রিটায়ার করে দেহাতে চলে গেছে।'

'আপনার বাবার সঙ্গে আমি দেখা করতে চাই। আপনাদের গ্রামটা কোথায়? কি করে যেতে হয় সেখানে?'

অবাক সান্ত্রী বলল, 'আমার বাবার সঙ্গে আপনি দেখা করবেন! কিন্তু কেন বাবুজী! সে তো একদম দেহাতি গাঁ। এখান থেকে দশ কোশ দূর হবে। বাসে যেতে হবে, বড় রামপুর থেকে চান্দোলী, সেখানে বাস বদলে, উমঝাও। ওখান থেকে হাঁটা পথে এক কোশ, দাঁতালি। বহুত তকলিফ।'

আবু বলল, 'তা হোক, একদিন আমরা ওখানে গিয়ে হাজির হব। তা দাঁতালি পর্যন্ত মটরগাড়ি যাবে তো?'

'যাবে বাবুজী, তবে উমঝাওয়ের পর ক্ষেতি আল ধরে গেলে সিধাপথ। ওপথে আমরা যাই। কিন্তু কেন যাবেন আপনারা সেখানে? আমার বাবা তো নেহাত গাঁওয়ার, কিছু জানে না। সে কি বলবে আপনাদের মতো পড়া লিখা জানা আদমিদের?'

আবু হেসে বলল, 'আরে তুমি ভয় পাচ্ছ কেন? বাবুজীর মা রানীমার দোস্ত ছিল। বহুত রোজ বাদে বাবুজী ফের এল। এমনি বাতচিত বলতে যাবেন। ভয়ের কিছু নেই।'

বাবলু বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, আপ ডরিয়ে মত। আপকা পিতাজীকা কেয়া নাম হ্যায়?'

এই প্রশ্ন শুনে সান্ত্রীর মুখ একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ও যেন কেমন ভয়ে জড়সড় হয়ে গেল। কি যে উত্তর দেবে তাই যেন ভেবে পেল না।

তা দেখে আবু বলল, 'আরে কেন তুমি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছ? আমরা তোমাদের গাঁয়ে না হয় নাই যাব। বাবুজী বহুদিন পর এদিকে এল, তাই পুরনো লোকজনদের খোঁজ নিচ্ছেন। হয়তো তোমার বাবার কোলে চড়ে তখন খুব ঘুমতো। কি নাম তোমার বাবার? সেই নাম ওর মনে আছে কিনা তাই শুধু মিলিয়ে নেবে। কেন যে মিছে ভয় পাচ্ছ!'

সান্ত্রী তবুও ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনারা খুফিয়া নন তো?'

হো হো করে হেসে আবু বলল, 'আরে না না, আমরা খুফিয়া হতে যাব কেন! কেন যে তুমি এমন হঠাৎ ভয় পেয়ে গেলে! যাকগে ওসব কথা। ভেতর থেকে খবর এল কি? দেখ না একবার।'

সান্ত্রী জায়গা ছেড়ে নড়ল না। শুধু পিছনের ঘুলঘুলি দরজার দিকে তাকাল একবার। সেটা গলে তখনি দ্বিতীয় সান্ত্রী হাজির হলো। বলল, 'চলিয়ে সাব অন্দর। ছোটাকুমারসাব আপলোগোকে লিয়ে এন্তেজার কর রহা হ্যায়। পাধারিয়ে।'

সান্ত্রীর পিছন পিছন দুজনেই ঘুলঘুলি দরজা গলে ভিতরে ঢুকল। ফটকের সামনে বিশাল বাঁধানো চত্বর। তার মাঝে মাঝে এখানে ওখানে কিছু খোলা জমিতে ফুলের বাগান। এদিকে ওদিকে দুএকটা বড় বড় গাছও আছে। ফটকের সামনের সোজা পথ উঁচু সিঁড়ির সামনে শেষ হয়েছে। ছোট্ট সিঁড়ির শেষে বাড়িতে ঢোকার দরজাটা খোলা রয়েছে।

ওরা দুজনে সিঁড়ির কাছাকাছি পৌঁছাতেই ঘরের মধ্যে থেকে বার হয়ে এলেন একজন সুপুরুষ যুবক। বয়স খুব বেশি হলে বাইশ চব্বিশ। হাসি মুখ, দুহাত জোড় করা। স্পষ্ট বাংলায় বললেন, 'আসুন আসুন। ভিতরে এসে বসুন।' বলে হাত তুলে নমস্কার জানালেন।

ওরা দুজনেও প্রতি নমস্কার করে সিঁড়ি দিয়ে ভিতরের ঘরে ঢুকল। বাইরে বেশ গরম। কিন্তু ঘরের মধ্যে ঠাণ্ডা। বসার ঘর একটু সেকেলে ধরনের সাজানো। একপাশের গদি আঁটা চেয়ার দেখিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'বসুন আপনারা। শুনলাম কলকাতা থেকে এসেছেন, জরুরী কাজে। যদি আপত্তি না থাকে তো, আপনাদের নাম জানতে পারি কি?'

বাবলু বলল, 'আমার নাম পরিমল রায়চৌধুরী। আমিই এসেছি কলকাতা থেকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে। সঙ্গে আমাদের পারিবারিক বন্ধু, ভাইও বলতে পারেন, আবদুর রহমান। ও হুসেনগঞ্জে থাকে। ওর বাবার নাম বললে বোধহয় চিনতে পারবেন, নাম সৈয়দ রজ্জাক আলি।'

ভদ্রলোক বললেন, 'ওঁর নাম এদিকে সবাই জানে। হুসেনগঞ্জ থানার চার্জে ছিলেন বহুদিন। এখন রিটায়ার করে হজরতগঞ্জে আছেন।'

আবু বলল, 'হ্যাঁ ঠিকই বলেছেন আপনি। আমি হুসেনগঞ্জে থেকে কলেজে পড়ি।'

ছোটকুমার বললেন, 'আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম। আমার নাম, কামতাপ্রসাদ সিং। আমি বহুদিন কলকাতায় ছিলাম পড়াশুনার জন্য। এখন বলুন, আমি আপনাদের জন্য কি করতে পারি?'

ওদের কথার মাঝে একজন কাজের লোক বিশাল পরাতে করে বড় গ্লাসে ঠাণ্ডা শরবত এনে রাখল ওদের সামনে।

ছোটকুমার বললেন, 'দয়া করে গ্রহণ করুন। আমার মনে হয় কাজের কথা শেষ হতে হতে বেলা পড়ে যাবে। ইচ্ছা করেন তো গরিবখানায় দুপুরের আহারটাও সেরে যেতে পারেন। আপনাদেরই অসুবিধা হবে নিরামিষখানা। আমি কিন্তু খুশি হব।'

আবু বলল, 'না না, সঙ্গে আমাদের গাড়ি আছে। ভাইসাব আমার সঙ্গে আমাদের বাড়ি যাচ্ছে। মিছিমিছি আপনাকে বিব্রত করব কেন? কাজের কথা মিটতে বেশি সময় লাগবে না বলেই মনে হয়। তুমি কি বল ভাইসাব?'

বাবলু বলল, 'কিন্তু কথাটা আমি যে কিভাবে পাড়ব তাই ঠিক বুঝতে পারছি না। ব্যাপারটা এতই... যাকে বলে ...মানে ...আমি একজন হারিয়ে যাওয়া লোকের খোঁজ করছি। যে আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে এই গাঁ বা এর আশপাশে কোথাও থেকে হারিয়ে গেছিল। তেমন কোনো খবর কি আছে আপনাদের কাছে? মানে আপনাদের পরিবারের মধ্যে কেউ কি কখনও হারিয়েছেন?'

আবু স্পষ্ট দেখল, ছোটকুমারের মুখের ভাব খুব তাড়াতাড়ি বদলে গেল। যে মানুষটা এতক্ষণ হাসিখুশি ছিলেন, তিনি হঠাৎ কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। অথচ বেশ অবাক হবার ভান করে বললেন, 'ব্যাপারটা আমি কিন্তু ঠিক বুঝতে পারলাম না। আপনি যদি আরও স্পষ্ট করে বলেন।'

একটুক্ষণ ভেবে নিয়ে বাবলু সব কথা আস্তে আস্তে খুলে বলল। ও যে ওর নিজের অতীত খুঁজতেই এসেছে সে কথাও গোপন করল না। এমনকি এও বলল, এ বাড়ির বাইরেটা দেখে ওর মনে হয়েছে, ওর সেই মনের গভীরে আঁকা বাড়ির দেওয়ালের সঙ্গে যেন খুব মিল আছে। এ বাড়ির পিছনেও উঠোনে বাঁধানো বেদীতে পিপুল গাছ আছে। সেটাও ওর স্মৃতির মাঝে ধরা ছবির সঙ্গে বেশ মিলছে। যদি এখন ও সেই গাছটা একবার দেখতে পায় তো আরও নিশ্চিন্ত হতে পারে।

বেশ মন দিয়ে ছোটকুমার ওর সব কথা শুনলেন। বললেন, 'এ বাড়ির অতীত ইতিহাস আমি ভাল করেই জানি পরিমলবাবু। অবশ্য আপনি যে সময়কার কথা বলছেন, তখন আমি জন্মাইনি। তা হলেও এমন একটা ঘটনা আমার অজানা থাকার কথা নয়। আর ওই যে বাড়ির কথা বললেন, অমন পাঁচিল ঘেরা বেশ কখানা বাড়ি এ অঞ্চলের আশেপাশে আছে। আর সে-সব বাড়ির পিছনের উঠোনে যে গাছ নেই তা কে বলতে পারে? আমার মনে হয়, আপনার ব্যাপারটা অন্য কোথাও ঘটেছিল। অন্য কোনো বাড়িতে। অন্তত এ বাড়িতে যে নয়, তা আমি বলতে পারি।'

বাবলু ভীষণ নিরুৎসাহ হয়ে বলল, 'অতীতে আপনাদের বাড়ির কোনো ছেলে কখনও হারিয়ে যায়নি? এ কথা আপনি ঠিক জানেন?'

হাসলেন ছোটকুমার। বললেন, 'আমি তো নিশ্চিত ও ব্যাপারে। তবে আমার জ্যাঠামশাই এখানে থাকলে তাঁর কথা শুনলে বোধহয় আপনি বেশি বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তিনি তো এখন এখানে নেই, কাজে লক্ষ্ণৌ গেছেন। ফিরতে দিন কুড়ি হবে।'

বাবলু হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার বাবা?'

একটু চুপ করে থেকে ছোটকুমার বললেন, 'তিনি আমার এক বছর বয়সে গত হয়েছেন।'

'আই অ্যাম সরি।' বলল বাবলু, 'মাপ

করবেন, আপনার মা, ঠাকুমা, দিদিমা, বা বয়স্ক আর কেউ কি নেই, যাঁরা এ ব্যাপারে কিছু বলতে পারেন? আমার এত কৌতূহলের জন্য ক্ষমা করবেন, এখানে এসে পর্যন্ত আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, আমি বোধহয় ঠিক জায়গায় এসেছি। কামতাপ্রসাদজী, আমি কিন্তু আমার কোনো অধিকার সাব্যস্ত করতে আসিনি। আমি শুধু খুঁজে পেতে চাই আমার অতীতকে। সেটুকুই আমার কৌতূহল। তার বেশি কিছু নয়। তাই এমনভাবে আপনাকে জেরা করছি।'

'ঠিক আছে।' বললেন ছোটকুমার, 'বাড়িতে এখন যাঁরা আছেন তাঁরা কেউ আমার থেকে বেশি কিছু জানে বলে মনে হয় না। এক ছিলেন আমার পিসীমা। তাঁর কথা থাক। আর তিনি তো এখানে থাকেন না।'

'কোথায় থাকেন তিনি?' ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করল বাবলু।

'তাঁর ঠিকানা আমি ঠিক জানি না। জানি না তিনি বেঁচে আছেন কি না। কোনো সম্পর্ক নেই তাঁর সঙ্গে আমাদের পরিবারের।'

শেষবারের মতো বাবলু বলল, 'দয়া করে আমাকে আপনাদের অন্দরমহলের গাছটা একবার দেখতে দিন... তাহলে...।'

ভীষণ কঠিন মুখে ছোটকুমার তাকালেন ওদের দিকে। বললেন, 'আপনারা অচেনা মেহমান। আমি যতদূর সম্ভব ভদ্র ব্যবহার করেছি আপনাদের সঙ্গে। আশা করি এই ভদ্র ব্যবহারের সুযোগ নেবার চেষ্টা করবেন না। আর ওই যে কি গাছের কথা বলছেন, অমন কোনো গাছ এবাড়িতে নেই। আপনাদের যা জানার ছিল, সব প্রশ্নের উত্তর আমি দিয়েছি। এখন আসুন আপনারা। তেওয়ারী ইন দোনো সাহাবকো রাস্তা দেখাও।' বলে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন ছোটকুমার।

মুখ চোখ লাল হয়ে গেল বাবলুর। আবু তাড়াতাড়ি ওর হাত ধরে টান দিয়ে বলল, 'চলো ভাইসাব, বহুত দের হলো।'

দরজার কাছ থেকে সান্ত্রিও ডাক দিল, 'আইয়ে সাব ইধার আইয়ে।'

ওরা আবার উঠানের মাঝে নেমে এল। কিছুটা এগিয়ে এসেই আবু জিজ্ঞাসা করল, 'সেপাইজী আপকা শুভ নাম।'

'রঘুনন্দন তেওয়ারী।' বেশ গর্বের সঙ্গে উত্তর দিল সান্ত্রি।

আরও ক'পা এগিয়ে এসে আবু ফের জিজ্ঞাসা করল, 'আপকা দোস্ত যো ফাটকপর খাড়া হ্যায়, উনকো নাম?'

'বিলাইতি সিং। বলল সান্ত্রি, 'কেঁও সাব, নাম পুছকে ক্যা হোগা?'

'না না, কি আর হবে?' আপনারা দুজনে এত হেল্প করলেন তাই জিজ্ঞাসা করলাম। দয়া করে দশটা টাকা রাখুন দুজনে পান খাবেন।' বলে আবু তার পকেট থেকে একটা নোট বার করে এগিয়ে ধরল।

'কোই বাত নেহি, কোই বাত নেহি।' বলে সান্ত্রি টাকাটা নিয়ে ওদের ঘুলঘুলি গেটের সামনে এনে হাজির করল।

ওরা গাড়ির কাছে আসতেই আবু বক্কর বেশ রাগ করে বলল, 'এত দেরি করে কেউ! কি এমন দেখার আছে এখানে? এখন ওঠ জলদি। গাড়ি ছোটাব।'

ওরা দুজনে গাড়িতে উঠে পড়ল। গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে গলির দিকে চালিয়ে দিল আবু বক্কর। বলল, 'এইসা বহুত কোঠি ইস জিলামে হ্যায়। নজদিকই তো খান সাহাবকা কোঠি, বিলকুল এইসা কিলাকা মাফিক বানায়া হুয়া হ্যায়। তুলানমে হ্যায় নবাব কোঠি, ও ভি এইসাহি। ফির গিরধর নগর জানে সে উহাকা রাজাসাবকা কোঠি ভি কিলাকা মাফিক বানায়া হুয়া হ্যায়। ক্যা মালুম, আউর ভি কিতনে সারে কোঠিয়াঁ হোঙ্গে ইধার উধার।'

বাবলু যেন আপন মনেই বলল, 'সবগুলোই দরকার হলে একটা একটা করে খুঁজে দেখব। দেখতেই হবে আমাকে। ড্রাইভারজী আপনি আমাকে সাহায্য করবেন।'

আবু বলল, 'ছোটকুমার কিন্তু সব কথা ঠিক বলেননি। তোমার কি মনে হয় ভাইসাব?'

'আমার মনেও ওই সন্দেহ। কিন্তু কি লাভ তাতে ওঁর? পিছনের বাড়িতে গাছটা আছে অথচ দেখলে না কেমন অস্বিকার করে গেলেন। পিসীমার খবর জানেন না, এও কি সত্যি বলে মনে হয় তোমার?'

'ওই যে তুমিই তো বললে, সম্পত্তির হিস্যা...' কথা আবু শেষ করতে পারল না।

'কে চায় ওঁর সম্পত্তির অংশ? আমি তো ওঁকে সে কথা স্পষ্টই বললাম।'

'ভাইসাব সম্পত্তি ভীষণ জিনিস। কে তোমার মুখের কথা বিশ্বাস করবে বল তো? সম্পত্তি চাও, না অথচ কুড়ি-পঁচিশ বছর বাদে তুমি এসেছো তোমার জন্মস্থান খুঁজতে? তোমার রিস্তেদারদের বার করতে! কোনো মতলব নেই তোমার, এ কে বিশ্বাস করবে বল?'

'আবু, কাউকেই আমি খুঁজছি না। বলেছি তো তখন তোমাকে, একজনের অস্পষ্ট কান্নাভরা মুখের ছবি আঁকা আছে আমার মনের ভেতরে। আমি শুধু তাকেই খুঁজছি। যদি সে আজও বেঁচে থাকে শুধু তাকেই আমার চাই আবু। আর কিছু না, কাউকে না।'

আবু বক্কর গাড়ির গতি বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'তোমাদের এসব কথার মানে কি? সত্যি করে বল তো, কি খুঁজছ তোমরা? এই বাবুজী কে? কি চান ইনি?'

আবু বলল, 'বাড়ি চল ড্রাইভারজী। সব কথা তোমাকে বলব। আমাদের তোমার সাহায্যই সব থেকে বেশি চাই। শুনলে না ভাইসাব তো তাই তোমাকে বলল।'

ভর দুপুরবেলা গাড়ি যখন রেজ্জাক সাহেবের বাংলোর কাছে পৌঁছাল, তখন রেজ্জাক সাহেব বারান্দায় দাঁড়িয়ে। বেশ চিন্তাতেই পড়েছিলেন তিনি। এত দেরি তো হয় না কখনও। গাড়ি থেকে বাবলুকেও নামতে দেখে বেজায় খুশি হয়ে বললেন, 'আরে কে ও, বাবুলবাবু না? এসো এসো। ঘরের খবর সব ভাল তো? তোমার মা-বাবা ভাল আছেন?' কথাগুলো তিনি উর্দুতেই বললেন।

কাছে এসে বাবলু হিন্দু কায়দায় ঝুঁকে ওকে প্রণাম করতে গেল। উনি ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। বাবলু জিজ্ঞাসা করল, 'চাচীজী ভাল আছেন, আয়েষা দিদি কেমন আছে, সুলেমান ভাই?'

'সব ভাল।' বললেন রেজ্জাক সাহেব। বলেই হাঁক পাড়লেন, 'আয়েষার মা, দেখে যাও কে এসেছে। এসো এসো জলদি।'

চাচীজী বারান্দায় আসতেই বাবলু তাঁর দু'পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। তিনিও হিন্দুমতে ওর মাথায় হাত রেখে দোয়া মাঙলেন। বললেন, 'আরে বাবুল, তুই কত বড় হয়ে গেছিস। মা ভাল আছেন, বাবা?'

'হ্যাঁ, আমাদের বাড়ির সবাই ভাল আছেন।' বলল বাবলু, 'দিদি জামাইবাবু কোথায়?'

'তারা এখন এখানে থাকে না।' বললেন চাচী, 'ওই পাশের মহল্লায় তাদের কুঠি। সুলেমান চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। গাঁয়ে বড় দোকান দিয়েছে। ভাল আছে ওরা। ওবেলা রোদ পড়লে আবু নিয়ে যাবে তোকে।'

রেজ্জাক সাহেব বললেন, 'চল ভেতরে চল। বিশ্রাম কর, স্নান করে খাও। তারপর বিকালে কথা হবে। এসো ভিতরে এসো।'

এমন সময় আবু বক্কর এসে দাঁড়াল বারান্দার সামনে। বলল, 'সাব, নক্কর বাবুজী কুছ ধান্দামে হ্যায়। আপ বহত সোচ বিচার কর উনহে আপনা পাস রাখিয়ে। নেহি তো পিছে কুছ গড়বড় হো সকতা।'

ওর এমন স্পষ্ট কথা শুনে সবাই কেমন থতমত খেয়ে গেল। ভীষণ লজ্জায় পড়ল বাবলু। কি যে ও বলবে ভেবেই পেল না।

না থেমেই আবু বক্কর বলল, 'আতে বখত ও বাবুজী বড়া রামপুর রাজাকা কোঠি গিয়া থা। ভিতর যা কর কুছ বাতচিত ভি কিয়া কিসিকো সাথ। ইসি লিয়ে তো আনেমে ইতনা দের হুয়া।'

আবু হঠাৎ ভীষণ রাগে বলল, 'এ তুমি কি বলছ ড্রাইভারজী। ছিঃ ছিঃ, ভাইসাব কি ভাবছে! আরে আমরা তো...'

আবু বক্কর বলল, 'তুম চুপ রহো ছোটাসাব। তুমভী তো ইস বাবুজীকা ফের মে পড় গয়া। দেমাগ তুমহারা ভি ঠিক নহী হ্যায়। সাব, হুঁশিয়ার, নেহিতো পিছে পস্তাওগে।'

চাচী অবাক হয়ে বললেন, 'হ্যাঁরে বাবুল, এসব কথার মানে কি? আমি তো কিছুই বুঝছি না।'

রেজ্জাক সাহেব হাসতে চেষ্টা করে বললেন, 'ঠিক আছে ঠিক আছে, তুমি গাড়ি গ্যারেজ করে বিশ্রাম নাও গিয়ে। আমি এদিকে দেখছি। আমার চোখে ধুলো দেবে এমন কেউ জন্মায়নি। চল বাবুল, ঘরে বস। কোথায় গেছিলে আবু? ও কি বলছে?'

গজগজ করতে করতে আবু বক্কর চলে গেল। ওরা ঘরে এসে বসল। চমৎকার করে সাজানো ঘর। বসেই চাচী বললেন, 'ব্যাপার কিরে বাবুল, কোথায় গেছিলি তোরা। আবু বক্কর সাদাসিধা মানুষ। তোদের কিছু কাজ ওর নিশ্চয়ই ভাল লাগেনি। তাই ও নালিশ করে গেল। কিন্তু তোরাই বা কোথায় গেছিলি!'

রেজ্জাক সাহেব বললেন, 'আগে ঠাণ্ডা পানি দাও। একটু স্থির হয়ে বসুক ওরা, তারপর সব শুনো। বাবুল বদ ছেলে, এ তো আমরা আবু বক্করের কাছ থেকে শুনব না। ওর কথা বাদ দাও।'

আবু বলল, 'আসলে, আমরা যা করেছি, তা ওকে না জানিয়ে করেছি। তাই ওর রাগ। আব্বা, ওর ধারণা আমি খুব ছেলে মানুষ। একা থাকি। তাই যখন ওর সামনে থাকব, ওর বুদ্ধি নিয়ে চলব। ও আমাকে গাইড করবে।'

'লোকটা সাচ্চা লোক।' বললেন রেজ্জাক সাহেব।

'এমন কতগুলো সাচ্চা লোক যোগাড় করেছ না তুমি আব্বা, আমাদের আর কারও সঙ্গে রিস্তাদারি রাখা চলবে না। ভাইসাব, ও পাগলের কথায় তুমি কিছু মনে কর না তো।'

বাবলু বলল,' না, না, মনে করব কেন, ও তো ভুল বুঝেছে। কিন্তু ওর ভুল ভাঙতে হবে আবু। ওকে আমার সব থেকে বেশি দরকার হবে।'

রেজ্জাক সাহেব বললেন, 'এইতো বাবুল, তুমি আবার কি যেন হেঁয়ালী শুরু করলে।'

বাবলু হেসে বলল, 'বাঃ হেয়ালী তো আপনি করছেন চাচাজী। আমার নাম বাবলু, আপনি কিন্তু কখনও কোনোদিন আমাকে ও নামে ডাকেন না। ডাকেন বাবুল বলে। কেন, কেন ও নামে ডাকেন? বলবেন কি সে কথা আজ!'

চাচীজী বললেন, 'থাক থাক, ও সব কথা এখন থাক। ঠাণ্ডা হয়ে বস তো তোরা। আমি শরবৎ পাঠিয়ে দিচ্ছি খা। তারপর গোসল করতে যা বেলা অনেক হয়েছে। খানা খেতে হরে না?' বলে উনি উঠে পড়লেন।

বাবলু বলল, 'না চাচীজী, আপনিও আমাকে বাবুল বলে ডাকেন। কেন ডাকেন তা আজ আপনাকেও বলতে হবে। সব হেঁয়ালী তো লুকিয়ে আছে ওই উত্তরের মধ্যেই।'

'হায় আল্লা!' বলে চাচীজী প্রায় পালিয়েই গেলেন ওখান থেকে।

তা দেখে বাবলু হাসল। বলল, 'চাচাজী, আমি জানি, আমার আসল নাম ছিল বাবুল। হয়তো কোনো মা আমাকে আদর করে ডাকত ও নামে। তাই আমি যখন আপনাদের মধ্যে আসি, আমার নাম জিজ্ঞাসা করাতে ওই নামই বলেছিলাম। আমার মা বাবুলকে বদলে বাবলু করে দিয়েছে। এই তো? সেই থেকে আমি বাবলু। তাই তো?'

'হ্যাঁ।' বললেন রেজ্জাক সাহেব, 'তুমি কি তোমার সব কথা জান বাবুল?

'হ্যাঁ। বাবা-মা কিছু গোপন করেনি আমার কাছে। আমি তাদের মত নিয়ে ছুটিতে এসেছি আমার অতীত খুঁজতে। এবারে আপনার কাছে আসা সে কারণেই।'

'ওঃ তাই বল।' বললেন রেজ্জাক সাহেব, 'তুমি তাহলে সব কথা জান।'

'চাচাজী, বোধ হয় এ সব থেকেও একটু বেশি কিছু জানি। যখন আপনারা আমার সম্বন্ধে খোঁজ খবর করছিলেন, তখন যদি আমি আপনাদের আমার মনের কথা খুলে বলতে পারতাম, তাহলে বাবুলকে আর হয়তো বাবলু হতে হতো না। কিন্তু আমি তখন ছিলাম নেহাতই ছোট্ট। মনের কথা কাউকে বুঝিয়ে বলার মতো বুদ্ধি আমার ছিল না। আর সত্যি বলতে কি বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমার মনের মধ্যে গভীরভাবে দাগ কেটে বসা, ছোট্ট বয়সের ছবি ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে যায়। তা আমি আবার মনে করেছি। আজ আমি তাই একটা বাড়ি খুঁজছি যেটা উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। তার একটা ফটক আছে বিশাল। বিশাল উঠানের মাঝে বাঁধানো বেদীর ওপরে বিরাট গাছ। একটা ছোট্ট ঘর এক পাশে। সে ঘরের মধ্যে একজন শুধুই কাঁদে। সে আমাকে খুব ভালবাসে। সেই বোধ হয় আমার মা। আর একটা প্রচণ্ড বেগে ছুটন্ত ঘোড়ার গাড়ি। না, পাল্কি গাড়ি নয়, ফিটন গাড়ি হবে বোধহয়, আর একটা ভয়ঙ্কর লোক তার মাথায় বিরাট পাগড়ি। আজ এতদিন পরে এইগুলো সব এক এক করে পর পর জোড়া লাগাবার চেষ্টা করব। চাচাজী, ওই যে মা-টা আমার সারাদিন কাঁদত, তার নিশ্চয়ই খুব দুঃখ ছিল! আমি আর কিছু চাই না চাচাজী, আমি তাকে খুঁজে বার করতে চাই।'

অনেকক্ষণ ঘরের কারও মুখে কোনো কথা ছিল না। একসময় রেজ্জাক সাহেব বললেন, 'তখন যদি এসব কথা তুমি বলতে পারতে বাবুল, তাহলে...যাক সে কথা। আবু, কদিন ছুটি নাও তুমি। আবু বক্করকে বুঝিয়ে বল। গাড়ি নিয়ে আশপাশ তন্ন তন্ন করে খোঁজ। অমন বাড়ি যখন ছিল, তা খুঁজে পাওয়া যাবেই। বাড়ি পেলে বাকিটা মেলাতে দেরি হবে না।'

'বাড়ি বোধ হয় আমি পেয়েছি চাচাজী।' বলল বাবলু, 'বড় রামপুরের রাজবাড়ি। কিন্তু ছোট কুমার বিশ্রীভাবে আমাদের বিদায় করে দিলেন। বললেন, ওদের বাড়িতে অমন হারিয়ে যাবার ঘটনা নেই।'

'তাহলে অন্য কোথাও খুঁজতে হবে। রামপুরের রাজারা সজ্জন ব্যক্তি, তাঁরা মিথ্যা বলবেন কেন? না না বাবুল, তুমি ওঁদের কথা বিশ্বাস করতে পার।'

'ভেতর বাড়ির উঠোনে বড় গাছ আছে। সে কথা তিনি অস্বীকার করেছেন! অথচ, ও বাড়ির এক সান্ত্রি বললেন, সে গাছতলায় আজ কালও বাড়ির বাচ্চারা খেলা করে!'

'আরে না না, সান্ত্রি কি বলতে কি বলেছে। আমার মনে হয় তোমাদের উচিত অন্য কোথাও খোঁজ করা।' বললেন রেজ্জাক সাহেব, 'কি কারণে ছোটকুমার মিথ্যা বলবে বল?'

আবু বলল, 'সম্পত্তির কারণে আব্বা। দেশের আইনে তো সম্পত্তিতে সবার সমান অধিকার। যে শরিক চলে গেছিল, বা হারিয়ে গেছিল পঁচিশ বছর আগে, সে ফিরে এলে অসুবিধার তো সৃষ্টি হবেই। আর তাছাড়া তার কথা আর কে মনে রেখেছে বল? আমার মনে হয় তাই ছোটকুমার অমনভাবে আমাদের বার করে দিয়েছেন।'

এমন সময় শরবৎ এল। সঙ্গে কড়া হুকুম গোসল করতে যাবার জন্য। শরবতের গ্লাস হাতে তুলে নিয়ে রেজ্জাক সাহেব বললেন, 'কথাটা ভাবার মতো বটে। নাও, শরবৎ খেয়ে তোমরা দুজনে গোসল কর গিয়ে। আমি ততক্ষণ ব্যাপারটা নিয়ে আর একটু ভাবি।'

# হিমতাজ তেল প্রস্তুত কারক : পণ্ডিত দ্বারকা প্রসাদ শর্মা (বৈদ্যভূষণ) নির্মিত অন্যান্য আয়ুর্বেদিক উপহার

**বজরঙ্গবলী চূর্ণ**

এই চূর্ণের অশেষ গুণ। মেহ, প্রমেহ, স্বপ্নদোষ ও দুর্বলতা দূর করে। শরীরকে যথেষ্ট বীর্যবান করে তোলে। কোষ্ঠকাঠিন্য ও আলস্য দূর করে। হারিয়ে যাওয়া যৌবনকে ফিরিয়ে আনে **বজরঙ্গবলীচূর্ণ**

**কব্জ সংহার**

মন্দাগ্নি, অজীর্ণ অরুচি, উদরাময়, অম্লপিত্ত ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে। ক্ষুধা বৃদ্ধি এবং বায়ুমুক্ত করে। পাকস্থলীর ক্রিয়ার সাহায্য করে।

**বজ্র দন্ত মঞ্জন (লাল)**

দাঁত ব্যাথা, মাড়ি ফোলা, পুঁজ পড়া, মুখের দুর্গন্ধ ও পাইওরিঅ্যা বন্ধ করে। দাঁতকে শক্ত ও মজবুত করে।

শ্রেষ্ঠত্বের কোন বিকল্প নেই

# হিমতাজ তেল

আয়ুর্বেদিক ফর্মূলায় তৈরী হিমতাজ এক আশ্চর্য উপকারী তেল। মাথা ব্যাথায় এবং চোখের দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে দারুণ কাজ দেয়। সারাদিন মাথা ঠাণ্ডা, শরীর সতেজ ও মন প্রফুল্ল রাখে। এই তেল চুলের গোড়ায় প্রয়োজনীয় পুষ্টি যোগায়। চুল দীর্ঘ, ঘন ও কালো রাখতে এ তেল অদ্বিতীয়। এ জন্যই সবার পছন্দ আয়ুর্বেদিক হিমতাজ তেল।

আয়ুর্বেদ ঔষধ নির্মাতা **পণ্ডিত দ্বারকা প্রসাদ শর্মা**

১৬১/১, মহাত্মা গান্ধী রোড (বাঙ্গুর বিল্ডিং) কলিকাতা - ৭০০ ০০৭

প্রকাশিত হলো

পরিবর্ধিত, পরিমার্জিত
নতুন সংস্করণ

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ক্রিকেট খেলা শিখতে হলে
ক্রিকেট খেলার আইন কানুন
ফুটবল খেলার আইন কানুন

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
বেস্ট সেলার
খেলার রাজা ফুটবল
বাদশা গোলাম
আমাদের সেরা খেলোয়াড়
আমাদের মতো খেলো
মারাদোনা-মারাদোনা

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
ক্রিকেটের বই
শীতের দুপুরে দুই প্রতিবেশী
ব্যাটের রাজা গাভাসকার
ক্যারিবিয়ানের কড়চা

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের
কলমে দুই ক্লাব
ক্লাবের নাম মোহনবাগান
ক্লাবের নাম ইস্টবেঙ্গল

যে কোনো বইয়ের দোকানে পাওয়া যাবে। ঘরে বসে পেতে হলে নিচের ঠিকানায় চিঠি লিখুন।

RBC ADVTG/DSK/6

নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড
৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

ময়ূখ চৌধুরীর
কমিকসে
রবিনহুড

রবিনহুড। নামটার সঙ্গেই জড়িয়ে আছে উত্তেজনা, আর রোমাঞ্চ। রহস্যময় এই মানুষটিকে বারবার দেখা যায় দুষ্টের দমনে দুরন্ত সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে। ময়ূখ চৌধুরীর আঁকা রবিনহুডের তিনটি কমিকসের পাতায় পাতায় ফুটে উঠেছে দুর্ধর্ষ সেই সংগ্রাম আর শিহরন জাগানো অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনী। সদ্য প্রকাশিত তিনটি কমিকসের বই।

রবিনহুড
বুদ্ধির যুদ্ধে রবিনহুড
জলদস্যুর কবলে
রবিনহুড

( তিনটি কমিকসেরই দাম সাড়ে চার টাকা করে।)

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ
২১, ঝামাপুকুর লেন কলকাতা ৭০০০০৯

আবু শরবৎ শেষ করে বলল, 'আর আবু বক্কর চাচাকে ডেকে ব্যাপারটা ভাল করে বুঝিয়ে দাও। চাচা অনেক ওরকম বাড়ির খবর জানে। সে সম্বন্ধেও খোঁজ খবর নাও। ভাইসাবের আর কদিন ছুটি! তার মধ্যে তো ওকে কাজ হাসিল করতে হবে।'

খেতে বসে রেজ্জাক সাহেব বললেন, 'বিকাল পাঁচটায় আমরা যাচ্ছি ফের বড় রামপুর। সেখান থেকেই কাছেই খান সাহেবের কোঠি। আবু বক্কর বলেছে, সে কোঠিও তোমার দেখা কোঠির মতো। চল ওটাও দেখে আসি।'

'আপনি যাবেন আমাদের সঙ্গে?' জিজ্ঞাসা করল বাবলু।

'হ্যাঁ। আমার মনে হয় তাতে কাজ তাড়াতাড়ি হবে।' বললেন রেজ্জাক সাহেব, 'আর অত ছোট বয়সে তোমাকে দেখে বোঝার উপায় ছিল না, তুমি হিন্দু না মুসলমান। পোশাক-পরিচ্ছদ কিন্তু মুসলমানি ঢঙের ছিল। কিন্তু তাতেই বা কি, আজকাল সবাই সব রকম পোশাক পরে। দেখ, খান সাহেবের বাড়িতে গেলে কোনও হদিস মেলে কি না।'

খাওয়ার পর বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিল বাবলু। একলা একটা খাটে শুয়ে শুয়ে অনেক ভাবল। ঘুম এল না ওর। ছোটকুমার সাহেবের সব কিছুই যেন কেমন রহস্যময়। মুখের হাসি-খুশি ভাব কত তাড়াতাড়ি বদলে গেল! আরও অবাক কথা, এত ভাল বাংলা বলতে তিনি শিখলেন কি করে? এদিকের সবাই তো শহর বলতে লক্ষ্ণৌয়েই যায়। অত দূর পথ পাড়ি দিয়ে কলকাতায় যায় না। তা ছাড়াও আপন পিসীর কথা নিজেই হঠাৎ বলে ফেলে কিভাবে তা গোপন করতে চেষ্টা করলেন। কেন করলেন? তবে কি ওই পিসীকে ঘিরেই কোনো রহস্য আছে! থাকলে, কে সে রহস্যের সমাধান করতে পারবে? কার কাছে যাবে ও?

হঠাৎ ওর মনে পড়ল সাত্রীর কথা। তারও চালচলন গোলমেলে। তার বাবা রিটায়ার করে গাঁয়ে আছেন। তিনি কি কোনো খবর দিতে পারবেন। পঁচিশ বছর আগের খবর তাঁর জানা থাকা সম্ভব।

বিছানায় উঠে বসল বাবলু। খান সাহেবের বাড়িতে যাবে ও। শুধু দেখতে, রহস্য আরও জট পাকায় কিনা। অন্য আর সব বাড়িগুলোতেও যাবে। কিন্তু এক ফাঁকে খুঁজতে যেতে হবে সাত্রীর বাবাকে। আর যে করেই হোক খুঁজে বার করতে হবে ছোটকুমারের পিসীকে। সব রহস্যের বোধহয় তা হলেই সমাধান হবে। এ ব্যাপারে আবুকে সব খুলে বলতে হবে। রেজ্জাক সাহেব, কেন যেন ছোটকুমারের কথা অবিশ্বাস করতে চাইছেন না। বনেদী পরিবারের লোক নিজে, তাই বনেদী পরিবার সম্বন্ধে একটা বদ্ধ ধারণা থাকা সম্ভব ওঁর পক্ষে।

আবু বলল, 'তোমার বুঝি ঘুম আসছে না!'

'না,' বলল বাবলু, 'আমি কি করতে চাই শোন।' বলে, ওর মনের কথা ও খুলে বলল।

হাসল আবু। বলল, 'আমিও তাই করব ঠিক করেছি। দেখলে না তার জন্য কেমন বকশিস দিয়ে সাত্রীর নামটা জেনে নিলাম। দাঁতালি গাঁয়ে পৌঁছে বিলাইতি সিং-এর বাবাকে খুঁজে বার করা কষ্টের হবে না।'

বাবলু বলল, 'থ্যাঙ্ক ইউ আবুভাই। তুমি তাহলে আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবে।'

'পুরোপুরি। যতক্ষণ না তোমার অতীত খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। তবে আব্বার কথামতো এক এক করে সব বাড়িগুলোও ঘুরব আমরা। তাতে সন্দেহ পাকা করতে পারবে একটা বাড়ির ওপর। কাজ তাতেই সহজ হবে।'

যখন প্রায় সন্ধ্যা হয় হয়, আবু বক্কর বড় রামপুর ছাড়িয়ে বলল, 'সাব, খান সাব বহুত খানদানি আদমী। উনসে বাতচিত আপহি কিজিয়েগা। দুসর কিসিকো কুছু বোল নে মত্ দিজিয়ে। নেহি তো কুছ খাস কাম বনেগাহি নেহি।'।'

রেজ্জাক সাহেব বললেন, 'ঠিক আছে, আমিই কথা বলব। তুমি খান সাহেবকে দেখছ নাকি?'

'জী হাঁ। মিলিটারিতে ছিলেন, কর্নেল। বহুত তেজী, আর একদম সিধা আদমী। দেখুন, এখন বাবুজীর কোনো রিস্তা বার হয় কিনা।'

বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াতে থতমত খেয়ে গেল বাবলু। আরে, এ বাড়িটাও তো বড় রামপুরের রাজার বাড়ির মতই দেখতে। তেমনি সাদা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। তেমনি ফটক সামনে। তবে কি এই বাড়িটারও পেছনের উঠোনে তেমনি একটা বিশাল গাছ আছে! তবে কি.....!

গাড়ি ফটকের সামনে পৌঁছাতেই যেন ম্যাজিকের মতো ফটকটা খুলে গেল। আর বাবলুকে চমকে দিয়ে খোলা ফটক দিয়ে বার হয়ে এল তেজী ঘোড়ায় টানা একটা ঘোড়ার গাড়ি। পাল্কি গাড়ি নয়! ওর ছোট্ট মনে ভয়ের রঙে আঁকা সেই গাড়ির মতো একটা গাড়ি। কোচম্যান দরজার সামনে অন্য গাড়ি দেখে পা দিয়ে চেপে ঘণ্টাটা বাজিয়ে দিল, ঘড়ং-ঘড়ং-ঘড়ং! সমস্ত শরীর শিউরে উঠল বাবলুর! এই আওয়াজ তার চেনা! এই গাড়িটা ওর চেনা। পঁচিশ বছর ধরে যে সব স্মৃতি ও ভুলেছে, তার মধ্যে ওই ঘণ্টার আওয়াজটা এক। ও কি তবে ঠিক জায়গায় এসে পৌঁছাল এতদিন বাদে!

ঘোড়ার গাড়িটা আস্তে ওর পাশ কাটিয়ে চলে গেল। ঘোড়ার পায়ের একটানা টগবগ টগবগ আওয়াজ ক্রমে দূরে মিলিয়ে গেল।

আবু বক্কর বলল ওর ভাষায়, 'আপনারা ও গাড়ি রুকলেন না কেন? খান সাহেব তো চলে গেলেন বিকাল বেলার জন্য বেড়াতে। ফিরতে কি আর না ঘণ্টা খানেক হবে। এখন চুপ করে বসে থাকুন গাড়িতে।'

রেজ্জাক সাহেব বললেন, 'এ কথা তো তুমি আগে বলবে! নাও, নাম সবাই, চল, দেখি বাড়ির অন্য কারও সঙ্গে আলাপ করা যায় কিনা?'

আবু বক্কর ছাড়া অন্যেরা নামল গাড়ি থেকে। আবু বলল, 'রাজবাড়ির মতো ফটকে সাত্রী নেই। ফটক কিন্তু খোলাই রয়েছে।'

রেজ্জাক সাহেব বললেন, 'তার মানে পাহারাদাররা আমাদের জন্যই অপেক্ষা করছে। ওরা বুঝেছে আমরা খান সাহেবের কাছেই এসেছি।'

ফটকের কাছে পৌঁছাতে এক অতি বৃদ্ধ মুসলমান সামনে এগিয়ে এলেন। ফর্সা ধপধপে গায়ের রং। এক গাল পাকা দাড়ি। পাজামা মেরজাই পরা। এগিয়ে এসে শিষ্টাচার বিনিময় করে বললেন, 'আপনারা কি খান-সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন? তিনি এই বেরলেন বেড়াতে। আসুন ভেতরে এসে বসে বিশ্রাম করুন। উনি এসে পড়বেন কিছুক্ষণের মধ্যেই। আমি ওঁর মুনিম। আপনাদের খাতির যত্নের ত্রুটি হবে না।'

রেজ্জাক সাহেব বললেন, 'আমরা খান সাহেবের সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি। বিষয়টা জরুরী। তবে আপনার কাছ থেকে যদি কিছু খবর পাই তো আর ওঁকে বিরক্ত করব না। খবরগুলো একজনের পক্ষে খুবই জরুরী।'

মুনিমজী বললেন, 'আসুন আসুন। কি কথা জানতে চান বলুন, বলার মতো হলে আমিই না হয় তার জবাব দেব।'

ওরা তিনজন বৈঠকখানায় এসে বসল। মুনিমজী বললেন, 'চা, কফি না শরবৎ, কোনটা ইচ্ছা করেন আপনারা। সব ব্যবস্থা আছে। অসুবিধা হবে না।'

রেজ্জাক সাহেব বললেন, 'শরবৎ। আপত্তি যদি না থাকে বলবেন কি, আপনি এ বাড়িতে কত দিন কাজ করছেন?'

প্রশ্নটা এতই আচমকা যে মুনিমজী অবাক

হয়ে তাকালেন রেজ্জাক সাহেবের দিকে। রেজ্জাক সাহেব তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'না, মানে, আমরা জানতে চাই আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগেকার কিছু কথা। তাই ওই প্রশ্ন আর কি।'

'কি জানতে চান বলুন।' শান্তভাবে বললেন মুনিমজী, 'উত্তর দেবার মতো হলে উত্তর দেব।'

একটু ইতস্তত করে রেজ্জাক সাহেব বললেন, 'না, মানে আমি জানতে চাই, মানে আমরা জানতে চাই, আপনাদের এই বাড়ি থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে কি কেউ হারিয়ে গেছিল?'

মুনিমজী তাড়াতাড়ি বললেন, 'কি বললেন? ঠিক করে বলুন?'

আবু বলল, 'এই আড়াই তিন বছরের একটা ছেলে, মানে, সেই বয়সের কেউ কি হারিয়ে গেছিল আপনাদের বাড়ি থেকে, বছর পঁচিশেক আগে?'

রেজ্জাক সাহেব ঢোক গিলে গলা সাফ করে বললেন, 'হ্যাঁ, ওই কথাই আমি জানতে চাই। মানে আমরা জানতে চাই।'

মুনিমজী চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ক'পা এগিয়ে এসে ঝুঁকে রেজ্জাক সাহেবের কাছে মুখ এনে বললেন, 'আমি নিশ্চয়ই ভুল শুনিনি? আপনারা পঁচিশ বছর আগে হারিয়ে যাওয়া এক ছেলের কথা বলছেন, এই তিন চার বছর বয়স ছিল তার? বলুন ঠিক এই বলেছেন তো আপনারা?'

রেজ্জাক সাহেব বললেন, 'হ্যাঁ, হারিয়েছিল নাকি কেউ?'

গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুনিমজী বললেন, 'সে ছেলের খবর আপনারা জানেন?'

আবু বলল, 'হ্যাঁ জানি। কিন্তু তার কথা আপনাদের বলার আগে, আপনাদের কাছে কোনও ছবিটবি আছে কি তার? দেখাতে পারেন?'

'ছবি!' বললেন মুনিমজী, 'আছে হয়তো তার। তবে তা কি এ বাড়িতে পাবেন? ছবি নিশ্চয়ই আছে তার মার কাছে। আলতাফ, সে ছেলে কোথায়? আমরা কি করে তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি?'

বাবলু বলল, 'তার মা থাকেন কোথায়? এ বাড়িতে থাকেন না?'

'খানসাহেবের বড় মেয়ে নার্গিসের বড় ছেলে আলতাফ ভীষণ বিপদে পড়ে মার সঙ্গে এসেছিল এ বাড়িতে দাদুর কাছে, ক'দিন থাকতে। ডাকাত পড়েছিল তখনই বাড়িতে। আর তাকেই ধরে নিয়ে গেছিল, বদলে টাকা আদায় করবে বলে। টাকা ওরা আদায় করতে পারেনি। ধরা পড়ে গেছিল পুলিশের হাতে। পুলিশ অবশ্য জানিয়েছিল আলতাফকে ডাকাতরা খুন করেছে। লাশ কিন্তু তার পাওয়া যায়নি। আদালতেও কোনো কিছু প্রমাণ হয়নি খুনের ব্যাপারে। ডাকাতির জন্য ডাকাতদের অনেক সাজা হয়েছিল। ছেলে আমাদের আর ফিরে আসেনি। কোথায় আলতাফ? তার মা, তাকে ফিরে পেয়ে আপনাদের দোয়া দেবে। কোথায় সে? বড় ভয়ঙ্কর সময়েই তার খবর আপনারা এনেছেন।'

বাবলু বলল, 'ডাকাতটার মাথায় ইয়া বড় পাগড়ি ছিল?'

'হ্যাঁ তা ছিল।' বললেন মুনিমজী,'এ বিষয়ে কারও মনে কোনো সন্দেহ নেই।'

তখনি বাইরে আবার ঘোড়ার গাড়ির ঘণ্টা শোনা গেল, ঘড়ং ঘড়ং ঘড়ং।

বেশ যেন ভয় পেয়ে মুনিমজী বললেন, 'ওই বোধহয় খানসাহেব ফিরলেন! কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ফিরলেন কেন আজ? তবে কি কোনো খারাপ খবর আছে! হায় আল্লা! কিছু হয়নি তো তার! হায় আল্লা!'

রেজ্জাক সাহেব বললেন, 'ব্যাপার কি বলুন তো? তখন বললেন, ভয়ঙ্কর সময়ে এসেছি আমরা! এখন এমন করছেন! কি হয়েছে বলবেন কি?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুনিমজী বললেন, 'খানসাহেব বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন মেজর সাহেবের সঙ্গে। আলতাফের যখন তিন চার বছর বয়স ওর বাবা যুদ্ধে মারা যান। সে খবর পেয়েই খানসাহেব মেয়েকে আর নাতিকে নিজের কাছে এনে রাখেন। ভাগ্য এমনি, তখনি ডাকাত পড়ে বাড়িতে। খোয়া যায় আলতাফ। নার্গিস মার জীবনের সব আশা-আকাঙ্ক্ষার শেষ হয়ে যায় ওখানেই। বলতে গেলে বাঁচার ইচ্ছাটাই তার চলে যায়। আত্মহত্যা গুনাহ্, তাই কোনো মতেই বেঁচে ছিল সে এতদিন। কদিন আগে ডাক্তার বলে গেছেন তার ক্যানসার হয়েছে। ছেলেকে হারিয়ে আর এ বাড়িতে থাকেনি নার্গিস মা। খানসাহেব তার জন্য সবকিছু করেছেন। কিন্তু আল্লার মর্জি কে বোঝে? আজ জীবনের শেষের ক'দিন যদি সে তার হারানো ছেলেকে খুঁজে পায় তো...'

কথা মুনিমজী শেষ করতে পারলেন না। ঘরে ঢুকলেন অশীতিপর বৃদ্ধ একজন। সাদা ধপধপে দাড়ি বুক পর্যন্ত। বয়স যাই হোক না তাঁর, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। হাতে ছড়ি। চোখে অবাক দৃষ্টি। বললেন, 'কিছুটা এগিয়েই মনে হলো, গাড়ি এসেছে কেন? আপনারা যদি আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন তো মিছে বসিয়ে রাখি কেন? তাই ফিরে এলাম। মুনিমজী এঁদের খাতির-যত্ন ঠিক মতো করা হয়েছে তো? দাঁড়ালেন কেন আপনারা? বসুন বসুন।' বলে এগিয়ে এসে তিনি নিজেও একটা চেয়ারে বসলেন।

মুনিমজী বললেন, 'জনাব এঁরা এক ভীষণ জরুরী ব্যাপারে কথা বলতে এসেছেন। আপনি ব্যস্ত হবেন না, খবর ভাল, মানে এঁরা আলতাফ ভাইয়ার খবর এনেছেন বলে মনে হয়। সে বিষয়েই কথা হচ্ছিল আমাদের।'

অবাক হয়ে সবাই দেখলেন, খানসাহেব যেন বিদুতের ছোঁয়া পেয়েছেন, এমনভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। অবাক দৃষ্টিতে ওদের সকলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর শান্ত গলায় বললেন, 'পুলিশ রিপোর্টে আমার নাতি আলতাফকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছে। এ কথা কি শুনেছেন আপনারা?'

মুনিমজী বললেন, 'সে কথা আমি এঁদের বলেছি জনাব।'

আবারও কিছুক্ষণ তেমনি করেই তাকিয়ে রইলেন খানসাহেব। আবারও তেমনি শান্ত গলায় বললেন, 'আপনাদের পরিচয় কি জানতে পারি? মানে, আপনাদেরই পরিচয়। আর এই খবরের জন্য আপনারা কত টাকা দাবি করেন? টাকার অঙ্কটা কি বলবেন?'

আবু বলল, 'আপনি বোধহয় ভুল করছেন...।'

ওকে বাধা দিয়ে রেজ্জাকসাহেব বললেন, 'তোবা তোবা, টাকার কথা উঠবে তা ভাবিনি আমি খানসাহেব। আমাদের পরিচয়, আমার নাম সৈয়দ রেজ্জাক আলি। এ আমার ছোট ছেলে সৈয়দ আবদুর রহমান। আর এ হলো বাবুল, না না বাবলু মানে পরিমল রায়চৌধুরী। আমার ছেলেবেলাকার দোস্তের ছেলে। মানে, পালিত পুত্র বলতে পারেন। আমরা এসেছি এই বাবুলেরই অতীত খুঁজে বার করতে। আজ থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে আমার দোস্ত আর তাঁর স্ত্রী একে হুসেন শা পীরের দরগার কাছে খুঁজে পান। আমিই তখন ছিলাম হুশেনগঞ্জের থানার চার্জে। বিস্তর খোঁজাখুঁজিতেও ওর আপনজনদের খোঁজ করতে পারিনি তখন। আমার দোস্তরা ওকে আপন ছেলের মতোই মানুষ করেছেন। আজ ও জীবনে প্রতিষ্ঠিত। ওর মনের গভীরে কিছু স্মৃতির ছোঁয়াচ ছিল। তাই সম্বল করেই ফের আমরা খোঁজা শুরু করেছি। টাকাপয়সার তো কোনো প্রশ্ন নেই খানসাহেব। প্রশ্ন শুধু ওর মাকে খুঁজে বার করা। ওর মনে আছে, ওকে যে ধরে নিয়ে গেছিল তার মাথায় বিরাট পাগড়ি ছিল।'

তোবা তোবা, টাকার কথা উঠবে তা ভাবিনি।

'আর কি সবুত আছে আপনাদের কাছে?' তেমনি শান্তভাবেই জিজ্ঞাসা করলেন খানসাহেব।

বাবলু বলল, 'আবু, আমি বাংলায় বলছি, তুমি ওকে আমার কথাগুলো বুঝিয়ে দাও। আমার সেই ছোট্টবেলাকার বেশ কখানা ফটো তুলে রেখেছেন আমার বাবা। তা আছে আমার সঙ্গে। যে পোশাক পরে আমি হারিয়ে যাই তাও আছে সঙ্গে। আর আছে সেই তাবিজটা। উনি বললে, সেগুলো আমি এনে হাজির করতে পারি। ওঁর কাছে কি আলতাফের কোনো ফটো আছে? দুটো ফটো মেলালেই তো সবকিছু প্রমাণ হয়ে যাবে।'

সব কথা আবু ওঁকে বুঝিয়ে বলল। শুনে স্তব্ধ হয়ে গেলেন খানসাহেব। ধপ করে ফের বসে পড়লেন তাঁর চেয়ারে। কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে কি যেন ভাবলেন। তারপর ফের উঠে দাঁড়ালেন। স্পষ্ট দেখল সবাই, প্রায় কাঁপতে কাঁপতে তিনি এগিয়ে গেলেন রেজ্জাকসাহেবের কাছে। ওঁকে কাছে এগিয়ে আসতে দেখে উঠে দাঁড়ালেন রেজ্জাকসাহেবও। খানসাহেব তাঁর হাতের লাঠিটা মেঝেতে ফেলে হঠাৎ রেজ্জাক সাহেবের দুটো হাত জড়িয়ে ধরলেন। কান্না চাপা গলায় বললেন, 'এদিকে আপনার নাম কে না জানে। আমার অন্যায় হয়ে গেছে অমন চিন্তা করা। কিন্তু কি জানেন, বহু লোক এসেছিল আমাদের দুঃখে সওদা করতে। ছবিগুলো কি আমি আজই দেখতে পাব?'

ওঁকে ধরে পাশের চেয়ারে বসিয়ে দিলেন রেজ্জাকসাহেব। বললেন, 'কেন দেখবেন না। আমরা এখুনি গাড়ি নিয়ে ছুটে যাচ্ছি, নিয়ে আসছি সব প্রমাণ। যদি মিলে যায় তো আপনাদের মুখে যে হাসি দেখব... বাবুল জলদি চল।'

খানসাহেব বললেন, 'না ও থাক এখানে। ও চলুক আমার সঙ্গে আমার মেয়ের কাছে। এখন আমি তাকে কিচ্ছু বলব না রেজ্জাক সাহেব। আর তাকে কত দুঃখ দেব বলুন তো! তবে যদি সব কিছু মিলে যায়... আলতাফ... বাবুল....তু তেরা আম্মাকো পাশ রহেগা তো তব?'

'আমার কর্তব্য আমি ঠিকই করব. দাদু।' বলল বাবলু।

'কেয়া বোলারে বেটা, কেয়া বোলা! কেয়া বলকে মুঝে পুকারা?'

'দাদু। বাংলাতে আমরা মায়ের বাবাকে তো তাই বলি। আমার আবার তোমাদের ভাষা তেমন আসে না দাদু। বুঝতে পারি, বলতে তেমন পারি না। ও তুমি চিন্তা কর না দাদু। ও নিয়ে আটকাবে না।'

রেজ্জাকসাহেব বললেন, 'ঠিক আছে, আমি আর আবু যাচ্ছি এখনি। ফিরে আসব কোথায়? এখানে না আপনার মেয়ের বাড়িতে? সে বাড়ি তো আমরা চিনি না?'

'আপনারা এখানেই ফিরে আসবেন। আমি নিজে ছবিগুলো দেখব। তারপর পাকা ব্যবস্থা নেব। তার আগে আমার মেয়েকে আমি কিছু বলতে চাই না।'

'ঠিক আছে।' বলে রেজ্জাকসাহেব আর আবু বার হয়ে গেলেন। বাইরে দূরে কিছুক্ষণ পরে মোটরগাড়ির আওয়াজ শোনা গেল।

খানসাহেব বললেন, 'বাবুল, একটা কথা দাও আমাকে তুমি, আমার মেয়ে তো আর বেশিদিন নেই। তার সামনে গিয়ে তাকে তুমি অন্তত আর দুঃখে ফেল না। তোমার পরিচয় যাই হোক না কেন। তোমার একটু স্নেহ

ভালবাসা সে যেন পায়। বড় দুঃখী ও বাবুল। বড় দুঃখী।'

বাবলু বলল, 'আমার তাহলে কি পরিচয় হবে ওঁর কাছে এখন? আপনি যদি বলেন তো না হয় ছবিগুলো আশা পর্যন্ত আমি এখানে অপেক্ষাই করব। তবে আমার নিজের বলার কিছু থাকে যদি এ ব্যাপারে দাদু, তো বলব, চলুন আমরা যাই মার কাছে। মার সঙ্গে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে, এ শিক্ষা আমার আছে দাদু। এক মায়ের কাছেই তো এতদিন আমি ঘর করে আছি। না হয় আরও এক মায়ের মুখে হাসি ফোটাব। এখন যা বলেন আপনি।'

বাবলুকে বুকের মধ্যে টেনে জড়িয়ে ধরলেন খানসাহেব। মুখে আর কোনো কথা বলতে পারলেন না। বাবলু বুঝল, থরথর করে কাঁপছেন উনি।

মুনিমজী বেজায় খুশি হয়ে বললেন, 'গেটে গাড়ি তৈরি আছে জনাব। আর দেরি করবেন না।'

ঘণ্টা বাজিয়ে ঘোড়ার গাড়িটা ছুটতেই আবার সমস্ত শরীর মন যেন কেমন করে উঠল বাবলুর। কোনো সন্দেহ নেই, এই ঘোড়ার গাড়ির সঙ্গে ওর জীবনের ইতিহাস ভীষণভাবে জড়িয়ে আছে। এ গাড়ি ওর চেনা। এ গাড়ি ওর মনের ভয় ও দুঃখের কারণ বহুদিন থেকে! এ গাড়ির প্রচণ্ড গতি ওকে ঘুমের মধ্যে ভয় দেখায়!

খানসাহেব বাইরের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিলেন। সেদিকে তাকিয়ে বাবলু বলল, 'দাদু, এ গাড়িটা এ বাড়িতে কতদিন আছে? মানে তোমরা এ গাড়িটা কতদিন ধরে ব্যবহার করছ?'

চিন্তা ভুলে তাকালেন খানসাহেব। বললেন, 'এই গাড়িটা আমার কেনা। সেই যেবার তোমাকে ডাকাতরা ধরে নিয়ে গেল, সেবারই এ-গাড়িটা বড় রামপুরের রাজা বাহাদুরের কাছ থেকে কিনি। পুলিশ রিপোর্টে তোমাকে মৃত বলে ঘোষণা করলেও তারা তা প্রমাণ করতে পারেনি। গাড়িটা চড়ে কোথায় না তোমাকে খুঁজে ফিরেছি। সেই খোঁজার জন্যই কিনি গাড়িটা।'

থতমত খেয়ে গেল বাবলু। বলল, 'আমি যখন হারিয়ে যাই, তখন এই গাড়িটা আপনাদের এখানে ছিল না?'

'তখন তো ও গাড়ির মালিক ছিলেন অন্যজন। কিন্তু কি ব্যাপার বল তো, কিসের সমস্যা হলো? গাড়িটার সঙ্গে তোমার ব্যাপারের কি কোথাও কোনো মিল আছে মনে পড়ছে?'

'হ্যাঁ দাদু।' বলল বাবলু, 'আমি যখন থেকে ভাবতে শিখেছি, তখন থেকে এ গাড়িটা আমার মনে শুধুই ভয়ের সৃষ্টি করেছে। অথচ চুরি হয়ে যাবার আগে এ বাড়ির ছেলে হলে ওটা তো আমার দেখাই সম্ভব ছিল না! তাহলে কেন ওটা নিয়েই আমি এত ভয় দেখেছি রাতের পর রাত!'

ঘণ্টা বাজিয়ে গাড়িটা বড় রাস্তা ছেড়ে পাশের রাস্তা ধরল। বাইরেটা একবার দেখে নিয়ে খানসাহেব বললেন, 'আমাদের বাড়িতে বা তোমার নিজের বাড়িতে গাড়ি ছিল, কিন্তু সেগুলো ছিল সবই পাল্কি গাড়ি। জান তো আমাদের বাড়ির মেয়েরা কত পর্দানশিন ছিলেন সে যুগে। তুমি সেসব গাড়িতে চড়েছিলে তখন। সেসব বড় গাড়ি গ্রামের পথে যেখানে সেখানে নিয়ে যাওয়া যায় না বলেই এই গাড়িটা আমি কিনি। বড় রামপুরের রাজাসাহেবও কেন যেন ওটা বিক্রি করবেন বলে ঠিক করেন। যোগাযোগ করে আমি কিনি। তোমার গাড়ির চিন্তার সঙ্গে এখন চোখে দেখা এই গাড়িটাকে তুমি মিলিয়ে ফেলেছ! দুটো এক নাও হতে পারে।'

'আপনাদের সেই আগের পাল্কি গাড়িগুলো আছে? দেখতে পারি একবার?' জানতে চাইল বাবলু।

'না না, সে গাড়ি আর এখন তুমি কোথায় পাবে! সে গাড়ি দুটোও হাত বদল হতে হতে যে কোথায় হারিয়ে গেছে, কে তার খবর রাখে! আমি বলি কি বাবুল, ও গাড়ির চিন্তাটা এখন তুমি মন থেকে মুছে ফেল। ছবি মিললে, ও গাড়িটা কি আর তখন বাধার সৃষ্টি করবে? করবে না। তাহলে তৈরি হও, আমরা এসে গিয়েছি।'

ঘড়ং ঘড়ং ঘড়ং করে ঘণ্টা বেজে উঠল। একটা বাঁক নিয়ে গাড়িটা আর একটা পাঁচিল ঘেরা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল। একটু এগিয়ে থামল গাড়ি। খানসাহেব বললেন, 'আমরা এসে গিয়েছি বাবুল। তোমাকে আমি আপন ভেবেছি বাবুল। আমার চিরদুঃখী মেয়েটাকে তুমি নিশ্চয়ই আরও দুঃখ দেবে না?'

এ কথার কোনো উত্তর দিল না বাবলু। শুধু দু চোখ তুলে তাকাল ও খানসাহেবের দিকে। সেই চাহনি দেখে খানসাহেবও আর কোনো কথা বললেন না। সহিস দরজা খুলে ধরতে নিচে নামলেন। পিছন পিছন বাবলুও নামল।

পাঁচিল ঘেরা ছোট্ট উঠানের মাঝে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। এ পাঁচিল সাধারণ পাঁচিল। উঠোনের এদিকে ওদিকে কিছু বাগান। কটা বড় গাছ। বাগানে আলো জ্বলছে। সামনের ছোট একতলা বাড়ির ঘরেও আলো জ্বলছে। গাড়ি থামতেই সামনের দরজাটা খুলে গেল। খোলা দরজায় এসে দাঁড়ালেন একজন মাঝবয়সী মহিলা। কোনও সন্দেহ নেই তিনি নার্স। বললেন, 'আজ এত দেরি হলো আপনার? আপনার মেয়ে বার বার খোঁজ করছিল আপনার।'

'সে কেমন আছে এখন?'

'তেমনই, ডাক্তারবাবু এসেছিলেন। নতুন ওষুধ দিয়েছেন। আমীর গেছে আনতে। আসুন আপনারা ভিতরে।' একপাশে সরে দাঁড়ালেন তিনি।

লাঠিতে ভর দিয়ে ক'পা এগিয়ে খানসাহেব বললেন, 'বাবুল ইনি হলেন সিস্টার মমতাজ। আরও আছেন দুজন, রুকসানা আর পারভিন। এঁরাই নার্গিসের দেখাশোনা করেন। আর আছে আমার সম্পর্কের আর একজন নাতি। ওই যে যার নাম শুনলে আমীর। সেও থাকে এখানে। এঁরা সবাই আমার মেয়েকে ভালবাসেন। তাই আমি নিশ্চিন্ত। তা না হলে এই বুড়ো বয়সে, চোখের সামনে আমার আদরের মেয়েকে তিল তিল করে মরতে দেখতে হতো... ওঃ আল্লা! তোমার কাছে কি গুনাহ্ করেছি আমি!'

সিস্টার মমতাজ বললেন, 'আপনি অমন করবেন না। প্লিজ, আপনি অমন করলে আপনার মেয়েকে আমরা কি বলে বোঝাব?'

থমকে দাঁড়ালেন খানসাহেব। একটু যেন হাসলেন। বললেন, 'ঠিক বলেছ। আমাকে শক্ত হতে হবে। আমাকেই তো শক্ত হতে হবে! চল বাবুল, আমরা ভিতরে যাই।'

সিস্টার মমতাজের পিছন পিছন ওরা এগোলো। ছোট বাড়ি, কিন্তু ঝকঝকে পরিষ্কার। ছোট লম্বা বারান্দার শেষের দরজায় পর্দা ঝুলছে। বারান্দার আলোটা জ্বলছে বলেই ভিতরে আলোর আভাস বোঝা যাচ্ছে না। ধীর পায়ে খানসাহেব পর্দার সামনে দাঁড়িয়ে পর্দাটা তুললেন। চাপা শান্ত গলায় বললেন, 'নার্গিস মা, আজ তুমি কেমন আছ?' কথার শেষে উনি ঘরে ঢুকে বিশাল খাটের পাশে দাঁড়ালেন।

ঘরের মধ্যে আবছা আলো। বড় খাট পাতা। তার পাশে দুখানা চেয়ার। সামান্য আসবাবপত্রে ছিমছাম সাজানো ঘর। খাটের অন্য পাশে একটা টেবিলে নানান আকারের ওষুধের শিশি আর ওষুধ রাখা। ধপধপে বিছানায় শুয়ে আছেন একজন মহিলা। সারা দেহ তাঁর চাদরে ঢাকা। শুধু মুখটাই বার হয়ে আছে। ঘরে একটু দূরে আর একটা চেয়ারে আর একজন নার্স বসে। তাঁর বয়স অল্প। ক্লান্ত গলায় অসুস্থ মহিলা বললেন, 'আজ এত দেরি করলে কেন

আব্বা?'

একটু ঝুঁকে একবার মেয়ের কপালে হাত বুলিয়ে দিলেন খানসাহেব। বললেন, 'দেরি হবার কারণ আছে বুঝলে। আজ আর একজন তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। কত আর বয়স হবে তার। আমার ওকে খুব ভাল লেগেছে নার্গিস। তাই ভাবলাম তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। ভাল লাগবে তোমার।'

'কে এসেছেন আব্বা?' তেমনি ক্লান্তভাবেই নার্গিস জিজ্ঞাসা করলেন।

ঘুরে দাঁড়িয়ে খানসাহেব বললেন, 'আরে বাবুল, তুমি এখনও ওখানে দাঁড়িয়ে আছ! এসো এসো, তোমাদের আলাপ করিয়ে দিই।'

পায়ে পায়ে বাবলু এগিয়ে গেল খাটের দিকে। আবছা আলোয় দেখল দুটো করুণ চোখ ব্যাকুলভাবে কি যেন খুঁজছে। ওর চোখে চোখ পড়তেই তা স্থির হলো কিছুক্ষণের জন্য। তারপর ব্যাকুল চাহনি আবার চঞ্চল হয়ে পড়ল। ব্যথা জড়ান গলায় মা নার্গিস জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুম কৌন হো বেটা? তুম কৌন হো?'

বাবলু কিছু বলার আগেই ভীষণ ব্যস্ত হয়ে উনি আবার বললেন, 'আরে আউর এক বাত্তি তো জ্বালা দো। ইয়ে আন্ধেরা মেরা আউর আচ্ছা নেহি লাগতা। শুনা কোই?'

নার্স ঘরের একপাশে আলোটা জ্বালিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মা নার্গিস আবার স্থির দৃষ্টিতে ফের তাকালেন বাবলুর দিকে। ভীষণ ক্লান্তিতে ফের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুম কৌন হো বেটা। ম্যায় তো পয়চানা নেহি শেকা।'

বাবলু একটু এগিয়ে গিয়ে বলল, 'বাঃ চিনবেন কি করে আপনি। আগে কি কখনও আমাকে দেখেছেন? তবে আমি কিন্তু আপনাকে চিনি। আপনি, মা নার্গিস। জানেন, আমি কিন্তু আপনার বাবাকে দাদু বলতে শুরু করেছি। দাদু! এই রে বুঝলেন না তো? আরে যাকে বলে গ্র্যান্ড ফাদার। এক্ষেত্রে ম্যাটার্নাল গ্রান্ড ফাদার মিন করছি। উনি একসেপ্ট করেছেন। জিজ্ঞেস করুন। তাহলে অটোমেটিক আপনি কিন্তু হলেন আমার মা। এ তো অঙ্ক, ম্যাথামেটিক্স, ভেরি ইজি।'

ক্লান্ত মুখে চাপা হাসি ফুটল মা নার্গিসের। বললেন, 'আমাকে একটু উঠিয়ে বসিয়ে দিতে পার? ওরা দেয় না। বেটা, সারাদিন কি কারও শুয়ে থাকতে ভাল লাগে?'

বাবলু বলল, 'দাঁড়ান দাঁড়ান, আপনি বললেন, আর আমি সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে ধরে বসিয়ে দেব, অমন ভাল ছেলে আমি নই মা।' বলে সিস্টারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'শুনলেন তো, উনি উঠে বসতে চাইছেন। বসিয়ে দেওয়া কি উচিত হবে? ডাক্তারবাবুর কি নির্দেশ আছে এ ব্যাপারে?'

সিস্টার বললেন, 'উনি কি উঠে বসে থাকতে পারবেন? পারলে আপত্তি নেই। দাঁড়ান আমি ওঁকে বসিয়ে দিচ্ছি।' বলে সিস্টার বিছানার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন।

নিরাশভাবে মা নার্গিস বললেন, 'থাক আর দরকার নেই। কি হবে বসে!'

বাবলু বলল, 'বাঃ কি হলো আপনার! এই না বললেন বসবেন? বসুন, বসে বসে কথা বলি। কত কথা আছে আমার বলার, কত কথা আছে শোনার আপনার কাছ থেকে। তবে শরীর আগে, যদি মনে করেন, শরীরের জন্যই এখন ওঠা ঠিক হবে না, তাহলে উঠবেন না।'

'তুমি আমার সঙ্গে কি কথা বলবে বল তো?'

'আরে কথার কি শেষ আছে নাকি? জানেন আমি না একদম চুপ করে থাকতে পারি না। হাঁসফাঁস করে উঠি। হাঁসফাঁস বোঝেন তো? দেখুন তো কি মুশকিল, আমি আবার হিন্দি, উর্দু দুটোই ভাল বলতে পারি না। তবে কেউ বললে বেশ বুঝতে পারি। আর এদিকে আপনিও বাংলা জানেন না। তাহলে কি আমাদের হাত পা নেড়ে মনের কথা একজন অন্যজনকে বোঝাবে?'

প্রাণ খুলে হাসলেন মা নার্গিস। বললেন, 'তুমি যখন আমার উর্দু বুঝতে পারছ, তখন আমিও তোমার বাংলা বুঝতে পারছি, লেকিন হাঁসফাঁস করিস না।'

ভীষণ খুশি হয়ে বাবলু বলল, 'এই তো চাই মা। তবে কি এখন একটু উঠে বসবে?'

ক্লান্ত হাসিতে মুখ ভরে রেখে মা নার্গিস বললেন, 'বসবে!'

বাবুল বলল, 'আসুন আসুন নার্স দিদি। আমি মাকে আস্তে তুলে বসিয়ে দিচ্ছি। আপনি পিঠের দিকে ঠিক করে তাকিয়াগুলো দিয়ে দিন। আসুন আসুন।'

ভীষণ যত্নে মা নার্গিসকে আস্তে তুলে বসিয়ে দিল বাবলু। নার্স পিছনের বালিশ ঠিক করে দিলেন। চুপ করে চোখ বুজে রইলেন কিছুক্ষণ মা নার্গিস। কি যেন মনে মনে উনি বোঝার চেষ্টা করলেন। বাবলুর মনে হলো, যে দুটো দুর্বল হাতে উনি ওকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, সেই দুটো হাতের খোঁজেই তো এতদিন ঘুরে মরেছে ও নিজে।

চোখ খুললেন মা নার্গিস। সঙ্গে সঙ্গে বাবলু বলল, 'যেই একটু অসুবিধা বোধ করবে অমনি বলবে, শুইয়ে দেব। জোর করবে না কিন্তু, বুঝলে?'

ওর দিকে কেমন করে যেন তাকালেন মা নার্গিস। আবার ওঁর মুখে চাপা হাসি ফুটে উঠল। শান্তভাবে বললেন, 'বুঝলে!' বলার শেষে সারা মুখ ওঁর হাসিতে ভরে গেল।

বড় নার্স দিদি তখনি ট্রেতে করে কি যেন সব নিয়ে ঢুকলেন। পাশের টেবিলে তা নামিয়ে রেখে বললেন, 'বসেছেন যখন আপনি, তখন আস্তে আস্তে কিছু খেয়ে নিন। আমি সব এনেছি। হাতে খাবেন? না খাইয়ে দেব?'

করুণ মুখ করে নার্গিস বললেন, 'রুচি নেই বোন। এখন খাব না।'

বাবলু বলল, 'উহুঁ ও বললে তো চলবে না মা। আমি সারাক্ষণ তোমার সামনে বসে বকবক করে যাব। আর তুমি তা চুপ করে বসে শুনবে, তা হবে না। তোমাকেও সমানে আমার সঙ্গে বকতে হবে। না খেলে গায়ে জোর হবে না। বকবে কি করে? তাই খেতে হবে।'

তেমনি করে হেসেই মা নার্গিস বললেন 'বকবে কী করে! খেতে হবে!'

'বাঃ এর মধ্যেই তো দেখছি তুমি বেশ ভাল বাংলা শিখে গেলে! গুড, গুড, ভেরী গুড। তবে আর মিছে খাব না বলছ কেন? নাও, নাও, যা পার খেয়ে নাও, তারপর...'

কথা বাবলু শেষ করতে পারল না। মা নার্গিস ওর দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে বললেন, 'না না, যা পারো খাবে না।' বলেই হাসিতে প্রায় ভেঙে পড়লেন।

বাবলু বলল, 'বাঃ বাঃ, তুমি তো দেখছি আমারই মতো বাঙালী হয়ে গেছ! বাংলা ভারি মিঠে বুলি। তোমাদের উর্দুর মতো অত খসখসে নয়। তবে বলতে যাই হোক না, শুনতে খুব ভাল লাগে। এই দেখ আবার বাজে বকে যাচ্ছি, সিস্টার আপনি ওকে খাইয়ে দিন। বুঝলেন?'

বুকের ওপরে ন্যাপকিন বিছিয়ে নার্স দিদি আস্তে আস্তে মা নার্গিসকে খাইয়ে দিতে লাগলেন।

এতক্ষণ খানসাহেব এক পাশে ঠায় দাঁড়িয়ে ছিলেন লাঠি হাতে পাথরের মূর্তির মতো। এবারে বললেন, 'বেটি, আজ আমার ঘরে ক'জন মেহমান আসবে। আমরা এখন যাই। কাল সকালেই আবার আসব। রাতে তুমি ঘুমিও কিন্তু।'

খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল মা নার্গিসের। আবার করুণ মুখে তাকালেন তিনি সবার দিকে। করুণভাবেই বললেন, 'হ্যাঁ, তোমরা এসো আব্বা। আমার কি জোর আছে যে কাউকে থাকতে বলব। কেউই যখন রইল না...।' প্রায় কান্নায় ওঁর গলা বন্ধ হয়ে গেল।

বাবলু সঙ্গে সঙ্গে হইহই করে উঠল, 'আরে আরে তোমার আবার কি হলো, এই তো বেশ আমার সঙ্গে কথা বলছিলে। কেউ না থাকল তো কি আছে? তুমি আমাকে একবার থাকতে বল না। দেখ না, আমি কি করি। শেষ পর্যন্ত গলা ধাক্কা দিলে তবে বার হব, তার আগে আর তাড়াতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, একটা শর্ত আছে... না, না, দুটো শর্ত, এক নম্বর, তুমি কখনও মন খারাপ করতে পারবে না। ওটা এমন কিছু শক্ত শর্ত নয়, ও তো তুমি ইচ্ছে করলেই করতে পার। তবে দ্বিতীয় শর্তটা ভীষণ কঠিন...।'

ও কথা শেষ করার আগেই মা নার্গিস বললেন, 'কি তোমার শর্ত শুনি?'

'বলব?' বলে বাবলু খানসাহেবের দিকে তাকাল।

অবাক খানসাহেব বললেন, 'বল, তুমি কি বলতে চাও বল। সম্ভব হলে সে শর্তও মানা হবে।'

'খুব শক্ত শর্ত।' বলে ব্যাজার মুখ করে বাবলু সবার মুখের দিকে তাকাল, 'বলি তাহলে, মানে আমাকে যে মা-টা মানুষ করেছে না, বুঝলে সে আবার হিন্দু। পুজোটুজো করে। আমি যখন এদিকে আসি, বার বার বলে দিয়েছে, যাই করি আর তাই করি, কখনও গরু যেন না খাই। খেলেই নাকি গা দিয়ে প্যাঁজ রসুনের গন্ধ ছাড়বে। অমনি তাহলে আমার কান মলে, গোবর খাইয়ে প্রায়শ্চিত্ত করাবে। গোবর, এ্যাঃ, আবার প্রায়শ্চিত্ত বোঝো তো? ও দাদু ওর উর্দু কি, হিন্দিই বা কী?'

আবার হাসি ফুটে উঠল মা নার্গিসের মুখে। চাপা গলায় বললেন, 'পাগল কাঁহাকা। তুঝে ও সব খানে নেহি হোগা রে বেটা, রহ্ যা মেরে পাশ।'

প্রায় চেঁচিয়েই উঠল বাবলু। বলল, 'ব্যস এই তো আসল কথা। দাদু গুড নাইট, আসুন আপনি। কাল সকালে কিন্তু খবরটা নিয়ে আসা চাই। বুঝলেন, জীবনে, যে এত আনন্দও আমার পাবার ছিল তা জানতাম না। আপনার আল্লার কাছে প্রার্থনা করবেন, এ যেন সত্যি হয়। সত্যি যে এত মধুর, তাও তো আমি ভাবিনি কোনো দিন।'

খানসাহেব আবেগে আবার বাবলুকে জড়িয়ে ধরলেন। সে মাত্র ক'সেকেণ্ডের জন্য। কোনো কথা বললেন না। ঝুঁকে মা নার্গিসের কপালে হাত বুলিয়ে দিলেন। বললেন, 'খানা খেয়ে নাও মা। ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। কাল সকালেই আসব। পাগলটা রইল তোমার কাছে। সবাইকে বলে যাচ্ছি। ওর দেখভাল করবে। তুমি ও নিয়ে চিন্তা কর না মা।'

হেসে মা নার্গিস মাথা নাড়লেন শুধু। বাবলু শুধু বলল, 'যাঃ চলে, সবার ভাল করতে গিয়ে শেষে কিনা আমি পাগল হয়ে গেলাম! যাঃ চলে।'

মা নার্গিস বললেন, 'তু বেটা এইসাহি পাগল হো কর রহা যা মেরে পাশ। মেরা তো আউর থোড়া কয় রোজকা ওয়াস্তা। মুঝে ছোড়কে না জানা বেটা।' দু'ফোঁটা টলটলে জল গড়িয়ে পড়ল ওঁর দুচোখ থেকে। থমকে থেমে গেল বাবলু। খানসাহেব আস্তে আস্তে বার হয়ে গেলেন। খাওয়া শেষ করলেন মা নার্গিস। নার্স দিদি বললেন, 'এবারে একটু আবার শোন আপনি। চান তো কিছুক্ষণ পর আবার বসিয়ে দেব আপনাকে।'

মাথা নাড়লেন মা নার্গিস। বললেন, 'না, আমার কষ্ট হচ্ছে না। কিছু পরে তো ওষুধ খেতে বলবে? ওষুধ খেয়ে তখন শোব। এখন আরো কিছুক্ষণ আমাকে বসতে দাও।'

বাবলু বলল, 'এই তো চাই মা। কি সারাক্ষণ শুয়ে থাকবে? এখন কিন্তু তুমি কিছুক্ষণ একদম চুপ করে বিশ্রাম করবে। নো টক। কথা বলব আমি। কি বলব?'

'তু কাঁহাসে আয়ারে?' জিজ্ঞাসা করলেন মা নার্গিস।

সে তাহলে তোমাকে একটা মহাভারত শোনাতে হয়। অনেক কথা। শুনবে?'

হেসে মা নার্গিস বললেন, 'শুনবে।'

'সে প্রায় পঁচিশ বছর আগে, হুশেন শা পীরের দরগায় এক হিন্দু মা এসেছিল মানত করতে। বোধহয় তার মানত ছিল ছেলের। ফেরার সময় তারা রাস্তায় একটা আড়াই তিন বছরের ছেলেকে কুড়িয়ে পায়। ছেলেটা রাস্তার ধারে একা দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। কেউ ছিল না তার। সেই মা-টা তাকে কোলে তুলে নেয়। মা ছিল বাঙালী। ছেলেটা কিন্তু বাঙালী ছিল না। তা না থাক, ছেলেটা তার নতুন মাকেই দুহাতে আঁকড়ে ধরেছিল। হুসেনগঞ্জের থানার দারোগা বাঙালীবাবুদের দোস্ত ছিল। তিনি অনেক খোঁজ করলেন। কোথাও ছেলেটার মা-বাবার খোঁজ করতে পারলেন না। পারবেন কি করে বল? ওকে তো চুরি করে এনে, জোর করে পীরবাবার স্থানে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। সেই বাঙালী মা-টাই ওকে মানুষ করল। সেই মা-ই ওর মা এখন। সেই বাঙালীবাবুই বাবা। ওরা দুজনে দারুণ ভালবাসেন ওকে।' থামল বাবলু। তাকাল মা নার্গিসের দিকে।

অবাক চোখে মা নার্গিস তাকিয়ে রইলেন ওর দিকে। অনেকক্ষণ কিছু বলতে পারলেন না। শেষে শীর্ণ দুটো হাত শুধু সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। বাবলু একটু ঝুঁকে পড়ল। হাত দুটো ওর মুখে মাথায় বুকে পিঠে স্নেহের পরশ বুলিয়ে দিল। বড় বড় ধারায় আবার ক'ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল মা নার্গিসের দু চোখ দিয়ে। বাবুল ওর ডান হাত বাড়িয়ে সে জল মুছিয়ে দিল। বলল, 'হ্যাঁ মা, আমিই সেই ছেলেটা। এতদিন বাদে এসেছি আমার ছেলেবেলাকে খুঁজতে। আমার ছেলেবেলার ছবি আছে আমার সঙ্গে। আমার সেই প্রথম দিনের জামা পোশাক তাও আছে। আজ রাতে থানার সেই দারোগাবাবু সেগুলো নিয়ে যাবেন দাদুর কাছে। কাল সকালেই আমি জানতে পারব আমি কে?'

মুখে মাথায় বারবার হাত বুলিয়ে মা নার্গিস বললেন, 'তুই আমার আলতাফ। তুই-ই আমার আলতাফরে। আর চলে যাস না বাবা। আমি আর ক'দিন! শেষের ক'দিন আমাকে একটু হাসতে দিস বাবা। তারপর নয় তুই আবার তোর সেই মা-টার কাছে চলে যাস। আমি তো তা আর দেখার জন্য তখন থাকব না।' আবার গায়ে মাথায় পরম যত্নে হাত বুলিয়ে দিলেন মা নার্গিস।

বাবলু বেশ রাগ করে বলল, 'নো আজেবাজে টক মা। চলে যাব, মরে যাব, থাকবনা এসব কি কথা? অসুখ বুঝি কারও করে না। ডাক্তারবাবু আসছেন, ওষুধ দিচ্ছেন, আর আমিও তো এসে গিয়েছি। এখন চটপট ভাল হয়ে যাও তো দেখি। ওই মা-টা তোমাকে দেখতে চায়। তোমাকে কলকাতায় নিয়ে যাব। তুমি সেখানে মছলি-ভাত খাবে। তারপর ওই মা-টার সঙ্গে খুব ঝগড়া করবে। আমি বসে বসে দেখব। কে জেতে। তা না কি আজেবাজে কথা বলছ বল তো! সিস্টার ওষুধ খাবার সময় হয়নি মার? দিন তো খুব তিতো ওষুধ। ভীষণ তিতো।'

মা নার্গিস আজ খুশি মনেই ওষুধ খেলেন। ওষুধ খাবার পর ওঁর মুখ মুছিয়ে দিলেন নার্স। বললেন, 'আজ অনেকক্ষণ বসে আছেন। অনেক কথা বলেছেন। এবারে শুয়ে পড়ুন। ভাইসাব তো রইলেন। ডাকলেই আসবেন। কাল আবার সকালে কথা বলবেন।'

মা নার্গিস বললেন, 'হ্যাঁ। আমার ঘুম পাচ্ছে খুব! তুই যাস না বেটা। বসে থাক আমার মাথার কাছে। ঘুমালে যাস। তোমরা দেখ পাগলটার যেন কোনো অসুবিধা না হয়।'

বাবলু আর নার্স দুজনে ধরে মা নার্গিসকে শুইয়ে দিলেন। শুয়েই কেমনভাবে যেন তাকালেন মা নার্গিস বাবলুর মুখের দিকে। বাবলু বলল, 'তুমি ঘুমাও মা, আমি আছি

তোমার পাশে বসে। গুড নাইট।'

ক্লান্ত অবসন্ন গলায় মা নার্গিস বললেন, 'আল্লা, আমাকে তুমি আর কটা দিন সময় দাও, আল্লা। এত সুখ, এত আনন্দ, এখুনি আমাকে ছেড়ে যেতে বল না আল্লা। রেহেম কর।'

বাবলু আস্তে আস্তে মা নার্গিসের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। পরম তৃপ্তিতে তিনি চোখ বুজলেন।

তোমার সব কষ্ট কমে যাবে মা।

একসঙ্গে খেতে বসল ওরা সকলে, পাশের ঘরের টেবিলে। আমীর বলল, 'ভাইসাব, আপনি বোধহয় জানেন না মাতাজীর কি অসুখ করেছে?'

'জানি।' বলল বাবলু।

'তবে বোধহয় এ কথা জানেন না, আর করার কিছুই নেই।'

'তাই নাকি! ডাক্তারবাবু কি তাই বলেছেন?'

বড় সিস্টার বললেন, 'আপনি বড় দেরিতে এসেছেন ভাইসাব। এখন আল্লা যা করেন, তাঁর মর্জি।'

অন্য আর একজন সিস্টার বললেন, 'এতদিন তো যন্ত্রণায় কথাও বলতে পারছিলেন না। আজ আপনি আসাতে এই কিছুক্ষণ ওঁর মুখে হাসি দেখলাম। ওষুধ বলতে তো আর কিছু দেওয়ার নেই। এখন ওঁকে পেন কিলার আর ঘুমের ওষুধ দিয়ে রাখা হয়েছে। আপনি ক'দিন আগে এলেন না কেন?'

'আগে আসব! জানলে তো আগে আসব আমি! কিছুই তো জানতাম না।'

তৃতীয় নার্স বেশ ছেলেমানুষ। বললেন, 'ভাইসাব যে কদিন উনি আছেন, আপনি ওঁকে সুখে রাখুন। শান্তিতে রাখুন। আল্লা আপনাকে তাই তো ঠিক সময়ে এখানে পাঠিয়েছেন। আপনি ওঁকে অনেক শান্তি দিতে পারবেন।'

হাসল বাবলু। বলল, 'কিন্তু কাল সকালে যদি জানতে পারি আমি আলতাফ নই আমি অন্য কেউ, তাহলে?'

আমীর বলল, 'যতদূর যা আমি শুনেছি, তাতে মনে হয় আপনিই আমার ভাই আলতাফ। অন্য কিছু হতেই পারে না।'

বড় সিস্টার বললেন, 'আমারও তাই মনে হয়। দেখুন সব দিক দিয়ে প্রায় সবকিছু মিলে যাচ্ছে আলতাফের সঙ্গে। তাহলে ছবিই বা মিলবে না কেন?'

একটু ভেবে ছোট সিস্টার বললেন, 'আর যদি নাও মেলে ছোটভাইসাব, তাহলেও ওঁর জীবনের বাকি ক'টা দিন না হয় আপনি আলতাফই হয়ে রইলেন। আপনার কোনো লোকসান হবে না তাহলে। কিন্তু উনি পাবেন অনেক কিছু।'

আমীর বলল, 'হ্যাঁ, ভাইসাব তাহলে তাই করবেন। আমরা সবাই তখন আপনাকে আলতাফ বলে ভাবব। সেভাবে কথা বলব। উনি কিছু বুঝতে পারবেন না।'

নার্স তিনজনই সঙ্গে সঙ্গে এ কথায় সায় দিলেন। খাওয়া শেষ করে ওঁরা উঠলেন। কাজের লোকরা আমীরের ঘরেই আলাদা বিছানা করে দিল বাবলুর জন্য। নার্সদের একজন ডিউটিতে থাকবেন। অন্য দু'জন বিশ্রাম নেবেন তাদের ঘরে। প্রয়োজনে সবাই সবাইকে ডেকে তুলবে।

শুতে যাবার আগে বাবলু একবার মা নার্গিসের বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ডিউটি নার্স মাথা নেড়ে বোঝালেন, পেশেন্ট ঘুমোচ্ছেন।

একদৃষ্টে মা নার্গিসের দিকে তাকিয়ে রইল বাবলু। মনে তখন ওর একটাই চিন্তা। কাল সকালে কি খবর আনবেন খানসাহেব! এ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে ও আজ? এমন হবে জানলে কি ও আসত ওর অতীত খুঁজতে! একজন অসহায় মৃত্যুপথযাত্রীনীর জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে ও এখন। বড় করুণ এই সম্পর্ক! এ কি আর ও ছিঁড়ে বার হতে পারবে? কিন্তু ও যদি নিজে আলতাফ না হয়? যদি ও

আর কেউ হয়? তবে কি খানসাহেব ওকে এই মিথ্যা খেলা চালিয়ে যেতে বলবেন? এই মিথ্যা খেলা কি চালিয়ে যাওয়া ওর উচিত হবে? উচিত অনুচিতের থেকেও অন্য ব্যাপার অনেক বেশি ভয়ের হয়ে দাঁড়িয়েছে। মা নার্গিস মুখে কিছু না বললেও, কি যেন বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন। সে বিশ্বাস কি রাখতে পারবে বাবলু।

নিজের মনকে ও বারবার জিজ্ঞাসা করেছে। ও তো আর ছেলেমানুষ নেই। ও এখন যা কিছু করে, যা কিছু করছে, তা তো জেনে বুঝে ভেবেই করে, বা করছে। ওকে যদি ওর নিজের মতো চলতে দেওয়া হয়, তবে ও আর ওর অতীত খুঁজবে না। এই এখানে এই বাড়ির দেওয়ালের মাঝে এক অসহায় মৃত্যুপথ-যাত্রিনীর কাছ থেকে যা পেয়েছে ও, তা তো ওর অনেক পাওয়া। ওর সমস্ত অতীতের সব কিছু এই পাওয়ার সামনে ও হাসিমুখে ভুলে যেতে রাজি আছে। এর বেশি আর কি ও পেতে পারে ওর অতীত থেকে।

যন্ত্রণাকাতর মুখ মা নার্গিসের। গভীর ঘুম নেমেছে দু চোখে ওঁর। সে ঘুম স্বাভাবিক নয়। এ ঘুম ওষুধের। তবুও বুঝি আজ তিনি অনেক শান্তিতে ঘুমোচ্ছেন। অনেক কিছু হারিয়ে ফিরে পাওয়ার প্রশান্তি ওঁর এই মুখে।

নিজের বিছানায় শুয়ে অনেকক্ষণ ছটফট করল বাবলু। আমীর একবার জিজ্ঞাসা করল, ও জল খাবে কিনা? তারপর ঘুমিয়ে পড়ল দুজনেই।

অনেক রাতে ঘুম ভাঙল বাবলুর, আমীরের চাপা গলার ডাকে। 'ভাইসাব ভাইসাব উঠিয়ে উঠিয়ে।' ঘুম ভেঙে গেল বাবলুর। ও বিছানার ওপরে উঠে বসল।

আমীর বলল, 'আপনি ও ঘরে যান! আপনার আম্মাজীর পাশে গিয়ে বসুন। আমি এখনি যাচ্ছি ডাক্তারসাহেবের কাছে।' ওর গলার স্বর, ওর বলার ধরন একটা ইঙ্গিতই দিল। চোখ মুছে বাবলু পাশের ঘরে গিয়ে দেখল, মা নার্গিসের বিছানার পাশে দুজন সিস্টার দাঁড়িয়ে। একজন বোধহয় একটা ইনজেকশন তৈরি করছেন। ও কাছে যেতে দুজনে সরে দাঁড়াল। বিছানার সামনে চেয়ারে বসল বাবলু।

ক'ঘণ্টা আগে যে মুখে হাসির ছোঁয়াচ দেখে গেছিল বাবলু, সে মুখ চরম যন্ত্রণায় কাতর। ও মা নার্গিসকে প্রায় বুকে তুলে নিল। দুটো ক্ষীণ হাতও যেন ওকে আঁকড়ে ধরল। ব্যথার সীমা পার হয়ে ক্ষীণ হাসির রেখা যেন ফুটল মা নার্গিসের মুখে। বহু কষ্টে বলল, 'তুই আর যাস না এখান থেকে। আমাকে ধরে রাখ শক্ত করে। আঃ কি আরাম!'

বহু কষ্টে নিজেকে সামলে বাবলু বলল, 'যাব না মা আর আমি তোমার কাছ থেকে। তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে?'

'না রে, আর কষ্ট কিসের? ওকে বল, আমাকে যেন আর ও ইনজেকশনটা না দেয়। আমি আর বেহুঁশ হতে চাই না। আমি শুধু তোকে চাই আমার পাশে। সারাক্ষণ।'

বাবলু বলল, 'ডাক্তারবাবুকে ডাকতে গেছে আমীর। তিনি এলে তোমাকে ওষুধ দেবেন। তোমার সব কষ্ট কমে যাবে মা।'

এবারে সত্যিই মা নার্গিস হাসলেন। দুর্বল হাত দুটো দিয়ে যেন আরও শক্ত করে ধরলেন বাবলুকে। বললেন, 'আর আমার কোনো কষ্ট নেইরে। কষ্ট থাকবে কেন? তুই না আমার পাশে আছিস!'

নার্স মরফিয়া ইনজেকশান দিতে যাচ্ছিলেন। বাবলু বারণ করল। ডাক্তারবাবুর জন্য একটু অপেক্ষা করতে বলল। রাজী হলেন নার্স।

বাইরে গাড়ির আওয়াজ হলো। ঘরের দরজা দিয়ে লাঠি হাতে এসে দাঁড়ালেন বৃদ্ধ খান-সাহেব। তেমনি সোজা, তেমনি বলিষ্ঠ ভঙ্গি তাঁর। আস্তে কাছে এসে বললেন, 'মা নার্গিস। শোন একটা খুশির খবর। এই পাগলটার ছেলেবেলার ছবি আর পোশাক আমি দেখেছি। তোর আলতাফই তোকে তার বুকে ধরে আছে রে। তোর আলতাফ, তাকিয়ে দেখ তো রে মা, চিনতে পারিস কিনা? আমি কিন্তু দাদুভাইকে দেখেই চিনেছিলাম। তবুও তোকে বলিনি। ছবিগুলো দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে তবে তোকে বলছি। কি রে চিনতে পেরেছিস তোর আলতাফকে?' বলে প্রাণখুলে হেসে উঠলেন বৃদ্ধ খানসাহেব।

বাবলু বলল, 'মা, মা, ও মা, তাকিয়ে দেখ একবার। দেখ না, চিনতে পার কি না আমাকে? আমি কিন্তু তোমাকে দেখেই চিনতে পেরেছিলাম। সত্যি।'

দুচোখ মেলে ভাল করে তাকালেন মা নার্গিস। তারপর দুর্বল দুটো হাত দিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে আঁকড়ে ধরলেন তাঁর আলতাফকে। ওর বুকের মধ্যে আরও নিবিড়ভাবে নিজেকে ঠেলে দিলেন। ক্লান্তভাবে বললেন, 'আমি যখন ঘুমিয়ে পড়ব, তুই মাটি দিস আমাকে। দুঃখ করিস না। তোর ওই মা-টাকে ভালবাসিস। সব মায়েরাই এক রে। আর ক'দিন আগে এলি না কেন রে? আর আমার কোনো দুঃখ নেই।'

খানিক পরে ডাক্তারবাবু বললেন, 'ওঁকে শুইয়ে দিন। উনি চলে গেছেন। বড় কষ্ট পাচ্ছিলেন। এ যাওয়া মুক্তি।'

বাবুল ওঁকে শুইয়ে দিল। তাকিয়ে দেখল মুখে চোখে ওঁর আর কোনো ব্যথার ছাপ নেই। পরম শান্তিতে যেন ঘুমোচ্ছেন উনি! স্থির দৃষ্টিতে ওঁর সেই শান্ত সুন্দর করুণ মুখের দিকে তাকিয়ে রইল বাবলু।

সব খোঁজার শেষ হবে ভেবেছিল বাবলু। শেষ হবে ওর অতীত। কিন্তু কোথায় হলো শেষ! বড় করুণভাবে শেষ হলো ওর এই ক'ঘন্টার পরিচয়। যা ওর জীবনের অনেকখানি ভরে দিয়েছে। শূণ্য করে দিয়ে গেল বোধহয় তার থেকেও অনেক বেশি। 'মা, আমি তোমাকে চিনতাম না। মা, তোমাকে আমি বাকী জীবন ভুলব না।'

তারপর শেষযাত্রার আয়োজন হলো। শবাধারে কাঁধ দিল বাবলু। বলল, 'আমি সবকিছু নিজে করব দাদু।'

খানসাহেব বললেন, 'তাই তো করতে হবে তোমাকে!'

আস্তে শবাধার মাটির গভীরে শুইয়ে দেওয়া হলো। বাবলু নিজের হাতে মাটি দিল তাতে। মনের ভিতরটা তখন ওর ভেঙে মুচড়ে যাচ্ছিল। আবু ওর পাশে ছিল। পাশে ছিলেন রেজ্জাক চাচা। আমীর বলল, 'সব শেষ হলো ভাইজান, চল ফিরে যাই।'

সেই ঘোড়ার গাড়িটা আবার যখন ঘণ্টা বাজিয়ে ছাড়ল, বুকের মধ্যে আবারও যেন কেমন করে উঠল বাবলুর। এ শব্দ এই গাড়িটা ওর অতীতের সঙ্গে ভীষণভাবেই জড়িয়ে আছে। আছেই, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সেখানে খানসাহেব আর আলতাফ নেই। আছে বড় রামপুরের রাজবাড়ি। ঘড়ং ঘড়ং করে ঘণ্টা বাজিয়ে গাড়িটা এসে থামল রেজ্জাক সাহেবের বাড়ির সামনে। বারান্দায় এসে দাঁড়াল আবু। পিছন পিছন চাচী। ও নিচে নামতেই আবু এগিয়ে এসে বলল, 'চলে এলে যে? ব্যাপার কী?'

চাচী বললেন, 'ও তো তোমার নিজের বাড়ি বাবুল।'

বাবলু বলল, 'চাচা আছেন? ও বাড়ি আলতাফের, বাবুলের নয়। বাবলুর তো নয়ই।'

'কি বলছ তুমি।' অবাক চাচী বললেন।

'ঠিকই বলছে বাবুল।' বলে বাইরে এসে দাঁড়ালেন রেজ্জাকসাহেব। 'তোমার ছুটির আর ক'দিন বাকি? আরও খুঁজবে, না শখ মিটেছে, ফিরে যাবে?'

করুণ ভাবে হাসল বাবলু। বলল, 'রবি ঠাকুরের সেই লাইনটা কি শুনেছেন আপনি?—'সব ঠাঁই মোর, ঘর আছে, আমি

সেই ঘর মরি খুঁজিয়া—খোঁজা আমার শেষ হয়নি চাচা। ছুটি এখনও ক'দিন আছে।'

'তাহলে চল, গিরধরনগরের রাজাসাহেবের কোঠি। আবু বক্কর বলছিল, ওখানে একদিনে গিয়ে ফিরে আসা যাবে না। তাহলে কাল সকালে রওনা হব, খাবার দাবার সঙ্গে নিয়ে। কি বল?'

বাবলু বলল, 'বেশ। তাই যাব চাচা। কিন্তু বলতে পারেন, দাঁতালি গ্রামটা কোন দিকে?'

'কেন, সে গ্রামের খোঁজ কেন?' অবাক রেজ্জাকসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন।

আবু বলল, 'সেখানেই তো সেই সাত্রীর বাবা থাকেন।'

বাবলু বলল, 'খানসাহেবের ওই ঘোড়ার গাড়িটা আমার অতীতের সঙ্গে ভীষণভাবে জড়িয়ে আছে। অথচ আমি যখন হারিয়ে যাই, তখন ওর মালিক ছিলেন বড় রামপুরের রাজারা। ওরা ওটা বিক্রি করাতেই দাদু ওটা কেনেন। ওই গাড়ির রহস্যটাও উদ্ধার করতে হবে চাচা।'

'গাড়িটা নিয়ে দেখছি তোমার একটা অবশেসন হয়ে গেছে!' বললেন রেজ্জাক সাহেব, 'তোমার দাদুও ও কথা আমাকে বলেছেন। বলেছেন, বাবুল আলতাফ নয় রেজ্জাকসাহেব, আলতাফের বয়স ছিল তিন-চার। আর বাবুল যখন হারায় তখন ও গাড়ির মালিক ছিলেন বড় রামপুরের রাজাবাহাদুর।'

আবু বলল, 'দাঁড়াও আমি আবু বক্কর চাচাকে ডাকি। সে নিশ্চয়ই দাঁতালির খোঁজ দিতে পারবে।'

আবু বক্কর বলল, 'গিরধরনগর যাবার পথ থেকে বাঁয়ে ঘুরে গেলে দাঁতালি গাঁ। দু জায়গাতেই আজকাল বাস চলে। গাড়ি তো যাবেই। গিরধরনগর যাবার পথেও ওখানে যাওয়া যায়, ফেরার পথেও যাওয়া যায়। যেমন ইচ্ছা আপনাদের।'

বাবলু বলল, 'যাবার পথেই আমরা ওখানে যাব চাচা। সাত্রীর বাবা যদি সব রহস্যের সমাধান করে দিতে পারেন তো তাহলে আর আমাদের গিরধরনগর যেতে হবে না।'

আবু বলল, 'সেই ভাল। আমারও মন বলছে ছোটকুমার প্রথম দিনই আমাদের ধোঁকা দিয়েছেন। ওই সম্পত্তির ভাগ দিতে হবে, এই ভয়ে। সাত্রীর বাবাকে ভয় দেখালে, বা লোভ দেখালে হয়তো সত্যি যা তা জানা যাবে।'

বাবলু বলল, 'খুফিয়া মানে কি চাচা?'

অবাক রেজ্জাকসাহেব বললেন, 'হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?'

আবু বলল, 'খুফিয়া মানে স্পাই। ঠিক ধরেছ ভাইসাব। ও সেদিন হঠাৎ ও কথা জিজ্ঞাসা করল কেন? ডালমে কুছ কালা মালুম হচ্ছে।'

'আরে ব্যাপারটা কি তা আমাকে খুলে বলবে তো?' বললেন রেজ্জাকসাহেব।

সাত্রীর গ্রাম আর তার বাবার খোঁজ নেওয়াতেই ও যে ভয় পেয়ে ওদের দুজনকে খুফিয়া সন্দেহ করেছিল, তা শুনে থমকে গেলেন রেজ্জাকসাহেব। অনেকক্ষণ কি যেন ভাবলেন। বললেন, 'এ কথাটা আমাকে আগেই বলা উচিত ছিল তোমাদের। একজন সামান্য কর্মচারীর মনেও ভয় জাগবে কেন? তাহলে কি গোপন কথা কিছু আছে? থাকলে, তা কি? কাল সকালে রওনা দিয়ে আমরা দাঁতালি যাব। পরে অন্য কথা।'

আবু বলল, 'আব্বা, ওখানকার থানা অফিসারের সঙ্গে তোমার আলাপ আছে কি? থাকলে খুব ভাল হয়। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গিয়ে বুড়োকে ভয় দেখিয়ে সত্যি কথা যা তা বার করা সহজ হবে।'

রেজ্জাকসাহেব বললেন, 'ঠিক বলেছ। তাহলে আগে দাঁতালির থানায় যাব আমরা, পরে অন্য জায়গায়।'

পরদিন সূর্য ওঠার আগেই আবু বক্কর গাড়ি নিয়ে হাজির হলো। চাচী শুখা ভাজি, মাংস, পরোটা করে দিলেন অনেক। সেসব গাড়িতে তুলে ওরা রওনা দিলেন। দাঁতালির থানায় পৌঁছালেন যখন তখন সাড়ে দশটা বাজে। রেজ্জাকসাহেব নেমে গেলেন থানায়। বেশ কিছুক্ষণ বাদে ফিরলেন একজন ছোকরা ইন্সপেক্টরকে সঙ্গে নিয়ে। সে গাড়িতে উঠে বলল, 'স্যার বিলাইতি সিংয়ের বাবার নাম সাহেব সিং। বড় রামপুরের রাজবাড়িতে কাজ করত। বহুদিন চাকরি ছেড়ে ঘরে বসে আছে। শুনেছি, তার ছেলে এখন রাজবাড়ির কাজে ঢুকেছে।'

রেজ্জাকসাহেব বললেন, 'তাকে একটু কড়কে দিতে হবে। তুমি ভাই আমার কথায় শুধু সায় দেবে। ভয় নেই, বেআইনি কিছু আমি করবো না। মাধো সিং তোমার বস, বহুদিন আমার আণ্ডারে কাজ করেছেন। আমাকে ভাল ভাবেই চেনেন। চেনেন বলেই না এক কথায় তোমাকে সঙ্গে দিলেন।'

'ব্যাপারটা কি তা যদি আমাকে একটু বলেন.....।' ইন্সপেক্টর বললেন।

রেজ্জাকসাহেব বললেন, 'আবু, গাড়িটা এক পাশে দাঁড় করাও। সত্যি তো, তুমি ঠিক কি করতে যাচ্ছ তা যদি না জান তো,কাজ করবে কি করে। আসলে বড় রামপুরের ছোটকুমার বোধহয় কিছু কথা গোপন করছেন। সত্যি যে কি তা আমরা জানতে চাই।' বলে, বাবলুর অতীত ইতিহাস সব খুলে বললেন ওকে।

সব শুনে ইন্সপেক্টর বললেন, 'এ তো সিনেমার গল্প ভাইসাব! আমার পুরো সাহায্য আপনারা পাবেন। সত্যি তো এতদিন একটা লোক কিছু না করে গাঁয়ে বসে বসে খেল। শুনেছি তেমন জমি-জায়গাও তো ওদের নেই! চলল কি করে তাহলে?'

গাড়ি এসে থামল একটা ছোট মাঠকোঠার সামনে। ইন্সপেক্টরসাহেবই থামালেন গাড়ি। সবাই নামল গাড়ি থেকে। ইন্সপেক্টরসাহেব বাড়ির দরজার কাছে গিয়ে ডাক ছাড়লেন, 'সাহেব সিং বাড়িতে আছ, সাহেব সিং।'

অনেক ডাকাডাকিতে বয়স্ক একজন তাগড়া লম্বা লোক বার হয়ে এল বাড়ির মধ্যে থেকে। যেমন তাগড়া ও, তেমনি বড় ওর মাথার পাগড়ি! সেই পাগড়ির দিকে অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল বাবলু।

দুচার সাধারণ কথার পর জেরা শুরু করলেন রেজ্জাকসাহেব। সাহেব সিং বারবার মাথা নেড়ে বলতে লাগল, ও কিচ্ছু জানে না। ও বুঝতে পারছে না কি কথা ওকে বলা হচ্ছে।

শেষে ইন্সপেক্টর সাহেব বেশ কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'সাহেব সিং, তুমি যদি সত্যি কথা না বল, তাহলে তোমাকে থানায় নিয়ে যাব বলেই এসেছি আমি। কচুয়া ধোলাই খেলে তবে তোমার মুখ দিয়ে সত্যি কথা বার হবে। চল, তাহলে থানায় চল।'

মুখ ভয়ে কালো হয়ে গেল সাহেব সিং-এর। রেজ্জাকসাহেব বললেন, 'এখন যদি সত্যি বল, তাহলে তোমাকে চালান দেওয়া হবে না। চুপ করে থাকলে থানায় নিয়ে যাবে। কেস উঠবে আদালতে। দশ বিশ বছরের জেল হয়ে যাবে তোমার। ভেবে দেখ, কি করবে তুমি?'

'আমাকে এই বুড়ো বয়সে আর জেলে দেবেন না বাবুসাব। মরে যাব আমি।'

'তাহলে সত্যি যা হয়েছিল তাই বল।' বললেন ইন্সপেক্টর।

'আমাকে জেল হাজতে দেবেন না তো তাহলে?'

'না, কথা দিচ্ছি।' বললেন রেজ্জাকসাহেব।

কালো মুখে সবার মুখের দিকে বারবার তাকিয়ে দেখতে লাগল সাহেব সিং। শেষে ঢোক গিলে বলল, 'ভিতরে চলুন, আমি সব বলছি।'

নিজের রিভলবারটি হাত দিয়ে একবার দেখে নিলেন ইন্সপেক্টর সাহেব। বললেন, 'ঘরেই চল। কথা দিচ্ছি, তুমি সত্যি যা বলবে, তা আর কেউ জানতে পারবে না। পাঁচ কান

হবে না এ কথা।'

ছোট ঘরের মেঝেতে পাতা চটের ওপরে বসল সবাই। সাহেব সিং তার দুহাত দিয়ে ইন্সপেক্টরের দুটো হাত ধরে বলল, 'যা করেছি তা বহুত খারাপ কাজ। কি করব বলুন, সামান্য সেপাই ছিলাম রাজবাড়িতে। অত টাকার লোভ সামলাতে পারিনি। এখন গাঁয়ে আমার ইজ্জত আছে। ওসব কথা জানাজানি হলে, এ গাঁ ছাড়তে হবে আমাকে। ও কাজ করবেন না আপনারা, দোহাই আপনাদের।'

রেজ্জাকসাহেব বললেন, 'কোনো চিন্তা নেই তোমার। সত্যি যা, তা বল।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে একটু একটু করে সব কথা খুলে বলল সাহেব সিং।

বুড়ো রাজাসাহেবের দুই ছেলে এক মেয়ে। বড়ছেলে হনুমানপ্রসাদ, ছোটছেলে রামপ্রসাদ। মাঝে মেয়ে সরজু! লেখাপড়ার তেমন চল ছিল না বাড়িতে। কিন্তু সরজু ছিল আলাদা। সে গাঁয়ের স্কুল ছাড়িয়েছিল। আরও পড়বে বলে জেদ করাতে তার বিয়ের ঠিক করেন বুড়ো রাজাসাব। কিন্তু কদিন বাদে সরজুকে আর বাড়িতে পাওয়া যায় না। লোক- লজ্জার ভয়ে বুড়ো রাজা মেয়ের তেমন খোঁজ করেন না। গাঁয়ের স্কুলের মাস্টারও নিরুদ্দেশ হয়েছিল। সে ছিল জাতে ছোট। জল চলত না তার হাতে।

বহুদিন বাদে সরজু ফিরে এসেছিল। সঙ্গে তার আড়াই তিন বছরের ছেলে। সে বিধবা। টাকা পয়সা কিচ্ছু ছিল না তার কাছে, স্বামীর অসুখে সব খরচ হয়ে গেছিল। সে বাড়ি ফেরেনি, ফিরে এসেছিল তার দাদা হনুমানপ্রসাদের কাছে।

দুই ভাই তাদের বোনকে আশ্রয় দিয়েছিল। আলাদা বাসা করে দিয়েছিল। যাতায়াত ছিল তাদের। বুড়ো বাবাকে অনেক বুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত তারা বোনকে বাড়িতে এনেছিল। তবে তার জায়গা হয়েছিল পিছন বাড়ির একটা ঘরে। বাইরের লোকের মুখে যাতে গুজব না ছড়ায়, তাই মেয়েকে ঘরে তুলেছিলেন বুড়ো রাজাসাব। কিন্তু ছোট জাতের ছেলেটিকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। মামারা ছেলেটাকে আদর করত, কোলে নিত। উনি শুধু দূর দূর করতেন। শেষে একদিন দুই ছেলের সঙ্গে বুড়ো রাজাসাহেবের দারুণ ঝগড়া হলো। দুনিয়া বদলে গেছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে, এখন ওসব জাতপাত কে মানে। কেন তা নিয়ে বুড়োকর্তা এত বাড়াবাড়ি করছেন এ কথা তাঁরা বললেন। সরজু নিজে লেখাপড়া জানে, সে লেখাপড়া জানাকেই তো বিয়ে করবে।

রাতের অন্ধকারে বুড়ো রাজাসাব সাহেব সিংকে ডেকে পাঠালেন একলা তাঁর ঘরে। শুনে শুনে অনেকগুলো টাকা দিলেন। বললেন, কোচম্যানকে বলা আছে, ভোর রাতে ছেলেটাকে তুলে নিয়ে হুসেনশা পীরের মেলায় ছেড়ে দিয়ে আসতে হবে। মুখ চেপে বাড়ি থেকে বার করে নিয়ে যেতে হবে, যাতে ও চেঁচাতে না পারে।

তাই করেছিল সাহেব সিং। খুব খারাপ কাজ! কিন্তু বড় গরীব ছিল ও। অতগুলো টাকার লোভ তাই সামলাতে পারেনি। সারা জীবন তারপর বুড়ো রাজার মতো আফশোস করেছে!

পরদিন হনুমানপ্রসাদজী আর রামপ্রসাদজী তাঁদের বোনকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে চলে গেছিলেন। রামপ্রসাদজী বেশি দিন বাঁচেননি তারপর। বুড়ো রাজা শেষ জীবনে প্রায় পাগল হয়ে গেছিলেন। ঘোড়ার গাড়িটা বিক্রি করে দিয়েছিলেন। সাহেব সিংকে ডেকে বারবার বলেছিলেন ছেলেটাকে খুঁজে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে। তা আর ও পারবে কেন! শেষে ভীষণ রাগে তাকে ছুটি দিয়ে দিয়েছিলেন। একা তিনি অত বড় রাজবাড়িতে ঘুরে বেড়াতেন হন্যে হয়ে।

ওবাড়িতে আর ফেরেনি সরজু। বড়ছেলে বাধ্য হয়েই বাবার দেখভাল করার জন্য ফিরে-ছিলেন। ছোট ভাইয়ের এক ছেলে শহরে থাকত পড়ালিখার জন্য তার মাকে নিয়ে। একা শহরের এক ভাড়াবাড়িতে থাকত সরজু দেবী। বড় ভাই হনুমানপ্রসাদ তারও দেখভাল করতেন।

সাহেব সিং-এর গল্প শেষ হতেই রেজ্জাকসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'সরজু মা কোন শহরে থাকে? কি নাম তার? তুমি কি কখনও সে বাড়িতে গিয়েছ?'

মাথা নাড়ল সাহেব সিং। বলল, 'হুজুর কোন মুখে আমি সরজুমাইর সামনে গিয়ে দাঁড়াব? শুনেছি তিনি শহরে থাকেন, তা সে শহর কোথায় তা তো আমি জানি না।'

আবু বলল, 'তুমি কত দিন আগে শুনেছিলে মা সরজু শহরে থাকেন?'

অনেক ভেবে সাহেব সিং বলল, 'হুজুর আমার সব খবরই তো বহুদিন আগেকার। এখন শুনেছি ছোটকুমার ফিরে এসেছেন পড়ালিখা শেষ করে। বড় রামপুরেই থাকেন। বড় কুমারবাহাদুরও থাকেন তাঁর সঙ্গে। সরজুমাই যে কোথায় থাকেন, তা তো জানি না। তবে মনে হয়, তিনি বেঁচে আছেন।'

আবু বলল, 'তাহলে আর কোথাও গিয়ে সময় নষ্ট করে লাভ নেই আব্বা। চল আমরা এখান থেকে সোজা বড় রামপুর যাই। ছোটকুমার এবারে উল্টোপাল্টা বললে, আমরা থানায় যাব।'

রেজ্জাক সাহেব অনেক ভেবে বললেন, 'হনুমানপ্রসাদজী সরজুমাইয়ের দেখভাল করেন, তাহলে তিনি আর কোথায় থাকবেন। বড় রামপুরেরই কোথাও না কোথাও আছেন। আমরা আগে তাঁকে খুঁজে বার করি। তাহলে ছোটকুমার আর কোনো ঝামেলা পাকাতে পারবেন না। সেদিন বললে না, তিনি তাঁর ফুফির ঠিকানা জানেন না। উল্টো প্যাঁচই ঠিক জবাব হবে তাঁর।'

বাবলু বলল, 'হ্যাঁ, সেই ভাল। আর গিরধরপুরে যাব বলে ছবিগুলো আর পোশাকটা তো সঙ্গে রয়েছে। দেখে চিনবেন নিশ্চয়ই!'

আবু বক্কর বলল, 'জলদি গাড়িতে উঠুন আপনারা। সিধা কাঁচাপথে আমি আপনাদের জলদি বড় রামপুরে পৌঁছে দিচ্ছি।'

সাহেব সিংকে অবাক করে দিয়ে সবাই ছুটে গিয়ে গাড়িতে উঠে পড়ল। বড় রামপুরে পৌঁছে ওরা প্রতি মোড়ে গাড়ি থামিয়ে প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, সরজু দেবীর বাড়ি কোনটা! কেউ কোনো উত্তরই দিতে পারল না। শেষে এক বৃদ্ধ বললেন, 'ঠিক করে বলুন তো কাকে খুঁজছেন আপনারা।'

আবু বলল, 'সরজু দেবী। বড় রামপুরের রাজবাড়ির সরজু দেবীর বাড়ি খুঁজছি আমরা। বলতে পারেন কোথায় সেই বাড়ি?'

বৃদ্ধ বললেন, 'সরজু দেবীর নাম শুনেছি। তবে কোথায় থাকেন তিনি তা জানি না। রাজাদের ছোট বাড়িটা ওই সামনের বাঁহাতি গলির শেষ বাড়িটা। ওখানে খোঁজ নিতে পারেন, ওখানে কেউ কেউ থাকেন।'

বৃদ্ধকে ধন্যবাদ জানিয়ে ওরা গাড়ি ছুটিয়ে দিল গলির দিকে। সরু গলি, গাড়ি ঢুকলে পথ বন্ধ হয়ে যাবে। আবু বক্কর তাই গাড়ি গলির মুখে দাঁড় করাল। সবার আগে নামলেন রেজ্জাকসাহেব। তারপর আবু, সব শেষে বাবলু নামল। তার হাতে ছোট্ট স্যুটকেসটা।

রেজ্জাকসাহেব বললেন, 'এসো এসো। দেরি করছ কেন তোমরা? মা কখনও ছেলেকে অস্বীকার করবেন না, বুঝলে বাবুল। আজ তোমার আবার নতুন জন্ম হবে। ডোন্ট বি সেন্টিমেন্টাল, শক্ত থাকবে। শহুরে লেখাপড়া জানা ছেলে তুমি, দেহাতি মাকে মানিয়ে নিতে পারবে তো?' বলে নিজেই পথের মাঝে থমকে দাঁড়ালেন, 'কথাটা ভাল করে ভেবে দেখেছ তো? মনে রাখবে তোমাকে হারানোর ব্যথা উনি সহ্য করেছেন। এখন এই বয়সে পেয়ে

হারানোর ব্যথা কিন্তু ওঁর আর সহ্য হবে না। সে ব্যথা তুমি ওঁকে দিতে পার না।'

করুণভাবে হাসল বাবলু। বলল, 'চাচা, আমি বাংলা ছাড়া আপনাদের কথা তত ভাল করে বলতে পারি না। আপনি আমাকে একটু সাহায্য করবেন, যাতে আমার কথা উনি বুঝতে পারেন ভাল করে।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই করব।' থতমত খেয়ে বললেন রেজ্জাকসাহেব, 'আঃ আবু, রাস্তার মাঝখানে এমনি করে দাঁড়িয়ে পড়লে কেন? চল চল এগোও।'

না এগিয়েই আবু বলল, 'ওই দেখ আব্বা, ওই ওদিকে।'

রেজ্জাকসাহেব আর বাবলু তাকিয়ে দেখল, গলির শেষের বাড়ি থেকে মাথা নিচু করে বার হয়ে আসছেন ছোটকুমার কামতাপ্রসাদ। খুব চিন্তায় মাথা নিচু। কোনো দিকে খেয়াল নেই তাঁর।

রেজ্জাকসাহেব বললেন, 'লুকোও।' বলে প্রায় ছুটে নিজে গিয়ে উঠলেন একটা বাড়ির রকে। আবু উল্টো দিকের একটা বাড়ির খোলা দরজায় ঢুকে পড়ল। বাবলু এদিক ওদিক তাকিয়ে কোথাও লুকোবার জায়গা খুঁজে পেল না। অগত্যা কাউকে চেনে না, এমন একটা ভাব করে এগিয়েই চলল শেষের বাড়িটার দিকে। ছোটকুমারের পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল যখন ও তখনও ছোটকুমারের কোনো দিকেই খেয়াল নেই। ওকে পেরিয়ে গিয়ে একটু থামল বাবলু। সঙ্গে সঙ্গে আবু ছুটে এসে পাশে দাঁড়াল। বলল, 'হুঁশ নেই কুমারের। তার মানে দারুণ ভাবনায় পড়েছেন। দেখ আবার কি প্যাঁচ কষেছেন।'

হাঁপাতে হাঁপাতে রেজ্জাকসাহেব এসে বললেন, 'কুইক। এগোও। কুমার ভীষণ চিন্তিত। দেখ আবার কি করে এসেছেন ওখানে। চল চল।'

সামনে সামান্য একটু বাগান। তারপরে ছোট্ট একতলা বাড়ি। আধুনিকভাবে গড়া। বাড়ির জানালাগুলো সব খোলা। তাতে পর্দা লাগান। ছোট ঢাকা বারান্দার লাগোয়া দরজাটা বন্ধ।

ফটক খুলে ওরা বারান্দায় উঠল। বেশ ইতস্তত করে রেজ্জাকসাহেব দরজায় ধাক্কা দিলেন। একটু পরে দরজা খুলে গেল। সামনে এসে দাঁড়ালেন এক বৃদ্ধ। ষাটের উপরে তাঁর বয়স। চোখে পুরু চশমা। খালি গা। পরনের ধুতি বেশ দামী।

রেজ্জাকসাহেব বললেন, 'আমরা সরজু দেবীর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই। জরুরী কথা আছে। একটু গোপনীয়ও। বলুন, কলকাতা থেকে আসছি।'

বৃদ্ধ তাঁর হাই পাওয়ারের চশমা পরা চোখ তুলে এক এক করে ওদের প্রত্যেককে দেখলেন। তারপর দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'দয়া করে ভিতরে এসে বসুন। আপনাদের মধ্যে কে এসেছেন কলকাতা থেকে?'

আবু বলল, 'ইনি, ইনি এসেছেন কলকাতা থেকে। জরুরী কাজটা এঁরই। আমরা...' কথা ও শেষ করতে পারল না। বৃদ্ধ রেজ্জকসাহেবের সামনে গিয়ে বললেন, 'দারোগাজী, এ বাড়ি আপনাদেরই। আরাম করে বসুন। সরজু আসবে। সরজু আসছে। সরজু এই দিনটির জন্যই তার রামজীর পুজো রোজ করেছে। বাবুল, তোমার মাকে তুমি সামলিও। প্রথম দেখা এতদিন বাদ...যাই আমি ওকে ডেকে আনি গিয়ে।'

রেজ্জাকসাহেব বললেন, 'আপনি কি হনুমানপ্রসাদজী?'

বৃদ্ধ বললেন, 'জী। আমি বাবুলের মামা। কত কোলে করেছি ওকে! আজ আর কোলে করতে পারব না। ও কত বড় হয়ে গেছে!'

'আপনি আমাদের চিনলেন কি করে?'

'ওই যে বললেন কলকাতা থেকে এসেছেন! কামতাপ্রসাদ তো আপনাদের খবর পেয়েই টেলি করে লক্ষ্ণৌ থেকে আমাকে ডেকে আনল। বলল, আমি তো ওদের বহুত ভয় দেখিয়ে ভাগিয়ে দিয়েছি। তবে দারোগা সাহেব যখন মাঝে আছেন, তখন আর ও হারাবে কোথায়। দরকার মতো ফের ধরে আনা যাবে।'

রেজ্জাকসাহেব বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ছোটকুমার তো ওদের হাঁকিয়েই দিয়েছিলেন।'

'না, না।' হাসি মুখে বললেন হনুমানপ্রসাদজী, 'ও খবর শুনে আমার মতোই খুশি হয়েছিল। বিশেষ বাবুল যখন বলল, ভিতর বাড়ির পিপল গাছের কথা। কিন্তু পাকা সবুত কোথায়? তাই ও ঠিক তখনি কি করবে তা ভেবে না পেয়ে ওদের হাঁকিয়ে দিয়েছিল। আপনার নাম ঠিকানা এদিকের সবার জানা। আপনি যখন মাঝে আছেন তখন আর বাবুল হারাবে না, এ বিশ্বাস ওর ছিল। তাই ও অমন করেছে। আমাকে জরুরী তলব দিয়ে এনেছে পরামর্শ করার জন্য।'

বাবলু ব্যস্ত হয়ে বলল, 'পাকা সবুত আমার কাছে আছে মামা। আমার ছেলেবেলার অনেকগুলো ছবি। আর হারিয়ে যাবার সময়কার পোশাক। তাবিজ। সঙ্গেই এনেছি সেগুলো। দেখবেন আপনি? দেখাব?'

'না, তার কোনো দরকার হবে না।' হাসি মুখে বললেন হনুমানপ্রসাদজী, 'বাবুল খোয়া যাবার এক দেড় বছর বাদ কামতা জন্মেছে। ওর তাই পাকা সবুতের প্রয়োজন হয়েছিল, আমার ওসব চাই না। আমি সব প্রমাণ পেয়ে গিয়েছি। পাকা প্রমাণ।'

'কি সেই প্রমাণ? অবাক রেজ্জাকসাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাবুল তো ছেলেবেলায় রোগা পাতলা দুবলা ছিল। সে চেহারা তো ওর আর নেই! এখন তো ও তাজা তাগড়া যোয়ান! তবে কি করে পাকা প্রমাণ পেলেন আপনি?'

'বাবুল, আমার ভাগ্নে, কোলে চড়ে ঘুরত। রোগা পাতলা দুবলা, হুসেন শা পীরের দরগায় মানত করে তাবিজ বাঁধা হয়েছিল গলায়। যোয়ান তাগড়া হয়ে সেই বাবুলই তো ফিরে এসেছে ঘরে। তাকে তো চিনতেই পারব আমি দারোগাজী।'

'ও হো হো, বাবুল নামটা! তাই বলুন!' খুশি হয়ে বললেন রেজ্জাকসাহেব, 'আরে দেখুন তো, আমার ভাবীর যা বুদ্ধি! বাবুল, কি সুন্দর নাম, তা না তাকে বাবলু করা! ভাগ্যিস ও নামটা আমি আর আমার বিবি বজায় রেখেছিলাম! এখন সরজুমাইকে ডাকুন, ছেলেকে বুঝিয়ে দিয়ে আমরা ঘরে ফিরি। যা চলেছে না কদিন! এখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচব।'

'তাকে আমরা এখনও কিচ্ছু বলিনি', বললেন হনুমানপ্রসাদজী, 'ছবিগুলো কি কাছে আছে আপনাদের? দেখাবেন একবার? মানে.....দুঃখীকে আমি আর নতুন করে কোনো দুঃখ দিতে চাই না দারোগাবাবু। ভুল হয়নি আমার .....তবুও.....!'

রেজ্জাকসাহেব বললেন, 'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। কাজ পাকা করাই ভাল। আর যখন প্রমাণ হাতেই রয়েছে।' বলে বাবলুর হাত থেকে স্যুটকেসটা ছিনিয়ে নিয়ে খুলে ধরলেন হনুমানপ্রসাদজীর সামনে।

পোশাকগুলো তুলে নিজের চোখের সামনে ধরলেন হনুমানপ্রসাদজী কিছুক্ষণ। সেগুলো পাশের চেয়ারে নামিয়ে রেখে একটা ছবি তুলে নিলেন। দেখলেন, রাখলেন। অন্যটা তুলে নিলেন। এক এক করে সব কটা ছবি দেখে স্যুটকেসটা পাশে নামিয়ে রাখলেন হনুমানপ্রসাদজী। একটু থামলেন। স্পষ্ট তাকালেন বাবলুর দিকে।

বাবলুর বুকের মধ্যে তখন ঝড় বইছিল। তবে কি আবার কোথাও কোনো গোলমাল হলো। আবার নতুন করে খোঁজা শুরু করতে হবে ওকে! সরজুমাই ওর মা নয়! কেউ নয় এই শান্ত ভদ্র বৃদ্ধ মানুষটি ওর! নবাব কোঠি, বা গিরধরনগরের রাজবাড়িতেই ওর ভাগ্য জড়িয়ে

ছুটে গিয়ে ধরে ফেলল ওর সরজুমাকে।

আছে! খুঁজে যেতে হবে শুধুই ওকে চিরকাল!

আস্তে হনুমানপ্রসাদজী ওর সামনে এসে দাঁড়ালেন। আস্তে দুটো হাত বাড়িয়ে দিলেন ওর দিকে! তারপর হঠাৎ ওকে ওঁর বিশাল বুকের মাঝে টেনে নিলেন। কান্না চাপা গলায় বললেন, 'আয় তোকে কোলে করি আর একবার। কোথায় ছিলি রে বাবুল এত দিন? তোর মা তো কেঁদে কেঁদে অন্ধ হতে বসেছে রে। আয় বাড়ি আয়। আর তোকে কোথাও কাউকে খুঁজতে যেতে হবে না।'

তখনি ছোটকুমার কামতাপ্রসাদ ঘরে ঢুকলেন। ওদের সবাইকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, 'আরে, আপনারা! যাক আমার দুশ্চিন্তা গেল তাহলে! যা ভয় পেয়েছিলেন আপনারা। চাচাজী, আমি তাহলে ফুফিকে খবরটা দিই গিয়ে। ওহো, আপনারা কেউ চলে যাবেন না কিন্তু। আজ গরীবখানায় ভোজন সেরে যেতে হবে আপনাদের। নিরামিষ খানা। কষ্ট হবে আপনাদের।'

রেজ্জাকসাহেব বললেন, 'আরে দূর, কষ্ট হবে কে বলল? যান যান, জলদি সরজুমাইকে খবরটা দিন গিয়ে। আমরা দেখি মা আর ছেলের কান্না! ও হবে বড় আনন্দের জিনিস! হনুমানপ্রসাদজী, আগে মিঠাই আনান, মিঠাই! আজ তো সবার মুখ মিষ্টি করার দিন। ওহো, আবু তুমিই গাড়ি নিয়ে বাজারে যাও। দুশো পাঁচশ যত টাকা আছে তাতে ভাল মিঠাই নিয়ে এসো। আমিই আজ সবার মুখ মিষ্টি করাব। আরে আমি না বাবুলের চাচা! আমার একটা কর্তব্য আছে তো। বসে থেকো না, যাও যাও জলদি।'

ছোট-কুমার কামতাপ্রসাদ হেসে বললেন, 'তাই যাও ভাইসাব। আমার ভাগে কম পড়েনা যেন। যা সেদিন ভয় দেখিয়ে দিয়েছিলাম তোমাদের।'

ভিতর বাড়ির দরজার কাছে একটা ছায়া ভেসে উঠল। মেয়েলী গলায় ডাক শোনা গেল, 'ভাইয়া?'

হনুমানপ্রসাদজী ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সরজু, এসো এসো, ঘরে এসো। এখানে সবাই তোমার আপনজন। এসো, রামজী তোমার সব দুঃখ দূর করে দিয়েছেন সরজু। এসে দেখ কে তোমার জন্য এখানে অপেক্ষা করছে। এসো তুমি।'

ক্লান্ত পায়ে সরজুমাই ঘরে ঢুকলেন। হাত বাড়িয়ে সামনে কিছু আছে কিনা দেখতে দেখতে এগোতে লাগলেন। করুণভাবে বললেন, 'রামজী বড় নিষ্ঠুর ভাইয়া! সে তো আমার বাবুলকে ফেরত দেবে না। আর সব পেয়েও আমার কি হবে ভাইয়া। যে দুঃখী আমি, সেই দুঃখীই থাকব!

আস্তে আস্তে হাত বাড়িয়ে উনি এগিয়ে আসতে গেলেন। ঘরের মধ্যে তখন ভীষণ থমথমে ভাব। কারও কোনো হুঁশ ছিল না। ওঁর চলার পথের সামনে যে একটা ছোট টিপয় ছিল তা কারও নজরে পড়েনি। উনি সে দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিলেন হাত বাড়িয়ে।

অবাক চোখে ওঁর দিকে তাকিয়ে ছিল বাবলু। এই তবে ওর সেই মা! যার খোঁজে ও এতদিন ঘুরে মরেছে! এ তো ওর সেই কলকাতার মায়ের মতোই! না, না, কোথায় যেন ওর ওই নার্গিস মায়ের সঙ্গে অসম্ভব একটা মিল আছে! যে ব্যথা ভুলেছিল ওর নার্গিস মা ওকে পেয়ে, তেমন করে কি সব ব্যথা ও ভুলিয়ে দিতে পারবে ওর এই মায়ের!

এই পৃথিবীর সব দেশের সব মায়েরাই সমান! জাত নেই, ধর্ম নেই তাঁদের! তাঁরা শুধুই মা! চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসে বাবলুর, তখনি ও দেখতে পেল সামনের নিচু ছোট টিপয়-টা। ঠিক ঠোক্কর খাবার আগেই ও প্রায় ছুটে গিয়ে ধরে ফেলল ওর সরজু মাকে। রুদ্ধ গলায় বলল, 'মা, সাবধান, সামনে একটা টেবিল আছে।'

থমকে দাঁড়ালেন সরুজ মা। তারপর তাঁর দুটো হাত আস্তে আস্তে বাবলুর সারা গায়ে মাথায় বোলাতে লাগলেন। কিছুক্ষণ তাঁর মুখে কোনো কথা ছিল না। তারপর শান্ত গলায় জিজ্ঞাসা করলেন, 'তু কৌন রে বেটা, তু কৌন?' ওঁর গলায় যেন কেমন একটা আশার সুর বেজে উঠল!

বাবলুর মনে হলো ও যেন নার্গিস মায়ের গলাই শুনতে পেল! না, না, ঐর ছোঁয়ায় তো ওর সেই কলকাতার মায়ের ভালবাসা! দূর, দূর,

এসব ও কি ভাবছে! সবাই সমান! কোথাও তো কোনো তফাৎ নেই! তবে!

সরজু মা ফের জিজ্ঞাসা করলেন, 'চুপ কিঁউ রে বেটা? তু কৌন রে? তুঝে কাহা ম্যায়নে দেখা? তুঝে ম্যায় পহচানতা? কৌন হো! তু বেটা?'

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বাবলু বলল, 'মা, আমি বাবুল। তোমার বাবুল। এত দিন বাদে তোমার কাছে ফিরে এসেছি।'

দু'হাত দিয়ে ওর সারা গা মাথা বোলাতে থাকলেন সরজু মা। মুখে কোনো কথা বললেন না। খানিক পরে আস্তে আস্তে বাবলুকে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। বললেন, 'দেখতে পাইনা রে বাবুল, আমি আর দেখতে পাই না। দুষ্টু ছেলে, এত দিন কোথায় ছিলি রে? মাকে কি এমন করে কাঁদাতে হয়। আর তো আমাকে ফেলে চলে যাবি না! আর তোকে যেতে দিলে তো।'

হনুমানপ্রসাদজী বললেন, 'সরজু, ও আর হারাবে না। ও তো এখন বড় অপসর। তোমাকে তো ওর সঙ্গে ওর কাছেই এখন থাকতে হবে। সব দুঃখের শেষ হলো তোমার।'

রেজ্জাকসাহেব বললেন, 'হাঁ, হাঁ, সব দুঃখের শেষ। সরজু বহিন, আমি হলাম গিয়ে বাবুলের চাচা। মানে ওর বাবার দোস্ত! আজ আর চোখের জলটল নয়। আজ সবার মুখ মিষ্টি করার দিন। ছোটকুমার আজ খানা না খেয়ে আমরা কেউ উঠছি না এ বাড়ি থেকে। জব্বর ভোজ লাগান। ও হো হো, বহিনজী আমি তো আবার মুসলমান। আপনার তো ঘরে রামজী আছেন, তাহলে কি হবে?'

বাবলুর গায়ে মাথায় তখনও তিনি হাত বুলিয়ে দিচ্ছিলেন। চোখের জল মুছতে চেষ্টাও করলেন না তিনি। বললেন, 'বাবুলের চাচা, সে তো আমার বড়ই আপনজন। আপনজন ঘরে এলে সব দেবতারাই খুশি হন। ভাইয়া মুখ মিষ্টি করার ব্যবস্থা কর। আয় বাবুল, আয় আমার সঙ্গে পাশের ঘরে। তোর সব কথা আমি শুনব। সেখানে থাকবে শুধু মা আর ছেলে। আর কাউকে আমি সেখানে যেতে দেব না। বকব তোকে। আদর করব। কাঁদবও রে। বাবুল, আমি যে তোকে আর কোনোদিনও ভাল করে দেখতে পাব না রে!'

নিজেকে সামলে নিয়ে বাবলু বলল, 'বাজে বোকো না তো মা। তোমাকে কলকাতায় নিয়ে যাব। সেখানে বড় বড় ডাক্তার আছেন। ও চোখ তোমার ঠিক আগের মতোই হয়ে যাবে দেখো। তখন তো দেখতে পাবে আমাকে। দেখবে একটা হত কুচ্ছিৎ তোমার সামনে দাঁড়িয়ে। তখন যেন আবার বল না, এটা কে রে!'

সরজুমাই ভেজা চোখেই হাসলেন। বললেন, 'পাগল কাঁহাকা। চল ওঘরে চল। কত কথা আছে আমার।'

তখনি ঘরে বিরাট চাঙ্গারী নিয়ে ঢুকল আবু। পেছনে দোকানের লোকের হাতেও চাঙ্গারী। সারা ঘর মিষ্টির গন্ধে ভরে গেল। হৈ হৈ করে উঠলেন রেজ্জাকসাহেব। বললেন, 'সরজু বহিন, দাঁড়িয়ে যান একটু। সবার আগে আপনার মুখ মিষ্টি করাব আমরা। তারপর বাবুলের। তারপর তো আছি আমরা সবাই। বাবুল নিয়ে এসো ওঁকে। আবু দেরি কর না, খোলো খোলো কি এনেছ দেখি।'

হনুমানপ্রসাদজী বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সরজু। আগে মুখ মিষ্টি কর। তারপর চোখ মোছ। তোমার কান্নার দিন শেষ হয়েছে। বাবুল এগিয়ে এসো।'

ছোটকুমার বললেন, 'বাঃ সবাইকে ডাকা হচ্ছে, আর আমি বাদ।'

রেজ্জাক সাহেব বললেন, 'আরে যা ভয় পাইয়ে দিয়েছিলেন! আমরাই তো প্রায় বাদ হয়ে যাচ্ছিলাম! আবু দাও, দাও, ওঁর হাত বোঝাই করে মিষ্টি দাও। আজ আনন্দের দিন, আল্লা রসুল, রামজী দুজনেই মুখ তুলে চেয়েছেন। আজ তো শুধুই আনন্দ আর আনন্দ।'

সরজুমাই বাবলুর হাত ধরে এগিয়ে আসতে আসতে বললেন, 'কতকাল বাদে এ বাড়িতে এমন সুখের দিন এলো। বাবুলের চাচাজী তোমরা আমাকে আবার নতুন জীবন দিয়েছ। তোমরা আজ চলে যেও না। আমার সুখের ভাগী হও তোমরাও। দাও আমাকে কি মিষ্টি দেবে দাও। বাবুল তুইও নে মিষ্টি।' সবাই এক সঙ্গে হেসে উঠল আনন্দে।

ছবি : বিজন কর্মকার

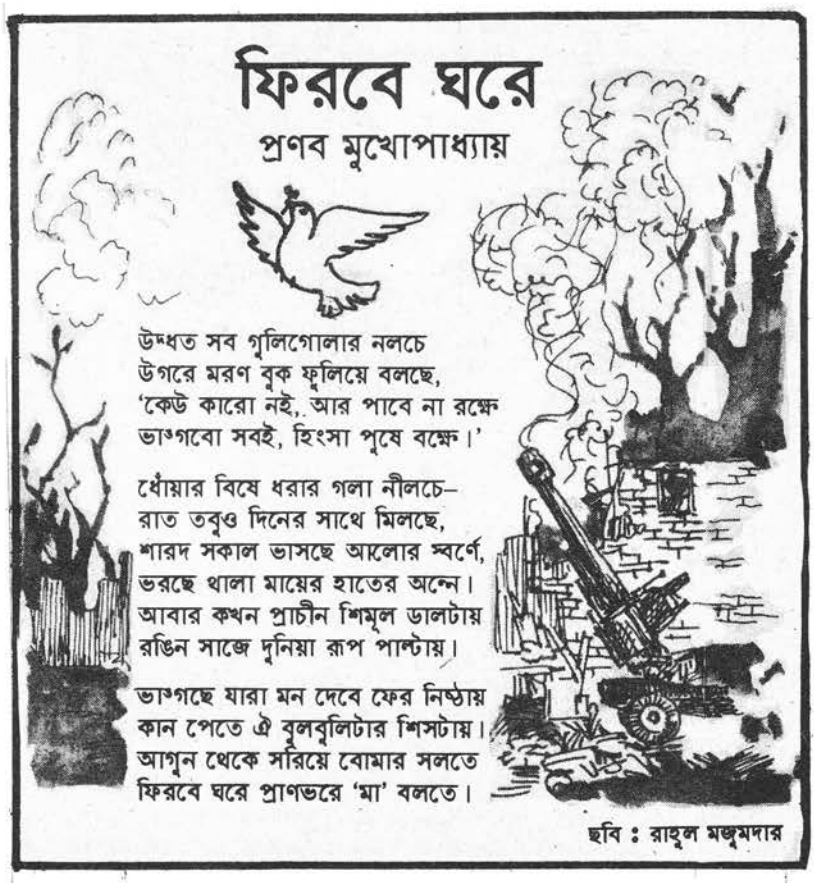


ছবি : রাহুল মজুমদার

# চোরাবালির নকশা

সংকর্ষণ রায়

'এই হলো রূপনগড় শহর।' আমাদের গাইড শ্যামরতন বললে, 'সামনেই রাজাসাহেবের পুরোনো হাবেলি।'

একটা ভগ্নস্তূপের সামনে শ্যামরতনের নির্দেশমত আমার জিপটাকে দাঁড় করিয়েছে ড্রাইভার থানুরাম। শহর থেকে একটু তফাতে একটা নেড়া কোয়ার্টজাইট্ পাহাড়ের নিচে হাবেলিটাকে (প্রাসাদ) এই পাহাড়েরই একটি অংশ বলে মনে হচ্ছে।

'রাজাসাহেব এখানে থাকেন নাকি?' আমি প্রশ্ন করি।

'না।' শ্যামরতন জবাব দিল, 'আগে থাকতেন। এখন থাকেন নতুন হাবেলিতে।'

আমার পাশে বসেছিলেন সার্ভে অব ইন্ডিয়ার অফিসার জগজিৎ সিং, তিনি বললেন, 'রাজাসাহেব না থাকলেও পিটার মূর আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি যাই....'

'না।' খপ্ করে জগজিৎ সিংয়ের একটি হাত ধরে ফেলে শ্যামরতন বললে, 'আপনাকে একা এই হাবেলির মধ্যে ঢুকতে দেওয়া যায় না। রাজাসাহেব সপরিবারে এই হাবেলি ছেড়ে চলে যাওয়ার পর থেকে কেউই থাকে না এখানে, কারুরই থাকার কথা নয়। মূর সাহেব কোন সাহসে এসেছেন এখানে ভেবে পাই নে!'

'রাজাসাহেবের ব্যক্তিগত সংগ্রহ রাজস্থানের মরুভূমির কয়েকটা মানচিত্র এই হাবেলির মধ্যে রাখা আছে। এই নকশাগুলি দেখতে এসেছেন মূর সাহেব। নকশাগুলো আমাকেও দেখাবেন বলে আমাকে আজ এখানে হাজির হতে বলেছেন।'

বলে জগজিৎ সিং জিপ থেকে নেমে হাঁটতে শুরু করেন।

'চলুন আমরা সকলেই যাই আপনার সঙ্গে।' বলে আমিও নেমে পড়ি জিপ থেকে।

পিটার মূর সার্ভে অব ইন্ডিয়ার উপদেষ্টা। সার্ভে অব সউদি অ্যারাবিয়া থেকে এসেছেন রাজস্থানের মরু অঞ্চলের মানচিত্র তৈরি করতে। জগজিৎ সিং এ ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করছেন। সম্প্রতি তাঁরা দুজনে মিলে মানচিত্রে মরুভূমির চোরাবালিগুলোকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করছেন। রাজস্থানের মরুভূমির বালির তলায় খনিজ খুঁজে বেড়ালেও আমি এ কাজে তাঁদের সাহায্য করছি, কারণ এখানে পথে পথে অসংখ্য চোরাবালি, ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

হাবেলিটা রয়েছে শহর থেকে একটু তফাতে। রূপনগড় আসলে রূপনগর। এই রূপনগরের রাজকুমারী চঞ্চলকুমারীর কথা তোমরা নিশ্চয়ই বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ' উপন্যাসে পড়েছ।

নামেই রূপনগর, আসলে কুরূপনগর। এমন বিশ্রী শহর আর কোথাও দেখিনি। পাথরের বাড়িগুলো খুবই ঘিঞ্জিভাবে জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে, একটা বাড়ি থেকে অন্য বাড়িকে তফাৎ করা যাচ্ছে না।

শুধু এই হাবেলিটাই স্বতন্ত্র। একদিকে পাহাড় ও তিন দিকে বালি। এই বালি বালিয়াড়ির আকারে হাবেলিকে পাঁচিলের মতো ঘিরে ফেলেছে। দুর্গের পাঁচিলের মতো এই বালিয়াড়ির মধ্যে কোথাও কোনো ফাঁক নেই, যার মধ্য দিয়ে ভেতরে ঢোকা যায়।

শ্যামরতন গজর গজর করতে করতে বললে, 'মূর সাহেব

অদ্ভুত লোক তো! এমন একটা জায়গায় আপনাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছেন যেখানে জন্তু-জানোয়ারও ঢুকতে পারবে না। এই বালিয়াড়ি ডিঙিয়ে ঐ হাবেলির মধ্যে ঢোকা কি সোজা কথা!'

বালির রাজত্বে জগজিৎ সিং ও আমি দুজনেই কাজ করছি, কাজেই এই বালিয়াড়ি পেরিয়ে যাওয়াটা আমাদের পক্ষে এমন কিছু কঠিন কাজ নয়। মোটামুটি হাবেলির সামনের দিক কোনটা তা ঠিক করে নিয়ে আমরা বালিয়াড়ি ডিঙিয়ে যেতে উদ্যত হই।

এক পা এক পা করে বালিয়াড়ির দিকে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, এমন সময় জগজিৎ সিং আমার হাত ধরে বললেন, যাবেন না ভাইসাহেব, এই বালিয়াড়ি চোরাবালি।'

'কি করে বুঝলেন?' আমি প্রশ্ন করি।

'বালির চেহারা দেখে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে মূর সাহেব এই চোরাবালি ডিঙিয়ে হাবেলির মধ্যে ঢুকলেন কি করে!'

'বোধ হয় ঢোকেননি। এই চোরাবালি ডিঙিয়ে ভেতরে ঢোকা কি সম্ভব?'

'কিন্তু গত দুদিন ধরে তিনি এই হাবেলির মধ্যেই আছেন। হাবেলির মধ্যে অনেক পুরনো নকশা ও মানচিত্র পেয়েছেন, সেগুলি পরীক্ষা করছেন। ওগুলো আমাকে দেখাবেন বলেই তিনি আমাকে যেতে বলেছেন ওখানে....'

'অসম্ভব।' শ্যামরতন বললে, 'এই বালিয়াড়ি যদি চোরাবালি হয়, তার ওপর দিয়ে যেতে পারবেন না আপনি।'

'মূর সাহেব যদি গিয়ে থাকেন, আমিও পারব যেতে।' জগজিৎ সিং বললেন, 'হয়তো এই বালিয়াড়ির সবটাই চোরাবালি নয়....'

এমন সময় ঘূর্ণিঝড় ওঠে, মরুভূমির বালি মাটি ছেড়ে আকাশে ওড়ে, আকাশ ও মাটির মাঝখানকার শূন্যস্থান বালি দিয়ে ভরে যায়। খানিকক্ষণ বাদে ঝড় থামে, বালি থিতিয়ে পড়ে, কিন্তু জগজিৎ সিংকে দেখতে পাই না।

'কোথায় সিংজী?' আমি উত্তেজিত স্বরে বলে উঠি, 'ঝড়ে উড়ে গেলেন না উবে গেলেন!'

'দেখছেন তো স্যার, কি রকম একটা সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটে গেল!' আর্তস্বরে বলে উঠল শ্যামরতন, 'মনে হচ্ছে হাবেলির মধ্য থেকে কেউ এসে ওঁকে হাবেলির মধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছে....'

'তা হলে চলো হাবেলির মধ্যে ঢুকে ওঁকে উদ্ধার করার চেষ্টা করি আমরা।' আমি বললাম।

'আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে! চোরাবালি ডিঙিয়ে হাবেলির মধ্যে ঢোকার কথা ভাবছেন কি করে!'

'সিংজী তো ঢুকেছেন....'

'চোরাবালি ডিঙিয়ে যেতে পারে এমন কেউ এসে সিংজীকে কাঁধে তুলে নিয়ে গিয়েছে বলে মনে হচ্ছে। তার পাল্লায় পড়তে আমি চাই নে....'

বলতে বলতে হনহনিয়ে হাঁটতে শুরু করে শ্যামরতন।

'ও কি শ্যামরতন, চলে যাচ্ছ কেন!' কাতর স্বরে বলে উঠলাম আমি, 'সিংজীকে উদ্ধার করার ব্যবস্থা করতে হবে না!'

'আমাদের সাধ্য কি!' সড়কের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা আমার জিপ লক্ষ্য করে হাঁটতে হাঁটতে শ্যামরতন বললে, 'যিনি ওঁকে নিয়ে গিয়েছেন, তিনিই ওঁকে ফেরত দিয়ে যাবেন!'

অগত্যা শ্যামরতনকে অনুসরণ করে জিপে চেপে ফিরে এলাম আমার ক্যাম্পে। রূপনগর শহর থেকে একটু দূরে একটি বাগানবাড়ির বাগানের মধ্যে ক্যাম্প করে আছি আমরা। মরুভূমির মধ্যে ছোটখাট মরূদ্যান এটা। বাগানে অজস্র গাছপালা, ফুল-ফলের সমারোহ। একটা বাঁধানো কুয়ো আছে

এমন সময় জগজিৎ সিং এসে হাজির হলেন।

বাগানের মাঝখানে, তাতে কখনো জলের অভাব ঘটে না। এই তাঁবুর সামনে পাশাপাশি তাঁবু খাটিয়ে আছি আমি ও জগজিৎ সিং। পিটার মূর থাকেন সম্বরের বিশ্রামগৃহে।

আমি আমার তাঁবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই জগজিৎ সিংয়ের তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল তাঁর চাকর ইউনুস। তার প্রশ্নের উত্তরে আমি কিছু বলার আগে শ্যামরতন বললে, 'তোমার সাহেব রূপনগড়ের হাবেলির মধ্যে আটকা পড়েছেন, আল্লার কাছে দোয়া মাংগো ভাইজান...'

'বলো কি!' ইউনুস প্রায় চিৎকার করে ওঠে।

আমার তাঁবুর বসার ঘরে আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন স্থানীয় থানার দারোগা মোহনলাল, তিনি জানতে চাইলেন পিটার মূরের সংগে আমাদের দেখা হয়েছে কিনা।

'আমার সংগে দেখা হয়নি।' আমি জবাব দিলাম, 'তবে আমার বন্ধু জগজিৎ সিংয়ের সংগে দেখা হয়ে থাকতে পারে। মূর সাহেব তাঁকে আজ রূপনগরের হাবেলিতে গিয়ে তাঁর সংগে দেখা করতে বলেছিলেন।'

'কবে বলেছিলেন?' মোহনলাল প্রশ্ন করেন।

'গতকাল। জগজিৎ সিংয়ের সংগে তাঁর তাঁবুতে এসে দেখা করেছিলেন তিনি।'

'আপনি দেখেছিলেন তাঁকে?'

'না। আমার কাছে আসেননি তিনি, জগজিৎ সিংও তাঁকে নিয়ে আসেননি আমার কাছে।'

'আপনি কি শিওর যে তিনি নিজে জগজিৎ সিংয়ের কাছে এসেছিলেন গতকাল?'

'নিশ্চয়ই, জগজিৎ নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলেননি।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বিস্ফারিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে মোহনলাল বললেন, 'অথচ আমাদের কাছে রিপোর্ট এসেছে যে পিটার মূর সাত দিন আগে থেকে নিরুদ্দেশ। সম্বরের ডাকবাংলোর চৌকিদার আমাদের জানিয়েছে যে সাত দিন আগে ভোরবেলায় সেই যে ডাকবাংলো থেকে তিনি বেরিয়ে গিয়েছেন, আর ফিরে আসেননি....'

এমন সময় জগজিৎ সিং এসে হাজির হলেন। নির্বাক বিস্ময়ে কয়েক মুহূর্ত তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে আমি বললাম, 'হাবেলির মধ্যে ঢুকলেন কি করে, সিংজী? ওখান থেকে বেরিয়ে এলেনই বা কি করে?'

'আমার হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন পিটার মূর।' জগজিৎ সিং বললেন, 'ওখান থেকে বেরও করে নিয়ে এসেছেন তিনি....'

মোহনলাল বললেন, 'আপনাকে হাবেলির মধ্য থেকে বের করে নিয়ে এসে মূর সাহেব কি আবার হাবেলির মধ্যে ঢুকে পড়েছেন?'

'তা বলতে পারব না।' জগজিৎ সিং জবাব দিলেন, 'হাবেলি থেকে আমাকে নিয়ে বেরিয়ে আসার পর তিনি যে কোথায় গেলেন তা বলতে পারব না। আমার মনে হলো তিনি যেন বাতাসে মিলিয়ে গেলেন....'

'বাতাসে কোনো মানুষ মিলিয়ে যেতে পারে না, কাছাকাছি কোথাও আছেন নিশ্চয়ই, যাই ওঁকে ধরে ফেলার চেষ্টা করি....'

'উনি যদি আবার হাবেলির মধ্যে ঢুকে গিয়ে থাকেন, ওঁকে ধরতে পারবেন না।' জগজিৎ সিং বললেন, 'কারণ চোরাবালি ডিঙিয়ে হাবেলির মধ্যে ঢোকা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়।'

'হাবেলির চারপাশে এই চোরাবালিটা সত্যিই একটা আশ্চর্য ব্যাপার।' আমি বললাম, 'এটা হলো কি করে?'

'এটা হলো কি করে তা বোঝার চেষ্টা করছিলেন মূর সাহেব।' জগজিৎ সিং বললেন, 'এখন থেকে এ নিয়ে আমিই সমীক্ষা চালাব। মূর সাহেব এসব কাজের দায়িত্ব আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন।'

'তাঁর কাজের দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়ার জন্যই কি তিনি আপনাকে ঐ হাবেলির মধ্যে নিয়ে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'হাবেলির মধ্যে পাওয়া নকশাগুলো আপনাকে দেখাননি?'

'দেখিয়েছেন বই কি! দেখানো শুধু নয়, ওগুলোর দায়িত্বও দিয়েছেন আমাকে।'

'হাবেলির মধ্যে নকশাগুলির হদিস তিনি পেলেন কি করে?'

'রাজাসাহেবের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। তাঁর নতুন হাবেলিতে এই নকশাগুলো নিয়ে যাননি তিনি, কারণ এগুলো সম্বন্ধে তাঁর কোনো আগ্রহ ছিল না। তাঁর ঠাকুর্দার আমলের এই নকশাগুলো তিনি পুরনো হাবেলির আলমারির মধ্যে রেখে গিয়েছিলেন। মূর সাহেব আগ্রহ প্রকাশ করলে ঐ আলমারির চাবি তাঁকে দিয়ে ওগুলোকে উদ্ধার করতে বলেছিলেন।'

'ওগুলো উদ্ধার করেও মূর সাহেব আপনাকে দিয়ে দিলেন কেন?'

'তাঁর যাবতীয় কাজের দায়িত্ব আমাকে বুঝিয়ে দেওয়ার পর নকশাগুলো নিজের কাছে রাখার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেননি। ওগুলো আমাকে দিয়ে থর মরুভূমির মধ্যে যাবতীয় চোরাবালি চিনে নিয়ে মানচিত্রে চিহ্নিত করতে বললেন।'

'কিন্তু কেন? হঠাৎ এইসব কাজের দায়িত্ব আপনার ওপরে চাপিয়ে দিলেন কেন?'

আমার এই প্রশ্নের উত্তরে জগজিৎ সিং কিছু বলার আগে আমাদের ক্যাম্পের সামনে আর একটি পুলিশের গাড়ি এসে থামল। সেই গাড়ি থেকে নামলেন মোহনলালের সহকারী হীরালাল। উত্তেজিতভাবে আমার তাঁবুর মধ্যে ঢুকে মোহনলালের উদ্দেশে রুদ্ধশ্বাসে বললেন, 'মূর সাহেবের হদিস মিলেছে স্যার, সম্বর হ্রদের ধারে চোরাবালির মধ্যে চাপা-পড়া তাঁর মৃতদেহ ঘণ্টা দুয়েক আগে উদ্ধার করেছি তাঁর এ্যালসেশিয়ান কুকুরটির সাহায্যে। আমাদের ডাক্তার পরীক্ষা করে বলেছেন যে সপ্তাহখানেক আগে চোরাবালির মধ্যে ডুবে মরেছেন তিনি।'

'কিন্তু একটু আগেই তো তাঁর সংগে দেখা হলো আমার!' কম্পিত স্বরে বললেন জগজিৎ সিং, 'কাজ বুঝিয়ে দিয়ে নিজের হাতে এই নকশাগুলো দিলেন আমাকে....'

বলে এক বান্ডিল মানচিত্র আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন জগজিৎ সিং।

ছবি: বিজন কর্মকার

# জয় পরাজয়

## মহাশ্বেতা দেবী

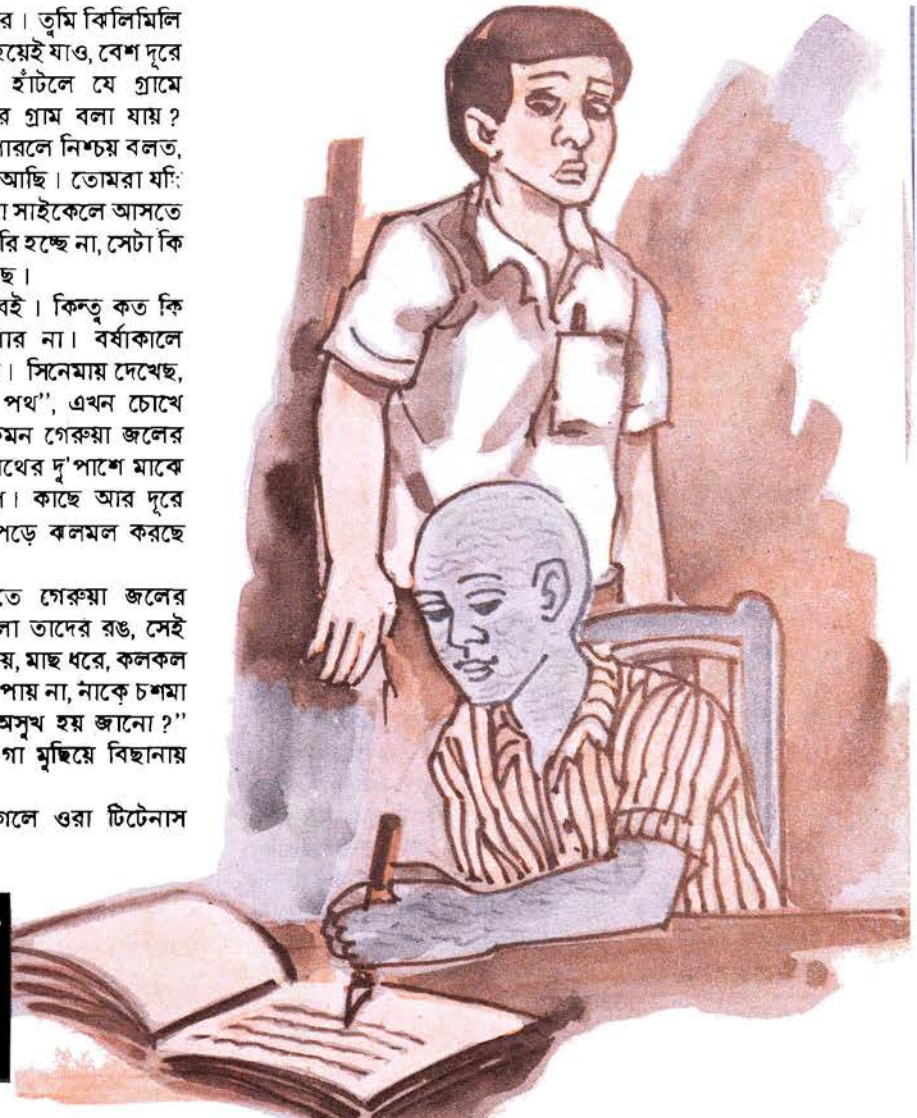

গ্রামটা বেশ দূরেই বলতে পার। তুমি ঝিলিমিলি দিয়েই যাও বা মানবাজার হয়েই যাও, বেশ দূরে গ্রাম। আঠারো কি. মি. হাঁটলে যে গ্রামে পৌঁছনো যায়, তেমন গ্রামকে কি কাছের গ্রাম বলা যায়? গ্রামের মাটি তো কথা বলতে পারে না, পারলে নিশ্চয় বলত, আমি তো বাপু যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি। তোমরা যদি কাছেই আসতে চাও, এলেই পার। হেঁটে বা সাইকেলে আসতে বেজায় কষ্ট, তা আমি জানি। রাস্তাটা তৈরি হচ্ছে না, সেটা কি আমার দোষ? আমিও আছি, গ্রামও আছে।

সেখানে পৌঁছতে হলে পথের কষ্ট খুবই। কিন্তু কত কি দেখার আছে তা তোমরা ভাবতেও পার না। বর্ষাকালে ভিজতে ভিজতে যাওয়াই সবচেয়ে ভালো। সিনেমায় দেখেছ, গান শুনেছ "গ্রামছাড়া ওই রাঙামাটির পথ", এখন চোখে দেখবে দিব্যি চওড়া রাঙামাটির পথে কেমন গেরুয়া জলের ছোট ছোট ধারা বয়ে চলেছে। দেখবে পথের দু'পাশে মাঝে মাঝে কালো পাথরের বড় ও ছোট স্তূপ। কাছে আর দূরে দেখবে শাল পলাশের মিতালি। জল পড়ে ঝলমল করছে সবুজ পাতা।

আর তারপর দেখবে কুমারী নদীতে গেরুয়া জলের মাতামাতি। ছোট ছোট ছেলেমেয়ে, কালো তাদের রঙ, সেই জলে কি মাতন জুড়েছে। ওরা জলে ঝাঁপায়, মাছ ধরে, কলকল করে হাসে, ওদের মা কক্ষণো ভীষণ ভয় পায় না, নাকে চশমা এঁটে বলে না, "দূষিত জলে কতরকম অসুখ হয় জানো?" তারপর ওদের গরমজলে স্নান করিয়ে গা মুছিয়ে বিছানায় শুইয়ে ডাক্তারকে টেলিফোন করে না।

অবশ্য ধারাল পাথরে পা কেটে গেলে ওরা টিটেনাস টকসয়েডও নেয় না। কুমারী নদী যখন ক্ষেপে ওঠে, ওই ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ওদের মোষের পিঠে চেপে মোষের গলা জড়িয়ে নদী পার হয়।

কুমারী নদীর সাঁকো পেরোবে তোমরা। তারপর দিব্যি বড়সড় বটগাছের নিচে বনমালীর দোকানে বসে গরম গরম বেজায় মিষ্টি চা, বেসনের ফুলুরি আর মচমচে মুড়ি খেয়ে নেবে।

আর কি! কয়েক কিলোমিটার হাঁটা। পৌঁছে যাবে জোড়ডোবা গ্রামে।

দেখবে কি বড় গ্রাম, কি সুন্দর গ্রাম! জোড়ডোবার ঠিক পরেই হচ্ছে আরো বড় শালতোড়িয়া গ্রাম। শালতোড়িয়াতে সবচেয়ে বেশী চোখে পড়বে মস্ত বড় "শালতোড়িয়া আদর্শ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়"। কৃষ্ণচূড়া আর পলাশ গাছে স্কুলটি ঘেরা। স্কুলের পাশে মস্ত খেলার মাঠ। শালতোড়িয়াতে দোকান, ছোট বাজার, ছোট্ট একটা পোস্টাপিস, সব আছে। সাঁওতালদের ঝকঝকে সুন্দর বাড়িগুলি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যাবে। দেখতে পাবে একটা জায়গায় প্রকৃতির কোন খেয়ালে বট-অশথ আর শিমুল গাছ একসঙ্গে জড়িয়ে উঠেছে।

এক জায়গায় দেখবে একজন বেজায় বুড়ো সাঁওতাল বসে শনের দড়ি পাকাচ্ছে। ওর ভুরু, বুকের লোম, মাথার ছোট ছোট চুল সবই সাদা। যদি কাউকে জিগ্যেস কর, সে বলবে, উনি হচ্ছেন ব্যাঘ্রবীর ধানু মাণ্ডি।

বছর পঞ্চাশ আগে, জোড়ডোবার চারপাশে যখন অনেক জঙ্গল ছিল, তখন চিতাবাঘ ঢুকেছিল মাহিতী বাবুদের গোয়ালে। ধানু মাণ্ডি সেদিন বাঘটাকে মেরেছিল। ধানু ধস্তাধস্তি করে দায়ের কোপেই বাঘ মারে। বাঘটাকে আর ধানুকে একটা ছইখোলা গরুর গাড়িতে চাপিয়ে ছেলেরা গাড়ি টেনে বান্দোয়ান থানায় নিয়ে যায়। থানাবাবু ধানুকে পাঁচ টাকা পুরস্কার দিয়েছিলেন। আর মাহিতীবাবু ওই তিনগাছের তলায় ধানুকে বসিয়ে সভা করেছিল। ধানুর নাম দিয়েছিল "ব্যাঘ্রবীর ধানু মাণ্ডি"।

সেই মাহিতীবাবু খুব ভালো লোক ছিল। ধানুকে দশটা

টাকা আর নতুন কাপড় দিয়েছিল। এই ইস্কুলটা মাহিতীবাবুই পত্তন করে। ছোট্ট পাঠশালা ছিল সেটা। সেই "আদর্শ পাঠশালা" বড় হতে হতে আজ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় হয়েছে। তবে মাহিতীবাবুদের সেই ধানের গোলা, গরুর গোহাল, মাছের পুকুর, কাঁঠাল বাগান, কিছুই নেই। মাহিতীবাবু মরে যেতে ছেলেরা সব বেচে দিয়ে শহরে চলে যায়। ওর এক ভাইয়ের নাতির ছোট একতলা বাড়ি আছে বটে। সেই নাতি রাজীব মাহিতী শিরিসবেড়া প্রাথমিক স্কুলে মাস্টার। তবু ধানু মান্ডি বলে, মাহিতী বাড়ি হয় ওটা।

ওই বাড়ির সামনে যদি স্কুলের সময়ে দাঁড়াও, তুমি দুটি ছেলেকে দেখতে পাবে। একটি ছেলে অরুণ, সে দেখতে ঝকঝকে, ক্লাসের ফার্স্ট বয়, ফুলপ্যান্ট আর বুশশার্ট পরে, বই নিয়ে মাথা তুলে বেরিয়ে আসে।

দেখবে একটা তিন চাকার ভ্যান রিকশা। রিকশাচালক মোহন বাড়িতে ঢুকে যাবে। একটু পরে ও ঠেলে ঠেলে হাঁটিয়ে নিয়ে আসবে বরুণকে। বরুণকে দেখে কেউ বলবে না ও অরুণের যমজ ভাই।

মুখ, হাত, সব জায়গার চামড়া কোঁচকানো, সাদাটে, লোমশূন্য। মাথার চুল একেবারে নেই। মাথার চামড়াও কোঁচকানো। দেখলে যেন মনে হয় অন্য গ্রহের প্রাণী। সবচেয়ে বিকৃত ওর দুটি হাত ও দুটো পায়ের পাতা। হাতের সব আঙুলগুলো জোড়া, পায়ের পাতার আঙুলও জোড়া।

বরুণ জন্মেইছিল ওই বিকৃতি নিয়ে। হাত ও পায়ের আঙুল ওর জোড়াই ছিল। অরুণ সুস্থ, সুন্দর। বরুণ ওইরকম। বছর কয়েক বয়সে বরুণদের মামা, যে জামসেদপুরে কাজ করত, সে ওখানকার হাসপাতালে ওকে কয়েকবার অপারেশন করায়। কিন্তু অপারেশন করে আঙুল ফাঁক করে দেবার পরেও আবার জুড়েই গেল। ফলে হাত-পা স্বাভাবিক হলো না। আর পা ঘষে ঘষে চলত বলে, নিজেও মাঝে মাঝে টলে পড়ে যেত। ছোট বয়সে সে ভাবেই ও জ্বলন্ত ল্যাম্পের ওপর পড়ে গিয়ে পুড়েও গেল খুব।

বরুণের বাবার কি দুশ্চিন্তা, মায়ের কি দুঃখ তাই ভাবো। কিন্তু বরুণ ওই হাত জড়ো করেই চামচ চেপে ধরে ভাত খেত। একদিন বরুণের বাবা ওকে নিয়ে কলকাতার হাসপাতালেও গেলেন। ফিরলেন ওকে নিয়ে সাত দিন বাদে।

বরুণের মা বললেন, কিছু ব্যবস্থা হবে?

–ব্যবস্থা করে ফেলেছি।

–কি করলে?

–কাল দেখতে পাবে। আজ ওর নামে একটু পুজো পাঠিয়ে দাও তো মন্দিরে।

সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরে পুজো গেল। রাতে বরুণের বাবা বললেন, কাল ওকে ভোরে তৈরি করে দিও।

–কেন গো?

–ও স্কুলে যাবে।

–স্কুলে যাবে! বরুণ!

বরুণের বাবা আস্তে আস্তে বললেন, কলকাতায় ওরা বলল, ওকে বিদেশে নিয়ে যান। সেখানে এর অপারেশনও হবে, প্লাস্টিক সার্জারি করলে পোড়ার চিহ্ন মিলিয়ে যাবে। জার্মানী, আমেরিকা, ইংল্যান্ড!

–সে কত টাকা?

–আর জানতে চাইনি। কয়েক লক্ষই হবে।

মা নিশ্বাস ফেললেন।

–আমি ওকে চিড়িয়াখানা দেখিয়েছি, তারামন্ডল, জাদুঘর, নেতাজী স্টেডিয়াম, সল্টলেক স্টেডিয়াম, বড় পোস্টাপিস! হোটেলে ভাত খেয়েছি, মেট্রো রেলে চড়েছি, সব ও বলবে।

–তাই তো বলছে সমানে।

–ভেবে দেখলাম, স্বপ্ন দেখে তো লাভ নেই। ওকে থাকতে হবে এখানে, পড়তে হবে সকলের সঙ্গে, ওকে প্রতিবন্ধী বলে আলাদা করে রেখে দিলে তো হবে না। অরুণের মতো ও হবে না, কিন্তু ও নিজের মতোই হোক।

–সত্যি, ওকে নিয়ে কি হবে?

বাবা একটু হেসে বললেন, গোটা গোটা হাত-পা নিয়েই কি সবাই মানুষ হয়, না হতে পারে? ওর শরীরটা প্রতিবন্ধী, মনটা তো নয়। স্কুলে যাবে, অরুণের সঙ্গেই যাবে।

বরুণ স্কুলে গিয়ে ভর্তি হয়েছিল তৃতীয় শ্রেণীতে। অরুণ তখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে। হেডমাস্টার বললেন, রাজীব, ও পারবে তো?

–পারবে। শুধু লিখতে একটু সময় দেবেন। দু'হাতে কলম চেপে ধরে ঠেলে ঠেলে লেখে তো, সময় লাগে। ওকেই জিগ্যেস করে দেখুন।

বরুণ বলল, পারব সার, সব পারব। আমি তো বাড়িতে মা-বাবার কাছে পড়ি।

হেডমাস্টার বললেন, নিশ্চয় পারবে।

–সমান মেঝেতে চলার সময়ে ও পা ঘষে হাঁটে। বগলের নিচে একটু ধরলে....

বরুণ বলল, আমি নিজেই হাঁটতে পারব।

হেডমাস্টার অবাক হয়ে বললেন, নিশ্চয় পারবে। অরুণের ভাই, তুমিও পড়বে.....

বরুণের গলা খুশিতে ভরে গেল, ওর মতন হব কেমন করে? ও সবতাতে ভালো। বাবা বলেন, আমি আমার মতো পারব।

রাতে খেতে বসে অরুণ বলল, আমি কিন্তু ওকে নিয়ে যেতে পারব না।

–কেন পারবি না?

–পারব না, ব্যস্।

বাবা বললেন, সে আমি জানি। ওকে মোহনই নিয়ে যাবে, নিয়ে আসবে। কিন্তু অরুণ! মানুষ হতে শেখ্, দেহটা নিঁখুত হলেই সবাই মানুষ হয় না, মনে রাখিস।

ছোটবেলা একরকম গেল। কিন্তু বরুণও যখন পঞ্চম শ্রেণীতে উঠে গেল, তখন অরুণের মনোভাবটা বেশ বোঝা যেতে থাকল।

অরুণ সপ্তম থেকে অষ্টম শ্রেণীতে উঠল, তিনটে বিষয়ে প্রথম, ক্লাসেও প্রথম হয়ে।

বরুণ কোনোমতে চল্লিশের ঘরে নম্বর তুলে পাস।

বাড়িতে বিশেষ খাওয়া-দাওয়াটা কিন্তু দুজনের জন্যেই। বরুণ পাস করেছে এটাই যেন মস্ত খবর। অরুণ? ও তো প্রথম হয় প্রতিবারই। বাবা বরুণকে "চাঁদের পাহাড়" বইটাও দিলেন।

অরুণ ওর প্রাইজগুলো সাজিয়ে রাখছিল। অরুণের তো একটা আলাদা ঘরই আছে। বরুণ ওর বাবা-মার ঘরের একপাশে একটা আলাদা খাটে শোয়।

বরুণ বলল, তোর প্রাইজের পাশে আমার প্রাইজটা রাখবি? গল্পের বই তো?

অরুণ বলল, রাখতে পারি, তবে প্রাইজ বলিস না। প্রাইজ পেতে হলে কম্পিট করতে হয়।

বরুণ কিন্তু হেসে ফেলল।

–কম্পিট করব? আমি?

–কেন, তোর বুদ্ধি নেই?

–লিখতে সময় লাগে না?

–বেশি সময় চাইলেই পারিস।

–না। সবাই যেমন সময়ে লেখে, তার মধ্যেই যা হয়।

অঙ্ক সার অরুণকে বললেন, বরুণ অঙ্কে কত পেয়েছে জান?

–চল্লিশ।

–উত্তর লিখেছিল পঁয়তাল্লিশ নম্বরের, তাই পেয়েছে। ব্যাপারটা বুঝলে?

–কি, সার?

–একশো উত্তর লিখলে ও অনেক বেশি পাবে।

–একশো আনসার করতে ওর তিন ঘণ্টা লাগবে।

–জানি। খুব, খুব দুর্ভাগা ছেলে। তুমি পার না, ওর হাত দুটোকে গাইড করতে?

–আমি, সার?

–তোমারই ভাই তো!

–আমার সময় কোথায়? আর মা-বাবা ওর জন্যে সবসময় স্পেশাল কেয়ার নেন।

অঙ্ক সার চুপ করে গেলেন। তিনি কদমকুড়ার ছেলে। রাজীবদের অনেক কাল চেনেন। ওঁর মনে হলো, অরুণের মনে কি কোথাও ঈর্ষা আছে ভাইয়ের বিষয়ে?

এ কথা ওর মা-বাবারও মনে হয়। ছোটবেলার ছবিটা দেখ, দুটি ভাই একেবারে একরকম। আর আজকে? বরুণকে একটু বেশি যত্ন করতে হয়েছে, তার দিকে বেশি মন দিতে হয়েছে, কেন হয়েছে তা কেন অরুণ বোঝে না?

বরুণের মনে কিন্তু ভাইয়ের জন্যে গর্ব, শুধুই গর্ব। অরুণ সপ্রতিভ, পড়া-খেলা-আঁকা, সবেতে প্রথম হয়। অভিনয় এমন করে যে বলার নয়।

বরুণ কিছু না পারলে কি হয়, অরুণ তো পারে।

মাধ্যমিকে অরুণ চারটে লেটার পেল, খুব ভাল রেজাল্ট করল। হেডমাস্টার বললেন, উচ্চমাধ্যমিকটা ওকে পুরুলিয়ায় পড়ান। আমাদের এখানে তেমন পড়ানো হবে না। আসলে ওকে সুযোগ দিলে ও অনেক ওপরে যাবে।

অরুণ বলল, না সার। আমি এখানেই পড়ব। আপনি যদি কেমিস্ট্রিতে সাহায্য করেন, আমি এই স্কুল থেকেই ভাল রেজাল্ট করে দেখিয়ে দেব।

–তারপরে কি করবে?

–দেখি, রেজাল্ট কি হয়।

–বরুণকে তো একটু বোঝানো দরকার।

বাবা বললেন, কেন?

আমার সময় কোথায়?

–ও বেশি সময় চাইলে তা পাবে। কিন্তু কিছুতে রাজী করানো যাচ্ছে না ওকে।

অরুণ অনেকদিন পরে ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলল।

–তুই টাইম নিবি না কেন?

–না, বিশেষ সুবিধা চাইব না।

–তুই তো হেল্‌পারও পেতে পারিস।

–দূর! হেল্‌পার নেয় অন্ধরা। আমি, আমি তো দেখতে পাই।

–লিখতে তো স্পীড পাস না।

বরুণ বেশ গম্ভীর গলায় জোর দিয়ে বলল, যা স্পীড আছে, তাতে যা হবে তা হবে। তুই ভাবিস না।

–কি হবে "পি" পেয়ে পাস করে?

বরুণ হাসল।

–"পি" পেয়ে তো কত ছেলেই পাস করে। আমাকে দিয়ে তো কিছু হবে না। তুই ভাল পাস করবি, অনেক ওপরে যাবি। বাবা-মার দুঃখ ঘুচবে।

–থাক, জ্ঞান দিতে হবে না। ওটা কি খাতা? এত বড় খাতা?

–আমার লেখাই যে বড় বড়।

–তোকে ইংরিজিতে হেল্‌প করব?

বরুণ যেন চমকে উঠল ভয়ে।

–না না, কোনো হেল্‌প নয়। আমি নিজে যা পারব....

–তোর কি হেল্‌প নিলে মাথা কাটা যাবে? এ রকম জেদ কেন করিস, বুঝি না।

–জেদ! হয়তো তাই। কিন্তু খুব জেদ কি করি? স্কুলে যেতে দেখ্, মোহনের সাহায্য তো নিতেই হয়। আর, প্রতিবন্ধী বলে সময় কতটা পাব? একশো উত্তর করতে আমার দু'ঘন্টা পনেরো মিনিট বোশ দরকার, স্পীড নেই। তেমন তো দেওয়ার নিয়ম নেই।

–স্পীড বাড়াতে পারতিস।

–পারা যায় না। পুশ করে লিখি, হাতে ব্যথা করে। তুই আমাকে ইংরিজিতে হেল্প করবি বললি। প্লীজ বোঝ্, আমার বুঝতে কোনো অসুবিধে হয় না। লিখতে কষ্ট, হাতের লেখা অপাঠ্য, কিন্তু উত্তর খারাপ দিই না।

–সময় নেবার রাইট তো আছে তোর।

–মোহনের তো রাইট আছে ব্যাংক লোন পঁচিশ হাজার টাকা পাবার, ধানু দাদার তো রাইট আছে কৃষিঋণ পাবার, ওরা পায়নি। ওদের হয়ে কে বলবে বল্? আমি অবশ্য সময় পেতেই পারি, কিন্তু নেব না।

–কিন্তু কেন?

–ধরে নে জেদ। আর কিছু না থাকুক, জেদটা থাকুক। আমি যা করব, তাতে এই রেজাল্টেই চলে যাবে।

অরুণ যেন অবাক! এই বরুণ কি সেই বরুণ, যার কদর্য চেহারা আর বিকৃত হাঁটাচলা দেখে ওর চিরকাল মনে হয়েছে, মা-বাবা ওকে বাড়ির ভেতরে রাখলেই পারত?

এ কি সেই বরুণ? যাকে নিয়ে মা-বাবা বরাবর বাড়াবাড়ি করেছেন বলে ওর মনে একটা অদ্ভুত, দুর্বোধ্য আক্রোশ ছিল? যে জন্যে ও ঠিকই করেছে, উচ্চমাধ্যমিক পাস করে যে ভাবেই হোক বেরিয়ে যাবে গ্রাম থেকে, জেলা থেকে। অন্যরকম কেরিয়ার করবে, শালতোড়িয়ার এই বন্ধ জীবনে ফিরবে না।

অরুণ বলল, খুব আস্তে বলল, জেদটা কেন?

বরুণ হাসল। বলল, আমি নিজেকে প্রতিবন্ধী মনে করি না, আমার মনটা তো প্রতিবন্ধী নয়।

–যাক গে, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

মাধ্যমিক পরীক্ষা এসে গেল।

সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে পুজো গেল। সকালে বাবা আর মোহন ওকে নিয়ে গেলেন মানমোহিনী বিদ্যালয়ে পরীক্ষা দেয়াতে। বরুণ পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে, মার চোখে জল এসে গেল।

মানমোহিনীতে অরুণ বরুণের মায়ের এক মাসতুত দাদা সারের ডীলার। ওঁর বাড়িতে পরীক্ষার দিন ক'টা থাকবে বরুণ। কাল থেকে মোহন এ বাড়িতে থেকে রান্না করবে। বরুণের মা বাড়ি গুছিয়ে রেখে মানমোহিনী যাবেন। ছেলের পরীক্ষার সময়টা দাদার বাড়ি থাকবেন। তিনি থাকলে বরুণের থাকার ব্যাপারটা সহজও হবে।

অরুণ বলল, তুমি তো আজও যেতে পারতে।

–না। ওর জামাকাপড় কেচে নেব কয়েকটা। মোহন ফিরে এলে সব দেখিয়ে দেব। সজাগ থাকিস অরুণ। সন্ধ্যার আগে দরজাগুলো বন্ধ করিস। মোহনের বউ ঝাঁটপাট দেবে, বাসন ধোবে, তুই শুধু ঠাকুরঘরে সন্ধ্যাবেলা একটু ফুলজল দিস, ধূপ জ্বেলে দিস।

–সব করব।

–ধানু কাকা তেল এনে দিলে রেখে দিস।

–সে আবার কি তেল দেবে?

মা নিশ্বাস ফেলে বললেন, ও ওষুধবাকল থেকে তেল তৈরি করে। সেই তেল মালিশ করেই তো বরুণের পা আর কাঁধের ব্যথাটা কমে।

অরুণ আরেকবার অবাক হয়।

–আমি তো জানি না।

–জানতে তো চাস না, কোনোদিনই না।

অরুণ যেন চড় খায় গালে। সত্যিই কি ও বরুণের বিষয়ে এতটাই নিস্পৃহ?

আর ধানু মান্ডি এসে পড়ে।

–বউমা কুথা গেলি?

–এই তো!

–তেলটা লিয়ে আলম। লে।

–আমি কাল যাচ্ছি কাকা।

–যা। উয়াক বলবি কি সব ঠিক আছে।

–কি ঠিক আছে কাকা?

–উ আমাদের একটো কথা বেটেক্। দুই বীরে করব্য একটো কাম।

ধানু চলে যায়। এখনও ও সোজা হয়েই হাঁটে, মাঝে মাঝে গ্রামে সকলের খবর নিতে বেরোয়। তবে সন্ধ্যাবেলা আর চোখে দেখে না।

মা চলে যান পরদিন। আর অরুণ ঢোকে ঘরে। বরুণের খাতাগুলো, কয়েকটা বই। মোটা খাতাটা খোলে। কি সব লেখে ও!

ওপরে লেখা "আমার খাতা"। সাদা কাগজের বড় বাঁধানো খাতা।

বরুণ কি ডায়েরি লিখেছে?

–"অরুণ ফার্স্ট হয়েছে। অংক একাশি পেয়েছে।"

এটা কবেকার কথা লিখছে?

–"পরের বার একশো পাবে। অরুণ রেডিও থেকে গান তুলেছে, মানব না বন্ধনে, মানব না শৃংখলে।"

–"অরুণ খেলছিল ফুটবল, আমি দেখছিলাম। আমি হাততালি দিতে পারি না। কিন্তু আমার আনন্দ হয়েছে।"

অরুণ, অরুণ, অরুণ, নিজের কথা ও কিছু লেখেনি? "অরুণ স্কুল ম্যাগাজিনে সম্পাদক হয়েছে আর পদ্য লিখেছে। আমি পদ্য লিখতে পারি না।"

অরুণ খাতাটা বন্ধ করে, যত্ন করে রেখে দেয়। বরুণ তার সব কথা লিখে রেখেছে কেন? "মা-বাবা আমাকে দেখে দুঃখ পায় কেন? আমি তো কিছু পারব না। অরুণ বড় হলে মা-বাবার সব দুঃখ ঘুচে যাবে।"

অরুণ ওর বইগুলো গুছিয়ে রাখে। বেরিয়ে আসে। মনে হচ্ছে, বরুণের কথা খুব মনে হচ্ছে।

পরীক্ষা দিয়ে, মানমোহিনী গ্রামের বটেশ্বর শিবমন্দিরে পুজো দিয়ে ওরা ফিরে আসে। বরুণ বলে, বাপরে, বাড়ি ছেড়ে এত দিন থাকা যায়?

মা বলেন, বরুণের সংগে কথা বলে দাদা খুব খুশি হয়েছেন। বুঝলি অরুণ?

–কি কথা হলো?

বরুণ বলল, সে অনেক কথা। কাজের কথা।

–সে তো তোর ধানু দাদার সংগে।

বরুণ বলল, হ্যাঁ। দেখতেই পাবি।

–আমাকেও বল্ না।

–আগে আমরা মিটিং করি।

মিটিংটা হলো ধানুর বাড়িতে। বরুণ, ধানু, মোহন আর বরুণের বাবা। অরুণ বলল, কিসের মিটিং?

–বিজনেসের।

–তুই বিজনেস করবি?

–নিশ্চয়। স–ব জেনে এসেছি, বুঝলি?

–মোহন সেনাপতি, ধানু মাণ্ডি, আর তুই?

–বাবা একটু হেল্‌প করছে, পরে লাগবে না।

–তোর রেজাল্ট বেরোবার আগেই?

–আগেই।

–কেমন পরীক্ষা দিলি?

–"পি" ডিভিশান আটকায় কে?

অরুণ আর কিছু বলল না। কৌতূহল ওরও হচ্ছে, কিন্তু সে তো ও প্রকাশ করবে না।

বরুণ বলল, খুব তাড়াতাড়ি তোকে অবাক করে দেব।

অরুণকে কেন, সকলকেই অবাক করে দিল বরুণ।

যেদিন ওদের বাড়ি বেজায় রাশভারি অঞ্চল প্রধান, গ্রামীণ ব্যাঙ্কের বেজায় ছোকরা চেহারার ম্যানেজার আর ব্লক অফিসার এলেন একসঙ্গে।

প্রধান বললেন, ডাকো, ডাকো, বরুণের পার্টনাররা কোথায়?

মোহন আর ধানুও এল।

মা বললেন, অরুণ, চা দে ওঁদের।

প্রধান বললেন, এই তো অরুণ! শোন বাবা, তোমার ভাই একটা ভালো কাজ করে ফেলেছে।

বলে চা খেলেন, পানপরাগ খেলেন।

বরুণ বলল, ওকে বলিনি কিছু।

–আমিই বলছি। আমাদের ধানুকাকার বিঘা খানেক জমি আছে, যাতে চাষ করলেও একবার ধানই হয়। ওর ছেলে, নাতি, সব বাঁকুড়ায় কাজ করে। ও জমিতে ও কিছু করতে পারে না। ওর বাড়িতে ওর ভাইয়ের নাতিটা থাকে, সে ব্লকে কাজ করে। বরুণ একটা চমৎকার স্কীম দিয়েছে, বুঝেছ?

–স্কীমের ও কি জানে?

–সরকারী বই পড়ে জেনেছে। ধানুকাকার জমিতে ওরা মুরগি খামার করবে। বরুণ এ জন্যে ব্যাঙ্ক লোন পাবে। মোহন খাটবে। ওরা তিনজন সমান অংশীদার। আমরা ব্লক থেকে ট্রেনিং দেব, ওষুধ ইনজেকশান দেব, সব ব্যবস্থা করে দেব। ওরা খাটতে পারলে এটা খুব লাভে চলবে।

ধানু বলল, খুব চালাতে পারব।

–রীতিমত ঘর হবে, মুরগি আর ডিম দুই বেচা যাবে। যাতে আমি সবচেয়ে খুশি হয়েছি, বরুণ প্রতিবন্ধী হিসেবে কোনো বিশেষ বিবেচনা চায়নি।

ধানু বলল, তা পরধান হয়েছ, তুমি লয় সিদিনে ফিতাটো কাট্যে দিও।

–উদ্বোধন? তা করে দেয়া যাবে।

–চমৎকার! ধানুর জমি, মোহন আর ওর বউয়ের লেবার, খাতাপত্র টাকার হিসেব বরুণের। না রাজীব, তোমার ছেলে যাকে বলে একটা দৃষ্টান্ত....তিনটে তিন রকম লোক, একসঙ্গে এ ভাবে....

ধানু বলল, ধুর বাবু! তিনটো গাছে মিলমিশে রইতে পারো, তা মানুষ পারব্যেক নাই?

বরুণের বাবার মনে হলো, মানুষই পারছে না এখন। গাছের জগতে তো কোনো বিদ্বেষ নেই।

–বরুণ আবার বেশি লোক নেবে না।

–না জ্যাঠামশাই। ছোট করেই শুরু হোক। ট্রেনিং নিতে আমি আর মোহন যাব ব্লকে।

বরুণ কিরকম আত্মবিশ্বাস নিয়ে কথা বলছে!

ওঁরা কথা বলতে থাকলেন, অরুণ বেরিয়ে এল।

আজ ও খেলতে গেল না, বন্ধুদের কাছে গেল না, সোজা চলে এল নিজের ঘরে। আলোও জ্বালল না। বরুণের কথাই ভাবতে লাগল। বরুণ কি এমনি করেই ওর বিষয়ে মা-বাবার দুশ্চিন্তা দূর করছে?

পা ঘষে ঘষে, দেয়াল ধরে ধরে বরুণ এল। অরুণের পাশে বসল ধপ করে।

–অরুণ!

–আমাকে বলিসনি কেন?

–অবাক করে দেব বলে।

–ও!

–বাবা তো পারত না এ ক'হাজার টাকা ইনভেস্ট করতে। ধানু দাদার জমিটা ছিল, মোহন তো আছেই। সকলে মিলে.... কি মনে হয়, পারব?

–আমাকে জিগ্যেস করছিস?

–তোর কথাটা শোনা আমার বড্ড দরকার।

অরুণ উঠে বসল, বরুণকে জড়িয়ে ধরল।

–পারবি না মানে? সব পারবি তুই। সবাই, সবাই আমাকে জিততে দেখেছে এতদিন, কিন্তু আমি এ ভাবে....পারতাম না বরুণ! তোর কাছে আমি হেরে গেছি। হেরে গিয়ে আমার গর্ব হচ্ছে। মানুষ হিসেবে তুই....অনেক মানুষ হয়েছিস!

–তবে হ্যান্ডশেক কর্।

অরুণ ওর ডান হাতটা আস্তে চেপে ধরল।

–তোর জন্যে আমার গর্ব হচ্ছে। দেখি, তোর যোগ্য ভাই হতে পারি কিনা।

–কলেজ-কেরিয়ারে অনেক ওপরে ওঠা, ওগুলো ভুলে যাস না যেন।

–দেখাই যাক।

ঘরের বাইরে দাঁড়িয়ে বাবা সব শুনলেন। ওঁর চোখ ভিজে উঠল আনন্দে।

মাকে বললেন, ওদের ডেকো না, দু'ভাই গল্প করছে।

ছবি: সুফি

# ঘোষবাগানের দানো

## অজেয় রায়

জ্যৈষ্ঠ মাস। রাত প্রায় সাড়ে নটা। লাভপুর লাইনের লাস্ট বাসটা সবে পেরিয়েছে।

বাসরাস্তার ধারে শিবপদর চায়ের দোকানের ঝাঁপ আধখানা খোলা। ভিতরে তাসের আসর বসেছে লণ্ঠনের আলোয়। খেলুড়ে চারজন। শিবপদ স্বয়ং। এ ছাড়া ব্রজ দাস, কেষ্ট মণ্ডল ও জটাধর। খেলা চলছে ঘণ্টাখানেক। টুয়েন্টি নাইন। চলবে আরও খানিকক্ষণ।

এই চারটি মানুষেরই বেজায় তাসের নেশা। সন্ধ্যা হতেই বাকি তিনজন এক এক করে জমা হয় শিবপদর দোকানে। উসখুস করে। তারপর খদ্দেরের ভিড় কাটলেই বের হয় তাসের প্যাকেট। দোকানের ঝাঁপ আধখানা ফেলে চারজন গুছিয়ে বসে ভিতরে তক্তোপোশের ওপর।

মফস্বল গ্রাম বাংলা। পিচ-বাঁধানো বাসরাস্তার দুধারে বিস্তৃত খেতের জমি, পুকুর, বাগান। কোথাও কাঁকুড়ে খোয়াই ডাঙা। মাঝে মাঝে এক একটি জনবসতি। ছোট বড় গ্রাম শহর।

গরমকালে রাত আটটার পর বড় একটা খদ্দের জোটে না শিবপদর দোকানে। তাসুড়েরা তখন জুত করে খেলায় বসে। শিবপদ তখন ছুটি দিয়ে দেয় দোকানের ছোকরা কর্মচারিটিকে। দু-একজন ছুটকো খদ্দের এলে খেলার ফাঁকেই মালিক একাই তাদের আপ্যায়ন করে। হয়তো অল্পক্ষণের জন্য বন্ধ থাকে খেলা। ফের শুরু হয়।

শিবপদর বয়স বছর চল্লিশ। তার তাসুড়ে বন্ধুরা কাছাকাছি বয়সী। শিবপদর বাড়ি দোকানের লাগোয়া বাসরাস্তার পাশে। এই গ্রামটির নাম নতুনগ্রাম। ছোট গ্রাম। পঞ্চাশ-ষাট ঘর লোকের বাস। তবে বাস স্টপেজ হিসেবে নতুনগ্রামের গুরুত্ব আছে। এখান থেকে উত্তর ও দক্ষিণে অনেকগুলো চওড়া মেঠো রাস্তা গেছে দূর দূর গ্রামের দিকে। সারাদিনই এই স্টপেজে বাসযাত্রীর আনাগোনা। শিবপদর দোকান ছাড়াও এখানে আছে আরও একটা ছোট চায়ের দোকান। নতুনগ্রামের ইন্দু মুখুজ্যের। আর আছে একটা গমভাঙাই কল। সদ্য খুলেছে। তবে শিবপদর ছাড়া অন্য দুটো দোকানই সন্ধ্যে নামলে বন্ধ হয়ে যায়।

মূলত চা-বিস্কুটের দোকান বটে শিবপদর। তবে সে কিছু মিষ্টি ও

নোনতাও বানায়। এ ছাড়া তার দোকানটা হচ্ছে একটা সাইকেল স্ট্যান্ড। দূর গ্রাম থেকে যারা এখানে এসে বাস ধরে যায় ওদিকে বোলপুর বা উল্টোদিকে নানুর-কির্নাহার-লাভপুর লাইনে, কাজেকম্মে বা দৈনিক চাকরি বা ব্যবসা করতে, তারা অনেকে সাইকেলে এসে শিবপদর কাছে বাইক জমা রেখে যায়। কাজ শেষে বাসে এসে দোকান থেকে সাইকেল নিয়ে গ্রামে ফেরে। দোকানের গায়ে ছোট এক খড়ের চালার নিচে থাকে তালামারা সাইকেলগুলো।

নিয়মিত যারা সাইকেল রাখে তাদের থেকে কিছু ভাড়া পায় শিবপদ। উপরি আয়। তার কোনো অসুবিধে নেই। কারণ তাসের নেশায় লাস্ট বাসটা অবধি সে তো থাকেই দোকানে। নেহাতই কোনো সাইকেল মালিক না ফিরলে শিবপদ তার গাড়িটা নিয়ে গিয়ে রাখে নিজের বাড়িতে।

নিঝুম রাত। তাসুড়েদের টুকরো টুকরো কথাবার্তা ও মাঝে সাঝে উচ্চস্বরে কিছু তর্কবিতর্ক ছাড়া আর কোনো মানুষের গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে না। কখনো কখনো পিচ রাস্তা দিয়ে হুস করে বেরিয়ে যায় মোটর গাড়ি-ট্রাক।

খেলতে খেলতে জটাধর হঠাৎ ঘাড় কাত করে মন দিয়ে কি শোনে। তারপর বলে, 'কিসের শব্দ হচ্ছে জানি।'

'হুঁ।' অন্যরাও কান পেতে সায় দেয়।

ঝন্‌ঝন্। ঘটাং ঘটাং–আওয়াজটা এগিয়ে আসছে দ্রুতবেগে। অসমান মেঠো পথ দিয়ে সবেগে সাইকেল চালিয়ে আসছে কেউ। হরিপুরের দিক থেকে আসছে শব্দটা। কি ব্যাপার?

ঘ্যাচ্। সজোরে ব্রেক কষার আওয়াজ হয় দোকানের ঠিক সামনে। ঝনাৎ করে মাটিতে পড়ল একটা সাইকেল। শিবপদরা ধড়মড় করে উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে ঝাঁপের একপাশের কোণা তুলে হুড়মুড় করে ঢুকে টলতে টলতে সটান উপুড় হয়ে পড়ল একজন দোকানের মেঝেতে।

ভবা মন্ডল!

থরথর করে কাঁপছে ভবা। গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরুচ্ছে তার মুখ দিয়ে। শিবপদরা লাফ দিয়ে এগোয়।

'কেউ লাঠি মেরেছে। কিংবা ছুরি। ছেনতাই করেছে ডাকাতে।' ব্রজ নিশ্চিত কণ্ঠে ঘোষণা করে।

'না না। মারেটারেনি। গায়ে রক্ত কৈ?' জটাধরের প্রতিবাদ–'অন্য কিছু ব্যাপার। জল দে শীগগির।'

শিবপদ তাড়াতাড়ি মগে করে জল আনে। ভবাকে চিৎ করে দিয়ে ওর মুখে মাথায় জলের ঝাপটা দেওয়া হয়। কিছু একটা ঘটেছে সাংঘাতিক সন্দেহ নেই। তবে দেহে আঘাতের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না।

ভবা মন্ডল থাকে হরিপুরে।

মাত্র মিনিট দশেক আগে ভবা নেমেছিল লাভপুর লাইনের বাস থেকে। ও বোলপুর শহরে গিয়েছিল। শিবপদর দোকান থেকে তার সাইকেল নিয়ে রওনা দিয়েছিল হরিপুর।

মুখে জলের ছিটে পেয়ে একটু সুস্থ হয়ে চোখ মেলল ভবা। ঘোলাটে নয়নে দেখল শিবপদদের। উঠে বসে। কেষ্ট এক গেলাস জল দিতে ঢকঢক করে খায়। অতঃপর তার গলা দিয়ে ভয়ার্তস্বরে যে কথাটি বেরোয় তা শুনে অন্যরা হতভম্ব।

'ভ–উ–ত।'

'এ্যাঁ। ভূত!' চারজনই চমকে ওঠে, 'কোথায়?'

তক্তোপোশে বসে কাঁপা কাঁপা গলায় থেমে থেমে যে অদ্ভুত ঘটনা বলল ভবা তার সারমর্ম এই–

শিবপদর দোকান থেকে সাইকেলে উঠে হরিপুরের দিকে যাচ্ছিল ভবা। যে রাস্তা ধরে সে দিনের পর দিন গেছে। ফিকে জ্যোৎস্নায় দিব্যি দেখা যাচ্ছিল পথ। তাই টর্চ জ্বালেনি। ফুরফুরে বাতাস বইছে। খোশমেজাজে গুনগুন করে গাইতে গাইতে প্যাডেল মারছিল। মনে ঘুরছে বাড়িতে কিছু কাজের কথা। পদ্মদীঘির পাশ দিয়ে গিয়ে বাঁক নিয়েছে, সহসা রাতের স্তব্ধতা ভেঙে কেমন একটা চাপা অদ্ভুত বিকট হাসির আওয়াজ কানে যেতে ঘাড় তুলে পুকুরপাড়ে তাকিয়েই তার আক্কেল গুড়ুম।

কিছুটা সামনে, দীঘির উঁচু পাড়ে বিশাল এক ছায়ামূর্তি। অন্তত দু মানুষ লম্বা। প্রকাণ্ড মাথা। চুলের গোছা উড়ছে। দু হাত নাড়তে নাড়তে সেটা নামছে ধীরে ধীরে। পাড় বেয়ে নিচে। নিঃশব্দে। গোটা দেহটা মিশকালো। চলনের ধরনটা অদ্ভুত। ভবা দীঘির ধারে ওইখানে পৌঁছনোর সময় ঠিক ওটা তার ঘাড়ে এসে পড়ত।

ঝপ্ করে সাইকেলে ব্রেক কষে নেমে পড়েছিল ভবা।

বিস্ফারিত চোখে মূর্তিটা দেখেছিল চার-পাঁচ সেকেন্ড। জমে যেন পাথর হয়ে গিছল আতঙ্কে। ওটা যে কোনো জীবন্ত প্রাণী নয় তার সন্দেহ ছিল না। নির্ঘাৎ ওটা ভূত দানো পিশাচ জাতীয় কিছু। অশরীরী। ভবা অজ্ঞানই হয়ে যেত ভয়ে। কোনোরকমে মরিয়া হয়ে সে সাইকেলটা ঘুরিয়ে উঠে পড়ে উর্ধ্বশ্বাসে প্যাডেল মারে। কি ভাবে, কতক্ষণে যে পৌঁছেচে দোকানে হুঁশ নেই। শুধু মনে হচ্ছিল যে এই বুঝি কারও হিমশীতল আঙুলের মুঠি আঁকড়ে ধরবে তার ঘাড়।

ভবা তার ভয়াবহ অভিজ্ঞতার বর্ণনা শেষ করে ফের এক গেলাস জল খায়।

শিবপদরা চোখাচোখি করে। চারজনের মনে একই প্রশ্ন। এতকাল ওই রাস্তা দিয়ে কত লোক যাতায়াত করেছে রাত-বিরেতে কিন্তু ভূত-প্রেতের দেখা পায়নি তো কেউ! ভবা মন্ডলও প্রায়ই ফেরে রাত করে। নেহাৎ ভীতু বলা যায় না লোকটিকে।

'আমি ভাই ও-পথে একা ফিরছি না। মানে আজ রাতে।' ভীত কণ্ঠে জানায় ভবা।

'তাহলে কি করবে?' শিবপদ চিন্তিত।

'এই দোকানেই শুয়ে থাকি রাতে।'

'বাড়িতে ভাববে না?'

'তা ভাববে বৈ কি! কি করা?'

কেষ্ট গজগজ করে ওঠে–'ভূত-ফুত সব বাজে। চাঁদের আলোয় কলা বা খেজুর গাছের পাতা নড়তে দেখে ভুল করেছে। আচমকা দেখলে এমনি মনে হয় অনেক সময়।'

'না ভাই, সত্যি বলছি। স্পষ্ট দেখলুম। গাছ-টাছ নয়। এগুচ্ছিল।' ভবা কাতরস্বরে প্রতিবাদ জানায়।

আসলে কেষ্ট দাস চটেছিল ভবার ওপরে। খেলায় হারছিল কেষ্ট। অল্প কয়েক পয়েন্টে। আর আধঘন্টাটাক খেলা হলে হার মেকআপ করে জিতে যেত হয়তো। ভবা দিল সব ভন্ডুল করে। হারলে কেষ্টর মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আপাতত ভবা যদি এখানে ঠাঁই গাড়ে তাহলে খেলার দফা গয়া। কেবল ভূতের

গল্পই চলবে।

কেষ্ট বলে ওঠে, 'চল তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। দীঘিটা পার করে দিই।'

'পৌঁছে দিবি?' শিবপদ ইতস্তত করে, 'তবে আর একজন কেউ যাক সংগে। নইলে তোকে একা ফিরতে হবে। জটা যাবি?'

'নাঃ, কি দরকার?' মুখে সাহস দেখালেও কেষ্টর হাবেভাবে বোধ হলো যে জটা সংগে গেলে মন্দ হয় না।

'ঠিক আছে, চ।' জটাধর রাজী।

'মিনিট পনেরোর মধ্যেই ফিরছি। ফিরে এসে আবার খেলব।' জানাল কেষ্ট।

তিনজন রওনা দিল সাইকেল চেপে।

মিনিট পনেরো নয়। কেষ্ট ও জটাধর দোকানে ফিরল প্রায় ঘন্টাখানেক বাদে। কাঁপতে কাঁপতে। দুদ্দাড় করে সাইকেল চালিয়ে।

তারা দুজনেও দেখেছে সেই ছায়া দানবকে। তবে দীঘির পাড়ে নয়। পদ্মদীঘি পাশ কাটিয়ে নিরাপদেই পেরিয়ে গিছল তিনজনে। অলৌকিক কারও দেখা মেলেনি। কিন্তু হরিপুরের কাছাকাছি গিয়ে তাদের নজরে পড়ে দূরে তালডাংগার খোলা মাঠে এক আবছা বিরাট মূর্তি। যেমন বর্ণনা দিয়েছিল ভবা।

সেই দানোটা ধীরে ধীরে বেড়াচ্ছিল রুপোলি চাঁদের আলোয়। একবার খনখনে গা-শিউরানো হাসির শব্দ শোনা গেল। ওর অট্টহাসি। ক্রমে মূর্তিটা গিয়ে মিলিয়ে গেল দীঘির দক্ষিণে ঘোষ-বাগানের ভিতরে।

বহুক্ষণ কাঠ হয়ে নজর করেছে তিনজন। কিন্তু সেই ভৌতিক দানোর দেখা আর মেলেনি। অবশেষে ভরসা করে দোকানে ফিরেছে কেষ্ট ও জটা। ভবা অবশ্য চলে গেছে হরিপুর।

সেদিন আর তাসের আসর বসল না।

বোলপুর শহর। সাপ্তাহিক বংগ-বার্তার অফিসে উঁকি দিল দীপক। পাশে ভবানী প্রেসের কাজ চলছে খটাখট শব্দে। ভবানী প্রেসের মালিক এবং বংগবার্তার সম্পাদক কুঞ্জবিহারী মাইতি তাঁর ছোট্ট কামরায় বসেছিলেন নিজের চেয়ারে। মাঝবয়সী শ্যামবর্ণ গাঁট্টাগোট্টা কুঞ্জবিহারীর পরনে ধুতি শার্ট। মাথা ঝুঁকিয়ে গোল গোল চোখে শুনছিলেন সামনে বসা এক ভদ্রলোকের কথা। দীপক দরজা ঠেলতেই কুঞ্জবাবু বলে উঠলেন– 'এস দীপক। তোমার কথাই ভাবছিলাম।'

দীপক ভিতরে ঢুকে চেয়ারে বসে।

কুঞ্জবিহারী বললেন, 'আলাপ করিয়ে দিই। ইনি হচ্ছেন শ্রীতারকনাথ ঘোষ। বাড়ি নতুনগ্রাম। আমার বিশেষ পরিচিত। আমাদের বংগবার্তার গ্রাহক। আর এ হচ্ছে দীপক রায়। বংগবার্তার একজন রিপোর্টার। ভেরি ভেরি প্রমিসিং ইয়ংম্যান।'

তারকনাথ ও দীপক পরস্পরকে নমস্কার জানাল। বছর পঞ্চাশের ছোটখাটো নিরীহ দর্শন তারকনাথ সসম্ভ্রমে দীপকের পানে চেয়ে কাঁচুমাচুভাবে হাসলেন।

কুঞ্জবিহারী দীপককে বললেন, 'তারকবাবু কি বলছিলেন জান? ওঁদের গ্রামের কাছে সম্প্রতি ভূতের উপদ্রব শুরু হয়েছে। ঠিক উপদ্রব বলা উচিত নয়। আবির্ভাব হচ্ছে। যে সে ভূত নয়। বিরাট সাইজ। দানো বলা যায়। ধারেকাছে প্রায়ই দেখা যাচ্ছে তাকে। ভেরি ইন্টারেস্টিং। কি বল?'

'সব গ্রামেই ওরকম ভূত দেখা যায়।' নীরস কণ্ঠে দীপকের মন্তব্য।

'না না। আমাদের গাঁয়ে আগে কখনো ভূত-টুত দেখা যায়নি। এই হপ্তাখানেকের ব্যাপার। একদম হঠাৎ। লোকে খুব ভয় পেয়েছে।' ক্ষীণ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানান তারকনাথ, 'রাতে হরিপুরের পথে কেউ একলা যেতে ভরসা পাচ্ছে না। অনেকে নিজের চোখে দেখেছে কিনা।'

'একটা কাজ কর না দীপক,' বলে ওঠেন কুঞ্জবিহারী, 'একদিন চলে যাও ওখানে। খোঁজখবর কর। যারা দেখেছে তাদের ইন্টারভিউ নাও। ভূতটার ডেসক্রিপশান। তার বিচরণক্ষেত্রের বর্ণনা। হঠাৎ এই ভৌতিক আবির্ভাবের কারণটা কি হতে পারে? খাসা একটা নিউজ হবে। বেশিদূর তো নয়। এখান থেকে বাসে বড়জোর ঘন্টাখানেক।'

'আবার ভূত? পারব না।' দীপকের সাফ জবাব।

'আহা, তোমার যে এ লাইনে হাতযশ আছে। তাই তো বলছি তোমায়।' এরপর সম্পাদক মহাশয় চোখ ছোট করে, পুরুষ্টু ঝোলা গোঁফজোড়াটি নাচিয়ে, রহস্যময় সুরে বললেন, 'আর যদি সম্ভব হয় তেনাকে একবার দর্শন করেও আসতে পার।'

'তিনি কি আমায় দর্শন দেবেন? মনে হয় না।' তাচ্ছিল্যের হাসি দিয়ে বলে দীপক।

'আহা-হা, ট্রাই করতে দোষ কি? লাক্ ফেভার করলে দেখে ফেলতেও পার। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। স্বয়ং রিপোর্টার দেখেছে। জম্পেস একখানা স্টোরি হবে বংগবার্তায়।'

'হুঁঃ।' নাক দিয়ে একটা শব্দ করে দ্বিতীয় প্রস্তাবটা উড়িয়ে দেয় দীপক। তবু ওখানে যাবার ব্যাপারে না করতে পারে না। হাজার হোক সম্পাদকের অনুরোধ।

'বেশ, যাব।' দীপক রাজী। তারপর সে তারকবাবুকে জিজ্ঞেস করে–'কাল থাকবেন গ্রামে?'

'না। পরশু আসুন, রোববার।' জানালেন তারকবাবু।

'হ্যাঁ, চলে যাও পরশু,' উৎসাহ দেন কুঞ্জবাবু, 'তারকবাবু, দীপকের সংগে ওখানকার লোকের আলাপ-টালাপ করিয়ে দেবেন। একটু সাহায্য করবেন।'

রবিবার সকালে চা খেতে খেতে নিজের মনে গজগজ করে দীপক, 'যত্তসব। বোগাস্ ব্যাপার–'

বছর ষোল বয়সী ভাইপো ছোটন আর তার ছোট বোন ভাইঝি ঝুমা লক্ষ্য করছিল দীপককে। ছোটন জিজ্ঞেস করে, 'কি হয়েছে কাকু?'

'আর বলিস কেন?' দীপক গজরায়, 'কোন গ্রামে ভূত দেখা গেছে, আমাকে তাই কভার করতে যেতে হবে। আরে বাবা, বাংলা দেশের সব গাঁয়ে ঝোপেঝাড়ে আর পুরনো বাড়িতে তো লোকে হরদম ভূত দেখে। এডিটর আমায় পেয়ে বসেছে। বেকার খাটাবে।'

'কাকু, আমি যাব। ভূত দেখব।' ছোটন লাফিয়ে ওঠে।

'কাকু, আমিও যাব। কখনো ভূত দেখিনি।' ঝুমাও নাচে।

'ভাগ্।' ছোটন দাবড়ে দেয় বোনকে, 'অন্ধকারে উঠোনে যেতে ভয় পায়, আবার ভূত দেখবেন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি কেমন বীরপুরুষ, জানা আছে।' ঝুমা দমে না।

দীপক থামায় দুজনকে, 'দূর দূর ভূত কে দেখবে? রাতে থাকছি না। একটু খোঁজখবর নিয়ে দিনে দিনে ফিরে আসব।'

'কাকু, আমায় নিয়ে চল না, জায়গাটা দেখে আসি।' ছোটনের আবেদন।

তা মন্দ নয়। ভাবে দীপক। একা একা একঘেয়ে লাগতে পারে। তবু ছোটন সংগে থাকলে দুটো গল্প করা যাবে। সে বলল, 'আচ্ছা চ। বেলা দশটা নাগাদ খেয়েদেয়ে বেরিয়ে পড়ব।'

'কাকু, আমিও যাব।' ঝুমার আবদার।

'না। তোমার মাস্টারমশাই আসবেন আজ দুপুরে। আজ থাক।'

'যাও, যাও।' হতাশ ঝুমা দাদাকে ভেঙচায়, 'ভূত যখন ঘাড় মটকাবে বুঝবে ঠেলা।'

'দিনে ভূত বেরোয় না।' বিজ্ঞ ছোটনের মন্তব্য।

বেলা এগারোটা নাগাদ ছোটনকে নিয়ে দীপক পৌঁছে গেল নতুনগ্রামে। তারকবাবুর সংগে দেখা করল। তারকনাথ দীপককে নিয়ে এলেন শিবপদর দোকানে। পরিচয় করিয়ে দিলেন শিবপদর সংগে। ভবা মন্ডল তখন ছিল সেখানে। দোকানে বসে দুজন অন্য গ্রামের লোক তখন বিস্ফারিত নেত্রে গিলছিল ভবার ভূত দেখার অভিজ্ঞতা।

ঘোষবাগানের দানো–এই নামেই খ্যাতিলাভ করেছে ওখানকার অশরীরী সেই দানব ছায়ামূর্তি। যে বিচরণ করে রাতে। ঘোষবাগানের কাছাকাছি দীঘির গায়ে অথবা তাকে দেখা গেছে ঘোষবাগানের পুবে তালডাংগার প্রান্তরে।

ঘোষবাগানের দানো বা ভূতের আবির্ভাবে শিবপদর সোনায় সোহাগা। কারণ এর ফলে তার দোকানে বিক্রি বেশ বেড়েছে। পাঁচ গাঁয়ের লোক হাজির হচ্ছে নতুনগ্রাম স্টপেজে। শিবপদর দোকানে বসছে খানিক। আসল উদ্দেশ্য, ঘোষবাগানের দানোর গল্প শোনা। এই সূত্র ধরেই উঠছে নানা লোকের যত শোনা ও দেখা ভূতুড়ে কাহিনী। যক্ষ রক্ষ পিশাচ দানো মামদো বেহ্মদত্যি পেতনি শাকচুন্নিদের নিয়ে হরেক গা-ছমছম দমবন্ধ-করা গল্পে দিনভোর সরগরম থাকে দোকান। সংগে চা বিস্কুট মিষ্টি নোনতার সদ্ব্যবহারও চলে।

ঘোষবাগানের দানোর প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে ভবা মন্ডলই আসর জমিয়েছে বেশি। কারণ সেই দেখেছে প্রথম এবং তার অবসরও প্রচুর। তাকেই বেশি পাওয়া যায় শিবপদর দোকানে।

কেষ্ট ও জটাধর ব্যস্ত মানুষ। সন্ধ্যের আগে তারা বড় একটা আসতে পারে না দোকানে। আরও একজন ওই দানোকে দেখেছে বটে সচক্ষে। কেতুপুরের ভরত সর্দার। কিন্তু সে চাকরি করে বর্ধমানে। সপ্তাহে একদিন মাত্র বাড়ি আসে। ফলে ভবাই জাঁকিয়ে বসেছে।

ভবা থিয়েটারে পার্ট করত। এলেমটা পুরো কাজে লাগাচ্ছে। ঘোষবাগানের দানো দেখার গল্প শুরু করলে শ্রোতাদের আর নড়তে দেয় না। প্রায় প্রতিদিনই তার গল্পে রং চড়ছে। ঠান্ডা নিরীহ শিবপদকে নিয়ে তার দুশ্চিন্তা নেই। তবে কেষ্ট বা জটাধর হাজির থাকলে সে মোটেই খুশি হয় না। কারণ আসরটা তখন দখল করে নেয় ওরা কেউ। প্রথম ভূত দেখার পর কম্পিত বিপর্যস্ত ভবার ঊর্ধ্বশ্বাসে দোকানে আগমন দিয়ে শুরু হয়– কাহিনী। ভবা তখন কেটে পড়ে।

ব্রজনাথের আফশোস, ইস্, কেন সেদিন গেলাম না ভবাকে পৌঁছতে! তাহলে কি এমন অগ্রাহ্যি সইতে হয়। কেউ তাকে পোঁছে না, ভবা, কেষ্ট বা জটাকে পেলে।

শিবপদর অবশ্য এসব গৌরবে মাথাব্যথা নেই। সে শুধু শুনে যায়। কিছু বাড়তি রোজগার হচ্ছে। এতেই সে খুশি।

তবে রাতে হরিপুর যাবার শর্ট-কাট রাস্তায় যাত্রী কমে গেছে একদম। আঁধার নামলে কেউ আর ওপথে একলা মাড়ায় না। অন্তত দুতিনজন একসংগে মিলে তবে যায়। ঘোষবাগান, পদ্মদীঘি, তালডাংগার ধার দিয়ে–রামনাম জপতে জপতে।

শিবপদর দোকান প্রায় ফাঁকাই থাকে সন্ধ্যের পর। ফলে দোকানে তাসের আড্ডা বসে তাড়াতাড়ি।

শিবপদ কেষ্ট জটাধর ব্রজ–চারজনই নতুনগ্রামের বাসিন্দা। তাই তাদের রাতে ঘরে ফিরতে অসুবিধা নেই। বাসরাস্তার উত্তরে ঘোষবাগান, হরিপুর, কেতুপুর। আর দক্ষিণে নতুনগ্রাম।

তবে অন্য পথে চললেও, রাতে বেরুলে গোটা অঞ্চলের লোকেরই গা শিরশির করে। পথে কোনো ছায়া নড়তে দেখলে বা কোনো বিদঘুটে আওয়াজ কানে গেলেই আঁতকে ওঠে।

কাগজের রিপোর্টার শুনে দীপকের চারপাশে ভিড় জমল।

দীপক দোকানে বসে ভবা শিবপদ এবং আরও কয়েকজনের সংগে কথা বলে নোট নিল। নিউজটা বানাতে কাজে লাগবে। তারপর সে বলল, 'ভূতটির বিচরণক্ষেত্রগুলি দেখতে চাই। প্রথমে যাব ঘোষবাগান। আমার সংগে যদি কেউ আসেন দেখিয়ে দিতে–'

দোকান তখন প্রায় ফাঁকা। ভবা এবং আরও জনাকয়েক দুপুরে খেতে গেছে ঘরে। তারকনাথ ভীতু মানুষ। দিনের বেলাতেও তার ঘোষবাগানে ঢুকতে ভয়। আমতা আমত করে বলল, 'আমার একটু কাজ আছে। এখুনি যেতে হবে। শিবপদ, তুমি যদি ভাই কাউকে দাও ওনার সংগে!'

শিবপদ বলল, 'ঠিক আছে, নকুল যাবে। আমার ভাগনে। নকুল, তোর ভাত খাওয়া হয়ে গেছে তো? বেশ। বাবুদের সংগে যা। খোলা মাঠে ঘোরাবিনে বেশি। যা রোদ্দুর।'

নকুল বছর পঁচিশের যুবক। ছিপছিপে শক্ত গড়ন। রং কালো। সুশ্রী হাসিহাসি মুখখানা। পরনে লুঙ্গি ও শার্ট। খালি পা।

নকুলের সংগে চলল দীপক ও ছোটন। শিবপদ দোকানে ঝাঁপ ফেলে খেতে গেল।

'তুমি কি কর?'

যেতে যেতে নকুলকে জিজ্ঞেস করে দীপক।

'আজ্ঞে, অনেক কিছু।' মুচকি হেসে জবাব দেয় নকুল।

'মানে?'

'এই যেমন ফিরি করি। বেলুন, প্ল্যাস্টিকের খেলনা, ডুগডুগি, তালপাতার টুপি, হুইসিল–এমনি সব। শীতকালে মেলায় মেলায় ঘুরি। বোলপুর শহরেও যাই। লটারির টিকিটও বিক্রি করি। মামাকেও সাহায্য করি দোকানের কাজে। বোলপুর থেকে মালপত্তর কিনে আনি দোকানের। চাষের কাজেও হাত লাগাই। বেকার তো। নানা ধান্দা করি।'

'লেখাপড়া ?'

'স্কুল ফাইনাল পাশ করেছি।'

'কলেজে পড়লে না কেন ?'

'অনেক খরচ।' নকুলের মুখ ঈষৎ ম্লান হয়।

দীপক আঁচ করে অভাবী সংসারের সমস্যা। এ নিয়ে আর কথা বাড়ায় না।

বাসরাস্তা থেকে ঘোষবাগানের দূরত্ব অন্তত আধ মাইল। পথের দুধারে বসতি নেই। শুধু চাষের খেত। তখন শস্য নেই মাঠে। এবড়ো-খেবড়ো খটখটে মাঠ। ঘোষবাগানটা ঠিক পথের ধারে নয়। চলার পথ থেকে প্রায় শ' তিনেক হাত তফাতে। মাঝখানে একটা শুকনো নালার খাত। আর কিছু ধেনো জমি।

পদ্মদীঘির দক্ষিণে প্রায় বিঘে দেড়েক উঁচু জমির ওপর ঘোষবাগান। সেখানে পাঁচটি প্রাচীন আমগাছ এবং দুটি কাঁঠালগাছ। 'উঃ, কত আম!' বলতে বলতে ছোটন সাঁ করে একটা ইঁট ছুঁড়ল আমডাল লক্ষ্য করে।

'আঃ, কি হচ্ছে ?' ধমক দেয় দীপক। তারপর ওপরে দেখতে দেখতে বলে, 'বাঃ, খুব আম হয়েছে! ভাল জাতের মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, ল্যাংড়া আর গোলাপখাস। কলমের গাছ।' জানায় নকুল।

দুটি গাছে মস্ত মস্ত কাঁঠাল ঝুলছে প্রচুর।

'এই বাগানের মালিক কে ?' প্রশ্ন করে দীপক।

'মামা।'

'মানে শিবপদবাবু ?'

'হ্যাঁ।' ঘাড় নাড়ে নকুল। বলে, 'মামার তো চাষের জমি খুব অল্প। এই আম কাঁঠাল বেচে আর দোকানের আয়ে কোনোরকমে চলে। এই বাগান করেছিলেন মামার ঠাকুর্দা। দীঘিটাও তিনি কাটিয়েছিলেন। তাঁর অবস্থা খুব ভাল ছিল। মামার আসল বাড়ি হরিপুর। মামা ভারি ভাল মানুষ, তাই অন্য শরিকরা জবরদস্তি করে আর ঠকিয়ে নিয়েছে মামার পাওনা বেশির ভাগ সম্পত্তি। মামা তাই রাগ করে নতুনগ্রামে এসে ঘর করেছে। ওই দীঘিটারও ভাগ আছে মামার। সামান্য অংশ। তা দীঘি মজে গেছে। মাছ হয় না। কাটানো হয়নি বহুকাল। মামা মামী, ওদের চার ছেলেমেয়ে, তার ওপর আমরা তিনজন।

গাছের ফল রাখা কি সোজা ব্যাপার ?

আমি, মা, বোন। বড় সংসার।'

'তোমার বাবা নেই ?'

'না। বাবা হঠাৎ মারা যেতে খুব কষ্টে পড়েছিলুম। তখন মামা এনে এখানে রাখল।'

আমগাছ দেখতে দেখতে নকুল বলল, 'গাছের ফল রাখা কি সোজা ব্যাপার ? বড্ড চুরি হয়। এখন পাকার টাইম। এখনই বিপদ বেশি। আগের বছর অর্ধেক আম কাঁঠাল চুরি হয়ে গেল। এবার দিনরাত পাহারা দিচ্ছি। দিনে মামার বাগাল ছেলেটা থাকে, রাতে আমি। তবে এ কদিন আর রাতে থাকছি না বাগানে। মানে ভূতের ভয়ে। তাই শুধু দিনে ডিউটি দিচ্ছি।'

বাগানের মাঝে দেখা গেল খড়ে ছাওয়া এক ছোট্ট কুটীর। ভিতরে হাত দেড়েক উঁচু একটা বাঁশের বেঞ্চি। চারটে খোঁটার ওপর গায়ে গায়ে লাগানো বাঁশের কঞ্চি পেতে তৈরি। একটি লোক কোনোরকমে শুতে পারে তাতে। এক কোণে কিছু কাঠকুটো ঘুঁটে খড় জড়ো করা। মাটিতে একটা উনুন বানানো হয়েছে।

উনুনটা দেখিয়ে নকুল বলল, 'রাতের ঘুম তাড়াতে চা বানিয়ে খাই। ওই বেঞ্চিটায় কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ি। রাতে একটু করে ঘুমিয়ে নিই, আর জেগে উঠে হাঁক পাড়ি। অভ্যেস করে নিইচি। চোরে ভাববে যে গোটা রাত ঠায় জেগে আছি,' মুচকি হাসে নকুল, 'তবে ঠিকমতো ঘুম কি আর হয় ?'

বাগান থেকে বেরিয়ে দীঘির পাড়ে দাঁড়াল তিনজন।

মস্ত দীঘি। এখন অনেকটা বুজে এসেছে। দীঘির মাঝখানে সামান্য একটু জল। বাকিটায় শুকনো কাদা। দীঘিতে পদ্মফুল আর নেই। কলমি নটে ইত্যাদি নানারকম শাকে প্রায় ঢেকে গেছে দীঘিগর্ভ। পাড়ের ঢালে হলুদ ফুলে ভরা প্রচুর কন্টিকারির ঝোপ। দীঘি ঘিরে অনেকগুলো কলাগাছ আর লম্বা লম্বা নারকেল গাছ।

দীঘির পাড়ে পাড়ে হাঁটে তিনজন।

সোজা উত্তরে একটা বড় গ্রাম। গাছপালায় ঢাকা। ফাঁকে ফাঁকে কিছু ঘর-বাড়ি চোখে পড়ছে।

'ওই গ্রামটা কি ?' দেখায় দীপক।

'হরিপুর', জানাল নকুল, 'আর ওই দূরে বাঁ দিকে ওটা কেতুপুর। রাতে এখন লোকে দীঘির পাশ দিয়ে শর্ট-কাটে

হরিপুর যেতে ভরসা পায় না। তাই কেতুপুরের কাছ দিয়ে গিয়ে ঢোকে। অনেকটা ঘুরপথে।'

নতুনগ্রাম থেকে চওড়া মেঠো রাস্তাটা ঘোষবাগানের কাছাকাছি এসে দু ভাগ হয়ে গেছে। একটা শাখা পদ্মদীঘিকে পাক খেয়ে চলে গেছে উত্তরে হরিপুর। অন্যটা গেছে উত্তর-পশ্চিমে কেতুপুর।

পদ্মদীঘি আর ঘোষবাগানের পুবে জমি ঢালু হয়ে নেমে গেছে। তারপর শুরু হয়েছে রুক্ষ পতিত ডাংগা ভূমি। লোকে বলে তালডাংগা। প্রায় মাইল খানেক বিস্তৃত। সেখানে কোথাও সমতল কঠিন কালচে মাটি। কোথাও বা উঁচুনিচু ঢেউখেলানো কাঁকর বালি নুড়ি মেশানো খোয়াই। ওই ডাংগায় কিছু তাল ও খেজুরগাছ ছাড়া আর কোনো উদ্ভিদ নেই।

নকুল দেখাল, 'ওই যে দূরে ডাংগার শেষে, বাসরাস্তার কাছে গ্রাম। ওর নাম ইসলামপুর।'

'এখানে শ্মশান-টশান আছে?' দীপকের প্রশ্ন।

'আছে। হরিপুরের শ্মশান আর ইসলামপুরের গোরুস্থান। এই ডাংগার সীমানাতেই।'

'ভূতটাকে ঘোষবাগানের দানো নাম দিয়েছে কেন?' দীপক কৌতূহলী।

নকুল বলল, 'লোকে ভাবছে যে ঘোষবাগানেই ওর আস্তানা। তাই–'

'আচ্ছা, ভবা মণ্ডল বলছিলেন যে এখানে নাকি একটা খুন হয়েছিল?'

'হ্যাঁ। গত বছর। তালডাংগায় ওইখানে একটা মৃতদেহ পড়েছিল। পুলিশ বলেছিল, লোকটা দাগী ডাকাত। ওর দলের লোকেই নাকি ওকে খুন করে ফেলে রেখে গিছল এখানে। কয়েকজন গ্রেফতারও হয়েছিল। তারপর তো অনেক মাস কেটেছে। কোনো গোলমাল হয়নি। এখন হঠাৎ?'

দীপক চারধার দেখল খানিকক্ষণ খুঁটিয়ে। তারপর বলল, 'চল ফেরা যাক।' তার মাথায় একটা প্ল্যান এসেছে।

নতুনগ্রামে ফিরে দীপক ছোটনকে বলল, 'তোকে বোলপুরের বাসে তুলে দিলে, একা ফিরতে পারবি?'

'কেন পারব না! কিন্তু তুমি?'

'ভাবছি থেকে যাই এখানে রাতটা।'

'বুঝেচি। ভূত দেখবে?'

'একটা ট্রাই করব।'

'কাকু, আমিও থাকব।'

'নো। এই বয়সে ভূত দেখার শখে কাজ নেই। শোন, বাড়িতে মানে দাদা-বৌদিকে খবরদার বলবিনে আমি কেন এখানে রয়ে গেলাম। ঝুমাকে বারণ করে দিবি বলতে। বললে কিন্তু কোনোদিন আর আইসক্রিম খাওয়াব না, মনে রেখ।'

ছোটন চলে গেল বোলপুর।

দীপক শিবপদকে বলল, 'আজ রাতে আমার একটা শোবার জায়গার ব্যবস্থা করতে পারেন? একটা খাট হলেই চলবে।'

'এখানে থাকবেন!' শিবপদ অবাক।

'হ্যাঁ। আজ রাতে একটু বেরোব। যদি আপনাদের ভূতের দর্শন পাই। তারপর তো আর ফেরার বাস পাব না। তাই রাতটুকু কাটাতে–'

'এটা কিন্তু মশাই ঠিক হবে না।' শিবপদ বাধা দেয়।

'দেখুন, আমি রিপোর্টার। এমন রিস্ক ঢের নিয়েছি। আমার নার্ভ বেশ স্ট্রং।'

একটু চুপ করে থেকে শিবপদ বলল, 'রাত সাড়ে ন'টা-দশটা অবধি আমার দোকান খোলা থাকে। তাস খেলি। তার মধ্যে ফিরলে এখানেই শুতে পারেন। ওই তক্তেপোশে। আর যদি দেরি হয়?' সে ভাবনায় পড়ে।

'বাস বাস। দশটাই যথেষ্ট। তার মধ্যে দেখা পাই ভাল। নইলে ফিরে আসব। সারারাত জাগার ইচ্ছে নেই মোটেই। পাঁচ-দশ মিনিট দেরি হতে পারে। একটু অপেক্ষা করবেন প্লিজ।'

রাত আটটা নাগাদ শিবপদর দোকানে পাঁউরুটি, আলুর দম ও রসগোল্লা খেয়ে দীপক নৈশ অভিযানে রেডি। নকুল বলল তাকে, 'টর্চ এনেছেন?'

'টর্চ? নাঃ। টর্চ কেন? দিব্যি চাঁদের আলো রয়েছে।'

'মানে, চাঁদের আলোয় তো স্পষ্ট দেখতে পাবেন না। বাগানে দীঘির পাড়ে বড় বড় সাপ ঘোরে। বিষাক্ত গোখরো, কেউটে। তাই বলছি।'

ভূতের ভয়ে না হোক, সাপের কথায় ঘাবড়ে গেল দীপক। আমতা আমতা করে বলল, 'তাহলে তো বাগানে বা পুকুরপাড়ে না যাওয়াই উচিত। কি বল? রাস্তা থেকে দেখবখন। তবু একটা টর্চ থাকা ভাল। যোগাড় করে দিতে পার একটা?'

'দেখি।' চলে যায় নকুল।

ইতিমধ্যে শিবপদর দোকানে এসে জুটেছে ব্রজনাথ, কেষ্ট ও জটাধর। তাস খেলার লোভে। জটা উপদেশ দেয়, 'মশাই সাবধানে ঘুরবেন। ভূত সাপ কেউ ফ্যালনা নয়। আমাদের অভিজ্ঞতা আছে তাই বলছি। গোঁয়ার্তুমি করে একটা বিপদ ঘটালে মুশকিলে পড়ে যাব সবাই।'

'না না। সে ভাববেন না। সাবধান হব বৈকি।' আশ্বাস দেয় দীপক।

নকুল একটা টর্চ এনে দেয়। তবে সেটার আলোর জোর খুব কম।

নতুনগ্রাম থেকে হরিপুর যাবার রাস্তাটা পদ্মদীঘির গা ঘেঁষে গিয়ে যেখানে উত্তরে ঘুরে সিধে গিয়েছে সেই বাঁকে হাজির হলো দীপক। সেখান থেকে দীঘির পাড়, ঘোষবাগান এবং তালডাংগা–এই তিনের অনেকটা অংশ দেখা যায়। পথের ধারে একটা পাথরের ওপর বসল সে জুত করে।

ক্রমে চাঁদ ওপরে ওঠে। শুক্লপক্ষের মাঝামাঝি। হালকা জ্যোৎস্নায় প্রকৃতি রহস্যময়। আলোআঁধারির জগৎ। মেঘহীন আকাশে হীরের কুঁচির মতো ঝকঝকে অসংখ্য তারা। বাতাস উঠেছে। তাই গরমের ঝাঁঝটা কমেছে। দিব্যি আরাম লাগছে খোলা জায়গায়।

কিন্তু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগের চেয়ে একটি অস্বস্তি ক্রমে বাড়তে থাকে দীপকের মনে। উঃ, চারধার কি নিস্তব্ধ! শুধু কানে আসে অসংখ্য ঝিঁঝির তীব্র একটানা ঐকতান। আর মাঝে মাঝে অদ্ভুত কিছু শব্দ। রাতে নির্জন পাড়াগাঁ অঞ্চলে সে কম ঘোরেনি। ভয়ও পেয়েছে কখনো কখনো। তেমনি এক ভয় বা অস্থির ভাব যেন বড় বেশি চেপে বসছে আজ।

কোনো সড়সড় মড়মড় আওয়াজ পেলেই দীপক টর্চ ফেলে দেখছে আশেপাশে। ঘোলাটে আলোর বৃত্তয় হাত দশেকের বেশি নজর চলে না।

কতক্ষণ দীপক এমনিভাবে বসেছিল খেয়াল নেই। বুঝি একটু ঝিমুনি এসেছিল। সহসা একটা আওয়াজে চটক ভাঙে। এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হঠাৎ তার নজরে পড়ল বাগানের কাছে

দীঘির পাড়ে বিরাট এক ছায়ামূর্তি। কোনো মানুষ অত লম্বা হতে পারে না। প্রকাণ্ড মাথা। আবছা চন্দ্রালোকে বোঝা যায়, তার গোছা গোছা চুল উড়ছে বাতাসে। দুলছে হেলছে শরীর। সুদীর্ঘ হাত দুটো নাড়ছে এলোমেলো।

ধীরে ধীরে চলছে মূর্তিটা। ঝোপঝাড়ের গা দিয়ে। কিন্তু কোনো শব্দ নেই। একবার একটা আওয়াজ শোনা গেল। অপার্থিব খনখনে চাপা হাসি। যেন হাসছে ওটা। দেখতে দেখতে সেই দানব মূর্তি অদৃশ্য হলো ঘোষবাগানের অন্ধকারে।

আরও মিনিট পনেরো বসে রইল দীপক একই জায়গায় কাঠ হয়ে। তারপর উঠে গুটিগুটি হাঁটতে শুরু করে নতুনগ্রামের উদ্দেশে। শিবপদর দোকানের আলো দেখার পর তার যেন ধড়ে প্রাণ এল।

সম্পাদক কুঞ্জবিহারী টেবিলে প্রচণ্ড এক চাপড় মেরে হুংকার দিলেন– 'কনগ্রাচুলেশনস্ দীপক। স্টোরিটা ফাসক্লাস হয়েছে। ঘোষবাগানের দানো। হৈচৈ পড়ে গেছে। এ হপ্তায় বঙ্গবার্তার বাম্পার সেল। কত চিঠি পাচ্ছি জান?'

'চিঠি? কি চিঠি লিখছে?' দীপক কৌতূহলী।

'ফর এ্যান্ড এগেনস্ট। কেউ খুব প্রশংসা করেছে লেখাটার এবং রিপোর্টারের সাহসের। কেউ আবার গালমন্দ করেছে। লিখেছে–মিথ্যে। বানানো গপ্পো।'

'কি বানানো?' তেতে ওঠে দীপক।

'আহা, চটছ কেন? তর্ক জমলেই তো নিউজের দর বাড়ে। তবে বিশ্বাসীর সংখ্যাই বেশি। অনেকে খোঁজখবর নিচ্ছে ব্যাপারটার।'

দীপক বলল, 'আমি কিন্তু আর ওমুখো হচ্ছি না। একবার দর্শনই যথেষ্ট।'

'না না, তোমার আর যাবার দরকার কি? যার ইচ্ছে হবে সত্যি মিথ্যে যাচাই করতে, সে নিজে যাক।' সম্পাদক ফতোয়া দিলেন।

আরও দিন দশেক কাটল।

এক সকালে ভবানী প্রেসের পিয়ন এসে জানাল দীপককে, 'এডিটারসাব আপনাকে ডেকেছেন। জরুরি দরকার।'

ওঃ, ওঝার কি চেহারা!

কি ব্যাপার? দীপক তখুনি ছোটে।

সম্পাদকের কুঠুরিতে বসেছিলেন নতুনগ্রামের সেই তারকনাথ। দীপক ঢুকতেই কুঞ্জবিহারী গমগমে গলায় বলে উঠলেন, 'শোন হে দীপক, তারকবাবু কি বলছেন?' বলে তিনি নিজেই গড়গড় করে কিছু খবর শুনিয়ে দিলেন–

নতুনগ্রামে নাকি ভূতের ব্যাপারটা আরও জমেছে। এমনকি বঙ্গবার্তার দৌলতে কলকাতা থেকে একজন রিপোর্টার গিয়েছিল ব্যাপারটার খোঁজ করতে। খুব গুজব রটেছে।

'আমি আসার পর আর কেউ ভূত দেখেছে?' দীপক জিগ্যেস করে।

'দেখেনি কেউ। তবে শুনেছে দুজন।' জানালেন তারকনাথ।

'শুনেছে মানে? হাসি?'

'হ্যাঁ, হাসি। তাছাড়া বাগানের কাছ দিয়ে যাবার সময় শুনেছে জোরে টানা দীর্ঘশ্বাস। কিংবা যেন ফুঁসছে কেউ। একেবারে ভূতুড়ে আওয়াজ। দুজন একসঙ্গে যাচ্ছিল। শব্দটা কানে যেতেই তারা প্রাণপণে সাইকেল চালিয়ে পালায়।'

'আহা, আসল কথাটাই যে বলা হলো না।' বাধা দেন কুঞ্জবিহারী, 'জান দীপক, এবার ভূত তাড়াবার ব্যবস্থা হয়েছে।'

'কি ভাবে?'

'ওঝা ডেকে ঝাঁড়ফোক করা হয়েছে দু'দিন আগে,' বললেন তারকনাথ, 'অনেক খরচা করে মুর্শিদাবাদ থেকে আনা হয়েছিল। নামকরা ওঝা। নতুনগ্রামের বলাই আর ইসলামপুরের হাবিব–এই দুই ছোকরাই প্রধান উদ্যোগ নিয়েছিল। চাঁদা তুলেছে গাঁয়ে গাঁয়ে। অনেকেই দিয়েছে। হরিপুরের লোকেই বেশি। ওদেরই তো বেশি অসুবিধে হচ্ছিল। ওঃ, ওঝার কি চেহারা! মুখে দাড়িগোঁফের জঙ্গল। লম্বা চুল! ইয়া জোয়ান। লাল লাল চোখ। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা। বাজখাঁই গলা। গায়ে লাল কাপড়, লাল ফতুয়া। মাথায় লাল ফেট্টি।

'সারা সকাল কত কি যে করল! খুব মন্ত্র আওড়ালো। সংস্কৃত বাংলা হিন্দী। মন্ত্রের কি তেজ! ওফ্। সরষে ছিটিয়ে, গণ্ডি কেটে দেছে ঘোষবাগান, পদ্মদীঘি আর তালডাঙ্গায় যে জায়গাগুলোয় দানোটার ঘোরাফেরা। বলে গেছে যে

এবার বাগান ছেড়ে পালাবে বাছাধন। এই অঞ্চলই ছেড়ে যাবে। অন্য কোথা থেকে তাড়া খেয়ে এসে ঘোষবাগানে আস্তানা গেড়েছিল। বিষম প্রকৃতির দানো ভূত। এখনো কারও ক্ষতি করেনি বটে, তবে করত ঠিক ভবিষ্যতে। অতৃপ্ত আত্মা। হঠাৎ হঠাৎ ক্ষেপে যায় মানুষের ওপর। যাক, এখন বাঁচোয়া।'

'তারপর রেজাল্ট কি? আর ভূত দেখা যায়নি?' জানতে চায় দীপক।

'নাঃ। এই দুদিন তো দেখা যায়নি। অট্টহাসি বা ফোঁস-ফোঁসানিও শোনা যায়নি। অবিশ্যি এখনো হরিপুরের শর্ট-কাট পথে তেমন লোক চলছে না ভয়ে। তবে দূর থেকে নজর রাখছে।'

দীপক ভুরু কুঁচকে ভাবে কিছুক্ষণ। তারপর বলে, 'আজ হবে না। কাল যাব একবার আপনাদের ওখানে। ব্যাপার-স্যাপার দেখতে।'

'ভেরি ভেরি গুড', টেবিল চাপড়ালেন কৃষ্ণবিহারী, 'নিউজটা ফলো করা উচিত। জানতাম, শুনলে তুমি ঠিক যাবে আবার।'

পরদিন সকালে দীপক গেল নতুনগ্রামে।

নাঃ, গতকালও রাতে অলৌকিক কিছু দেখা যায়নি বা শোনা যায়নি।

দিনভোর গমগম করছে শিবপদর দোকান। নকুল এক ফাঁকে হাসিমুখে জানিয়ে গেল দীপককে, 'স্যার, আর এক মাস এমন চললে মামা একখানা কোঠাঘর তুলতে পারবে। জানেন, ওঝা যেদিন এল দোকানে, লাভ হয়েছে তিনশো টাকা প্রায়। চা টিফিন মিল সাপ্লাই। মামা আর আমার তো কিছু দেখারই ফুরসত মিলল না।'

দীপক যখন ঘোষবাগানে ঘুরঘুর করছে, তখন বাগানের বাইরে দুটি যুবক ফিসফিস করছে। বলাই আর হাবিব।

বলাই বলল, 'আপদ তো চুকল। এবার কাজ সারি?'

হাবিব চিন্তিতভাবে বলল, 'আর কটা দিন যাক। ভিড় কাটুক।'

ঘণ্টা দুই সেখানে কাটিয়ে দীপক বোলপুরে ফিরে এল।

দীপক পরদিন ফের গেল নতুনগ্রামে। দুপুরে।

নাঃ, গত রাতেও দানোর দেখা মেলেনি। কোনো বিদঘুটে শব্দও শোনেনি কেউ। আগের রাতে তিনজন লোক সাহস করে জোট বেঁধে হরিপুরে গেছে দীঘির পাশ দিয়ে শর্ট-কাটে। নিরাপদেই। লোকের ভয় ভাঙছে।

দীপক শিবপদর দোকানে বসে প্ল্যান ভাঁজছে যে ওঝার কেরামতি নিয়ে আজ একটা লিখে ফেলব বোলপুরে ফিরে। এমন সময় বাস থেকে একজন নামল, যাকে দেখে তার পিত্তি জ্বলে গেল।

সমাচারের রিপোর্টার মন্টু। সাপ্তাহিক সমাচারও বোলপুর থেকে প্রকাশিত হয় এবং বৃগবার্তার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী।

মন্টু দীপককে দেখে দাঁত বের করে হেসে বলল, 'এই যে। এলাম।'

মন্টুর কাঁধে ঝোলানো ক্যামেরাটা দেখিয়ে দীপক গম্ভীরভাবে বলল, 'ভূতের ছবি তুলবে নাকি?'

'নাঃ। তেমন ক্যামেরা পাচ্ছি কৈ?' মন্টু মিচকে হাসে, 'এই বাগান-টাগানের ছবি নেব। তুমি তো হে ফার্স্ট রাউন্ডটা মাত করে দিয়েছ। দেখি সেকেন্ড রাউন্ডে আমি কিছু করতে পারি কিনা? আজ রাতে এখানে থাকছ নাকি?'

'হুম্। ঠিক করিনি। তুমি?'

'ভাবছি থেকে যাব।'

দীপক কিঞ্চিৎ দ্বিধায় ছিল রাতে থাকবে কিনা? তক্তোপোশে শুয়ে মশার কামড় খেয়ে অনিদ্রায় কাটানো মোটেই আরামদায়ক ব্যাপার নয়। কিন্তু সে তখুনি স্থির করে ফেলে মনে মনে, রাতটা এখানেই কাটাব। যদি কিছু আজ স্পেশাল ঘটে, মন্টু একা লিখে ক্রেডিট নেবে? কভি নেভি।

রাত আটটা নাগাদ শিবপদর দোকানে কিছু খেয়ে নিয়ে দীপক গুটিগুটি বেরিয়ে পড়ে। ঘুরঘুর করে কাছাকাছি। লক্ষ্য রাখে মন্টু কোথায় যায়।

একটু বাদেই সে দেখল যে মন্টু হরিপুরের রাস্তা ধরে হাঁটা দিল। অর্থাৎ ওই পথের কোথাও বসে ভূত দেখার তালে আছে। দীপক সে ধারে গেল না। পিচ রাস্তা ধরে খানিক পুবে হেঁটে তালডাঙ্গায় নামল। বসল একটা ঝোপের আড়ালে।

নিশুতি থমথমে রাত। তারা-ফুটফুটে আকাশে ঝকঝকে চাঁদটা প্রায় থালার মতো গোল। রুপোলি জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে মাঠঘাট।

প্রায় ঘণ্টাখানেক কেটেছে। দীপকের কানে এল কারও হেঁড়ে গলার গান। নজর করে দেখল যে একজন আসছে গাইতে গাইতে হরিপুরের দিক থেকে তালডাঙ্গা ভেদ করে।

আগন্তুক গায়ক পল্টন আলি।

পল্টন কাঠ-মিস্ত্রি অর্থাৎ ছুতোর। সে এখানে ছিল না মাসখানেক। হুগলিতে গিয়েছিল কাজ করতে। দু-তিন দিন আগে ফিরেছে, বাড়ি ইসলামপুরে। এসে শুনেছে সব। ঘোষবাগানের দানোর কথা। ওঝা ডাকা—ইত্যাদি এবং হয়তো এবার পালিয়েছে দানোটা।

পল্টনের যাত্রার শখ বেজায়। সে ক্ল্যারিওনেট বাজায় যাত্রাদলে। দেশে ফিরেই সে রিহার্সাল দেওয়া শুরু করেছে হরিপুরে তাদের পার্টির মহড়ায়। রিহার্সাল শেষে ফিরছে এখন।

পল্টনের ভয়-ডর কম। তাছাড়া ভূতের দেখাও মিলছে না কয়েক দিন। সে তাই নিশ্চিন্তে গলা ছেড়ে গাইতে গাইতে আসছে তালডাঙ্গার ভিতর দিয়ে ইসলামপুর যাবার শর্ট-কাট পায়ে চলার পথ ধরে। ঘুরপথেও যাওয়া যায় তালডাঙ্গা এড়িয়ে। তবে কি দরকার অযথা সময় নষ্টে। খুব খিদে পেয়ে গেছে।

পল্টন যখন ডাঙ্গার মধ্যে বেশ খানিকটা ঢুকে এসেছে তখনই দেখা গেল ঘোষবাগানের দানোকে। দীঘির গা বেয়ে নামছে ডাঙ্গায়।

পল্টন প্রথমে খেয়াল করেনি। মশগুল হয়েছিল গানে। সঙ্গের কুকুর শেরুর গর-র গর্জন শুনে মাথা ঘুরিয়ে দেখেই থমকে দাঁড়াল। শেরু পল্টনের ভীষণ ভক্ত। প্রায় সব সময়ে সঙ্গে ঘোরে। জাতে দেশী বটে কিন্তু ইয়া তাগড়া। তেমনি তেজী। কয়েকবার শেরু পল্টনকে সাবধান করে দিয়ে সাপের হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

পল্টন কয়েক মুহূর্ত ওই নির্জন প্রান্তরে সেই ঘোর কালো চলমান সাক্ষাৎ বিভীষিকাকে দেখে 'ইয়া আল্লা' বলে পিছু ফিরে মারল টেনে দৌড়।

দীপক আবছা দেখতে পেল যে বহুদূরে আর একটি মানুষ গরুর গাড়ির রাস্তা ধরে পাঁই পাঁই করে ছুটে মিলিয়ে গেল নতুনগ্রামের দিকে। ও নির্ঘাৎ মন্টু।

দীপকও উঠে পালাবে ভাবছে, এমন সময় এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখে সে হাঁ।

পল্টন পালাল বটে কিন্তু পল্টনের বাঘা কুকুর শেরু ঘাউ ঘাউ করে ডাক ছেড়ে সোজা তেড়ে গেল দানোটার দিকে। আরে মরবে যে কুকুরটা!

এরপর দ্বিতীয় চমক। দীপক দেখল যে ঘোষবাগানের দানো পালাচ্ছে। বুঝি শেরুর তাড়া খেয়ে লগবগ করতে করতে। খানিক পিছনে হেলে বিচিত্র ভঙ্গিতে ছুটে আসছে দীপক যেখানে বসে সেই দিকেই। হঠাৎ দানোটা একটা বেঁটে খেজুরগাছকে জড়িয়ে ধরল। এরপরই শোঁ শোঁ করে একটা তীক্ষ্ণ টানা শব্দ।

অদ্ভুত সেই আওয়াজটা শুনে থমকে গেল শেরু। পরক্ষণে সে বেজায় ভড়কে পিছু ফিরে মারল ছুট। ওর প্রভুর পথেই।

এসব দেখে দীপকের দেহ অসাড় হয়ে গিছল। উঠে পালাবে যে সে শক্তিও নেই। দানোটা তার থেকে মাত্র হাত চল্লিশ তফাতে। তার কেমন ভয় হলো যে এখন উঠে পালাতে গেলে ভূতটার নজরে পড়ে যাবে। সে কাঠ হয়ে দেখে।

দীপক লক্ষ্য করে যে খেজুরগাছ জাপটানো দানোটা হঠাৎ আকারে ছোট হচ্ছে। ক্রমে ছোট হতে হতে প্রায় মিশে গেল মাটিতে। শোঁ শোঁ শব্দটা তখন থেমে গেছে।

তীক্ষ্ণ চোখে নজর করে দীপক। দেখে, ওই খেজুরগাছের তলায় কে একজন নড়াচড়া করছে। কোনো মানুষ। এমন কিছু বড়সড় চেহারা নয় মানুষটার।

প্রচণ্ড কৌতূহলে গুড়ি মেরে এগোয় দীপক নিঃসাড়ে। কাছে গিয়ে ঝপ্ করে টর্চ মারে লোকটার গায়ে। আজ সে নিজের টর্চ এনেছে।

গায়ে আলো পড়তেই লোকটি চমকে মুখ ফেরায়।

দীপক থ। এ কি! এ যে নকুল। লুঙ্গি ও শার্ট পরা। সে দুই লাফে গিয়ে নকুলের হাত চেপে ধরে বলল, 'কি ব্যাপার? তুমি? এখানে কি কচ্ছ?'

নকুল অসহায়ভাবে বলে ওঠে, 'স্যার, আলো নেবান প্লিজ। বলছি সব।'

দীপক নকুলের হাত ছেড়ে দিয়ে লক্ষ্য করে, মাটিতে শায়িত বিরাট লম্বা এক দেহ। মানুষের মতন মনে হচ্ছে তবে আকারে যেন দানব। আলখাল্লা জাতীয় পোশাক পরনে। নিথর।

'কি এটা?' দীপক প্রশ্ন করে।

জবুথবু হয়ে বসে আছে শ্রীমান মন্টু।

'আজ্ঞে ঘোষবাগানের দানো।' মিনমিন করে নকুল।

'ইয়ার্কি হচ্ছে,' বলেই দীপক টর্চ ফেলে মূর্তিটার মুখে। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ চমকায়।

বীভৎস এক দানব মুণ্ড। কুচকুচে কালো চামড়া। ভাঁটার মতন লাল লাল চোখ। ছিরকুটে ধবধবে সাদা রাক্ষুসে দাঁতের সারি। মাথায় চুলের গোছা। গলা থেকে কালো রঙের বিশাল আলখাল্লায় ঢাকা গোটা দেহ।

'প্লিজ স্যার, আলো নেবান।' কাতরে ওঠে নকুল।

দীপক টর্চ নেবায় এবং বোঝে নিজের ভুল।

ওটা কোনো মুণ্ড নয়। গাঢ় নীল গোল মস্ত বেলুনের ওপর হাতে আঁকা ভূতুড়ে মুখ। সত্যি চুল নয়। সরু সরু কালো রঙের কাগজের ফালি সাঁটা মাথায়।

দীপক বসে পড়ে চিৎ হয়ে শোয়া মূর্তিটা ঘেঁটেঘুঁটে টিপেটুপে দেখে। ফিনফিনে আলখাল্লাটার তলায় মনে হলো একটা লম্বা মোটা বেলুন। তার ডগায় বাঁধা মুণ্ড আঁকা বেলুনটা। গলা মানে দুই বেলুনের জোড়ের কাছে কঞ্চির ফ্রেমে আটকানো লম্বা কালো আলখাল্লাটা। সরু লম্বা দুটো বেলুন বাঁধা রয়েছে কাঁধের কাছে। যেন হাত। তাদের একটা ফেঁসে চুপসে গেছে। পা বলে কোনো বস্তু নেই। একটা ভারি লাঠি চাপানো রয়েছে মূর্তিটার গলার কাছে।

'এ যে বেলুন-ভূত?' দীপক স্তম্ভিত।

'আজ্ঞে তাই।' কাঁচুমাচুভাবে সায় দেয় নকুল।

'তুমি বানিয়েছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। মানে এই বডি আর মাথাটা গ্যাস বেলুনের। তবে হাত দুটো গ্যাসের নয়, অর্ডিনারি বাতাস বেলুন। আমি তো বেলুন বিক্রি করি। ঘরেই থাকে নানারকম বেলুন। গ্যাস সিলিন্ডারও থাকে।

'গ্যাস বেলুন তো। তাই এই সরু দড়িটা দিয়ে বেঁধে ধরে থাকি নিচে। নইলে ছাড়লেই মুণ্ডসুদ্ধ জামা পরানো বডিটা হুস্ করে উড়ে যাবে।'

'ও, এই বেলুন ভূত দেখিয়ে তুমি লোককে ভয় দেখাচ্ছ?'

'আজ্ঞে।' নকুল মাথা চুলকোয়।

'কারণটা কি?' দীপকের স্বর কঠিন হয়।

'বাধ্য হয়ে স্যার', নকুল করুণ গলায় বলে, 'বাগানের ফল বাঁচাতে। ওই বলাই আর হাবিব দুটো মহাচোর। গত বছর ওরাই সাফ করে দিয়েছিল বাগান। হাতে-নাতে ধরতে পারিনি অবিশ্যি।

তবে খবর পেয়েছি। এবারও দেখছিলাম যে কেবলই দুটো ঘুরঘুর করছে বাগানে। কাঁহাতক আর রাত জেগে পাহারা দেওয়া যায়। ওরা তাকে তাকে ছিল। এক রাত পাহারা না থাকলে বা বেশি ঘুমলেই ফল সাফ করবে।

'একদিন ওদের সংগে কথা বলে বুঝলাম যে দুটোরই খুব ভূতের ভয়। তখন আইডিয়া খেলল মাথায়। এক একদিন চুপিচুপি এসে অন্ধকারে বাগানে বসে বেলুনগুলো ফুলিয়ে ভূতটা বানাই। বাগান থেকে বেরিয়ে নিচু হয়ে ওটাকে খানিক উড়িয়ে লম্বা জামাটার আড়ালে আড়ালে দড়ি ধরে টেনে টেনে নিয়ে হাঁটি। কারও চোখে পড়ে যায়। ভূত-প্রেত-দানো ভাবে। বিটকেল হাসি-টাসিও দিই। আবার বেলুন থেকে গ্যাস বেরুবার শব্দেও লোক ভয় পায়। গ্যাস সিলিন্ডারটা বাগানে কুটীরের ভিতর গর্তে লুকনো থাকে।

'আজ দেখলাম যে শয়তান দুটো শলা করছে গোপনে। ভয় হলো, আজ হয়তো ফল চুরি যাবে। ভূতের ভয়টা কেটেছে কিনা। তাই আজ ভয়টা ফের চাগিয়ে দিলাম। কিন্তু পল্টনের কুকুরটা যা! বেটা সাংঘাতিক। দানো-ফানো মানে না! ভাগ্যিস কামড়ায়নি। ইস্, খেজুর কাঁটায় লেগে ভূতের পোশাকটা ছিঁড়ে গেছে। একটা হাত ফেঁসেছে।'

'কিন্তু লোকের যে ভীষণ অসুবিধে হচ্ছে?' ধমকে ওঠে দীপক।

'আর বড়জোর দিন পনেরো স্যার,' নকুল অনুনয় করে, 'তার মধ্যে আম-কাঁঠাল সব নেমে যাবে। তাপ্পর আমি নিজে ফের ওঝা ডেকে আনব। মানে অন্য ওঝা। দেখবেন তার মন্ত্রের জোর। ঠিক দানোটা পালাবে। অন্তত বছরখানেকের মতো।' ফিক্ করে হেসে ফেলে নকুল।

'হুঁ। মনে রেখ। নইলে কিন্তু–' দীপক ওয়ার্নিং দেয়।

'যে আজ্ঞে।' নকুল ঘাড় নাড়ে।

'মামা জানে তোমার কীর্তি?'

'আজ্ঞে না।' বলেই নকুল হামলে পড়ল দীপকের পায়ে, 'প্লিজ স্যার, বলবেন না কাউকে। তাহলে মারা পড়ব। মামা আর আমার মুখদর্শন করবে না।'

'আচ্ছা, আচ্ছা।' অভয় দেয় দীপক।

নকুল বলল, 'স্যার, এবার এগুলো গুটিয়ে ফেলি।'

সে কিছু খুটখাট করে। কয়েকবার শোঁ শোঁ শব্দ হলো বেলুন থেকে গ্যাস বা হাওয়া বেরুবার। চোপসানো বেলুনগুলো এবং আলখাল্লা দড়ি ইত্যাদি গুটিয়ে নিয়ে সে ভরল একটা ব্যাগে। তারপর বলল, 'স্যার, এবার তবে যাওয়া যাক। আপনি তো দোকানে যাবেন। আমি একটু ঘুরে বাড়ি ঢুকব লুকিয়ে।'

'চল।' দীপক পা চালায়।

শিবপদর দোকানে পৌঁছে দীপক দেখল যে সেখানে হুলুস্থুল চলছে। তক্তোপোশে জবুথবু হয়ে বসে আছে শ্রীমান মন্টু। তার গা-মাথা জামা-প্যান্ট সব ভিজে জবজবে। চোখে ফ্যালফ্যালে দৃষ্টি। তাকে ঘিরে চারজন তাস-খেলুড়ে তো রয়েছেই, গ্রামের আরও কয়েকজন জুটেছে। সবাই উত্তেজিত সুরে কথা বলছে।

শিবপদর কাছে জানল দীপক, মন্টু নাকি হাঁউমাঁউ করে দোকানে ঢুকে আছড়ে পড়ে তক্তোপোশে। তারপরই জ্ঞান হারায়। জলের ঝাপটা দিতে হুঁশ ফিরেছে।

দীপককে দেখে মন্টু ক্ষীণকণ্ঠে বলল, 'দেখেছ? উঃ, ডেঞ্জারাস!'

কোনোরকমে হাসি চেপে একবার মাথা ঝাঁকিয়ে দীপক গম্ভীরভাবে বসল তক্তোপোশের কোণায়।

মন্টু কাঁদ কাঁদ স্বরে বলে ওঠে, 'আমার ক্যামেরাটা? কোথায় যে পড়ল?' অসহায় চোখে সে তাকায় সবার পানে। অর্থাৎ কিনা, দয়া করে কেউ যদি তার ক্যামেরাটি উদ্ধার করে এনে দেয়।

কারও কিন্তু এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখা গেল না। দীপক বলল, 'ক্যামেরা কেউ নেবে না। খুব ভোরে গিয়ে খুঁজে নিও।'

হতাশ মন্টু ধপ্ করে শুয়ে পড়ল।

দীপকের মাথায় তখন দারুণ একটা স্টোরি ঘুরছে–

ঘোষবাগানের দানোর পুনরায় আবির্ভাব। প্রেতদর্শনে সমাচারের রিপোর্টারের নিদারুণ দুর্দশা। তার প্রাণভয়ে পলায়ন। পতন ও মূর্ছা। ক্যামেরা হারানো–ইত্যাদি।

কাল বাড়ি ফিরেই লিখে ফেলবে।

ছবি: রাজা সরকার

# বাঘের হাসি

অপূর্ব দত্ত

কানের ভেতর আতর গুঁজে
কলপ দিয়ে জুলফিতে
সোঁদরবনের ভোঁদড় গেল
বাঘের বাড়ি কুলপিতে
মাঘের শীতে বাঘ বেরোল
গায়ে উলের র‍্যাপার
'হালুম' করে বলল–'আসুন,
বলুন তো কী ব্যাপার
'ব্যাপার হ'ল ইয়ে–মানে
বলব কি আর মশাই
আপনাদের ঐ রাজা–সে তো
আস্ত একটা কসাই।'
বাঘ বললে–'ধ্যাত্তেরিকার
তাও কখনও হয়!
আসলে তো আমিই রাজা
ও তো রাজা নয়।'
যেই না বলা ভোঁদড় বলে
'তাহলে স্যার আসি।'
রাতদুপুরে দাপিয়ে পাড়া
বাঘের সে কী হাসি!

ছবি: রাহুল মজুমদার

# নিজের দেশে ম্যাণ্ডেলা

## অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

যেন কতকাল হয়ে গেল, ম্যাণ্ডেলা ঘরবাড়ি ছেড়ে কেবল আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছে। পাঁচ-সাত দিনও হয়নি তবু কেন যে মনে হয় কত কাল! বেশিদিন সে তার মাকে ছেড়ে থাকতে পারে না। এটাই হয়েছে তার ভারি জ্বালা। মা ঠিক ছটফট করছে। আবার উধাও মেয়েটা! যায় কোথায়! সে যে তার নিখোঁজ বাবাকে খুঁজতে বের হয়ে কত দেশে চলে যায়, তা মা কিংবা বুচার মামা বিশ্বাস করবে কেন! সে বলেও না কিছু। চুপচাপ থাকে। আগে হম্বিতম্বি হতো। পুলিশ থেকে শহরের বড় বড় কাগজগুলিতে তার নিখোঁজ হবার খবর চলে যেত। সে ফিরে এলেই, হাজার প্রশ্ন। কোথায় গেছিলে, কে তোমাকে নিয়ে গেছিল? কোনো দুষ্টচক্রের পাল্লায় পড়ে যে সে ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে না, তাই বা বিশ্বাস করবে না কেন তারা!

তার তখন এক কথা, 'জানি না।'

'কোথায় গা ঢাকা দিয়েছিলে, জান না।'

'না জানি না।'

'আরে বলছ কি, তুমি বাচ্চা মেয়ে, বোঝ না—তোমার পক্ষে কোথাও এতদিন পালিয়ে থাকা সম্ভব নয়।'

ম্যাণ্ডেলা সাড়া দিত না। করুক না বকবক, কতক্ষণ করতে পারে দেখা যাক। তবে এবারে বেশ ক'দিন সে ঘরছাড়া। উড়তে শুরু করলে তার এই হয়। ঘরবাড়ির কথা মনে থাকে না, মা-র কথা মনে থাকে না,এমনকি বুচার মামা যে তার এই বাঁদরামিতে ক্ষিপ্ত হয়ে থাকে তাও সে গ্রাহ্য করে না। উড়তে উড়তে সে সেবারে ফনের রাজত্বে ঢুকে গেছিল। সে না থাকলে মুম্বাটুকে যে পুড়িয়ে মারা হতো, কেউ বিশ্বাস করবে না। মা না, মামা না, কেউ না। আর এসব বলে সে তার সেই জাদুকরকে ছোট করতে চায় না। জাদুকর তাকে পালকের টুপি না দিলে তার বাবাকে খুঁজে বের করাও মুশকিল। আর এমনভাবে ওড়ার আনন্দই বা সে পেত কোথায়!

সে তার বাবাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, বাবা না থাকলে কেউ থাকে না, এরা বুঝবে কি করে। জাহাজডুবি যে কোথায় হলো, এটাই সে বুঝতে পারছে না। জাহাজ তলিয়ে গেলেও বোট থাকে জাহাজে—বাবা যে বোটে ভেসে পড়েনি কে বলবে! কোনো দ্বীপে কিংবা অরণ্যে বাবা তার বেঁচে আছে, কারণ মানুষের জন্য ঈশ্বর সর্বত্র বেঁচে থাকার ব্যবস্থা করে রেখেছেন। তার সেই বুড়ো হানসের কথাও মনে হয়। মানুষটা নির্জন দ্বীপে কতকাল কাটিয়ে দিল—সেই কবে সারা পৃথিবী জুড়ে যুদ্ধ হয়েছিল, হানস ছিল একজন সৈনিক—সে যুদ্ধজাহাজ থেকে পালিয়ে একটা দ্বীপে উঠে গেছিল। পালিয়ে না, জাহাজটা ডুবে যাচ্ছিল—কি যে খবর, সে আর এখন মনে করতে পারছে না। উড়তে উড়তে কোনো নির্জন দ্বীপে কেউ চুপচাপ বালুবেলায় দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেলে কার না বিশ্বাস হবে, নিশ্চয়ই সেই নিখোঁজ মানুষটি, সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে তার ছোট্ট মেয়ে ম্যাণ্ডেলার কথা ভাবছে! কিংবা সমুদ্রের কোথাও যদি কোনো জাহাজ কিংবা জেলে নৌকোর সন্ধান পাওয়া যায়, সেই আশাতেও মানুষটা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।

সে যাই হোক, ম্যাণ্ডেলা দ্বীপে নেমে গেছিল। সঙ্গে তো হাইতিতি আছেই। সে কাছে গিয়ে দেখল, একজন বুড়ো মানুষ, চুল সব পেকে গেছে—সাদা দাড়ি, গায়ে পাতার পোশাক। তার বাবা নয় ঠিক, তবে মানুষটার জন্য কম তার ভোগান্তি হয়নি। এই আছে এই নেই, কারণ ম্যাণ্ডেলা পালকের টুপি মাথায় দিলেই অদৃশ্য, খুলে ফেললে ম্যাণ্ডেলা। হাইতিতি বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। তার গলায় ঘণ্টা বাজছে। দ্বীপে কোনো ভুতুড়ে উপদ্রব শুরু হয়েছে ভেবে লোকটা দৌড়াতে শুরু করেছিল। এতটুকুন দ্বীপে আর যে মানুষজন নেই, ম্যাণ্ডেলা উড়তে উড়তে টের পেয়েছে—তারপর লোকটার কাছে গিয়ে টুপি খুলে দাঁড়িয়ে পরিচয় দিয়েছে, তার নাম ম্যাণ্ডেলা। সে থাকে নিউ প্লাইমাউথ শহরে। জাদুকর তাকে পালকের টুপি দেওয়ায় সে যেখানে খুশি উড়ে যেতে পারে। সঙ্গে আছে ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা হাইতিতি—গলায় রুপোর ঘণ্টা বেঁধে দিলে, সেও অদৃশ্য হয়ে যায়—উড়ে যায়। সে তো ছোট্ট মেয়ে—একা একা ঘুরতে ভয় পাবে বলেই, হাইতিতিকেও দয়াপরবশ হয়ে জাদুকর রুপোর ঘণ্টা দিয়ে গেছে। হাইতিতি সঙ্গে থাকলে, তার আর কোনো ভয় থাকে না।

বুড়ো মানুষটি কিছুতেই বিশ্বাস করছিল না তাকে। এমন আজগুবি কথা কে কবে শুনেছে! বাধ্য হয়ে ম্যাণ্ডেলা টুপি পরে দেখিয়েছে, খুলে দেখিয়েছে। হাইতিতি যে একটা ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা তাও দেখিয়েছে। রুপোর ঘণ্টা খুলে নিতেই হাইতিতি লাফিয়ে পড়েছিল, একেবারে বুড়ো মানুষটির নাকের ডগায়। সে বিশ্বাসই করতে পারেনি, হাইতিতি একটা ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা, আর এত চতুর। সারা দ্বীপে ছুটে বেড়িয়েছিল—কিন্তু শত হলেও বুড়ো মানুষ, পারবে কেন—ক্লান্ত অবসন্ন বুড়ো মানুষটি পাথরে হেলান দিয়ে বসে পড়েছিল—আর হাঁপাচ্ছিল। তারপর যখন বুঝল, না, ম্যাণ্ডেলা সত্যি সুন্দর ছোট্ট পরীর মতো একটা মেয়ে এবং হাইতিতিও সত্যি একটা ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা, তখন বিশ্বাস করেছিল, ঈশ্বরের পৃথিবীতে সবই সম্ভব। মানুষ তার কতটুকু জানে।

সেই মানুষটি দ্বীপে থাকতে থাকতে তার নাম ভুলে গেছিল। দেশের নামও মনে ছিল না। দ্বীপে থাকে। কচ্ছপের খোলে জল ধরে রাখে। পাখিরা উড়ে আসে দ্বীপের পাহাড়ে। তারা সেখানে বাসা বানায় মুখের লালা দিয়ে। সেই বাসা বুড়ো মানুষটা জলে ভিজিয়ে খায়—খুবই উপাদেয় স্যুপ। বুড়ো মানুষটার পাতার ঘরেও নিয়ে গেছে। বুড়ো মানুষটা সমুদ্রের ধার থেকে কচ্ছপের ডিম সংগ্রহ করে পুড়িয়েছে। ম্যাণ্ডেলাকে খেতে দিয়েছে। বড় বড় চিংড়িমাছ সমুদ্রের ধারে ধারে জলজ ঘাসের মধ্যে লাফিয়ে বেড়ায়। নীল স্ফটিক জল, খিদে পেলে চিংড়ি মাছ তুলে এনেছে। পুড়িয়ে নিজে খেয়েছে। তাকে খেতে দিয়েছে। তারপর ম্যাণ্ডেলা আবিষ্কার করেছিল, বুড়ো মানুষটা বিশাল একটা গাছের কাণ্ডে তার নাম লিখে রেখেছে, নদীর নাম, মেয়ের নাম। দ্বীপে এলে কেউ যেন তার অবর্তমানে টের পায় হানস ওটো নামে এক যুদ্ধপলাতক আসামী দ্বীপটায় জীবন অতিবাহিত করে দিয়েছে—তার কোনো

কষ্ট হয়নি। ঈশ্বর মানুষের জন্য সর্বত্রই বেঁচে থাকার কিছু না কিছু ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

হানস ওটোর কথাও সে তার মাকে বলেনি, মামাকে বলেনি। বললেই তাদের হাজার প্রশ্ন। এত প্রশ্নের জবাব দিতে তার ভাল লাগে না।

কোথায় সে দ্বীপ?

কোথায় কতদূরে সে বলতেই পারে না। কারণ পালকের গুণ, নিমেষে উড়ে যাওয়া যায়, মেঘেরা ভেসে যায় তার সঙ্গে। মেঘ কাটিয়ে বাতাসের আগে সে উড়ে যেতে পারে। আবার ইচ্ছে করলে মেঘের আড়ালে সে লুকিয়ে থাকতে পারে। দ্বীপটা কত দূরে, হাজার মাইল না তারও বেশি সে জানে না। সে শুধু জানে লোকটির নাম হানস ওটো। সে শুধু জানে তার মেয়ে আছে। ম্যাণ্ডেলারই বয়সী হবে হয়তো। নয়তো তাকে দেখে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলবে কেন? মেয়ের নাম, নদীর নাম গাছে লিখে রাখবে কেন! মানুষের তো সবচেয়ে প্রিয় তার নদী আর গ্রাম। গ্রামের নামও লিখে রেখেছিল। হানস ওটো কোন্‌দেশের লোক তাও সে জানে না। যে দেশেরই হোক, মেয়েকে ছেড়ে থাকার কষ্ট সব বাবারই এক। হানস নিজেও জানে না, কতকাল সে অতিবাহিত করেছে দ্বীপে। থাকতে থাকতে দ্বীপের গাছপালা, পাখি, প্রজাপতি তার বন্ধু হয়ে গেছে। নিজের গাঁয়ের নাম ভুলে গেছে। নদীর নামও। মানুষ যেখানে থাকে, বড় হয়; সে অরণ্যই হোক, নির্জন দ্বীপই হোক প্রিয় হয়ে যায় তার। হানসের তাই হয়েছিল, বুড়ো হয়ে সে ভুলেই গেছিল, তার দেশ আছে, বাড়ি আছে, নদী আছে, মেয়ে আছে।

এসব মনে হলেই ঝাবার জন্য তার কষ্ট বাড়ে। বাবাও একদিন ভুলে যাবে তার কথা, টিলার উপর তাদের লাল নীল রঙের কাঠের বাড়ির কথা। আপেল বাগানের কথা। গীর্জার কথাও ভুলে যেতে পারে। সে যে তার বাবার হাত ধরে পাইন ফেস্টিভ্যালে যেত—তাও ভুলে যেতে পারে। দ্বীপ কিংবা অরণ্যের গাছপালা, মানুষের কত প্রিয় হতে পারে হানস ওটোকে না দেখলে সে টের পেত না।

এই একটা আতঙ্ক থেকেই সে এত অস্থির। বাবা তার হয়তো একদিন বাড়ি ফেরার কথাই ভুলে যাবে।

বাবা যদি তার কথা ভুলে যায়, মা-র কথা ভুলে যায় তবে আর ম্যাণ্ডেলার বেঁচে থেকে কি হবে। ওয়াকার কথাও ভুলে যেতে পারে। সে বাড়ি না থাকলে, বেচারা ওয়াকাকে মামা কেবল ধমকাবে।—'গেল, কোথায় মেয়েটা? খুঁজে দ্যাখ!' তারপর বলবে, 'এত করে বলি, ম্যাণ্ডেলাকে ফেলে কোথাও যাস না, তাও তুই পাইনের জঙ্গলে ঢুকে গেলি! ওখানে কি আছে তোর! ওখানে গেলে সেই জাদুকরের দেখা পাওয়া যাবে! তুইও কি চাস, জাদুকর তোকে কিছু দেবে! ওটা তো পাথরের মূর্তি। সমুদ্রের কিনারে পড়েছিল। শহরের মেয়র খবর পেয়ে ছুটে গেছে। শিশুরাও। একেবারে রাজবেশ। সাদা পাথরের মূর্তি। মাথায় মিনা করা বাদশাহী টুপি, ময়ূরের পালক মাথায়, পরনে আলখাল্লা। পায়ে নাগরাই জুতো। পাথরের রাজপুত্র বলা যায়। তুই কি ভাবিস ওয়াকা, ম্যাণ্ডেলাকে জাদুকর অদৃশ্য করে রাখে! তুই কি জাদুকরের পায়ের কাছে বসে বারবার প্রার্থনা করিস, —ম্যাণ্ডেলার সুমতি দাও। ম্যাণ্ডেলা ফিরে এসেছে, ওকে আর তুমি অদৃশ্য করে রেখ না। বুচার মামা, লুসি মাসির ত্রাস বোঝো না। এমন একটা ছোট্ট মেয়ে বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে গেলে কত কষ্ট বল! সে কোথায় যায়, তুমি ঠিক জান। বলে দাও না, ম্যাণ্ডেলা কোথায় যায়। তুই মূর্তিটিকে তাই বলিস?'

ওয়াকার তখন এক কথা, 'না কর্তা কিছু বলি না তাকে?'

বুচার মামা বলবে, 'ফের যদি দেখি ওয়াকা, তুই জাদুকরের বাগানে ঢুকেছিস, পা খোঁড়া করে দেব।'

জাদুকর পাথরের। কোথা থেকে কিভাবে যে সমুদ্রের ঢেউ ফেলে দিয়ে গেছে তাকে, কেউ তা জানে না। তা এটা বেশ একটা রহস্য।

শহরের বেলাভূমিতে জাদুকর পড়ে আছে। সেই জাদুকর—যে জাহাজে এসেছিল, যে পাতার বাঁশি বাজাত—যে শিশুদের নিয়ে পাইন ফেস্টিভ্যালের দিনে, মিছিল বের করেছিল—ঠিক সেই পোশাকে, সেদিন সে যা পরে পাইন ফেস্টিভ্যালে শহরের রাস্তায় নেমে এসেছিল, শহরের মানুষজন তাকে দেখে তো অবাক—বাড়ির কাচ্চা-বাচ্চারা সব ছুটে বের হয়ে গেল, পাতার বাঁশির সুরে মুগ্ধ করে সব শিশুদের সে বের করে নিল, সে যদি মাস কাবার না হতেই পাথরের মূর্তি হয়ে ভেসে আসে আর বেলাভূমিতে পড়ে থাকে—তবে মানুষের দোষ কি! তারা তো অবাক হবেই।

ম্যাণ্ডেলা উড়ে যাচ্ছে, আর বাড়ির কথা ভাবছে। মা-র কথা, ওয়াকার কথা, মামা বুচার ঠিক বাগানে পায়চারি করছে। শহরের লোকজন বলাবলি শুরু করে দিয়েছে, ভুতুড়ে মেয়েটা সত্যি এবারে উধাও! এতদিন তো সে বাড়ির বাইরে কখনও থাকে না। শহরের ছেলে-মেয়েদের চোখেও ঘুম নেই সম্ভবত। ওয়াকা অস্থির হয়ে পড়বে। সে পাইনের জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবে। উপত্যকায় আপেলের বাগানে ঘুরে বেড়াবে কিংবা ভেড়ার পাল নিয়ে যারা নিচে নেমে যায়, তাদের কাছে খোঁজাখুঁজি করবে, 'ম্যাণ্ডেলাকে দেখেছ! কোথায় যে আছে! কোথায় যে গা ঢাকা দিয়ে থাকে। খায় কি!' অবশ্য খাবার ভাবনা থাকার কথা না। চেরি ফলের বাগানে ঢুকে গেলে চেরি ফল খেয়ে আনন্দেই দিন কাটিয়ে দিতে পারে—কিংবা আঙুরের ক্ষেতে যদি লুকিয়ে থাকে, তবে তো হাইতিতিরও খুব মজা। আঙুর খেতে ওস্তাদ। আর কোনো খামারে পালিয়ে থাকলে, সেখানে দুধ মাখন সব পাবে। নদী এবং হ্রদের পাড়ে পাড়ে ঘুরে বেড়ালেও তার ভয় থাকার কথা না। ম্যাণ্ডেলার ভারি মিষ্টি স্বভাব। সবাই তাকে আদর করে খাওয়াতে পারে। মেয়েটার মধ্যে ঐশী শক্তি আছে, এমনও এখন শহরের লোকজনরা বিশ্বাস করে। তার পক্ষে পাঁচ-সাতদিন নিখোঁজ হয়ে থাকা খুব কঠিন না। এমনকি এখন রাত জেগে ছাদে বসে থাকবে সবাই—ওর ফেরার সময় শহরের মাথায় ঘণ্টাধ্বনি হয়। সাধারণ মানুষ তো জানে না হাইতিতির গলায় ম্যাণ্ডেলা রুপোর ঘণ্টা বেঁধে দেয়। সে এই রুপোর ঘণ্টা পেল কোথায় তাও কেউ জানে না। তা হাইতিতি ভাসতে ভাসতে নেমে এলে ঘণ্টা বাজবে, ঘণ্টাধ্বনি হবে—এবং নীল আকাশে দেখা যাবে ছেঁড়া রুমালের মতো কি যেন দুটো ভেসে চলে আসছে। তখনই তারা বলবে, লুসির ভুতুড়ে মেয়েটা ফিরল। যাক্ কিছু যে হয়নি—কোথায় যায়! লুসির প্রাণে এবার জল এল! সবাই লুসিকে এজন্য কিছুটা মা মেরীর কাছাকাছি জননী ভেবে থাকে। তাকে সবাই ভক্তি শ্রদ্ধাও করে। বাগানের সুমিষ্ট ফল, ভেড়ার বাচ্চা উপহারও পাঠায় কেউ কেউ।

ম্যাণ্ডেলা দ্রুত বাতাস কেটে নেমে আসছে। এতদিন এভাবে তার বাইরে ঘোরা উচিত কাজ হয়নি। তারপরই মনে হলো, সে না থাকলে ফনের আদেশে মুম্বাটুকে পুড়িয়ে মারা হতো। একজন মানুষের প্রাণ বড়, না মা-র দুশ্চিন্তা বড় কিছুতেই ম্যাণ্ডেলা তার গুরুত্ব বুঝতে পারে না। মাকে সে কষ্ট দিতে চায় না। সেবারে, সেই প্রথম, পালকের টুপি আর রুপোর ঘণ্টা পেয়ে কি বোকামিই না করে ফেলেছিল! পাইনের জঙ্গলে এভাবে কেউ পালকের টুপি ফেলে রেখে যায় না। রুপোর ঘণ্টাও ফেলে রেখে যায় না। যদি যায়, তবে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য আছে। এবং সেদিনই স্বপ্নে কে যেন তাকে বলে গেল, আরে সেই জাদুকরই তো, তার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, ওটা অমূল্য জিনিস—তোমার বাবা নিখোঁজ। তাকে তুমি ওটা পরে খুঁজতে

যেতে পারবে। পৃথিবীর যে কোনো জায়গায়, তুমি ইচ্ছে মতো উড়ে যেতে পারবে। তারপর মনে হলো, না, যেন এটা জাদুকর তার হাতে দিয়েই বলেছিল—কি যে হয়, কখনও মনে হয় স্বপ্নে, কখনও মনে হয় বাস্তবেই মানুষটি তার নিখোঁজ বাবার কষ্ট বুঝে পালকের টুপিটি তাকে দিয়ে গেছিল। তবে রহস্যময় মনে হলেও তার কেন যে মনে হয়, জাদুকর বসন্তনিবাস তার ভালই চায়। এই যে সে ফনের রাজত্বে ঘুরে এল, তাও বোধহয় জাদুকরের ইচ্ছে। তা না হলে, সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে সে নিমেষে উড়ে যায় কি করে! তবে এটা মনে আছে, জাদুকর তাকে পইপই করে বলেছে, 'এই টুপির খবর, রুপোর ঘণ্টার খবর কেউ যেন না জানে—এতে মন্ত্রগুণ নষ্ট হয়ে যায়।' সে এজন্য কিছুই বলতে পারে না। ওড়াউড়ির শুরুতে লায়ন রকে গেছিল। সবে সে পালক আর রুপোর ঘণ্টা পেয়েছে। পেয়েই টুপিটা মাথায় দিতেই কেমন হালকা হয়ে গেল। উড়তে থাকল—তার খুব ভয় ধরে গেছিল—আরে বাতাসে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে যে তাকে! সমুদ্রের উপরে যে নিয়ে যাচ্ছে তাকে! যেই না ভয় সঙ্গে সঙ্গে সে দেখতে পায়, বাড়ির দিকে উড়ে যাচ্ছে—কি সুন্দর বাড়িটা—এত উপর থেকে তো সে তার বাড়ি কখনও দেখেনি। সবুজ পাইনের জঙ্গলে পাহাড়ের মাথায় বাড়িটা মনে হচ্ছিল, আশ্চর্য সুন্দর। সামনে সমুদ্র, সমুদ্রের বালিয়াড়িতে পাথরের জাদুকর একবার ঘাড় ফিরিয়ে তাকে দেখেও ছিল। বলেছিল, 'ভয় কি! মাথায় পালকের টুপি আছে, ভয় কি! তুমি যা ভাববে, ঠিক সেমতো টুপিটা কাজ করবে। তোমার ভয় ধরে গেল, তাই আবার বাড়ির দিকে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে তোমাকে।' তারপর বলেছিল, 'তুমি একা কেন—হাইতিতি কোথায়। ওকে সঙ্গে নাও। তারও তো আছে রুপোর ঘণ্টা। একা ওড়াউড়ি করলে ভয় পাবারই কথা। আমারও ভয় করত। এই যে সমুদ্রবেলায় তোমরা আমাকে পাথরের মূর্তিতে বন্দী করে রেখেছ, আমারও একা ভয় করে। ভয় করে বলেই তো সব পাখিরা ওড়াউড়ি করে মাথার উপর। রাতে যখন শহর ঘুমিয়ে পড়ে তখনও একটা বড় অ্যালবাট্রস পাখি আমার মাথায় চুপচাপ বসে থাকে। আমাকে সঙ্গ দেয়। কথা বলে। হাইতিতি সঙ্গে থাকলে তোমার ভয় করবে না। মানুষের সঙ্গে পাখি, প্রজাপতি, শুধু পাখি, প্রজাপতি কেন, সব প্রাণীরই একটা মধুর সম্পর্ক থাকে। যারা শুধু মানুষের কথা ভাবে, তারা স্বার্থপর। মানুষের সঙ্গে গাছপালারও গভীর সম্পর্ক। কেউ কাউকে ছেড়ে বাঁচতে পারে না। বড় হতে পারে না।'

রাত শেষ হয়ে আসছে। আকাশে স্বাতি নক্ষত্রের গায়ে যেন কুয়াশার জল লেগে গেছে। আকাশ আর নক্ষত্রমালার ভিতর ম্যাণ্ডেলা ভেসে যাচ্ছিল। ম্যাণ্ডেলা কত কিছু ভাবছিল। বাড়ি ফেরার সময়ই তার সব কথা মনে হয়। এমনকি বাবার লাগানো প্রিয় গাছগুলোর কথাও মনে হয়। কাঠের সেই লাল নীল বাড়িটার চারপাশে, বাবা কত দেশ থেকে সব সুন্দর সুন্দর গাছ এনে লাগিয়েছে। বাবার জন্য আগে মন খারাপ হলে সে গাছগুলির চারপাশে ঘুরে বেড়াত। সিলভার-রক গাছটিও তার প্রিয়। শুধু তার কেন, হাইতিতিরও। হাইতিতিকে তো গাছটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়। সুযোগ পেলেই সে জঙ্গলে ঢুকে যেতে চায়। এমনও হয় যে তাকে আর খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না। গেল কোথায়। ওয়াকা, সে, বুচার মামা পর্যন্ত টর্চ হাতে পাইনের জঙ্গলে খুঁজতে বের হয়। বাড়িটার নিচে বিশাল পাইনের বন—কতদূর চলে গেছে। কোথায় কোন জঙ্গলে ঘাপটি মেরে আছে তারা বুঝবে কি করে। না, খুঁজে খুঁজে কোথাও পাওয়া গেল না নিরাশ তারা। আর বাড়ি ফিরে দেখে, দুষ্টুটা সিলভার-ওক গাছের নিচে চুপচাপ বসে আছে। গাছটাকে হাইতিতিও কত ভালবাসে এটা যেন তার প্রমাণ।

সেই গাছটা সে কতদিন দেখে না। গাছটার নিচে বসে থাকে সকাল হলে। গাছের ছায়ায় নীল রঙের বেতের চেয়ারে সে বসে থাকে। হাইতিতি তখন একেবারে পোষা কুকুরের মতো। সে যা খাবে, ভাগ না পেলে ক্ষিপ্ত হয়ে কখনও গিয়ে সে জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ে। টমেটো সস দিয়ে স্যান্ডউইচ খেলে হাইতিতিরও চাই স্যান্ডউইচ, টমেটো সস। এত পাজি কখনও লাফিয়ে হাঁটুতে দু-পা রেখে ঝুঁকে দেখবে সে কি খাচ্ছে।

সেই গাছটাও তাকে টানছে, এই টানের জন্যই সে মেঘ ফুঁড়ে বের হয়ে আসছে। মেঘেরা কি, দায় নেই, দায়িত্ব নেই, তাদের মা-বাবাও নেই, ঘরবাড়ি তাদের কোথায় সে জানে না, মেঘেরা ঝরঝর করে ঝরে পড়লেই খালাস। তাদের মতো ঢিমেতালে ভেসে বেড়ালে চলবে কেন। সে সাঁ সাঁ করে উড়ে চলেছে, দুরন্ত ঈগল কিংবা কোনো অ্যালবাট্রস পাখির ঝাঁক নিমেষে পড়ে যাচ্ছে তার পেছনে। রকেটের মতো সে ছুটে চলেছে। মা রোজ আশা করছে, সকালে ঘুম থেকে উঠেই দেখতে পাবে তাকে! দুপুরেও খাবার নিয়ে বসে থাকছে হয়তো। রাতেও। আর রোজ ঠিক গীর্জায় যাচ্ছে প্রার্থনা করতে। রাত হলে চুপচাপ জানালায় দাঁড়িয়ে থাকবে। এখন আর আগের মতো মা ত্রাসে পড়ে যায় না। আগে তাকে না দেখলেই কান্নাকাটি জুড়ে দিত। বুচার মামাকে ফোন করত, 'ম্যাণ্ডেলাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।' ব্যস্। সারা শহর তোলপাড়—থানা-পুলিশ কত কিছু হয়েছে। কিন্তু যে উড়তে পারে, অদৃশ্য হয়ে থাকতে পারে, থানা-পুলিশের সাধ্য কি তাকে খুঁজে বের করে।

সেই সেবারে—দূর ছাই মনেও থাকে না। সেই সেবারে বললেই তো হয় না, আরে ঐ যে লায়ন রকে তারা যেবারে যায়—পুরো চব্বিশ ঘণ্টা নিখোঁজ। তা এতটুকুন ছোট্ট মেয়ের পক্ষে চব্বিশ ঘণ্টা নিখোঁজ হয়ে থাকা যে কত ঝকমারি—বাড়ি ফিরে হাড়েহাড়ে টের পেয়েছিল।

হাওয়ায় ভেসে বাড়ির কাছাকাছি আসতেই মনে হয়েছিল, তাদের বাড়িতে মানুষজনের ভিড়, পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ। কী হলো রে বাবা!

তাদের বাড়ির সামনে সুন্দর ঘাসের লন। সবুজ—আর সেখানে এত মানুষের ভিড়! নিচে পাইনের বনভূমি, সেখানেও লোকজন কি খোঁজাখুঁজি করছে। বাড়ির পেছনে সাদা পাহাড়—এপমন্ট হিল। প্রায় সারাটা বছর তুষার শৃঙ্গ রোদে ঝকমক করে। বৃষ্টির দিনে, কিংবা কুয়াশা হলে পাহাড়টা কখনও কখনও আড়ালে পড়ে যায়। তখন কেন যে বাড়িটা তাদের ন্যাড়া ন্যাড়া মনে হয় সে বুঝতে পারে না। কুয়াশা থাকায় সে পাহাড়টা দেখতে পায়নি—তবে পাহাড় না থাকলেও, সবই আগের মতো আছে। বনভূমির নিচে ছোট্ট বেলাভূমি। আর আছে অজস্র লাল নীল পাথর, ফুলের উপত্যকায় রাজবেশে জাদুকর দাঁড়িয়ে আছেন। এমনকি পাহাড়ের নিচে সবুজ ঘাসের চারণভূমিতে সে অজস্র ভেড়ার পালও দেখতে পেয়েছিল। সবই এত ঠিকঠাক, তবু কেন যে বাড়িতে তাদের এত লোকজন প্রথমে ঠাউর করতে পারেনি।

পরে বুঝেছিল, অ তাইতো, সে যে মনের আনন্দে হাইতিতিকে নিয়ে লায়ন রকে উড়ে গেছে তা তো কেউ জানে না' সে পাইনের বন থেকে উঠে আসার সময়ই সবাই হৈ চৈ বাধিয়ে দিয়েছিল—ঐ তো ম্যাণ্ডেলা! ঐ তো হাইতিতি! মা প্রায় পাগলের মতো ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরেছিল, আর হাউহাউ করে কাঁদছিল।

বুচার মামার গম্ভীর গলা, 'কোথায় গেছিলে—দিনকাল ভাল না, বিচ্ছু মেয়ে,

কোথায় গেছিলে—দিনকাল ভাল না তোমাকে নিয়ে তো আমরা সবাই পাগল হয়ে যাব দেখছি। বল, কোথায় গেছিলে!'

সে তো বলতে পারে না, লায়ন রকে গেছিল। জাদুকর যদি রাগ করে। জাদুকর তো স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলতেই পারে—'ম্যাণ্ডেলা তোমার একদম বুদ্ধি নেই। ওরা বিশ্বাস করবে—তুমি গেলে কি করে জানতে চাইবে না! এখন লায়ন রকে যাওয়া যায় না। ঝড়ের দরিয়া বলে ফেরি বন্ধ! স্বভাবতই প্রশ্ন উঠবে, তুমি গেলে কি করে? কি দরকার বলার, লায়ন রকে গেছিলে—চুপ করে থাকলেই তো হয়।

॥ দুই ॥

সে সেবারে অবশ্য মামার দাবড়ানিতে ভয়ে বলে ফেলেছিল সব। লায়ন রকে উড়ে গেছে। এমনকি টিউলিপ ফুল খেয়ে হাইতিতির কি আনন্দ। সে লাফায় আর টিউলিপ ফুল খায়। যত পায় তত খায়। কিন্তু মামা বিশ্বাসই করলেন না। ভাবলেন মিছে কথা বলছে।

গুরুগম্ভীর গলায় প্রশ্ন, 'এই তোমার শিক্ষা! তুমি জান না, গুরুজনদের সঙ্গে মিছে কথা বলতে নেই। আমরা খোঁজাখুঁজি করে হয়রান। বাড়িটার উপর এত ভুতুড়ে উপদ্রব। তোমার বাবা জাহাজে গেলেন, আর ফিরলেন না, তুমি বড় হতে না হতেই নিখোঁজ হয়ে গেলে। কোথায় না খুঁজেছি—পিকাকোরা পার্কে তন্নতন্ন করে খোঁজা হয়েছে। তোমার তো ধারণা, তোমার বাবা সেখানে লুকিয়ে আছেন। বল, সত্যি করে বল, কোথায় সারাটা দিন ঘাপটি মেরে ছিলে। না বললে,' বলেই লুসিকে ডেকে বললেন, 'তোমার অনেক ভোগান্তি আছে। এ মেয়ে তোমাকে ভোগাবে। যাও নিয়ে যাও। তালা বন্ধ করে ফেলে রাখ ঘরে। কোথায় যায় দেখব! বাবাকে খুঁজতে যায়। আর কিছু খোঁজার অজুহাত পেল না!'

সহৃদয় পুলিশ অফিসারটিই তাকে সেবারে বলতে গেলে রক্ষা করেছিল। বলেছিল, 'ওকে আর বকাবকি করবেন না। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ওকে কোনো প্রশ্ন করবেন না। নিজে না বললে, ভয় দেখিয়ে কথা বের করতে যাবেন না। শিশুরা একটু চঞ্চল হয়েই থাকে।' পুলিশ অফিসারটি আরও জানিয়েছিল, মিঃ হাসিমারা আসবেন। তিনি একজন শিশু বিশেষজ্ঞ। সেই বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিটিই হয়তো বলেছেন, নিরুদ্দেশ থেকে বাচ্চা ছেলেমেয়ে ঘরে ফিরে এলে তাকে অযথা প্রশ্ন করে উত্ত্যক্ত করতে নেই।

বুচার মামা এসব কারণেই বোধহয় নানা বিভ্রমে পড়ে গেছিলেন। তাকে বুকে তুলে নিয়ে বলেছিলেন, 'মা আমার খুব ভাল। বেশ বেড়িয়ে হাওয়া খেয়ে ফিরলে। তা কোথায় গেছিলে? নিশ্চয় খুব সুন্দর জায়গা। আমরাও না হয় যেতাম।' আর তখনই সে বোকামি করে ফেলল, 'জান বুচার মামা—আমরা না, লায়ন রকে গেছিলাম।'

বুচার হতভম্ব।

'লায়ন রকে! কেন? কি করতে!'

'বাবাকে খুঁজতে।'

বুচার মামা তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। বিশ্বাস করবে কেন, সে তার বাবাকে খুঁজতে লায়ন রকে গিয়েছিল। আসলে শিশুরা মনে মনে নানা জায়গায় ভ্রমণ করে থাকে। এও বোধহয় তাই—এমনই হয়তো ভেবেছিলেন বুচার মামা। শুধু বলেছিলেন, 'বাবাকে একা খুঁজতে গেলে? ভয় করল না।'

'একা কেন? সঙ্গে হাইতিতি ছিল। ওকে জিজ্ঞেস করে দেখ না?'

বোকা হাইতিতিও কম যায় না! সে সোজা ঢেকুর তুলে দুটো তাজা টিউলিপ ফুল জিভে তুলে এনেছিল। তারপর জিভ বের করে দেখিয়েছিল, মনের আনন্দে সে সারাদিন টিউলিপ ফুল খেয়ে বেড়িয়েছে। একমাত্র এসময়ে লায়ন রকেই টিউলিপ ফুল ফুঁটে থাকার কথা, অন্যত্র তারা যে ঝরে গেছে বুচার মামা কেন—সবাই সেটা জানে!

বুচার মামা এরপর আর কি প্রশ্ন করবেন বুঝতে পারছিলেন না। হতভম্ব অবস্থা বোধহয় কিছুটা কেটে গেছে। লোকজনের ভিড়ও পাতলা হয়ে আসছে। সবাই বলাবলি করছিল, 'মেয়েটার মাথায় নিশ্চয় ভূত চেপেছে।' অথবা বাবাকে খুঁজতে যায় বলায় মনে করেছে, শেষে তার বাবাই মেয়েটাকে খাবে। কোথায় কোন গভীর সমুদ্রে জাহাজডুবিতে মারা গেছে কে জানে—তার প্রেতাত্মা যে মেয়েটাকে ঘরছাড়া করতে চাইছে না, তারই বা ঠিক কি! বরং এসব ব্যাপারে পুলিশ, শিশুবিশেষজ্ঞ না ডেকে ওঝা গুণিন ডাকাই বেশি শ্রেয়। ঝাড়ফুঁক করলে নিরাময় হয়ে যেতে পারে।

ম্যাণ্ডেলা দেখছিল মাকে ঘিরে প্রতিবেশীরা নানা উপদেশ দিচ্ছে। ওয়াকা মা-র ফুটফরমাস খাটছে। ম্যাণ্ডেলা ফিরে আসায় তার আর কোনো দুশ্চিন্তা নেই। সেও লাফিয়ে বেড়াচ্ছে টুকিটাকি কাজ সারার সময়।

আসলে বুচার ভেবেছিলেন, পাইনের বনে ঢুকে মেয়েটা নির্ঘাত রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিল। তারপর ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে কোনো গাছের নিচে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারপরই মনে হলো, রাস্তা হারালে, ফের পথ চিনে বাড়ি এল কি করে! এও হতে পারে বাবার খোঁজে সে পাইনের বন পার হয়ে কোনো উপত্যকায় উঠে গেছিল। কিংবা কোনো আপেল বাগানে, বাবা নিখোঁজ—কোথায় আর যাবে, ঠিক খুঁজে বের করবে এমন আশাতেই সে আর বাড়ি ফেরার কথা মনে রাখতে পারেনি। এও হতে পারে বাবার কথা ভাবতে ভাবতে কোনো পাথরে বসে কাঁদছিল। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তারপর সকাল হলে বাড়ির কথা মনে হয়েছে। মার কথা মনে হয়েছে। আর স্থির থাকতে পারেনি। ঘুমিয়ে স্বপ্নও দেখতে পারে। স্বপ্নে সে লায়ন রকে ঘুরে আসতেই পারে। সুতরাং ম্যাণ্ডেলার বিশ্বাসকে বুচার ক্ষুণ্ণ করতে চায়নি। টিউলিপ ফুল সব ঝরে গেছে তাও বিশ্বাসযোগ্য নয়।

'তা হলে লায়ন রক থেকে ঘুরে এলে?'

'হ্যাঁ মামা।'

'বেশ করেছ। একা অবশ্য যাওয়া তোমার ঠিক হয়নি।'

'তুমি না মামা, খুব বোকা! হাইতিতি আমাকে ছেড়ে কোথাও যায়, কোথাও থাকে!'

বুচার অবশ্য তা জানেন। তার ভগ্নীপতির এই এক শখ ছিল—পৃথিবীর যেখানে যা কিছু পাওয়া যায় মেয়ের জন্য নিয়ে আসতে পারলে, যেন তার সমুদ্র-সফর সফল। আর ম্যাণ্ডেলারও আবদারের শেষ ছিল না।

'বাবা আমার চাই সিংহলের হাতি।'

বাবা তার জন্য সিংহল থেকে কাঠের হাতি কিনে এনেছিলেন।

'বাবা আমার চাই জাভাদ্বীপের গিরগিটি।'

বাবা ম্যাণ্ডেলার জন্য পাথরের গিরগিটি নিয়ে এলেন।

'বাবা আমার চাই, তুষার হরিণ!'

বাবা নিয়ে এলেন, রুপোর একটা সাদা হরিণ।

'বাবা আমার চাই ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা!'

ব্যস যেমন বাবা তেমনি তার মেয়ে। তিনি সেবারে নিয়ে এলেন সত্যি একটা জ্যান্ত ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা। ম্যাণ্ডেলা যা চায় তাই পায়। বাবার জাহাজ কবে ফিরবে সেই আশায় কতদিন জেটিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বাবার জাহাজ ফেরার কথা আছে জানলেই ম্যাণ্ডেলা বাড়ির লনে বসে সাদা জাহাজের অপেক্ষায় থাকে। বাড়িতে বসে থাকলে নীল সমুদ্র দেখারও একটা আনন্দ আছে। টিলার উপরে বাড়ি—সমুদ্র অনন্ত অসীমে মিশে গেছে—ঝড় এবং তরঙ্গমালা উভয়ই সে কাঁচের জানালায় দাঁড়িয়ে দেখতে পায়। নিচে পাইনের বনভূমি, গাছগুলি ঝড়ের দাপটে নুয়ে পড়ে। ঝড়ের ঝাপটায় গাছের ডালপালা ভেঙে পড়ে—কখনও সমুদ্রের জলকণা ভেসে এসে নানা কারুকার্য গড়ে দেয় জানালার কাঁচে। এমন মেয়ের জন্য বাবার কেন শখ হবে না—একটা জ্যান্ত ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা। মেয়ের মুখে হাসি ফোটাতে পারার জন্য বুচার জানেন, পারলে ভগ্নীপতি সারা পৃথিবীর সব বিচিত্র গাছপালা পাখি জীবজন্তু বাড়িটায় ছড়িয়ে দেয়—নানা মজা সৃষ্টি করার খুবই আগ্রহ তার।

সেই ভগ্নীপতি যেবারে ক্যাঙ্গারুর বাচ্চাটি নিয়ে জাহাজ থেকে নামল, কি ভিড় বাচ্চাটাকে দেখার জন্য। বাড়িতেও ভিড়। ম্যাণ্ডেলাকে খুশি করার জন্য সেবারে আর কাঠ নয়, পাথরের নয় একেবারে রক্তমাংসের জীব এনে হাজির করলেন। তবে ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা তো—পোষ মানবে কেন! খায় না, শুয়ে থাকে। ম্যাণ্ডেলা বোঝে ক্যাঙ্গারুরও মা-বাবা থাকে। মা-বাবার জন্য মন তো খারাপ করবেই।

'এই দুধ খাও।'

'খাবো না!'

'না খেলে, আমিও খাচ্ছি না।' ম্যাণ্ডেলা গুম মেরে বসে থাকত বাচ্চাটার সামনে। লুসি রাগারাগি করছে—'তুমি কি, মেয়ে বলল, আর জ্যান্ত একটা ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা ধরে আনলে! বাঁচবে।'

ম্যাণ্ডেলার মনে আছে, বাবা শুধু একটা কথাই বলেছিলেন, 'বাড়িতে ম্যাণ্ডেলা আছে। বাঁচবে। ভালবাসা পেলে কে না বাঁচে! বাঁচতে চায়!'

তখন তো বাচ্চাটা ভাল করে লাফাতেও পারত না। ম্যাণ্ডেলার আদরে মাথাটিও গেছে। ম্যাণ্ডেলা খেতে বসলে নিজেই লাফিয়ে এসে বসে পড়বে। টেবিলের চারপাশে চারটে চেয়ার। ডাইনিং টেবিলে কারুকাজ করা চিনামাটির প্লেট, বাটি, চা-এর পট, নুনদানি, জলের মগ। চারপাশে চারজন। বাবা মা একদিকে—সে আর হাইতিতি একদিকে। ওয়াকাই নামটা দিয়েছিল। বাড়িতে কেউ অতিথি এলে তার যে একটা নাম থাকে ওয়াকাই মনে করিয়ে দিয়েছিল।

কত নাম ঠিক করা হলো।

ম্যাণ্ডেলার একটাও পছন্দ না।

'সি-গাল।'

'সি-গাল কেন? ও কি পাখি! সি-গাল নাম রাখছ! ও কি উড়তে পারে? ওর কি ডানা আছে?'

বাবা বললেন, 'শ্যাময় নামটা বেশ।'

ম্যাণ্ডেলা জানে না শ্যাময় কোনো নাম হতে পারে। সেটা আবার কি বস্তু?

বাবা বলেছিলেন, 'শ্যাময় একপ্রকারের হরিণ। আলপস পর্বতমালায় তারা বিচরণ করে। তুষার হরিণও বলতে পার। রঙটা তো হরিণের মতো। শ্যাময় নামটাই আমার পছন্দ।'

মা ধমকে উঠেছিল, 'যেমন মেয়ে তেমনি বাবা। নাম নিয়ে এত দুশ্চিন্তা! কেউ খাচ্ছে না। কেউ কাঁটা চামচ ধরছে না। আর বাচ্চাটাও হয়েছে, দেখ, যেন সব বুঝতে পারে। সবার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কে কি নাম রাখতে চায়, নামটা পছন্দ কিনা, বোঝার চেষ্টা করছে।'

মা-র ধমকে সবারই মনে হলো, খাবার টেবিলে গল্পও করতে হয়, আবার খেতেও হয়। তারা শুধু গল্পই করছে। ওয়াকা ডাইনিং টেবিল সাজিয়ে ক্যাঙ্গারুর বাচ্চাটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে কি নাম রাখতে চায়, কারো সে বিষয়ে যেন কোনো আগ্রহ নেই জানার।

তার খুব অভিমান। সে কোনো কথা বলছে না। গুম মেরে একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। সে-ই যে বাজার থেকে, বন থেকে বাচ্চাটার জন্য খাবার সংগ্রহ করে আনে কেউ যদি তার কষ্টটা বুঝত। সে-ই তো আবিষ্কার করেছিল, বাচ্চাটা খেতে ভালবাসে আনারস আর তরমুজ। লেটুস পাতাও তার প্রিয় খাবার। আর বুনো ফল এবং গাছের নরম শেকড়-বাকড়। যেমন বনআলু তার খুব প্রিয়। জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে ওয়াকা লতা দেখলেই চিনতে পারে, কোনটা বনআলুর, কোনটা শালুই লতা। লতার ফল দেখলেও সে চিনতে পারে। দুটো লতাই একরকম দেখতে। পাতাও একরকমের। পানপাতার মতো। ওয়ালনাট গাছ কিংবা কৌরিপাইনের কাণ্ড খুব প্রিয় এ-দুটো লতারই। গাছের ডালপালা জড়িয়ে এমন বিতিকিচ্ছি অবস্থা করে ফেলে যে তখন গাছটাকে আর চেনাই যায় না। ঝুপড়ি মতো হয়ে যায় গাছটা। এত সব কারণে দু-একবার ওয়াকা যে না ঠকেছে তা নয়। বনআলু ভেবে লতার গুঁড়ি কুপিয়ে দেখা গেল, কিছুই নেই। শালুই লতার মূল বলে বিশেষ কিছু থাকে না। লতার নিচে হাতির দাঁতের মতো

নরম রসালো মূলও থাকে না। পরিশ্রমই বৃথা। এখন অবশ্য সে জঙ্গলে ঘুরে ফুল এবং ফল দেখে চিনতে পারে, কোনটা বনআলুর। কোনটা শালুই লতা। শালুই লতার ফুল এবং ফল দুই হয়। ফুলগুলি কাকটাস লতার ফুলের মতো। নীল রঙের। ফল হলে লম্বা পটলের মতো দেখতে। বিস্বাদ খেতে। মুখে দিলে বমি হবেই। আর বনআলুর কোনো ফুল হয় না। ফল হয়। ফলগুলি দেখতে বিশ্রী। বড় জড়ুলের মতো যেন থোকা থোকা ঝুলে থাকে। পুড়িয়ে খেতে দারুণ! বাচ্চাটা কি খায়, না খায় তাও জানা নেই। তবে দুধ খায়। দুধ সব বাচ্চারাই খায়। ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা দুধ খাবেই ধরে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দুধ তো বার বার খেতে ভাল লাগে না। মুখরোচক কিছু চাই। আর এজন্যই হাইতিতির ডিসে লেটুস পাতা, বনআলুর টুকরো—কিছুটা শাঁখআলুর মতো কেটে রাখা হয়েছে। আনারসও কেটে রাখা হয়েছে। সব রেডি—অথচ খাওয়ার নাম নেই। বাচ্চাটার নাম নিয়ে সবাই পড়েছে। অথচ ওয়াকার মতামত এ ব্যাপারে সবাই অগ্রাহ্য করছে। ওয়াকার তো রাগ হবেই।

ম্যাণ্ডেলা মা-র কথাতে সচকিত হয়ে গেছে। সত্যি তো কেউ কিছু মুখে তুলছে না। গ্রিন পিজ আর টমেটোর স্যুপ—ভাপ উঠতে উঠতে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, সে খেয়ালও নেই। মা-র তো রাগ হবেই। সাদা ন্যাপকিন ভাঁজ করা। কেউ খুলে হাঁটুতে বিছিয়েও নিচ্ছে না। যেন নামকরণ না হলে কেউ কিছু মুখে দেবে না ঠিক করেছে। অগত্যা কাঁটা চামচে গেঁথে নিল একটা লেটুস পাতা। ম্যাণ্ডেলা বাচ্চাটার মুখের কাছে নিয়ে গেলে, মুখ হাঁ করল। বাচ্চাটার বায়নাও শেষ ছিল না তখন! ম্যাণ্ডেলা না খাইয়ে দিলে কিচ্ছু মুখে দেবে না। একবার সে বাচ্চাটার মুখে খাবার তুলে দেয়, একবার সে চামচে স্যুপ খায়। আহার পর্ব শুরু হতেই বাবা যে কেন বললেন, 'ওয়াকা কি বলে?'

আর যায় কোথায়।

ওয়াকার মুখে একগাল হাসি।

সে বোধহয় রাগে ক্ষোভে ঘামছিল। তার তখন সব ঠাণ্ডা। সে জামার আস্তিনে মুখ মুছে বলল, 'হাইতিতি।'

'হাইতিতি আবার নাম হয় নাকি!' মা মুরগির রোস্ট কেটে সবার পাতে দেবার সময় কথাটা বলেছিল।

ব্যস, ওয়াকার আবার মন খারাপ। টিকল না। তার নাম পছন্দ না। সে ব্যাজার মুখে চায়ের পটে গরম জল ঢেলে দিল। খাওয়া হলে ওয়াকা সব যখন সাফ করে তুলে নিয়ে যাবে তখন সবাই এক পেয়ালা চা না হয় কফি খায়। সে হাতের কাছে সব যোগাড় রাখে। যে যার মতো পট থেকে চা নেয়। চিনি নেয়। দুধও নেয়। তবে বাবা চা-এর লিকারই বেশি পছন্দ করেন—তিনি তাঁর চা-এ কখনও দুধ মেশান না।

ম্যাণ্ডেলার খারাপ লাগছিল। ওয়াকার ব্যাজার মুখ সে একদম পছন্দ করতে পারে না। তাছাড়া ওয়াকারই তো ভাব ছিল বেশি জাদুকরের সঙ্গে। সেই তো জাদুকরকে শহরটা ঘুরিয়ে দেখিয়েছিল। সেই তো বাড়ি ফিরে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছিল—'জান, জাদুকর বসন্তনিবাস এসেছে শহরে। সে যা চায় পেয়ে যায়। আলখাল্লার ভিতর থেকে যখন তখন সে একটা বেড়ালের বাচ্চা বের করে আনে। তারপর জাদুকরের কান যত ফরফর করে নড়াচড়া করে তত বেড়ালছানাটা বড় হয়ে যায়। শেষে বাঘ হয়ে যায়। বাচ্চারা বাঘ দেখে খুশি হলে, জাদুকরের আর কান ফরফর করে না। বাঘটা ছোট হতে হতে শেষে আবার বেড়ালছানা হয়ে যায়। তারপর লাফিয়ে জাদুকরের আলখাল্লার পকেটে ঢুকে পড়ে।' তবে ওয়াকা এ-সব ম্যাণ্ডেলাকেই বলে। কারণ বড়রা তো বিশ্বাস করবে না। বাচ্চারা যা দেখতে পায় বড়রা তা দেখতে পাবে কেন।

তার মনে আছে, বাবা সেদিনই সমুদ্রযাত্রায় বের হয়ে গেছিলেন। খুব ইচ্ছে ছিল, জাদুকরের খবরটা বাবাকে দেয়। কিন্তু বাবা যদি বিশ্বাস না করে—ওয়াকা তো বলেছে, 'ছোটরা যা দেখতে পায়, বড়রা তা দেখতে পায় না। বড়রা বিশ্বাস নাও করতে পারে। বিশ্বাস না করলে জাদুকরের অপমান না! সে রেগে গেলে, তাদের ক্ষতিও করতে পারে। বিশ্বাসীদের জন্য জাদুকর—অবিশ্বাসীদের প্রতি জাদুকর খাপ্পা।' পরপরই ওয়াকা বলেছিল, 'আমাদের ধর্মে আছে, তুমি জান মেসাইয়া কি না করেছেন। তিনি ইচ্ছে করলে কুষ্ঠরুগীর আরোগ্য লাভ করাতে পারেন। মূক-বধির তাঁর কৃপায় কথা বলতে পারে, অন্ধ ব্যক্তি দৃষ্টি ফিরে পায়। মৃত ব্যক্তির জীবনলাভ হয়। অবিশ্বাসীরা এ-জন্যই তো বিধর্মী।'

খুবই অকাট্য যুক্তি।

ম্যাণ্ডেলা বাবাকে জাদুকরের খবর দিতে সাহসই পায়নি। আর সে-বারই তো বাবা জাহাজডুবিতে নিখোঁজ হয়ে গেলেন। বাবা কি কারো কাছ থেকে শহরে জাদুকরের আবির্ভাবের খবর পেয়েছিলেন! খবর পেয়ে কি তিনি অবিশ্বাস করেছিলেন—'যত্ত সব আজগুবি কথা!' জাদুকর আজগুবি হলে যীশুর দয়াও আজগুবি। কৈ তার বেলায় তো তিনি অন্ধজনে দেহ আলো গোছের। তিনি কত সব অলৌকিক ক্রিয়া কাণ্ড করে গেছেন, গীর্জায় গেলে কিংবা মা যখন অত্যন্ত নিরিবিলি পবিত্র গ্রন্থটি পাঠ করেন, তখন তো তিনি কখনও বলেন না—আজগুবি। বরং যীশুর দয়ার কথা পড়তে পড়তে মা কেঁদে চোখ ভাসায়। তারও যীশুর কথা শুনতে শুনতে কেন যে কান্না পায় বোঝে না। মনে হয়, তিনি একজন মাস্টার ম্যাজেসিয়ান। তাঁর দয়ায় মানুষ সঠিক পথের খোঁজ পায়। শয়তান শত লোভে ফেলেও তাঁকে কব্জা করতে পারেনি—মানুষের মঙ্গল ছাড়া মাস্টার ম্যাজেসিয়ান আর কিছু ভাবতেই পারতেন না। যীশু রাস্তায় আসছে জেনে দু'জন অন্ধলোক অপেক্ষা করছে। কাছে আসতেই তো তারা চিৎকার করে বলেছিল, প্রভু আপনি আমাদের স্পর্শ করুন। যীশু তাদের চোখে হাত রাখলেন। তারা আবার পৃথিবীর সব কিছু দেখতে পেল। কত বড় জাদুকর হলে এটা যে সম্ভব! বসন্তনিবাস তাকে পালকের টুপি দিয়ে গেছে—কাউকে বলা যায় না। অথচ তিনি যে একজন প্রবল জাদুকর কেউ বিশ্বাসই করবে না। যীশুর সেই গল্পটাও তো তার মনে গেঁথে আছে। সক্কাল বেলায় তিনি জেরুজালেমে ফিরছেন। বড় ক্ষুধার্ত। রাস্তায় একটা মরা যজ্ঞিডুমুরের গাছ দেখতে পেলেন। পাতা নেই, ফল নেই। তিনি শুধু বললেন, আমি ক্ষুধার্ত—তুমি কি আমাকে কিছু ডুমুর ফল দিতে পার না! সঙ্গে সঙ্গে গাছটি পাতা মেলে দিল। হাওয়ায় তার ডালপালা দুলতে থাকল। ডুমুর ফলে ভরে গেল ডালপালা। যীশুর শিষ্যরা তো দেখে অবাক। তাঁরা প্রশ্ন করলেন, প্রভুকে—কি করে সম্ভব? প্রভু বললেন, যদি তোমাদের অটুট বিশ্বাস থাকে, যদি কোনো সংশয় না থাকে, এর চেয়ে আরও অলৌকিক কাজ তোমরা ইচ্ছে করলে করতে পার। এই যে সামনে মাউন্ট অফ অলিভস রয়েছে, তাকে যদি বল, সমুদ্রে বিচরণ কর—তবে সে তাই করবে। যদি প্রার্থনায় বিশ্বাস জন্মায়, হেন কাজ নেই মানুষের মঙ্গলের জন্য তুমি তা করতে পার না।

ম্যাণ্ডেলা মা-র কাছে শুনেছে, আরও কত অলৌকিক ঘটনার কথা। বাবা জাহাজে চলে গেলে মা তো সারাদিন চুপচাপ কাজ করত, ঘর সাজাতো, বাবার লাগানো গাছগুলিতে জল দিত, তাকে নিয়ে বসাতো—হাতের লেখা, অংক ড্রইং সব খাতাগুলির মলাট দিত যত্নের সঙ্গে। ইস্কুলের নাম, তার নাম, কোন ক্লাস সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখে দিতে পারলে খুশি হতো। তারপর অবসর সময়ে যীশুর মহিমা পাঠ করে

জান বাবা লাঠিটা না খুব ভারি।

শোনাতো মা। বিশ্বাস করলে মাউন্ট অলিভসকেও যে নির্দেশ দেওয়া যায়, যাও সমুদ্রে গিয়ে বিচরণ কর—আর তক্ষুণি পাহাড়টা হয়তো চলে যাবে সমুদ্রে। আসলে বিশ্বাস। পালকের টুপি পরে সেটা আরও বেশি বুঝেছে। জাদুকরের প্রতি প্রবল বিশ্বাসই তাকে পালকের টুপিটা যেখানে খুশি নিয়ে যেতে পারে। যতই দুর্গম অঞ্চল হোক, যতই দূরের হোক সব দেশে সে ঘুরে বেড়াতে পারে। তার কি মজা কেউ বুঝবে না।

সে তো একদিন মাকে অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বলেছিল, 'আচ্ছা মা, পাহাড় কখনও সমুদ্রে বিচরণ করতে পারে। তার কি হাত পা আছে, যে হেঁটে বেড়াবে, নয় সাঁতার কাটবে। পাহাড় কখনও সমুদ্রে হেঁটে যেতে পারে!'

মা চোখ কপালে তুলে বলেছিল, 'বলছিস কি! অমন কথা মুখে কখনও বলবি না। তিনি ঈশ্বরের পুত্র। তাঁর মহিমা অপার। তিনি বললে সব হয়। তিনি ইচ্ছা করলে সব পারেন। পাহাড় কেন, সব এক মুহূর্তে লণ্ডভণ্ড হয়ে যেতে পারে। পাহাড় গুঁড়িয়ে যেতে পারে। সমুদ্রের জল তিনি অঙ্গুলি হেলনে শুষে নিতে পারেন। কখনও আর এমন কথা বলবে না।' বলে মা হাঁটু গেড়ে বসেছিল—বিড়বিড় করে প্রার্থনা করেছিল—'মেয়েটা অবুঝ প্রভু। তার দোষ ধর না।'

দূর থেকে দেখতে পাচ্ছে সেই প্রিয় এগমন্ট হিল। এই পাহাড়টার কোলেই তার প্রিয় শহর নিউ প্লাইমাউথ। সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের কোলে শহরটা। ধাপে ধাপে উপরে উঠে গেছে। বন্দর এলাকা পার হয়ে সি-ম্যান মিশান—ট্রাম গাড়ি এক বগির। গাড়িটা দুলকি চালে পাহাড়ের চড়াই উৎরাই পার হয়ে যখন যায়, তখন দূর থেকে মনে হয় খেলনার গাড়ি। তার কেবল ইচ্ছে হচ্ছে, কতক্ষণে সেই গাড়িটা তার দৃষ্টিগোচর হবে।

এ সব ভাবার সময়ই মনে হলো, বাবা ওয়াকার কথাই শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছিলেন। হাইতিতি নামটা ভারি সুন্দর। জব্বর নাম ঠিক করেছে ওয়াকা। তবু বাবার বোধহয় কোনো সংশয় ছিল নাম নিয়ে। তিনি ওয়াকাকে প্রশ্ন করেছিলেন,'নামটি তোর সুন্দর। কিন্তু হাইতিতি বললে তো কিছু বোঝায় না। এই যেমন সব নামেরই একটা ব্যাখ্যা থাকে—তোর নাম ওয়াকা। মাউরি উপজাতিদের ভাষায় ওয়াকা মানে সুন্দর। হাইতিতির মানেটা কি বুঝতে পারছি না।'

## ॥ তিন ॥

ওয়াকা সত্যি বিপদে পড়ে গেল। সে ভেবেও কিছু বলেনি—তবু কেন যে বাচ্চাটার নাম সে হাইতিতি রাখতে চাইছে। তারপরই এক গাল হেসে বলেছিল, 'আমরা ডাং খেলি না?'

'তা খেলিস। তোর তো কাজকাম না থাকলেই ডাং খেলার নেশা। তখন তোর পাত্তা পর্যন্ত পাওয়া যায় না। কোথায় যে লুকিয়ে পড়িস!'

বেচারা পড়ে গেল মহা ফাঁপরে। ঠিক নালিশ গেছে তার নামে। সে তবু কিঞ্চিৎ চুপচাপ থেকে কি ভাবল—তারপর বলল, 'ডাং ছুঁড়ে দেবার সময় আমরা চিৎকার করি—হাই।'

'হাই! সে আবার কি?'

'জিজ্ঞেস কর না ম্যাণ্ডেলাদিদিকে! কি তুমি চুপ করে আছ কেন? তুমি খেল না! আহা, কি ভাল মেয়ে সেজে বসে আছে!'

শহরটায় মাউরি উপজাতির লোকেদেরও বাড়িঘর আছে। তবে ম্যাণ্ডেলা বোঝে না, তারা কেন গরীব হয়। গরীব বলেই তো ওয়াকা সেই বাচ্চা বয়স থেকে তাদের বাড়িতে আছে। তার সঙ্গে বড় হচ্ছে। ওয়াকা ফাঁক পেলেই ডাং খেলতে চলে যায়। পাহাড়ের উপত্যকায় উঠে গেলে সে দেখতে পায় ওয়াকার বন্ধুরা তার অপেক্ষায় বসে আছে। এদের প্রায় সবার বাবামাই দিনেরবেলা কাজে বের হয়ে যায়। কেউ রাস্তা পরিষ্কার করে। কেউ আঙুরের জমি চাষ করে মালিকের হয়ে। মেয়েরা দোকানে কাজ করে। বাজারে নানা কিসিমের মাছও বিক্রি করে। সমুদ্রে মাছ ধরার জন্যও দলে দলে তারা বের হয়ে যায়। তখন বাড়ির কাচ্চাবাচ্চারা

স্বাধীন। যে যার মতো হুটোপুটি করে বেড়ায় অথবা সমুদ্রের ধারে ঘোরে। কেউ গিয়ে জেটিতেও বসে থাকে। নাবিকদের পিকাকোরা পার্কে চিনিয়ে নিয়ে যায়।

ম্যাণ্ডেলা বলছিল, 'জানো বাবা, একটা ছোট্ট লাঠি, সাইপ্রাস গাছের ডাল কেটে তৈরি। জান বাবা লাঠিটা না খুব ভারি। দল বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে সবাই। এক লাইনে কেউ আগু পিছু থাকতে পারবে না। তারপর না, দলের রাজা ঠিক হবে। তারপরে না, রাজা ডাং ছুঁড়ে দেবার সময় চিৎকার করে উঠবে—হাই। ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে সবাই এক পায়ে লাফাতে থাকবে। তি তি তি—সবাই এক পায়ে লাফিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আর মুখে তি তি বলছে। যে আগে যেতে পারবে, আগে কব্জা করতে পারবে ডাং সেই হবে ফের দলের রাজা।'

বাবা বলেছিল, 'বা, সুন্দর খেলা তো। তা এই হাইতিতি খেলার সঙ্গী হতে পারি না আমি?'

বাবা জাহাজ থেকে ফিরে এলে মাঝে মাঝে বড় ছেলেমানুষ হয়ে যেত। একবার তো সত্যি ওয়াকার সঙ্গে ডাং খেলতে চলে গেল।

মার এক কথা, 'তোর বাবা গেল কোথায়!' ম্যাণ্ডেলাও জানে না, গেল কোথায়। বাবা বাড়ি নেই, ওয়াকাও নেই, এমনকি হাইতিতি নেই—তা ওয়াকা বাচ্চা হাইতিতিকে নিয়ে মাঝে মাঝে শহরে ঘুরতে বের হয়। কখনো ম্যাণ্ডেলা সঙ্গে থাকে। শহরটা না চিনলে হবে কি করে! তারা হাইতিতিকে নিয়ে পিকাকোরা পার্কেও বেড়াতে গেছে। মুশকিল, হাইতিতিকে দেখলে সব বাচ্চাদের কেন যে ল্যাজ গজিয়ে যায়। ভিড়ে হাঁটা যায় না কখনও। আর নানা প্রকারের দুষ্টুমি—কেউ কান টেনে দেয়—লম্বা কান বলে টানতে খুবই সুবিধা। কেউ ল্যাজ টেনে দেয়। কেউ আবার চিমটি পর্যন্ত কাটে। তখনই রেগে যায় ওয়াকা। '—কি হচ্ছে, এটা কি বাঁদর, এটা কি কুকুর! হ্যাঁ, তোরা বাচ্চাটার পেছনে লেগেছিস! জানিস ফু মন্তরে বাঘ বানিয়ে দিতে পারি—জানিস ইচ্ছে করলে হাতি হয়ে যেতে পারে। বাঁদরামি করছিস্, জাদুকরের কথা মনে নেই—' আর তখনই সবাই খুব ভাল ছেলে। একেবারে ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না। তারা তো দেখেছে জাদুকরের সঙ্গী ওয়াকাকে। ওয়াকা বললেই তো জাদুকর যে যা চাইত দিত। দুষ্টুমি করলে জাদুকরকে বলত, 'না, দেবে না। তোমার পেছনে লুকাই প্যাক দিচ্ছিল। তুমি টের পাওনি। ওকে পাতার বাঁশিও দেবে না।' জাদুকর পাইন পাতা দিয়ে সব সুন্দর সুন্দর বাঁশি বানিয়ে দিয়ে গেছে তাদের। এখনও তারা পাইন ফেস্টিভ্যালের দিন, পাতার বাঁশি বের করে সমস্বরে আশ্চর্য মিউজিক তৈরি করে। তখন শহরের লোকজন না বলে পারে না, ভাগ্যিস জাদুকর বসন্তনিবাস জাহাজে করে এসেছিল, পাতার বাঁশি বানিয়ে দিয়েছিল বাচ্চাদের, না দিলে এমন একটা সুন্দর বন্দর শহরে এই আশ্চর্য মিউজিকের খবরই কেউ পেত না। এখন তো নানা সাজপোশাকে পাইন পাতার পোশাক পরে সবাই যখন শহরের বড় গীর্জার দিকে হাঁটে তখন এই মিউজিক শোনার জন্য রাস্তার পাশে, ঘরের ছাদে, জানালায় মানুষের উপচে পড়া ভিড়। জাদুকর বলেই সম্ভব, যেন এই শহরে সবই ছিল—ছিল না কোনো অকল্পনীয় মিউজিক। যার স্রষ্টাও জাদুকর নিজে। সে সেবারে মিছিলটি নিজেই পরিচালনা করছিল। তার লম্বা আলখাল্লার উপর পাইন পাতার নানা বাহার। ওয়াকাই বুঝিয়েছিল, 'তুমি জান না বসন্তনিবাস, এটা আমাদের সবচেয়ে বড় উৎসব। সারাদিন সারারাত উৎসব চলবে। যে যার মতো বাহারি মিছিল বের করবে। আমরা বের করব বাঁশির মিছিল। সবার হাতে থাকবে পাইন পাতার বাঁশি, তুমি তো সুন্দর সুন্দর বাঁশি বানিয়ে দিয়েছ আমাদের। মন ভাল না থাকলে আমরা সমুদ্রের ধারে ধারে ঘুরি আর বাঁশি বাজাই। বাঁশির সুর কতদূর থেকে শোনা যায়! আর কি সুমিষ্ট। তখন মানুষের তো দুঃখকষ্টও থাকে না। তোমার হাতেও থাকবে লম্বা পাইন পাতার বাঁশি। ক্লারিওনেটের মতো লম্বা। তুমি যে সুর দেবে, সেই সুরে আমরা বাঁশি বাজাব। শহরের লোকজন বুঝতে পারবে, কত বড় ওস্তাদ লোক তুমি!'

সুতরাং ম্যাণ্ডেলার কেন যে মনে হয়েছিল, বাবা, ওয়াকা কোথাও কোনো নির্জনে বসে পাতার বাঁশিও বাজাতে পারে। কে জানে, বাবা হয়তো চুপি চুপি বলছে—'এই ওয়াকা, আমাকে দিবি একটা পাতার বাঁশি। আমি বড় হয়ে গেছি বলে কি বাঁশি বাজাতে পারি না। ছোটরা যা পারে, বড়রাও তাই পারে। ছোটদের মতো বড়দেরও ইচ্ছে হয় পাতার বাঁশি বাজিয়ে যদি দুঃখকষ্ট ভুলে থাকা যায়।' তা জাহাজে উঠলে তো ফেরার দিনক্ষণ ঠিক থাকে না। কবে জাহাজ ফিরবে কেউ জানেও না। পাঁচ-সাত মাস এমনকি কখনও বছর কাবার হয়ে যায়। তখন তো বাবার মন বাড়িঘরের জন্য খারাপ লাগতেই পারে। পাতার বাঁশি বাজাতে জানলে, মানুষের যে দুঃখকষ্ট অনেক লাঘব হয় বাবাও বোধ হয় টের পেয়েছিলেন।

বেশ বেলা হয়ে গেছিল বাবার ফিরতে। মা কেবল ঘরবার করছিল।

'গেল কোথায়? দ্যাখ না ম্যাণ্ডেলা সে গেল কোথায়। আরে ওয়াকার না হয় কাণ্ডজ্ঞান থাকতে না পারে, তাই বলে সে না বলে কয়ে সকালে বের হয়ে গেল!'

ম্যাণ্ডেলার কি যে তখন রাগ হচ্ছিল! তাকে ফেলে চুপচাপ বাবা চলে গেল। একবার বলতেও পারল না, 'আমরা যাচ্ছি, তুই যাবি!' ওয়াকা বাবার এত প্রিয় হয়ে গেল! সে তার বাবার কেউ না!

ম্যাণ্ডেলার তখন এক জবাব, 'জানি না, কোথায় গেছে তারা। আমি জানব কি করে।' মাছ ধরতে গেলে ছিপ ছুইল ঘরে পড়ে থাকত না। মাছের খবর ওয়াকা ভালো জানে। সমুদ্রে সারডিনের ঝাঁক কখন উঠে আসে সেই ঠিক খবর দিতে পারে। মাছ ধরার নেশা ওয়াকারও কম নেই। তার দাদুর ছোট্ট সরু সাদা নৌকাটির সে মালিক। দাদু ছিলেন মাছ মারার ওস্তাদ লোক। মৃত্যুর আগে নৌকাটি নাকি ওয়াকাকে দান করে গেছেন। আর নৌকাটিরও আছে নানা বাহারি শখ। সে যেদিকে যেতে চায়, যেতে দিতে হয়। যেমন চিংড়িমাছ বড় বড়—প্রায় হাতখানেক এক একটা লম্বা—নৌকাটিই তার খবর জানে, কোথায় আছে কি মাছ!—সমুদ্রে কবে যে নৌকাটি ভাসানো হয়েছিল কেউ জানে না। সরু ছিপনৌকা। খুবই ছোট। একজনের বেশি আরোহী উঠতে পারে না। আর এর আশ্চর্য ক্ষমতা বিশাল বিশাল ঢেউ অবলীলায় পার হয়ে যাওয়া। যতই ঝড় থাকুক সমুদ্রে, হাল ঠিক রাখতে পারলে সাধ্য কি ঢেউ নৌকাটিকে গ্রাস করতে পারে! চেষ্টারও ত্রুটি নেই। নৌকাটি ভাসলেই সমুদ্রের তর্জন গর্জন শুরু হয়। আবার তুমি! দেখাচ্ছি মজা। দু-হাত তুলে, হা রে রে করে ঢেউগুলি নৌকাটিকে তেড়ে আসে। ওয়াকা নিপুণভাবে সমুদ্রের উপর তার নৌকা ভাসিয়ে দূরে দূরে চলে যায়। এটাও তার এক ভারি মজার খেলা। ফেরার সময় নৌকায় থাকে নানা রঙের ঝিনুক, শঙ্খ, চিংড়িমাছ বড় বড়। আর সারডিন মাছ। সে নৌকার খোল থেকে মাছগুলি যখন সমুদ্রের কিনারে নামিয়ে আনে, ম্যাণ্ডেলার কি আনন্দ। বেছে বেছে তাজা আর সুস্বাদু মাছগুলি ম্যাণ্ডেলা দিদির জন্য রেখে দেয়। বাকি সব দিয়ে দেয় তার জাতভাইদের। সে মাছ কখনও বিক্রি করে না।

ওয়াকা সমুদ্রে গেছে খবর পেলেই তার জ্ঞাতিভাইরা সব ছুটে আসবে বেলাভূমিতে। ওয়াকা যখন মাছ ধরতে গেছে, তখন সে খোল ভর্তি করে মাছ শিকার করে ফিরবেই। সবাই

ঝুড়ি নিয়ে বসে থাকে। ওয়াকা নৌকা টেনে বালিয়াড়িতে তুলে আনলে সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু ওয়াকা তখন খুব গম্ভীর। সে বেশ বড়দের মতো তখন কথা বলে।

'লাইন দিয়ে দাঁড়াও।'

সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে যায়।

'এস এক এক করে।'

সবাই এক এক করে এলে ভালমন্দ মিশিয়ে মাছ তুলে দেয়।

কাজেই বাবা ওয়াকার পাল্লায় পড়ে মাছ শিকারেও যেতে পারে। ওয়াকার তো মাথার ঠিক নেই—এক ভেবে বাবুর সঙ্গে বেড়াতে বের হয়েছে, আর এক ভেবে নৌকায় উঠে গেছে! বাবা যে তার কত ছেলেমানুষ তখনই টের পায় ম্যাণ্ডেলা। তা না হলে বাড়ির কাজের ছেলেটি কখনও মনিবের মতো কথা বলতে পারে—'চলুন কর্তা বাঁশি বাজাইগে। চলুন কর্তা ডাং খেলিগে। চলুন কর্তা মাছ শিকারে।' আরে কারো বাবা কি এমন হলে হয়! নিজের মর্জির কথা বুঝতে হয় না। ওয়াকার মর্জিতে যেখানে সেখানে চলে যাওয়া কি ঠিক!

কাজেই ম্যাণ্ডেলার গোঁসা হবে না তো কার হবে! তার দায় পড়েছে, কোথায় গেল তারা রোদে বের হয়ে খুঁজতে হবে। ডাকাডাকি করতে হবে।

বাবা কেন যে জাহাজ থেকে ফিরলে এত ছেলেমানুষ হয়ে যেত সে বুঝত না। এটাই ছিল তার ক্ষোভের কারণ। যেন ওয়াকা বাড়ির কাজের ছেলে নয়, বাবার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

সেই বাবা আর ওয়াকা ফিলে এল। পাইনের জঙ্গল ভেঙে উপরে উঠে এল! হাইতিতিও ফিরছে। তিনজন একেবারে যেন বিশ্বজয় করে ফিরেছে। তিনজনের কাছেই পাইন পাতার বাঁশি। বাবারটা হাতে, ওয়াকারটা পকেটে গোঁজা আর হাইতিতির বাঁশিটা বগলে।

এখন কেন যে মনে হয়, জাদুকর শহরের শিশুদের খুশি করার জন্য, যে যা চেয়েছে দিয়ে গেছে। যেমন ওয়াকাকে দিয়ে গেছে পাতার বাঁশি। পাইন পাতা দিয়ে কি করে সুন্দর বাঁশি বানানো যায় সে-ই শুধু জানে। আর সবাই যে চেষ্টা না করেছে তা নয়, কিন্তু পাতা মুড়ে বাঁশি হয় তবে কোনো সুর থাকে না। ফুঁ দিলে সুমিষ্ট সুর ভেসে বেড়ায় না। ওয়াকাকে এই জাদুবিদ্যা দেওয়ায় সে কি খুশি! ওয়াকা তো জানে না, তাকেও দিয়ে গেছে পালকের টুপি, হাইতিতিকেও দিয়ে গেছে রুপোর ঘণ্টা। ওয়াকা মনে করে জাদুকর কেবল তাকেই ভালোবাসত। ম্যাণ্ডেলাদিদিকে সেই তো জাদুকরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। সেই ম্যাণ্ডেলাদিদি যে আরও আশ্চর্য টুপির মালিক ওয়াকা জানেই না। ওয়াকার এত অনুগত ছিল বসন্তনিবাস যে সে ছাড়া কাউকে কোনো জাদুবিদ্যার অধিকারী করবে বিশ্বাস করতে পারত না। অন্তত যেদিন বসন্তনিবাস জাহাজে চলে গেল সেইদিন তো মনে হয়েছিল, ওয়াকাই জাদুকরের প্রিয়জন। সে শহরের সব শিশুদের এনে জড় করেছিল জাহাজঘাটায়। বড় বড় ক্রেনের নিচে দাঁড়িয়ে তারা সাদা রঙের পোশাকে বিদায় জানিয়েছিল জাদুকর বসন্ত-নিবাসকে। তারা সবাই একটি আশ্চর্য মেলডি পাতার বাঁশিতে সৃষ্টি করেছিল। সেই সুরে কান্না পায়নি, এমন একটি শিশুও ছিল না জেটিতে। ম্যাণ্ডেলা আর ওয়াকা মাঝখানে। তাদের দুজনের মাঝখানে হাইতিতি। হাইতিতি পর্যন্ত অপলক দেখছিল, জাহাজে সেই ক্ষেপাটে নাবিক দাঁড়িয়ে আছে। অন্তত জাহাজের ছোটবাবু ওয়াকাকে কানে কানে ফিসফিস করে বলেছিল, 'নজর রেখ। জাহাজ থেকে পালিয়ে কোথায় যে গিয়ে বসে থাকে—আমরা খুঁজতে বের হই। দেখছ তো কেমন কিম্ভূতকিমাকার পোশাক পরে জাহাজ থেকে নেমে আসে! লক্ষ্মী ছেলে, খবর দিতে পারলে জাহাজের কাপ্তান খুশি হবে।' ওয়াকা জাদুকরকে ক্ষেপাটে লোক বলায় খুবই ক্ষুব্ধ হতো। তবে প্রকাশ করত না। সে বলত, 'ছোটবাবু, জাদুকর কখনও ক্ষেপাটে হয়! আমরা যা চাই তিনি তাই দেন। চাইতে জানতে হয়।' তবে আপনি সার, যখন বলেছেন, জাহাজে পৌঁছে দিতে, যতই রাত হোক বসন্তনিবাসকে আমরা জাহাজে ঠিক পৌঁছে দেব। যত রাতই হোক ওয়াকা বসন্তনিবাসকে জাহাজঘাটায় পৌঁছে দিত। জাহাজের ছোটবাবু এবং আরও দু চারজন নাবিক টর্চ হাতে সি-ম্যান মিশানের সামনে অপেক্ষা করত। ওয়াকা বসন্তনিবাসকে যত রাতই হোক জাহাজঘাটায় পৌঁছে দেবে এমন বিশ্বাস তাদের যথেষ্টই ছিল।

সেই ওয়াকা পাতার বাঁশি পেয়েই খুশি। জাদুকরের জন্য মন খারাপ হলে, সে চুপচাপ জাদুকরের মূর্তির পায়ের কাছে গিয়ে বসে থাকে। শহরের মানুষেরা অবাক হবে না! জাদুকর জাহাজে চলে গেল, ওয়াকা তার ব্যান্ড বাজিয়ে বিদায় জানাল—হাজার হাজার বেলুন উড়িয়ে দেওয়া হলো বাতাসে—আর সাদা জাহাজ যত দূরে যায়, তারা দেখতে পায়, জাদুকর একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে ডেকে। শিশুদের উদ্দেশে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে—যেন বলতে চায় সব শিশুদের মনেই আছেন একজন জাদুকর—যে তাকে যে-ভাবে চিনতে পারে। সাদা জাহাজ নীল জলে ক্রমে অদৃশ্য হয়ে গেলে ওয়াকা ফিরে এসেছিল—আর কি কান্না! বোধহয় জাদুকর ওয়াকার কষ্ট টের পেয়েই মাস কাবার না হতেই বেলাভূমিতে এসে তিনি পড়ে থাকলেন। সেই এক পোশাক। একই রকমের নাগরাই জুতো, মাথায় ময়ূরের পালক—একেবারে রাজবেশ। জাদুকর ছিলেন রক্তমাংসের, হয়ে গেলেন শেষে সাদা পাথরের মূর্তি।

আর তাই না দেখে শহরবাসীদের চোখ কপালে উঠে গেল। একজন জাদুকর যদি পাথরের মূর্তি হয়ে শহরের শিশুদের কাছে ফের ফিরে আসেন, তবে তাঁকে অবহেলা করা যায় না। বাচ্চাদের শুভ-অশুভ বলে কথা। সব বাবা-মারাই তো চায় তাদের শিশুরা বড় হয়ে উঠুক—পৃথিবীর তাবৎ স্বপ্ন নিয়ে। নগরপাল সভা করলেন তখন, এই মূর্তি নিয়ে কি করা! শিশুরা দাবি করল, বেলাভূমিতেই মূর্তিটি বসিয়ে দেওয়া হোক। গড়ে তোলা হোক সুন্দর একটি বাগান। বাগানে নানা ফুলের গাছ লাগিয়ে দেওয়া হোক। আর যেসব পাখিরা ফুল ভালোবাসে মধু খেতে ভালোবাসে তাদের বলা হোক, এখানেই এসে তোমরা থাকবে। কেউ তোমাদের ক্ষতি করবে না।

## ।। চার ।।

দূর থেকে যত শহরের কাছে উড়ে যাচ্ছে তত ম্যাণ্ডেলা উত্তেজিত হয়ে পড়ছে। প্রথমেই দেখতে পাবে সেই বিশাল পর্বতশ্রেণী। এগমন্ট হিলের শৃঙ্গগুলি বরফে ঢেকে থাকে। রোদের বর্ণছটায় ঝিকমিক করে পাহাড়চুড়ো। কখনও মনে হয় সোনালি পাহাড়। কখনও রূপালি পাহাড়। তার সেই বর্ণছটায় রাতেও কেমন শহরটা বিভোর হয়ে থাকে। আকাশের দিকে তাকালে চোখে পড়বে অনন্ত হয়ে আছে সেই পাহাড়ের দেশটা। সে এত জায়গায় উড়ে গেছে নিজের এই পাহাড়টির উপরে কখনও উড়ে যায়নি। দু' চোখ মেলে তার প্রিয় এই পাহাড় দেখার ইচ্ছে কেন যে হয়নি বোঝে না। দূর থেকে পাহাড় যত রহস্যময় ঠেকে, কাছে গেলে তা হারিয়ে যেতে পারে। এই আতঙ্কেই হয়তো সে কখনও পাহাড়ের উপর দিয়ে উড়ে যায়নি। যেন পাহাড়টা আছে থাক। সে তার রহস্য নিয়ে সারাজীবন ম্যাণ্ডেলার মনে বেঁচে থাক। উড়ে গেলেই দেখতে পাবে, সেই একই বনভূমি, নদীর খাদ কিংবা যেমন আর দশটা পাহাড় থেকে ঝর্ণা নেমে আসে তেমনি কোনো নিরাভরণ ঝর্ণা নিয়ে জেগে আছে পাহাড়টা। দিন রাত জল পড়ার ঝরোঝরো শব্দ যদি

কখনও একঘেয়ে মনে হয়, তবে যেন পাহাড়ের মহিমা খাটো হয়ে যাবে।

তারপর আরও কাছে গেলে সে দেখতে পাবে পাহাড়ের কোলে সব আপেল কমলালেবুর বাগান, পাকা সড়ক—লাল-নীল কাঠের বাড়ি। গাছগুলিতে আপেল আর আপেল। গোলাপি কিংবা টকটকে সিঁদুরের রঙ আপেলের গায়। উপত্যকায় এই আপেলের বাগানগুলি কি যে টাটকা আর তাজা! মাঝে মাঝে এখানে সেখানে কৌরিপাইনের জঙ্গল, নিচে আবাদের ভূমি কিংবা মেষপালকরা অস্থায়ী কুটীর বানিয়ে চলে আসে এখানে। সারাদিন তারা ভেড়ার পাল নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ঘাস খাওয়ায়। রাতে মাঠের মধ্যেই ঘুমিয়ে থাকে ভেড়ার পাল। গুঁতোগুঁতিও করে—তখন মেষপালকের কাজ ছুটে যাওয়া। ঝগড়া থামিয়ে দিতে না পারলে শিং-ফিংভেঙে রক্তপাত। বড় বিশ্রী ব্যাপার। মেষপালক কুটীরে শুয়ে থাকে খড়ের বিছানায়। কখনও সে নির্জন প্রান্তরে সেই বাঁশি বাজায়। যা দিয়ে গেছে বসন্তনিবাস সবার হাতে হাতে।

নিচে সেই সমুদ্র কিংবা দ্বিপটিকে শুধু সে দেখতে পাচ্ছে। দুটো একটা জেলেডিঙ্গিও দেখতে পেল। সকাল হচ্ছে। এবারে দূরে এক ঝলক আলোর মতো পাহাড়টা চোখে ভেসে উঠল। তার চোখ ধাঁধিয়ে গেছে। তুষারশৃঙ্গে সূর্যোদয়ের সময় তাকালে যা হয়! সে কেমন মুহ্যমান হয়ে পড়ে। হাইতিতি উড়ে যাচ্ছে আরও বেগে। সে বোধহয় ভেবেছে ম্যাণ্ডেলার আগে পাইনের বনভূমিতে টুপ করে নেমে পড়বে। হাইতিতির এই এক দোষ। কিছু বুঝতে চায় না। মাঝে মাঝে গোয়ার্তুমিও করে ফেলে—সে যা বলে হাইতিতি তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। বোঝে না—সমুদ্রপাখিরা পথ ভুল করে অন্য কোথাও নিয়ে যেতে পারে। সমুদ্রের উপর উড়ে যাওয়া এমনিতেই কঠিন—কেবল ম্যাণ্ডেলা জানে, সে বাড়ি ফিরছে, বাড়ির জন্য তার মন খারাপ, মাকে দেখার জন্য সে উত্তেজিত হয়ে আছে—পালকের টুপি জানে, সে কি চায়। জানে বলেই সে বাড়ি ফিরে যেতে পারছে—হাইতিতির তা না। হাইতিতির মা-বাবার কথাও বোধহয় মনে নেই। সমুদ্রে ঝাঁক ঝাঁক পাখি দেখলেই সে তাদের সঙ্গে খেলা করে বেড়ায়। উড়ে বেড়ায়, ওরা যদি কোনো দ্বীপের দিকে ধাওয়া করে, সেও পিছু নেয়। পিছু নিলে তাদের যে নিজের দেশে ফেরা হবে না হাইতিতি বোঝে না। এত বোকা। ডাকলেও শোনে না। তখন আর কি করা। অগত্যা ছুটে যেতে হয়, ডাকতে হয়, হাইতিতি ভালো হচ্ছে না। পাখিদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা ভাল। কিন্তু পাখিরা জলে ভেসে থাকতে পারে, ঘুমাতে পারে, তুমি পারবে ডালে বসে থাকতে, ঘুমাতে পারবে। খাবে কি! পাখিরা ছোঁ মেরে সমুদ্র থেকে মাছ তুলে নিতে পারে দরকারে! তুমি পারবে। তোমার কি আর কখনও কাণ্ডজ্ঞান হবে না!

কে শোনে কার কথা।

অগত্যা ছুটে গিয়ে কান টেনে ধরতে হয়—বলতে হয়, 'ওদিকে নয়, এদিকে। ওদের সঙ্গে কোথায় রওনা হলে! ফিরছি বাড়ি, মন ভালো নেই, মা কত চিন্তা করছে—আর তুমি পাখিদের দেশে উড়ে যেতে চাও। সে না হয় যাওয়া যাবে। ওড়া তো তোমার ফুরিয়ে যায়নি। ম্যাণ্ডেলাদিদি তোমাকে একবার পাখিদের দেশও ঘুরিয়ে আনবে। এখন চল। লক্ষ্মী ভাইটি।'

হাইতিতি রেগে যায়।

'তুমি আমার কান ধরলে কেন?'

'একশবার ধরব।'

'আমি যাব না।'

'হাইতিতি ভালো হচ্ছে না। নিজের ভালোমন্দ বুঝতে শেখ। আমি চিরদিন থাকছি না যে তোমাকে পাহারা দিয়ে বেড়াব।'

হাইতিতির রাগ জল। সত্যি তো ম্যাণ্ডেলাদিদি না থাকলে সে খুবই বিপদে পড়ে যাবে। সে একেবারে তখন খুবই অনুগত হয়ে যায়। 'আমি চিরদিন থাকছি না' ম্যাণ্ডেলাদিদি শুধু বলে না, বুচার মামাও বলে। লুসি মাসিও বলে। ম্যাণ্ডেলাদিদি উৎপাত শুরু করলেই লুসি মাসি বলবে, 'ম্যাণ্ডেলা নিজের ভালোমন্দ বুঝতে শেখ। আমি চিরদিন থাকছি না, যে তোমাকে পাহারা দিয়ে বেড়াব।'

ছোটরা যে বড়দের কথাই অনুকরণ করে—ম্যাণ্ডেলাদিদির শাসনে এটা সে ভালোই টের পায়। ছোটরা বড়দের কাছেই সব শেখে। বজ্জাতিও। তবে ম্যাণ্ডেলাদিদি খুবই সরল। আর মনটাও খুব ভালো। তার যে ভালো চায় হাইতিতি তাও বোঝে। সে আর পাখিদের ঝাঁকের পেছনে ধাওয়া করে না। কিংবা পাখিদের মতো ডিগবাজিও খায় না। সত্বর বাড়ি ফেরা দরকার। মা-র জন্য মন খারাপ—পাখিদের সঙ্গে ওড়াউড়ির খেলা পছন্দ নাই করতে পারে। সে দুষ্টুমি করলে রেগে তো যাবেই। পাখিরা কেন তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে। আর পাখিরা তাকে দেখতে পায় কিনা তাও সে বোঝে না। তার গলায় ঘণ্টা বাজলে শব্দ হয় ঢং ঢং। তাকে দেখতে না পাক ঘণ্টার শব্দ ঠিকই টের পায়। তখন পাখিদের মধ্যে কলরব পড়ে যায়। উড়তে উড়তে যদি পাখির ঠ্যাং ধরে ফেলে—তবে খুব জব্দ। কিন্তু ম্যাণ্ডেলাদিদি তেড়ে আসবে।

'এই হাইতিতি, হচ্ছেটা কি! ছেড়ে দাও। কাউকে জব্দ করাও মোটা বুদ্ধির লক্ষণ। তোমার খেলা আর একজনের প্রাণসংশয়। ঠ্যাং ভেঙে গেলে, পাখা মচকালে, পাখিটা আর উড়তে পারে! দেব তোমার ঠ্যাং ভেঙে। বুঝবে মজা। কারও অনিষ্ট করলে তোমার অনিষ্ট হতে পারে বোঝো না। বয়েস তো কম হলো না—ধেড়ে বাঁদর কোথাকার!'

'তুমি আমাকে বাঁদর বললে!'

'বাঁদরামি করলে বাঁদর বলব না তো কি বলব!'

'পাখিদের সঙ্গে তো খেলা করছিলাম। বাঁদর বললেই হলো।'

'এটা খেলা! খেলা বোঝো না। একজনের খেলা, আর একজনের প্রাণসংশয়—এটা তোমার কাছে খেলা হতে পারে—কিন্তু পাখির জীবন সংশয় বোঝো! তুমি তাকে আদর করতে চাইছ বুঝবে কি করে। সে তো ছটফট করবেই। এস।'

আবার হাওয়ায় ভেসে চলে তারা।

এগামন্ট হিল চোখের ওপর ক্রমশ বড় হচ্ছে। এবারে শতরঞ্জের মতো পাহাড়তলী ভেসে উঠবে চোখে। একেবারে দাবার ছকের মতো মনে হয়। গাছপালা স্পষ্ট নয়, ধীরে ধীরে সব এবারে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। তার শরীর আর ততটা হাল্কা নেই যেন। গতি কমে আসছে।

আর তার যে কি হয়। দেশে ফেরার সময় মনে হয়, সে হয়তো বাড়িতে গিয়েই দেখবে, বাবা তার ফিরে এসেছেন। ম্যাণ্ডেলাকে বাড়িতে দেখতে না পেলে ছটফট করবেন সে জানে। বাবা যদি জানে, ম্যাণ্ডেলা তাকে খুঁজতে বের হয়েছে খুশিই হবে। তবে বাবা রাগও করতে পারে। বলতেই পারে, 'তুমি একটা বাচ্চা মেয়ে ম্যাণ্ডেলা, তুমি আমাকে কোথায় খুঁজতে বের হয়েছিলে! তোমার এই দুর্জয় সাহস হলো কি করে?' তখন তো সে বলতে পারবে না,'জান বাবা জাদুকর না আমাকে একটা পালকের টুপি দিয়ে গেছে। হাইতিতিকে রুপোর ঘণ্টা। আমার মুখ ব্যাজার দেখে জাদুকরের মনে দয়া হয়েছিল।'

এটাও ঠিক, বাবা ফিরে এলে সে আর ওড়াউড়ি করতে পারবে না। জাদুকর বলেই দিয়েছে,'টুপিটা পরলে তুমি যেখানে খুশি ইচ্ছে করলে উড়ে যেতে পারবে, বাবাকে খুঁজে বেড়াতে পারবে। বাবা তোমার ফিরে এলেই

পালকের টুপি হারিয়ে ফেলবে। বাবা ফিরে না আসা তক তুমি ছোট থাকবে। বয়স বাড়বে না। বড় হয়ে গেলে তুমিও একজন তখন অবিশ্বাসী হয়ে যাবে। অবিশ্বাসীদের জন্য কখনও কোনো পালকের টুপি থাকে না।' জীবনে কিছু পেতে হলে, কিছু হারাতে হয়, এও জাদুকর তাকে বলে গেছেন। সে তার বাবাকে ফিরে পেলে, পালকের টুপি হারিয়ে ফেলবে।

ম্যাণ্ডেলা যদি গিয়ে দেখে বাবা সত্যি ফিরে এসেছেন—ইস—সে আর একদণ্ড স্থির থাকতে পারছে না! সে সব হারাতে রাজী, তার পালকের টুপিও—বাবা ফিরে এলে, তার আর কিছুর দরকার হবে না। যেন গিয়েই দেখতে পাবে, দেয়ালের হুকে বাবার জাহাজি টুপি ঝুলে আছে। বাবা ফিরে এলে কত কিছু নিয়ে আসতে পারে। তাহিতি দ্বীপের রঙিন পাথর বাবা তাকে এনে দেবে বলেছেন। দামি পাথরের মালা পরে সে ঘুরে বেড়াতে পারবে। তার জন্য হনলুলু দ্বীপের টিয়া পাখির মুখোসও নিয়ে আসতে পারেন। মুখোস পরে সে, ওয়াকা আর হাইতিতি চলে যাবে জাদুকরের মূর্তিটির নিচে। তারপর তারা গান গাইবে। পাতার বাঁশি বাজাবে ঘুরে ঘুরে। জাদুকরের দয়াতেই বাবা যে একদিন ফিরে আসবেন, এই বিশ্বাস তার আছে। সে জানে না, জাদুকরের মনে কি আছে? তিনি যদি চান, তার বাবা ফিরে আসুক, তবে যত সাত সমুদ্র তের নদীর পারেই বাবা তার থাকুক না, ঠিক ফিরে আসবে।

আর তখনই এটা কি দেখতে পাচ্ছে!

সমুদ্রের জল তোলপাড় করে বিশাল একটা হাঙর তেড়ে যাচ্ছে কাকে। আরে করছে কি, জল যেন পাহাড় কেটে দু-ভাগ হয়ে গেছে। সমুদ্রের জলে তাণ্ডব শুরু হয়ে গেছে—আরে মাছটা কি ক্ষেপে গেছে! ক্ষেপে যাবার কি কারণ। তার বাবার কথা মনে থাকল না, বাড়ির কথা মনে থাকল না—এমন একটা রাক্ষুসে দৈত্য তাদের সমুদ্রে এসে হাজির—আর হাঁ করে কাকে তাড়া করছে! তারপরই ম্যাণ্ডেলার চক্ষুস্থির। ওয়াকা আর তার ছিপ-নৌকাটি গভীর সমুদ্রে মোচার খোলের মতো নামছে উঠছে, কাত হচ্ছে। সে কি ধরে আছে ঠিক মতো? আর নিচে নামতেই টের পেল ওয়াকা তার ঠাকুরদার ছিপ নিয়ে গভীর সমুদ্রে চলে এসেছে। ছিপটার সুতো ছেড়ে দিয়েছে—এবং নীল হাঙরের গলায় আটকে গেছে বিশাল একটা বঁড়শি। মাছটা তো ক্ষেপে যাবেই। ছল চাতুরী করে মাছটাকে লোভে ফেলে দিয়ে ওয়াকা এতক্ষণ মজা দেখছিল বোধহয়। বঁড়শি গেঁথে গেলে মাছটা এত হিংস্র হয়ে উঠতে পারে সে হয়তো অনুমানই করতে পারেনি।

'বোঝো মাছ ধরার মজা!'

'বোঝো এবার কার পাল্লায় পড়ে গেছ!'

'দেখছ না, কি দ্রুত ছুটে আসছে। আরে ওয়াকা সুতো কেটে দাও। ছেড়ে দাও। তুমিও যাবে, মাছও যাবে।'

তারপরই মনে হলো, সে কাকে বলছে! কে তার কথা শুনবে! তার কথা আকাশে ভেসে থাকলে কেউ শুনতে পায় না। তবে হাইতিতির ঘণ্টার শব্দ শোনা যায়। বোধহয় ঘণ্টার শব্দেই চকিতে একবার উপরের দিকে তাকিয়েছিল, তার খেয়ালও নেই যেন দ্রুত ছুটে আসছে একটা অতিকায় হাঙর। থামের মতো কালো শিরদাঁড়া ভেসে আছে। লফিয়ে ঢেউএর মাথায়ও উঠে গেল। সাদা পাথরের মতো পেটের মাংস থলথল করছে। ধারালো অজস্র দাঁতগুলি রৌদ্রকিরণে চকচক করছে—যেন খুঁজছে কোথায় আছে সেই আততায়ী এবং লাফিয়ে ঢেউএর মাথায় ভেসে উঠেই তলিয়ে যাচ্ছে। আবার ভেসে উঠছে।

'ওয়াকা মরবে।'

'মরণের ওষুধ কানে ঝুলিয়ে বেড়াচ্ছে।'

'কি সাহস!'

'বিন্দুমাত্র বিচলিত নয়।'

'ওয়াকা, ওয়াকা?'

সে শুনতে পাবে কেন, মাথার উপর ম্যাণ্ডেলাদিদি উড়ে ওকে ডাকছে। সতর্ক করে দিচ্ছে।

ঘণ্টার শব্দে কি তবে টের পেয়ে গেছে, যাক কাছে কোথাও ম্যাণ্ডেলাদিদি আর হাইতিতি আছে। তার আর ভয় নেই, সে বুঝছে না কেন, রাক্ষুসে মাছটা ল্যাজের এক ঝাপটায় তার নৌকা তলিয়ে দিতে পারে। নৌকা তো নয়, যেন একটা ডোঙা। বাবা যদি ফিরে আসেন, ওয়াকার এই দুর্জয় সাহসও তিনি পছন্দ করতে না পারেন। ধমক দিতে পারেন, 'প্রাণ হাতে করে মাছটার সঙ্গে লড়লে! তোমার এত সাহস, একা একা গভীর সমুদ্রে ঢুকে গেছো! মাছটা তোমার কোনো অনিষ্ট করেছে!'

অবশ্য পলকের ভাবনা, কিন্তু মাছটা যে ওয়াকার নৌকা দেখতে পাচ্ছে না বোঝাই গেল। কারণ একেবারে পাশ কাটিয়ে দূরে গিয়ে ভেসে উঠল।

জলের ঝাপটায় ওয়াকার জামা প্যান্ট ভিজে যাচ্ছে। ঢেউ এসে তাকে এবং নৌকাটাকে ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। সে টাল খেয়ে একবার পড়েও গেল। আবার উঠে দাঁড়াল। হুইল থেকে সুতো ছেড়ে দিচ্ছে। আবার গুটিয়ে আনার চেষ্টা করছে। ওস্তাদ মাছ শিকারীর মতো তার ভাবভঙ্গী। ওয়াকা নুয়ে কি খুঁজল! আবার মাছটা ঢেউএর মাথায় লাফ দিয়ে উঠে গেল। কিনার দেখা যাচ্ছে না। শহরবাসীরা কেউ জানেই না, ওয়াকা আজ মরণ খেলায় মেতেছে—হয় মাছ শিকার করে বেলাভূমিতে ফিরবে নয় সে নিজেকে নিঃশেষ করে দেবে।

ম্যাণ্ডেলা ইচ্ছে করলে নৌকায় নেমে যেতে পারে। কিন্তু এত পলকা নৌকায় সে নামলে, তার ভরে যে নৌকাটা ডুবে যাবে না কে বলতে পারে। সে পাটাতনে নেমেও যেতে পারছে না। সে ভাবল, যদি মাছটাকে মুক্তি দেওয়া যায়। কি যে করে! এত শক্ত সুতো যে হাঙরের দুর্ধর্ষ ধারালো দাঁত পর্যন্ত অকেজো। অথবা মাছটার হৃৎপিণ্ডে যদি বঁড়শি গেঁথে যায় তবে মাছটা নিজের ছটফটানিতেই অস্থির হয়ে উঠেছে। দাঁতে বড়শি কেটে দেবার কথা বেমালুম ভুলে যেতে পারে—এই সব সাত-পাঁচ ভেবেই সে আলগাভাবে ওয়াকার মাছ কাটার ধারালো ছোট্ট ছুরিটা তুলে ঘ্যাচ করে সুতো কেটে দিল। মাছটা ফিরে যাক নিজের দেশে, যে যার মতো সুখে থাক ভেবেই কাজটা করেছে। এছাড়া যেন ওয়াকার প্রাণ রক্ষা করার উপায় তার জানা ছিল না।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। মাছটা ঠিকই ওয়াকাকে দেখেছে। তার নৌকাটাও। এতক্ষণ ওয়াকাই ছিল সবল প্রতিপক্ষ। সুতোয় টান দিলেই মাছের অন্তরাত্মা থরথর করে কাঁপে! সে অবশ হয়ে যায়। প্রতিপক্ষ সবল বুঝতে কষ্ট হয় না। এবার যেন, মাছটা ছাড়া পেয়ে আরো হিংস্র হয়ে উঠল। ঢেউ-এর উপর লাফিয়ে ডিগবাজি খেল দু-বার। জলে বিশাল ঘূর্ণি তুলে ভেসে বেড়াতে থাকল—ওয়াকা হতাশ। সে জানে তার বুঝি রক্ষা নেই—এতক্ষণ সে ছিল সবল প্রতিপক্ষ, এক মুহূর্তে সুতো ছিঁড়ে যাওয়ায় সে কত দুর্বল হয়ে গেছে, হতাশ মুখ দেখে টের পেল ম্যাণ্ডেলা।

সমুদ্রের নীল জলে মাছটা চক্কর দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে এবার মরণ খেলায় বুঝি মাতবে। নৌকাটার চারপাশে বেশ দূরে সে মুখ তুলে বিশাল হাঁ করল—তারপর ডুব দিল। সমুদ্রের বিশাল ঢেউ ঝাপটা মারছে। ওয়াকা সত্বর তার সব গুটিয়ে নিয়ে ভেগে পড়ার তালে আছে। সে হয়তো জানে, অতিকায় মীনটি সমুদ্রের নিচে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার খোঁজে। এবং নীল জলরাশি ভেদ করে যে কোনো মুহূর্তে তার নাকের ডগায় লাফিয়ে পড়তে পারে। তারপর ওয়াকাকে গিলে খেতে পারে।

ম্যাণ্ডেলা ভেবে পাচ্ছে না—কি করবে! সে কেমন অস্থির হয়ে পড়ছে। ওয়াকার কিছু হলে

কি যে হবে! সে খুবই বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। সে নৌকার ঠিক মাথার উপরই ওড়াউড়ি করছে। হাইতিতি একবার নৌকায় নেমে যেতে চেয়েছিল, তার ল্যাজ ওয়াকার পিঠেও মাঝে মাঝে লেগে যাচ্ছে। পিঠে সুড়সুড়ি লাগছে—ওয়াকা জানে হাইতিতির ঘণ্টা এভাবেই বাজে। রাতে অদৃশ্য হবার মুখে শহর-বাসীদের মতো সেও শুনতে পায় আকাশে ঘণ্টাধ্বনি করে কারা চলে যাচ্ছে। শহরবাসীদের তখন এক কথা, লুসির ভুতুড়ে মেয়েটার কাজ। শিশুরা বলবে, জাদুকরের কৃপায় এটা হয়। মানুষ ইচ্ছে করলে উড়তে পারে না, এমন অবিশ্বাসী তারা নয়। মানুষই সব পারে। জাদুকর ইচ্ছে করলেই পারে। লুসির ভুতুড়ে মেয়েটা বললে তারা ক্ষেপে যায়। ওয়াকাও ক্ষেপে যায়। সেই একই ঘণ্টাধ্বনি তার মাথার উপর অনবরত বাজতে থাকলে, সে চিৎকার করে উঠল— 'ম্যাগুেলাদিদি, শীগগির খবর দাও, সমুদ্রের দৈত্যটা আমাকে ঘিরে ফেলেছে। ঐ দেখ দূরে ভেসে উঠছে—ঐ দ্যাখ দূরে পিঠের শিরদাঁড়া ভাসিয়ে চলে যাচ্ছে। ঐ দ্যাখ আবার ফিরে আসছে।'

ম্যাগুেলা এবার দেখল, সেই অতিকায় মীন ফের সমুদ্রের ঢেউ ঝাপটা মেরে সরিয়ে দিল—অনেকটা উপরে উঠে দেখার চেষ্টা করল কত দূরে তার সেই প্রবল প্রতিপক্ষ—তারপর ছুটে আসতে লাগল এবং ঝাঁপিয়ে পড়ল নৌকার উপর। নৌকা উল্টে গেল।

ওয়াকা লাফিয়ে পড়ল জলে—চিৎকার করে উঠল, 'ম্যাগুেলাদিদি'। আর কোনো আওয়াজ উঠল না। ঢেউএর ঝাপটায় সে অনেক দূরে সরে গেছে। ওয়াকা সাঁতারে পটু—সে ঢেউএর উপর একবার হাত তুলে দিল, তারপর ঢেউএর ভিতর ডুব দিয়ে সে আরও কিছুটা দূরে সরে গেল—অতিকায় মীনের আর পাত্তা নেই। ম্যাগুেলার বুকে ত্রাস—সে উড়তে থাকল—এবং যেখানে সেই মীন ফের ভেসে উঠল তার নাকে ল্যাজ দিয়ে হাইতিতি সুড়সুড়ি দিল। মাছটা মুখ ঝামটাল। হাঁ করা মুখ বন্ধ। মীন ভেসে উঠলেই হাইতিতি ছুটে যাচ্ছে, আর ল্যাজের ডগা দিয়ে নাকে মুখে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। যেন কোনো রকমে আটকে রাখা—এবং সেই ফাঁকে যদি ওয়াকা তার নৌকা ভাসিয়ে পালাতে পারে। কিন্তু নৌকাটা যে উল্টে আছে। তার পাটাতনের কাঠ ছড়িয়ে পড়ছে সমুদ্রে। ওটাকে টেনে নেওয়া সহজ কাজ নয়। নৌকা ভেসে থাকলে, ম্যাগুেলাই দড়ি ধরে টেনে নিয়ে যেতে পারত। সে জলেও নামতে পারছে না। যদি পালকের টুপি সমুদ্রে ভেসে যায়। যেতেই পারে। আসলে ম্যাগুেলা ভুলেই গেছে তার পালকের টুপি ঝড় কিংবা ঢেউ কেউই উড়িয়ে নিতে পারে না। তার কেবল এখন লক্ষ্য কোনদিকে অতিকায় মীন ছুটে যাচ্ছে। অনেক দূরে অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে ওয়াকাকে। ঢেউ এর প্রবল ঝাপটায় সে একান্ত স্থির থাকতে পারছে না। আর তখনই দেখল, আবার সেই অতিকায় মীন জলে ঘূর্ণি তুলে তালগাছের মতো সমুদ্রের পিঠে ভেসে উঠেছে। এবং তীরের ফলার মতো ছুটে যাচ্ছে ওয়াকার দিকে।

এসময় হা-হুতাশ করে লাভ নেই ম্যাগুেলা জানে— সে কিছুটা ধাতস্থ হয়ে উঠেছে। সে দেখতে পাচ্ছে পাটাতনের একটা লম্বা কাঠ ঢেউএর মাথায়। দ্রুত উড়ে গিয়ে সে কাঠটা তুলে নিল। প্রথমে ভেবেছিল, ভাসলেই কাঠটা দিয়ে মারবে মাথায়। সে মারলও। আশ্চর্য মাছটার যেন তাতে কিছুই আসে যায় না। পাথরের মতো শক্ত মাথা। অতিকায় মীন তার লক্ষ্যে স্থির। সে ওয়াকাকে গিলে খাবেই। ওয়াকাও দুর্বল হয়ে পড়ছে। ডুবে যাচ্ছে, ভেসে উঠছে। সে খুঁজছে তার নৌকাটাকে। কিন্তু কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। চারপাশে ক্ষেপা সমুদ্র তাকে ঘিরে ধরেছে। ঘণ্টাধ্বনি দূরে শুনতে পাচ্ছে। কিন্তু কেউ তাকে উদ্ধার করতে আসছে না। প্রাণপণে সে ঢেউ কাটিয়ে ভেসে থাকার চেষ্টা করছে। এই গভীর সমুদ্রে ঢুকে গিয়ে সে বুঝতেও পারছে না, কোথায় তার প্রিয় বেলাভূমি, পাইনের বন, আর টিলার ওপর মিকি মাউসের মতো লাল-নীল রঙের কাঠের বাড়ি। কোনদিকে সাঁতার কাটলে, সে সেখানে পৌঁছাতে পারবে তাও জানে না। কেবল মাঝে মাঝে হাঁকছে, 'ম্যাগুেলাদিদি তুমি সব পার। আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাও। হাইতিতিকে

মাছটা ঢেউএর মাথায় লাফ দিয়ে উঠে গেল।

বল, ঘণ্টাধ্বনি করুক, তা অনুসরণ করি।'

কিন্তু প্রবল ঢেউ-এর গর্জনে ম্যাণ্ডেলা ওয়াকার কোনো কথাই শুনতে পাচ্ছে না। সে এখন পাহাড়ের মতো বিচরণ করে বেড়াচ্ছে সমুদ্রে—অতিকায় মীনের খোঁজে। কোথায় গেল। যেন প্রকৃতির রুদ্ররোষে তারা পড়ে গেছে। ঝড় উঠলে বড়রকমের সর্বনাশ। সমুদ্রের জলকণা বাতাসে ভেসে বেড়ালে সে কিছুই চোখে দেখতে পাবে না। না ওয়াকাকে, না সেই অতিকায় মীনকে।

আবার দেখল, দিগন্ত থেকে মাছটা ভেসে আসছে। সমুদ্রের জল উথাল-পাতাল করে ভেসে আসছে। সে খুঁজছে ওয়াকাকে। মাছের ঘ্রাণশক্তি প্রবল। সে ঠিক ওয়াকাকে খুঁজে পাবেই—যত দূরেই থাক ওয়াকা, ঘ্রাণশক্তি প্রবল বলে ঘোরাফেরা করতে করতে অতিকায় মীন ঠিক পেয়ে যাবে ওয়াকাকে।

ম্যাণ্ডেলা উড়ছে।

হাইতিতি উড়ছে।

হাইতিতি হাঁ করা মুখের কাছে ল্যাজ বাড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু মাছটা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না—অথচ কিছু যেন নাকের ডগায় স্পর্শ করছে। সেটা কি মাছটা বুঝতে পারছে না। হ্যাঁচ্চো দিচ্ছে কিনা তাও ম্যাণ্ডেলা জানে না। কারণ মাছের হাঁচি কাশি থাকে কিনা সে জানে না।

ম্যাণ্ডেলা যে উড়ে গিয়ে বুচারমামার বন্দুকটা নিয়ে আসবে তার উপায় নেই।

সদা ব্যস্ত রাখতে হচ্ছে মাছটাকে।

ভেসে উঠলেই সে পাটাতনের লম্বা কাঠটা দিয়ে পিঠে মাথায় যেখানে সুযোগ পাচ্ছে, মারছে।

মাছটা তখন জলের নিচে লুকিয়ে পড়ছে।

কিন্তু অতিকায় মীন,ভবি ভুলবার নয়।

আবার হাঁ করে সমুদ্রের তলায় ঘূর্ণি তুলছে—বেঁকে যাচ্ছে, চিৎ হয়ে খেলা করছে। যেন যে আছে সমুদ্রে, সে তার কব্জার মধ্যে। খুশিমতো গিলে ফেলা শুধু কাজ। ভেসে উঠে ডুবে গিয়ে সে যে মজা করছে না অদৃশ্য কোনো অশুভ আত্মার সঙ্গে কে বলবে! যেন বলছে, 'দেখ আমরা জলের জীব। তাবৎ শক্তি আমাদের জলে। অন্তরীক্ষে তুমি আর যাই কর, জলের নিচের সাম্রাজ্যে তোমার হাতিয়ার ভোঁতা।'

ম্যাণ্ডেলা এটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে।

আর দেখছে, ঐ তো ওয়াকা, ভাসছে—জলে ডুবছে। আর দূরে নৌকা উল্টে গিয়ে যেমন লম্বা একটা কুমীরের মতো রোদ পোহাচ্ছে।

আর তখনই ম্যাণ্ডেলা দেখল, আবার সেই মীন ভেসে উঠেছে। চোখ হিংস্র। দাঁতালো মাছটা ওয়াকাকে মুখ হাঁ করে গিলতে যাচ্ছে। ম্যাণ্ডেলা উপায়ান্তর না দেখে হাঁ করা মুখে পাটাতনের লম্বা কাঠটা ঢুকিয়ে দিল। ক্রিকেট মাঠে স্টাম্প পুঁতে দেবার মতো হাঁ করা মুখে ঢুকিয়ে দিল। খাপে খাপে বসে গেল কাঠটা।

নাও বোঝো মজা!

এতে এখন জব্দ হবে মাছটা ম্যাণ্ডেলা অনুমানই করতে পারেনি।। মাছটা আর তার চোয়াল বন্ধ করতে পারছে না। ছুটছে, ল্যাজ তুলে ছুটে বেড়াচ্ছে, ডুবে যাচ্ছে, জলে অজস্র বুদবুদ উঠছে। আবার ভেসে উঠছে। চোয়াল বন্ধ করতে পারছে না। কাঠটা দু চোয়ালে ঠেকার কাজ করছে। কাঠটা দু-চোয়ালে বসে গেছে। ভাসলেও মুখ হাঁ করা, ডুবলেও মুখ হাঁ করা।

ম্যাণ্ডেলা যত দেখে তত হাততালি দেয়। একটা অতিকায় মীনকে এভাবে সে জব্দ করতে পারবে আশাই করতে পারেনি।

সে এবার হাত ঝেড়ে নৌকাটার কাছে গেল। ওয়াকা সাঁতার কাটছে।

নৌকাটা ম্যাণ্ডেলা আর হাইতিতি টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। আর মাছটা করুণ চোখে সমুদ্রে ভেসে থেকে অন্তরীক্ষের কাণ্ড-কারখানা দেখছে। যেন বলছে, 'আমার দু-চোয়ালে কেন কাঠ আটকে দিলে। না পারছি ওগলাতে, না পারছি গিলতে।

ম্যাণ্ডেলা বলল, 'মজা বোঝ। ওয়াকাকে তুমি চেন না। সুতো কেটে দিলাম, তাই রক্ষে। পারতে সুতো ছিঁড়ে পালাতে। যতদিন তুমি জব্দ না হতে ওয়াকা নৌকায় ভেসে বেড়াত! ওয়াকাকে তুমি চেন না। বেইমানি আর কাকে বলে! প্রতিশোধ নেবে! আরে মানুষই তো ভুল করে। তাই বলে তাকে শোধরাবার সুযোগ দিতে হবে না। সে না হয় বঁড়শিতে আটকে ফেলেছিল, তোমার কি বুদ্ধি বুঝি না বাপু, দাঁত এত তোমার ধারালো—সুতো কেটে দিতে পারলে না। অথচ বড়াই ষোল আনা!'

নৌকাটা হাতের নাগালে পেয়ে ওয়াকা অদ্ভুত কৌশলে উল্টে দিল, জল সেচে ফেলে দিল—আর দেখল, সেই অতিকায় মীন তার নৌকার পাশে ঘোরাফেরা করছে। আর হাই তোলার মতো মুখ ভাসিয়ে দেখাচ্ছে, কে যে তাকে এভাবে জব্দ করে গেল!

ওয়াকাও অবাক। সত্যি তো মাছটার চোয়ালে একটা পাটাতনের কাঠ আটকে রয়েছে। না পারছে ওগলাতে, না পারছে গিলতে। কে যে কাজটা করল! তবে সে ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পেয়েছে। ম্যাণ্ডেলাদিদিরই কাজ। সে অবাক হয়ে শুনল, মাথার উপর তখনও ঘণ্টা বেজে চলেছে।

ওয়াকা ঘণ্টাধ্বনি অনুসরণ করল। তীরের কাছাকাছি এসে দেখল মাছটা তার দিকে তখনও করুণ চোখে তাকিয়ে আছে।

সে মাছটার কাছে গেল। হাঁ করা মুখের কাঠটা সে বৈঠায় চাড়ি মেরে ভেঙে দিল। আর তখন মাছটা ছুটল—যেন উড়ে যাচ্ছে—ছোট্ট একটা বিমানের মতো। সমুদ্রের ধারে যারা ওয়াকার অপেক্ষায় ছিল তারা তো দৃশ্যটা দেখে অবাক। তারা এসেছিল মাছ নিতে, কিন্তু দেখল, নৌকার খোলে একটা মাছ নেই। পাটাতন সাফ। সে টলতে টলতে পাইন বনের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে। সারা গায়ে তার অজস্র ক্ষত।

ছবি : বিজন কর্মকার

# শালিকটা

## পলাশ মিত্র

শালিকটা বেশ আছে:
ইদিক-উদিক ঘুরছে ফিরছে
গাইছে গান;
শালিকটা বেশ আছে—
কণ্ঠে যে তার
গানের বাহার
অফুরান।

শালিকটা বেশ আছে:
কুটুরমুটুর কখন কি খায়
ফুরুৎ উড়ে কোথায় পালায়—
এই তো বসে অ্যান্টেনাতে
আবার গেল কোন্ সুদূরে;
শালিকটা বেশ আছে
পুজোর আগেই বাবু এলেন ভুবন ঘুরে।

ছবি : রজতবরণ চক্রবর্তী

# মেছোভূত

## বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

মাছ ধরা একটা নেশা। এই নেশাতেই পড়ে গিয়েছিলাম এক সময়। আয়োজনের ত্রুটি নেই, দামী হুইল আর ছিপ কিনে ফেললাম। কেবল হুইল আর ছিপ থাকলেই তো হয় না, চার আর টোপও দরকার। কত মশলাপাতি কিনে যে টোপ বানাতাম তার হিসেব নেই। খবর পেলেই ছুটে যেতাম কোথায় পিঁপড়ের ডিম পাওয়া যায়, কোথায় মৌচাক কি বোলতার চাক। মাছ ধরার জন্য পুকুরের ধারে বাঁশ পুঁতে মাচাও বানিয়ে নিয়েছিলাম একটা। অথচ কপালের ফের, রুই কাতলা কালেভদ্রে এক আধবার হয়তো তুলতে পেরেছি কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুঁটি ট্যাংরা কই মাগুর। এত আয়োজন করে বড় মাছ যদি না তোলা যায়, মন খারাপ লাগবে বৈকি! প্রায় দিনই কুচোকাচা মাছ নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় বেশ মন খারাপ হয়ে যেত।

তা, সেই পুকুরের ধারে মাছ ধরার জন্য আরো কয়েকজন ছিপ নিয়ে এসে বসত সেসময়। দু'একজনের সঙ্গে একটু বন্ধুত্বও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যারা মাছ ধরে তারা ছিপ ফেলে কখনো বকবক করে না। কেবল জলের উপর ফাতনার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। ফাতনা একটু নড়ে উঠলেই আর রক্ষে নেই, পৃথিবী যদি রসাতলেও যায়, মাছটাকে ডাঙায় না তোলা অবধি মাথার ঠিক থাকে না।

আমি যেখানে বসতাম সেখান থেকে হাত পঁচিশেক দূরে বসত মনোজ। মনোজের কপালটাও ঠিক আমারই মতো, ওকেও খুব বেশি একটা রুই কাতলা ধরতে দেখতাম না। সেই মনোজ একদিন বিরক্ত হয়ে বলল, এ তো আর পারা যাচ্ছে না ভাই। মাছ ধরার জন্য যা খরচ করছি, তাতে বাজার থেকে কিনে খেলে অনেক লাভ হতো।

বিশু, আমাদেরই আর এক মাছ ধরার বন্ধু, কথাটা শুনতে পেয়েই হেসে উঠল, তা যা বললে ভাই। কিন্তু বাজারের মাছ আর ছিপে ধরা মাছের স্বাদ যে আকাশপাতাল তফাৎ। ও ভাই তুমি যাই বলো, এ পুকুরে বড় মাছটাছ আর আছে কিনা সেটাই আমার সন্দেহ। আমাদের বোধহয় এবার থেকে অন্য পুকুরে গিয়ে বসা উচিত।

বললাম, বড় মাছ যে নেই, সেটা কিন্তু ঠিক নয়। সেবার পরাশরবাবু দু'কেজি ওজনের একটা কাতলা ধরেছিলেন মনে আছে? আসলে আমাদের ছিপ ফেলার মধ্যেই কোথাও যেন একটা গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে।

মনোজ গাঁক গাঁক করে উঠল, মাছ ধরা আমাকে শেখাবি নাকি। জীবনে কত মাছ ধরেছি তার হিসেব দিলে তোর মাথা ঘুরে যাবে।

আমি আর কথা বাড়াই না। আবার ফাতনার দিকে চোখ পেতে বসে থাকি। ঘড়িতে বড় জোর চারটে। আর ঘন্টা খানেক কি ঘন্টা দেড়েক এখানে বসা যাবে। তারপর মন খারাপ করে বাড়িতে গিয়ে ঢুকতে হবে। ফালতু বকবক করে আর লাভ নেই।

যাই হোক আরও মিনিট দশ পনের বোধ হয় কেটেছিল, হঠাৎ কোত্থেকে মোটাসোটা একটা লোক ছিপ হাতে এগিয়ে এসে পুকুরের একধারে বসে পড়ল।

মনে মনে ভাবলাম, যাক বাবা, হতভাগাদের দলে আরো একজন বাড়ল।

দেখলাম, লোকটার কেমন গম্ভীর গম্ভীর মুখ। কোনো দিকেই নজর নেই। পকুরের ধারে একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়ল। তারপর বঁড়শিতে টোপ গেঁথে সেই টোপ কপালে তিনবার ছুঁইয়ে পুকুরের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল। দিয়ে ফাতনার দিকে চোখ পেতে বসে রইল।

থাকো বসে। আমরাও পাত্তা দিলাম না। পাত্তা দেওয়ার কোনো কারণও ছিল না। কেন না, আমরা সারাদিন বসে বসে কি মাছ পেয়েছি তা জানি। বড়জোর চার ছ'ইঞ্চি সাইজের দুটো একটা চারাপোনা, দু'দশটা ট্যাংরা কি কইটই। লোকটা দিনের শেষে এসে কত আর ধরবে!

তবু কেন জানি লোকটার দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিলাম। পরনে মালকোঁচা মারা ধুতি, গায়ে ফতুয়ার মতো একটা জামা। দেখি, মাঝে মাঝে ফতুয়ার পকেট থেকে কী যেন বার করে মুখে পুরছে।

মনোজের দিকে তাকালাম, কী খাচ্ছে রে?

কে জানে, ছেড়ে দে না। ও সব আলতু ফালতু লোকের দিকে না তাকিয়ে নিজের ফাতনার দিকে নজর রাখ।

লোকটা বোধহয় ডালমুট কিংবা বাদাম ভাজাটাজা খাচ্ছে, খুব চালু। আমি আবার আমার ফাতনার দিকে নজর দিলাম।

আরো মিনিট কয়েক কেটে গেল। হঠাৎ চমকে উঠলাম। দেখি, লোকটা মাছ বাঁধিয়েছে টোপে। ছিপে টান মেরে উঠে দাঁড়িয়েছে। সুতো তখনো জলের নিচে। বোধহয় একটা বড়

মাছই আটকেছে। ছোট মাছ হলে ছিপের টানে মাছটা উঠে আসত। বড় মাছ বলেই তা সম্ভব হলো না। সুতোটা জলের ওপর এখন এপাশ ওপাশ দৌড়চ্ছে, হুইল থেকে সুতো ছাড়তে শুরু করেছে লোকটা। ছোট্ট ছিপটা ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে উঠেছে।

আশ্চর্য কপাল লোকটার। দশ মিনিট বসতে না বসতেই বড় মাছ বাঁধিয়ে ফেলল। হাঁ করে তাকিয়ে থাকি। জলের নিচে বঁড়শিতে আটকে যাওয়া মাছটার গায়ে যে বেশ জোর বোঝাই যাচ্ছে। এরকম অবস্থায় মাছটাকে তুলতে হলে বেশ কায়দা জানা দরকার। জলের নিচে খুব করে দৌড়তে দিতে হয় মাছকে। শেষ পর্যন্ত দৌড়তে দৌড়তে যখন ও ক্লান্ত হয়ে পড়বে তখন ওকে নেটের মধ্যে ফেলে ডাঙায় তুলে আনতে হবে। তা না করে সুতো ধরে বোকার মতো টানলে মাছটা সুতো ছিঁড়ে পালিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু না, লোকটাও কম যায় না। মিনিট কয়েক লড়াই চালিয়ে শেষ পর্যন্ত মাছটাকে ডাঙায় তুলে ফেলল। আই বাপ এ যে দু'কেজির কম নয় রে! কি কপাল মাইরি। এসে মিনিট পাঁচেক বসেই অত বড় একটা মাছ ধরে ফেলল, আর আমরা সারাদিন বসে সামান্য এই কটা ছোট মাছ পেলাম।

মনোজের দিকে তাকালাম। কি কান্ড দেখলি?

মনোজ আর কী উত্তর দেবে! বোকার মতো হাসে।

একেই বলে লাক!

লোকটা ততক্ষণে তার ছিপ গুটিয়ে নিয়েছে। মাছটার মুখের মধ্যে দড়ি ঢুকিয়ে ভাল করে বেঁধে নিল। তারপর সেই বিরাট মাছটাকে হাতে ঝুলিয়ে গম্ভীর মুখে পুকুর ছেড়ে হনহন করে চলে গেল।

ওদিকে সূর্যটা তখন ডুবিডুবি। আমাদেরও ওঠার সময় হয়ে এসেছিল।

কী রে মনোজ, সন্ধ্যা তো হয়ে এল, চল বাড়ি ফিরি এবার।

দেখলাম, বেশ খানিকটা দূরে পরাশরবাবুও তাঁর ছিপ গুটোতে শুরু করেছেন। সবারই কেমন গম্ভীর মুখ। হুট করে অজানা একটা লোক এসে অত বড় একটা মাছ ধরে নিয়ে গেল, আর ওরা সারাদিন বসেও তেমন কিছু জোটাতে পারল না, মুখ গম্ভীর হওয়ারই কথা।

মনোজ বলল, চল। আমাদের কপালে নেই, হবে না। লোকটা কিন্তু জব্বর মাছটা ধরে নিয়ে গেল রে।

কি আর বলব। ছিপ গুটিয়ে ফেললাম। আগামী শনি আর রবি পরপর দু'দিন ছুটি আছে, ঠিক হলো শনিবার আবার এসে বসব এখানে। বড় মাছ এবার ধরতেই হবে। এর মধ্যে কলকাতার নিউমার্কেট থেকে বেশ খানিকটা চার কিনে এনে রাখব। দেখি মাছ সেই চারের গন্ধে এগোয় কিনা।

মনোজ আর আমি কাছাকাছিই থাকি। বাড়িমুখো হাঁটা দিলাম।

যথাবিহিত পরের শনিবার আবার পুকুরের জলে চার-ফার ফেলে ছিপ নিয়ে বসলাম। হে ভগবান, আজ আর বিমুখ করো নাগো, জব্বর একটা মাছ দিও। ছোট ছোট মাছ ধরে কারো কাছে আর মুখ দেখাতে পারি না ভগবান।

মনোজ বলল, আজ যা চার ঢালা হয়েছে তাতে বড় মাছ এদিকে না এসেই পারবে না।

বললাম, মাছেরাও আজকাল খুব চালাক হয়ে গেছে রে। ফাতনা থেকে সুতো ঝোলা দেখেই ওরা বুঝতে পারে।

দেখাই যাক কী হয়। দু'জনেতে আবার ফাতনার দিকে চোখ পেতে বসে রইলাম। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। হঠাৎ মনে হলো, ফাতনাটা বুঝি একটু নড়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ছিপ হাতে নিয়ে আমি তৈরি হই। বড় মাছ যদি হয়, ফাতনাটাকে এক্ষুণি টুক করে জলের নিচে তলিয়ে নিয়ে যাবে। আর সঙ্গে সঙ্গে টান মেরে বুঝে নিতে হবে কেমন মাছ। যদি বড় মাছ হয়, হুইল থেকে সুতো ছাড়তে হবে। উত্তেজনায় আমি তাকিয়েই থাকি ফাতনার দিকে। কিন্তু না, আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। তবে কি ফাতনাটা জলের ঢেউয়েই নড়েছিল, কেমন মন খারাপ হয়ে যেতে থাকে আবার।

হতাশ হয়ে বসে রইলাম।

ওদিকে পরাশরবাবু সটাক করে ছিপ টেনে একটা মাছ তুললেন। ছোট মাপের মৃগেল বোধহয়। তা হোক বউনি হলো পরাশরবাবুর।

আমার এমনই কপাল, বউনি হলো ঘন্টা দুয়েক পরে। একটা পাঁচ-ছ' শ' ওজনের শোল। ওদিকে মনোজ ততক্ষণে কয়েকটা শিঙি আর মাগুর মাছ ধরে ফেলেছে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে শুরু করল। আরো দু'একটা করে ছোটখাট মাছ আমরা সবাই ধরে ফেলেছি। কিন্তু আজকের দিনেও বড় মাছের কোনো লক্ষণই নেই।

মনোজের দিকে তাকালাম, আজকের দিনটাও বৃথা গেল রে। ফালতু ফালতু পয়সা খরচ করে চার আনালাম।

মনোজ বলল, মাছ ধরা এবার থেকে ছেড়েই দেব ভাবছি। কপালে না থাকলে ওসব হয় না।

কি আর বলি, ঘড়িতে ততক্ষণে সাড়ে চারটা বেজে গেছে। আর বড়জোর ঘন্টা খানেক কি ঘন্টা দেড়েক বসা যাবে। আবার টোপ ফেলে ফাতনার দিকে তাকাই।

হঠাৎ এ সময় চমকে উঠলাম, এই মনোজ, সেই লোকটা রে। সেই যে সেদিন অত বড় মাছটা ধরে নিয়ে গেল।

হ্যাঁ, সেই লোকটাই। পরনে মালকোঁচা মারা ধুতি, গায়ে ফতুয়া। চোখ মুখ কেমন গম্ভীর গম্ভীর।

লোকটা কারো দিকে তাকাল না। ধীরে ধীরে পুকুরের ধারে গিয়ে বসে পড়ল। তারপর বঁড়শিতে টোপ গেঁথে পুকুরের জলে ছুঁড়ে ফেলল।

দেখে মনে হয়, বেশ বেরসিক। যেন একটু আলাপ-সালাপ করতে গেলে দাঁত খিঁচিয়ে উঠবে। লোকটাকে আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করতে থাকি।

ঠিক সেদিনকার মতোই ফতুয়ার পকেট থেকে ডালমুট কিংবা বাদাম ভাজা বার করে টুকটুক করে খেতে শুরু করেছে।

মনোজ বলল, দেখা যাক, আজ বেটা কী মাছ ধরে! বুঝলি বার বার ঘুঘু ধান খেতে পারে না।

কথাটা তখনো শেষ হয়নি মনোজের, লোকটা ছিপ হাতে নিয়ে টান মেরেই উঠে দাঁড়িয়েছে। নির্ঘাৎ বড় মাছ। হুইল ঘোরাতে শুরু করেছে। আশ্চর্য ব্যাপার, লোকটা কি মন্ত্রতন্ত্র জানে নাকি!

মিনিট দশেক মাছটা জলের নিচে ছুটোছুটি করে শেষটায় লোকটার হাতে ধরা দিল। আই বাপ, এ যে বিশাল মাছ। আড়াই তিন কেজির কম হবে না। এ রকম দুটো মাছ হলেই একটা বিয়েবাড়ির কাজ চলে যায়।

কি দারুণ কপাল দেখেছিস? চল না লোকটার সঙ্গে একটু আলাপ করি।

মাছটাকে হাতে ঝুলিয়ে গম্ভীর মুখে চলে গেল।

মনোজ বলল, কী আলাপ করবি?

না মানে, লোকটা বসতে না বসতেই অত বড় মাছ পেয়ে যাচ্ছে। ওর কাছ থেকে কৌশলটা জেনে নেওয়া যায়।

ঠিক আছে চল। ছিপ গুটিয়ে নিয়ে আমি আর মনোজ লোকটার কাছে এগিয়ে এলাম।

লোকটা সেই আগের দিনের মতোই মাছের মুখে দড়ি ভরে নিয়ে শক্ত করে একটা গিঁঠ দিয়ে হাতে ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু মনোজদের দিকে তাকাবার প্রয়োজন মনে করে না। গম্ভীর মুখেই হাঁটতে শুরু করে।

মনোজই ডাকল, দাদা শুনছেন?

লোকটা ঘাড় ঘুরিয়ে একবার তাকাল। ব্যস। ওইটুকুই।

তারপর আবার হাঁটতে শুরু করল।

আচ্ছা বেরসিক তো। ও দাদা, আমাদের সঙ্গে একটু কথা বললে কি দোষ হবে?

লোকটা আবার দাঁড়াল, গম্ভীর মুখ। আমার সময় নেই, সন্ধ্যের আগেই আমাকে মাছটা পৌঁছে দিতে হবে।

কোথায় পৌঁছে দেবেন?

কেন হে ছোকরা? তোমাদের কী দরকার?

না মানে, রাগ করবেন না। আমরাও আপনার মতোই এ পুকুরে মাছ ধরতে আসি, কিন্তু আজ পর্যন্ত এত বড় মাছ কোনোদিন ধরতে পারিনি।

লোকটা হিঁ হিঁ করে হাসল কেবল।

মাথায় ছিটটিট নেই তো! মনোজ বলল, আপনার বাড়ি কোথায়? কোথায় থাকেন?

যেখানেই থাকি না, তোমাদের কী?

আমাদের কিছু না। আসলে মাছ ধরার কৌশলটা একটু যদি শিখিয়ে দিতেন।

মাছ ধরবে? ধর না, শেখাবার কি আছে। বঁড়শিতে টোপ গাঁথবে, জলে ফেলে ফাতনার দিকে তাকিয়ে থাকবে, আবার কি!

তাই তো করি। কিন্তু কেবল ছোট ছোট মাছ ওঠে, বড় মাছ কোনোদিন পেলাম না।

বড় মাছ ধরবে?

আপনি যদি একটু দয়া করে শিখিয়ে দেন।

শিখবে। কিন্তু এখন তো আমার হাতে সময় নেই। সন্ধ্যের মধ্যেই আমাকে মাছ পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। ঠিক আছে তোমরা আমার সঙ্গে এসো, হাঁটতে হাঁটতে যতটুকু পারি বলে দেই।

উৎসাহে লোকটার সঙ্গে হাঁটা শুরু করি আমি আর মনোজ।

লোকটা বাঁ দিকে ঘুরে জঙ্গলের দিকে এগোতে শুরু করল। এ জঙ্গলে সাপ শেয়াল কত কিছু থাকতে পারে। আমি মনোজের দিকে তাকাই।

মনোজ চোখের ইশারা করে, চল না। ভয় কী!

লোকটা একবার দু'বার আকাশের দিকে তাকায়, সন্ধ্যে হতে আর কত দেরি হে?

মনোজ বলল, আমার ঘড়িতে এখন ছটা।

ছ'টা মানে, আজ সূর্যাস্ত হওয়ার কথা ছ'টা বারোতে, তাই না? তার মানে এখনো সন্ধ্যে হতে আরো বারো মিনিট বাকি আছে। একটু তাড়াতাড়ি চলো।

বললাম, এই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আপনি আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

ফের কথা বলে! বড় মাছ কী করে ধরে যদি জানতে চাও, বকবক করো না। চলো।

আমরা আবার চুপ করে লোকটার পিছন পিছন হাঁটতে থাকি। লোকটার হাতে ঝোলানো সেই বিশাল মাছটা। আর এক হাতে ছিপ আর হুইল। দেখাই যাক না, কোথায় নিয়ে যায় আমাদের।

জঙ্গল আরো ঘন হয়ে আসে। অন্ধকারটাও যেন জড়িয়ে ধরতে থাকে। দুটো একটা জোনাকিও চোখে পড়ে আমাদের। অন্ধকারে গাছগুলোকে ঠিক মতো চেনা যাচ্ছে না, কী গাছ ওগুলো!

লোকটাই বলল, গাব গাছ। গাব গাছ চেন?

গাব গাছ সচরাচর চোখে পড়ে না। আমরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করি। হঠাৎ মনোজ আমাকে ইশারা করে, ওই দেখ গাছের ডাল থেকে কত মোটা একটা দড়ি ঝুলছে।

হ্যাঁ, এই দড়িটার নিচে গিয়ে আমি এখন দাঁড়াব। আর তা হলেই তোমরা বুঝতে পারবে কি করে আমি বড় মাছ ধরি।

কেমন যেন রহস্যময় লাগে লোকটার কথা। আমি আর মনোজ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি।

লোকটা ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে দড়ি ঝোলা গাছটার নিচে দাঁড়াল। আর ঠিক এই সময়ই আমাদের নজরে আসে লোকটার দুটো হাতই ফাঁকা, মাছটাও নেই, ছিপটাও নেই।

মনোজ চেঁচিয়ে উঠল, আপনার মাছ?

লোকটা হিঁ হিঁ করে একটু হাসল, যার মাছ সে নিয়ে গেছে। বললাম না, সন্ধ্যে হলেই যার মাছ তাকে পৌঁছে দিতে হবে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখ, ছ'টা বারো কখন হয়ে গেছে।

কী ব্যাপার বল তো!

মনোজ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, ছটা বত্রিশ।

তারপর আরো আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটল। গাছের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠি, লোকটাও নেই দড়িটাও নেই।

সারা গা কাঁটা দিয়ে উঠল আমাদের। মনোজ চিৎকার করে উঠল, ভূত ভূত।

তারপর দু'জনে মিলে দে ছুট। ছুটতে ছুটতে জঙ্গল থেকে যখন বেরুলাম তখন বেশ রাত। কিন্তু ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল আমাদের।

পরদিন ফের মনোজের সঙ্গে দেখা। মনোজ বলল, আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, জঙ্গলের ভিতর ওই গাব গাছে দড়ি ঝুলিয়ে একটা লোক ফাঁসি দিয়ে মরেছিল কয়েক বছর আগে। কাল বড্ড বেঁচে গেছি আমরা।

এর পরও আমরা অনেক দিন ওই পুকুরেই মাছ ধরতে গেছি, কিন্তু মেছোভূতটাকে আর কোনোদিন আমরা চোখে দেখিনি।

ছবি : শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

# গদাইয়ের ইংরেজি শেখা // মঞ্জিল সেন

গদাইয়ের মন খুব খারাপ। ওর বাবা বলে দিয়েছে আর ইস্কুলে যেতে হবে না, এবার খরায় চাষবাসের খুব ক্ষতি হয়েছে, ঘরে সবকিছু বাড়ন্ত, ইস্কুলের খরচা আসে কোত্থেকে! তার চাইতে গদাই বরং ওর বাবার সঙ্গে চলুক, ঘরামির কাজ করে কিছু রোজগার করবে, বাবাকেও সাহায্য করা হবে। ওর বাবা ঘরামির কাজও জানে, যখন চাষবাস থাকে না তখন ওই কাজই করে। পেট চালাতে হবে তো, সংসারে মনিষ্যি কম নয়, শুধু চাষবাসে পেট ভরে না, তাও আবার অন্যের জমিতে গতর খাটা।

গদাই তাই চলছিল কয়েক ক্রোশ দূরে শহরে, ওখানে তার বাবা এক ডেকরেটরের কাছে ঠিকে কাজ পেয়েছে। মরশুমের সময় ডেকরেটরদের বাড়তি লোক দরকার হয়। গদাইয়ের বাবা হাতে কাজ না থাকলেই ওই ডেকরেটরবাবুর কাছে চলে যায়, জুটেও যায় কাজ একটা, বিশেষ করে পূজা-পার্বণ আর বিয়ের সময়। বাবুর এখন লোকের দরকার, একসঙ্গে কয়েকটা কাজে হাত দিয়েছেন, তাই গদাইকে খবর পাঠিয়েছে ওর বাবা। এখন শহরে গিয়ে কিছুদিন থাকতে হবে। ডেকরেটরবাবুই ওর বাবাকে বলেছিলেন ছেলেকে আনবার কথা। বাপ-ব্যাটায় একসঙ্গে রোজগার করবে, শুখা সময়টা তবে আর শুকিয়ে মরতে হবে না। ডেকরেটরবাবু মন্দ পয়সা দেন না।

গদাইয়ের কিন্তু এসব কাজ মোটেই ভাল লাগে না। ওর এখন পনের বছর বয়স। ওর মনে অনেক আশা ছিল, লেখাপড়া শিখে বাবুদের মতো চাকরি করবে, নিদেন গাঁয়ের প্রাইমারি ইস্কুলের মাস্টার হবে। এমনিতেই একবার অসুখে ওর একটা বছর নষ্ট হয়েছে, তাছাড়া একটু বেশি বয়সেই ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিল ও।

ওর বাবার মোটেই ইচ্ছে ছিল না যে ও ইস্কুলে ভর্তি হয়। চাষীর ছেলে বাপের সঙ্গে সঙ্গে চাষের কাজ শিখবে এই তো নিয়ম। কিন্তু গদাই খুব বায়না ধরেছিল ও লেখাপড়া করবে, ইস্কুলে যাবে। ওর এক মামা লেখাপড়া শিখে এখন এক উকিলবাবুর মুহুরি হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ওর মায়ের জেদাজেদিতে বাবা রাজী হয়েছিল, ভর্তি করে দিয়েছিল ইস্কুলে।

লেখাপড়ায় গদাই কিন্তু খারাপ নয়। অঙ্কে বেশ মাথা, বাংলাতেও ভাল, শুধু ইংরেজিতে কাঁচা। ওটা কিছুতেই ওর মাথায় ঢোকে না। ইস্কুলে আর কতটুকু শেখানো হয়! বাড়িতে বুঝিয়ে দেবার বা পড়াবার কেউ নেই। ইস্কুলের অনেক ছেলেই বাড়িতে মাস্টারমশায়ের কাছে পড়ে, কিন্তু ওর বাবার যা অবস্থা, ইস্কুলের খরচা যোগাতেই হিমশিম খেয়েছে এতদিন। ঠিকমত পড়লে ওর এবার ক্লাস নাইন হতো।

শহরে যেতে ওকে অনেকটা পথ পেরোতে হবে। সূর্য মাথার ওপর ওঠবার আগেই ও পৌঁছতে চায়। যা খরা চলছে, মাঠ-ঘাট শুকিয়ে কাঠ। চাষী মাঠে লাঙল দেবে কি, আশি নব্বই বছরের বুড়ির মুখের বলিরেখার মতো অজস্র ফাটল ধরেছে রুক্ষ মাটির বুকে। এখন দরকার ভারী বৃষ্টি অথচ মেঘের দেখা নেই। কালবৈশাখী এবার যেন আসতেই ভুলে গেছে। বৃষ্টি না হওয়ায় আমগাছের মুকুল শুকিয়ে যাচ্ছে, ফলের ব্যাপারীদেরও মাথায় হাত।

গদাইয়ের মা ওর কোঁচড়ে অনেকটা মুড়ি আর কিছু বাতাসা দিয়ে দিয়েছিল। ভোরবেলাতেই ও বেরিয়ে পড়েছে। মুড়ি আর বাতাসা চিবুতে চিবুতে চলেছে। একটা বড় মাঠ ওকে পেরোতে হবে। শুকনো খটখটে মাঠ, এদিক ওদিক কয়েকটা খেজুর গাছ, আসশেওড়া আর ফণিমনসার ঝোপ চোখে পড়ে। মাঠ নয় যেন এক প্রান্তর, মরুভূমির মতো খাঁ খাঁ করছে। রুক্ষ, ধূসর, ফেটে চৌচির, ঘাসের চিহ্ন মাত্র নেই, অল্পস্বল্প যা

আছে তাও হলদে, বিবর্ণ হয়ে গেছে।

হঠাৎ ওর নজরে পড়ল এক বুড়ো ভদ্রলোক আর সঙ্গে বোধহয় তাঁর স্ত্রী এদিকেই আসছেন। ভদ্রলোকের মাথায় একটা ছাতা, দুজন কোনোমতে তার তলায় মাথা গুঁজে হাঁটছেন। ভদ্রলোকের বাঁ হাতে একটা চামড়ার ব্যাগ, বেশ ভারী মনে হয়, ভদ্রমহিলার এক হাতে মিষ্টির একটা হাঁড়ি, অন্য হাতে একটা বড় থলি, সেটাও বেশ ভারী, দেখেই বোঝা যায়।

দুজনেই বেশ হাঁপিয়ে পড়েছেন, একে খরায় সকাল থেকে আগুনে-হাওয়া বইছে, তার ওপর মাল-পত্তর নিয়ে হাঁটা, বয়স হয়েছে তো, আর বুঝি চলতে পারছেন না।

গদাই কাছে আসতেই বুড়ো ভদ্রলোক বললেন, "পলাশপুর আর কতদূর বাবা?"

"পলাশপুর! গদাই অবাক হয়ে তাকায়,"সে তো ইদিকে নয়।"

"সেকি!" বুড়ো ভদ্রলোক যেন আকাশ থেকে পড়লেন "আমাকে যে একজন এদিকেই পথ দেখিয়ে দিল।"

"ভুল বলেছে", গদাই বলল, "এই মাঠ দিয়েই আপনাদের যেতে হবে না।"

"কিন্তু লোকটা যে বলল, এই মাঠ পেরোলেই পলাশপুর", বুড়ো ভদ্রলোক অসহায়ের মতো বললেন।

"ওই লোকটাকে দেখেই আমার খারাপ লেগেছিল", এতক্ষণে মুখ খুললেন ভদ্রমহিলা। কাঁচা সোনার মতো গায়ের রঙ, এত বয়সেও জলুস কমেনি। রোদে তেতে তপ্ত কাঞ্চন বর্ণের মতো দেখাচ্ছে, গায়ে দামী গয়না।

ঠিক তখুনি গদাইয়ের চোখে পড়ল দুজন লোক ছুটতে ছুটতে এদিকেই আসছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা সম্ভাবনা ওর মাথায় ঝিলিক খেলে গেল। এই মাঠটার দুর্নাম আছে, লোকে বলে ঠ্যাঙ্গাড়ে মাঠ। সরল, নিরীহ মানুষকে ভুলিয়ে এই মাঠে এনে টাকাপয়সা সব কেড়ে নেয় দুষ্টু লোক, তাই নাম হয়েছে ঠ্যাঙ্গাড়ে মাঠ। নির্জন প্রান্তরে অসহায় পথিকের কিছুই করার থাকে না। এই ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা কি তাদের খপ্পরে পড়েছেন?

হাতের কাছে কোনো অস্ত্র নেই যা দিয়ে লোক দুটিকে বাধা দেওয়া যায়। একটা লাঠি যদি থাকত হাতে! গদাই ভাল লাঠি খেলতে জানে। বুড়ো ভদ্রলোকের হাতের ছাতাটা দামী, স্টিলের ডান্ডি, ডগাটা সরু।

"আপনার ছাতাটা একটু দিন তো?" ও বলল।

"কেন?" বুড়ো ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন।

"পরে বলব", ছাতাটা বুড়ো ভদ্রলোকের হাত থেকে প্রায় কেড়েই নিল গদাই, তারপর গুটিয়ে ফিতেটা আঁটো করে চারপাশে ঘুরিয়ে বোতামের সঙ্গে আটকে দিল।

"এটা কি হলো?" বুড়ো ভদ্রলোক একটু রাগত কণ্ঠেই বললেন, "তোমাকে তো ভাল ছেলে বলেই মনে করেছিলাম।"

"মুখ দেখে কাউকে বোঝা যায় না", ভদ্রমহিলা বললেন, "দামী ছাতাটা....."

তাঁর কথা শেষ হবার আগেই পেছনে দ্রুত পায়ের শব্দে তাঁরা দুজনে ফিরে তাকালেন। দুজন লোককে দেখে বুড়ো ভদ্রলোক যেন সাহস পেলেন, বললেন, "এই দেখুন, আমার দামী ছাতাটা এই ছেলেটা কেড়ে নিয়েছে।"

হা হা হা। ওদের একজন হেসে বলল, "এ যে চোরের ওপর বাটপাড়ি, এ্যাঁ।" তারপর গদাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, "ভাল, ভাল, এই তো কাজ শেখার বয়স। তা ছাতাটা তুই নিগে যা, আমাদের দরকার টাকাকড়ি।"

"ওমা, এ যে সেই লোকটা", ভদ্রমহিলা বলে উঠলেন, "এই

গর্জন করে উঠল প্রথম লোকটি।

তো আমাদের ভুল পথ দেখিয়েছে!"

"তা একটু দেরিতে বুঝলেন মা ঠারান", লোকটা দাঁত বের করে হাসল, "এখন গায়ের গয়নাগাঁটি খুলে দ্যান, অনেক দূর যেতে হবে আপনাদের, একটু হালকা কইরে দি। আর কত্তা", বুড়ো ভদ্রলোকের দিকে ফিরে সে বলল, "টাকা-পয়সা যা আছে বের করেন চটপট, আমাদের হাতে সময় কম।" বলেই সে তার সংগীর দিকে ইংগিত করল। সে ফস করে একটা ছোরা বের করে কয়েকবার লোফালুফি করল।

"ও খুব ভাল ছোরা ছুঁড়তে পারে", প্রথম লোকটি বলল, "দূর থেকে ছুঁড়ে বুকের ভেতর সেঁধিয়ে দেয়। তাড়াতাড়ি করেন বাবু, মাথার উপর সূয্যি উঠলি পর আপনাদিগেরও কষ্ট, আমাদিগেরও কষ্ট।"

বুড়ো ভদ্রলোক অসহায়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

"কি হলো?" এবার গর্জন করে উঠল প্রথম লোকটি, "ভাল কথার মানুষ নয় দেখতেছি আপনারা। খুন-জখম করার ইচ্ছে ছিলনি আমাদের, তা আপনারা হতে দিবেননি।"

তার কথা শেষ হবার সংগে সংগে দ্বিতীয় লোকটি ছোরার ফলাটা বুড়ো ভদ্রলোকের গলায় ঠেকালো। লোকটার গায়ের রঙ কুচকুচে কালো, মাথায় বাবরি চুল, ডাকাতের মতোই চেহারা।

"ওঁকে ছেড়ে দাও", ভদ্রমহিলা আর্তনাদ করে উঠলেন।

"গয়না যা গায়ে আছে সুড়সুড় কইরে খুইলে দ্যান মা ঠারান, তবেই ওনারে ছাইড়ে দিব। গয়নার দাম বেশি না ওনার পেরাণের দাম বেশি তা এখন ভাইবে দেখেন।'

ভদ্রমহিলা আর কথা না বাড়িয়ে গা থেকে একে একে গয়না খুলে প্রথম লোকটির হাতে তুলে দিতে লাগলেন। তাঁর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।

"এবার আপনার পালা", দ্বিতীয় লোকটি ছোরা নামিয়ে বুড়ো ভদ্রলোককে বলল, "টাকা-পয়সা যা আছে বাইর করেন কত্তা, লুকায়ে রাখবেন না।"

বুড়ো ভদ্রলোক ভয়ে ভয়ে পকেটে যা টাকা-পয়সা ছিল বের করতে লাগলেন। প্রথমজন তখন গয়না নিয়ে ব্যস্ত, দ্বিতীয়জনের লোভী চোখ দুটো বুড়ো ভদ্রলোকের ওপর। গদাইকে কেউ লক্ষ্যই করছে না। ও দেখল এই সুযোগ। ও ছাতা দিয়ে দ্বিতীয় লোকটির হাতে সজোরে আঘাত করল, ছোরাটা হাত থেকে খসে পড়ে গেল মাটিতে। লোকটা হাত চেপে কাৎরাচ্ছে। গদাই আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করল না। এক লাফে ছোরাটা কুড়িয়ে নিল, তারপর ছাতার ডান্ডার সরু স্টিলের ফলা দিয়ে প্রথম লোকটার বুকে এক খোঁচা মারল, ককিয়ে উঠল লোকটা।

"সব গয়না মাটিতে নামিয়ে রাখ", গদাই চেঁচিয়ে বলল, "নইলে ছাতাপেটা করব, দেখছ তো লোহার ডান্ডা আছে এতে।"

লোকটা বুকে হাত দিয়ে বসে পড়েছিল, সব গয়না হাত থেকে পড়ে গেছে। গদাই আড়চোখে তাকিয়ে দেখল যার হাতে সে ছাতা দিয়ে মেরেছিল সে ওর দিকে একটু একটু করে এগোবার চেষ্টা করছে। ও কয়েক পা পিছিয়ে বলল, "খবরদার, আর এগিয়েছ কি ছোরা দিয়ে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেব। ইস্কুলে আমাকে লাঠি আর ছোরা খেলা শিখিয়েছে, এবার তার পরখ হয়ে যাবে।"

লোকটা থেমে গেল। যে বসে পড়েছিল সে বলল, "তুমি পাগল হলে নাকি, তোমাকেও বখরা দেব।"

"চোপ," গদাই ধমকে উঠল, "আমি কি তোমাদের মতো চোর-ছ্যাঁচোড় নাকি যে বখরা নেব!"

ওর বয়স পনের হলেও বেশ জোয়ান চেহারা, মাথাতেও বেড়েছে।

লোক দুজন কিন্তু অত সহজে শিকার হাতছাড়া হতে দিতে রাজী নয়। হঠাৎ তারা একসংগে তেড়ে এল। গদাইও কম যায় না। ছোরাটা দাঁতে চেপে দুহাতে ছাতাটা শক্ত করে বাগিয়ে ধরে দমাদ্দম পেটাতে লাগল ওদের। শেষ পর্যন্ত ওরা রণে ভংগ দিল, দৌড়ে পালাল।

কপালের ঘাম মুছে একগাল হাসল গদাই, তারপর ভদ্রমহিলাকে বলল, "গয়নাগুলো তুলে নেন।"

ভদ্রলোক বললেন, "তুমি....."

তাঁর মুখের কথা কেড়ে গদাই একটু আহত কণ্ঠে বলল, "আমি ওদের মতলব বুঝতে পেরেছিলাম, তাই ছাতাটা নিয়েছিলাম আর আপনি ভাবলেন কিনা আমি....."

"আমাকে মাপ কর বাবা, আমি বুঝতে পারিনি," ভদ্রলোক ওর দুহাত জড়িয়ে ধরলেন। ভদ্রমহিলা ইতিমধ্যে গয়না তুলে নিয়েছেন।

"আপনারা আসতেছেন কোথা হতে?" গদাই জিগ্যেস করল। ইস্কুলে পড়ে ওর ভাষা অনেক মার্জিত হয়েছে তবু মাঝে মাঝে দু-একটা গ্রাম্য কথা বেরিয়ে আসে।

"রাণাঘাট থেকে বাবা", বুড়ো ভদ্রলোক বললেন, "এদিকে আগে কখনও আসিনি।"

"তা পলাশপুরে কাদের বাড়ি যাবেন?"

"নিবারণচন্দ্র রায়, আমার ছেলে", বুড়ো ভদ্রলোক জবাব দিলেন, "ইস্কুলের হেডমাস্টার হয়ে নতুন এসেছে ওখানে।"

"ওটা তো হাই ইস্কুল", গদাইয়ের দুচোখ বড় বড় হলো, "আপনার ছেলে ওখানকার হেড স্যার!"

"হ্যাঁ, বাবা", এবার ভদ্রমহিলা বললেন, "ইংরেজিতে এম এ, ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল। সরকারি ইস্কুলে পড়ায় তো, আগে ওদিকেই ছিল, কিছুদিন হলো পলাশপুর বদলি হয়ে এসেছে।"

"তা আপনারা রিকশা বা গাড়ি করেন নাই কেন? হেঁটে অতদূর যাওয়া যায়? বাসেও তো যেতে পারতেন?"

"কি করব বাবা", বুড়ো ভদ্রলোক বললেন, "স্টেশনে নেমে শুনলাম কি একটা গোলমাল হয়েছে তাই সব স্ট্রাইক। গাড়িঘোড়া বন্ধ, কোনো রিকশাই যেতে রাজী হলো না, বেশি টাকা দেব বলেছিলাম। এদিকে ছেলেকেও খবর দিইনি, হঠাৎ এসে অবাক করে দেব ভেবেছিলাম। নাতনির জন্য মিষ্টি নিয়ে যাচ্ছি, ও আবার রাণাঘাটের পান্তুয়া খুব ভালোবাসে।"

"আমরা যখন গাড়ির খোঁজ করছিলাম, ওই লোকটিই এগিয়ে এসে আমাদের জিগ্যেস করল কোথায় যাব", ভদ্রমহিলা বললেন, "তারপর আমাদের পথ দেখাবার নাম করে নিয়ে এসে এই মাঠটা দেখিয়ে দিল। বলল, এটা পার হলেই পলাশপুর। কি দুষ্টু লোক, তুমি না এসে পড়লে আজ আমাদের রক্ষে ছিল না।"

গদাই অনেক কষ্টে হাসি চাপল। কিছুক্ষণ আগে ভদ্রমহিলা

ওর সম্বন্ধেই বলেছিলেন, "মুখ দেখে কাউকে বোঝা যায় না।"

"তা এতটা পথ আপনারা জিনিস-পত্তর নিয়ে যাবেন কেমন করে?" গদাই না বলে পারল না।

"তুমি বাবা আমাদের একটু পৌঁছে দাও," ভদ্রলোক আকুল কণ্ঠে বললেন, "ভগবানই তোমাকে জুটিয়ে দিয়েছেন।"

গদাই একটু ইতস্তত করল। শহরে পৌঁছাতে ওর অনেক দেরি হয়ে যাবে, বাবা খবর পাঠিয়েছিল সকালের মধ্যেই যেন চলে আসে।

"তোমাকে আমরা খুশি করে দেব," ভদ্রলোক বললেন, "আমরা অকৃতজ্ঞ নই।"

গদাই এবার ভুরু কোঁচকালো, বলল, "আমি কি আপনাদের কাছ থেকে কিছু পাবার আশায় ওদের সঙ্গে মারামারি করেছি! আমার কর্তব্য মনে হয়েছিল, তাই।"

"আমার ভুল হয়ে গেছে বাবা," ভদ্রলোক বললেন, "তোমার মতো ছেলে বড় একটা চোখে পড়ে না আজকাল, পরের জন্য কে এমন নিজের জীবন বিপন্ন করে বল!"

"ঠিক আছে, চলেন", গদাই বলল, "ওই চামড়ার ব্যাগটা আর থলিটা আমাকে দেন, অতটা পথ আপনারা বইতে পারবেন না।"

ওঁদের আপত্তি সত্ত্বেও ও-দুটো ও দুহাতে নিল, তারপর হাঁটা দিল।

পথে যেতে যেতে ভদ্রলোক ওর মা-বাবা, বাড়ি-ঘর, কোন ইস্কুলে কোন ক্লাসে পড়ে এসব জিগ্যেস করলেন। গদাই মন খুলে সব বলল। ওরা গরীব, বাবা চাষ-আবাদের কাজ করে। ইস্কুলে এবার ক্লাস এইটে উঠেছিল, কিন্তু বাবা বলেছে আর পড়াতে পারবে না, এবার থেকে বাবার সঙ্গে কাজে বেরোতে হবে। লেখাপড়া করার খুব ইচ্ছে ওর, ক্লাসে ভালই নম্বর পায় শুধু ইংরেজিটা ছাড়া। ইংরেজি গ্রামার ওর কাছে খুব কঠিন লাগে। ইংরেজিটা ওকে যদি কেউ ভাল করে পড়াত তবে ও নিশ্চয়ই ভালভাবে ইস্কুলের শেষ পরীক্ষায় পাশ করত। কিন্তু ওর অদৃষ্টে লেখাপড়া নেই। নিজের কাহিনী শেষ করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল গদাই।

সেদিন ছিল রবিবার। নিবারণচন্দ্র রায়ের বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে একটু বেলাই হয়ে গেল। মাঝখানে কয়েকবার ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলাকে বিশ্রাম করতে হয়েছে। বয়স হয়ে গেছে, তার ওপর অতটা হাঁটা অভোস নেই।

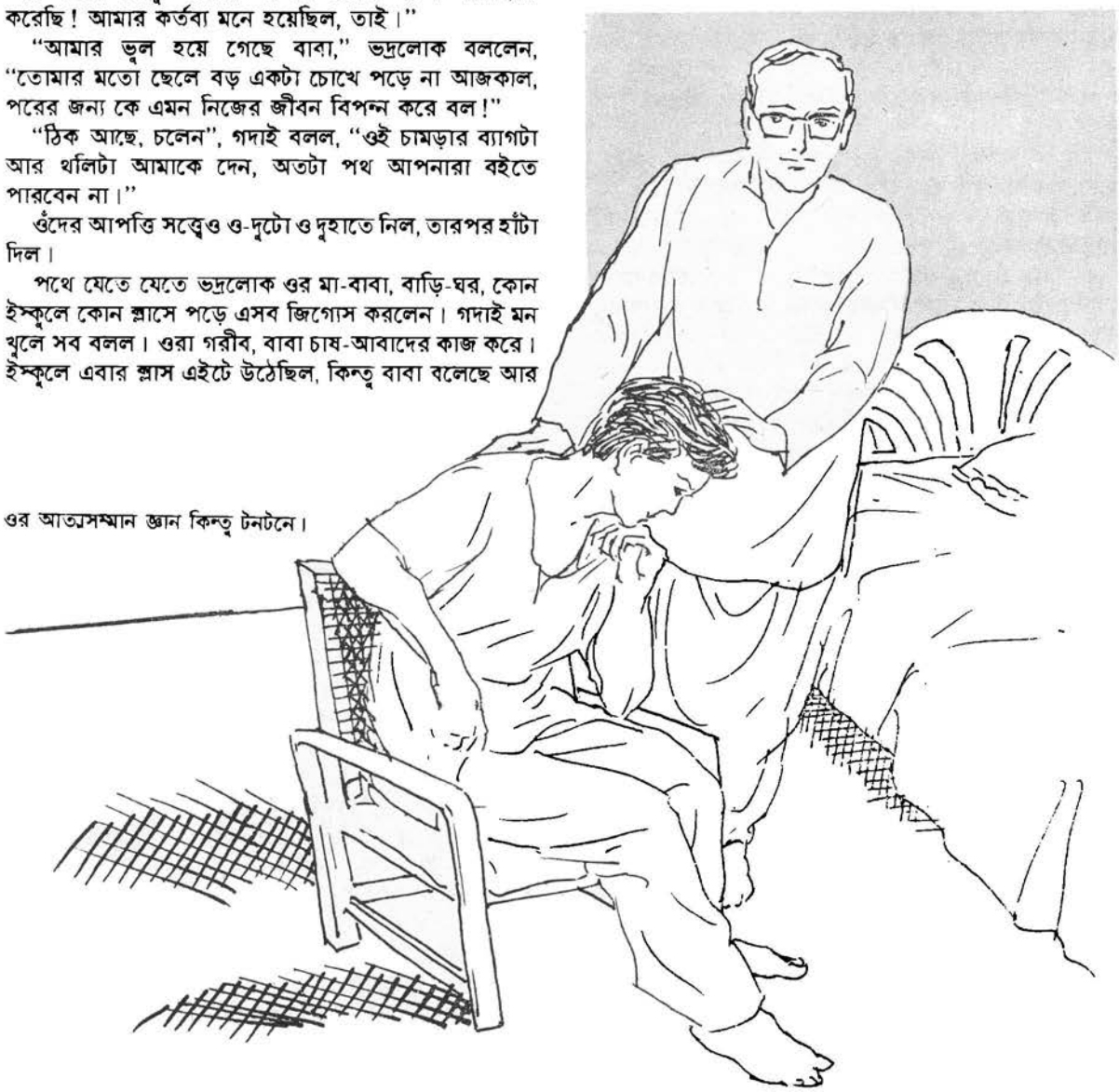

ওর আত্মসম্মান জ্ঞান কিন্তু টনটনে।

নিবারণবাবুর বয়স চল্লিশের কাছাকাছি। সুপুরুষ চেহারা, চোখেমুখে একটা গাম্ভীর্য আছে। তিনি বুড়ো ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলাকে দেখে অবাক। তাড়াতাড়ি পায়ের ধুলো নিলেন, ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর স্ত্রী এসে প্রণাম করলেন। তাঁদের পাঁচ বছরের মেয়ে ঠাকুমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

গদাই বলল, "এবার তবে আমি যাই।"

আসলে নিবারণবাবুকে দেখে ওর কেমন ভয় ভয় করছিল। অত বড় ইস্কুলের হেড্ স্যার। এমনিতেই হেড্ স্যারদের সম্বন্ধে ওর মনে একটা ভয়, সেই ছোটবেলা থেকেই। ও যেন পালাতে পারলে বাঁচে।

বুড়ো ভদ্রলোক বললেন, "পাগল নাকি, কোথায় যাবে তুমি এই অবেলায়, চুপটি করে আমার পাশে বস তো।"

তিনি ওর হাত ধরে টেনে পাশে বসালেন, তারপর ছেলে আর ছেলের বউয়ের কাছে সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন। সব শুনে নিবারণবাবু বললেন, "কি সর্বনাশ! এই ছেলেটি না থাকলে তোমাদের সব কেড়ে নিত, হয়তো গায়েও হাত তুলত!"

তাঁর বউ বলল, "খুব বেঁচে গেছেন আপনারা। কি দুষ্টু লোক, পথ দেখাবার নাম করে কোথায় পাঠিয়ে দিয়েছিল! যা শুনছি, ওখানে খুন-জখম করলেও কেউ জানতে পারত না। ভাগ্যিস ছেলেটি ওই সময় ওখান দিয়ে যাচ্ছিল।"

বুড়ো ভদ্রলোকের নাতনি চোখ বড় বড় করে গদাইকে বলল, "তুমি ডাকাতদের সঙ্গে লড়াই করেছ! তোমার খুব সাহস তো!"

গদাই লজ্জায় মরে যায় আর কি!

"ওর আত্মসম্মান জ্ঞান কিন্তু টনটনে", বুড়ো ভদ্রলোক বললেন, "আমি পুরস্কারের কথা বলায় রেগে গিয়েছিল।"

"তবে কি করা যায়!" নিবারণবাবু একটু মাথা চুলকোলেন, 'আপনি যা বলবেন তাই হবে।"

বুড়ো ভদ্রলোক গদাইয়ের কাহিনী খুলে বললেন।

"ওর খুব লেখাপড়ার শখ, কিন্তু অবস্থার জন্য ওর লেখাপড়া বন্ধ হতে চলেছে," তিনি বললেন, "ছেলেটিকে আমার খুব ভাল লেগেছে নিবারণ, সৎ আর সাহসী। এমন ছেলেই তো দরকার আমাদের দেশের। আমার ইচ্ছে তুমি ওর লেখাপড়ার ভার নাও। তোমার ইস্কুলে ভর্তি করে দাও, খরচপত্তর যা লাগে সব তুমি দেবে।"

"কিন্তু ও এতটা পথ এসে ইস্কুল করতে পারবে কি?" নিবারণবাবু বললেন, "ওর গ্রাম এখান থেকে কম দূর নয়।"

"তবে কি হবে?" বুড়ো ভদ্রলোকের মুখে ছায়া পড়ল।

"তার জন্য ভাবনা কি?" এবার বউটি মিষ্টি হেসে বলল, "ও আমাদের এখানেই থাকবে, আমাদের এখান থেকেই লেখাপড়া করবে। আমরা ওকে যত্ন করেই রাখব, আপনি কিচ্ছু ভাববেন না বাবা।"

নিবারণবাবুর মুখে এবার হাসি ফুটল, তিনি বললেন, "ঠিক বলেছ, কথাটা আমার মনেই আসা উচিত ছিল। তবে ওর বাবার অনুমতি দরকার।" তারপর গদাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার বাবাকে রাজী করাতে পারবে তো?"

গদাই ঘাড় কাৎ করল, ওর মুখ দিয়ে যেন কথা বেরোতে চাইছে না।

"তবে তো কথাই নেই," বুড়ো ভদ্রলোক প্রসন্ন মুখে বললেন, "তুমি এক কাজ কর বাবা, এখানে ভাত খেয়ে একটু বিশ্রাম কর, তারপর বাবার কাছে চলে যাও। বাবার সঙ্গে কথা বলে এখানে চলে এস। তোমার কোনো চিন্তা নেই, ছেলে আমার হেডমাস্টার হলে কি হবে, বাপের কথা ওর কাছে বেদবাক্যি, আর বউমা আমার সাক্ষাৎ মা-লক্ষ্মী, খুব দয়ামায়া শরীরে।" তারপর একটু হেসে ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বুঝলে নিবারণ, ইংরেজিটা তুমি কিন্তু নিজে ওকে পড়াবে, ওটাতেই ও কাঁচা, বলছিল অমন খটমটে গ্রামার নাকি ওর মাথায় ঢোকে না।"

তাঁর কথা বলার ভঙ্গীতে সবাই হেসে উঠল, আর লজ্জায় মাথা নিচু করল গদাই। মনে মনে ও কিন্তু ভীষণ খুশি।

ছবি : অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়

# শরৎ যেও না ফিরে

ডাঃ অরুণকুমার দত্ত

শরৎ এসেছে আবার
ধান লুঠ করা মেঘ
হয়েছে ফেরার। নদীর দুকূল
গেছে ভরে, পাড়ভাঙা জলে।
কাশফুলে হাওয়া খেলে
হাসির ফোয়ারা তোলে।
দোয়েল কোয়েল ডাকে
সবুজ পাতার ফাঁকে,
কেঁদে ফেরে সমীরণ দূর বনছায়।
শারদ বাজনা বাজে,
খুশির ছোঁয়াচ লেগে।
নাচে প্রাণ অফুরান শরতের সোনালি রোদে।
এখন বরিষণ লুঠে নিল যে রে
মেঘভাঙা রাঙা রোদে
শরৎ যেও না ফিরে বাংলার বুক চিরে
বহ অনুখন।।

-ছবি : রাহুল মজুমদার

# প্যাটন

নটরাজন

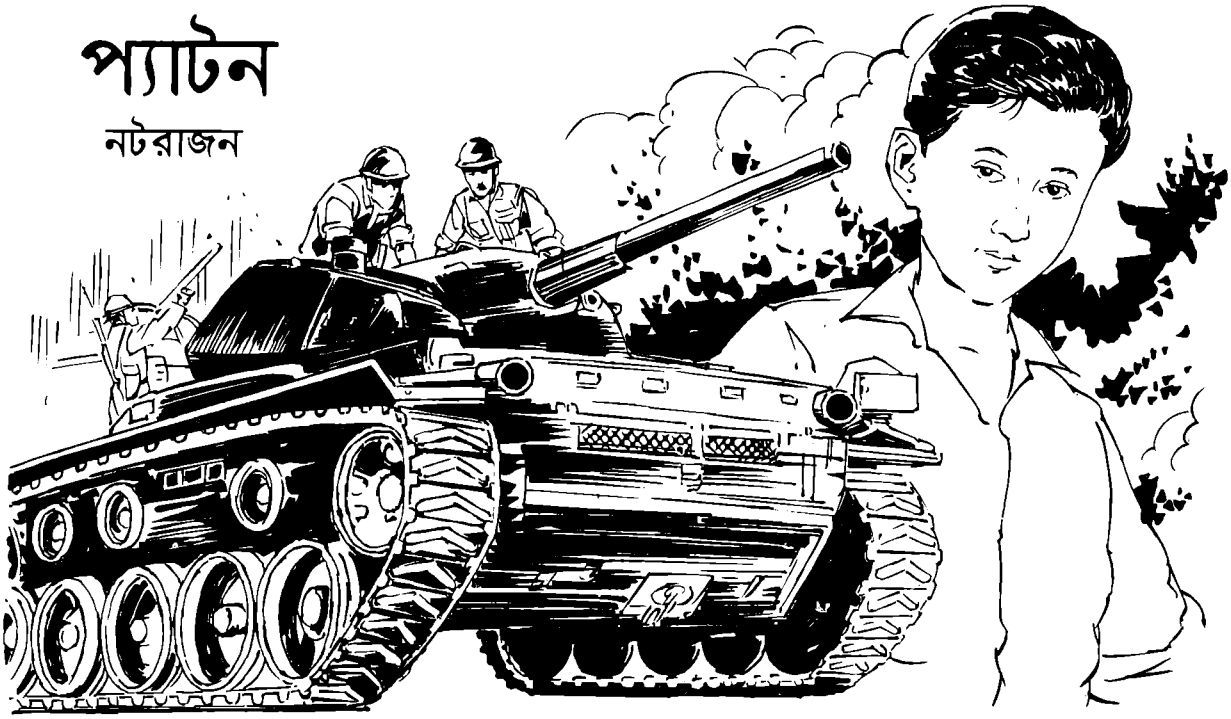

ডাকনাম হিসেবে আজকাল 'গোগোল' নামটা বেশ চালু। এমন একটা চালু নামের অধিকারী বলেই হয়তো আমাদের এই কাহিনীর নায়ক গোগোল নিজেও বেশ চালু। কথা বলে চোখে মুখে। চলা-ফেরা করে প্রায় বিদ্যুৎগতিতে। এই মুহূর্তে সে বাড়ির একতলায় রান্নাঘরের কাছাকাছি ঘুরঘুর করছে, পরমুহূর্তেই খোঁজ করলে তাকে পাওয়া যাবে বাড়ির চিলেকোঠায় নিজের সৈন্যবাহিনীর মধ্যে। হ্যাঁ, সৈন্যবাহিনী। নানা সাইজের, নানা আকৃতির গোটা পঁচিশ তিরিশ মাটি, রবার ও প্লাস্টিকে তৈরি পুতুল নিয়েই তার বিশাল সৈন্যবাহিনী। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অবস্থায় সে এই পুতুলগুলো কিনেছে। হাতে পয়সা পেলেই সে পুতুল কেনে। এটাই তার একরকম নেশা। বাড়ির চিলেকোঠার একটা পাশ সম্পূর্ণ অধিকার করে রেখেছে গোগোলের এই সৈন্যবাহিনী। আবার, এই সৈন্যবাহিনীর সবাই যে মানুষ তাও নয়। কিছু আছে হনুমান, কিছু আছে রাক্ষস, কিছু আছে মাথায় চুড়ো বাঁধা দেবতার মতো দেখতে। এরই মধ্যে একালের বন্দুকধারী প্যান্ট-শার্ট পরা সেপাইও আছে। আসলে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে গোগোল তাদের এই বাড়িতে আমদানী করেছে। যেমন টি. ভি.তে যখন রামায়ণের রমরমা, তখন লম্বা লেজওয়ালা হনুমান, ভয়ংকর দর্শন রাক্ষসসৈন্য এই বাড়িতে ঢুকেছে গোগোলের হাত ধরে। আবার মহাভারতের সময় এসেছে মাথায় চুড়ো বাঁধা দেবতার মতো দেখতে সৈন্যরা। এছাড়া, রাস্তাঘাটে দেখা পুলিশ, হোমগার্ডের মতো পোশাকপরা সৈন্যরা তো আছেই। বাড়ির চিলেকোঠায় এই বিশাল সৈন্যবাহিনীর একমাত্র অধীশ্বর শ্রীমান গোগোল। সে কখনও হয় এই সাম্রাজ্যের রাজা, কখনও বা এদের সেনাপতি। গোগোলের এই সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলায় তার ছোট্কা অর্থাৎ ছোটকাকা ধীরেনের দান অপরিসীম। সুযোগ পেলেই গোগোল চড়াও হয় ধীরেনের ওপর। তারপর তার কাছে থেকে পুতুল কেনার পয়সা আদায় করে ছাড়ে। এই আদায় করার ব্যাপারে গোগোলের খুড়তুতো ভাই অর্থাৎ ধীরেনের নিজের ছেলে বাচ্চু পর্যন্ত পিছিয়ে থাকে। বাপকে বড়ই ভয় করে বাচ্চু। তাছাড়া সে খুবই শান্ত প্রকৃতির। বয়সেও যেমনি সে সামান্য ছোট তেমনি সর্বদাই গোগোলের অনুগত। দাদার অর্থাৎ গোগোলের হুকুম তার কাছে দেববাক্য। গোগোলের চিলেকোঠার সাম্রাজ্যে প্রবেশের একমাত্র অধিকার বাচ্চুর। এই অধিকার বাচ্চুর চাইতে চার বছরের বড় তার নিজের দিদি শম্পারও নেই। শম্পা হয়তো গোগোলের সাম্রাজ্যে ঢুকে পুতুলগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। বাচ্চু সাবধান করে তাকে। বলে, দিদি, হাত দিসনি। গোলদা দেখতে পেলে....। কথাটা শেষ না করেই বাচ্চু থেমে যায়। গোগোলকে সে গোলদা বলেই ডাকে।

–চুপ কর ডেঁপো ছেলে কোথাকার! বাচ্চুকে ধমকে ওঠে শম্পা, আমি কি তোর গোলদার পুতুল ভাঙছি? একটু তো দেখছি কেবল।

–গোলদা ধরতে বারণ করেছে। ভয়ে ভয়ে জবাব দেয় বাচ্চু।

–ইস্, তোর গোলদা যেন লাটসাহেব যে তার কথা শুনতে হবে। মুখ ভেংচে জবাব দেয় শম্পা।

ঠিক এমনি সময় সেখানে গোগোলের আগমন। চিৎকার করে সে বলে ওঠে, ওকি দিদি, তুই যে আমার সৈন্যদের গায়ে হাত দিয়েছিস?

–কেন, কি হয়েছে তাতে? জবাব দেয় শম্পা, তোর সৈন্যরা কি ননীর পুতুল যে গায়ে হাত ঠেকালে গলে যাবে?

নিজের সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে দিদির এই ধরনের মন্তব্য অপমানজনক, তাই তাড়াতাড়ি বলে ওঠে গোগোল, আমার

সৈন্যরা তোর নিজের মতো ননীর পুতুল নয়। ওদের চেহারা দেখেছিস? এক একজন দারা সিং–

ফোঁস করে ওঠে শম্পা, আমি বুঝি ননীর পুতুল?

–নয় তো কি? রীতিমতো ঝগড়া শুরু করে গোগোল, সেদিন ছোট্কা গালে একটা টোকা দিতে না দিতেই ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলেছিলি না?

আট বছরের ছোট ভাইয়ের মুখে সেদিনের সেই লজ্জাকর কান্নার কথা ঠিক বরদাস্ত করতে পারে না বারো বছরের শম্পা। তাই সে পাল্টা অভিযোগ আনে গোগোলের বিরুদ্ধে, সেদিন যে বড়মা তোর কানটা ধরতেই বেড়ালছানার মতো চিঁ-চিঁ করেছিলি, মনে নেই? কথার সঙ্গে সঙ্গে শম্পার অঙ্গভঙ্গি দেখে বাচ্চু খিল্‌খিল্ করে হেসে উঠতেই গোগোল তার গোল গোল চোখ পাকিয়ে ধমকে ওঠে তাকে, তুই হাসছিস, ভাই?

গোলদার ধমক খেয়ে তাড়াতাড়ি নিজের হাতে মুখ চাপা দিলেও গোগোলের সেদিনের দুর্গতির ছবিটি মনে করে বাচ্চুর চোখ দুটো তখনও হাসতে থাকে।

সেই মুহূর্তে শম্পার দিকে ব্রহ্মাস্ত্র ছোঁড়ে গোগোল। বলে ওঠে, কাল বিকেলে যে তুই ছোটমা'র মিটসেফ থেকে আচার চুরি করে খেয়েছিলি তা আমি সকলকে বলে দেব।

মাথার ববচুল ঝাঁকড়ে জবাব দেয় শম্পা, আমি কি নিজে থেকে চুরি করেছিলাম? ঐ বাচ্চুটাই তো বলেছিল চুরি করে আনতে। ছোট ভাই। ওর কথা তো আর ফেলতে পারি না। তাই তো এনেছিলাম। কিরে বাচ্চু, চুপ করে আছিস কেন? সত্যি করে বল তো তুই বলেছিলি না?

কথাটা যখন মিথ্যে নয় তখন বাচ্চুর পক্ষে চুপ করে থাকা ছাড়া আর উপায় কি? শম্পা বলতে থাকে, সেই আচার তুই ও বাচ্চু দু'জনেই তো খেয়েছিলি। বেশ, আর কখনও আচার চুরি করে তোদের খাওয়াবো না।

নিজের ছোঁড়া ব্রহ্মাস্ত্র নিজের দিকে ফিরে আসার আশংকায় মনে মনে অস্বস্তিবোধ করে গোগোল। গোগোল ও বাচ্চুর যখন-তখন রান্নাঘরে যাতায়াতের অধিকার নেই। মেয়ে বলে সেই অধিকার শম্পার আছে। সেই সুযোগেই সে ভালো-মন্দ, এটা-ওটা লুকিয়ে নিয়ে এসে ভাইদের খাওয়ায়। শম্পা যদি রেগে গিয়ে এসব বন্ধ করে দেয় তাহলে তাদেরই ষোলআনা লোকসান। তাছাড়া এই সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলায় শম্পাকে না হলে চলে না। বানরসৈন্য নিয়ে রাম-রাবণে যুদ্ধের খেলায় শম্পা না থাকলে তো সীতাকে পাওয়া যায় না। রাম যতই ভালো হোক, আর রাবণ যতই খারাপ হোক, ঐ খেলায় গোগোল অবশ্যই রাবণ হবে। রাম হতে হবে বাচ্চুকে। বাচ্চু যদি রাম সাজতে রাজী না হয়ে মিনমিনে অনুযোগের সুরে বলে, তুই রোজ রোজ রাবণ হবি কেন গোলদা? আমার বুঝি একদিনও রাবণ হতে ইচ্ছে করে না? গোগোল তখন বাচ্চুর গলা জড়িয়ে ধরে তাকে বোঝায়, তুই একদিন যুদ্ধ, ভাই। রাম কত ভালো, রাবণটা তো নচ্ছার। এ খেলার মতো তুই রাম হ। আর একদিন রাবণ হবি। নিরীহ মুখচোরা বাচ্চু আর কিছু না বলে কাঁধে কঞ্চি দিয়ে তৈরি ধনুক-বাণ নিয়ে রাম হয়, আর ছোট্কার ফেলে দেয়া দাড়ি কামানোর ব্রাশের বাকি চুল দিয়ে বানানো একটা জবরদস্ত গোঁফ নাকে লাগিয়ে রাবণ সেজে গোগোল যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এ ব্যাপারে শম্পার কোনো আপত্তি চলে না। সে মেয়ে। কাজেই সীতা তাকে হতেই হবে। মহাভারতের যুদ্ধের সময় কিন্তু এই ভালো-মন্দের যুক্তি খাটায় না গোগোল। বাচ্চুকে অবশ্যই দুর্যোধন হতে হবে। অর্জুন হবে গোগোল নিজে। তখন গাণ্ডীব থাকবে গোগোলের কাঁধে, আর দুর্যোধনের হাতে প্লাস্টিকের পেল্লায় এক গদা। এখানেও শম্পা একান্তই অসহায়। ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক তাকে হতেই হবে দ্রৌপদী। নইলে যে যুদ্ধের খেলাটাই মাটি।

গোগোলের দাদু সুধাসিন্ধু এখনও বেঁচে। বয়স সত্তরের কোঠায়। ভয়ানক গম্ভীর প্রকৃতির তিনি। ছেলেরা অর্থাৎ গোগোলের বাবা রমেন ও তার ছোটকাকা ধীরেন এই বয়সেও রীতিমত সমীহ করে চলেন তাঁকে। রমেন একটা কলেজের লেকচারার। নিজের লেখাপড়া আর কলেজ ছাড়া কিছু জানেন না তিনি। বলতে গেলে ছোটভাই ধীরেনের ওপরেই এই সংসারের ভার। একটা সওদাগরী অফিসের বড়বাবু তিনি।

রমেন ও ধীরেনের মাঝখানে সুধাসিন্ধুর আরও একটি ছেলে ছিল–বরেন। রাজপুত্রের মতো চেহারা ছিল তার। অত্যন্ত মেধাবী ও আদর্শবান। এই দ্বিতীয় পুত্রটিকে নিয়ে গর্বের সীমা ছিল না সুধাসিন্ধুর। মনে মনে ভাবতেন, বরেন একদিন তাঁর পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করবে।

মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিংয়ে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হলো বরেন। বাড়িতে আনন্দের ঢেউ। স্ত্রী অনেকদিন আগেই গত। বাড়িতে স্ত্রীলোক বলতে একমাত্র রমেনের স্ত্রী। তখনও তিনি নিঃসন্তান। আর ধীরেন তখনও ছাত্র।

পাশ করার পরে অনেক ভালো ভালো চাকরির আহ্বান উপেক্ষা করে বরেন যেদিন মিলিটারী ইঞ্জিনীয়ারিং সার্ভিসে যোগ দিল সেদিন মনে মনে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলেন সুধাসিন্ধু। মিলিটারী মানে যুদ্ধ। আর যুদ্ধের কি বিভীষিকা তা ভালকরেই জানতেন সুধাসিন্ধু। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। তখনও ভারতবর্ষ পরাধীন। ব্রিটিশ রাজশক্তির পক্ষে জাপানের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন তিনি। ভয়ংকর সেই যুদ্ধের দিনগুলোর কথা মনে পড়লে এই বয়সেও তিনি শিউরে ওঠেন। কি ভয়ানক হানাহানি, কাটাকাটি, রক্তক্ষয়! অবর্ণনীয় দুর্দশা মানুষের। প্রশ্ন জেগেছিল তাঁর মনে–মানুষে মানুষে এই হানাহানি কি কোনোদিন বন্ধ হবে না? এর কি শেষ নেই? জবাবও কিন্তু পেয়েছিলেন নিজের মনেই–না, এর শেষ নেই। মানুষের ইতিহাসই যুদ্ধের ইতিহাস। যুদ্ধ–সংগ্রাম–লড়াই। মানুষের জীবনের সঙ্গে এই শব্দগুলো ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ থেকে মুক্তি নেই মানুষের।

সুধাসিন্ধুর প্রশ্নের জবাবে বরেন সেদিন বলেছিল, বাবা, আপনি সেদিন লড়াই করেছিলেন একটা বিদেশী শক্তির স্বার্থে। কিন্তু আমি লড়াই করবো নিজের দেশের জন্যে। মাতৃভূমিকে রক্ষা করার চাইতে পুণ্যের কাজ আর কি হতে পারে?

বরেনের এই কথার প্রতিবাদ সেদিন করতে পারেননি সুধাসিন্ধু। সেদিন কেবল দু'হাত তুলে ছেলেকে আশীর্বাদ করেছিলেন তিনি।

নিজের মেজ ছেলেকে নিয়ে সুধাসিন্ধুর স্বপ্ন কিন্তু সার্থক হয়েছিল। তাঁর পরিবারের মুখ উজ্জ্বল করেছিল বরেন। তবে তার জন্যে নিজের জীবন দান করতে হয়েছিল বরেনকে। পাক-ভারত যুদ্ধে খেমকারণ ফ্রন্টে পাকিস্তানকে বিপর্যস্ত করেছিল ভারতীয় সৈন্যবাহিনী। চূড়ান্ত পরাজয় ঘটেছিল পাকিস্তানের। ভারতীয় সৈন্যের হাতে দুর্ধর্ষ পাকিস্তানী প্যাটন ট্যাংকের সমাধি রচনা হয়েছিল সেদিন। প্রচুর পাকিস্তানী অস্ত্রশস্ত্র সেদিন দখল করেছিল ভারতীয় বাহিনী।

ছেলের মৃত্যুর খবরে একেবারে পাথর হয়ে গিয়েছিলেন সুধাসিন্ধু। শোকে-দুঃখে প্রায় বোবা হয়ে গিয়েছিলেন। মাস কয়েক নিজের ঘর ছেড়ে এক পা-ও বাইরে বেরোতেন না। বরেনের একখানি মস্তবড় ছবি তৈরি করিয়ে নিজের ঘরের দেয়ালে টাঙিয়েছিলেন। সেই ছবিতে আজও নিজের হাতে ধূপ জ্বালিয়ে দেন তিনি। মৃত্যুদিনে সাজিয়ে দেন রজনীগন্ধার মালা। তারপরে অনেকগুলো বছর কেটে গেছে। কিন্তু পুত্রশোক আজও ভুলতে পারেননি সুধাসিন্ধু। পুত্রের ছবির দিকে তাকিয়ে আজও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেন তিনি।

পাকিস্তানের যে প্যাটন ট্যাংকবাহিনী একদিন বরেনকে কেড়ে নিয়েছিল সেই ট্যাংক আগে কখনও দেখেননি সুধাসিন্ধু। তবে তিনি শুনেছেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত ট্যাংকের চাইতে এই ট্যাংক নাকি অনেক উন্নতমানের। আমেরিকায় তৈরি এই ট্যাংক নাকি এক একটি চলন্ত দুর্গবিশেষ। কিন্তু দুর্ভাগ্য পাকিস্তানের। এমন বস্তু হাতে পেয়েও শেষরক্ষা করতে পারেনি তারা। পালিয়ে বাঁচতে হয়েছিল তাদের, কিন্তু তার আগে বরেনের মতো কিছু দেশপ্রেমী সৈনিকের মৃত্যু ঘটিয়েছিল তারা।

যুদ্ধজয়ের পরে এই প্যাটন ট্যাংকের একটিকে এনে রাখা হয়েছিল কলকাতার গড়ের মাঠে যুদ্ধজয়ের নিদর্শন হিসেবে। অনেকের মতো সুধাসিন্ধুও একদিন এসেছিলেন এখানে। জলপাই রংয়ের সেই প্যাটন ট্যাংকটি ঘিরে তখন কৌতূহলী জনতার ভিড়। কচি-কাঁচারাও এসেছিল দলে দলে। একটু দূরে একপাশে দাঁড়িয়ে সুধাসিন্ধু কেবল ছলছল চোখে তাকিয়েছিলেন ট্যাংকটির দিকে। মনে মনে ভাবছিলেন, কে বলতে পারে হয়তো এই ট্যাংকটির কামানের গোলাতেই সেদিন ছিন্নভিন্ন হয়েছিল বরেনের দেহটা।

বরেনের ছবিখানাই এখন সুধাসিন্ধুর এক মস্ত গর্ব। নতুন কেউ তাঁর ঘরে এলে প্রথমেই তিনি তাকে ছবিখানা দেখিয়ে বলেন, আমার ছেলের ছবি। মিলিটারী ইঞ্জিনীয়ার। পাক-ভারত যুদ্ধে পাকিস্তানী প্যাটন ট্যাংকের কামানের গোলায় মৃত্যু হয়েছে। বলতে বলতে আনন্দে-গর্বে বৃদ্ধের ছলছলে ঘোলাটে চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

বিকেলে বাড়ির ছাদে একা একা পায়চারি করেন সুধাসিন্ধু। মাঝে মাঝে নাতি-নাতনিদের সেই যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা তাঁর চোখে পড়ে। বিশেষ করে বড় নাতি গোগোলের হাব-ভাব, কথা-বার্তায় আকৃষ্ট হয়ে মনে মনে বলেন, এ ব্যাটার তো দেখছি বড়ই ঝোঁক যুদ্ধের দিকে। এই খেলা ছাড়া যেন অন্য কোনো খেলাই আর মনে ধরে না ওর। তাহলে কি বড় হয়ে এই ব্যাটাও একদিন যুদ্ধে যাবে? অসম্ভব নয়। তিন পুরুষের যুদ্ধবাজ

বড়কাকার এই ছবিটাকে বড়ই ভালো লাগে গোগোলের।

পরিবার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রথম পুরুষ তিনি নিজে। পাক-ভারত যুদ্ধে দ্বিতীয় পুরুষ বরেন। ভবিষ্যতে অন্য কোনো যুদ্ধে হয়তো তৃতীয় পুরুষ এই গোগোল। কথাটা মনে হতেই সুধাসিন্ধুর ভেতর থেকে কে যেন বলে ওঠে, না–না, আর যুদ্ধ নয়। পুত্রহারা পিতার দুঃখ একমাত্র পিতা ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারে না। না, আর নয়। ভবিষ্যতে এই পরিবারের আর কেউ কখনও যুদ্ধে যাবে না।

বড়ছেলে রমেনকে কাছে পেয়ে সুধাসিন্ধু একদিন বলেই ফেললেন, শোন, দাদুভাইকে একটু সামলে রাখতে চেষ্টা কর। বড়ই দামাল হয়ে উঠছে।

–কেন বাবা, ও কি করেছে? মোটা লেন্সের চশমার ফাঁকে বাপের দিকে তাকান রমেন।

তাড়াতাড়ি জবাব দেন সুধাসিন্ধু, না বাবা, দাদুভাই কিছু করেনি। দারুণ বুদ্ধিমান ছেলে। কিন্তু ওর ভাবভঙ্গি আমার ভালো লাগে না। যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা ছাড়া আর কোনো খেলাই ওর মনে ধরে না। তুই তো সংসারের কোনো খবর রাখিস না। অনেককাল বোধহয় ছাদেও যাসনি। গেলে দেখতে পেতিস

দাদুভাইয়ের কান্ড। চিলেকোঠাকে যেন এক যুদ্ধক্ষেত্র বানিয়ে রেখেছে। পুতুলের সৈন্যসামন্ত সাজিয়ে দিদিভাই ও ছোটুটাকে নিয়ে কেবল যুদ্ধ যুদ্ধ খেলে। আমি লক্ষ্য করেছি দিদিভাই ও ছোটু অন্য কোনো খেলা খেলতে চাইলেও দাদুভাই তাতে রাজী হয় না। ওর একমাত্র ঝোঁক কেবল ঐ যুদ্ধের দিকে। এসব কিন্তু মোটেই ভালো লক্ষণ নয়।

ছোটনাতি বাচ্চুকে ছোটু বলেই ডাকেন সুধাসিন্ধু। বাপের কথায় একটু সময় চুপ করে থাকেন রমেন। সুধাসিন্ধুর দুঃখ তিনি বোঝেন। তাই আশ্বাসের ভঙ্গিতে হালকা সুরে জবাব দেন, এ নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না, বাবা। ছেলেমানুষের খেয়াল। বড় হলে কি আর এসব থাকবে?

–না না, বলে ওঠেন সুধাসিন্ধু, এই বয়স থেকেই এমন যুদ্ধের দিকে ঝোঁক ভালো নয়। তোরা তো লক্ষ্য করিস না, আমি দেখি, মাঝে মাঝেই দাদুভাই আমার ঘরে ঢুকে বরেনের ছবিটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।

কথাটা মিথ্যে নয়। বড়কা অর্থাৎ বড়কাকার এই ছবিটাকে বড়ই ভালো লাগে গোগোলের। মিলিটারী পোশাকপরা তার বড়কাকা দেখতে কি সুন্দর। চাক্ষুষ তাকে কখনও দেখেনি গোগোল। তার জন্মের বহু আগেই সে গত হয়েছে। ঐ ছবিটার মধ্যে বড়কাকার যে বীরত্বব্যঞ্জক ভঙ্গিটুকু ফুটে উঠেছে সেটুকুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করে গোগোল। যে ছবির দিকে চোখ পড়লে সুধাসিন্ধুর মনটা ব্যথায় পূর্ণ হয়ে ওঠে, সেই একই ছবি দেখে মনে মনে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে গোগোল। বৃদ্ধের মনে মৃত্যুর দুঃখ, আর বালকের মনে বীরত্বের গর্ব।

একদিন সুধাসিন্ধুর ঘরে ডাক পড়লো তাঁর ছোটছেলের। ধীরেন ঘরে ঢুকতেই গম্ভীর সুরে জিজ্ঞেস করেন সুধাসিন্ধু,ছোট বৌমার কাছে শুনলাম কাল নাকি তুই বাচ্চাদের নিয়ে গড়ের মাঠে প্যাটন ট্যাংক দেখতে যাচ্ছিস?

–হ্যাঁ বাবা, জবাব দেন ধীরেন, ক'দিন ধরেই গোগোলটা–

কথাটা শেষ করতে পারেন না ধীরেন। তার আগেই তেমনি সুরে বলে ওঠেন সুধাসিন্ধু, আমি ঠিকই অনুমান করেছিলাম। এমন উৎসাহ ঐ দাদুভাই ছাড়া আর কারুর নয়।

মিথ্যে নয় কথাটা। পাকিস্তানের প্যাটন ট্যাংকের কামানের গোলায় যে তার বড়কার মৃত্যু হয়েছিল সেকথা গোগোল জানলেও এই শহরেই যে একটা সত্যিকারের প্যাটন ট্যাংক আছে সেই খবরটা মাত্র কিছুদিন আগেই সে জেনেছিল তার এক স্কুলের বন্ধুর কাছ থেকে। আর জানার পর থেকেই ঐ বস্তুটি চাক্ষুষ দেখার জন্যে গোগোল তার ছোট্কাকে অস্থির করে তুলেছিল। অবশেষে একদিন ধীরেনকে প্রায় ঘেরাও করে ফেলেছিল গোগোল। সঙ্গে বাচ্চু ও শম্পা।

সুধাসিন্ধুর কথায় একটু আমতা আমতা করে জবাব দেন ধীরেন, হ্যাঁ বাবা, ওরা সবাই মিলে একদিন বেড়াতে যাবার জন্যে–

ধীরেনের কথার মধ্যেই আবার বলে ওঠেন সুধাসিন্ধু, এই শহরে দেখার মতো বস্তুর তো অভাব নেই। সেসব ছেড়ে ঐ ট্যাংক কেন? এসব মোটেই ভালো নয়। দাদুভাইয়ের এই বয়সে এমন যুদ্ধের দিকে ঝোঁক বন্ধ করা উচিত। ওদের নিয়ে বেড়াতে যাবে যাও। কিন্তু গড়ের মাঠে ঐ প্যাটন ট্যাংকটা দেখাবার দরকার নেই। এতে কেবল ওদের শিশুমনে যুদ্ধপ্রীতিই বাড়বে।

শেষ পর্যন্ত ধীরেন ছেলেমেয়েদের নিয়ে বেড়াতে গেলেও সুধাসিন্ধুর কথা অমান্য করে সেই প্যাটন ট্যাংক দেখতে যাননি। আর এই নিয়ে তিন ভাই-বোন বিশেষ করে গোগোলের ক্ষোভের অন্ত ছিল না। দাদু সুধাসিন্ধুর ওপর মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেও মুখে কিছু প্রকাশ না করে কেবল মুখ ভার করেছিল। ভাইপোর মনের কথা টের পেয়ে ধীরেন আশ্বাসের সুরে বলেছিলেন, চিন্তা করিস না। একদিন প্যাটন ট্যাংক তোদের দেখাবোই। বাবার অনুমতি নিয়েই দেখাবো।

গাল্‌ফ ওয়ার। ইরাকের কুয়েত দখল নিয়ে আমেরিকার নেতৃত্বে বহুজাতিক বাহিনীর সঙ্গে ইরাকের যুদ্ধ। সুধাসিন্ধুর ঘরে রঙীন টি. ভি.র সামনে বাড়ির বড়দের ভিড়। ইংরেজি, বাংলা ও হিন্দী খবরের সময় বাড়ির মহিলারা পর্যন্ত উপস্থিত। একমাত্র বাদ বাড়ির তিনটি ছেলে-মেয়ে। কেবল যুদ্ধের খবর ও ছবি নয়, এ বাড়িতে টি. ভি র খবর শোনা ও ছবি দেখা বরাবর এ বাড়ির ছেলে-মেয়েদের পক্ষে নিষিদ্ধ। সুধাসিন্ধুর যুক্তি, এতে নাকি ছেলে-মেয়েদের খবরের কাগজ পড়ার ইচ্ছে থাকবে না, যা নাকি তাদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। তাছাড়া ওটা তাদের লেখাপড়ার সময়। ওদের জন্যে টি. ভি.র পর্দা খোলা কেবল ছোটদের অনুষ্ঠানের সময়।

প্রচন্ড কৌতূহল গোগোলের। সে যুদ্ধের খবর যতটা সম্ভব যোগাড় করে খবরের কাগজ থেকে। ওদের জন্যেই তিন-চারটে খবরের কাগজ আসে বাড়িতে। কিন্তু এতে মন ভরে না গোগোলের। যুদ্ধের ছবি টি. ভি.র পর্দায় দেখার জন্যে মন উসখুস করে। লুকিয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে এক-আধবার একটু-আধটু ছবিও দেখে। কাজের অছিলায় ঐ সময় দাদুর ঘরে ঢুকতে দু'একবার চেষ্টাও করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে সুধাসিন্ধুর গম্ভীর কণ্ঠস্বর, এখন এখানে নয় দাদুভাই। ঘরে গিয়ে লেখাপড়া করো। তোমাদের অনুষ্ঠানের সময় তোমাদের ঠিক ডেকে পাঠাবো।

তা অবশ্যি ঠিক। ছোটদের অনুষ্ঠানের সময় সুধাসিন্ধু নিজেই ডেকে পাঠান তাদের। তাঁর হুকুমে ঐ সময় বাড়ির প্রাইভেট টিউটরদের পর্যন্ত চুপ করে বসে থাকতে হয়। ছেলে-মেয়েরা ছোটদের অনুষ্ঠান দেখবে, তারপর গিয়ে পড়তে বসবে।

শান্তি নেই গোগোলের মনে। যুদ্ধের এমন টাটকা ছবি সে টি. ভি.র পর্দায় দেখতে পাচ্ছে না। ইরাকের ছোঁড়া স্কাড্ মিসাইল–আমেরিকার পেট্রিয়ট। বড় বড় কামানের চোখ ঝলসানো ছবি। লুকিয়ে লুকিয়ে মাঝে-মধ্যে সে যতটুকু দেখে ফেলে তাতে তার দেখার ইচ্ছে আরও বেড়ে ওঠে। এরই মধ্যে সে দু'একবার ট্যাংকের ছবিও দেখে ফেলেছে। চলন্ত ট্যাংক ঘর্-ঘর্ শব্দ করতে করতে ছুটে চলেছে মরুভূমির রাজ্যে। এই সময় যদি সে একবার অন্ততঃ গড়ের মাঠের সেই প্যাটন ট্যাংকটাও চাক্ষুষ দেখতে পারতো!

বাড়ির চিলেকোঠায় অচিরেই শুরু হয়ে গেল্ গাল্‌ফ ওয়ার। একদিকে ইরাকের সাদ্দাম হোসেন, অন্যদিকে আমেরিকার জর্জ বুশ। নায়কের ভূমিকা নিয়ে প্রথমদিন তো বাচ্চুর সঙ্গে মুখ দেখাদেখিই বন্ধ হতে বসেছিল গোগোলের। সাদ্দাম

আবার যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে বাচ্চু।

হোসেন তখন হিরো। গোগোলের ইচ্ছে সাদ্দাম হবে সে নিজে। রাবণের সেই পেল্লায় গোঁফজোড়া তো তার কাছে মজুত আছেই। ওটাকেই একটু ছেঁটে-ছুঁটে সে সাদ্দামের গোঁফ বানিয়ে নেবে। এদিকে বরাবরের শান্ত বাচ্চুও এবার নাছোড়বান্দা। গোঁফহীন বুশ সে কিছুতেই হবে না। তা'ছাড়া দিদি শম্পা যখন তাকে বুঝিয়ে দিলে যে বুশ মানে ঝোপ অর্থাৎ ঐ বুশের কাজ একমাত্র ঝোপে-ঝাড়ে ঘুরে বেড়ানো তখন একেবারে অটল হয়ে রইলো বাচ্চু। সমস্যায় পড়লো গোগোল। তার ওপর আরও একটা সমস্যা। দিদিটাকে নিয়ে কি হবে? গাল্‌ফ ওয়ারে যখন সীতা কিংবা দ্রৌপদীর মতো কেউ নেই তখন শম্পার ভূমিকা নিয়ে বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লো গোগোল। বিশ্বরাজনীতিতে যদি ভারতের ইন্দিরা গান্ধী কিংবা ব্রিটেনের মিসেস্ থ্যাচারের মতো কেউ থাকতো তা'হলেও না হয় ব্যাপারটা সহজ হতো। কিন্তু এখন উপায়?

শেষপর্যন্ত একটা উপায় বের করলে শম্পা নিজেই। ভাইদের চাইতে বয়সে সে খানিকটা বড়। খবরের কাগজ মারফৎ কিছু বেশি খবরই সে রাখে; গাল্‌ফ ওয়ারে যখন কোনো স্ত্রীলোকের ভূমিকা নেই তখন শম্পাকে বাধ্য হয়ে পুরুষের ভূমিকাতেই নামতে হলো। সে হবে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট গরবাচভ। গোগোল ও বাচ্চু যখন ট্যাংক, মিসাইল নিয়ে ধুন্ধুমার কান্ড বাধাবে তখন শম্পা শান্তির প্রতীক একটা সাদা ফ্ল্যাগ হাতে নিয়ে যুদ্ধ থামাতে চেষ্টা করবে।

বাড়ির চিলেকোঠায় যুদ্ধের প্রস্তুতি শেষ। গোগোল ততক্ষণে কূটকৌশল অর্থাৎ তার রংয়ের বাক্সটা দিয়ে দেবার অংগীকারে বাচ্চুকে জর্জ বুশের ভূমিকায় নামতে রাজী করিয়ে ফেলেছে। কাঁচি দিয়ে গোঁফ ছেঁটে সেই গোঁফ নাকে লাগিয়ে গোগোল তখন গাল্‌ফ ওয়ারের আসল নায়ক–সাদ্দাম হোসেন।

বাড়ির ছাদে পায়চারি করছেন সুধাসিন্ধু। চিলেকোঠায় তখন শুরু হয়েছে গাল্‌ফ ওয়ার। একদিকে পুতুলের সৈন্যবাহিনী নিয়ে সাদ্দামের আস্ফালন, অন্যদিকে বুশের রণহুংকার। যুদ্ধের তান্ডবে গমগম করছে বাড়ির চিলে কোঠা। দলা পাকানো কাগজ দিয়ে তৈরি স্কাড মিসাইল ছুঁড়ছে গোগোল, আর তা পেট্রিয়ট দিয়ে ঠেকাচ্ছে বাচ্চু। ঘর্-ঘর্ শব্দে ছুটে চলেছে ট্যাংক, বুম্-বুম্ শব্দে ফাটছে কামানের গোলা। ওদিকে গোগোল ও বাচ্চুর ঠোঁটে অনবরত বেজে চলেছে বোমারু বিমানের আওয়াজ। সৈন্যবাহিনীর কেউ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, কেউ বা পায়ের ধাক্কায় গড়াগড়ি খাচ্ছে। একটা রবারের পুতুল দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে বলের মতো লাফিয়ে ওঠে। সেইদিকে তাকিয়ে পুতুলটার দুর্দশায় বাচ্চু খিলখিল করে হেসে উঠতেই তাকে ধমকে ওঠে গোগোল, এই ভাই, যুদ্ধের মধ্যে কেউ হাসে নাকি? তাড়াতাড়ি মুখ বন্ধ করে আবার যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে বাচ্চু। এরই মধ্যে একখানা লাঠির মাথায় সাদা ন্যাকড়া জড়িয়ে 'শান্তি–শান্তি' বলে চিৎকার করতে থাকে শম্পা।

পায়চারি থামিয়ে চিলেকোঠার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে

নাতি-নাতনীদের খেলা দেখতে দেখতে একটু স্মিত হাসেন সুধাসিন্ধু। মনে মনে ভাবেন, একালের ছেলে-মেয়ে এরা। জন্ম থেকেই এদের কানের কাছে কেবল লড়াইয়ের আওয়াজ। চারিদিকেই অশান্তি। শান্তির অস্তিত্ব নেই কোথাও। এদের মন থেকে যুদ্ধপ্রীতি দূর করা কি সহজ?

একসময় সুধাসিন্ধু পায়ে পায়ে চিলেকোঠার মধ্যে এসে দাঁড়ান। গোগোল ও বাচ্চুর কপালে তখন ঘাম। শম্পার মুখেও ক্লান্তি। সেই দিকে তাকিয়ে সুধাসিন্ধু বলে ওঠেন, অনেকক্ষণ খেলা করেছিস, দাদুভাই। এবার তোরা একটু বিশ্রাম কর।

–যুদ্ধের মধ্যে কেউ বিশ্রাম করে নাকি দাদু? জিজ্ঞেস করে গোগোল।

জবাব দেন সুধাসিন্ধু, অবশ্যই করে। বিশ্রাম না করে কেউ একটানা যুদ্ধ করতে পারে নাকি? সাদ্দাম হোসেনই বলিস, কিংবা জর্জ-বুশই বলিস, খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম না করে কেউই যুদ্ধ করে না।

–আর গরবাচভ? জিজ্ঞেস করে শম্পা।

মৃদু হেসে জবাব দেন সুধাসিন্ধু সে তো যুদ্ধ না করে এমনিতেই বিশ্রাম করছে।

দাদুর কথায় যুদ্ধের সাময়িক বিরতি। সেই ফাঁকে বাচ্চু সুধাসিন্ধুর কাছে এসে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা দাদু, যুদ্ধে কে জিতবে? আমি না গোলদা?

কঠিন প্রশ্ন। সহসা কোনো জবাব দেন না সুধাসিন্ধু। সেই ফাঁকে গোগোল সদর্পে এগিয়ে এসে বলে ওঠে, আমি জিতবো। আমি সাদ্দাম হোসেন।

–কখখনো না, বলে ওঠে বাচ্চু, তুই ঠিক হেরে যাবি, গোলদা। তোর সব স্কাডগুলোকে যে আমি পেট্রিয়ট দিয়ে ঠেকিয়ে দিয়েছি।

–আরে, রেখে দে তোর পেট্রিয়ট। বলতে বলতে গোগোল বাচ্চুকে একটা ধাক্কা দিতেই সে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলে।

ঝগড়া বাধার আশংকায় সুধাসিন্ধু তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে দু'হাতে দুই নাতিকে নিজের কাছে টেনে এনে বলে ওঠেন, ছি দাদুভাই, এভাবে ঝগড়া করে না। না, আর নয়। অনেকক্ষণ খেলা হয়েছে। সন্ধ্যা হয়ে এলো। এবার নিচে গিয়ে পড়তে বসো।

একটু থেমে কি যেন চিন্তা করেন সুধাসিন্ধু। তারপর আবার বললেন, মন দিয়ে লেখাপড়া করবে। আর, আজ থেকে প্রতিদিন রাত সাড়ে ন'টায় টি. ভি.র ইংরেজি সংবাদ দেখবে।

খানিকক্ষণ সবাই চুপচাপ। দাদুর কথা যেন সহসা বিশ্বাস হয় না। পরক্ষণেই হৈ-হৈ করে ওঠে গোগোল। সঙ্গে সঙ্গে বাচ্চু আর শম্পাও। এতদিনে তাহলে টি. ভি.র ইংরেজি সংবাদ দেখাশোনার নিষেধাজ্ঞা উঠে গেল।

কথায় আছে, বসতে পেলে শুতে চায়। গোগোলের অবস্থাও তেমনি। টি. ভি. দেখার আনন্দে নাচতে নাচতে সে সুধাসিন্ধুকে জড়িয়ে ধরে আবদারের সুরে বললে, কাল তো রবিবার, দাদু। ছোট্কাকে বলো না আমাদের সেই গড়ের মাঠের প্যাটন ট্যাংক্টা একবার দেখিয়ে আনতে।

মুখের হাসি সামান্য ম্লান হয়ে ওঠে সুধাসিন্ধুর। পরক্ষণেই তিনি জবাব দেন, ঠিক আছে, তাই হবে। ধীরেনকে বলে দেব।

দাদু যেন আজ কল্পতরু। নাতি-নাতনীরা যা চাইছে তাতেই তিনি আজ রাজী। হৈ-হৈ করে ছেলেমেয়েরা নিচে চলে যায়। তাদের সৈন্যবাহিনী সেই চিলেকোঠায় পড়ে থাকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে।

রাত সাড়ে ন'টা। টি. ভি.র সামনে বড়রা আজ পিছিয়ে। গোগোল, বাচ্চু ও শম্পাই আজ ভি. আই. পি.। তাদের মাঝখানে স্বয়ং সুধাসিন্ধু। প্রত্যেকের চোখই টি. ভি.র স্ক্রিনের দিকে।

ইংরেজি বুঝতে না পারলেও অখন্ড মনোযোগে যুদ্ধের ছবি দেখছে গোগোল। স্কাড মিসাইলের আক্রমণ ইজরাইলে। বোমারু বিমানের আক্রমণ বাগদাদে। লন্ডভন্ড চারিদিক। বাড়ি ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। মানুষ মরছে। সাইরেন বাজছে! আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যেতে মানুষের ছোটাছুটি। প্রিয়জনের মৃত্যুতে কান্নায় ভেঙে পড়ছে অসহায় মানুষ। একটি বাচ্চা ছেলে হাসপাতালে শুয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করছে। তার সারা গায়ে চাপ চাপ রক্ত। পাশে দাঁড়িয়ে ছেলেটির মা। চোখে তার জলের ধারা।

যুদ্ধের ছবি দেখতে দেখতে মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করতে থাকে গোগোলের, হাত-পা কেমন যেন অসাড় হয়ে ওঠে। ইচ্ছে হয় টি. ভি.র সামনে থেকে উঠে যেতে। কিন্তু শেষপর্যন্ত স্থির হয়ে বসেই থাকে গোগোল।

চলছে যুদ্ধের ছবি একের পর এক। তেলের খনি থেকে তেল গড়িয়ে এসে বিষাক্ত করে তুলেছে সমুদ্রের জল। অসহায় সামুদ্রিক প্রাণী। একটি সামুদ্রিক পাখি কোনোরকমে জল ছেড়ে পাড়ে এসে উঠেছে। তার সারা গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে জলের বদলে ঘন কালো তেল। আর একটা পাখি নিজেকে বাঁচাতে পাড়ে ওঠার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছে, কিন্তু পারছে না। অসহায় দৃষ্টি তার চোখে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের লোভের আগুনে পুড়ে মরছে প্রকৃতির এই নিরীহ সন্তানেরা। ছবি দেখতে দেখতে গোগোল হঠাৎ অনুভব করে তার চোখের কোণে জমে উঠেছে জল যা নাকি ঐ সমুদ্রের জলের মতোই নোনা।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠেই কাউকে কিছু না জানিয়ে গোগোল উঠে যায় বাড়ির চিলেকোঠায়। তারপর ছাদের আলসেয় দাঁড়িয়ে একটা একটা করে তার সৈন্য পুতুল ছুঁড়ে ফেলে দেয় নিচের ডাস্টবিনে।

চিলেকোঠা থেকে গোগোল নিচে নামতেই তার ছোট্কার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। ধীরেন বললেন, খেয়েদেয়ে একটু তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে। গড়ের মাঠে তোদের প্যাটন ট্যাংক দেখাতে নিয়ে যাবো।

ম্লান মুখে শুকনো কণ্ঠে জবাব দেয় গোগোল, না ছোট্কা, আমি যাবো না।

ছবি : বিজন কর্মকার

# শরীর ছেড়ে বেরিয়ে

## দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

কমল আসতেই চেঁচিয়ে উঠলো শ্রীকান্ত আর সুকান্ত : কি কমলকাকু, সেই যে আসছি বলে চলে গেলে আর এলে সাত দিন পরে ?

কমল একটা চেয়ার টেনে বসতে বসতে বললে, ওরে বাবা, বিরাট ঝামেলায় পড়ে গিয়েছিলাম, অনেক কষ্টে সামলেছি, আগে তোদের মাকে বল এক কাপ চা দিতে।

তা না হয় বলছি, কিন্তু তুমি এমন করে উধাও হয়ে গিয়েছিলে কেন ? ঐ একজিবিশনে নিয়ে গিয়ে আমাদের আইসক্রিম খাওয়াতে হবে বলে ? আমরা কোথায় আশা নিয়ে বসে আছি সেই শনিবার থেকে। সুকান্তর গলায় বেশ অভিমান।

আর আইসক্রিম ! আমার নিজের প্রাণ হিম হয়ে যাওয়ার উপক্রম। চা খেয়ে শরীরটাকে আগে চাংগা করি।

শ্রীকান্ত আর সুকান্তর মা চায়ের ফরমাশ আগেই শুনতে পেয়েছিলেন। এই দেওরটির চায়ের নেশার কথা তিনি ভালোভাবেই জানেন। তাঁর নিজের দেওর অবশ্য নয়, দূরসম্পর্কের। কিন্তু সে হয়ে গেছে নিজের দেওরের চেয়েও বেশি। প্রায়ই আসে। আর শ্রীকান্ত আর সুকান্তর যত আব্দার ওরই কাছে। বিয়ে-থা করেনি। কলেজে পড়ায়। হৈচৈ করে কাটিয়ে দেয়।

মা চা নিয়ে এসে বললেন, তোমার আবার কী হলো, কমল ? কে তোমার প্রাণ হিম করে দিলে ?

চায়ে চুমুক দিয়ে কমল বললে, আর বলবেন না, বৌদি। বিরাট ঝামেলা। রীতিমতো খুন !

খুন ? শ্রীকান্ত আর সুকান্ত একসঙ্গে বলে উঠলো।

খুন, মানে প্রায় খুন আর কি। খুন করার চেষ্টা। দুধের মধ্যে বিষ। সেই বিষ শরীরে গিয়ে মৃত্যুও হতে পারত। হয়নি খুব ভাগ্য ভালো। কিন্তু তাতে তো থানা-পুলিশের হাত থেকে রেহাই নেই।

বৌদি বললেন, খুন করার চেষ্টা ? কে কাকে খুন করার চেষ্টা করলে ?

আরে আমাদের পাশের বাড়ির সত্যপ্রকাশবাবু। বোধহয় বলেছি ওঁর কথা তোমাদের।

সেই ব্যবসাদার ?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, সেই ফার্নিচারের ব্যবসাদার। অনেক পয়সা।

তা তাঁকে খুন করার চেষ্টা করলে কে ? আর তুমি তার মধ্যে জড়িয়ে পড়লে কী করে ? বৌদি জানতে চাইলেন।

ইতিমধ্যে বাড়িতে ঢুকলেন শ্রীকান্ত-সুকান্তর বাবা অনির্বাণ। কমলকে দেখে বললেন, কিরে, ক'দিন তোকে নাকি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না ? তোর ভাইপোরা বলছিল পুলিশে খবর দেবে !

আবার পুলিশ ! তা হলে আমি পালাই ! বলেই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লো কমল।

খুনের চেষ্টার গল্পটা না বলেই চলে যাবে

চেপে ধরে বসিয়ে দিল দুই ভাইপো। বললে, সে কি, খুনের চেষ্টার গল্পটা না-বলেই চলে যাবে নাকি?

বৌদি হাসতে হাসতে বললেন, পুলিশের নাম শুনে এত ভয় পাচ্ছ কেন, কমল? তুমিই খুনের চেষ্টা করেছিলে নাকি ঐ সত্যপ্রকাশবাবুকে?

কমলের মুখ গম্ভীর হয়ে গেল এবার। বললে, হাসির ব্যাপার নয় বৌদি। খুব সিরিয়াস কেস।

তা তুমি না-বললে কী করে বুঝব, কত সিরিয়াস?

তা হলে শোনো।

কমল বলতে লাগলো:

দিন কয়েক আগে পাড়ায় হৈচৈ। সত্যপ্রকাশবাবুকে খুনের চেষ্টা হয়েছিল। তাঁর দুধের সঙ্গে বিষ মিশিয়ে সেই দুধ তাঁকে খাওয়ানো হয়েছিল। যেমন-তেমন বিষ নয়, মারাত্মক ধরনের বিষ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেছেন তিনি। প্রথমে বাড়িতে ডাক্তার এসে দেখেন, যন্ত্রণায় প্রায় জ্ঞান হারিয়েছেন সত্যপ্রকাশ। একটা ইনজেকশনও দেন। কিন্তু তাতে কিছু হয় না। তখন নিয়ে যাওয়া হয় কাছাকাছি নার্সিংহোমে। সেখানে দেওয়া হয় ওষুধপত্র। বিষ বার করা হয় পেট থেকে।

প্রাণে বেঁচে যান সত্যপ্রকাশ। কিন্তু তাতে সব ঝামেলা শেষ হয় না। প্রথমে সত্যপ্রকাশের বাড়ির লোক চেয়েছিলেন ব্যাপারটা চেপে দিতে। কিন্তু নার্সিংহোমের ডাক্তার নীলরতন দত্ত বললেন, না, না, তা কি করে হয়। পয়জনিং-এর কেস, এটা পুলিশকে জানাতেই হবে। তা ছাড়া, এমন কাজ কে করলো, সেটাও তো অনুসন্ধান করে দেখা দরকার। আর সেই অনুসন্ধান করতে গিয়েই ঝামেলা।

বৌদি বললেন, তা তুমি এই ঝামেলায় জড়ালে কী করে?

কমল বললে, আরে আসলে সেইটাই তো গল্প। কিন্তু সেটা শুনতে হলে আরও এক কাপ চা খাওয়াতে হবে।

দ্বিতীয় কাপ চা আসতেও অবশ্য দেরি হলো না। কারণ এখন সকলেই সত্যপ্রকাশের কাহিনী শুনতে রীতিমতো আগ্রহী।

একটু সামলে ওঠার পর নার্সিংহোমে ডাক্তারবাবুই প্রথমে জানান ব্যাপারটা সত্যপ্রকাশকে। তাঁর শরীরের মধ্যে যে বিষ চলে গিয়েছিল, মারাত্মক ধরনের বিষ, এই কথাটা শোনার পর কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়েছিলেন সত্যপ্রকাশ। সেটাই স্বাভাবিক। বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ তাঁকে বিষ খাইয়ে মারার চেষ্টা হবে কেন, সেটাই তিনি বুঝতে পারেননি।

তারপর এসেছে পুলিশ। প্রথমে নার্সিংহোমে, তারপর বাড়িতে। ঐ দুধে বিষের কথাই বলেছে। বলেছে প্রাণে বেঁচে যাওয়ার কথাও। তারপর জিজ্ঞেস করেছে, এই ব্যাপারে সত্যপ্রকাশের কি সন্দেহ হয় কাউকে?

আর এই প্রশ্নটা শুনেই নাকি খুব চমকে উঠেছেন সত্যপ্রকাশ। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকেছেন, তারপর বলেছেন, না, না, আমার আর কাকে সন্দেহ হবে, কাউকে সন্দেহ হয় না, কাউকে সন্দেহ হয় না.....

কেমন যেন উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন সত্যপ্রকাশ। কী যেন একটা মনে করার চেষ্টা করেছেন, তারপর চুপ করে গেছেন।

পুলিশের কাছেই কমল পরে শুনেছে এসব কথা। ইন্সপেক্টর ঘোষ বলেছিলেন, একটা আঘাত পাবার পর এই ধরনের উত্তেজনা বা নার্ভাসনেস আসা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। তিনি তাই ঠিক করেছিলেন পরে আবার কথা বলবেন সত্যপ্রকাশের সঙ্গে।

ইতিমধ্যে ইন্সপেক্টর ঘোষ কথা বলেছেন বাড়ির লোকের সঙ্গে। স্ত্রী মঞ্জুলিকা এই ঘটনায় এতটাই আঘাত পেয়েছিলেন

যে তিনি তো প্রথমে কিছু বলতেই পারেননি। পরে যা বলেছেন তার অর্থ, তিনি কাউকে সন্দেহ করবেন কি, তিনি তো ধারণাই করতে পারছেন না তাঁর সংসারে এমন ঘটনা ঘটতে পারে।

যাই হোক, জিজ্ঞাসাবাদ করে ইন্সপেক্টর ঘোষ যা জানতে পারলেন তা হলো এই ঃ

রোজ রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে এক গ্লাস দুধ খাওয়ার অভ্যেস সত্যপ্রকাশের অনেক দিনের। সেই দুধ রেখে যায় তাঁর ভৃত্য ভজনলাল। দুধ গরম করে গ্লাসে ভর্তি করে দেয় রান্নার কাজ করে যে বামুনদিদি সে। আর বাড়িতে আছে সত্যপ্রকাশের দুই ছেলে–নিত্যপ্রকাশ আর জ্যোতিপ্রকাশ। নিত্যপ্রকাশ বিবাহিত। তার একটি মেয়ে। একজন দারোয়ান বাড়ি পাহারা দেয়। রাতে বাড়ির ভিতরে সে অবশ্য আসে না। তবু বাড়ির লোক বলতে তাকেও ধরতে হয়। এদেরই মধ্যে কেউ অপরাধী। তবে নিত্যপ্রকাশের চার বছরের মেয়েটিকে নিশ্চয়ই সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যায়।

খুনের চেষ্টার কেস, সত্যপ্রকাশের কথা জানাটা খুবই দরকারি। কিন্তু ওঁর কাছে সন্দেহের কথা বললেই তিনি যেন কেমন করে উঠলেন, বলছেন, সন্দেহ.....সন্দেহ.....না, না, আমার কাউকে সন্দেহ হয় না.....

এদিকে ইন্সপেক্টর ঘোষ পড়েছেন আর এক সমস্যায়। অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে একটা জায়গায় তিনি আটকে গেছেন। আর সেই কথাটা যখন তিনি সত্যপ্রকাশকে বলতে গেলেন তখন হলো উল্টো বিপত্তি। আরও যেন উত্তেজিত হয়ে উঠলেন সত্যপ্রকাশ।

গ্লাস.....গ্লাস.....

হ্যাঁ, যে-গ্লাসটায় আপনি দুধ খেতেন।

হ্যাঁ, ওটা অনেক দিনের পুরনো কাঁসার গ্লাস। আমার নাম লেখা ছিল। সেটার কী হয়েছে?

ইন্সপেক্টর ঘোষ বললেন, সেই গ্লাসটা পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ তদন্তের জন্য ওটা খুবই দরকার। কেউ তো কিছু বলতে পারছে না। আপনার পক্ষেও তো আর জানা সম্ভব নয়।

এই কথা শুনে কেমন যেন চমকে উঠেছিলেন সত্যপ্রকাশ। বলেছিলেন, না, না, আমি কী করে জানব, আমি কি করে জানব.....

সুকান্ত এই সময়ে বলে উঠল, তা তো ঠিক কমলকাকু, উনি আর কী করে জানবেন, উনি তো তখন যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন, তারপর ওঁকে নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হলো।

কমল বললে, হ্যাঁ, তা ঠিক, কিন্তু.....

এর মধ্যে আর কিন্তু কী আছে কমল? আর তাছাড়া তুমি কী করে জড়িয়ে পড়লে সেটাও তো বলছ না? প্রশ্নটা বৌদির।

কমল একটু থেমে বললে, ঐ কিন্তুর মধ্যেই তো আমি।

কিন্তুর মধ্যে তুমি! এবার সকলেই অবাক।

আর বলেন কেন, বৌদি। কমল বলতে লাগল ঃ সত্যপ্রকাশ একদিন আমায় ডেকে পাঠালেন। ওঁর ছোট ছেলে জ্যোতি আমার বন্ধু। একসঙ্গে পড়তাম। পরে ও বাবার ব্যবসায়ে চলে গেল। তবে আমাদের বন্ধুত্ব আগের মতোই আছে। প্রায়ই ওদের বাড়িতে যাই। সত্যপ্রকাশ মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে গল্পটল্পও করেন। ইদানীং ব্যবসার ভারটা দুই ছেলের ওপরেই আস্তে আস্তে ছেড়ে দিচ্ছেন। হাতে সময় থাকে।

তা তোমায় ডেকে উনি কী বললেন?

আমায় ডেকে সত্যপ্রকাশ একদিন বললেন, কমল, তোমার সঙ্গে আমার একটা জরুরি কথা আছে। আমি ভাবলাম, কী আবার জরুরি কথা রে বাবা? যাই হোক, গেলাম। একটু থেমে উনি বললেন, তুমি তো কলেজে পড়াও, সাইকোলজি না কি যেন। তুমি তো জানো অনেক কিছু। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব। এরকম কি সত্যিই হতে পারে?

কী ব্যাপার বলুন তো, মেসোমশায়? কমল জানতে চেয়েছে।

সত্যপ্রকাশ তখন একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। বলার পর আবার জিজ্ঞেস করেছেন, সত্যিই কি হতে পারে এরকম?

কমল একটু চুপ করে থেকেছে। ভেবেছে। হ্যাঁ, এমন ব্যাপার সে মনস্তত্ত্বের পত্রপত্রিকায় পড়েছে। কোনো কোনো বিখ্যাত লেখকও লিখে গেছেন এই ধরনের অভিজ্ঞতার কথা। কিন্তু এর আগে এমন কোনো মানুষ সে দেখেনি যাঁর এই রকম বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছে। তাই সত্যপ্রকাশের কথা শুনে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে সে।

সত্যপ্রকাশ জিজ্ঞেস করেছেন, কমল, এটা কি স্বপ্ন, স্বপ্নের মতো কিছু?

না, মেসোমশায়, এটা ঠিক স্বপ্ন নয়, এর অন্য একটা নাম আছে। কিন্তু আপনি তো সব ব্যাপারটা আমায় বলছেন না। একটু বাদ রাখছেন।

কী বাদ রাখছি, কমল?

ঐ যে একটা নাম বাদ রাখছেন। গ্লাসটা যে নিয়ে গেল তার নাম আপনি বলছেন না। কমল অনুযোগ করলে।

না, না, সে আমি তোমাকেও বলতে পারব না। তা হলে তো ও খুব মুশকিলে পড়বে। তা ছাড়া আমি জানি না কেউ আমার কথা আদৌ বিশ্বাস করবে কিনা। সত্যপ্রকাশ যেন ভরসা পাচ্ছেন না ঠিক।

এদিকে কৌতূহল আর চেপে রাখতে পারছে না শ্রীকান্ত-সুকান্ত, এমন কি তাদের মা-বাবাও। অনির্বাণই বলে উঠলেন, হ্যাঁরে কমল, সত্যপ্রকাশ ঐ অবস্থায় গ্লাসের ব্যাপারটা জানলেন কী করে, ওঁর তো জানার মতো অবস্থা ছিল না তখন?

কমল একটু হেসে বললে, হ্যাঁ, সেটাই তো এখন বলব, সেটাই তো আসল মজা।

সত্যপ্রকাশ কমলকে যে অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন তা এই ঃ

ঘুমের মধ্যে আমি যেন কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলাম। একটু পরে ঘুমটা ভেঙে গেল। শুরু হলো পেটের কাছে যন্ত্রণা। ক্রমশ বাড়ছে সেই যন্ত্রণা। ছটফট করতে শুরু করলাম। আমার স্ত্রী রাতে শোয় পাশের ঘরে নাতনীকে নিয়ে। তাকে যে ডাকব তেমন অবস্থাও আমার নেই। ডাকতে চেষ্টা করছি, কিন্তু গলা দিয়ে যেন স্বর বেরোচ্ছে না। আমার বিছানার কাছে একটা কলিং বেলের সুইচ আছে, কাজের লোককে ডাকার জন্যে। সেটাই বাজাতে চেষ্টা করলাম,

পারলাম না। আর তারপরই ঘটলো সেই ব্যাপারটা.....

আমি যেন বেরিয়ে এলাম আমার শরীরটা ছেড়ে। হ্যাঁ, আমার শরীরটা ছেড়ে। যেন দুটো আমি। একটা আমি আমার শরীরটা যেটা বিছানায় শুয়ে আছে। আর একটা আমি খানিকটা ওপর থেকে, যেন শূন্যে ভেসে থেকে আমার ঐ শরীরটাকে দেখতে পাচ্ছি। শুধু আমার শরীর কেন, খাট-বিছানা, ঘরের অন্য সব আসবাবপত্র, এমন কি ঘরের বাইরেও অনেক কিছু, আমার বাড়ির আশপাশ, সবই দেখতে পাচ্ছি আমি....

একটু পরে দেখি সে এসে ঘরে ঢুকলো। এদিক-ওদিক তাকালো। তারপর পা টিপে টিপে এসে গ্লাসটা হাতে তুলে দেখলো, কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করে বেরিয়ে গেল গ্লাসটা হাতে নিয়ে। ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেল সিঁড়ি দিয়ে নেমে একতলায়। তারপর দরজা খুলে বাড়ির পিছনে বাগানে.....

ইতিমধ্যে আমার স্ত্রী বোধহয় পাশের ঘর থেকে আমার শরীরের যন্ত্রণা আর ছটফটানির কিছুটা আন্দাজ করতে পেরেছিল। আমার স্ত্রী এসে ঘরে ঢুকলো। আমার অবস্থা দেখে থমকে দাঁড়িয়ে রইলো কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই সামলে নিয়ে ছুটে গেল ছেলেদের কাছে। ডাক্তারকে ফোন করলো ছোট ছেলে। সকলে আমাকে ঘিরে আমার বিছানার চারপাশে। নিজেরা কী সব বলাবলি করছে। আমার সঙ্গে, অর্থাৎ আমার যে-শরীরটা পড়ে আছে বিছানায় তার সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করছে। আমি কিন্তু কিছু শুনতে পাচ্ছি না ঠিক। আমার স্ত্রী শুরু করেছে কান্নাকাটি .....

ডাক্তারবাবু এসে গেলেন। আমার শরীরটা পরীক্ষা করলেন। একটা ইনজেকশন দিলেন। ইনজেকশন দেওয়ার পরেই যে আমি আমার শরীরটা ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলাম সেই আমি যেন ফিরে এলাম আবার ঐ শরীরের মধ্যে.....!

কমলের মুখে সত্যপ্রকাশের কাহিনী শুনে সকলেই একটু চুপ করে রইল কিছুক্ষণ। তারপর অনির্বাণই প্রথম কথা বললেন: কমল, তুই যাই বল, এটা কিন্তু স্বপ্নের মতোই কিছু একটা।

না দাদা, এটা স্বপ্ন নয়। কমল বললে, প্রথমে ধরুন, ঐ যন্ত্রণার মধ্যে স্বপ্ন দেখাটা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, সত্যপ্রকাশবাবু যে বিবরণ দিয়েছেন তা যে ঠিক তা আমি পরে মাসিমা আর ওঁদের ছেলেদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি। শুধু ঐ গ্লাস নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা সম্পর্কে ওঁরা কিছু বলতে পারেননি, কারণ ওঁরা তখনও সত্যপ্রকাশের ঘরে ঢোকেননি।

স্বপ্ন যদি না হয় তবে এটাকে কী বলবি? অনির্বাণের এই প্রশ্নের উত্তর জানতে আগ্রহী সকলেই।

কমল বললে, দেখুন দাদা, যখন শরীরে একটা জোর আঘাত লাগে, কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, অথবা শরীরে যখন অস্ত্রোপচার হয়–এইসব সময়ে এই ধরনের অভিজ্ঞতা অনেকের হয়েছে বলে শোনা যায়। দাদা, আপনি তো আর্নেস্ট হেমিংওয়ের লেখার খুব ভক্ত ছিলেন একসময়?

ছিলাম কেন, এখনও আছি। হেসে বললেন অনির্বাণ। তারপর ছেলেদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন: তোরা হেমিংওয়ের নাম শুনেছিস?

শ্রীকান্ত বলে উঠলো, কেন শুনব না? সেই বুড়ো আর তিমি মাছের গল্প যিনি লিখেছেন তিনি তো?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, কমল বললে, দা ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দা সী। সেই হেমিংওয়েই প্রথম মহাযুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। সেই সময়ে একটা গুলি এসে লাগে তাঁর গায়ে। তখন ওঁর এই রকমই অভিজ্ঞতা হয়েছিল বলে লিখে গেছেন। বলেছেন, তাঁর যেন মনে হয়েছিল, পকেট থেকে যেমন রুমাল বেরিয়ে আসে তেমনই তাঁর আত্মা বা ঐ রকম একটা কিছু যেন তাঁর শরীর থেকে বেরিয়ে এল, ওপরে ভেসে বেড়িয়ে চারপাশটা দেখলো, তারপর আবার ঢুকে গেল শরীরের মধ্যে.....

কমল বলতে লাগলো: আর একটা ঘটনার কথা পড়েছিলাম। ডেভিড টেলর বলে এক ভদ্রলোক পূর্ব আফ্রিকায় গিয়ে এক দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন। ডেভিড আর তাঁর বন্ধু যাচ্ছিলেন একটা গাড়িতে করে। উল্টো দিক থেকে আসছিল একটা লরি। লরিটা এসে প্রবল জোরে ধাক্কা মারলো গাড়িটাকে। ছিটকে পড়ে গেলেন ডেভিড। পড়ে যাওয়ার পরই তার মনে হলো, তাঁর শরীরটা পড়ে রয়েছে রাস্তার ধারে, অথচ তিনি যেন ওপর থেকে ভাসতে ভাসতে দেখতে পাচ্ছেন সবকিছু....লরিটা কায়দা করে গাড়িটাকে কাটিয়ে নিয়ে খুব স্পীডে উধাও হয়ে গেল..... ডেভিডের বন্ধু ছুটে এলো তাঁর কাছে, তাঁকে পরীক্ষা করে দেখলো,তারপর হাসপাতালে নিয়ে গেল। বন্ধুটিও পরে একই রকম বিবরণ দিয়েছেন।

অনির্বাণ বললেন, এ তাহলে মায়া অথবা মতিভ্রম জাতীয় কিছু।

বৌদি যোগ করলেন: কমল, আমাদের একটা কথা আছে না, ভয়ে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়ে যাওয়া? একি অনেকটা সেই ধরনের?

কমল হেসে বললে, তা বলতে পারেন, তবে ইংরেজিতে এটাকে বলে আউট অব দা বডি এক্সপিরিয়েন্স। ও-ও-বি-ই। আমিও আগে কারো মুখ থেকে তাঁর নিজের এই রকম অভিজ্ঞতার কথা শুনিনি। কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

সেটা কী?

আমি ঠিক করলাম, সত্যপ্রকাশের কথাটা পরখ করে দেখব। ভাবলাম, নিজেই ওঁর বাড়ির বাগানে গিয়ে সেই গ্লাসটাকে খোঁজার চেষ্টা করব। তারপরে মনে হলো, নিজে ঝুঁকি নেওয়ার দরকার নেই, পুলিশকে বলাই ভালো। কিন্তু সত্যপ্রকাশ আবার আমায় বারণ করে দিয়েছিলেন ওঁর সেই অভিজ্ঞতার কথা আমি যেন কাউকে এখন না বলি। তাই ইন্সপেক্টর ঘোষকে আমি শুধু বললাম, আমার খুব সন্দেহ হচ্ছে গ্লাসটা বাগানে কোথাও থাকতে পারে। উনি জানতে চাইলেন, কেন এই সন্দেহ হচ্ছে আমার। আমি বিশদ কিছু না বলে শুধু বললাম, খুঁজেই দেখা যাক না।

সত্যপ্রকাশের বাড়ির লাগোয়া বাগানটা খুব একটা ছোট নয়। শহরতলি এলাকায় পুরনো বাড়ি, বেশ কিছুটা জায়গা আছে। সেই বাগানে খুঁজতে খুঁজতে একটা হাসনুহানা গাছের তলায় মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেল সত্যপ্রকাশের নাম লেখা সেই কাঁসার গ্লাস।

সত্যি? প্রশ্নটা করলেন বৌদি, কিন্তু এটা সবারই প্রশ্ন।

পাওয়া গেল সেই কাঁসার গ্লাস।

ছবিঃ বিজন কর্মকার

তা হলে তো অপরাধী এবার ধরা পড়বে? জানতে চাইল সুকান্ত।

পড়বে মানে? পুলিশ তো আটক করেছে একজনকে।

আটক করেছে? কাকে?

নিত্যপ্রকাশকে।

নিত্যপ্রকাশকে! সকলেই অবাক। বৌদি বললেন, ছেলে হয়ে বাপকে.... কী ব্যাপার বলো তো কমল?

উত্তর দিলেন অনির্বাণঃ ব্যাপার আর কী, সম্পত্তির লোভ হতে পারে। বড়লোকদের ব্যাপার, আমরা ছা-পোষা লোক আর বুঝব কী করে!

কমল বললে, তা হতে পারে। পুলিশের জেরায় সবই বেরিয়ে পড়বে। জোর তদন্ত চলছে।

আচ্ছা কমল, বৌদির আবার প্রশ্ন, সত্যপ্রকাশই বুঝি বলে দিলেন নিত্যপ্রকাশের নাম, মানে সেই রাতে বড় ছেলেই গ্লাসটা নিয়ে গিয়ে বাগানে রেখে দিয়েছিল?

কমল একটু চুপ করে থেকে বললে, না বৌদি, উনি ও ব্যাপারে আর কোনো কথাই বলতে চাইছেন না, শুধু চেয়ে থাকছেন উদাস দৃষ্টিতে।

তাহলে নিত্যপ্রকাশকে পুলিশ আটক করলো কী করে? এবার কৌতূহলী হয়ে ওঠে শ্রীকান্ত।

আঙুলের ছাপ দেখে। গ্লাসে তো নিত্যপ্রকাশের আঙুলের ছাপ থাকার কথা নয়। থাকতে পারে সত্যপ্রকাশের নিজের, ভজনলালের আর সেই বামুনদিদির। সবই এবার জানা যাবে। তবে আমার ঝামেলা আর মিটছে না।

কেন? জানতে চাইলেন অনির্বাণ।

আর বলবেন না, দাদা। সত্যপ্রকাশ বলছেন, তিনি সব সম্পত্তি দান করে দেবেন রামকৃষ্ণ মিশনকে, তার ব্যবস্থা করতে।

দান করে দেবেন? কেন রে?

কী জানি কেন! জিজ্ঞেস করলে কী সব শ্লোক আওড়াচ্ছেন..... কা তব কান্তা কস্তে পুত্র.....। বলছেন, কমল, আমার সব মোহ কেটে গেছে, আমি মৃত্যুর স্বাদও পেয়ে গেছি। আমি জানতে চাইলাম, মৃত্যুর স্বাদ আবার কী করে পেলেন? সত্যপ্রকাশ বলছেন, আরে বাবা, মৃত্যু কেমন তা তো আমি দেখতে পেলাম। মৃত্যু হলে আমার শরীরটা বিছানার ওপর তো এই রকমই পড়ে থাকবে, সেই শরীর ঘিরে কান্নাকাটি করবে আত্মীয়স্বজন, এক-আধজন হয়তো মনে মনে খুশিও হবে—যাক, বুড়োটা গেছে, এদিকে আমার আত্মা শরীর ছেড়ে বেরিয়ে এসে হাওয়ায় কিছুক্ষণ ঘুরবে, তারপর মিলিয়ে যাবে.....। সত্যি, আমার আর মৃত্যুভয় নেই কমল, আমার আর মৃত্যুভয় নেই।

একটু থেমে কমল বললে, সত্যপ্রকাশ এইসব কথা বলছেন, আর মাঝে মাঝে বলে উঠছেন, ও-ও-বি-ই, ও-ও-বি-ই....। কালকেই জ্যোতি জিজ্ঞেস করছিল, হ্যাঁরে বাবা মাঝে মাঝে কী যেন বলছেন ও-ও-বি-ই, তুই জানিস কিছু? আমি তাকে কিছু বলতেও পারছি না। সত্যপ্রকাশের বারণ। মহাফ্যাসাদে পড়ে গেছি।..... ওরে বাবা, অনেক রাত হলো, এবার উঠি। বাস ধরতে হবে।

এই বলে কমল চেয়ার ছেড়ে তাড়াহুড়ো করে উঠতে গিয়ে ধুতির কোঁচা জড়িয়ে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিল প্রায়। অনির্বাণ তাকে ধরে ফেলে বললেন, দেখিস ভাই, পড়ে গিয়ে যেন আবার জোর আঘাত না লাগে, তাহলে তোর আত্মারামও হয়তো খাঁচাছাড়া হয়ে যেতে পারে!

ধুতি সামলে হাসতে হাসতে যাত্রা করলো কমল।

# একটি আবিষ্কারের কাহিনী

ডাঃ বিশ্বনাথ রায়

না, না–এ সে জীবাণু নয়।

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী রাশিয়ান অ্যাকাডেমী অফ সায়ান্স ল্যাবোরেটারীতে দাঁড়িয়ে ডিমিট্রি আইওয়ানোস্কি কথাগুলি উচ্চারণ করলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে লুই পাস্তুর, রবার্ট কক প্রমুখ মনীষীরা যে সব জীবাণু আবিষ্কার করেছেন এ জীবাণু সে ধরনের নয়। তাঁরা বিভিন্ন ব্যাকটিরিয়া, প্রোটোজোয়া, ফাংগাস প্রভৃতি আবিষ্কার করেছেন (এঁদের কাহিনী বিভিন্ন বার্ষিকী এবং শারদীয়া শুকতারায় লেখা হয়েছে)। কিন্তু–কিন্তু–

ডিমিট্রি আবার মাইক্রোস্কোপে চোখ লাগালেন। কোনো জীবাণুই দেখা যাচ্ছে না, অথচ তামাক পাতায় যে রোগ হয়েছে সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই। তামাক পাতার গায়ে কালো কালো বিচিত্র ধরনের দাগ হয়েছে। এমনভাবে দাগ হয়েছে যে দেখলে মনে হয় তামাক পাতায় কেউ মোজেকের মতো রঙ

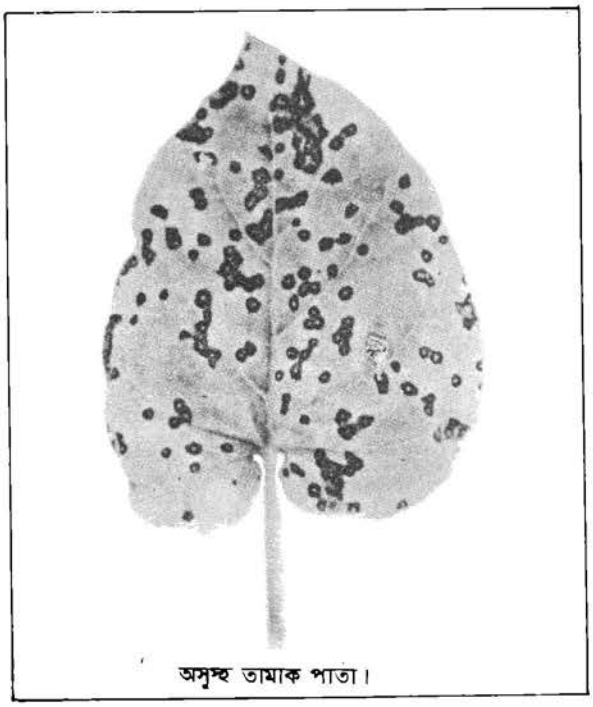

অসুস্থ তামাক পাতা।

করেছে, তাই এই রোগের নাম সকলে দিয়েছেন মোজেক ডিজিজ অফ টোব্যাকো প্ল্যান্ট।

ডিমিট্রির সংগে ছিলেন টোব্যাকো কোম্পানির মালিক। তিনি বললেন, এ কোনো রোগ নয়। তামাক পাতার রঙই এমনি।

ডিমিট্রি উত্তর দিলেন, এ পাতার রঙ নয়, তামাক পাতায় পোকা লেগে পাতাগুলো সব নষ্ট করে দিচ্ছে। দেখছেন না, এই তামাক পাতা দিয়ে আপনি সিগারেট বা চুরুট কিছুই তৈরি করতে পারছেন না। তৈরি করলেও যিনি খাচ্ছেন, তাঁর নানারকম অসুখ করে যাচ্ছে।

–বেশ, তাহলে তামাক পাতায় কি রোগ হয়েছে বলুন, আমি তার প্রতিকার করছি। আমিও চাই না খারাপ জিনিস বাজারে বিক্রি করি। পরিশুদ্ধ করার জন্যই আপনার কাছে এসেছি।

ডিমিট্রি দিনের পর দিন পরীক্ষা করে যান। চেম্বারল্যান্ড ফিলটার ক্যান্ডেল-এর ভেতর দিয়ে মোজেক রোগের তামাক পাতা পার করে নিয়ে এলেও, তার মধ্যে রোগের জীবাণু থেকে যায়, কিন্তু এই ছাঁকনিতে ব্যাকটিরিয়া, প্রোটোজোয়া জাতীয় জীবাণু, কীটাণু আটকে যায়। ডিমিট্রি সিদ্ধান্তে এলেন, মোজেক ডিজিজ-এর জীবাণু আরও ছোট, তাই ছাঁকনি দিয়ে পার হয়ে যায়। এই জীবাণুগুলি এত ছোট যে সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্রে এগুলো নজরে পড়ে না।

ডাচ বৈজ্ঞানিক এম. ডবলু বিজেরিংক অথবা বিগেরিংক একই বিষয় নিয়ে গবেষণা করছিলেন। তিনি ডিমিট্রির গবেষণার কথা কিছুই জানতেন না। তিনিও ডিমিট্রির মতো মোজেক ডিজিজ-এর তামাক পাতার জল চেম্বারল্যান্ড ফিল্টারের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করিয়ে সেই জল ভাল তামাক পাতায় ছড়িয়ে দিয়ে লক্ষ্য করলেন একই রকমের রোগ হচ্ছে। বিজেরিংক ঘোষণা করলেন দূষিত জলে এক প্রকারের অদৃশ্য

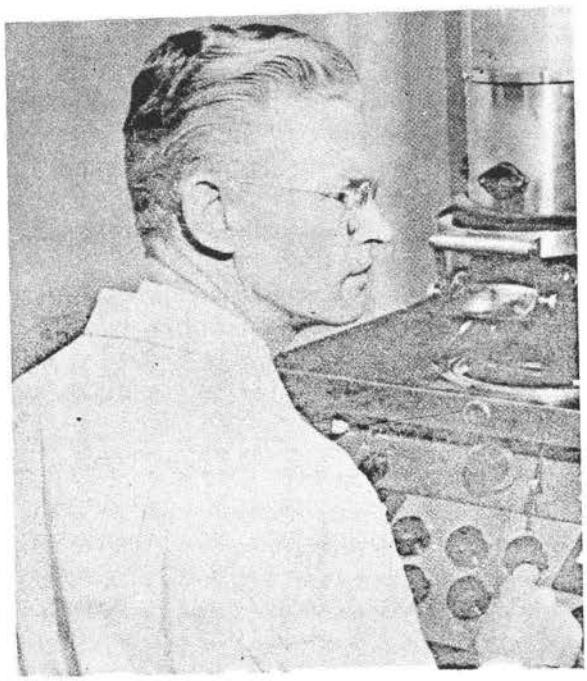

ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সামনে একজন বিজ্ঞানী।

দূষিত প্রাণ আছে। সেই দূষিত প্রাণের সংক্রমণে তামাক পাতার মোজেক ডিজিজ হচ্ছে।

বিজেরিঙ্কের ভাবধারায় গবেষণা আরম্ভ হলো। বিংশ শতাব্দীর সূচনায় এফ. এ. জে. লিফলার এবং পি ফ্রুস্ক লক্ষ্য করলেন গবাদি পশুর গায়ে পায়ে এক রকমের রোগ হচ্ছে, যার জীবাণুও ছাঁকনি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। এঁরা বললেন, জীবাণু নিশ্চয়ই আছে, সেই জীবাণুসমষ্টি এত ক্ষুদ্র যে ফিলটারের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসে। র‍্যাবিটদের এই সময় একটি রোগ হচ্ছিল এবং সেই রোগে বহু র‍্যাবিট মারা যাচ্ছিল। গুইস্‌পে সানারালি নামক একজন বৈজ্ঞানিক জানালেন, এই একই কারণে র‍্যাবিটদের রোগ হচ্ছে। গুইস্‌পে সানারালি এই রোগের নাম দিয়েছিলেন ইনফেকসাস মিকসোম্যাটোসিস ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াল্টার রীড এবং তাঁর সহকর্মীরা অনুসন্ধান করে দেখলেন পীত জ্বরও হয় এই অদৃশ্য জীবাণুর আক্রমণে। পরবর্তী অনুসন্ধানে দেখা গেল আরও অনেক রোগই এই অদৃশ্য জীবাণুর আক্রমণে হয়ে থাকে।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে গবেষকরা আরও জোরালো মাইক্রোস্কোপ ব্যবহার করতে লাগলেন। এর নাম দেওয়া হলো ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ।

এর আগে আর এক রকমের মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কৃত হয়েছে যার নাম লাইট মাইক্রোস্কোপ। এই অনুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে আলোর রশ্মি প্রবেশ করিয়ে দেখা হতো, যার ফলে একটি জীবাণুকে সাধারণ মাইক্রোস্কোপে যে আকারে দেখা যেত, তার চেয়ে দু হাজার গুণ বড়-দেখাত। এর ফলে যে সব জীবাণু সাধারণ মাইক্রোস্কোপে দেখা যেত না, বড় হয়ে লাইট মাইক্রোস্কোপে দেখা যেত। Micro organism নাম কেন দেওয়া হয়েছে এই জীবাণুগোষ্ঠীকে তা তোমরা জানো, কিন্তু আমি বলার লোভ সামলাতে পারছি না। organism-এর অর্থ হলো জীবাণু। যে সব জীবাণু মাইক্রোস্কোপে দেখা যায়, তাদের নাম দেওয়া হলো মাইক্রোঅরগানিজম। মাইক্রো কথাটি এসেছে মাইক্রোস্কোপ থেকে। লাইট মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে মোজেক ডিজিজ-এর জীবাণুর চেহারা প্রথম দেখা গেল। এই জীবাণুর নাম দেওয়া হলো ভাইরাস।

ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের ভেতর দিয়ে একটি জীবাণুকে দেখা যায় চল্লিশ হাজার গুণ বড়। সেই জীবাণুকে আরও ম্যাগনিফাই করে ছবি তুললে সে ছবি হয় দু লক্ষ গুণ বড়। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখা গেল ভাইরাস এক রকমের নয়। এদের নানা চরিত্র, নানা চেহারা, এরা নানা রকমের রোগ সৃষ্টি করে থাকে। কোনোটির মাথা মোটা, সরু লেজ। লেজ দিয়ে ফুটো করে শরীরের মধ্যে ঢুকে নানা রোগ সৃষ্টি করে। ভাইরাস নামটি এসেছে বিষ কথা থেকে। ভাইরাস-এর বিষ এত মারাত্মক যে মানুষ, প্রাণী, ফলমূল পাতালতাকে ধ্বংস করে দেয়। এর বিষে সবকিছুই মারা যায়। মোজেক ডিজিজ অফ টোবাকো থেকে অনুসন্ধান করে দেখা গেল, যিনি ধূমপান করেন, তিনি যদি ধূমপান করতে করতে বাগান করেন, তাঁর ভিজে হাতে মোজেক ডিজিজ অফ টোবাকোর ভাইরাস লেগে যায় আর সেই ভাইরাস টোম্যাটো বা অন্য কোনো ফলে লেগে সেগুলিও নষ্ট হয়ে যায়। ভাইরাসের টক্সিন আসলে বিষ, সেইজন্য এই অণুজীবাণুর নাম দেওয়া হয়েছে ভাইরাস। আগে সাপের বিষকেও বলা হতো ভাইরাস।

ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে দেখা গেল বহু রকমের ভাইরাস আছে এবং এক এক ধরনের ভাইরাস এক এক ধরনের রোগ তৈরি করে। বসন্ত, জন্ডিস, পোলিওমাইলাইটিস, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রভৃতি নানারকম মারাত্মক ব্যাধি ভাইরাসের আক্রমণে হয়।

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার বিখ্যাত বায়োকেমিস্ট ওয়েন্ডেল এম স্ট্যানলি একেবারে নতুন পদ্ধতিতে টোবাকো মোজেক ভাইরাস পৃথকীকরণ করলেন। তিনি ভাইরাসগুলিকে বায়োকেমিকেল প্রসেসে ট্রিটমেন্ট করে ক্রিস্টাল তৈরি করলেন। দেখা গেল, মোজেক ডিজিজ অফ টোবাকোতে এই ধরনের ক্রিস্টাল তৈরি হচ্ছে, যা ব্যাকটিরিয়া নয়, প্রোটোজোয়াও নয়। স্ট্যানলির আবিষ্কার অনেকে স্বীকার করলেন, অনেকে করলেন না। অনেকে অবিশ্বাসের সুরে বললেন, এই ক্রিস্টালগুলো জীবিত ? অনেকে বললেন, এই ক্রিস্টাল জীবনের গোধূলিবেলায় সৃষ্টি হয়, এরা অর্ধমৃত এবং অর্ধজীবিত। এদের আক্রমণে জীব আর বাঁচে না, মৃত্যুর অন্ধকারে তলিয়ে যায়।

স্ট্যানলি এ মন্তব্যে হতাশ না হয়ে গবেষণা আরও চালিয়ে যেতে লাগলেন। আরও বিভিন্ন রকমের ভাইরাস সংগ্রহ করে বায়োকেমিক্যাল প্রসেসে ক্রিস্টাল তৈরি করলেন। এবার ক্রিস্টালগুলির মধ্যে কি পদার্থ আছে তার বিশ্লেষণ শুরু করলেন। তিনি দেখলেন ভাইরাসের প্রধান জৈব রাসায়নিক পদার্থ হলো নিউক্লিয়োপ্রোটিন। আরও গভীর বিশ্লেষণে দেখলেন, নিউক্লিয়োপ্রোটিনকে ভাগ করলে নিউক্লিক অ্যাসিড

মোজেক ডিজিজ-এর ভাইরাস।

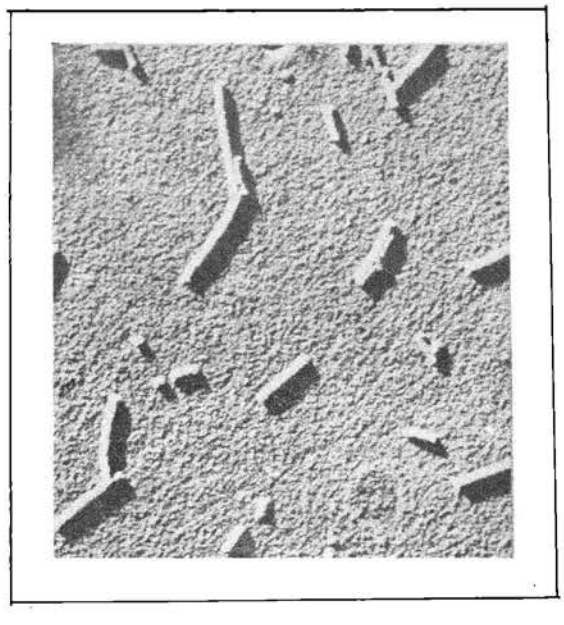

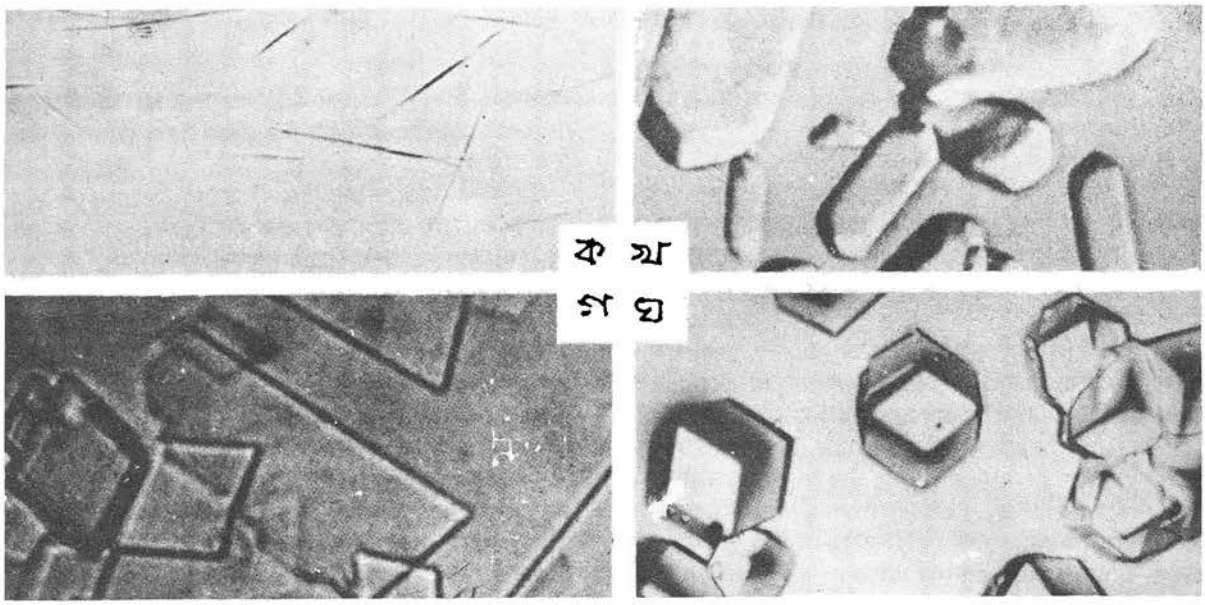


বিভিন্ন ভাইরাসের ক্রিস্টাল–(ক) টোব্যাকো মোজেক ভাইরাস ; (খ) পোলিও ভাইরাস ; (গ) এক ধরনের বিনের গাছের ভাইরাস ; (ঘ) টমেটো গাছের ভাইরাস।

এবং প্রোটিন আছে। নিউক্লিক অ্যাসিড প্রতি কোষ সৃষ্টির জন্য অপরিহার্য এবং প্রোটিনও একান্ত প্রয়োজনীয়। যেহেতু ভাইরাসের মধ্যে জৈব পদার্থ আছে, অতএব এগুলি জীবন্ত জীবাণু। কোনো কোনো ভাইরাসে নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন আছে, কোনো ভাইরাসে নিউক্লিক অ্যাসিড, প্রোটিন ও ফ্যাট আছে, আবার কোনো ভাইরাসে নিউক্লিক অ্যাসিড, প্রোটিন, ফ্যাট এবং সুগার আছে। প্ল্যান্ট ভাইরাসে, তার মানে যেসব ভাইরাসে গাছের অসুখ হয়, সেগুলির মধ্যে শুধু নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিন আছে, প্রাণীর অসুখ হয় যেসব ভাইরাসে, তার মধ্যে নিউক্লিক অ্যাসিড, প্রোটিন ও ফ্যাট আছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস পরীক্ষা করে দেখা গেল, তার মধ্যে নিউক্লিক অ্যাসিড, ফ্যাট, প্রোটিন এবং সুগার আছে। ইনফ্লুয়েঞ্জার ভাইরাস এত প্রবল যে ১৯১৮-১৯ সালে (প্রথম বিশ্বযুদ্ধর ঠিক পরেই) সারা বিশ্বব্যাপী ইনফ্লুয়েঞ্জার মহামারী দেখা গিয়েছিল এবং কত লোক মারা গিয়েছিল তার হিসেব নেই।

জৈব রাসায়নিক পদ্ধতিতে এই সিদ্ধান্তে আসা গেল, ভাইরাসের নিউক্লিক অ্যাসিড শরীরে প্রবেশ করে রোগ সৃষ্টি করে। ক্রিস্টালের তারতম্যে বিভিন্ন ভাইরাস চিহ্নিত হয়, এবং নিউক্লিক অ্যাসিডের স্ট্রাকচারের চরিত্র অনুযায়ী বিভিন্ন রোগ হয়। সবচেয়ে সরল ভাইরাসে থাকে প্রোটিনের মোড়কে নিউক্লিক অ্যাসিড। ল্যাবোরেটারীর গবেষণাতেও দেখা গেছে ভাইরাস বংশবৃদ্ধি করে যাকে ইংরিজীতে বলা হয় মিউটেশন। এ থেকেও প্রমাণিত হচ্ছে ভাইরাস জীবিত জীবাণু, যা বংশবৃদ্ধি করতে সক্ষম। মিউটেশন প্রসেসে রিসার্চ করতে করতে আরও একটি বিচিত্র জিনিস লক্ষ্য করা গেল। বারবার মিউটেশন করার ফলে নিউক্লিক অ্যাসিড ও প্রোটিনের চরিত্রও বদলে যেতে লাগল। নিউক্লিক অ্যাসিড জীন সৃষ্টিতে প্রয়োজন আর জীন থেকে বংশগত ব্যবহার সৃষ্টি হয়, যাকে ডাক্তারী ভাষায় বলা হয় জেনেটিক ফ্যাক্টর। বারবার মিউটেশন করার ফলে নিউক্লিক অ্যাসিডের চরিত্র বদলে যায়, তখন এই নিউক্লিক অ্যাসিড দিয়ে প্রতিরোধ টিকা তৈরি করা যায়।

আমরা আগেই জেনেছি, পোলিওমাইলাইটিস একটি ভাইরাস আক্রান্ত রোগ। এই রোগে ভাইরাস স্নায়ুশিরার মধ্যে প্রবেশ করে নার্ভ-এর কোষগুলিকে গলিয়ে দেয়, ফলে পক্ষাঘাত হয়ে যায়। ছোট বয়সে এই ভাইরাস শরীরে ঢুকলে কয়েকদিন জ্বর হয়, তারপরেই হাত-পায়ের স্নায়ুশিরার ভেতরটা গলে যায়। ফলে অংগপ্রত্যংগের দুর্বলতা বা অসাড়তা সৃষ্টি হয়ে যায়, নিউক্লিক অ্যাসিডকে পরিমিতভাবে দুর্বল করে বা মেরে ফেলে পোলিও রোগের প্রতিষেধক টিকা তৈরি করা হয় যাকে বলা হয় পোলিও ভ্যাকসিন। পোলিও ভ্যাকসিন প্রত্যেক শিশুকেই খাওয়ানো একান্ত দরকার, কারণ এ রোগের ভাল চিকিৎসা নেই।

এক এক রকমের রোগ এক এক রকমের ভাইরাসে হয় এ কথা আমরা আগেই জেনেছি। সেই ভাইরাস দিয়ে সেই রোগের টিকা তৈরি করার রিসার্চ চলছে। বসন্তের টিকা বহু আগেই আবিষ্কৃত হয়েছিল বলেই আজ বসন্ত রোগ প্রায় নির্মূল হয়ে গেছে।

ক্যানসার রোগে জেনেটিক বিকৃতি ঘটে বলে বিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস। ডি. এন. এ., আর. এন. এ. (ডিঅক্সিরিবোনিউক্লিক অ্যাসিড, রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড)-তে নিউক্লিক অ্যাসিড আছে। নিউক্লিক অ্যাসিডের বিকৃতি এবং ভয়ংকর বিভাজন ক্যানসার রোগসৃষ্টির অন্যতম প্রধান কারণ। ক্যানসার রোগীর নিউক্লিক অ্যাসিড নিয়ে ক্যানসার রোগের প্রতিরোধ টিকা তৈরির গবেষণা চলছে। সর্বান্তঃকরণে প্রত্যাশা করব, অদূর ভবিষ্যতে শারদীয়া শুকতারায় সেই আবিষ্কারের কাহিনী তোমাদের শোনাব।

# শুভংকর স্যার এবং জীবনের লক্ষ্য

## দেবল দেববর্মা

বিকেল পর্যন্ত আকাশটা দিব্যি হাসছিল। ফটফটে নীল। ঘরের কোণে কালো ঝুলের মতো কোথাও একটুকরো মেঘ লেগে ছিল না। গাড়িতে ওঠার সময় সুনন্দ ভাবতেও পারেনি আর ঘণ্টা চার-পাঁচ বাদেই হুড়মুড়িয়ে ঝড়বৃষ্টি শুরু হবে।

মার্চের শেষাশেষি। চৈত্রের রোদ্দুর এরই মধ্যে বেশ তেজী, চড়চড়ে হয়ে উঠেছে। অথচ ভোরের দিকে এখনও ঠাণ্ডা ভাব। অঞ্চলটাই এমনি। লাল কঙ্কালচের মাটি। উঁচু-নিচু তরংগায়িত অনুর্বর প্রান্তর। দূরে হাতির পিঠের মতো শুশুনিয়া পাহাড়টা দিগন্তে হেলান দিয়ে রয়েছে।

আজ শেষ রাত্তিরে সুনন্দ বাঁকুড়ায় নেমেছে। ট্রেনটা লেট ছিল। কিন্তু খড়্গপুর ছাড়ার পর বেশ খানিকটা মেক-আপ করে নিয়েছে। গাড়ি যখন বাঁকুড়া স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াল তখন চারটে বাজে। কন্ডাক্টরকে আগে থেকেই জানানো ছিল। বাঁকুড়ায় পৌঁছতেই সে দরজায় টোকা দিয়ে তাকে ঘুম থেকে তুলে দিল।

অবশ্য তেমন সুনিদ্রা হয়নি। ফার্স্ট ক্লাস ক্যুপেতে সে একাই ছিল। কিন্তু তাহলে কি হবে? দিনমানে যা গরম, রাত্তিরেও তার জের। বগীটা এয়ার-কন্ডিশনড্ হলে হয়তো বা ঘুম গাঢ় হতো। কিন্তু সে গুড়ে বালি। সুনন্দ আগেই খোঁজ নিয়ে জেনেছে এ লাইনে কোনো গাড়িতেই এ. সি. কোচ নেই। ফার্স্ট ক্লাস কামরা যে একটা থাকে সেই ঢের। কারণ যাত্রী কই? গোটা কম্পার্টমেন্টে সে এবং আর একজন মাত্র প্যাসেঞ্জার সেই ভদ্রলোকের আবার গার্ড, টিকিট-চেকার, আরো অনেকের সংগেই দহরম-মহরম। হয়তো নিজেও রেলের লোক। পাস নিয়ে যাতায়াত করে।

সুনন্দ এখানে এসেছে একটা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। তার এক ভাগনের বিয়ে। জায়গাটা বাঁকুড়া থেকে প্রায় তিরিশ মাইল দূরে। অন্য কেউ হলে সুনন্দ নির্দ্বিধায় নেতিবাচক উত্তর দিত। তার সময় কোথায়? একজন নামী চিকিৎসকের দায়িত্ব তো কম নয়। কলকাতায় পার্ক স্ট্রীটে চেম্বার। তারপর তিন-চারটে বিলাসবহুল নামী-দামী নার্সিংহোমের সংগে সে যুক্ত।

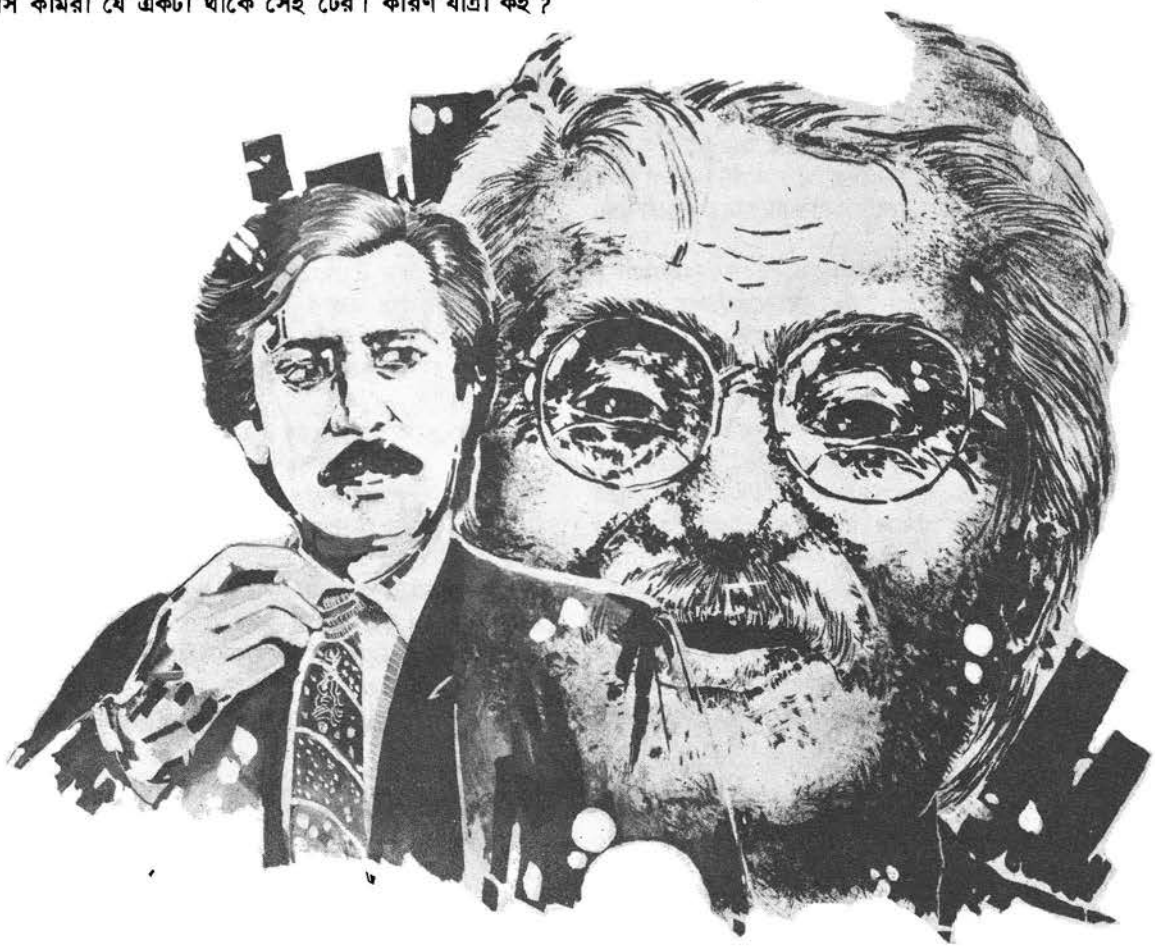

সকাল নটা থেকেই তার চেম্বারে রুগীর ভিড়। অধিকাংশেরই আগে থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট। কারণ সুনন্দ সেনকে দেখাতে হলে অন্তত তিন মাস আগে তার অ্যাসিস্ট্যান্টের কাছে ডেট নিতে হয়।

সুনন্দের এই ভাগনেটিও ডাক্তার। কলকাতায় মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময় কিছুদিন তার কাছেই ছিল। তারপর হস্টেলে চলে যায়। মোটামুটি ভালো ছাত্র। এম. বি. বি. এস. পাশ করার পর ফের একটা ডিপ্লোমা কোর্স করেছে। এখন সেই গ্রামের কাছেই একটা ছোট শহরে প্র্যাকটিশে বসে। তা পসার মন্দ হচ্ছে না। শ' দুই টাকা হেসে খেলে রোজ পকেটে ঢোকে।

বাঁকুড়ায় সুনন্দ এক বন্ধুর বাড়িতে এসে উঠল। তারও পেশা ডাক্তারি। কলকাতা থেকে সুনন্দ এর সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করেছিল। শুনে রমাকান্ত অর্থাৎ তার বন্ধু আগের দিন রাত্তিরেই চলে আসতে বলল। বিকেলের দিকে একটা ট্রেনও নাকি আছে। ঘণ্টা চার-পাঁচ বাদেই বাঁকুড়ায় নামিয়ে দেয়। তাহলে খেয়েদেয়ে রাত্তিরে দিব্যি ঘুম-টুম হবে।

টেলিফোনে রমাকান্ত বলল–'কাল সকালে কিন্তু তোকে আমার চেম্বারে বসতে হবে।'

'তোর চেম্বারে বসব কেন?' সুনন্দ শব্দ করে হাসল।

রমাকান্ত বলল–'এতে হাসবার কি হলো?'

'বারে। হাসবার কথাই যে। তোর চেম্বারে বসলে লোকে কি বলবে জানিস?'

'কি?'

'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।'

'তা বলুক।' রমাকান্ত তার আপত্তিকে আমলই দিল না। বলল–'অসুবিধে কিসের? চেম্বারে সাত-আটটা জটিল কেস তোকে দেখতে হবে। নটা নাগাদ ব্রেকফাস্ট সেরে বসলে ঘণ্টা দুয়েকের বেশি লাগবে না।'

তবু সুনন্দ খুঁতখুঁত করল। 'কী দরকার এসব ঝামেলায়? বরং বাঁকুড়ায় কোনো ভালো ফিজিশিয়ানকে দেখাতে বল। আজকাল অনেক স্পেশ্যালিস্ট সেখানে গেছে।'

কিন্তু রমাকান্ত রাজী নয়। সে জবাব দিল–'স্পেশ্যালিস্ট থাকবে না কেন? কিন্তু তোর মতো একজন বিলেত ফেরৎ বড় ডাক্তার পাব কোথায়? তুই কেসগুলো দেখবি জানলে শুধু রুগী কেন, তার আত্মীয়-বন্ধুরাও বর্তে যাবে।' টেলিফোনের তারে সে আবার বলল–'তাছাড়া দিনটা মিছিমিছি কানা করবি কেন? বরং চেম্বারে বসলে টু-পাইস পকেটে আসবে। তারপর বিকেলে ভাগনের বৌভাতে চলে যাস। রথ দেখা আর কলা বেচা দুই হবে।'

অগত্যা তাই। কিন্তু বিকেলের এক্সপ্রেসটা ধরতে পারল না সুনন্দ। নিরাময় নার্সিংহোমে তার এক পেশেন্টের খুব বাড়াবাড়ি। বেলা চারটে নাগাদ সুনন্দকে সেখানেই ছুটতে হলো। প্রায় ঘণ্টা দেড় কাটিয়ে সুনন্দ যখন বাড়ি ফিরল তখন ঘড়িতে ছটা বাজে। শেষ পর্যন্ত খেয়েদেয়ে রাত্তিরের ট্রেনটাই সে ধরবে ঠিক করল।

ভোরবেলা রমাকান্ত বাগানে পায়চারি করছিল। সুনন্দকে রিকশা থেকে নামতে দেখে বলল–'আয়, আয়। কাল তুই এলি না, তাই একটা আর্জেন্ট কল বুক করলাম। কিন্তু কলকাতার লাইনে গণ্ডগোল, তাই পেলাম না।

সুনন্দ বলল–'ইচ্ছে থাকলেও আসা হলো কই? নার্সিংহোমে এক পেশেন্টের খুব বাড়াবাড়ি। সেখান থেকে বেরোতেই সন্ধ্যে। তাই ধীরেসুস্থে রাত্তিরের ট্রেনটাই ধরলাম।

'ভালো করেছিস,' রমাকান্ত তাকে সমর্থন জানাল। বলল–'এখানেও সব রেডি করে রেখেছি। তুই মুখ-হাত ধুয়ে ঘণ্টা দুই জিরিয়ে নে। সাড়ে নটা নাগাদ চেম্বারে গিয়ে বসলেই হবে।'

দুপুরে সুনন্দ ঘুমিয়ে পড়েছিল। চেম্বার সেরে বাড়ি ফিরতে সাড়ে বারোটা বাজল। রাত্তিরে ভালো ঘুম হয়নি। খাওয়ার পর বালিশে মাথা রাখতেই চোখ দুটো জড়িয়ে এলো। বিকেল চারটের পর রমাকান্ত এসে হাঁকডাক শুরু করল–'এই ওঠ্, ওঠ্। তোর গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে আছে।'

তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে সুনন্দ গাড়িতে উঠল। শুধলো–'রাধামোহনপুর পৌঁছতে কতক্ষণ লাগবে?'

ড্রাইভার মুখ বাড়িয়ে জবাব দিল–'বড়জোর ঘণ্টা দুই। তার বেশি নয় স্যর।'

সীটে বসেই সে বন্ধুকে উদ্দেশ করে বলল–'তাহলে রাত্তির দশটা নাগাদ ফিরতে পারব, সকাল সাড়ে ছটার আসানসোল এক্সপ্রেসটা কিন্তু দুর্গাপুরে ধরতে হবে।'

'তার জন্যে চিন্তা নেই।' রমাকান্ত আশ্বাস দিল। বলল–'এই গাড়িই তোকে দুর্গাপুরে ছেড়ে আসবে।'

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। রাধামোহনপুর থেকে উঠতে সুনন্দর একটু দেরি হলো, সওয়া নটার মতো। ভাগনে অবশ্য বারবার বলছিল–'ভোরে গেলেই পারতে মামা। সাড়ে ছটার এক্সপ্রেসটা দুর্গাপুরে ধরতে।' কিন্তু সুনন্দ রাজী হয়নি। বৌভাতের খাটাখাটুনির পর অত ভোরে কে তাকে ডাকাডাকি করে তুলবে? বরং রমাকান্ত এ ব্যাপারে বেশি নির্ভরযোগ্য। নিজে কিংবা অ্যালার্ম ক্লকের সাহায্যেই হোক, তাকে ঠিক সময়ে জাগিয়ে দিতে তার ভুল হবে না।

রাধামোহনপুর থেকে বেরিয়ে খানিকটা কাঁচা রাস্তা। এখনও বৃষ্টি-বাদল হয়নি, তাই গাড়ি যাচ্ছে। নইলে একটা ভারী বর্ষা হলে রাস্তার যে কী হাল হবে তা বুঝতে অসুবিধে হয় না।

পশ্চিমের আকাশে গাঢ় কৃষ্ণ মেঘ। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। আরো মাইলখানেক গেলে গাড়ি পাকা সড়ক ধরবে। হঠাৎ গুড়গুড় শব্দে মেঘ ডাকল। তার সঙ্গে বিদ্যুতের ঝলকানি। ড্রাইভার বলল–'গতিক সুবিধের নয় স্যর। মনে হচ্ছে ঝড় উঠবে। হয়তো তার সঙ্গে বৃষ্টি।' আরো আধঘণ্টা চলার পর হঠাৎ বড় বড় ফোঁটায় জল নামল। প্রায় তখুনি সমস্ত আকাশ ঝলসিয়ে কড়কড় শব্দে বাজ পড়ল।

মিনিট দুই-তিন না যেতেই শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হলো। বেশ বড় বড় পাথর। তেমনি বেগে ঝড়। রাস্তার পাশে একটা গাছ প্রচণ্ড দুলছে। ঝড় বাড়লে হয়তো পথেই মুখ থুবড়ে পড়বে।

ভয় পেয়ে সুনন্দ বলল–'এই দুর্যোগে বরং কোথাও দাঁড়ালে হতো।'

শুনে ড্রাইভারও সায় দিল। বলল–'ওই তো প্রতাপপুর দেখা যাচ্ছে। গাঁয়ে ঢুকতেই ডান দিকে শুভঙ্কর স্যারের বাড়ি। ওখানেই একটু অপেক্ষা করবেন।'

ইচ্ছে থাকলেও আসা হলো কই ?

'শুভংকর স্যার ? তিনি কে ?

'আজ্ঞে ইস্কুলে মাস্টারি করতেন। ওই যে কী বলে না জাতির শিক্ষক। রিটায়ার করবার দু-তিন বছর আগে দিল্লী থেকে সেই পেরাইজ পেয়েছেন।'

'ও বুঝেছি। উনি হলেন ন্যাশনাল টিচার। শিক্ষক দিবসে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ওঁদের পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেন।'

কিন্তু প্রতাপপুরে ঢোকার মুখে ফের এক বিপর্যয়। গাড়ি হঠাৎ নিশ্চল হলো। ইঞ্জিনের বনেট খুলে কি সব পরীক্ষা করে ড্রাইভার হতাশ ভঙ্গিতে জানাল–'অ্যাকসিলেটরের তার কেটে গেছে, স্যার। নতুন না দিলে আর গাড়ি চলবে না।'

'তোমার কাছে তার নেই ?'

ড্রাইভার নেতিবাচক ভঙ্গি করল।

ইতিমধ্যে শিল-পড়া থেমেছে। এখনও বৃষ্টি হচ্ছে, তবে ঝড়ের বেগ কম। সামান্য দূরে শুভংকর স্যারের বাড়ি। সুনন্দ জিজ্ঞেস করল–'এখানে অ্যাকসিলেটরের তার কিনতে পাওয়া যাবে ?'

'না স্যার।' ড্রাইভার জিভ কেটে সলজ্জ হাসল, বলল–'এ হলো অজ পাড়াগাঁ। এখানে মোটর পার্টসের দোকান কোথায় ?'

'তাহলে উপায় ? সমস্ত রাত্তিরটা কি এখানেই পড়ে থাকতে হবে ?' সুনন্দ ঝাঁঝের সঙ্গে বলল।

'উপায় একটা হবে। অত চিন্তা করবেন না স্যার।' ড্রাইভার আশ্বাস দিল। শেষে বলল–'এখন একটু কষ্ট করে শুভংকর স্যারের বাড়ি চলুন। তারপর ঠেলাঠেলি করে গাড়িটা আমি রাস্তার একপাশে সরিয়ে রাখছি।'

ডাকাডাকি করতেই দরজা খুলে এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন। প্রায় সত্তরের মতো বয়স। খোঁচা খোঁচা একমুখ দাড়ি। চোখে চাঁদির চশমা। মাথায় শণের মতো পাকা চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমেছে

সুনন্দকে দেখেই সমাদর করে বললেন–'আসুন, আসুন। ইস ! আপনি দেখছি বেশ ভিজে গিয়েছেন।'

ড্রাইভার পরিচয় দিল–'ইনি কলকাতার খুব বড় ডাক্তার। রাধামোহনপুরে ভাগনের বৌভাতে গিয়েছিলেন। ফেরার সময় এই অনাছিষ্টি কাণ্ড। তারপর আবার গাড়ির অ্যাকসিলেটরের তারটা কেটে গেল। অগত্যা আপনার এখানে এনে তুলেছি।'

বৃদ্ধ সহাস্যে জবাব দিলেন–'এ তো পরম সৌভাগ্য আমার। এমন একজন মানী লোক দয়া করে এ বাড়িতে পায়ের ধুলো দিয়েছেন সেই ঢের।' তারপর ইঙ্গিতে ড্রাইভারকে চেয়ারটা এগিয়ে দিতে বললেন।

সুনন্দ বসল। ড্রাইভার বলল–'বৃষ্টি একটু কমলেই আমি বেরুব স্যার। এখান থেকে মাইল পাঁচ-ছয় দূরে বৃন্দাবনপুরে একটা মোটর–পার্টসের দোকান আছে। দেখি, যদি সেখানে তারটা পেয়ে যাই।'

'কিন্তু ছ-মাইল রাস্তা তুমি যাবে কেমন করে ?'

'গাঁয়ে কারো সাইকেল চেয়ে নেব, যাতায়াতে তা পেরায় ঘণ্টা তিন-চার লাগবেক। সেই সময়টুকুন কষ্ট করে মাস্টারমশায়ের কাছে বসুন।'

বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন–'আপনার নামটি কি ডাক্তারবাবু ?'

'সুনন্দ সেন।' কী মনে হতে সে ফের বলল–'আপনি বয়সে অনেক বড়। বরং আমাকে তুমি বলেই ডাকবেন।'

'সুনন্দ সেন', বৃদ্ধ নামটা যেন বিড়বিড় করলেন। হ্যারিকেনটা তুলে একদৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন খোঁজার চেষ্টা করলেন। সেই অদ্ভুত ঘোলাটে চোখে সুনন্দকে ফের লক্ষ্য করে বললেন–'তুমি সুনন্দ–সুনন্দ সেন !

হ্যাঁ, আমি শুনেছিলাম তুমি খুব বড় ডাক্তার হয়েছ।'

এতক্ষণে সুনন্দও চিনতে পেরেছে। প্রায় চল্লিশ বছর আগের কথা। সিউড়ি স্কুলে ক্লাস এইটে ভর্তি হয়েছিল সুনন্দ।

বাবার বদলির চাকরি। জানুয়ারী মাসে ওখানকার সাব-রেজিস্ট্রার হয়ে এলেন। প্রথম যেদিন স্কুলে গেল, সেদিন শুভংকর স্যারের অংকের ক্লাস। এসেই কোনো কথা না বলে ব্ল্যাকবোর্ডে চক পেন্সিল দিয়ে একটি কবিতা লিখলেন।

আছিল দেউল এক বিচিত্র গঠন
ক্রোধে জলে ফেলে দিল পবননন্দন।
অর্ধেক পংকেতে তার, তেহাই সলিলে
দশম ভাগের ভাগ শ্যাওলার দলে।
উপরে বাহান্ন গজ দেখি বিদ্যমান
করহ সুবোধ শিশু দেউল প্রমাণ।

তারপর ছাত্রদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন–'কবিতা হলেও আসলে এটা একটা অংক। দেখি, কে এর উত্তর বের করতে পারো।'

সমস্ত ক্লাস নিশ্চুপ। কারো মুখে শব্দ নেই। শুভংকর স্যার এক এক করে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকাচ্ছিলেন। হঠাৎ সুনন্দের দিকে নজর পড়তেই সে হাত তুলল।

তার কাছে এসে শুভংকর স্যার সস্নেহে শুধোলেন–'নতুন ভর্তি হয়েছ?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।'

'এই অংকটা কষতে পারবে?'

সুনন্দ মাথা হেলিয়ে সায় দিল।

'তেহাই মানে জানো?' শুভংকর স্যার ফের প্রশ্ন করলেন।

'জানি স্যার। তেহাই মানে এক-তৃতীয়াংশ।'

'ঠিক বলেছ।' তার পিঠে একটা মৃদু চাপড় দিয়ে আবার জিজ্ঞেস করলেন–'কি নাম তোমার?'

'সুনন্দ–সুনন্দ সেন।'

শুধু তেহাই শব্দের অর্থ নয়, বোর্ডে গিয়ে অংকটা কষার জন্য শুভংকর স্যার তাকে আহ্বান জানালেন। চক পেন্সিল হাতে নিয়ে সুনন্দ অংকটির নির্ভুল সমাধান বের করল।

কত দিন আগের কথা। অথচ দিনটা এখনও সুনন্দর স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

শুভংকর বললেন–'তোমার বলাইকে মনে পড়ে? বলাই দাস। ক্লাস এইটে তোমার সংগে পড়ত। এখন কলকাতায় কলেজ স্ট্রীটে বইয়ের দোকান, পাবলিশার হয়েছে। বছর পাঁচ-ছয় আগে একবার ওর দোকানে গিয়েছিলাম। তা আমাকে দেখেই চিনতে পারল। যত্ন করে বসাল। চা খাওয়াল। পুরানো ছাত্রদের গল্প করল। শেষে তোমার কথা বলল। কলকাতায় এম. ডি. করে লন্ডন থেকে এম. আর. সি. পি. হয়ে ফিরেছ। ডাক্তার হিসেবে হাতযশ, নামডাক আর পসার সবই হয়েছে।'

সুনন্দ নত হয়ে স্যারের পায়ের ধুলো নিল। সংকোচের সংগে বলল–'কী লজ্জার কথা! আপনাকে দেখে প্রথমটা চিনতেই পারিনি।'

'চেনা শক্ত। তারপর যে চল্লিশটা বছর কেটে গেছে সুনন্দ।' শুভংকর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। হঠাৎ কী ভেবে বললেন–'আচ্ছা, তুমি যে বছর ভর্তি হলে সে বছর স্কুলে একটা রচনা প্রতিযোগিতা হয়েছিল মনে আছে?'

স্মৃতিতে ঘটনাটা ভেসে উঠতেই সে ঈষৎ হাসল।

শুভংকর বললেন–'রচনার বিষয়বস্তু ছিল, 'তোমার জীবনের লক্ষ্য'। তা সেই রচনা প্রতিযোগিতায় তুমি ফার্স্ট হয়েছিলে।'

'হ্যাঁ স্যার। এখন মনে পড়ছে। প্রতিযোগিতায় ফার্স্ট প্রাইজ ছিল একটা রুপোর মেডেল। প্রাইজ ডিস্ট্রিবিউশনের দিন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নিজে সেটা আমার গলায় পরিয়ে দিলেন।'

শুভংকর বললেন–'তুমি লিখেছিলে বড় হয়ে ডাক্তার হওয়াই তোমার জীবনের লক্ষ্য। কেন ডাক্তার হতে চাও তারও অনেক যুক্তি দেখিয়েছিলে। এই গরিব দেশে বিনা চিকিৎসায় কত লোক বেঘোরে মারা যাচ্ছে। ডাক্তার হলে তুমি সেই দুঃখী অসহায় মানুষের সেবা করতে পারবে। সেই চিকিৎসা করাই হবে তোমার জীবনের ব্রত। রচনার শেষে স্বামীজীর বিখ্যাত দুটি লাইন তুমি উদ্ধৃত করেছিলে–

'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

ইতিমধ্যে কখন বৃষ্টি থেমেছে কেউ খেয়াল করেনি। ড্রাইভারও সম্ভবত অ্যাকসিলেটরের তারের খোঁজে বেরিয়েছে। সুনন্দ হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল প্রায় সাড়ে দশটা বাজে। গাড়িটা মেরামত হতে কত রাত্তির হবে কে জানে!

হঠাৎ হ্যারিকেন হাতে কে যেন দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। শুভংকর স্যার সেদিকে তাকিয়ে বললেন–'আরে! হরেন সাউ যে। কী খবর বল? তোমার নাতি কেমন আছে?'

'আজ্ঞে ভালো নয়। আর সেজন্যই তো এত রাত্তিরে আপনার কাছে এলাম মাস্টারমশায়। সন্ধ্যে থেকেই নাতিটার বেশ বাড়াবাড়ি। একটু আগে চন্দন ডাক্তারকে হাতে-পায়ে ধরে এনেছি। তা সে নাড়ি টিপে বলল–'গতিক সুবিধের মনে হচ্ছে না। তারপর রাস্তায় গাড়ির ড্রাইভারের কাছে শুনলাম কলকাতার কে এক বড় ডাক্তার আপনার কাছে এসে উঠেছেন।'

শুভংকর সহাস্যে বললেন–'শুনেছ ঠিকই। তবে যে সে ডাক্তার নয়, স্বয়ং ধন্বন্তরী বলতে পারো। কলকাতার এম. ডি., তারপর লন্ডনের এম. আর. সি. পি.। ও হলো আমার ছাত্র। খুব হাতযশ।'

হরেন সাউ সবিনয়ে জানাল–'ডাক্তারবাবু যদি দয়া করে একবার আমার নাতিটিকে দেখতেন।'

সুনন্দের মতামতের অপেক্ষা না করেই শুভংকর বললেন,–'নিশ্চয় দেখবে। দুঃখী অসহায় মানুষের চিকিৎসা করা ওর জীবনের ব্রত। আচ্ছা চল, আমিই ওকে সংগে করে নিয়ে যাচ্ছি।'

অগত্যা সুনন্দ উঠে দাঁড়াল। শুভংকর বললেন–'রাত-দুপুরে যখন এ গ্রামে হঠাৎ এসে পড়েছ, তখন ওর নাতিকে একবার দেখে আসবে চল।'

হ্যারিকেন হাতে শুভংকর নিজেই এগিয়ে গেলেন। সুনন্দ পিছনে। হরেন সাউ সকলের শেষে। যেতে যেতে শুভংকর বললেন–'এখন আর চিন্তা কিসের? সুনন্দ যখন এসে পড়েছে তখন ধর নাতি একরকম সেরেই গেছে।'

সুনন্দ অস্বস্তিবোধ করছিল। অসুখটা কী তাই সে জানে না। এখন যদি ব্যাধির একটা বিহিত করতে না পারে তাহলে শুভংকর স্যার অর্থাৎ তার গুরুমশায়ের মান থাকবে?

রোগীকে পরীক্ষা করেই সুনন্দ অসুখটা বুঝতে পারল। নিউমোনিয়া। বুকে প্যাচ্ রয়েছে। জ্বর প্রায় একশ চার ডিগ্রীর কাছাকাছি।

অত রাত্তিরে কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার এসেছে শুনে চন্দন নিজেই হাজির। হাতুড়ে কোয়াক, তার বিদ্যেবুদ্ধি সামান্য। রুগীর তেমন কোনো চিকিৎসাই হয়নি।

পরীক্ষা শেষ করে সুনন্দ ঘোষণা করল–'আজ রাত্তিরেই একে ইনজেকশন দিতে শুরু করুন।'

'ইনজেকশন?' চন্দন ভুরু তুলে তাকাল।

সুনন্দ বলল–'হ্যাঁ। ওষুধপত্র আর যা লাগবে আমি লিখে দিচ্ছি। কাউকে পাঠিয়ে আনিয়ে নিন।'

প্রেসক্রিপশন পড়ে চন্দনের প্রায় শিবনেত্র হবার যোগাড়। এত সব দামী ওষুধ এরা কোথায় পাবে?

ব্যাপারটা আঁচ করে শুভংকর বললেন–'এরা বড় গরিব, বুঝলে? দামী ওষুধ কেনার সামর্থ্য নেই।'

পকেটে বেশ কয়েকশ টাকা রয়েছে। সকালে বাঁকুড়ায় দশ-বারো জন রুগী দেখেছিল। ফিজ হিসেবে রমাকান্ত এই টাকাটা তার পকেটে গুঁজে দিয়েছে। সুনন্দ হঠাৎ শ' দুই টাকা বের করে বলল–'তাহলে এটা নিয়ে কেউ চলে যাক। ওষুধপত্রগুলো কিনে আনবে।'

চন্দন চিন্তিতমুখে জানাল–'এসব ওষুধ ধারে কাছে পাবেন কোথায়? এক সোনামুখীর বাজারে হয়তো মিলবে। একটা বড় দোকান দিবারাত্রি খোলা থাকে।'

হরেন সাউ বলল–'কিন্তু সোনামুখী এখান থেকে বেশ দূর। তা পেরায় বারো-চোদ্দ মাইল। এত রাত্তিরে কাকে পাঠাই?'

গাড়ির ড্রাইভার কখন ভিড়ের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। কেউ লক্ষ্য করেনি। সে হঠাৎ মুখ বাড়িয়ে বলল–'স্যার, অ্যাকসিলেটরের তার পেয়ে গেছি। বৃন্দাবনপুর যেতে হলোনি। রাস্তায় এক অ্যামবাসাডর গাড়ির সংগে দেখা। সেই ড্রাইভারের কাছে একটা বাড়তি তার ছিল।'

সুনন্দকে চিন্তিত দেখাল। একবার বিড়বিড় করে বলল–'ইনজেকশনটা এখনই দিতে পারলে ভালো হতো।' পরক্ষণেই ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে তার সিদ্ধান্ত জানাল–'তুমি বরং গাড়িটা নিয়ে একবার সোনামুখী থেকে ঘুরে এসো। ওষুধগুলো আজ রাত্তিরেই চাই।'

গ্রাম অঞ্চলে কথা যেন বাতাসে ছড়ায়। কলকাতার বড় ডাক্তার এসে হরেন সাউয়ের নাতিকে দেখেছে এ সংবাদ লতা-পল্লবিত হয়ে সর্বত্র জানাজানি হলো। ফলে যা হয়। আরো আট-দশ জন রুগী চিকিৎসার জন্য সুনন্দর সামনে এসে দাঁড়াল।

শুভংকর বললেন–'কি আর করবে? বিনা চিকিৎসায় অসুখে ভুগে এরা একদিন এমনি মারা যায়। ওষুধপত্র কেনার পয়সা নেই। কেমন করে বাঁচবে বল?'

বৃষ্টি হলেও একটা প্যাচপেচে গরম! কলকাতায় তার বাড়িতে এয়ার-কন্ডিশনার বসানো। ঘামে শরীরটা চটচটে হয়ে উঠেছে। তবু এই অবস্থায় হ্যারিকেনের আলোয় সুনন্দ সব কটি রুগীকেই পরীক্ষা করল। প্রত্যেকের আলাদা করে প্রেসক্রিপশন লিখল। তারপর পকেটে যা টাকা ছিল তাই ভাগাভাগি করে সকলকে দিয়ে বলল–'কাল সকালে ওষুধগুলো সোনামুখী থেকে আনিয়ে নিও।'

ড্রাইভার ফিরল প্রায় ঘণ্টা তিন বাদে। ঘড়িতে আড়াইটে বাজে। ইনজেকশনটা সিরিঞ্জে ভরে সুনন্দ নিজেই দিল। চন্দনকে বলল–'কাল দুপুর নাগাদ আর একটা দেবেন। মনে হয় বিকেলের দিকে জ্বরটা নেমে যাবে।'

আরো ঘণ্টাখানেক সুনন্দ প্রতাপপুরে কাটাল। ইনজেকশন আর ওষুধ দেবার পরই হরেন সাউয়ের নাতি কিছুটা সুস্থবোধ করছে। শুভংকর স্যারের দিকে তাকিয়ে সুনন্দ বলল–'আর চিন্তার কারণ নেই। রুগী এবার সেরে উঠবে।'

শুভংকর হাসলেন। সগর্বে বললেন–'সে কথা তো আগেই জানিয়ে দিয়েছি। সুনন্দ যখন এসে পড়েছে তখন আর ভাবনা নেই।'

সমস্ত রাত্তিরটা জাগরণে গেল। নৈশ প্রকৃতি এখন শান্ত, বাতাসে একটা শীতল স্পর্শ। গাড়ি পথে অপেক্ষা করছে।

সুনন্দ বলল–'তাহলে এখন যাই স্যার?'

'হ্যাঁ, এসো। সারারাত্রি যা ধকল গেল তোমার! ঘুম নেই, আর এই গরমে থাকা কি অভ্যেস আছে?'

সুনন্দ ঈষৎ হাসল। সত্যি আশ্চর্য! এত কষ্টের মধ্যেও কেমন তৃপ্তিবোধ করছিল সে। একটা খুশি ভাব। শুধু আনন্দটা কিসের তাই বুঝতে পারছিল না।

নত হয়ে সুনন্দ তার মাস্টারমশায়ের পদধূলি নিল। রোগা শীর্ণ হাত বাড়িয়ে ছাত্রের মাথার চুল স্পর্শ করে শুভংকর তাকে আশীর্বাদ করলেন। বললেন–'আজ বড় আনন্দ হলো তোমাকে দেখে। সত্যি জীবনের লক্ষ্য থেকে তুমি বিচ্যুত হওনি। অথচ তাই হয়। ব্যতিক্রম প্রায় দেখা যায় না।'

গাড়ি ছাড়ল। শুভংকর দাঁড়িয়ে। তাঁর পাশে হরেন সাউ, পিছনে আরো গ্রামের লোক।

ড্রাইভারকে বলল সুনন্দ–'গাড়ি দুর্গাপুরে নিয়ে চল। সকালের এক্সপ্রেসটা আমাকে ধরতেই হবে।'

পিছনের সীটে গা এলিয়ে দিল সুনন্দ। এই রাতটার কথা ভাবছিল সে। শুভংকর স্যার ঠিক বুঝতে পারেননি, আরো অনেকের মতো জীবনের লক্ষ্য থেকে সুনন্দও অনেকখানি দূরে সরে গেছে। শুধু গত রাত্রে এক আকস্মিক ঘটনায় হঠাৎ লক্ষ্যের খুব কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। এখন আবার ব্যবধান দীর্ঘ হচ্ছে।

এক্সপ্রেসটা ধরতে পারলে সাড়ে আটটার মধ্যেই কলকাতা পৌঁছে যাবে সুনন্দ। দশটায় তার চেম্বারে বসবার কথা। অন্তত বারোজনকে আগেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়ে রেখেছে। তার মধ্যে বিশিষ্ট শিল্পপতি সি. এস. ডালমিয়া একজন। চেম্বার থেকে বেরিয়ে সুনন্দ ছুটবে নার্সিংহোমে। তারপর কয়েকটা কল অ্যাটেন্ড করবে। ব্যস্ত জীবনে দিন কখন আসে আর যায় সুনন্দ প্রায় টেরই পায় না।

শৈশবের সেই রচনা প্রতিযোগিতার কথা মনে হলো তার। কী সব যেন লিখেছিল সে!

ভোরের আলো ফুটছে। রচনার অক্ষরগুলো এখন আকাশের নক্ষত্রের মতো বহুদূরে।

দিনের আলোয় পড়া যায় না।

ছবি: রঞ্জতবরণ চক্রবর্তী

# চিকামার স্বর্ণমূর্তি

## অনিল ভৌমিক

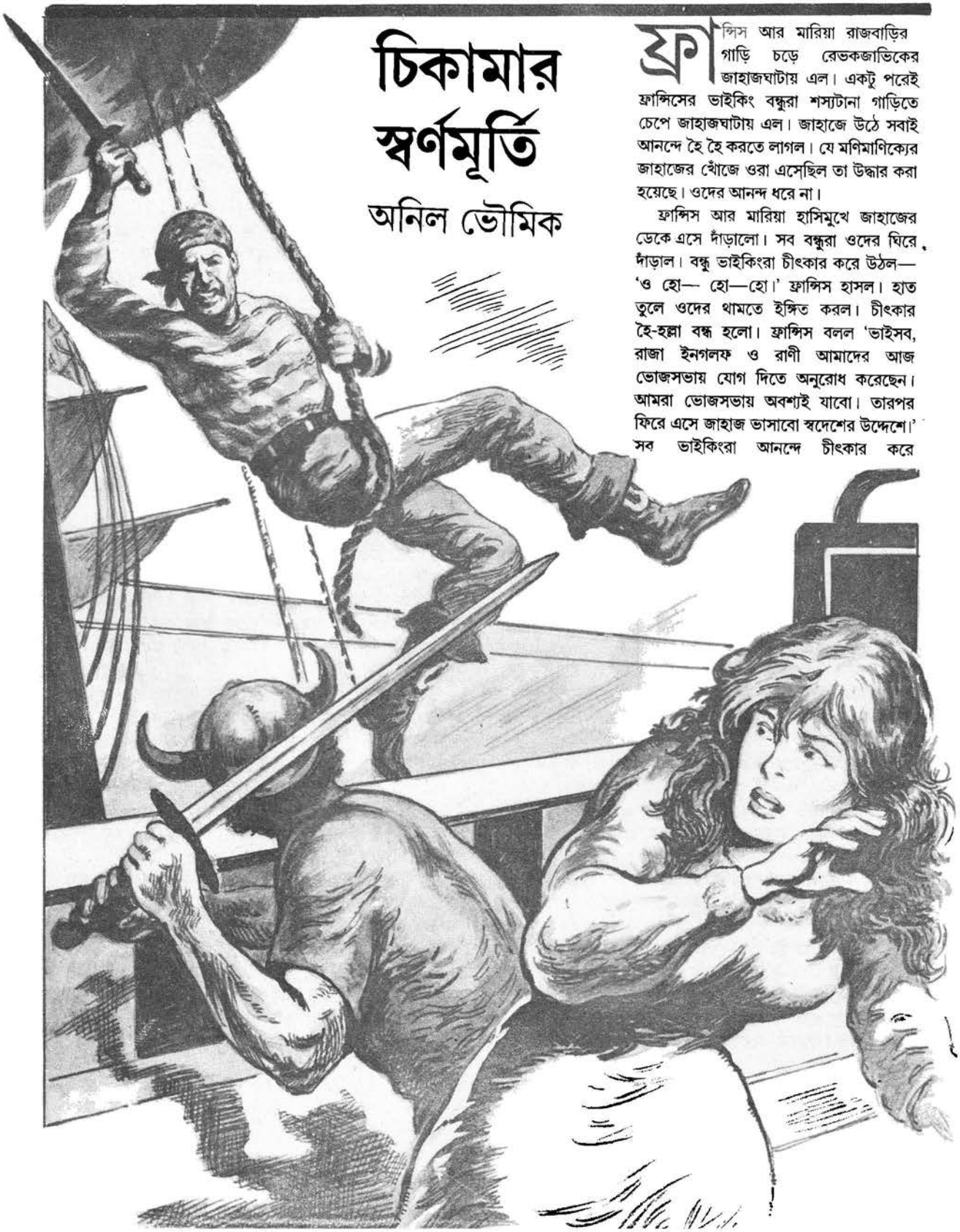

ফ্রান্সিস আর মারিয়া রাজবাড়ির গাড়ি চড়ে রেভকজাভিকের জাহাজঘাটায় এল। একটু পরেই ফ্রান্সিসের ভাইকিং বন্ধুরা শস্যটানা গাড়িতে চেপে জাহাজঘাটায় এল। জাহাজে উঠে সবাই আনন্দে হৈ হৈ করতে লাগল। যে মণিমাণিক্যের জাহাজের খোঁজে ওরা এসেছিল তা উদ্ধার করা হয়েছে। ওদের আনন্দ ধরে না।

ফ্রান্সিস আর মারিয়া হাসিমুখে জাহাজের ডেকে এসে দাঁড়ালো। সব বন্ধুরা ওদের ঘিরে দাঁড়াল। বন্ধু ভাইকিংরা চীৎকার করে উঠল—'ও হো— হো—হো।' ফ্রান্সিস হাসল। হাত তুলে ওদের থামতে ইঙ্গিত করল। চীৎকার হৈ-হল্লা বন্ধ হলো। ফ্রান্সিস বলল 'ভাইসব, রাজা ইনগলফ ও রাণী আমাদের আজ ভোজসভায় যোগ দিতে অনুরোধ করেছেন। আমরা ভোজসভায় অবশ্যই যাবো। তারপর ফিরে এসে জাহাজ ভাসাবো স্বদেশের উদ্দেশে।' সব ভাইকিংরা আনন্দে চীৎকার করে

উঠল—'ও-হো-হো।' এবার সবাই ভোজসভায় যাবে বলে পোশাক পরে তৈরি হতে গেল।

কিছুক্ষণ পরে ভাইকিংরা ভোজসভার শেষে জাহাজে ফিরে এল। ফ্রান্সিস ও মারিয়া রাজা ইনগলফের বিশেষ অতিথি হিসেবে গিয়েছিল। ওরাও রাজবাড়ির গাড়িতে ফিরে এল। ফ্রান্সিস জাহাজ ছাড়ার ইঙ্গিত করল। ঘর্‌ঘর্‌ শব্দে জাহাজের নোঙর তোলা হলো, বাতাসের তেমন জোর নেই। দাঁড়ীরা দাঁড়ঘরে চলে গেল। সমুদ্রের জলে দাঁড় চালাবার শব্দ উঠল, ছপ্‌ ছপ্‌। সব কটা পাল খাটানো হলো। পালে হাওয়া লাগল। জাহাজটা আস্তে আস্তে রেভকজাভিক বন্দর ছেড়ে মহাসমুদ্রের দিকে চলল।

দিনকয়েক পরেই জাহাজ দিনরাতের অঞ্চলে চলে এল। শীতের তীব্রতা কমে গেল। সবাই বাড়তি গরম পোশাক খুলে ফেলল। জাহাজ চলল ভাইকিংদের দেশের দিকে।

সেদিন দুপুরবেলা। জোর হাওয়ায় জাহাজের পালগুলো ফুলে উঠেছে। আকাশও পরিষ্কার। দাঁড়টানার কাজ থেকে ছুটি। ভাইকিংরা বেশিরভাগই নিজেদের কেবিনে শুয়ে বসে বিশ্রাম করছে। অনেকে ঘুমিয়েও নিচ্ছে। জাহাজের ডেকের নিস্তেজ রোদে কয়েকজন ভাইকিং কম্বল পেতে শুয়ে আছে। ওদের মধ্যে বিস্কোও আছে। হঠাৎ মাস্তুলের মাথায়-বসা নজরদার নিচে ডেকের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল—'একটা জাহাজ এইদিকে আসছে।'

— 'কোন দেশের জাহাজ?' শুয়ে থাকা বিস্কো চেঁচিয়ে বলল।

—'মাস্তুলে একটা পতাকা উড়ছে—ঠিক ঠাহর করতে পারছি না কোন দেশের পতাকা।' নজরদার বলল।

—'মরুক গে,' বিস্কো বলল—'দেখো জলদস্যুদের জাহাজ যেন না হয়।'

একটু সময় গেল। সেই জাহাজটা তখন বেশ কাছে চলে এসেছে। নজরদার এতক্ষণে জাহাজটার পতাকা ভালোভাবে দেখতে পেল। স্পেনদেশের পতাকা। নজরদার নিশ্চিন্ত হলো। নজরদার চেঁচিয়ে বলল—'স্পেন দেশের জাহাজ।'

বিস্কো শুয়ে শুয়েই বলল—'ঠিক আছে।'

জাহাজটা তখন ফ্রান্সিসদের জাহাজের গায়ের কাছে পাশে পাশেই চলেছে। হঠাৎ নজরদার দেখল সেই জাহাজের মাস্তুল থেকে স্পেনদেশের পতাকা নামিয়ে ফেলা হলো। সেখানে ওড়ানো হলো কালো কাপড়ে সাদা মড়ার মাথা আর ট্যাড়া আঁকা জলদস্যুদের পতাকা। নজরদারের বুক কেঁপে উঠল—জলদস্যুদের জাহাজ। ও চীৎকার করে উঠল—'জলদস্যু।' কিন্তু ওর গলা তখন শুকিয়ে কাঠ। যেটুকু শব্দ গলা দিয়ে বেরুলো তা কারো কানেই গেল না। ততক্ষণে জলদস্যুদের জাহাজটা ভাইকিংদের জাহাজের গায়ে এসে লেগেছে। কোনোরকম শব্দ না করে জলদস্যুরা খোলা তরোয়াল উঁচিয়ে এই জাহাজে উঠতে লাগল। প্রথমে উঠল জলদস্যুদের দলপতি। ছুঁচোলো দাড়ি গোঁফ মুখে। মাথায় বাঁকা কালো টুপি। গায়ে জমকালো পোশাক। পায়ে হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা বুট। জলদস্যুদের ইয়া গোঁফ, গাল পর্যন্ত জুলপি, মাথায় ঝাঁকড়া চুলে লাল কাপড়ের ফেট্টি, গায়ে ডোরাকাটা গেঞ্জি।

নজরদার দ্রুত মাস্তুলের গায়ে লাগানো দড়ির সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল। প্রাণপণে চীৎকার করতে লাগল— 'জলদস্যু—সাবধান!' ও কথাটা একবারই বলতে পারল। জলদস্যুর দলপতি কোমরের বেল্টে গোঁজা লম্বা ছুরিটা বের করে ছুঁড়ল নজরদারের দিকে। ছুরিটা পাক খেয়ে ছুটে গিয়ে নজরদারের বুকে বিঁধে গেল। ও দড়ির সিঁড়ি থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বিঁধে যাওয়া ছুরিটা ধরে টানতে গেল। ছুরিটা বুক থেকে বের করতে পারল না। ছিটকে পড়ল জাহাজের রেলিং-এর ওপর। তারপর পাক খেয়ে সমুদ্রের জলে।

ততক্ষণে যে চারজন ভাইকিং ডেকে কম্বল পেতে শুয়ে ছিল তাদের দু'জনের বুকেও জলদস্যুরা তরোয়াল বিঁধিয়ে দিয়েছে। ওরা টুঁ শব্দটিও করতে পারল না। বিপদ আঁচ করে বিস্কো দ্রুত উঠে পড়ল। দেখল উদ্যত তরোয়াল হাতে জলদস্যুরা ওদের ঘিরে ধরেছে। জলদস্যুদের দলপতি এগিয়ে এসে হাতের তরবারির ডগাটা বিস্কোর বুকে ঠেকিয়ে স্পেনীয় ভাষায় বলল—'কোনোরকম শব্দ করবে না। চলো তোমাদের অস্ত্রঘরটা দেখিয়ে দাও।' ততক্ষণে অন্য ভাইকিংটির মাথায় একজন জলদস্যু তরোয়ালের বাঁট দিয়ে ঘা মেরেছে। ভাইকিংটি দু'হাতে মাথা চেপে ডেকের ওপর গড়িয়ে পড়ে গেল।

এবার বিস্কোর পিঠে জলদস্যুদের দলপতি তরোয়ালের ডগা ঠেকিয়ে বলল—'চলো।'

বিস্কো দাঁড়িয়েই রইল। ও তখন ভাবছে কী করে ফ্রান্সিস ও হ্যারিকে এই বিপদের কথা জানাবে। ওর পিঠে তরোয়ালের চাপ বাড়িয়ে দস্যু দলপতি বলল —'চলো, নাহলে তরোয়াল বিঁধিয়ে দেব।' বিস্কো বুঝল এখন এদের কথামতো চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। রুখে দাঁড়ালে ওকে ঠিক হত্যা করবে। বিস্কো আস্তে আস্তে চলল। সিঁড়ি বেয়ে ওরা নামতে যাবে দলপতি চাপাস্বরে বলল—'কোনো শব্দ যেন না হয়।'

বিস্কো সামনে, পেছনে দস্যু দলপতি ও অন্য দস্যুরা নামতে লাগল। বিস্কো ওদের অস্ত্রঘরের সামনে নিয়ে এল। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল—'অস্ত্রঘর।' দলপতির নির্দেশে দু'জন জলদস্যু খোলা তরোয়াল হাতে ঘরটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। জলদস্যুদের দলপতি বলল—'তোমাদের ক্যাপ্টেন কে? তার কাছে আমাকে নিয়ে চলো।' বিস্কো চিন্তায় পড়ল। যে করেই হোক সে ফ্রান্সিসকে মুক্ত রাখতে চাইল। যদি ফ্রান্সিস ধরা না পড়ে তাহলে ফ্রান্সিস বুদ্ধি খাটিয়ে নিশ্চয়ই বিপদ থেকে সকলকে উদ্ধার করতে পারবে। জলদস্যু নেতা ওর পিঠে তরোয়ালের চাপ বাড়াল। গম্ভীর গলায় বলল—'চলো। কোনোরকম চালাকি করেছো কি মুণ্ডু উড়িয়ে দেব।'

বিস্কো চলল। পেছনে পেছনে জলদস্যু নেতা। ওর পেছনে চারজন খোলা তরোয়াল হাতে জলদস্যু। ঠিক তখনই একটা কেবিন ঘরের দরজা খুলে একজন ভাইকিং বেরিয়ে এল। পড়ল একেবারে বিস্কো আর জলদস্যুদের সামনে। বিস্কো বলে উঠল—'এই আমাদের ক্যাপ্টেন।'

জলদস্যু নেতা একলাফে সামনে গিয়ে ভাইকিংটির গলায় তরোয়াল ঠেকিয়ে বলল—'তুমিই এই জাহাজের ক্যাপ্টেন? ভাইকিংটির মুখ তখন ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। দু'হাত ওপরে তুলে ভয়ার্ত স্বরে বলে উঠল—'না-না, আমি না ফ্রান্সিস।' বিস্কো চোখের ইঙ্গিতে ভাইকিং বন্ধুটিকে বোঝাল যেন ও বলে যে, ওই ক্যাপ্টেন। কিন্তু বন্ধুটি তো সেটা বুঝল না উল্টে ফ্রান্সিসের নাম বলে দিল।

জলদস্যু নেতা এবার রাগত দৃষ্টিতে বিস্কোর দিকে তাকাল। বলল—'আমাকে ধোঁকা দিচ্ছিলে।' একজন জলদস্যুর দিকে তাকিয়ে বলল—'একে ডেকে নিয়ে যাও। বন্দী কর।' এবার দলনেতা ভাইকিংটির দিকে তাকাল। বলল—'আমাকে ফ্রান্সিসের কাছে নিয়ে চলো। কোনোরকম চালাকি করবে না।' ভাইকিংটিকে সামনে রেখে জলদস্যুরা চলল।

সবাই ফ্রান্সিস ও মারিয়ার কেবিন ঘরের সামনে দাঁড়াল। ভাইকিংটি আঙুল দিয়ে দরজাটা দেখাল। দস্যুনেতা গলা নামিয়ে বলল—'ফ্রান্সিসকে ডাকো।' ভাইকিংটি দরজায় টোকা দিল। ডাকল—'ফ্রান্সিস-ফ্রান্সিস।'

ফ্রান্সিস তখন বিছানায় আধশোয়া হয়ে বিশ্রাম করছিল। মারিয়া বিছানায় বসে রুমালে এমব্রয়ডারি করছিল। ডাক শুনে মারিয়া এসে দরজা খুলে দিল। জলদস্যু নেতা উদ্যত তরবারি হাতে এক ধাক্কায় দরজা সবটা খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকল। ফ্রান্সিস একলাফে বিছানা থেকে নেমে কাঠের দেয়ালে ঝোলানো তরোয়ালটার দিকে ছুটল। কিন্তু, তরোয়াল হাতে নেবার আগেই দু'জন জলদস্যু দুদিক থেকে ফ্রান্সিসকে জাপটে ধরল। ফ্রান্সিস শরীরে ঝাঁকুনি দিয়ে ছাড়াবার চেষ্টা করল। পারল না। জলদস্যু দু'জনের তরোয়ালের খোঁচা লেগে ফ্রান্সিসের বুকে পিঠে হাতে কেটে গেল। রক্ত পড়তে লাগল। মারিয়া বুঝল ওরা সকলেই বিপদে পড়েছে। কিন্তু মারিয়া ভয় পেল না। দৃপ্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল—'আপনি কে?' জলদস্যু-দলপতি একটু মাথা ঝুঁকিয়ে সম্মান জানিয়ে হেসে বলল—'আমার নাম আলবার্তো।'

—'তুমি জলদস্যু।' মারিয়া চেঁচিয়ে বলল।

— 'হ্যাঁ', আলবার্তো বলল—'মাদ্রিদ নগরে পাঁচ একর জমি কিনেছি। বাড়ি হচ্ছে। সোনা রুপো হীরে অলঙ্কার এসব আমার এখন খুব প্রয়োজন। তাই জাহাজ লুঠ করি। আর একটা কাজও করতে হয়। ক্রীতদাস সংগ্রহ ও বিক্রি।

— 'ঠিক আছে', মারিয়া বলল— 'আমাদের যা সোনা রুপো অলঙ্কার আছে দিয়ে দিচ্ছি। আমাদের জাহাজ থেকে দূর হও তোমরা।'

—'খুব ভালো কথা। আপনি সেসব একত্র করুন। কিন্তু আপনাদের কাউকে তো ছাড়া হবে না। কাছাকাছি ডাঙায় যেখানে ক্রীতদাস কেনাবেচার হাট পাবো সেখানেই আপনাদের বিক্রি করে দেব। সাদা চামড়ার ক্রীতদাস, অনেক দাম পাওয়া যাবে।'

ফ্রান্সিসকে ততক্ষণে দু'জন জলদস্যু দুহাত বুক ঘাড় দড়ি দিয়ে জড়িয়ে বেঁধে ফেলেছে। ফ্রান্সিস বাধা দেয়নি। ও বুঝতে পেরেছে—এখন লড়াই অসম্ভব। খালি হাতে এখন লড়াই চলবে না। সুযোগের অপেক্ষা করতে হবে। আলবার্তো জলদস্যু দু'জনকে ইঙ্গিত করল। ওরা ফ্রান্সিসকে ধরে নিয়ে চলল। পেছনে মারিয়া। মারিয়ার দু'টো হাতও ততক্ষণে বাঁধা হয়ে গেছে। সামনে আলবার্তো, পেছনে ফ্রান্সিসরা। সবাই চলল ডেকে ওঠার সিঁড়ির দিকে।

ওদিকে জলদস্যুরা চেষ্টা করল যাতে নিঃশব্দে সব কাজ সারা যায়, কিন্তু পারল না। ওদের দ্রুত চলাফেরায় কাঠের পাটাতনে শব্দ হলো বেশ। দু'চারজন ভাইকিং কেবিন ঘর থেকে বেরিয়েও এল। জলদস্যুদের দেখল। অস্ত্রঘরের দিকে ছুটল অস্ত্র আনতে। গিয়ে দেখল অস্ত্রঘরের সামনে খোলা তরোয়াল হাতে জলদস্যুরা পাহারা দিচ্ছে। ওরা হতাশ হলো। জলদস্যুরা ওদের ঘিরে ফেলল। ওদের হাত বেঁধে নিয়ে চলল ডেকে ওঠার সিঁড়ির দিকে।

ফ্রান্সিস মারিয়া হ্যারি আর সব ভাইকিংদের জাহাজের ডেকে জলদস্যুরা জড়ো করল। আলবার্তো সকলের দিকে তাকিয়ে বলল—'তোমরা সবাই বন্দী। শুধু—' আঙুল দিয়ে মারিয়াকে দেখিয়ে বলল—'ইনি স্ত্রীলোক। ইনি থাকবেন একটি কেবিন ঘরে। সেই ঘরের দরজার সামনে অবশ্যই পাহারাদার থাকবে। একটা কাজ তাঁকে করতে হবে। এই জাহাজে সোনা-মুক্তো-হীরে যা কিছু দামী জিনিস আর অলঙ্কার আছে সব একত্র করে আমাকে দিতে হবে।'

—'যদি না দিই।' মারিয়া ক্রুদ্ধস্বরে বলল।

—'তাহলে আপনি এবং এই জাহাজের কেউ বেঁচে থাকবেন না। সবাইকে মেরে হাঙরের মুখে ছুঁড়ে ফেলা হবে।' আলবার্তো বেশ জোরের সঙ্গে বলল। ফ্রান্সিস একটু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—'মারিয়া—কোনো কথা বলো না।' ভাইকিংরা সবাই তখন রাগে ফুঁসছে। বিনা যুদ্ধে এভাবে হার স্বীকার করা ওদের সহ্য হচ্ছিল না। কিন্তু উপায় নেই। এ অবস্থায় খালি হাতে লড়া যাবে না। ওরা চুপ করে রইল।

আলবার্তো মারিয়ার সামনে এল। মারিয়ার

বাঁধা হাত খুলে দিল। বলল—'যান। এই জাহাজে যা কিছু সোনা দানা হীরে মুক্তো আছে সব নিয়ে আসুন।' একজন জলদস্যুর দিকে তাকিয়ে আলবার্তো বলল—'এঁর সঙ্গে যা। সব যোগাড় হলে এঁকে আমাদের ক্যারাভেল-এ নিয়ে যাবি। পাঁচ নম্বর কেবিন ঘরে বন্দী করে রাখবি। পাহারা দিবি।'

জলদস্যুটি খোলা তরোয়াল হাতে মারিয়ার কাছে এসে দাঁড়াল। মারিয়া তখনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। আলবার্তো গলা চড়িয়ে হুকুমের সুরে বলল—'যান।' ফ্রান্সিস মৃদুস্বরে বলল—'মারিয়া কথার অবাধ্য হয়ো না।' মারিয়া একবার ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। তারপর নিচে নামবার সিঁড়ির দিকে এগোলো।

আলবার্তোর হুকুমে সব জলদস্যু খোলা তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিসদের ঘিরে দাঁড়াল। তারপর ওদের ঠেলে নিয়ে চলল জাহাজের ডেকের পাশে কাঠের রেলিঙের দিকে। দু'টো জাহাজই তখন পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। ফ্রান্সিসদের একে একে জলদস্যুদের ক্যারাভেল জাহাজে নিয়ে আসা হলো। সিঁড়ি দিয়ে নিচে জাহাজের খোলে নামানো হলো। একটা লোহার শিক লাগানো দরজার সামনে ওদের আনা হলো। একজন পাহারাদার জলদস্যু দরজাটার তালা খুলল। দেখা গেল এই দিনের বেলায়ও প্রায় অন্ধকার কয়েদ ঘর। ফ্রান্সিসদের সবাইকে সেই ঘরে ঢোকানো হলো। তিনজন কয়েদ ঘরের পাহারাদার জলদস্যু ফ্রান্সিসদের প্রত্যেকের হাত দড়ি দিয়ে বেঁধে দিল। তারপর লোহার মোটা শিকওয়ালা দরজাটা খুলে বেরিয়ে গেল। দরজা বন্ধ করল। তালা লাগাল। তারপর দরজার সামনে খোলা তরোয়াল হাতে পাহারা দিতে লাগল।

ভাইকিংরা কেউ কেউ কাঠের মেঝেয় শুয়ে পড়ল, কেউ কেউ বসে পড়ল। কেউ কেউ পায়চারি করতে লাগল। ফ্রান্সিস কাঠের দেয়ালে পিঠ চেপে বসল। পাশে বসল হ্যারি আর বিস্কো। হ্যারি মৃদুস্বরে বলল—আমাদের সাবধান থাকা উচিত ছিল। বিস্কো বলল—'ঈস্—নজরদার যদি একটু আগে বলতো—'

—'ওসব ভেবো—না আর—' ফ্রান্সিস বলল। একটু থেমে বলল—'চারদিক ভালো করে দেখেছি। দরজা ছাড়া আর কোথাও দিয়ে পালাবার উপায় নেই। তবে পা খোলা আছে আর শাঙ্কো বলেছে ওর বড় ছুরিটা ও জামার ভেতর লুকিয়ে রেখেছে। ক'টা দিন যাক। ওদের পাহারা দেওয়ার নিয়ম খাবার দেবার নিয়ম এসব দেখি। তারপর মুক্তির ফন্দী আঁটবো।' আর কেউ কোনো কথা বলল না। লোহার গরাদ দেওয়া দরজার ওপারে তখন আলোর ভাব কমে এসেছে। বাইরে বোধহয় বিকেল হলো।

চার পাঁচ দিন কেটে গেল। মারিয়া ওর গয়নাগাঁটি স্বর্ণমুদ্রা যা ছিল সবই আলবার্তোকে দিয়ে দিয়েছে। এর মধ্যে আলবার্তো মারিয়া যে ভাইকিং রাজার মেয়ে এটা জেনেছে। ও ঠিক করেছে—কোনো বন্দরের ক্রীতদাস কেনা বেচার হাটে ভাইকিংদের বিক্রি করে দেবে। তারপর ভাইকিংদের দেশের বন্দরে যাবে। মারিয়ার মুক্তিপণ হিসেবে দশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা ভাইকিং রাজার কাছে দাবি করবে।

জাহাজ চলল। দিনের পর দিন। ফ্রান্সিসদের একঘেয়ে জীবন কাটতে লাগল কয়েদ ঘরে।

ওদিকে পাঁচ নম্বর কেবিনে মারিয়ারও একঘেয়ে বন্দিনীজীবন কাটছে। মারিয়ার বেশি চিন্তা ফ্রান্সিসদের জন্যে। ও তো তবু আকাশ আলো সমুদ্র দেখতে পায়। ফ্রান্সিসরা তো অন্ধকারে পড়ে আছে। আলবার্তো মারিয়াকে মাত্র একবার ফ্রান্সিসের সঙ্গে দেখা করবার অনুমতি দিয়েছে। আধঘণ্টার জন্যে।

মারিয়া আসে। লোহার দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়। ওর মুখ বিষণ্ণ। ফ্রান্সিসের সঙ্গে কথা হয়। সামান্য কথাবার্তা। দু'জনের কারো কিছুই তো বলবার নেই। যা কিছু কথা এই বন্দীজীবন নিয়েই। মারিয়ার কাছেই ফ্রান্সিস জেনেছিল যে আলবার্তো ওর ক্যারাভেল জাহাজের পেছনে ফ্রান্সিসদের জাহাজটাও বেঁধে নিয়ে চলেছে। মারিয়া কখনও কখনও ফিসফিস করে বলে—'ফ্রান্সিস—এই বন্দীদশা থেকে কি আমাদের মুক্তি নেই?'

ফ্রান্সিসও চাপাস্বরে বলে—'আছে। নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু সেই মুক্তি পেতে হবে আমাদের কারো জীবন বিপন্ন না করে আর সময় সুযোগ বুঝে। ওরা এসব কথা খুব আস্তে বলে, যাতে পাহারাদারদের কানে না যায়। মারিয়া এভাবে প্রতিদিনই আসে। কথা বলে। চলে যায়।

এর মধ্যে ফ্রান্সিসের চারজন ভাইকিং বন্ধু নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে ঠিক করল পালাবে। কথাটা ওরা আর কাউকেই বলল না।

সেদিন রাতে তিনজন জলদস্যু পাহারাদার লোহার শিকের দরজা খুলে খাবার নিয়ে ঢুকল। সেই চারজন ভাইকিং পাহারাদারদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। একজন পাহারাদারকে কাবু করল। কিন্তু হাত বাঁধা অবস্থায় কি লড়াই করা চলে? বাকি দু'জন পাহারাদার তরোয়াল নিয়ে ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ভাইকিং চারজন তরোয়ালের মার ঠেকাবে কী করে? চারজনই তরোয়ালের ঘায়ে আহত হয়ে মেঝেয় পড়ে গেল। তাদের মধ্যে একজন গুরুতর আহত হলো। রক্তাক্ত দেহে ওরা গোঙাতে লাগল। ফ্রান্সিসরা যে ওদের সেবা-শুশ্রূষা করবে তারও উপায় নেই। সবাইর হাত বাঁধা। পাহারাদাররা দরজা বন্ধ করে পাহারা দিতে লাগল।

ফ্রান্সিস একজন পাহারাদারকে ডাকল। সে দরজার কাছে মুখ বাড়াল। ফ্রান্সিস বলল—'আমার বন্ধুদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করো।'

—'ক্যাপ্টেন আলবার্তোর হুকুম না হলে হবে না।' পাহারাদার বলল।

ফ্রান্সিস ভীষণ রেগে গেল। বলল—'এক্ষুণি আলবার্তোকে আসতে বলো।'

—'ক্যাপ্টেন এখন বিশ্রাম করছেন।' পাহারাদার বলল।

ফ্রান্সিস লোহার দরজায় প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে চীৎকার করে বলে উঠল —'আমার আহত বন্ধুরা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে আর উনি বিশ্রাম করছেন?' ফ্রান্সিসের চীৎকার করে বলা কথাগুলো শুনে সব ভাইকিং বন্ধুরা ছুটে লোহার দরজার কাছে এল। সবাই একসঙ্গে চীৎকার করে উঠল—'ও-হো-হো-।' পাহারাদার এই চীৎকার চ্যাঁচামেচিতে বেশ ঘাবড়ে গেল। ওর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে ফ্রান্সিস বলল—'যাও শীগগির।' পাহারাদারটি কী ভাবল কে জানে! ও চলে গেল।

কিছুক্ষণ পরে আলবার্তো লোহার গারদ-আঁটা দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস বলল—'আমাদের চারজন বন্ধু আহত। ওদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।'

আলবার্তো হেসে বলল—'ওরা আমার রক্ষীদের আক্রমণ করেছিল। ফল যা হবার তাই হয়েছে।'

—'কিন্তু ওরা আহত—ওদের চিকিৎসা—।'

আলবার্তো চেঁচিয়ে বলে উঠল—'ওসব হবে না। মরুক ওরা।' ফ্রান্সিসও গলা চড়াল—'যদি বিনা চিকিৎসায় ওরা কেউ মারা যায় তোমাকে আমি ছাড়বো না আলবার্তো। তোমাকে যেখানে যে অবস্থায় পাবো আমি হত্যা করবো।' আলবার্তো হো হো করে হেসে উঠল। বলল—'ঐ স্বপ্ন দেখতে দেখতেই তোমার জীবন এই কয়েদ ঘরে শেষ হয়ে যাবে।' ফ্রান্সিস আগুন-ঝরা চোখে আলবার্তোর দিকে তাকিয়ে রইল। কোনো কথা বলল না। আলবার্তো চলে গেল।

ফ্রান্সিসরা ফিরে এসে নিজেদের জায়গায় বসল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল। কয়েকজন ভাইকিং তখন জলের পাত্র করে জল এনে আহত বন্ধুদের ক্ষতস্থান ধুইয়ে দিচ্ছিল।

নিজেদের পোশাক ছিঁড়ে আহতদের শরীরের ক্ষতস্থান বেঁধে দিল। রক্ত পড়া বন্ধ হলো।

কিছুক্ষণ পরে মারিয়া এল। লোহার গরাদ দেওয়া দরজায় এসে দাঁড়াল। ফ্রান্সিস উঠে একটু দ্রুত পায়েই দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। ফিসফিস করে বলল—'এক্ষুণি আমাদের জাহাজে চলে যাও। বৈদ্য যে কটা ওষুধের বোয়াম আনতে বলে নিয়ে এসো। ফ্রান্সিস মুখ ফিরিয়ে ওদের ভাইকিং বৈদ্যকে ডাকল। বৈদ্য আড়মোড়া ভেঙে উঠল। ফ্রান্সিসের কাছে এল। ফ্রান্সিস গলা নামিয়ে বলল—'মারিয়া আমাদের জাহাজে যাচ্ছে। কী কী ওষুধের বোয়াম আনবে বলে দাও। বৈদ্যও নিচুস্বরে আস্তে আস্তে বলল—'রাজকুমারী আমার কেবিনঘরের তাকে দেখবেন কালো, হলুদ আর নীল রঙের তিনটে বোয়াম আছে। আপনি হলুদ বোয়ামটা থেকে একমুঠো গুঁড়ো একটা কাগজের ঠোঙায় ঢেলে নিয়ে আসবেন।'

—'আমি বোয়ামটাই নিয়ে আসতে পারি।' মারিয়া বলল।

—'তা পারেন। কিন্তু এই কয়েদঘরের দরজায় লোহার শিক লাগানো। এইটুকু ফাঁক দিয়ে বোয়াম ঢুকবে না। আপনাকে প্রত্যেকদিন ঠোঙায় করে লুকিয়ে ওই গুঁড়ো আনতে হবে।' বৈদ্য বলল।

—'মারিয়া দেরি করো না—শীগগির যাও।' ফ্রান্সিস তাগাদা দিল। মারিয়া পাহারাদারদের দিকে তাকিয়ে বলল—'ওদের পোশাক ভীষণ ময়লা হয়ে গেছে। আমি আমাদের জাহাজ থেকে কিছু পোশাক আনতে যাচ্ছি।' পাহারাদার দুজন মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। মুখে কিছু বলল না।

মারিয়া ডেকে উঠে এল দ্রুতপায়ে। একজন জলদস্যুকে দেখল মাস্তুলে ঠেসান দিয়ে ঝিমুচ্ছে। মারিয়া ডাকল—'শুনছো?' লোকটা চোখ মেলল। মারিয়াকে দেখেই একলাফে উঠে দাঁড়াল। তরোয়ালের হাতলে হাত রাখল। মারিয়া হেসে বলল—'লড়াই করতে আসিনি। তুমি তোমাদের দড়ির মইটা ধরো। আমি আমাদের জাহাজে যাবো।'

—'কেন?' জলদস্যু বলল।

—'আমার স্বামী আর বন্ধুরা তো কয়েদঘরে বন্দী হয়ে আছে। ওদের পোশাক নোংরা হয়ে গেছে। কিছু পোশাক আনবো।'

—'কিন্তু ক্যাপ্টেনের হুকুম ছাড়া—'

—'আরে আমি তো পালাচ্ছি না। ক্যাপ্টেনকে পরে আমি বলবোখন।' মারিয়া বলল।

জলদস্যুটা আর কিছু বলল না। জাহাজের পেছন দিকে চলল। জাহাজের পেছনের কাঠের রেলিংয়ের গায়ে একটা দড়ির মই আটকানো। মইটার মাঝে মাঝে কাঠের ফালি বাঁধা। মইটা বাঁধা রয়েছে ফ্রান্সিসদের জাহাজের সঙ্গে। দুটো জাহাজ একটা মোটা কাছিতে বাঁধা। জলদস্যুটি মইয়ের একটা মাথা কাঁধে নিয়ে কাছিটা ধরে ঝুলে ঝুলে ফ্রান্সিসদের জাহাজে উঠল। তারপর কাছিটা একটা হুকএর সঙ্গে আটকে টেনে ধরে রইল। মারিয়া মইয়ের কাঠের ফালিগুলোর ওপর পা রেখে রেখে ফ্রান্সিসদের জাহাজে উঠে এল। প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে মারিয়াকে আসতে হলো। দ্রুতপায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে বৈদ্যর কেবিনঘরে ঢুকল। তাকের দিকে তাকিয়ে খুঁজতে খুঁজতে হলুদ বোয়ামটা পেল। বোয়ামটা নিয়ে মারিয়া নিজের কেবিনঘরে চলে এল। নিজের আর ফ্রান্সিসের কিছু পোশাক নিল। অন্য কেবিনঘরগুলোতে ঢুকে অন্য ভাইকিং বন্ধুদের পোশাকও কিছু নিল। সব পোশাক পেঁচিয়ে বাঁধবার আগে হলুদ বোয়ামটা ভেতরে রেখে দিল। পেঁচিয়ে বাঁধা পোশাকের বোঁচকার মধ্যে রইল বোয়ামটা।

পোশাকের বোঁচকা দেখে জলদস্যুটি কিছু বলল না। মারিয়া মই বেয়ে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ক্যারাভেল জাহাজে ফিরে এল। নিজের কেবিনে ঢুকল। কাপড়ের বোঁচকার মধ্যে থেকে হলুদ বোয়ামটা বের করল। একটা রুমালে হলুদ গুঁড়ো একমুঠো ঢালল। বোয়ামটা কাঠের তাকে লুকিয়ে রাখল। তারপর কাপড়ের বোঁচকার মধ্যে ওষুধ বাঁধা রুমালটা রেখে কয়েদঘরের সামনে এল। চারজন ভাইকিং পালাবার চেষ্টা করেছিল বলে এখন নিয়মে কড়াকড়ি করা হয়েছে। সব ভাইকিংদের হাত খুলে দেওয়া হয়েছে। খাবারদাবার দরজার নিচের একটা ফোকর দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আলবার্তোর হুকুম কোনো কারণেই যেন দরজা খোলা না হয়। মারিয়া কাপড়ের পুঁটলি খুলে একটা করে পোশাক গরাদের ফাঁক দিয়ে ঢুকিয়ে দিতে লাগল। ফ্রান্সিস টেনে নিতে লাগল। হলুদ ওষুধজড়ানো পোশাকটা দেবার সময় মারিয়া বেশ জোরে বলল—'এই পোশাকটা এক্ষুণি পর।' ফ্রান্সিস বুঝল। মৃদু হেসে বলল—'আচ্ছা।' তারপর পোশাকটা নিয়ে বৈদ্যর কাছে এল। পোশাকের ভাঁজ থেকে রুমালে বাঁধা ওষুধটা দিয়ে বলল—'এই যে ওষুধ।' বৈদ্য রুমালের গিঁট খুলে ওষুধটা মেঝেয় ঢালল। বলল—'জল।' একজন ভাইকিং নারকেলের মালায় করে, জল নিয়ে এল। বৈদ্যর নির্দেশমতো হলুদের গুঁড়োর মধ্যে অল্প করে জল ঢালতে লাগল। বৈদ্য গুঁড়োটা মাখতে লাগল। একটু পরেই আঠা আঠার মতো দেখতে হলো। বৈদ্য ওষুধ নিয়ে আহত ভাইকিং ক'জনের ক্ষতে লাগিয়ে দিল। একটু জ্বালা করে উঠেই একটা ঠাণ্ডাভাব লাগল। ওদের ব্যথা অনেক কমে গেল।

পরের ক'দিনই মারিয়া একটা করে পোশাক আনল আর হলুদ গুঁড়ো ওষুধ দিয়ে গেল। তিনজন আহত ভাইকিং মোটামুটি সুস্থ হলো। কিন্তু একজন আহত ভাইকিং ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়ল। ওষুধ লাগানো চলল। কিন্তু ওর বুকের ক্ষতস্থান ফুলে পেকে উঠল। একদিন দুপুরে বাড়াবাড়ি অবস্থা হলো। প্রচণ্ড জ্বরে ওর গা পুড়ে যেতে লাগল। ভাইকিংটি প্রলাপ বকতে লাগল। সন্ধ্যের সময় অজ্ঞান হয়ে গেল। একটু রাত বাড়তে ভাইকিংটি হঠাৎ চোখ বড় বড় করে চারদিকে তাকাতে লাগল। তারপর আস্তে আস্তে চোখ বন্ধ করল। শেষবারের মতো ওর শরীরটা নড়ে উঠে স্থির হয়ে গেল। ফ্রান্সিস মৃত বন্ধুর কাঁধে হাত রাখল। ওর চোখ ফেটে জল এল। দু'হাতে মুখ চেপে ও কেঁদে উঠল। হ্যারি এগিয়ে এসে ওর পিঠে হাত রাখল। সব ভাইকিং বন্ধুরা মুখ নিচু করে বসে রইল। অনেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। ফ্রান্সিস চোখ মুছে হ্যারিকে বলল—'হ্যারি—ও নিজের জীবন দিয়ে আমাদের মুক্তির উপায় করে দিয়ে গেল।' হ্যারি ঠিক বুঝল না। তবে এটা বুঝল ফ্রান্সিস নিশ্চয়ই কিছু ভেবে স্থির করেছে। হ্যারি কোনো কথা বলল না।

ফ্রান্সিস উঠে দাঁড়িয়ে দরজার কাছে গেল। রক্ষীদের বলল—'আমাদের এক বন্ধু মারা গেছে। আলবার্তোকে খবর দাও।' একজন রক্ষী চলে গেল। একটু পরেই কাঠের মেঝেয় জুতোর শব্দ তুলে আলবার্তো এল। পেছনে জলদস্যুদের বৈদ্য। রোগা। পাকা দাড়ি। কয়েদ ঘরের দরজা খোলা হলো। শুধু বৈদ্য ঢুকল। মৃত ভাইকিংটির বুকে কান পাতল। আঙুল দিয়ে চোখ খুলে দেখল। হাতের পায়ের নাড়ি টিপে দেখল। তারপর মাথা নেড়ে মৃদুস্বরে বলল—'মারা গেছে।' কয়েদঘরের বাইরে গিয়ে আলবার্তোকে বলল সে কথা। আলবার্তো ফ্রান্সিসদের দিকে তাকিয়ে বলল—'এখান থেকে পালাবার চেষ্টা করলে এই অবস্থাই হবে। মড়া কালকে সমুদ্রে ফেলা হবে।

ফ্রান্সিস লাফিয়ে উঠল। চীৎকার করে বলল,

—'না আজকে রাতেই মড়া এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে।'

—'কেন?' আলবার্তো বেশ আশ্চর্য হয়েই বলল।

—'আমরা একটা মড়ার সঙ্গে রাত কাটাতে পারবো না।'

আলবার্তো ঠাট্টা করে হেসে বলল—'কিছুক্ষণ আগেও তো ও তোমাদের বন্ধু ছিল।'

—'সে ছিল ছিল। এখন তো একটা মড়া। বিদেয় করো এটাকে।' ফ্রান্সিস বলল।

—'হুঁ-তাই হবে।' আলবার্তো পাহারাওয়ালাদের সে কথা বলল। তারপর চলে গেল।

ফ্রান্সিসের এ ধরনের কথাবার্তায় ভাইকিং বন্ধুরা অবাক হয়ে গেল। ফ্রান্সিসের এ কী কথাবার্তা! এ কী ব্যবহার! বন্ধুদের জন্যে যে ফ্রান্সিস নিজের জীবন দিতে তৈরি থাকে সে এক মৃত বন্ধু সম্পর্কে এরকম কথা বলছে! হ্যারির সহ্য হলো না, ও ফ্রান্সিসের মুখোমুখি দাঁড়াল। দৃঢ়স্বরে বলল—'ফ্রান্সিস সাবধান, মৃত বন্ধু সম্পর্কে এরকম কথা যদি আর একটা বল, তোমাকে আমরা ছেড়ে দেব না।'

ফ্রান্সিস শুধু ফিসফিস করে বলল—'রাত্রি চাই—অন্ধকার চাই।' তারপর ফ্রান্সিস দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে একজন পাহারাদারকে ডাকল। বলল—'আচ্ছা ভাই, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?'

—'কী কথা?' একজন পাহারাদার এগিয়ে এসে বলল।

—'আমার দৃঢ় বিশ্বাস জাহাজটা থেমে আছে অথবা খুব আস্তে চলছে।'

—'আরে—ঠিক বলেছো। দু'দিন যাবৎ হাওয়া পড়ে গেছে—জাহাজ প্রায় চলছেই না। কিন্তু তুমি কী করে বললে?'

—'আমরা ভাইকিং—সমুদ্র জাহাজ এসবের মতিগতি আমরা সহজেই ধরতে পারি।' ফ্রান্সিস তারপর বলল—'তা ভাই দেরি করছো কেন? মড়াটা তাড়াতাড়ি নিয়ে যাও।'

—'তোমাদের রাতের খাওয়া হলেই নিয়ে যাবো।' পাহারাদার জলদস্যুটি বলল।

—'জলদি কর, জলদি কর।' ফ্রান্সিস কথাটা বলে দরজার কাছ থেকে চলে এল।

ফ্রান্সিস দু-একজন ভাইকিং বন্ধুর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করল। কিন্তু এক হ্যারি ছাড়া আর সবাই মুখ ফিরিয়ে রইল। মৃত বন্ধু সম্পর্কে ফ্রান্সিস যা কিছুক্ষণ আগে বলেছে সেটা বন্ধুরা ভুলতে পারেনি। ছিঃ, এত নোংরা মন ফ্রান্সিসের! একটু পরেই পাহারাদাররা রাতের খাবার দিয়ে গেল। প্রায় কেউই বিশেষ খেল না। ফ্রান্সিস কিন্তু পেটপুরে খেল। সব বন্ধুরা দেখল সেটা। ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিল তারপর। একটু পরে একজন পাহারাদার জলদস্যু একটা মোটা কাপড়ের বস্তা গরাদের মধ্যে দিয়ে ভাঁজ করে গলিয়ে দিল। সঙ্গে একটা দড়ি। পাহারাদার বলল—'মড়াটা বস্তায় পুরে মুখ বেঁধে দরজার কাছে রেখে সবাই সরে যাও। আমরা ঢুকে মড়া নিয়ে আসবো। তখন কেউ কাছে আসবে না।

শাঙ্কো বস্তা দড়ি নিয়ে এল। এবার মৃতদেহ এই বস্তায় ভরতে হবে। ফ্রান্সিস ফিসফিস করে ডাকলো—'শাঙ্কো।' শাঙ্কো ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস হাত বাড়িয়ে বলল—'শীগগির ছোরাটা দাও।' শাঙ্কো ঢোলা জামার নিচ থেকে ছুরি বার করে ফ্রান্সিসের হাতে দিল। ফ্রান্সিস সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঢোলা জামায় ছোরাটা ভরে রাখল। সকলের দিকে তাকিয়ে বলল—'তোমরা সব দরজার কাছে গিয়ে ভিড় করে দাঁড়াও যাতে পাহারাদাররা দেখতে না পায় এখানে কী হচ্ছে। সবাই এবার বুঝল ফ্রান্সিস নিশ্চয়ই কোনো ফন্দী এঁটেছে। সবাই দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। ভিড় হয়ে গেল দরজার সামনে। ফ্রান্সিস দ্রুত বস্তাটার মধ্যে ঢুকে পড়ল।


শুকতারার পাঠক-পাঠিকাদের জন্য সুখবর

মঞ্জিল সেন-এর গোরাচাঁদ

১৯৯০-৯১ সালের রাষ্ট্রীয় শিশুসাহিত্য প্রতিযোগিতায়
প্রথম পুরস্কার লাভ করেছে গোরাচাঁদ।
লেখককে আমাদের অভিনন্দন জানাই

ছোটদের জন্যে আমাদের আরও কিছু বই

শিশিরকুমার মজুমদারের —মামাবাবুর অ্যাডভেঞ্চার—৯৲
প্রলয় সেনের—অভিশপ্ত চূণীর—৭৲
মানবেন্দ্র পালের—বাপ্পার অ্যাডভেঞ্চার—৯৲
অজেয় রায়ের—প্রঃ বসুর ফরমূলা—১৪৲
নির্বেদ রায়ের—মুছে গেল পদচিহ্ন—৮৲
ময়ূখ চৌধুরীর—কায়না—২২৲
দেবল দেববর্মার—নিখোঁজ রতন—১০৲
দেবল দেববর্মার—পাহাড়ে আলো জ্বলে—১৪৲
সংকর্ষণ রায়ের—কালনাগিনীর আক্রোশ—৯৲
গজেন্দ্রকুমার মিত্রর—গোবুর নিরুদ্দেশ যাত্রা—১২৲
শংকর রুদ্রর—ভজগোবিন্দর অ্যাডভেঞ্চার—১২৲
সুজিতকুমার সেনগুপ্তর—রক্তমাখা গুপ্তধন—৯৲
সুজিতকুমার সেনগুপ্তর—সুন্দরবনের শয়তান—১২৲
সুজিতকুমার সেনগুপ্তর—আঁধার রাতের প্রহরী—১২৲
অনিল ভৌমিকের—অদৃশ্য জলদস্যু—৯৲
এবং আরও অনেক বই

বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিমিটেড
৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩

বলল—'শাঙ্কো, বস্তার মুখ বেঁধে দাও।' শাঙ্কো তাড়াতাড়ি বস্তার মুখ বাঁধল। ফ্রান্সিস বস্তাবন্দী হলো। হ্যারি বলে উঠল—'সাবাস্ ফ্রান্সিস।' ফ্রান্সিস বস্তার মধ্যে থেকে বলল—'আস্তে।'

বিস্কো শাঙ্কো আর কয়েকজন ভাইকিং বস্তাটা কাঁধে নিয়ে দরজার কাছে এল। একজন পাহারাদার বলল—'মড়া আবার কাঁধে করে নিয়ে আসছো। টেনে হিঁচড়ে আনো।'

—'না আমাদের বন্ধু তো—' হ্যারি বলল—'তা ভাই তোমরাও কাঁধে করে নিয়ে যেও।

—'কাঁধে করে পারবো না। তবে ঝুলিয়ে নিয়ে যাবো।' একজন পাহারাদার বলল।

দরজা খুলে ওরা বস্তাটা ধরল। ঝুলিয়ে নিয়ে চলল। ততক্ষণে একজন পাহারাদার দরজায় তালা লাগিয়ে দিয়েছে।

বস্তাবন্দী ফ্রান্সিসকে চার পাঁচজন জলদস্যু ঝুলিয়ে নিয়ে চলল। সিঁড়ি বেয়ে ডেকে উঠে এল। ডেকে এসে আর ঝুলিয়ে নিল না। ডেকের কাঠের মেঝের ওপর দিয়ে হিড়হিড় করে হিঁচড়ে নিয়ে চলল। ঘষটা লেগে ফ্রান্সিসের মাথার পেছনে পিঠে জ্বালা করতে লাগল। ফ্রান্সিস দাঁত চেপে সহ্য করতে লাগল। মুখে কোনো শব্দ করল না। ডেকের রেলিঙের কাছে এসে দু'জন জলদস্যু বস্তাবন্দী ফ্রান্সিসকে দোলাতে লাগল। তারপর ছুঁড়ে সমুদ্রের জলে ফেলে দিল।

জলে পড়েই বস্তাসুদ্ধ ফ্রান্সিস জলে ডুবে যেতে লাগল। ফ্রান্সিস তৈরিই ছিল। সঙ্গে সঙ্গে জামার তলা থেকে ছোরাটা বের করে মোটা কাপড়ের বস্তায় ঢুকিয়ে দিয়েই জোরে হ্যাঁচকা টান দিল। বস্তা লম্বালম্বি কেটে গেল। ফ্রান্সিস বস্তার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। জলের মধ্যে এইজন্যে ওকে বেশ কিছুক্ষণ দম আটকে থাকতে হলো। মুক্তোর সমুদ্র থেকে মুক্তো আনার জন্যে ফ্রান্সিস মুক্তো শিকারীদের সঙ্গে থেকে দম বেশিক্ষণ রাখার অভ্যেস করেছিল। এখন সেটা কাজে লেগে গেল। হাতে পায়ে জলের মধ্যে কয়েকটা ধাক্কা দিয়েই ও জলের ওপরে ভেসে উঠল। হাঁপাতে লাগল। ওর ভাগ্যও ভালো। দেখল ক্যারাভেল জাহাজ আর ওদের জাহাজ খুব আস্তে আস্তে যাচ্ছে। মৃদু জ্যোৎস্না পড়েছে সমুদ্রের জলে, জাহাজে। বাতাস তেমন জোরে বইছে না। তাই ঢেউও কম।

ফ্রান্সিস ওদের জাহাজটা লক্ষ্য করে সাঁতরাতে লাগল। একটু পরেই ওদের জাহাজের পেছন দিকের জলেডোবা হালটা ধরল। হালের কাঠের খাঁজে খাঁজে পা রেখে

মুখে কোনো শব্দও করতে পারল না।

একটু উঠল। ও তখন বেশ হাঁপাচ্ছে। একটু জিরোল। হাঁপানো একটু কমল। দেখল হাতের কাছে একটা মোটা কাছি ঝুলছে। ফ্রান্সিস কাছিটা বেয়ে বেয়ে আস্তে আস্তে উঠতে লাগল। একসময় হালের গায়ে পা রেখে জাহাজের ডেকে নামল। দেখল ওদের জাহাজের কোথাও আলো জ্বলছে না। ওর গায়ের পোশাক ভিজে সপ্‌সপ্ করছে। সিঁড়ি দিয়ে নামল অন্ধকারে। দ্রুত পায়ে নিজের কেবিন ঘরে ঢুকল। দ্রুত হাতে ভেজা পোশাক ছেড়ে শুকনো পোশাক পরে নিল। দেয়াল থেকে তরোয়ালটা নিয়ে কোমরে গুঁজল। তারপর একটা কাঁচঢাকা লণ্ঠন জ্বালল। সেটা নিয়ে চলল অস্ত্রঘরের দিকে। অস্ত্রঘর খুলল। বিস্কোর জন্যে আর একটা তরোয়াল কোমরে গুঁজে নিল। এবার শাঙ্কোর ধনুকটা নিল কাঁধে, বুকে ছিলাটা চেপে রাখল। কাঁধে ঝোলাল তীরভর্তি তূণীরটা। আলোটা নিয়ে ওপরে ওঠার সিঁড়ির কাছে এল। আলোটা নিভিয়ে ফেলল। আলো জলদস্যুদের নজরে পড়লে বিপদে পড়তে হবে। কাঁচঢাকা লণ্ঠনটা রেখে দিল। ডেকে উঠে এল। দেখল জলদস্যুদের ক্যারাভেলের ডেকে কয়েকটা আলো জ্বলছে। গভীর রাত। জলদস্যুরা নিজেদের কেবিনে ঘুমিয়ে আছে। মাস্তুলের আড়ালে দাঁড়াল ফ্রান্সিস। কিছুক্ষণ লক্ষ্য রেখে দেখল চারপাঁচজন জলদস্যু ডেকে জাহাজ পাহারা দিচ্ছে। দু'জনের হাতে খোলা তরোয়াল। বাকিরা তরোয়াল পাশে রেখে ডেকে বসে আছে।

ফ্রান্সিস ওদের জাহাজের সামনের দিকে এল। চাঁদের আলো খুবই অস্পষ্ট। তবু যদি জলদস্যুরা দেখে ফেলে তাই ও হামাগুড়ি দিয়ে এল। কাঠের ফালি বাঁধা দড়ির মইটা তখনও দু'টো জাহাজের মধ্যে লাগানো ছিল। মারিয়া ঐ দড়ির মই দিয়েই দু জাহাজে পারাপার করেছিল। ফ্রান্সিস হামাগুড়ি দিয়ে দড়ির মইয়ের ওপর দিয়ে এল। নামল জলদস্যুদের ক্যারাভেল-এর ডেকে। একটুক্ষণ অপেক্ষা করল। না, জলদস্যু পাহারাদাররা ওর আসা বুঝতে পারেনি।

ফ্রান্সিস এবার দড়ির মইয়ের হুকটা খুলে দিয়েই জাহাজের অন্ধকার কোণাটায় সরে এল। কাঠবাঁধা মইটা জাহাজের গায়ে গিয়ে লাগল। বেশ জোরে শব্দ উঠল—খট্‌ট্—। খোলা তরোয়াল হাতে একজন জলদস্যু ছুটে এল। জাহাজের হালের কাছে মাথা ঝুঁকিয়ে দেখতে লাগল শব্দটা কিসের। ফ্রান্সিস এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। এক লাফে নিঃশব্দে এগিয়ে এসে জলদস্যুটার ঘাড়ে তরোয়ালের বাঁট দিয়ে এক ঘা মারল। জলদস্যুটি মুখে কোনো শব্দও করতে পারল না। অজ্ঞান হয়ে রেলিঙের মুখ জুড়ে পড়ে রইল। অন্য পাহারাদার জলদস্যুটি দু একবার ওর অজ্ঞান বন্ধুকে ডাকাডাকি করল। তারপর খোলা তরোয়াল হাতে এগিয়ে এল। ফ্রান্সিস বুঝল এর সঙ্গে তরোয়াল নিয়ে লড়তে গেলে তরোয়ালের ঠোকাঠুকির শব্দ হবে। ডেকে বসে থাকা জলদস্যুরা শব্দ শুনে ছুটে আসবে। কাজেই কোনোরকম শব্দ করা চলবে না। নিঃশব্দে কাজ সারতে হবে। ও অন্ধকার থেকে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল। জামার তলা থেকে ছোরাটা বের করল। তারপর পেছন থেকে জলদস্যুটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁ হাত বাড়িয়ে তার মুখ চেপে ধরল যাতে কোনো শব্দ না করতে পারে। তারপর ছোরাটা আমূল ওর পিঠে বসিয়ে দিল। জলদস্যুটা কয়েকবার নড়ে উঠেই স্থির হয়ে গেল। ফ্রান্সিস ওকে ধরে আস্তে আস্তে ডেক-এর ওপর শুইয়ে দিল, যাতে কোনো শব্দ না হয়।

এবার ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল অন্য পাহারাদাররা মৃদুস্বরে নিজেদের মধ্যে গল্প করছে। এত কাণ্ড হলো ওরা কিছুই বুঝতে পারল না।

সিঁড়ির ঘর হাত বারোর মধ্যে। ফ্রান্সিস ডেকের মেঝেয় বুক পেতে শুয়ে পড়ল। তারপর বুক দিয়ে হিঁচড়ে হিঁচড়ে চলল। তারপর নিচে নামায় সিঁড়ির ওপর গড়িয়ে পড়ল। তখনই ফ্রান্সিস শুনল ডেকের জলদস্যুরা ওদের বন্ধু দুজনকে ডাকাডাকি করছে। ফ্রান্সিস বুঝল—আর দেরি করা চলবে না। কাঁচঢাকা আলোয় ও দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল।

কয়েদঘরের সামনে যখন এল তখন ও হাঁপাচ্ছে। দেখল দু'জন জলদস্যু খোলা তরোয়াল হাতে কয়েদঘর পাহারা দিচ্ছে। ফ্রান্সিস ভাবল এদের হত্যা না করে যাতে কয়েদঘরের চাবিটা নেওয়া যায় ও সেই চেষ্টাই করবে। কয়েদঘরের দরজার কাছে একটা কাঁচঢাকা বাতি ঝুলছিল। ফ্রান্সিস কোমর থেকে তরোয়াল খুলল। তরোয়াল উঁচিয়ে ও আস্তে আস্তে পাহারাদার দু'জনের সামনে এসে দাঁড়াল। পাহারাদার দুজন ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। এ কী? এ কী করে গারদঘরের বাইরে এল। তাও হাতে তরোয়াল নিয়ে। পরক্ষণেই ওরা লড়াইয়ের জন্যে তরোয়াল উঁচিয়ে ধরল। ফ্রান্সিস গলা নামিয়ে আস্তে আস্তে বলল—'যদি প্রাণে বাঁচতে চাও আমার সঙ্গে লড়াই করতে এসো না। আমি ফ্রান্সিস তোমাদের মতো দশজনের সঙ্গে লড়াই করে আমার কাছে কিছুই না। গারদঘরটা খুলে দাও। বন্ধুদের মুক্তি দাও। আমি তোমাদের কোনো ক্ষতি করবো না।'

পাহারাদার দু'জন একটু থমকে দাঁড়াল। ওদের মধ্যে একজন তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস একপাক ঘুরে তরোয়াল চালাল বিদ্যুৎবেগে। ওর মাথায় তরোয়ালের কোপ বসে গেল। জলদস্যুটা তরোয়াল ফেলে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। অন্য পাহারাদারটির মুখ মৃত্যুভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ফ্রান্সিস গম্ভীরগলায় বলল—'দরজা খুলে দাও।' লোকটা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কোমরে গোঁজা চাবির তাড়া বের করল। কয়েদঘরের তালা খুলতে লাগল।

ওদিকে হ্যারি সারারাত ঘুমুতে পারেনি। ওর এক চিন্তা—ফ্রান্সিস বস্তা কেটে বেরুতে পারল কিনা, হয়তো পারেনি। এসব বিপদের কথা ভাবছিল। তখনই ও কয়েদঘরের দরজার কাছে ফ্রান্সিসের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। ও আনন্দে লাফিয়ে উঠল। বিস্কো শাঙ্কো অন্য বন্ধুদের ধাক্কা দিতে দিতে চাপাস্বরে বলতে লাগল—'ওঠ—ওঠ—ফ্রান্সিস এসেছে।' দু'জন একজন করে সকলেরই ঘুম ভেঙে গেল। উঠে দাঁড়াতে লাগল সবাই। হ্যারি চাপাস্বরে বলল—'কোনোরকম শব্দ করো না।' তখনই কয়েদঘরের দরজা খুলে গেল। ফ্রান্সিস এক লাফে ঢুকল। কয়েদঘরে ঢুকেই ফ্রান্সিস ঠোঁটে আঙুল রাখল। সবাই আনন্দে চীৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল। ফ্রান্সিসের নির্দেশে সবাই চুপ করে রইল। হ্যারি ছুটে গিয়ে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। ওর চোখে জল এসে গেল।

ছোরাটা আমূল ওর পিঠে বসিয়ে দিল।

ফ্রান্সিস বলল—'পাগলামি করো না। এখন বড় লড়াই সামনে।' ফ্রান্সিস বিস্কোকে তরোয়াল খুলে দিল। শাঙ্কোকে দিল তীর ধনুক। বলল—'ভাইসব, এবার চূড়ান্ত লড়াই। সবাই জলদস্যুদের অস্ত্রাগারে চলে যাও। অস্ত্র নিয়ে প্রত্যেক কেবিনঘরে ঢুকে জলদস্যুদের বন্দী কর। প্রয়োজনে লড়াই কর। তারপর সবাইকে বন্দী করে ডেকে নিয়ে এসো। জল্‌দি। এক মুহূর্ত সময় নষ্ট করো না।'

ওদিকে ডেকের ওপরে যে পাহারাদার তিনজন ছিল তারা মৃত ও আহত বন্ধু দু'জনকে দেখে বুঝল কিছু একটা হয়েছে। ওরা সিঁড়ির দিকে ছুটল কেবিনঘরে ঘুমন্ত বন্ধুদের ডাকতে। কিন্তু সিঁড়ির কাছে আসতেই দেখল খোলা তরোয়াল হাতে ভাইকিংরা দলে দলে উঠে আসছে। ওরা বুঝল এখন লড়াই করতে যাওয়া বোকামি। তবু দু'জন তরোয়াল হাতে রুখে দাঁড়াল। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই আহত হয়ে গড়িয়ে পড়ল। গোঙাতে লাগল। কেবিন থেকে নিরস্ত্র জলদস্যুদের বন্দী করে এনে ডেকে জড়ো করা হলো।

এদিকে ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো খুঁজে মারিয়াকে যে কেবিনঘরে বন্দী করে রাখা হয়েছে সে ঘরটা পেল। দেখল বাইরে তরোয়াল হাতে একজন পাহারাদার দাঁড়িয়ে। পাহারাদারটি কিছু বোঝার আগেই ফ্রান্সিস ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঁ হাতে গলা চেপে ধরল। লোকটা বেরিয়ে আসা চোখে ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল। শাঙ্কো পাহারাদারটির হাত থেকে তরোয়ালটা কেড়ে নিল। ফ্রান্সিস বলল—'যাও ডেকে যাও।' তারপর ওর গলা ছেড়ে দিল। ফ্রান্সিস তখন বেশ হাঁপাচ্ছে। ও এগিয়ে এসে দরজায় টোকা দিল। একবার, দু'বার। মারিয়ার ঘুম ভেঙে গেল। বলল—'কে?' ফ্রান্সিস বলল—'আমি ফ্রান্সিস। শীগ্‌গির দরজা খোল।' দরজা খুলে গেল। মারিয়া হাসতে হাসতে ছুটে এসে ফ্রান্সিসের বাঁহাতটা জড়িয়ে ধরল। বলল—'তুমি—মানে—আমি কী বলবো—।' ফ্রান্সিস হেসে বলল—'কিছু বলতে হবে না। শীগগির ডেকে চলে যাও।—ওখানে সবাই আছে।'

—'কিন্তু তোমরা?'

—'আলবার্তোর সঙ্গে বোঝাপড়া করতে যাচ্ছি। তুমি যাও।' মারিয়া আর কথা বাড়াল না। সিঁড়ির দিকে ছুটল।

ফ্রান্সিস আর শাঙ্কো আলবার্তোর ঘরের সামনে এল। দেখল—দরজা খোলা। একজন জলদস্যু ঘরে দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয় আলবার্তোকে লড়াইয়ের খবর দিতে এসেছে।

হিম্মৎ থাকে তো লড়ো।

জলদস্যু ওদের দেখেই চীৎকার করে উঠল—'ক্যাপ্টেন—ঐ যে।' আলবার্তো দ্রুত এগিয়ে এল। দেখল তরোয়াল হাতে ফ্রান্সিস দাঁড়িয়ে। পেছনে তীরধনুক হাতে শাঙ্কো। আলবার্তো নিজেও তখন যুদ্ধসাজে তৈরি। সোনা দিয়ে বাঁধানো ওর তরোয়ালের হাতল। ও হাতল চেপে এক টানে তরবারি কোষমুক্ত করল। ফ্রান্সিস হেসে বলল—'তাহলে আলবার্তো। তুমি লড়াই চাও?' আলবার্তো কোনো কথা বলে না তরোয়াল হাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত হলো। ফ্রান্সিস বলল—'তোমার জাহাজ এখন আমাদের কব্জায়। সব জলদস্যু বন্দী। এরপরেও তুমি লড়াই করতে চাও।' আলবার্তো ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠল—'হ্যাঁ, হিম্মৎ থাকে তো লড়ো।'

—'বেশ। এখানে এই ছোট ঘরে লড়াই করা অসুবিধে। ডেকে চলো।' ফ্রান্সিস বলল।

আলবার্তোকে আর জলদস্যুটিকে সামনে রেখে ফ্রান্সিসরা সিঁড়ি বেয়ে ডেকে উঠে এল। দেখল—ভোর হয়েছে। নরম রোদ ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে, সমুদ্রের জলে, জাহাজে। একটু পরেই আলবার্তোর সঙ্গে তরোয়ালের লড়াইয়ে নামতে হবে। এই সুন্দর রোদে উজ্জ্বল নীল আকাশ—কতদূর ছড়িয়ে আছে। শান্ত সমুদ্রের জলে রোদের নাচন—ফ্রান্সিসের মনটা কেমন যেন করে উঠল। এই অপূর্ব সুন্দর পরিবেশে লড়াই—রক্তপাত—হত্যা? ওর মন মানল না। শেষবার চেষ্টা করতে হবে যাতে এই অমানবিক রক্তপাত হত্যা এড়ানো যায়।

কিন্তু আলবার্তো নির্বিকার। ডেকে দাঁড়িয়ে ও তরোয়াল ওঠাল। ওর মুখ কঠিন। চোখে হত্যার নেশা। মুখ বেঁকিয়ে হেসে বলল—'ফ্রান্সিস কী হলো? তৈরি হও।' ফ্রান্সিস কোনো কথা বলল না। তরোয়াল নামিয়ে রাখল।

—'কী হলো বীর ভাইকিং? ভয় পেয়ে গেলে?' আলবার্তো বলল। ফ্রান্সিসের চোখ দু'টো যেন জ্বলে উঠল। কিন্তু মনকে শান্ত করল। বলল—'আলবার্তো, আমি জানি তুমি নরঘাতক। অনেক নিরীহ মানুষকে তুমি হত্যা করেছো। ক্রীতদাসের হাটে বিক্রি করার জন্যে নিরীহ মানুষদের কয়েদঘরে জানোয়ারের মতো দীর্ঘদিন বন্দী করে রেখেছো। সেই তোমাকে আমার অনুরোধ—যে জীবন তুমি কাটিয়েছো, সেই জীবনের কথা ভুলে যাও। নতুন করে সৎ মানুষের মতো বাকি জীবনটা কাটাও। মানুষকে হত্যা নয়—মানুষকে ভালোবাসতে শেখ। মানুষের সেবা কর, দুঃখী-অভাবী মানুষদের দুঃখ দূর কর, অভাব দূর কর। তোমার ধনসম্পত্তি তো কম নয়।'

আলবার্তো হো হো করে হেসে উঠল। বলল—'ফ্রান্সিস—তুমি সত্যি ভয় পেয়ে গেছো।'

ফ্রান্সিস মৃদু হাসল। বলল—'আলবার্তো তোমাকে আমি বাঁচার সুযোগ দিয়েছিলাম। কিন্তু তুমি বুঝলে না। তোমার মতো নরপশুরা জীবনের উজ্জ্বল দিক কোনোদিন দেখতে পায়না। যাকগে—তুমিই আমাকে লড়াইয়ে নামালে। আমার কোনো দায়িত্ব রইল না।'

ফ্রান্সিসের কথা শেষ হতে না হতেই আলবার্তো তরোয়াল উঁচিয়ে ফ্রান্সিসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ফ্রান্সিস দ্রুত হাতে আলবার্তোর তরোয়ালের মার ঠেকাল। শুরু হলো দু'জনের তরোয়ালের লড়াই। ডেকের একপাশে বসে আছে নিরস্ত্র জলদস্যুর দল। অন্য পাশে দাঁড়িয়ে আছে সশস্ত্র ভাইকিংরা আর মারিয়া। মারিয়া শুনেছে তরোয়াল চালনায় ফ্রান্সিস সবার সেরা। কিন্তু কোনোদিন ফ্রান্সিসের তরোয়াল লড়াই দেখেনি। আজকে সেই সুযোগ এল। মারিয়া এমনিতে খুব শক্ত মনের মেয়ে। কিন্তু আজকে ও একটু আশঙ্কাই বোধ করল। কারণ ও ঠিক বুঝল যে আলবার্তো সুযোগ পেলে ফ্রান্সিসকে হত্যা করতে পিছপা হবে না। আলবার্তো বার বার আক্রমণ করতে লাগল। ফ্রান্সিস এদিক ওদিক সরে যেতে লাগল। তরোয়ালের মার

ঠেকাতে লাগল। ও চাইছিল যাতে আলবার্তো অল্পক্ষণের মধ্যেই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে। আলবার্তো সত্যিই ক্লান্ত হয়ে পড়ল। মুখ হাঁ করে শ্বাস নিতে লাগল। আলবার্তোর একটা তরোয়ালের মার ঠেকাতে গিয়ে ফ্রান্সিস ঘুরে দাঁড়াতে গেল। তখনই আলবার্তো তরোয়াল ঘুরিয়ে নিয়ে অন্য দিক থেকে তরোয়াল চালাল। তরোয়ালের চকচকে ফলাটা ফ্রান্সিসের বাঁ বাহু ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। পোশাকটা কেটে তরোয়াল বসে গেল। অনেকটা কেটে গেল। রক্তের ধারা বইল। মারিয়া চীৎকার করে উঠল। ফ্রান্সিস একবার ক্ষতস্থানের দিকে তাকিয়ে দেখল। তারপর প্রচণ্ড বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল আলবার্তোর ওপর। এবার আর আত্মরক্ষা নয়। ফ্রান্সিস আক্রমণ করল। ফ্রান্সিসের তরোয়ালের মার ঠেকাতে ঠেকাতে আলবার্তো ভালো করেই বুঝতে পারল এ বড় কঠিন ঠাঁই। মারিয়া ফ্রান্সিসের নিপুণ তরোয়াল চালানো দেখে অবাক হয়ে গেল। কী অনায়াস ভঙ্গীতে ফ্রান্সিস তরোয়াল চালাচ্ছে। বিদ্যুৎগতিতে স্থান পরিবর্তন করছে। কিন্তু পিছোচ্ছে না। একইভাবে আক্রমণের চাপ রাখছে।

অল্প সময়ের মধ্যেই ভীষণ পরিশ্রান্ত আলবার্তোর হাত অবশ হয়ে এল। তরোয়াল আর হাতের বশে রইল না। ও এলোমেলো তরোয়াল চালাতে লাগল। ফ্রান্সিস এই সুযোগ ছাড়ল না। এক পাক দ্রুত ঘুরেই শরীরের সমস্ত শক্তি নিয়ে তরোয়ালের এক ঘা মারল আলবার্তোর তরোয়ালে। আলবার্তোর হাত থেকে তরোয়াল ছিটকে গিয়ে মাস্তুলের কাঠে বিঁধে গেল। বেঁধা অবস্থায় তরোয়ালটা দুলতে লাগল। নিরস্ত্র আলবার্তো দু'হাত ওপরে তুলে হাঁপাতে লাগল। ওর চোখে মুখে মৃত্যুভয় ফুটে উঠল। ফ্রান্সিস শেষ আঘাতের জন্য তরোয়াল তুলল। ফ্রান্সিসও হাঁপাচ্ছে তখন। কিন্তু তরোয়াল চালাল না। আস্তে আস্তে তরোয়াল নামাল। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—'তোমার জাহাজ আর তোমার দলবল নিয়ে যাও—এক্ষুণি—এই তল্লাট ছেড়ে পালাও।' ফ্রান্সিস ঘুরে দাঁড়াল। কেউ লক্ষ্য করেনি যে আলবার্তোর কোমরের বেল্ট-এ একটা ছোরা গোঁজা আছে। এইবার আলবার্তো দ্রুতহাতে ছোরাটা টেনে বের করল। সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সিসকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ল। শাঙ্কো আলবার্তোকে কোমরে হাত দিতে দেখেই বুঝেছিল ওর উদ্দেশ্য কি। আলবার্তো ছোরা ছুঁড়ে মারার সঙ্গে সঙ্গে শাঙ্কো ফ্রান্সিসের পিঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল। দু'জনে জড়াজড়ি করে ডেকের ওপর পড়ে গেল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ছোরাটা পাক খেতে খেতে সমুদ্রের জলে পড়ে গেল। শাঙ্কো সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। তখনই মাস্তুলের ওপর বসে থাকা নজরদার চেঁচিয়ে বলল—'ডাঙা দেখা যাচ্ছে—ডাঙা।'

সকলেই হৈ হৈ করে উঠে জাহাজের রেলিঙের কাছে এসে জড়ো হলো। সত্যি দূরে বিস্তীর্ণ বালির তটরেখা দেখা যাচ্ছে। এই হৈচৈ-র মধ্যে আলবার্তো জাহাজের রেলিঙে দ্রুত উঠে পড়ল। উদ্দেশ্য সমুদ্রের জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়া। কারণ কাছেই সমুদ্রতীর। সাঁতরে পালাতে পারবে। কিন্তু আলবার্তো শাঙ্কোর নজর এড়াতে পারেনি। শাঙ্কো অতি দ্রুত ধনুকে তীর পরিয়েই তীর ছুঁড়ল। একেবারে নিখুঁত নিশানা শাঙ্কোর। তীর আলবার্তোর পিঠে বিঁধে গেল। আলবার্তো দু'হাত ওপরে তুলে ছিটকে সমুদ্রের জলে পড়ে গেল। ডেক থেকে ভাইকিংরা ও জলদস্যুর দল দেখল যে আলবার্তো আর ভেসে উঠল না। জলে যেখানে আলবার্তো পড়েছিল সেখানে জলটায় একটু লাল রঙ লাগল।

হ্যারি আস্তে আস্তে ফ্রান্সিসের কাছে এল। বলল—'ফ্রান্সিস, আমাদের এক বন্ধুর মৃতদেহ এখনও কয়েদঘরে পড়ে আছে।' ফ্রান্সিস দ্রুত বলে উঠল—'সত্যিই তো। তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়নি।' কথাটা বিস্কোর কানে গেল। বলল—'আমরা কয়েকজন যাচ্ছি।'

একটু পরেই বিস্কোরা কয়েদঘর থেকে বন্ধুর মৃতদেহ ডেকে এনে শুইয়ে দিল। সবাই চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়াল। ভাইকিংদের মধ্যে যে ধর্মযাজকের কাজ করে সে এগিয়ে এল। তার গলায় ঝুলছে একটা ভাঁজ করা চাদরের মতো। হাতে একটা চামড়ার ছেঁড়াখোঁড়া বাইবেল। ওটার পাতাগুলো সব খোলা। ভাইকিং যাজক তাই থেকে একটা পাতা খুলে বিড়বিড় করে কি পড়ল। সবশেষে বলল—'আমেন।' তখন মৃতদেহটি একটা মোটা কাপড়ের থলেতে ঢোকানো হলো। মাথার দিকে বেঁধে দেওয়া হলো। দু'জন ভাইকিং মৃতদেহটি নিয়ে জাহাজের রেলিঙ-এর ধারে গেল। মৃতদেহটি দোলাতে দোলাতে সমুদ্রের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিল। সকলেরই মন খারাপ হয়ে গেল। কেউ কোনো কথা বলল না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

নিরস্ত্র জলদস্যুর দল থেকে একজন যুবক জলদস্যু ফ্রান্সিসের সামনে এসে দাঁড়াল। বলল—'আমাদের ক্যাপ্টেন মারা গেছে। এখন আমরা কি করবো?'

ফ্রান্সিস হ্যারিকে ডেকে বলল—'এখন এই জলদস্যুদের নিয়ে কি করবে?'

—'ওদের মুক্তি দেব—ওদের ক্যারাভেল জাহাজ নিয়ে ওরা চলে যাবে। কিন্তু একটি প্রতিজ্ঞা ওদের করতে হবে বাকি জীবনে আর ওরা জলদস্যুতা করবে না। দেশে ফিরে সৎ জীবনযাপন করবে।'

ফ্রান্সিস যুবকটির দিকে তাকাল। বলল—'কী? এই শর্তে তোমরা রাজী?'

—'হ্যাঁ আমরা রাজী।' যুবকটি বলল।

—'কিন্তু একটা সমস্যার সমাধান এখনই করতে হবে।' হ্যারি বলল।

—'কী সমস্যা?' ফ্রান্সিস বলল।

—'দেখ—আলবার্তোর কেবিন ঘরে নিশ্চয়ই লুণ্ঠিত ধনসম্পদ রয়েছে। এখন আলবার্তো মারা গেছে। ঐ লুঠ করা ধনসম্পত্তির মালিকানা নিয়ে এবার এই জলদস্যুদের নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি শুরু হয়ে যাবে।'

ফ্রান্সিস একটু ভাবল। বলল—'কথাটা সত্যি। এই ধনসম্পত্তির কী হবে?'

শাঙ্কো বলল—'আমরা দখল করবো।'

—'না শাঙ্কো,' ফ্রান্সিস মাথা নেড়ে বলল—'অনেক নিরীহ মানুষের রক্তে ভেজা, চোখের জলে ভেজা ঐ অভিশপ্ত ধনসম্পদ আমরা কোনোমতেই নেব না। হ্যারিকে দায়িত্ব দিচ্ছি—হ্যারিই ঐ ধনসম্পদ জলদস্যুদের মধ্যে যতটা সম্ভব সমান ভাগে ভাগ করে দেবে।'

—'বেশ।' হ্যারি রাজী হলো। জলদস্যু যুবকটিকে হ্যারি বলল—'চলো—তোমাদের সঙ্গে কথা আছে।' যেখানে জলদস্যুরা বসে আছে যুবকটিকে নিয়ে হ্যারি সেদিকে গেল।

মারিয়া এগিয়ে এল ফ্রান্সিসের কাছে। বলল—'তুমি আহত। কাটা জায়গা থেকে এখনও রক্ত পড়ছে। তুমি কেবিনে চলো। তোমার বিশ্রামও দরকার।'

—'হ্যাঁ চলো।' ফ্রান্সিস বলল। তারপর বিস্কোকে বলল—'বিস্কো, আমাদের জাহাজ চালককে বলো আমাদের জাহাজটা তীরের যতটা কাছে সম্ভব যেন নিয়ে যায়।

দুপুরের খাওয়ার সময় হ্যারি ফিরে এল। ফ্রান্সিসকে বলল—'ভাগ বাঁটোয়ারা করে দিয়ে এসেছি। এবার কী করবে?'

—'ওদের ক্যারাভেল জাহাজের সঙ্গে আমাদের জাহাজ যে দড়িটা দিয়ে বাঁধা সেটা শাঙ্কোকে কেটে দিতে বল। জলদস্যুরা ওদের জাহাজে চড়ে দেশে ফিরে যাক।'

তাই করা হলো। জলদস্যুদের মুক্তি দেওয়া হলো। ওরা ওদের ক্যারাভেল জাহাজে তাড়াতাড়ি পাল খাটাল। হাওয়ার তোড়ে পাল

ফুলে উঠল। ওদের জাহাজ গভীর সমুদ্রের দিকে চলল। ডেকে দাঁড়িয়ে ফ্রান্সিসরা তা দেখল।

কিছুক্ষণ পরে রসুইঘর আর ভাঁড়ার ঘরের দায়িত্ব যে তিনজন ভাইকিং-এর হাতে ছিল তারা ফ্রান্সিস আর হ্যারির কাছে এল। একজন বলল—'এবার কি দেশে ফিরবে?'

—'হ্যাঁ।' ফ্রান্সিস বলল। অন্য ভাইকিংটি বলল—'কিন্তু আমরা জানি না আমরা কোথায় এসেছি। তীরের যে বালিয়াড়ি দেখছি তাতে বুঝতে পারছি না এটা কোনো দেশ না, দ্বীপ। দিক ঠিক করে দেশে ফিরতে আমাদের কতদিন লাগবে জানি না।'

—'তা তো ঠিকই।' হ্যারি বলল।

অন্য ভাইকিংটি বলল—'ভাঁড়ারঘরে যা ময়দা চিনি খাবার-দাবার আছে তাতে তবু কিছুদিন চলবে। কিন্তু খাবার জলের পরিমাণ অনেক কমে গেছে। কিছু খাবার জল না যোগাড় করতে পারলে সাংঘাতিক সমস্যায় পড়ে যাবো।'

ফ্রান্সিস হ্যারি দু'জনেই ভাবল কিছুক্ষণ। হ্যারিই প্রথমে বলল—'ফ্রান্সিস, যে ডাঙাটা দেখা যাচ্ছে ওখান থেকেই খুঁজে পেতে খাবার জল যোগাড় করতে হবে। তারপর দিক ঠিক করে দেশের দিকে পাড়ি দেব।'

—'ঠিক বলেছো তোমরা —ফ্রান্সিস বলল—'তাহলে কালকেই আমরা তীরে নামবো। দ্বীপ হোক আর দেশই হোক খাবার জল খুঁজে বার করতেই হবে।'

পরদিন সকালের খাবার খেয়েই ফ্রান্সিস বিস্কো আর শাঙ্কোকে তৈরি হয়ে আসতে বলল। বিস্কো তরোয়াল নিয়ে এল আর শাঙ্কো তীর ধনুক নিয়ে এল। মারিয়াও ভালো পোশাক পরে তৈরি হয়ে এল। মারিয়ার যাওয়ার ব্যাপারে ফ্রান্সিস দু'একবার আপত্তি জানাল। কিন্তু মারিয়া জেদ ধরল ও ওদের সঙ্গে যাবেই। অগত্যা ফ্রান্সিস আর আপত্তি করল না।

জাহাজের গায়ে ঝোলানো একটা শক্তপোক্ত নৌকো জলে নামানো হলো। দড়ি বেয়ে বেয়ে ফ্রান্সিসরা জাহাজ থেকে নৌকোয় নেমে এল। মারিয়াকে নামানো হলো দড়ির জালে দাঁড় করিয়ে। খাবার-দাবার, খাওয়ার জল এসব প্রয়োজনীয় জিনিস আগেই নৌকোয় রাখা হয়েছিল আর দু'টো জল রাখবার খালি পিপে। মারিয়া নেমে আসতেই বিস্কো নৌকো ছেড়ে দিল। বিস্কো আর শাঙ্কো নৌকো বাইতে লাগল তীরভূমি লক্ষ্য করে।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই নৌকো তীরে ভিড়ল। ফ্রান্সিসরা নামল। মারিয়া কিন্তু কারো সাহায্য ছাড়াই নৌকো থেকে লাফিয়ে নামল। সবাই বিস্তীর্ণ বেলাভূমির বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগল।

অনেকটা হাঁটার পর ওরা থামল। দেখল যতদূর চোখ যায় শুধু ধুধু বালির প্রান্তর। ওরা আবার হাঁটতে শুরু করল।

সাদা-ধূসর রঙের বালি। কোনোদিকে সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। দু'একটা পাখি মাঝে মাঝে বালিতে ছায়া ফেলে উড়ে যাচ্ছে। তীব্র রোদ—বালিতে প্রতিফলিত হয়ে চোখে এসে লাগছে। ধাঁধিয়ে যাচ্ছে চোখ। গরম হাওয়া বইছে।

কিছুক্ষণ চলার পর ওদের নজরে পড়ল ক্ষয়িত শিলার কালচে পাহাড়। বেশি উঁচু নয়। তার ওপাশে কিছু সবুজ গাছগাছালির মাথা দেখা গেল। ফ্রান্সিস আশ্বস্ত হলো—যাক মরুভূমির মতো জায়গাটা খুব দূরবিস্তৃত নয়।

টানা পাহাড়ের কাছে এল ওরা। পাথরে পা রেখে রেখে ওরা পাহাড়টায় উঠল। দেখল ওপাশে একটু দূর থেকে বনভূমি শুরু হয়েছে। খুব ঘন বন নয়। ছাড়া ছাড়া। দূরে কিছু ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে। ছাইকাদা দিয়ে গেঁথে গেঁথে তৈরি বাড়ি। ছাদ পেইকো ঘাসের। ফ্রান্সিস বলল—'মানুষের বসতি আছে দেখছি। চলো ওখানেই জলের খোঁজ করা যাক।' ওরা পাথরের চাঁইয়ে পা রেখে রেখে নামতে লাগল। ফ্রান্সিস অবশ্য মারিয়াকে হাত ধরে সাহায্য করতে লাগল। মারিয়া প্রায় নেমেই এসেছিল, হঠাৎ একটা পাথরের টুকরোয় পা রাখতে টুকরোটা সরে গেল। মারিয়া টাল সামলাতে পারল না। পাথরের চাঁইয়ের মাথা থেকে নিচে পড়ে গেল একটা বড় গহ্বরের মধ্যে। ভাগ্য ভালো—নিচে ছিল বালি। মারিয়ার বালির ওপর দু'পা পড়ল। ওর শুধু হাতটা একটু ছড়ে গেল। পাথরের চাঁইয়ের ধারে এসে ফ্রান্সিসরা হাঁটু গেড়ে বসে নিচে তাকাল। গহ্বরটা একটু অন্ধকারই, তবু দেখল মারিয়া উঠে দাঁড়িয়েছে। ফ্রান্সিস ডেকে বলল—'মারিয়া—তোমার কি খুব লেগেছে?'

মারিয়া হেসে বলল—'কিছছু না।'

—এবার ফ্রান্সিস অন্যদের দিকে তাকাল। বলল—'এখন মারিয়াকে তোলা যায় কী করে?'

—'জাহাজ থেকে দড়ি আনতে হবে।' বিস্কো বলল।

ওদিকে মারিয়া গহ্বরটার চারদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল। একটু অন্ধকার হলেও পাথুরে দেয়াল খোঁদল এসব দেখতে পাচ্ছিল। হঠাৎ চোখে পড়ল একটা গুহার মুখ। মুখটা বেশ বড়। একজন মানুষ মাথা উঁচু করে ঢুকতে পারবে। মারিয়া আস্তে আস্তে গুহাটার মুখে এসে দাঁড়াল। দেখল কাঠের ফালি দিয়ে তৈরি একটা দরজা গুহার মুখটায়। তার মানে এই গুহায় নিশ্চয়ই মানুষ থাকে। তাহলে এই গহ্বর থেকে বেরোবার পথও নিশ্চয়ই আছে। মারিয়া চারদিকে ঘুরে ঘুরে পথ খুঁজতে লাগল। কিন্তু পথ কোথায়? চারদিকেই পাথরের অমসৃণ গা। হঠাৎ একটা জায়গায় দেখল যেন ওখানে অন্ধকারটা কম। মারিয়া দ্রুতপায়ে সেখানে এল। দেখল দু'টো পাথরের চাঁইয়ের মাঝখানে একটা ফাটল। মারিয়া বালির ওপর হাঁটু মুড়ে বসল। তারপর বালির ওপর হামাগুড়ি দিয়ে ফাটলের মধ্যে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল। তার মানে এই গুহায় যে বা যারা থাকে তারা এই পথেই যাতায়াত করে। লুকিয়ে থাকার পক্ষে ভালো জায়গা।

মারিয়া বাইরে পাথরের চাঁইয়ের নিচে এসে দাঁড়াল। চেঁচিয়ে ডাকল—'ফ্রান্সিস।' বিস্কো তখন জলের খালি পিপে রেখে জাহাজ থেকে দড়ি আনতে যাবে বলে তৈরি হচ্ছে। তখনি মারিয়ার ডাক ওদের কানে গেল। ওরা তাড়াতাড়ি পাথরের চাঁই থেকে নেমে এল। দেখল মারিয়া দাঁড়িয়ে আছে। মারিয়া বলল—'এই গহ্বরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার পথ আছে।'

—ভালোই হলো,' ফ্রান্সিস বলল—'আমরা তোমাকে দড়ি দিয়ে তুলবো ভাবছিলাম।'

—'ফ্রান্সিস—এর ভেতরে একটা গুহা আছে। গুহার মুখে কাঠের দরজা আছে। মনে হয় মানুষ বাস করে।' মারিয়া বলল।

—'বলো কি!' ফ্রান্সিস একটু আশ্চর্য হলো।

বিস্কো বলল—'চলো না ফ্রান্সিস—দেখা যাক।'

সবাই হামাগুড়ি দিয়ে ফাটল পেরোল। গুহার মুখে এসে দাঁড়াল। ফালি কাঠের দরজাটা একটুকরো দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল। ফ্রান্সিস খুলল দড়িটা। তারপর একে একে সবাই গুহাটায় ঢুকল। ভেতরটা বেশ অন্ধকার। চোখে অন্ধকার ভাবটা সয়ে আসতে ওরা দেখল—গুহার একপাশে শুকনো ঘাসের বিছানা। তার ওপর মোটা কাপড়ের কম্বলমতো পাতা। অন্য পাশে পোড়া হাঁড়িকুড়ি, পাথরের টুকরো পেতে উনুন। একপাশে এলগারোবো গাঁছের বাঁকা কাণ্ড কুঁদে কুঁদে তৈরি বিচিত্র সব মূর্তি। এসব কী মূর্তি ফ্রান্সিসরা বুঝল না। আবার মা-ছেলে, বিয়ের বর-কনে এসবের মূর্তিও আছে। ওরা বুঝল এখানে একজন মানুষই থাকে। বিছানায় একটা মাত্র ঢিলেঢালা পোশাক পঞ্চো পড়ে আছে। সব দেখেটেখে ফ্রান্সিস বলল—'চলো, আর কিছু দেখার নেই। তবে লোকটাকে পেলে এখানে

জলের সন্ধান পাওয়া যেত।'

ওরা গুহার বাইরে আসতেই একজন মধ্যবয়স্ক লোকের মুখোমুখি পড়ল। লোকটা ভীষণভাবে চমকে উঠল। ও বোধহয় ওর গোপন আস্তানা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ছিল। লোকটা দ্রুত পেছন ফিরল। পালাবার ধান্ধা। বিস্কো জোরে ছুটে গিয়ে লোকটার ঢিলেঢালা পোশাক পঞ্চোটা পেছন থেকে চেপে ধরল। লোকটার পালানো হলো না। বিস্কো লোকটাকে ধরে ফ্রান্সিসের কাছে নিয়ে এল। লোকটা বেশ ভয় পেয়ে গেছে বোঝা গেল। লোকটা কাছে আসতে ফ্রান্সিস হেসে হাত তুলে ওকে ভয় না পেতে ইঙ্গিত করল। লোকটা যেন একটু নিশ্চিন্ত হলো। ফ্রান্সিস কথা বলতে গিয়ে সমস্যায় পড়ল। কী ভাষা বুঝবে লোকটা? ফ্রান্সিস প্রথমে পোর্তুগীজভাষায় জিজ্ঞেস করল—'তোমার নাম কী?' লোকটা বুঝল না। তাকিয়ে রইল। এবার ফ্রান্সিস স্প্যানিশ ভাষায় বলল—'তোমার কোনো ভয় নেই। তোমার নাম বলো।' লোকটার চোখমুখ উজ্জ্বল হলো। বোঝা গেল ও ফ্রান্সিসের কথা বুঝেছে। লোকটা ভাঙা ভাঙা স্প্যানিশ ভাষায় বলল,—'আমি মেস্তিজো—চিকামাদের দেবতার পূজারী।'

ফ্রান্সিস এবার ভালোভাবে মেস্তিজোকে দেখল। মেস্তিজোর মাথায় লম্বা লম্বা চুল। মুখের দু'পাশের আধখানায় হলুদ রঙ মাখা। দু'কানের লতিতে সোনার কাঠি বেঁধানো। পরনে ঢিলেঢালা পঞ্চো পোশাক ওর একহাতে একটা ঘাসের তৈরি ঝুড়ি তাতে ক্যারোপ বীনএর বেশ কয়েকটা রুটি। অন্য হাতে একটা চীনেমাটির কুঁজো মতো। বোঝা গেল খাবার জল তাতে। ফ্রান্সিস নিশ্চিন্ত হলো যে মেস্তিজোর হাতে অস্ত্র নেই। তার মানে সে যোদ্ধা নয়। ফ্রান্সিস বলল—'মেস্তিজো, তোমার কোন ক্ষতি আমরা করবো না। আমাদের জাহাজ সমুদ্রতীরে রয়েছে। আমরা পানীয় জল নিতে এসেছি। তুমি পানীয় জলের জায়গাটা দেখিয়ে দাও।' ফ্রান্সিস কথাগুলো থেমে থেমে বলল যাতে মেস্তিজো সহজে বুঝতে পারে।

মেস্তিজো মাথার লম্বা লম্বা চুল ঝাঁকিয়ে বলল—'চলো—জলের জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছি।' ফ্রান্সিস বিস্কো আর শাঙ্কোর দিকে তাকিয়ে বলল—'তাহলে তোমরা ওর সঙ্গে যাও। জল নিয়ে এসো।'

মেস্তিজো হাতের খাবারের ঝুড়ি জলের কুঁজো ওর গুহাঘরে রেখে এল। তারপর জলের জায়গা দেখাতে চলল। পেছনে পিপে নিয়ে বিস্কো ও শাঙ্কো চলল। ফ্রান্সিস বলল—'মারিয়া—চলো আমরা গুহাঘরে গিয়ে

চিমু সেনাদের নিয়ে মোচিকা সাম্রাজ্য আক্রমণ করল।

বসি।' দু'জনে এসে ফালি কাঠের দরজা খুলে গুহায় ঢুকল। খড়ের বিছানায় গিয়ে বসল দু'জনে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বিস্কোরা পিপে ভর্তি জল নিয়ে ফিরে এল। এদিকে বেশ বেলা হয়ে গেছে। সকলেরই খিদে পেয়েছে। জাহাজ থেকে খাবারদাবার আনা হয়েছিল। মারিয়া সে সব খাবার সবাইকে ভাগ করে দিল। মেস্তিজোকেও দেওয়া হলো। মেস্তিজো খুব খুশি। ফ্রান্সিস বলল—'মেস্তিজো—আমি তোমার খাবার খাবো। তুমি আমাদের খাবার খাও।'

মারিয়াও মেস্তিজোর খাবার খেতে চাইল। মেস্তিজো ঘাসে তৈরি ঝুড়ি থেকে রুটি, সামুদ্রিক মাছ, বীন, লঙ্কামেশানো আলুর তরকারি বের করে দিল ফ্রান্সিস মারিয়া খেতে লাগল। নতুন ধরনের খাবার দু'জনেরই ভালো লাগল।

খাওয়াদাওয়ার পর মেস্তিজো বিছানায় পাতা কাপড় তুলে খড়গুলো গুহার মেঝেয় আরও জায়গায় ছড়িয়ে দিল। তারপর দু'টো কম্বলমতো মোটা কাপড় পেতে দিল। ফ্রান্সিসরা সবাই বসল তাতে। শাঙ্কো শুয়ে পড়ল, বিস্কো আধশোয়া হলো। ফ্রান্সিস, মারিয়া আর মেস্তিজো বসে রইল। এতক্ষণ ফ্রান্সিস ভাবছিল—মেস্তিজোর কথা। স্পেনীয় ভাষায় কথা বলে অথচ আচার আচরণে মোটেই স্পেনীয়দের মতো নয়। ওর আসল পরিচয়টা কী? এই গোপন গুহাঘরে লুকিয়ে থাকে কেন? ফ্রান্সিস ডাকল—'মেস্তিজো?'

—'বলুন।'

—'দেখ, তোমার ভাষা শুনে বুঝছি তুমি স্পেনীয়। অবশ্য তোমার কথা কিছুটা ভাঙা ভাঙা তবু ভাষাটা তো স্পেনীয়। তাছাড়া তুমি আমার স্পেনীয় ভাষাও বুঝতে পারছো। অথচ তোমার এখনকার চেহারা মোটেই স্পেনীয়দের মতো নয়। কী ব্যাপার বলো তো?' ফ্রান্সিস বলল।

মেস্তিজো আস্তে আস্তে ভাঙা ভাঙা স্পেনীয় ভাষায় বলতে লাগল—'সে অনেকদিন আগের কথা। আমার বয়েস তখন ছয় সাত। স্পেনের ডিমেলো শহরে বাবা-মার সঙ্গে থাকতাম এটুকু আমার মনে আছে। বাবা মালবাহী জাহাজে কাজ করতেন। তখন একবার বাবা-মার সঙ্গে আমিও সমুদ্রযাত্রায় বেরোলাম। মাস চার পাঁচ জাহাজেই কাটল। ঝড়-ঝাপ্টায় আমাদের

জাহাজ বার কয়েক প্রায় ডুবে যাচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঝড়ের সঙ্গে লড়াই করে আমরা বেঁচে থেকেছি। জাহাজ ডোবেনি। কিন্তু শেষরক্ষা হলো না।

যে সমুদ্রতীরে আপনাদের জাহাজ নোঙর করা তার তীরভূমিকে বলে চালা। এই চালাকে প্রায় মরুভূমিই বলা যায়। এই চালার কাছাকাছি এসে আমাদের জাহাজ পড়ল এক প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে। প্রায় আশীজন নাবিক প্রাণপণ লড়াই করল ঝড়ের সঙ্গে। তাদের মধ্যে বাবাও ছিলেন। শেষপর্যন্ত জাহাজ ভেঙে চৌচির হয়ে গেল। গভীর ঝড়ো সমুদ্রে ছিটকে পড়লাম আমি। ভাঙা জাহাজের একটা লম্বা কাঠের টুকরো পেলাম হাতের কাছে। পাল খাটাবার ছেঁড়া দড়ি বাঁধা ছিল কাঠটায়। আমি কোনোরকমে সেই দড়ি দিয়ে কাঠের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে ফেললাম। তারপর কী হলো জানি না। যখন জ্ঞান ফিরে পেলাম দেখি এই চালার সমুদ্রতীরে বালির মধ্যে কাঠেবাঁধা অবস্থায় আমি পড়ে আছি। তখন সূর্য উঠেছে। মাথাটা পাথরের মতো ভারী। সেই অবস্থায় পড়ে রইলাম। রোদের তেজ বাড়ল। শরীরটা গরম হলো। উঠে মরুভূমির মতো উত্তপ্ত বালির ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগলাম। কী কষ্টে আর কী অবস্থায় যে চিকামা উপত্যকায় পৌঁছালাম তা আজ আর বলতে পারবো না.....

যাহোক—এই চিকামা উপত্যকায় গড়ে উঠেছিল মোচিকা সাম্রাজ্য। রাজধানীর নাম চিকামা। এখানকার অধিবাসীদের বলা হয় উনকা। কারণ এরা উনকা ভাষায় কথা বলে। উনকাদের রাজার নাম কোলা। কী করে রাজপুরোহিত ল্লামার সুনজরে পড়লাম জানি না। ল্লামাই আমাকে নিজের ছেলের মতো মানুষ করতে লাগল।' মেস্তিজো থামল।

ফ্রান্সিস বলল—'তারপর?'

—'বেশ চলছিল। কিন্তু মোচিকা সাম্রাজ্যের বিপদ ঘনিয়ে এল। এই মোচিকা সাম্রাজ্যের উত্তরে হলো চিমু সাম্রাজ্য। সেই সাম্রাজ্যের রাজার নাম লুপাকা। লুপাকা খুব কঠিন হৃদয়ের মানুষ। পাহাড়ী উপজাতিদের একত্রিত করে সে এক দুর্ধর্ষ সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছিল। মাস তিনেক আগে সে চিমু সেনাদের নিয়ে মোচিকা সাম্রাজ্য আক্রমণ করল। হিংস্র দুর্ধর্ষ সেই সেনাবাহিনীর কাছে রাজা কোলা হেরে গেলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে মারা গেলেন। লুপাকা মোচিকা সাম্রাজ্য দখল করল। চিকামায় রাজা হয়ে বসল। তার অত্যাচারে উনকাদের দুর্দশা চরমে উঠল।'

—'তারপর?'

—'এবার চিকামার কথা বলি। এখানে এক উঁচু পাথরের স্তূপের ওপর উনকাদের দেবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত। নিখাদ সোনায় তৈরি সেই দেবমূর্তি কতদিন আগে তৈরি হয়েছিল কেউ জানে না। নানারকম রঙবেরঙের দামী পাথরের কাজ সেই মূর্তিতে। সেই দেবমূর্তিকে উনকারা বলে হুয়াকা। প্রতিদিন হুয়াকার পুজো হয়। মাঝে মাঝে উৎসবও হয়।' মেস্তিজো থামল। আঙুল দিয়ে গুহার প্রায় অন্ধকার কোণায় রাখা একটা কাঠের মূর্তি দেখাল। বলল—'ঐ যে হুয়াকার কাঠের মূর্তি। নকল।'

ফ্রান্সিসরা তাকাল।

—হুয়াকা দেবতার মূর্তি দেখতে এইরকম—

—'আসল মূর্তিটা কত উঁচু?' ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—'হাত আড়াই তিনেক। রাজপুরোহিত ল্লামা শুধু পুজোই করত না। পাথর, এলগারোবো গাছের আঁকাবাঁকা কাণ্ড কুঁদে মূর্তিও বানাতো। আমিও তার কাছে এই কাজ শিখেছিলাম। এগুলো সব আমার তৈরি।'

—'এবার তোমার কথা বলো।' ফ্রান্সিস বলল।

—'লুপাকা এসে এখানে উনকাদের কাছে যত সোনা অলঙ্কার দামী পাথর পেল সব কেড়ে নিল। মাস দু'য়েক কাটল। একদিন রাজা লুপাকা হুয়াকা স্বর্ণমূর্তি নিজের চিমু রাজ্যে নিয়ে যেতে চাইল। হুয়াকাভক্ত উনকাদের কোনো আপত্তিই সে গ্রাহ্য করল না। সৈন্যরা স্বর্ণমূর্তি নামিয়ে আনতে গেল। তখনই ধরা পড়ল যে, যে মূর্তিটা রাখা আছে সেটা সোনার নয় কাঠের। এত সুন্দর রঙ মিলিয়ে তৈরি যে কারো বোঝবার উপায় ছিল না। রাজা লুপাকা ভীষণ ক্ষেপে গেল। আসল স্বর্ণমূর্তি তাহলে কে সরিয়েছে? কে লুকিয়ে রেখেছে সেই স্বর্ণমূর্তি? রাজা লুপাকার যত রাগ গিয়ে পড়ল রাজপুরোহিত ল্লামার ওপর। ল্লামার সঙ্গে তার শিষ্য আমাকেও বন্দী করা হলো। ভীষণ অত্যাচার চলল ল্লামার ওপর। ল্লামা বলল — রাজা কোলার নির্দেশেই সে আসল স্বর্ণমূর্তির মতো একটি কাঠের মূর্তি তৈরি করেছিল। সেটা নিয়ে রাজা কোলা কী করেছেন তা সে জানে না। রাজা লুপাকার রক্ষীদের নিপীড়ন সহ্য করতে না পেরে রাজপুরোহিত ল্লামা কয়েদঘরেই মারা গেল আমার কোলে মাথা রেখে।' মেস্তিজো থামল।

ফ্রান্সিস এতক্ষণ আধশোয়া হয়ে মেস্তিজোর কথা শুনছিল। স্বর্ণমূর্তির রহস্যের কথা শুনেই ও সোজা হয়ে বসল। বলল—'বোঝাই যাচ্ছে রাজা কোলা আশঙ্কা করেছিলেন যে রাজা লুপাকা তাঁর দেশ আক্রমণ করতে পারে। তাঁর পরাজয় হতে পারে। যুদ্ধে জিতেও যাতে রাজা লুপাকা স্বর্ণমূর্তি নিয়ে নিজের দেশে যেতে না পারে তার জন্যে তিনি নকল হুবহু একরকম দেখতে একটা কাঠের মূর্তি ল্লামাকে দিয়ে তৈরি করিয়েছিলেন।'

—'ঠিক বলেছেন।' মেস্তিজো বলল।

—'এখন প্রশ্ন হলো রাজা কোলা সেই আসল স্বর্ণমূর্তি কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলেন?' ফ্রান্সিস বলল।

—'তার হদিস কেউ জানে না।' মেস্তিজো বলল—'রাজা লুপাকা এখন হন্যে হয়ে সেই আসল স্বর্ণমূর্তি খুঁজে বেড়াচ্ছে।'

ফ্রান্সিস কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে ভাবল। তারপর ঘাসের বিছানা থেকে উঠে নকল কাঠের মূর্তিটার কাছে গেল। ভালো করে দেখল। বলল—'মেস্তিজো, রাজপুরোহিত কি এ ব্যাপারে কোনো ইঙ্গিতই তোমাকে দিয়ে যেতে পারেনি?'

—'না, স্পষ্ট করে কিছু বলেনি। তবে রাজা কোলাকে সে জিজ্ঞেস করেছিল — এই নকল কাঠের মূর্তি তিনি কেন তৈরি করছেন?'

মেস্তিজো বলল।

—'তার উত্তরে রাজা কোলা কী বলেছিলেন?' ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—'শুধু হেসে বলেছিলেন—সবই কপালের লিখন।' মেস্তিজো বলল।

—'সবই কপালের লিখন—'কথাটা ফ্রান্সিস বার কয়েক বিড়বিড় করে বলল। কী অর্থ কথাটার? ফ্রান্সিস গুহার পাথুরে মেঝেয় কয়েকবার পায়চারি করল। বিস্কো বলল—'ফ্রান্সিস,ব্যাপারটা কি তোমার কাছে রহস্যময় লাগছে?'

—'অবশ্যই—' ফ্রান্সিস পায়চারি থামিয়ে বলল—'আর আমি স্থির করে ফেলেছি ঐ স্বর্ণমূর্তি খুঁজে বের করতে আমি চিকামা উপত্যকায় যাবো।'

—'পারবে খুঁজে বের করতে?' মারিয়া বলল।

—'আগে নকল মূর্তিটা দেখি। চারপাশ ভালো করে দেখি, তবেই বুঝতে পারবো মূর্তি উদ্ধার করতে পারবো কিনা।' ফ্রান্সিস বলল। এবার ফ্রান্সিস মেস্তিজোর দিকে তাকিয়ে বলল—'তুমি এই গুহাঘরে লুকিয়ে আছো কেন?'

—'গুরুদেব ল্লামা মারা যাওয়ার পর রাজা লুপাকা আমার ওপর অত্যাচার শুরু করে—'মেস্তিজো বলল—'কোনোরকমে পালিয়ে এসে এখানে লুকিয়ে আছি।'

—'তুমি রাজা লুপাকাকে কী বলেছো?' ফ্রান্সিস জানতে চাইল।

—'ঐ যে কথাটা রাজা কোলা ল্লামাকে বলেছিলেন—সবই কপালের লিখন।'

—'হুঁ।' ফ্রান্সিস কপাল কুঁচকে ভাবল একটুক্ষণ। বলল—'রাজা লুপাকা বোধহয় কিছুই বোঝেনি।'

—'না। এই জন্যেই তো আমার ওপর রাগ। এখানে লুকিয়ে থাকি। আমি তো রাজপুরোহিত ল্লামার সহকারী ছিলাম। তাই উনকারা আমাকে শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। আমার জন্যে খাবার লুকিয়ে পাঠিয়ে দেয়। কখনো আমিও খাবার আনতে যাই।' মেস্তিজো বলল।

—'তুমি তো উনকাভাষা জানো।' ফ্রান্সিস বলল।

—'অনর্গল বলতে পারি।' মেস্তিজো বলল।

ফ্রান্সিস বিস্কোদের দিকে তাকাল। বলল—'বিস্কো, শাঙ্কো—বিকেল হয়ে গেছে। তোমরা অস্ত্রশস্ত্র এখানে রেখে জল নিয়ে জাহাজে চলে যাও। বন্ধুদের গিয়ে বল—আমরা চিকামা যাবো। স্বর্ণমূর্তি উদ্ধার করবো। ওরা যেন দিন দশপনেরো আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে। ততদিনে আমরা না ফিরলে ওরা যেন সশস্ত্র হয়ে চিকামায় যায়। সব বলে তোমরা দু'জন ফিরে এসো।'

—'বেশ—'বিস্কো বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। শাঙ্কোও উঠল। ফ্রান্সিস বলল—'মারিয়া, তুমি ওদের সঙ্গে জাহাজে ফিরে যাও।'

মারিয়া মাথা ঝাঁকিয়ে বলল—'না, আমিও তোমাদের সঙ্গে চিকামা যাবো।'

—'বেশ,চলো—' ফ্রান্সিস বলল—'আমরা কিন্তু বেড়াতে যাচ্ছি না। যে কোনো মুহূর্তে বিপদে পড়তে পারি।'

—'আমি ভয় পাই না।' মারিয়া দৃঢ়স্বরে বলল।

বিস্কো আর শাঙ্কো সন্ধ্যের আগেই জলের পিপে নিয়ে জাহাজে চলে গেল। গুহাঘরটা একেবারে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার হয়ে গেল। মেস্তিজো চকমকি ঠুকে পাথরের খাঁজে রাখা একটা মশাল জ্বালাল। মশালটা সামুদ্রিক মাছের তেলে ভেজানো ছিল। মেস্তিজো ফ্রান্সিসকে আর মারিয়াকে শোনাচ্ছিল ওর চিকামায় কাটানো জীবনের কথা। ফ্রান্সিস বেশ মনোযোগ দিয়ে সেই অভিজ্ঞতার কথা শুনছিল। ওর এত মনোযোগ দিয়ে শোনার উদ্দেশ্য যদি স্বর্ণমূর্তি উদ্ধারের কোনো সূত্র পাওয়া যায়।

একটু রাতে বিস্কো আর শাঙ্কো ফিরে এল। বলল—'বন্ধুরা সবাই ফ্রান্সিসের কথা মন দিয়ে শুনেছে। ওরা খুশি হয়েছে ফ্রান্সিস আর এক অভিযানে যাচ্ছে শুনে।' ওরা জাহাজ থেকে খাবার এনেছিল। রাতের খাওয়ার পর ওরা শুকনো ঘাস ছড়ানো বিছানায় শুয়ে পড়ল।

গভীর রাত তখন। দূরের সমুদ্রের মৃদু গর্জন শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ কিসের শব্দে মারিয়ার ঘুম ভেঙে গেল। ও আর কোনো শব্দ হয় কি না শোনার জন্যে কান পেতে রইল। আবার শব্দ হলো। দু'চারটে পাথরের টুকরো বাইরে চাঁই পাথরের গা বেয়ে গড়িয়ে পড়ল। ও ফ্রান্সিসকে ফিসফিস করে ডাকল—'ফ্রান্সিস, ফ্রান্সিস।' ফ্রান্সিস চাপাস্বরে বলল—'শুনেছি। আসার পথে ধূসর রঙের শেয়াল দেখেছিলাম। বোধহয় শেয়ালের পাল, খাবারের ধান্ধায় এসেছে।'

ঠিক তখনই কাঠের ফালিতে তৈরি গুহাঘরের দরজা খোলার শব্দ হলো। স্পষ্ট শব্দ। ফ্রান্সিস বিপদ আঁচ করল। একলাফে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে তরোয়ালটা নিয়ে চাপাস্বরে ডাকল—'বিস্কো—শাঙ্কো।'

বিস্কো শাঙ্কো তখনও ঘুমে অচেতন। মারিয়া ওদের জোরে ধাক্কা দিল। দু'জনেই দ্রুত উঠে বসল। ততক্ষণে কয়েকজন লোক এসে গুহাঘরের মধ্যে দাঁড়িয়েছে নিঃশব্দে। মশালের আলোয় দেখা গেল—লোহার ছুঁচলো মুখওয়ালা বর্শা। সকলের হাতেই বর্শা। বর্শা ছোঁড়ার জন্যে উঁচিয়ে ধরল ওরা। লোকগুলো বেঁটে। শক্ত-সমর্থ। গায়ের রঙ হালকা তামাটে। মাথার চুল লম্বা। কপালে লাল কাপড়ের ফেট্টি বাঁধা। তাতে পাখির পালক গোঁজা। পরনে ঢিলেঢালা পোশাক—পঞ্চো। মুখের দুপাশে লাল রং মাখা। শাঙ্কো দ্রুত তীর ধনুকের দিকে হাত বাড়াল। ফ্রান্সিস বলে উঠল—'শাঙ্কো, আগেই লড়াই নয়।' ফ্রান্সিস তরোয়াল ফেলে দিল। মেস্তিজোর দিকে তাকিয়ে দেখল ভয়ে মেস্তিজোর মুখ সাদা হয়ে গেছে। ফ্রান্সিস বলল—'মেস্তিজো এরা কারা?'

—'রাজা লুপাকার সৈন্য। আমাকে ধরলে ওরা মেরে ফেলবে।' সৈন্য ক'জন কিন্তু ফ্রান্সিসদের আর মারিয়াকে দেখে অবাক। সৈন্যদের মধ্যে সবচেয়ে বলশালী লোকটা ভারীগলায় কী বলে উঠল। ফ্রান্সিস বলল—'মেস্তিজো—এরা যা বলবে আমাকে তা বলো।'

—'ও দলনেতা। বলছে—তোমরা কে?' মেস্তিজো বলল।

—'বলো, আমরা ভাইকিং। রাজা কোলার লুকোনো স্বর্ণমূর্তি আমরা খুঁজে বের করতে এসেছি। আমরা লড়াই চাই না।' ফ্রান্সিস বলল। মেস্তিজো উনকা ভাষায় কথাগুলো দলনেতাকে বলল। দলনেতা কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে কী ভাবল। তারপর মাথা তুলে কী বলল। মেস্তিজো বলল—'দলনেতা বলছে, ওরা আমার খোঁজে এসেছিল। কিন্তু আপনারা বিদেশী। আপনাদেরও ও বন্দী করবে। রাজা লুপাকার কাছে নিয়ে যাবে। তারপর রাজা লুপাকা যা করবার করবে।'

—'খুব ভালো কথা। কিন্তু মেস্তিজো, ওকে বলো আমাদের কারো যেন কোনো ক্ষতি না হয়।' ফ্রান্সিস বলল। মেস্তিজো কথাটা দলনেতাকে বলল। দলনেতা মাথাটা দু'পাশে নাড়ল। বোধহয় কথাটা মেনে নিল। দলনেতার ইঙ্গিতে একজন সৈন্য নিজের কোমরে জড়ানো কালো রঙের লম্বা দড়ি বের করল। সেই দড়ি দিয়ে প্রথমে মেস্তিজো তারপর মারিয়ার হাত বাঁধা হলো। তারপর ফ্রান্সিসদের হাত বাঁধা হলো। আর একজন সৈন্য ফ্রান্সিসদের তরোয়াল শাঙ্কোর তীর ধনুক নিল। শাঙ্কো ওদের চোখের আড়ালে বড় ছোরাটা ঢোলা জামার মধ্যে লুকিয়ে রাখল।

গুহাঘর থেকে সবাই বাইরে এল। দু'জন

সৈন্য মশাল হাতে সামনের দিকে চলল। পেছনে দলনেতা, অন্য সৈন্য আর ফ্রান্সিসরা চলল।

পাহাড়ী এলাকা পোরোতেই পুব আকাশ লাল হলো। একটু পরেই সূর্য উঠল। দেখা গেল এদিকটায় বালির চিহ্নমাত্র নেই। চারিদিকে সবুজ গাছগাছালি। বীন, তুলো আলুর ক্ষেত। মাঝে মাঝে দু'চারটে পাথরগাঁথা বাড়ি। পেইকো ঘাসের ছাউনি। সেসব বাড়ি থেকে পুরুষ স্ত্রীলোক বাচ্চাকাচ্চারা বেরিয়ে এল। অবাক হয়ে ফ্রান্সিসদের দেখতে লাগল। বিশেষ করে হলদে গাউনপরা মারিয়াকে। ওদের পরনে মোটা সুতোর হাতে তৈরি ঢোলা পোশাক। পোশাকে নানা রঙের সুতোর কাজ।

ধুলোটে রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওরা ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই চিকামা পৌঁছল। দেখা গেল দুটো সবুজ ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের উপত্যকায় চিকামা নগর। এখানে জনবসতি বেশি। পাথরের বাড়িঘরও অনেক। চিকামার অধিবাসীরাও অবাক চোখে ফ্রান্সিসদের দেখতে লাগল। মারিয়ার পোশাক দেখে ওরা আশ্চর্য হলো বেশি।

একটা পাথরের লম্বাটে ঘরের সামনে এসে দলনেতা দাঁড়াল। সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল। একজন সৈন্য গিয়ে ঘরটার কাঠের দরজায় লাগানো একটা বড় হুক টেনে খুলল। দলনেতা ফ্রান্সিসদের ঘরে ঢোকার জন্যে ইঙ্গিত করল। ফ্রান্সিসরা ঘরটায় ঢুকল। ঘরে ঢুকেই ফ্রান্সিস বুঝল এটা কয়েদঘর। হাত বাঁধা অবস্থায় প্রায় আটদশজন লোক ঘরটায় শুয়ে বসে আছে। ফ্রান্সিস মেস্তিজোকে সঙ্গে সঙ্গে বলল—'দলনেতাকে বলো, আমাদের কেন কয়েদঘরে রাখা হচ্ছে?' মেস্তিজো ভয়ে ভয়ে সে কথা দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দলনেতাকে বলল। দলনেতার উত্তরটা ফ্রান্সিসকে বলল—'দলনেতা বলছে, ও রাজাকে সব বলবে। তারপর আপনাদের রাজসভায় রাজার সামনে উপস্থিত করবে। রাজা যা করবার করবেন। ততক্ষণ কয়েদঘরেই থাকতে হবে।' অগত্যা ফ্রান্সিসদের এই বন্দীজীবন মেনে নিতেই হলো।

দুপুরের দিকে কয়েদঘরের রক্ষীরা বড় বড় পাতা পেতে ফ্রান্সিসদের খেতে দিল। হাত খুলে দিল। ওরা খেতে লাগল। ফ্রান্সিসরা বন্দীদশায় যেমন বরাবর বলে তেমনি বলল—'পেট ভরে খাও। খেতে ভালো না লাগলেও খাও। শরীরটা ঠিক রাখো।' মেস্তিজোর গুহাঘরে যে খাবার ফ্রান্সিস আর মারিয়া খেয়েছিল তেমনি খাবার। খুব সুস্বাদু না হলেও খাবার অন্যরকম বলেই ভালো লাগল। ফ্রান্সিস চেটেপুটে খেল।

খাওয়াদাওয়া শেষ হতেই সৈন্যদের দলনেতা সেই বেঁটে বলশালী লোকটা এল। মেস্তিজোর সঙ্গে কী কথা হলো। মেস্তিজো বলল—'ফ্রান্সিস, চলো, রাজা আমাদের ডেকেছেন। রাজসভায় যেতে হবে।'

হাতবাঁধা অবস্থাতেই ওরা দলনেতার পেছনে পেছনে চলল। রাস্তার দু'ধারের লোকজন বেশ ঔৎসুক্যের সঙ্গে ওদের দেখতে লাগল। রাস্তার পাশ থেকে হঠাৎ একজন পুরুষ ও একজন নারী ছুটে এসে মেস্তিজোকে মাথা নিচু করে দু'হাত বুকে রেখে বোধহয় শ্রদ্ধা জানাল। সৈন্যরা ঐ দু'জনকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল। ফ্রান্সিস বুঝল—মেস্তিজো রাজপুরোহিতের শিষ্য ছিল। ওকে উনকারা এখনও শ্রদ্ধা করে। কিন্তু রাজা লুপাকার সৈন্যদের ভয়ে এগিয়ে এসে শ্রদ্ধা জানাতে সাহস পাচ্ছে না।

রাজবাড়িটা বেশ উঁচু, বড় ও পাথরের তৈরি। পাথরের ছাদ। ওরা রাজবাড়ির ভেতরে ঢুকল। একটু অন্ধকারমতো ভেতরটা। দিনের বেলায়ও পাথুরে দেয়ালে মশাল জ্বলছে। রক্ষীরা লোহার ছুঁচোলোমুখ বর্শা হাতে পাহারা দিচ্ছে।

একটু এগোতেই ফ্রান্সিসরা দেখল রাজসভা চলছে। একটা পাথরের সিংহাসনে রাজা লুপাকা বসে আছে। দু'পাশে আরো কয়েকটা পাথরের ছোট আসনে বোধহয় মন্ত্রী গণ্যমান্যরা বসে আছে। রাজা বেঁটে। বয়েস হয়েছে। তবু বেশ শক্তসমর্থ চেহারা। মাথার চুল লম্বা। কপালে চকচকে কাপড়ের হলুদ রঙের ফেট্টি। তাতে সুন্দর লম্বা লম্বা পালক গোঁজা। দুকানের লতিতে সোনার কাঠি গাঁথা। গায়ে পঞ্চো। তবে পঞ্চোর কাপড় মোটা নয়। পাতলা। মুখের অর্ধেক অংশে লাল রঙ মাখা।

ফ্রান্সিসরা যখন পৌঁছল তখন একটা বিচার চলছিল বোধহয়। রাজা বোধহয় রায় দিল। বিচারপ্রার্থীরা মাথা নুইয়ে বুকে দু'হাত রেখে সম্মান জানিয়ে চলে গেল। দলনেতা মাথা নুইয়ে দু'হাত বুকে রেখে সম্মান জানিয়ে কী বলে গেল। রাজা ফ্রান্সিসদের দিকে তাকাল। ফ্রান্সিস রাজার কঠিন মুখ দেখে আর ধূর্ত চাউনি দেখে বেশ চিন্তায় পড়ল। একে কি বোঝানো যাবে? তবে সোনা মণিমাণিক্যের লোভ বড় সাংঘাতিক। সেই লোভেই রাজা হয়তো ওদের কোনো বিপদে ফেলবে না।

এবার রাজা আর ফ্রান্সিসের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হলো। মেস্তিজো দোভাষীর কাজ করতে লাগল।

রাজা—'তোমরা ভাইকিং?'

ফ্রান্সিস—'হ্যাঁ।'

রাজা মারিয়াকে দেখিয়ে বললো—'এ কে?'

ফ্রান্সিস—'রাজকুমারী মারিয়া। আমার স্ত্রী।'

রাজা—'তোমাদের সব কথা শুনলাম। পারবে গুপ্ত স্বর্ণমূর্তি উদ্ধার করতে?'

ফ্রান্সিস—'সবকিছু দেখবো আগে, যতটা সম্ভব খবর সংগ্রহ করবো তারপর বলতে পারবো।'

রাজা—'বেশ, দ্যাখো চেষ্টা করে।

ফ্রান্সিস—'এর জন্যে আমাদের মুক্তি দিতে হবে। সব জায়গায় অবাধে ঘুরতে দিতে হবে।'

রাজা—'বেশ, কিন্তু মারিয়াকে রাজপ্রাসাদে রাখা হবে।' কথাটা বলে রাজা মৃদু হাসল। ফ্রান্সিস বুঝল ওরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে তাই মারিয়াকে নজরবন্দী রাখা হবে।

ফ্রান্সিস—'বেশ।'

এবার রাজা মেস্তিজোর দিকে তাকাল। রাগে রাজার চোখমুখ লাল হয়ে গেল। ভয়ে মেস্তিজো বেশ কাঁপতে লাগল। চীৎকার করে রাজা কী বলে উঠল। একজন রক্ষী ছুটে এসে মেস্তিজোকে ধরল। ভয়ে মেস্তিজো কাঁদতে লাগল। মেস্তিজোকে টেনে ছিঁচড়ে রাজার সামনে দাঁড় করানো হলো। আর একজন রক্ষী লম্বা চাবুক হাতে এগিয়ে এল। কোনো সামুদ্রিক মাছের সরু লেজ দিয়ে তৈরি চাবুকটা। চাবুকটার গায়ে ছোট ছোট কাঁটা। রক্ষী নির্মম হাতে চাবুক চালাল মেস্তিজোর গায়ে। মেস্তিজো যন্ত্রণায় চীৎকার করে উঠল। দেখা গেল পিঠে যেখানে চাবুকের ঘা পড়েছে সে জায়গা থেকে পাঞ্চোতে রক্ত ফুটে উঠেছে। রাজা আবার চীৎকার করে কী বলে উঠল। মেস্তিজো বারবার মাথা নোয়াতে লাগল আর মুখে কী বলতে লাগল। ফ্রান্সিস বুঝল রাজা মেস্তিজোর কাছে গুপ্ত স্বর্ণমূর্তির হদিস জানতে চাইছে। আবার চাবুক আছড়ে পড়ার আগেই ফ্রান্সিস ডান হাত তুলে মেস্তিজোর কাছে এসে দাঁড়াল। আবার রাজা আর ফ্রান্সিসের মধ্যে কথাবার্তা শুরু হলো। মেস্তিজো কাঁপা কাঁপা গলায় দোভাষীর কাজ করতে লাগল।

ফ্রান্সিস—'মেস্তিজোকে মুক্তি দিতে হবে।'

রাজা—'না, ও স্বর্ণমূর্তির খোঁজ জানে।'

ফ্রান্সিস—'না, ও জানে না। ও যা জানে সব আপনাকে বলেছে।'

রাজা—'না, ওকে মুক্তি দেওয়া হবে না।

ফ্রান্সিস—'তাহলে স্বর্ণমূর্তির সন্ধান আমরা করবো না। আমরা জাহাজে ফিরে যাবো।'

রাজা ভুরু কুঁচকে কী ভাবল। তারপর বলল—'যদি মেস্তিজো পালিয়ে যায়?'

ফ্রান্সিস—'ওর দায়িত্ব আমাদের। ও পালিয়ে গেলে আমরা যে কোনো শাস্তি মেনে নেব।'

রাজা লুপাকা ভেবে দেখল যে ল্লামা মরে গেল, মেস্তিজো এত অত্যাচারেও কিছুই বলতে পারছে না, নিজেরা অনেক চেষ্টা করেও স্বর্ণমূর্তির হদিস করতে পারেনি—এখন যদি এই ভাইকিংরা হদিস বার করতে পারে করুক না। বিদেশী বিধর্মী এরা। কাজ ফুরুলে মেরে ফেলাও যাবে।

—'বেশ।' রাজা বলল।

—'মেস্তিজো সবসময় আমাদের সঙ্গে থাকবে। ওর সাহায্য খুবই প্রয়োজন।' ফ্রান্সিস বলল।

রাজা মাথা দু'পাশে নাড়ল। তার মানে সম্মতি দিল।

—'আর একটা কথা।' ফ্রান্সিস বলল।

রাজা ফ্রান্সিসের দিকে তাকাল।

—'আমাদের অস্ত্রশস্ত্রগুলো ফেরৎ দিতে হবে। মারিয়া তো রাজপ্রাসাদে নজরবন্দী থাকবে। কাজেই আমরা তো আর ওকে ফেলে পালাতে পারবো না।' ফ্রান্সিস বলল।

রাজা সম্মতির ভঙ্গী করল। ফ্রান্সিস আবার বলল—'সারাদিনে মারিয়াকে একবার আমাদের সঙ্গে দেখা করতে দিতে হবে। অবশ্য মারিয়ার সঙ্গে আপনার প্রাসাদরক্ষীরাও থাকবে।'

রাজা সম্মতির ভঙ্গী করল। ফ্রান্সিসদের হাতের বাঁধন একজন রক্ষী খুলে দিল।

রাজসভা থেকে ফ্রান্সিসরা চলে এল। মেস্তিজোর পিঠের দিকটা তখনও রক্তে ভেজা। বাইরে এসে ফ্রান্সিস মেস্তিজোকে ওর কাঁধে ভর দিতে বলল। মেস্তিজো তখনও ভালো করে হাঁটতে পারছে না। ফ্রান্সিস বলল—'মেস্তিজো, দলনেতাকে বলো যেন তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা করে।' দলনেতা ওদের সামনে সামনে যাচ্ছিল। মেস্তিজো ওকে কাঁপা কাঁপা গলায় সে কথা বলল। দলনেতা কিছু বলল না।

রাজবাড়ির পেছনদিকে ওরা কিছুদূর এল। একটা পাথরের বাড়ির সামনে দলনেতা দাঁড়াল। দরজা খুলে ফ্রান্সিসদের ইশারায় ঢুকতে বলল। ফ্রান্সিসরা বাড়িটায় ঢুকল। সামনের ঘরটা বেশ খোলামেলা। একপাশে শুকনো ঘাস বিছোনো। দলনেতা হাততালি দিল। বাড়ির ভেতর থেকে দু'জন লোক এ ঘরে ঢুকল। দলনেতা তাদের কী বলল। মেস্তিজো ফ্রান্সিসকে বলল—'এই দু'জন আমাদের দেখাশুনো করবে।' লোক দু'জন বাড়ির মধ্যে গেল। একটু পরেই ফিরে এল। হাতে মোটা কাপড়ের কম্বলমতো। সেটা শুকনো ঘাসের গাদার ওপর পেতে দিল। মেস্তিজো বোধহয় জল চাইল। লোক দু'জন চীনেমাটির বড় কুঁজোমতো নিয়ে এল। ফ্রান্সিসরা প্রায় সকলেই জল খেল। ওরা বিছানায় বসল। মেস্তিজো শুয়ে পড়ল।

এবার দলনেতা মারিয়ার দিকে তাকিয়ে কী বলল। মেস্তিজো বলল—'মারিয়া, দলনেতা আপনাকে রাজবাড়ির অন্দরমহলে রেখে আসবে। এখন আপনাকে যেতে বলছে।' মারিয়া বিছানা থেকে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। ওর চোখ জলে ভিজে উঠল। মারিয়া বেশ শক্তমনের মেয়ে। কিন্তু ফ্রান্সিসদের জন্যে ওর মন বেশ খারাপ হয়ে গেল। তাই দেখে ফ্রান্সিস হেসে বলল—'মারিয়া, আমরা ভাইকিং। আমরা শুধু কব্জির জোরে লড়াই করি না, বুদ্ধির জোরেও লড়াই করি। আমাদের জন্যে মন খারাপ করো না, যাও। দিনে একবার তো দেখা হবেই।'

মারিয়া কোনো কথা বলল না। মাথা নিচু করে বোধহয় ফ্রান্সিসদের কথা ভাবতে ভাবতেই আস্তে আস্তে দলনেতার পেছনে পেছনে চলে গেল। ফ্রান্সিসদেরও মনটা খারাপ হয়ে গেল। বিস্কো বলল—'চলো ফ্রান্সিস, জাহাজে ফিরে যাই।'

'অসম্ভব,' ফ্রান্সিস দৃঢ়স্বরে বলল—'বিস্কো তুমি আমাকে ভালো করেই জানো। তোমরা সবাই চলে গেলেও আমি একা এখানে থাকবো। স্বর্ণমূর্তি খুঁজবো, উদ্ধার করবো। তারপর ফিরবো।'

—না—না ফ্রান্সিস, তোমাকে ছেড়ে আমরা যাবো না।'—বিস্কো দ্রুত বলে উঠল। শাঙ্কোও বলল—'আমরা তোমার সঙ্গেই থাকবো।' ফ্রান্সিস ঘাসের বিছানায় আধশোয়া হলো। ভাবতে লাগল স্বর্ণমূর্তির কথা। কোথায় কীভাবে রাখা হতো সেই মূর্তিটা তা দেখতে হবে। মেস্তিজো শুয়ে আছে। তখনও অল্প অল্প গোঙাচ্ছে।

একটু পরেই একটা রোগা বেঁটেমতো লোক ঘরে ঢুকল। মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি গোঁফ। মাথায় হলুদ কাপড়ের পাগড়ি মতো। গলায় নানারঙের পাথরের মালা। লোকটার হাতে একটা চীনেমাটির বোয়াম। বোঝা গেল লোকটা বৈদ্য। বৈদ্য মেস্তিজোর কাছে গেল। পিঠের দিকে পঞ্চো সরিয়ে চাবুকের ক্ষত দেখল। তখনও ক্ষত থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত পড়ছে। বৈদ্য বোয়াম থেকে সবুজ রঙের আঠা আঠা মতো একটা ওষুধ বের করল। আঙুল দিয়ে ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগিয়ে দিল। মেস্তিজো একটু কঁকিয়ে উঠল। তারপর শান্ত হলো। বোধহয় ব্যথাজ্বালা একটু কমল। একটা ছোট ন্যাকড়ার পুঁটুলি করে চারটে কালো কালো বড়ি বাঁধল। মেস্তিজোকে কী বলল। তারপর চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে একজন সৈন্য ফ্রান্সিসদের অস্ত্রশস্ত্র ঘরের কোণায় রেখে গেল।

দু'দিন কেটে গেল। ফ্রান্সিসরা শুয়ে বসে সময় কাটাতে লাগল। মেস্তিজো সুস্থ না হলে কিছুই করার নেই। সেই দু'দিনই মারিয়া এসে ওদের দেখে গেল। সেদিন ফ্রান্সিস, মেস্তিজোকো বলল—'এখন তোমার শরীর কেমন?'

—'অনেকটা ভালো।' মেস্তিজো বলল।

—'আমাদের নিয়ে চিকামায় একটু ঘোরাঘুরি করতে পারবে?' ফ্রান্সিস বলল।

—'পারবো।'

—'তাহলে আজই চলো।' ফ্রান্সিস বলল।

বিকেল নাগাদ ফ্রান্সিসরা মেস্তিজোকে সঙ্গে নিয়ে চিকামা নগর দেখতে বেরুল। প্রথমে রাজবাড়ির সামনে এল। রাজবাড়ি ওরা আগেই দেখেছে। মেস্তিজোকে ফ্রান্সিস বলল—'রক্ষীদের বলো, মারিয়াকে নিয়ে আসতে। মারিয়াও আমাদের সঙ্গে যাবে।' মেস্তিজো একজন দ্বাররক্ষীকে বলল সে কথা। এ কথাও বলল যে, এটা রাজার হুকুম। রক্ষীটি রাজবাড়ির মধ্যে ঢুকল। একটু পরেই মারিয়া বেরিয়ে এল। ওদের সঙ্গে চলল। পেছনে দু'জন রক্ষীও চলল।

পথে বেশ ভিড়। কিছুদূর আসার পর ডানদিকে একটা উঁচু বেদীমতো দেখা গেল। বেদীটি থাককাটা। বেদীর ওপরে একটা মূর্তি। ফুলপাতায় মূর্তিটা প্রায় ঢেকে গেছে। বেদীর সামনে এসে ফ্রান্সিস দেখল—মেস্তিজোর গুহাঘরে দেখা সেই কাঠের মূর্তির মতোই এই মূর্তিটা। তবে মেস্তিজোর মূর্তিটা ছিল ছোট। এটা একটু বড়। প্রায় আড়াই তিন ফুট। মেস্তিজো বলল—'এই আমাদের দেবতা হুয়াকার মূর্তি। তবে আসল সোনার মূর্তি নয়, কাঠের।'

—'মেস্তিজো, মূর্তিটা থেকে ফুলপাতা সরিয়ে দাও।' ফ্রান্সিস বলল। 'ভালো করে দেখি।'

মেস্তিজো বেদীর মসৃণ সিঁড়ি বেয়ে উঠল। মূর্তিটা থেকে ফুলপাতা সরাল। সিঁড়িতেও ছড়িয়ে আছে ফুলপাতা। ফ্রান্সিস মূর্তিটা ভালো করে দেখল। সত্যি, এত সুন্দর রঙ ব্যবহার করা হয়েছে যে মনে হচ্ছে সোনার মূর্তি। সিঁড়িতে বেদীতে পাথর কুঁদে কুঁদে সুন্দর ফুল লতাপাতার কাজ করা হয়েছে। ফ্রান্সিস বলল—'মেস্তিজো, এখানকার পাথরের কারুকাজ কি তোমরা করেছো?'

—'না, রাজা কোলা নিজেই এই কারুকাজ করেছেন। রাজা কোলার আর একটা পাথরের

কাজ দেখ।' মেস্তিজো সামনে আঙুল তুলে দেখাল। দেখা গেল একটা বিরাট পাথরের মাথা। একটা ছোটখাটো আস্ত পাহাড় কেটে কুঁদে কুঁদে ঐ মাথাটা তৈরি করা হয়েছে।

মেস্তিজো বলল—'এই মাথাটা পাথর কেটে আমরা তৈরি করেছি—রাজা, কোলা, গুরুদেব ল্লামা আর আমি।

—এটা কীসের মাথা?' মারিয়া বলল।

—'দেবরক্ষীর মাথা।' মেস্তিজো বলল।

ফ্রান্সিস একটু লক্ষ্য করে দেখল মূর্তিটার মাথায় গলায় ফুলপাতা ছড়ানো। ফ্রান্সিস বলল—'দেবরক্ষীরও পুজো হয় নাকি?'

—'হ্যাঁ, হুয়াকা দেবতার সঙ্গে দেবরক্ষীরও পুজো হয়।' মেস্তিজো বলল।

—'অত উঁচুতে লোকে ওঠে কি করে? ফ্রান্সিস বলল।

—'অনেক উঁচু একটা কাঠের মই আছে। সেটা বেয়ে সবাই ওঠে। ফুলপাতা দিয়ে পুজো করে। আমরাও পাথর কেটে তৈরি করার সময় ঐ মইটা ব্যবহার করতাম।' মেস্তিজো বলল।

ফ্রান্সিসরা স্বর্ণমূর্তির পাথরের বেদীতে ফুল-লতাপাতা, পাখির কাজ, দেবরক্ষীর মাথা, সব দেখতে লাগল। সত্যি, দুটোই দেখতে খুব সুন্দর। রাজা কোলা যে একজন দক্ষ ভাস্কর ছিলেন এসব দেখে সেটা স্পষ্টই বোঝা গেল। সব দেখেটেখে ফ্রান্সিসরা নিজেদের আস্তানায় ফিরে এল। মারিয়াকে নিয়ে রক্ষীরা রাজবাড়িতে চলে গেল।

দিন সাতেক কাটল। প্রায় প্রত্যেকদিনই ফ্রান্সিস মারিয়াকে সঙ্গে নিয়ে হুয়াকা দেবতার স্বর্ণমূর্তি দেবরক্ষীর মাথা দেখতে যায়। ঘুরে ফিরে দেখে। কিন্তু আসল স্বর্ণমূর্তি উদ্ধারের কোনো সূত্র পায় না।

শাঙ্কোর কাছে এসব একঘেয়ে লাগে। ও তাই দুপুরের খাওয়া সেরেই তীরধনুক নিয়ে পাখি খরগোশ শেয়াল শিকার করতে বেরিয়ে যায়। ডানদিকের সবুজ ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের ওপারেই বনজঙ্গল শুরু হয়েছে। খুব গভীর বন নয়। তবে গাছপালা প্রচুর। ঐ বনজঙ্গলেই শাঙ্কো শিকার করতে যায়।

এর মধ্যে রাজা লুপাকা ফ্রান্সিসকে ডেকে পাঠিয়েছিল। স্বর্ণমূর্তি উদ্ধার করতে পারবে কি না, পারলে কবে নাগাদ পারবে এসব জিজ্ঞেস করেছিল। মেস্তিজোর মারফৎ ফ্রান্সিস বলেছে—'খোঁজখবর করছি। কোনো সূত্র এখনও পাইনি। তবে বেশিদিন লাগবে না।'

সেদিনও শাঙ্কো তীরধনুক নিয়ে শিকারে বেরিয়েছিল দুপুরে খেয়েদেয়ে। বিকেল হয়ে

দেবরক্ষীর মাথা।

গেল তখনও ফিরল না। ফ্রান্সিস আর বিস্কো ভাবল শাঙ্কো বোধহয় বেশি শিকার পেয়েছে তাই আসতে দেরি হচ্ছে। কিন্তু সন্ধে হলো, রাত হলো শাঙ্কো ফিরল না। এবার ফ্রান্সিস আর বিস্কো চিন্তায় পড়ল। ফ্রান্সিস মেস্তিজোকে বলল—'শাঙ্কো এখনও শিকার থেকে ফিরল না, কী ব্যাপার বলো তো?'

—'ঐ তিতিকাকা জঙ্গলে হিংস্র প্রাণী নেই। তবে বিষধর সাপ আছে। শাঙ্কোকে কি সাপেই কামড়াল নাকি, ঠিক বুঝতে পারছি না।' মেস্তিজো বলল।

ফ্রান্সিস ঘাসের বিছানায় আধশোয়া হয়ে ছিল। ভাবল, এভাবে অপেক্ষা করে দুশ্চিন্তাই বাড়বে শুধু। ঐ বনে-জঙ্গলে গিয়েই শাঙ্কোর খোঁজ করা ভাল। ও বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। ডাকল—'বিস্কো অস্ত্র নাও। শাঙ্কোর খোঁজে যাবো।' বিস্কো দেয়ালের খাঁজে রাখা তরোয়ালটা নিল। ফ্রান্সিস বিছানার তলা থেকে নিজের তরোয়াল বার করল। বলল—'মেস্তিজো, তুমি আমাদের পথ দেখাবে চলো।'

তিনজন ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের দিকে চলল। মেস্তিজো সবার সামনে চলল। হাতে জ্বলন্ত মশাল। পাহাড় পেরিয়ে ওপাশে নামল। জঙ্গলে ঢুকল। খুব নিবিড় বন নয়। গাছপালা লতাগাছ এসব বেশ ছাড়া ছাড়া। ওরা মশালের আলোয় গাছপালার মধ্যে দিয়ে চলল। বনে পথ বলে কিছু নেই। বেশ কিছুটা এল। কিন্তু ফ্রান্সিস ভেবে পেল না এই রাতেরবেলা বন-জঙ্গলের মধ্যে কোথায় শাঙ্কোকে খুঁজবে। তবু দু'হাতের তালু মুখের সামনে গোল করে চীৎকার করে ডাকল—'শাঙ্কো—শাঙ্কো—।' কিন্তু নির্জন বনভূমিতে কোনো উত্তর ভেসে এল না। শুধু একটা পাখির দল কিচ্‌মিচ্‌ করে উঠল। রাতজাগা পাখিরা ডানা ঝাপটাল। বিস্কোও একইভাবে চীৎকার করে বলল—'শাঙ্কো, আমরা এসেছি। তোমার কোনো ভয় নেই। শাঙ্কো-ও-।' কিন্তু কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। ওরা এগোতে লাগল।

হঠাৎ ফ্রান্সিসের কানে এল শুকনো ডাল ভাঙার শব্দ। ও থমকে দাঁড়াল। তরোয়ালের হাতলে হাত রেখে ডাকল—'বিস্কো, সাবধান।' ফ্রান্সিসের কথা শেষ হতে না হতেই ওদের চারদিকে শুকনো পাতা ভেঙে কারা ছুটে এল। ওদের চারপাশে ঘিরে দাঁড়াল একদল যোদ্ধা। তাদের হাতে উদ্যত বর্শা। মেস্তিজো যোদ্ধাদের মশালের আলোতে দেখেই চীৎকার করে কী বলে উঠল উনকা ভাষায়। সঙ্গে সঙ্গে যোদ্ধারা বর্শা নামাল। সবাই মাথা নিচু করে মেস্তিজোকে সম্মান জানাল। মেস্তিজো বলল—'ফ্রান্সিস, আপনারা যুদ্ধ করবেন না। এরা আমাদের বন্ধু। এরা উনকা সৈন্য। রাজা কোলার সৈন্যবাহিনীর সৈন্য। যুদ্ধে পরাজয়ের পর এরা এই তিতিকাকা জঙ্গলে আত্মগোপন করে আছে।'

ফ্রান্সিস আর বিস্কো তরোয়াল খুলল না আর। যোদ্ধাদের মাথায় কালো কাপড়ের ফেট্টি। তাতে পাখির পালক গোঁজা। মুখের দুপাশে লাল রঙ লাগানো। ওদের দলনেতা এগিয়ে এল মেস্তিজোর সামনে। মেস্তিজোর সঙ্গে দলনেতা কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলল। তারপর মেস্তিজো ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে বলল—'শাঙ্কোকে এরা রাজা লুপাকার গুপ্তচর ভেবে বন্দী করে রেখেছে। তবে ভয়ের কিছু নেই। শাঙ্কো ভালো আছে।'

—'শাঙ্কোকে ওরা যেখানে রেখেছে সেখানে আমাদের নিয়ে যেতে বলো।' ফ্রান্সিস বলল। মেস্তিজো দলনেতাকে বলল সে কথা। দলনেতা মাথা ঝাঁকাল। কী বলল। তারপর গাছপালার মধ্যে দিয়ে চলল। মেস্তিজো বলল—'চলুন ওদের সঙ্গে।' সবার সামনে দলনেতা মেস্তিজোর মশালটা নিয়ে চলল। পেছনে ফ্রান্সিসরা। ওদের পেছনে যোদ্ধারা। একটু পরে মশালের আলোয় দেখা গেল বনভূমির গাছপালা পাতলা হয়ে এসেছে। সামনে গাছপালার আড়ালে একটা লম্বাটে বাড়ি দেখা গেল। পেইকো ঘাসের ছাউনি। কাঠ পাথর

মিলিয়ে বাড়িটা নতুন তৈরি হয়েছে।

সবাই বাড়িটার সামনে এল। বর্শা হাতে চারজন উনকা যোদ্ধা এগিয়ে এল। মেস্তিজোকে দেখে তারাও মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানাল। ফ্রান্সিস বুঝল উনকারা রাজপুরোহিতের শিষ্য বলে মেস্তিজোকে শ্রদ্ধা করে, ভালোও বাসে। দলনেতা রক্ষী যোদ্ধাদের কী বলল। ওরা চলে গেল। দলনেতার সঙ্গে ফ্রান্সিসরা এসে বাড়িটার সামনের উঠোনে দাঁড়াল। দলনেতা একটা লম্বা ঘর দেখিয়ে মেস্তিজোকে কী বলল। মেস্তিজো ফ্রান্সিসকে বলল—'আপনাদের এই ঘরে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।' ফ্রান্সিসরা ঘরটায় ঢুকল। লম্বাটে ঘর। কাঠ আর পাথরের দেয়াল। ঘরের দু'পাশের দেয়ালে দুটো বাতি জ্বলছে। তার আলোয় দেখা গেল সারা ঘর জুড়ে শুক্‌নো ঘাসের বিছানা। তাতে মোটা কম্বলমতো পাতা। প্রায় আট-দশজন উনকা যোদ্ধা তাতে শুয়ে বসে আছে। ফ্রান্সিসরা এতটা হেঁটে তখন বেশ ক্লান্ত। ওরাও বিছানায় বসল। ঘরের দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা অনেকগুলো বর্শা।

একটু পরেই শাঙ্কো হাসিমুখে ঘরে ঢুকল। ওর কাঁধে তীর ধনুক। ও ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। শাঙ্কোকে সুস্থদেহে দেখে বন্ধুরা খুশি হলো।

—'এখানে তোমার ওপর কোনো অত্যাচার করা হয়নি তো?' ফ্রান্সিস বলল।

—'না-না। এরা আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেছে। কারণ ধরা পড়ার পর আমি বারবার মেস্তিজোর নামটা বলেছি। তাতেই দেখলাম ওরা আমাকে বিশ্বাস করল।' শাঙ্কো তীর ধনুক রেখে বিছানায় এসে বসল। ওরা নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করতে লাগল।

বিস্কো বলল—'ফ্রান্সিস, স্বর্ণমূর্তি-বেদী,—দেবরক্ষীর মাথা সব তো দেখলে। আসল স্বর্ণমূর্তির কোনো হদিস করতে পারলে?'

—'এখনই কিছু বলতে পারছি না। সব বার বার ভালোভাবে দেখতে হবে। সূত্র একটা পাবোই। ফ্রান্সিস বলল। ওরা কথাবার্তা বলছে। তখনই মেস্তিজো ঢুকল। ফ্রান্সিসের পাশে এসে বসল। বলল—'ফ্রান্সিস—এরা তোমাদের আজকে রাতে এখানে অতিথি হিসেবে থাকতে অনুরোধ করেছে।' ফ্রান্সিস বিস্কোর দিকে তাকাল। বিস্কো বলল—'রাতে তো আমাদের কোনো কাজ নেই। থাকি না এখানে। একটা রাতই তো।' ফ্রান্সিস মেস্তিজোর দিকে তাকিয়ে বলল—'বেশ। বন্ধুরা যখন বলছে।'

—'উনকা যোদ্ধারা খুব খুশি হবে। যাই ওদের কথাটা বলে আসি।' মেস্তিজো চলে গেল।

রাত বাড়ল। একসময় একজন উনকা যোদ্ধা এসে ইঙ্গিতে ফ্রান্সিসদের রাতের খাওয়া খেতে ডাকল। ফ্রান্সিসরা ঘরের বাইরে এল। লম্বাটে ঘরের সামনে উঠোনে দেখল তিনকোণা পাতা পেতে দেওয়া হয়েছে। যোদ্ধারা খেতে বসছে পাতার সামনে। ওরাও খেতে বসল। ফ্রান্সিস দেখল উনকা সৈন্যরা সংখ্যায় একশ'রও বেশি। খেতে দেওয়া হলো সেই বীন আলুর তরকারি। ক্যারোপ বীনের গুঁড়ো দিয়ে তৈরি রুটি, সামুদ্রিক মাছের ঘন ঝোলমতো। ওরা খেতে লাগল। খিদেও পেয়েছিল বেশ।

সবারই খাওয়াদাওয়া শেষ হলো। ফ্রান্সিসরা আগের ঘরে এসে বিছানায় বসল। অন্য যোদ্ধারাও এসে বসল। কেউ কেউ শুয়ে পড়ল। ওরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলতে লাগল। ফ্রান্সিসরা সেই উনকা ভাষার বিন্দুবিসর্গও বুঝল না। তবে মাঝে মাঝে ওদের কথাবার্তার মধ্যে রাজা লুপাকার নাম ওরা শুনছিল।

কিছুক্ষণ পরে মেস্তিজো এল। পেছনে সেই দলনেতা। ওরা দু'জনে ফ্রান্সিসের কাছে এসে বসল। মেস্তিজো দলনেতাকে দেখিয়ে ফ্রান্সিসকে বলল—'ওরা বলছিল তোমরা ওদের কোনোভাবে সাহায্য করতে পারো কিনা।' ফ্রান্সিস ঠিক বুঝল না, মেস্তিজো কী বলতে চাইছে। ফ্রান্সিস বলল—'একটু বুঝিয়ে বলো।'

—'ফ্রান্সিস—' মেস্তিজো বলল—'তোমরা ভাইকিং। তোমাদের শৌর্যবীর্যের কথা খুব ছেলেবেলায় আমি শুনেছি। তাই আমিও চাই তোমরা এদের সাহায্য কর। তোমাদের সাহায্য পেলে ওদের সাফল্য সুনিশ্চিত।'

—'কীভাবে সাহায্য করবো সেটা বলো।' ফ্রান্সিস বলল।

—'এই উনকা যোদ্ধারা এই তিতিকাকা বনে আশ্রয় নিয়ে ঘাঁটি গেড়েছে। সব উনকা যুবকদের একত্রিত করছে। শক্তি সংগ্রহ করে ওরা কিছুদিন পরেই রাজা লুপাকার সৈন্যবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। যে করেই হোক, ওরা উনকাদের রাজ্য থেকে সৈন্যসহ রাজা লুপাকাকে তাড়াবে। এটাই ওদের প্রতিজ্ঞা। দেশ ও জাতিকে যে করেই হোক শত্রুর হাত থেকে বাঁচাবে। সেইজন্যে ওরা তোমাদের সাহায্য চায়।' মেস্তিজো বলল।

ফ্রান্সিস একটুক্ষণ ভাবল ব্যাপারটা। হ্যারি থাকলে ভালো হতো। ওর পরামর্শ নেওয়া যেত। ফ্রান্সিসকে একাই ভাবতে হলো সব। ভেবে নিয়ে ও বলল—'তার মানে ওরা চাইছে আমরা যেন ওদের দলে যোগ দিই—রাজা লুপাকার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে নামি।'

—'হ্যাঁ, তোমাদের সাহায্যে উনকাদের রাজ্য উদ্ধার করতে পারলে ওরা তোমাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।' মেস্তিজো বলল।

ফ্রান্সিস বলল—'কিন্তু মেস্তিজো—রাজা লুপাকা তো এখনও আমাদের কোনো ক্ষতি করেনি। অবশ্য গুপ্ত স্বর্ণমূর্তি উদ্ধারের পর রাজা লুপাকা অন্য চেহারা নিতে পারে। এমনকি আমাদের হত্যাও করতে পারে। আমি সেটা ভালো করেই জানি। রাজা লুপাকা অসৎ ও লোভী। তবু এখনও তো ও আমাদের বিপদে ফেলেনি। কাজেই আমরা কেন রাজা লুপাকার বিরুদ্ধে যুদ্ধে জড়াতে যাবো। এসব তোমাদের ব্যাপার। তোমরাই মিটিয়ে নাও।'

—'তাহলে তোমরা এদের সাহায্য করবে না?' মেস্তিজো বেশ মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বলল।

—'না, এই অবস্থায় পারবো না। তাছাড়া ভেবে দেখ—মারিয়া এখন রাজা লুপাকার হাতের মুঠোয়। মারিয়া বন্দিনী। আমরা যুদ্ধে উনকাদের সাহায্য করছি, এ সংবাদ রাজা লুপাকা পাবেই। তখন মারিয়ার জীবন বিপন্ন হতে পারে। সবদিক ভেবে বলছি এখন, আমাদের এসব ব্যাপারে না জড়ানোই ভালো।' ফ্রান্সিস আস্তে আস্তে বলল।

মেস্তিজো আর কিছু বলল না। দলনেতাকে উনকা ভাষায় কী বলে গেল। বোধহয় ফ্রান্সিসের কথাগুলোও বলল। দলনেতা দু-একবার মাথা নেড়ে উঠে চলে গেল। মেস্তিজো ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়তে পড়তে বলল—'আজ হোক, কাল হোক—লড়াই হবেই।'

রাত বাড়ল। ফ্রান্সিসরা ঘাসের বিছানায় শুয়ে পড়ল। সবাই ঘুমিয়ে পড়ল। শুধু ফ্রান্সিসের চোখে ঘুম নেই। ও তখন ভাবছে—গুপ্ত স্বর্ণমূর্তি উদ্ধার করা যাবে কি? কোনো সূত্রই তো পাচ্ছি না। এখানে বেশিদিন থাকাও চলবে না। দেরি দেখে হয়তো বন্ধুরা এসে হাজির হবে। আবার স্বর্ণমূর্তির সন্ধান করতে ওরা ব্যর্থ হলে লোভী রাজা লুপাকা কী চেহারা ধরে কে জানে? হয়তো ওদেরও মারিয়ার মতো বন্দী করে রাখতে পারে। এসব ভাবতে ভাবতে ফ্রান্সিস ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন সকালেই ওরা চিকামায় নিজেদের আস্তানায় ফিরে এল। আসার সময় দলনেতা ফ্রান্সিসকে বেশ সুন্দর ফুল-লতাপাতার কাজ করা একটা পাখা উপহার দিল। ফ্রান্সিস খুব খুশি হলো। বারবার বলল—'ধন্যবাদ।' মেস্তিজো কথাটা বুঝিয়ে দিল দলনেতাকে।

বিকেলে মারিয়া এল। সঙ্গে সেই দু'জন চিমু

পাহারাদার সৈন্য। মেস্তিজো সারা দুপুর টানা ঘুমিয়ে তখনই উঠল। আড়মুড়ি ভাঙতে ভাঙতে বলল—'যাবে না কি হুয়াকার উৎসবে?'

—'কোথায় হবে? বিস্কো জানতে চাইল।

—'ঐ হুয়াকা দেবতার স্বর্ণমূর্তির বেদীর সামনে। নাচগান হবে। রাজা লুপাকা রানী দু'জনেই নাকি আসবে। রাজা লুপাকা এখন চেষ্টা করছে উনকাদের মন জয় করতে। যাবে তোমরা?

মারিয়া খুশির চোটে হাততালি দিল। বলল—'ফ্রান্সিস, চলো না।'

—'যাবো তো কিন্তু রাজা লুপাকা কী তোমাকে ওখানে যাবার অনুমতি দেবে?' ফ্রান্সিস বলল।

—'কেন দেবে না? আমি তো আর পালিয়ে যাচ্ছি না।' মারিয়া বলল।

—'ঠিক আছে। মেস্তিজো, কখন আরম্ভ হবে উৎসব?' ফ্রান্সিস বলল।

—'একটু রাতে। আমরা খেয়ে-দেয়ে যাবো। উৎসব বেশ কিছুক্ষণ চলবে।' মেস্তিজো বলল।

—'তাহলে এক কাজ কর মেস্তিজো। তুমি মারিয়াকে নিয়ে রাজা লুপাকার কাছে যাও। রাজাকে বল যেন মারিয়াকে উৎসব দেখতে যেতে অনুমতি দেয়। অবশ্য সঙ্গে পাহারাদার থাকবে।' ফ্রান্সিস বলল।

—'দেখি বলে।' 'মেস্তিজো ঘাসের বিছানা ছেড়ে উঠল। মারিয়াকে নিয়ে রাজবাড়িতে গেল।

ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই মেস্তিজো ফিরে এল মারিয়াকে নিয়ে। সঙ্গে সেই দু'জন চিমু পাহারাদার। হেসে বলল—'রাজা লুপাকার মেজাজ এখন খুব ভালো। চিকামার গণ্যমান্য উনকারা নাকি দল বেঁধে রাজারানীকে উৎসবে আসার জন্যে নিমন্ত্রণ করে গেছে। কাজেই মারিয়ার অনুমতি বলার সঙ্গে সঙ্গেই পাওয়া গেছে।'

রাতের খাওয়া-দাওয়া সারল ফ্রান্সিসরা। মারিয়ার পাহারাদার সৈন্য দু'জনও ওদের সঙ্গে খেল।

একটু রাত হতেই সবাই চলল উৎসব প্রাঙ্গণের দিকে। ফ্রান্সিস উপহার পাওয়া পঞ্চো পরল। মারিয়া তাই দেখে হাসতে লাগল।

হুয়াকা দেবতার স্বর্ণমূর্তির বেদীর সামনের প্রাঙ্গণে উৎসবের আয়োজন হয়েছে। দেবতার পুজো দুপুরবেলাই হয়ে গেছে। স্বর্ণমূর্তি অর্থাৎ কাঠের মূর্তি ফুলে পাতায় প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। বেদীতেও ফুললতাপাতার স্তূপ। প্রাঙ্গণের চারিদিকে মশাল জ্বলছে। উৎসব প্রাঙ্গণ আলোয় আলোময়। প্রাঙ্গণের চারপাশে বহু নারী-পুরুষ-শিশুরা জড়ো হয়েছে। গাছের গুঁড়ি কুরে তার মুখে ভেড়ার চামড়া আটকে বাজনা তেরি করা হয়েছে। সেটাই একজন দমাদম বাজাচ্ছে। কচ্ছপের নাড়ি দিয়ে তৈরি বাজনা আর একজন বাজাচ্ছে। টানা টানা সুরের বাজনা।

একটু পরেই দু'টো পাহাড়ী ঘোড়ায় চেপে রাজা লুপাকা আর রানী এল। সামনে পেছনে রাজার দেহরক্ষীরা। দু'জনেই বেশ সেজেগুজে এসেছে। রাজার মাথায় বেশ মোটা করে হলুদ ফেট্টি বাঁধা। তাতে একটা ধবধবে সাদা পাখির লম্বা পালক। রানীর ঢিলেঢালা পোশাকে কাঁচের টুকরো বসানো। মশালের আলোয় ঝিকিয়ে উঠছে সেসব। উপস্থিত উনকারা কেউ কিন্তু রাজারানীর জয়ধ্বনি করল না। শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল। শুধু উপস্থিত চিমু সৈন্যরা হাতের বর্শা আকাশের দিকে তুলে তুলে কী বলল সমস্বরে চীৎকার করে। বোধহয় রাজা লুপাকা ও রানীর জয় ঘোষণা করল।

দেবরক্ষীর মূর্তি সেই মাথাটার নিচেই পাথরের আসন। রাজারানী ঘোড়া থেকে নেমে সেই আসনে বসল। শুরু হলো বাজনা। খুব সেজেগুজে একদল উনকা মেয়ে প্রাঙ্গণে ঢুকল। তাদের গায়ে উজ্জ্বল সুতোর নক্সা আঁকা ঢিলেঢালা পঞ্চো। মাথার বিনুনিতে নানা রঙের ফুল গোঁজা। মাথায় কপালে লাল মোটা ফেট্টি বাঁধা। তাতে নানা রঙের পাখির পালক। বাজনার তালে তালে শুরু হলো মেয়েদের নাচ। নাচের সঙ্গে বেশ চড়া সুরে মেয়েরা গানও গাইতে লাগল। ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল। দর্শকরা চীৎকার করে তাদের উৎসাহিত করতে লাগল।

নাচগান থামল। রানী হাত তুলে আবার নাচিয়েদের নাচগান করতে নির্দেশ দিল। আবার বাজনা বেজে উঠল। শুরু হলো নাচ আর সেইসঙ্গে গান। সেই গান উনকা ভাষার গান। ফ্রান্সিসরা কিছুই বুঝল না। মেস্তিজো ফ্রান্সিসকে বলল—'এটা হচ্ছে হুয়াকা দেবতাকে বন্দনার গান।' নাচগান চলল কিছুক্ষণ। দর্শকরা নাচিয়েদের দিকে ফুল ছুঁড়ে দিতে লাগল। চীৎকার করে উনকা ভাষায় কী বলতে লাগল। বোধহয় নাচিয়েদের বাহবা দিতে লাগল।

নাচগান শেষ হলো। বাজনা বন্ধ হলো। গোলমাল থামতে হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে থেকে একটি তরুণ নাচিয়ে মেয়েদের সামনে এসে দাঁড়াল। দর্শকরা অবাক। তরুণটির মুখ মশালের আলোয় উজ্জ্বল। উত্তেজনায় তরুণটির ঠোঁটদুটো কাঁপছে। তরুণটি মুখের কাছে হাতের চেটো গোল করে চিৎকার করে কী বলে উঠল। মেস্তিজো ফ্রান্সিসকে বলল—'সর্বনাশ। ছেলেটি রাজা কোলার জয়ধ্বনি দিচ্ছে। ও বিপদে পড়বে।' তারপরই তরুণটি তীক্ষ্ণস্বরে একটা গান ধরল। মুহূর্তে দর্শকদের মধ্যে ভীষণ চাঞ্চল্য জাগল। মেস্তিজো ফ্রান্সিসকে বলল—'ছেলেটি রাজা কোলার গুণকীর্তন করে গান গাইছে। উনকারা সবাই এই গান জানে।' সত্যিই দেখা গেল সব দর্শকরা—বেশির ভাগই উনকা উঠে দাঁড়িয়েছে। তরুণটির গানের সঙ্গে ততক্ষণে গলা মিলিয়েছে নাচিয়ে উনকা মেয়েরাও। আস্তে আস্তে উপস্থিত প্রায় সব দর্শকরা সেই গানের সঙ্গে গলা মিলাল।

ওদিকে রাজা লুপাকা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। রানীও। রাগে রাজা লুপাকার মুখ লাল হয়ে গেছে। তার চিরশত্রু রাজা কোলার গুণগান গাইছে তারই সামনে। অসহ্য। রাজা চীৎকার করে কী বলে উঠল। চিমু সৈন্যরা বর্শা হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল উনকাদের ওপর। উনকাদের মুখে গান বন্ধ হয়ে গেল। গান থামিয়ে নাচিয়ে মেয়েরাও প্রাঙ্গণ থেকে পালাল। দর্শকদের চীৎকার চ্যাঁচামেচি শুরু হলো। শুধু সেই তরুণটি একা তখনও গান গেয়ে চলেছে। রাজা লুপাকা তার দেহরক্ষীর একজনকে ইঙ্গিত করল। রক্ষীটি ছুটে এসে তরুণটির বুকে বর্শা বিঁধিয়ে দিল। তরুণটি উবু হয়ে উৎসব প্রাঙ্গণে পড়ে গেল। ওর গান বন্ধ হয়ে গেল। কয়েকবার নড়ে ওর দেহটা স্থির হয়ে গেল।

শাঙ্কো অসহিষ্ণু স্বরে বলে উঠল—'ইস্, সঙ্গে যদি তীর ধনুকটা থাকতো ঐ দেহরক্ষীটাকে আমি এক্ষুনি নিকেশ করতাম।' ওদিকে লোকজন সব ছুটোছুটি করে এদিক ওদিক পালাতে শুরু করেছে। চিমু সৈন্যদের বর্শার ঘায়ে কিছু লোক জখমও হয়েছে। অল্পক্ষণের মধ্যে সেই প্রাঙ্গণ জনশূন্য হয়ে গেল। আহত লোকদের আর্ত চীৎকার শোনা যেতে লাগল।

ফ্রান্সিস মেস্তিজোকে বলল—'শীগগির তোমাদের কোনো বৈদ্যকে ডেকে নিয়ে এসো। আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা কর।' ফ্রান্সিস বিস্কো আর শাঙ্কো আহত লোকজনদের ধরাধরি করে প্রাঙ্গণের একধারে এনে শুইয়ে দিল। মারিয়া নিজের ঢোলা পোশাক থেকে কাপড় ছিঁড়ে আহতদের ক্ষতস্থান বেঁধে দিতে লাগল। তাতে কারো কারো ক্ষতস্থান থেকে রক্তপড়া বন্ধ হলো। একটু পরেই মেস্তিজো একজন বৈদ্যকে নিয়ে এল। সে তার ঝোলা থেকে ওষুধ বের করে আহতদের ক্ষতস্থানে লাগিয়ে দিতে

লাগল। ফ্রান্সিস ডেকে বলল—'মারিয়া, এবার চলো। আমাদের আর কিছু করার নেই।'

ফ্রান্সিসরা ফিরে এল। মেস্তিজো আহতদের দেখাশুনো করার জন্যে থেকে গেল। বিশেষ করে মৃত তরুণটির সৎকারের জন্যেই মেস্তিজোকে ফ্রান্সিস থাকতে বলল। ফেরার পথে ফ্রান্সিসের বারবার সেই উদ্দীপ্তমুখ গাইয়ে তরুণটির কথা মনে পড়তে লাগল। ওর মনটা বেশ খারাপ হয়ে গেল।

তারপর কয়েকদিন কাটল। ওদিকে জাহাজে ফেরার তাগিদ রয়েছে। ফ্রান্সিসদের ফিরতে দেরি হলে হয়তো বন্ধুরা এসে হাজির হবে।

সেদিন বিকেলের দিকে মারিয়া ফ্রান্সিসদের আস্তানায় এল। সঙ্গে দু'জন রক্ষীও এল। মারিয়া বলল—'ফ্রান্সিস, চলো বেড়িয়ে আসি।' বিস্কো আর শাঙ্কো বলল—'চলো আমরাও যাবো।' মেস্তিজোও ওদের সঙ্গী হলো। চিকামার রাস্তা দিয়ে চলল ওরা। চিমু সৈন্যরা, চিকামার অধিবাসীরা ওদের চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। এই ভিনদেশী মানুষগুলো বিশেষ করে ঐ মেয়েটি অর্থাৎ মারিয়া যে কেন এখানে এসেছে, কেন এখনো আছে তাই ওরা ভেবে পেল না।

হুয়াকা দেবতার সেই কাঠের নকল মূর্তির বেদীর কাছে যখন ওরা পৌঁছল তখন বিকেল হয়ে গেছে। ওরা দেখল নকল মূর্তিটি তেমনি ফুলপাতায় প্রায় চাপা পড়ে গেছে। চিকামার উনকা লোকেরা আসছে ফুলপাতা হাতে। পুজো দিচ্ছে। ফুলপাতা দিচ্ছে মূর্তিতে। বেদীও ঢেকে গেছে ফুলপাতায়। কিছু লোক আবার বিরাট উঁচু কাঠের মই বেয়ে বেয়ে উঠে দেবরক্ষীর মাথায় গলায় ফুলপাতা ছুঁড়ে দিচ্ছে। অত উঁচু মইটা বোধহয় পুজো দেবার সুবিধের জন্যেই এখন লাগানো হয়েছে। ফ্রান্সিস ভাবল—হুয়াকার মূর্তিটা তো কাছ থেকে দেখেছি কিন্তু দেবরক্ষীর মূর্তিটা ভালো করে দেখা হয়নি। কারণ তখন মইটা ছিল না। ফ্রান্সিস বলল—'মারিয়া, তোমরা অপেক্ষা কর। দেবরক্ষীর মাথাটা কাছ থেকে দেখে আসছি।'

ফ্রান্সিস কাঠের সেই অনেক উঁচু মইটার কাছে গেল। তারপর ওপর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে মইটা বেয়ে বেয়ে উঠতে লাগল। উঠতে উঠতে মূর্তির মুখের কাছে এল। মোটা ঠোঁট দাঁত পেরলো। নাক ছাড়ালো। চোখ দুটো পুরো গোল নয়। কেমন চৌকো মতো। চোখ দুটো পার হলো। কপাল পার হলো। উঠে এল মাথার উষ্ণীষের কাছে। এতক্ষণ গলা মুখ নাক চোখ সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে এসেছে। কিন্তু মনোযোগ আকর্ষণ করে এমন কিছুই দেখতে পেল না। দেবরক্ষীর উষ্ণীষের ওপর নামল ফ্রান্সিস। চারদিকে তাকিয়ে দেখল বিকেলের নরম আলোয় অনেকদূর দেখা যাচ্ছে। চিকামার রাজবাড়ি বাড়িঘর রাস্তা তিতিকাকা বন দূরে সমুদ্রের দিকে পাহাড়ের সারি সব দেখা গেল। নিচের দিকে তাকিয়ে হুয়াকার মূর্তি বেদী পূজার্থী ও মারিয়াদের দেখল। ফ্রান্সিস মনে মনে রাজা কোলার প্রশংসা করল। একটা ছোট পাহাড় কেটে এইরকম মূর্তির মাথা তৈরি করা শুধু পরিশ্রমের কাজই নয় সেইসঙ্গে শিল্পবোধও থাকা চাই।

এবার ফ্রান্সিস নামবার জন্যে মইয়ে পা রাখল। তারপর আস্তে আস্তে নামতে লাগল। উষ্ণীষ পার হলো। যখন মূর্তিটার কপালের কাছে এল তখনই মূর্তিটার কপালের দিকে তাকিয়ে ফ্রান্সিস থমকে দাঁড়াল। কপালে কী যেন কুঁদে আঁকা। ও প্রথমে ভাবল হয়তো কপালের কোনো অলঙ্কার। ভালো করে দেখল। সন্দেহ হলো অলঙ্কার নয়—কী যেন পাথর কুঁদে লেখা। বিদ্যুৎচমকের মতো হঠাৎ ওর মনে পড়ল রাজপুরোহিত ল্লামার শেষ কথাটা— রাজা কোলা যে কথাটা বলেছিলেন—'সবই ললাটের লিখন।' তাহলে তো এই মূর্তিটার কপালে নিশ্চয়ই কিছু লেখা আছে। এই লেখাটা তো তাহলে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কী লেখা আছে কপালে?

ফ্রান্সিস দ্রুত নেমে এল মই বেয়ে। ফ্রান্সিসকে এভাবে দ্রুত নেমে আসতে দেখে মারিয়ার সবাই বেশ আশ্চর্য হলো। কী হলো ফ্রান্সিসের? নিশ্চয়ই একটা কিছু ঘটেছে।

ফ্রান্সিস মই থেকে নেমে মেস্তিজোর কাছে ছুটে এল। বলল—'মেস্তিজো, রাজা কোলা বলেছিলেন সবই ললাটের লিখন। তাই কিনা?'

—'হ্যাঁ।' মেস্তিজো বলল কিন্তু ফ্রান্সিস এই কথাটা বলছে কেন ও ঠিক বুঝল না। কথাটার এত গুরুত্বই বা দিচ্ছে কেন।

—'তোমার গুরুদেব রাজপুরোহিতও এই কথাটাই বলেছিল সবই ললাটের লিখন। তাই কিনা?'

—'হ্যাঁ।'

—'চলো মই বেয়ে উঠতে হবে। এসো তাড়াতাড়ি।' ফ্রান্সিস বলল।

মেস্তিজো ফ্রান্সিসের এই পাগলামির কারণ বুঝল না। তবু ফ্রান্সিসের কথামতো মইয়ের কাছে এল। দু'জনে মই বেয়ে উঠতে লাগল। ফ্রান্সিস উঠতে উঠতে বলল—'মেস্তিজো, তুমি, তোমার গুরুদেব রাজপুরোহিত আর রাজা কোলা মিলে এই মূর্তিটা বানিয়েছিলে। পাথর কুঁদে।'

—'হ্যাঁ।' মেস্তিজো বলল—'তবে বলতে পারো রাজা কোলার কৃতিত্বই বেশি। সমস্ত পরিকল্পনাটাই রাজা কোলার। উনিই পাথর কেটেছেন কুঁদেছেন আমরা শুধু পাথর মসৃণ করেছি।'

দেবরক্ষীর কপালের কাছে এসে ফ্রান্সিস বলল—'ললাটের লিখন মানে কপালের লেখা।' এবার মূর্তির কপালের সেই লেখাগুলো দেখাল। 'বলো তো ওগুলো কী লেখা? মেস্তিজো লেখাগুলো দেখল। লেখাগুলো দেখতে এমনি—

(০ ৪ ৮ ১২ ১৬)

মেস্তিজো মনোযোগ দিয়ে লেখাগুলো দেখে বলল—'এগুলো কোনো লেখা নয়। পর পর কয়েকটা উনকা ভাষায় অঙ্কের সংখ্যা কুঁদে লেখা। আমার মনে হয় রাজা কোলা এগুলো পরে কুঁদে লিখেছিলেন।'

—'বলো তো সংখ্যাগুলো কী?' ফ্রান্সিস বলল।

মেস্তিজো পড়ে পড়ে বলল—০ ৪ ৮ ১২ ১৬।' ফ্রান্সিস আশা করেছিল লুকানো স্বর্ণমূর্তির সম্বন্ধে কোনো সাঙ্কেতিক লেখা। এখন বুঝল এগুলো অঙ্ক। একটু হতাশই হলো। তবু অঙ্কগুলো মনে মনে মুখস্থ করল। বলল—'কিছু লেখা নেই?'

—'না। কিন্তু এই অঙ্কগুলো দিয়ে তোমার কী হবে?' মেস্তিজো বলল।

—'হবে হবে। তবে অনেক ভাবতে হবে এই অঙ্কগুলো নিয়ে। তবেই রহস্য ভেদ করা যাবে। রাজা কোলা যখন নিজে এই অঙ্কগুলো কুঁদে লিখেছিলেন তখন নিশ্চয়ই এই অঙ্কগুলোর গুরুত্ব আছে। তাছাড়া 'ললাটের লিখন' কথাটা ভুলে যেও না।' ফ্রান্সিস বলল।

এবার ফ্রান্সিস নামতে লাগল। ও তখনও অঙ্কের সংখ্যাগুলো নিয়ে ভেবে চলেছে। সঙ্গে মেস্তিজোও নামতে লাগল। মূর্তিটার মুখের কাছে এসে মুখটা দেখতে লাগল। মোটা ঠোঁট মূর্তিটার। প্রায় চৌকোনা। দাঁতগুলো পর পর সাজানো। ফ্রান্সিস কিছুটা অন্যমনস্ক ভঙ্গীতেই দাঁতগুলো দেখতে লাগল। হঠাৎ ওর মনে হলো—অঙ্কের ব্যাপার যখন, তখন দাঁতগুলো সংখ্যায় কটা দেখতে হয়। ও গুনলো। মোট ১৬টা দাঁত। এবার মূর্তিটার কপালের দিকে তাকাল। ঐ তো ওখানে শেষ সংখ্যা—১৬। আশ্চর্য! তাহলে তো সংখ্যাগুলোর সঙ্গে

যোলটা দাঁতের একটা সম্পর্ক রয়েছে। কী সেই সম্পর্ক?

মই বেয়ে দু'জনে নেমে এল। মারিয়া বিস্কো শাঙ্কো এগিয়ে এল। মারিয়া বলল—'কী ব্যাপার ফ্রান্সিস? তোমাকে বেশ উত্তেজিত মনে হচ্ছে।' একটু হাঁপাতে হাঁপাতে ফ্রান্সিস বলল—'হ্যাঁ মারিয়া, স্বর্ণমূর্তির রহস্যের সমাধান প্রায় হাতের মুঠোয়। তবে ভাবনাচিন্তা করতে হবে।'

বিস্কো শাঙ্কো জানে ফ্রান্সিস এসব ব্যাপারে কখনও বাজে কথা বলে না। ও নিশ্চয়ই মূর্তি উদ্ধারের কোনো হদিস পেয়েছে।

ওদের মধ্যে আর কোনো কথা হলো না। মারিয়া এই ব্যাপারে ফ্রান্সিসকে কোনো প্রশ্ন করল না। সময় হলে ফ্রান্সিস সব বলবে। ফ্রান্সিসরা নিজেদের আস্তানায় ফিরে এল। মারিয়াকে নিয়ে রক্ষী দু'জন রাজবাড়ি চলে গেল।

ফ্রান্সিস ঘরে ঢুকে কিছুক্ষণ ঘাসের বিছানায় চিৎ হয়ে শুয়ে রইল। মেস্তিজোর মনে তখনও সংশয়। ফ্রান্সিস কি পারবে? দেবরক্ষী মূর্তির কপালে কয়েকটা অঙ্কের সংখ্যা লেখা আছে। তা থেকে কি স্বর্ণমূর্তি কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে তা বের করা যাবে?

ফ্রান্সিস উঠে বসল। বলল—'মেস্তিজো, তুমি দু'টো কাজ কর। লেখবার জন্যে একটা সাদা চামড়া আর কালি কলম নিয়ে এসো। আর তোমার হাতুড়ি ছেনি কোথায় আছে?'

—'এখানেই—আমার পুরোনো আস্তানায়।' মেস্তিজো বলল।

—'ওদু'টোও নিয়ে এসো।' ফ্রান্সিস বলল।

মেস্তিজো চলে গেল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে এল। হাতে সাদা চামড়া আর পালকের কলম্। দোয়াতদান। হাতুড়ি ছেনিও সঙ্গে এনেছে।

ফ্রান্সিস নিল সে সব। মেস্তিজো বিস্কো শাঙ্কো সাগ্রহে এগিয়ে এল। দেখা যাক ফ্রান্সিস কী করে এসব নিয়ে। ফ্রান্সিস ভেড়ার চামড়ায় কালি কলমে লিখল—

০ ৪ ৮ ১২ ১৬

সংখ্যাগুলো লিখে ও ভাবতে লাগল এই সংখ্যাগুলো নিশ্চয়ই কোনো একটি নির্দিষ্ট সংখ্যার দিকে ইঙ্গিত করছে। সে সংখ্যাটা কত? ফ্রান্সিস ভাবতে লাগল। মেস্তিজো বিস্কো শাঙ্কো বোকার মতো সেই সংখ্যাগুলোর দিকে তাকিয়ে রইল। এই সংখ্যাগুলো দিয়ে কী হবে তা ওরা বুঝতেই পারল না। সংখ্যাগুলো মুখে আওড়াতে আওড়াতে ফ্রান্সিস লক্ষ্য করল সব সংখ্যার মধ্যে ব্যবধান রয়েছে চার অঙ্কের। তাহলে ৪ই সেই নির্দিষ্ট সংখ্যা যার প্রতি এই সংখ্যাগুলো ইঙ্গিত করছে।

ফ্রান্সিস খুশির হাসি হাসল। উৎসাহে উঠে দাঁড়াল। মেস্তিজো ভেবে পেল না ফ্রান্সিসের এত উৎসাহের কারণ কী? ফ্রান্সিস বলল— 'মেস্তিজো চলো দেবরক্ষীর মূর্তিতে উঠবো।'

—'কেন?' মেস্তিজো বলল।

—'তুমি হাতুড়ি ছেনি দিয়ে দেবরক্ষীর মূর্তির চার নম্বর দাঁতটা তুলবে।' ফ্রান্সিস বলল।

মেস্তিজো অবাক। বলল, 'তোমার কি মাথা খারাপ হলো?'

— সেটা পরে বুঝবে? চলো।' ফ্রান্সিস বলল।

সবাই দেবরক্ষীর মূর্তির সামনে এল। তখন রাত হয়েছে। বেদী প্রাঙ্গণ জনশূন্য। বেদীর সামনে প্রাঙ্গণের ধারে মশাল জ্বলছে। চারপাশ মোটামুটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

ফ্রান্সিস মইটার সামনে এল। মেস্তিজোকে ইঙ্গিতে মই বেয়ে উঠতে বলল। দু'জনে মই বেয়ে উঠতে লাগল। মেস্তিজোর হাতে হাতুড়ি ছেনি। বিস্কো শাঙ্কো নিচে দাঁড়িয়ে রইল।

মই বেয়ে উঠতে উঠতে দু'জনে মূর্তিটার মুখের কাছে এল। ফ্রান্সিস বলল—'মূর্তির পাথরটা কি খুব শক্ত?'

—'না-না। এটা বোসেটা পাথর কেটে তৈরি। বোসেটা পাথর সাধারণ পাথরের চেয়ে নরম।'

—'তাহলে চার সংখ্যার দাঁতটা ছেনি দিয়ে কেটে তোলো।' ফ্রান্সিস বলল।

মেস্তিজো হাতুড়ি ছেনি হাতে চার নম্বর দাঁতটার কাছে মইয়ে পা রেখে দাঁড়াল। এই মূর্তি তৈরির সময় ও পাথর কাটার কাজ করেছে। ওর অভ্যেস আছে এই ভাস্করের কাজে। ও চার সংখ্যার দাঁতটায় হাতুড়ি ছেনি চালাতে চালাতে হেসে বলল—'তোমার ধারণা এই দাঁতের খোঁদলে স্বর্ণমূর্তি আছে?'

—'ধারণা নয়, বিশ্বাস।' ফ্রান্সিস আস্তে বলল। ও একটা মশাল নিয়ে এসেছিল। সেটা মেস্তিজোর সামনে ধরে রইল। উত্তেজনায় ওর হাত কাঁপছে। নির্জন মন্দির প্রাঙ্গণে হাতুড়ি ছেনির ঠক্ ঠক্ শব্দ উঠছে। মেস্তিজো পাথর-দাঁত ভাঙতে লাগল। সত্যিই বোসেটা পাথর তেমন শক্ত নয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই দাঁত অনেকটা ভেঙে খোঁদল দেখা গেল। কিন্তু খোঁদল শূন্য। কিছু নেই তাতে। মেস্তিজো একটু হাঁপাতে হাঁপাতে বলল—'পেলে কিছু?'

—'হিসেব মেলেনি। আবার ভাবতে হবে। চলো নামি।' ফ্রান্সিস মই বেয়ে নামতে লাগল। পেছনে মেস্তিজো। বিস্কো শাঙ্কো তখন নিচে দাঁড়িয়ে ভাবছে ফ্রান্সিস কি সত্যিই লুকোনো স্বর্ণমূর্তি খুঁজে পেল? ফ্রান্সিস আর মেস্তিজোকে আস্তে আস্তে নামতে দেখে ওরা বুঝল ফ্রান্সিস ব্যর্থ। স্বর্ণমূর্তি উদ্ধার করতে পারেনি।

ফ্রান্সিসরা আস্তানায় ফিরে এল। পথে কেউ কোনো কথা বলল না। ঘাসের বিছানায় আধশোয়া হয়ে ফ্রান্সিস অঙ্কের সমাধান ভাবতে লাগল।

পরদিন সকালে ফ্রান্সিসের স্বর্ণমূর্তি উদ্ধারে কথা চিকামায় ছড়িয়ে পড়ল। লোকজন বেদীর সামনে এসে ভিড় করল। দেখল দেবরক্ষীর দাঁত ভাঙা। ওরা বুঝে উঠতে পারল না মূর্তি উদ্ধার করতে দেবরক্ষীর দাঁত ভাঙা হলো কেন।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর ফ্রান্সিসরা বিশ্রাম করছে। রাজবাড়ি থেকে রাজার একজন দেহরক্ষী এল। ফ্রান্সিসকে কী বলল। ফ্রান্সিস কিছুই বুঝল না। মেস্তিজোর দিকে তাকাল। মেস্তিজো বলল—'রাজা লুপাকা তোমাকে ডেকেছে।'

—'ও। ঠিক আছে। তুমিও আমার সঙ্গে চলো। নইলে কেউ কারো কথা বুঝব না।' ফ্রান্সিস বলল।

মেস্তিজোও ফ্রান্সিসের সঙ্গে রাজবাড়ি চলল।

রাজা লুপাকা পাথরের সিংহাসনে বসেছিল। ফ্রান্সিস ও মেস্তিজো সামনে এসে দাঁড়াল। মেস্তিজো মাথা নুইয়ে সম্মান জানাল। ফ্রান্সিস মাথা নোয়াল না। এই লুপাকার আদেশেই সেদিন গায়ক তরুণটি প্রাণ হারিয়েছিল। এই বেদনা ফ্রান্সিস ভুলতে পারেনি। দু'জনের কথাবার্তার মধ্যে মেস্তিজো দোভাষীর কাজ করল। রাজা ও ফ্রান্সিসের মধ্যে কথাবার্তা হলো এইরকম—

রাজা—'স্বর্ণমূর্তি উদ্ধার করতে পারবে?'

ফ্রান্সিস—'হ্যাঁ।'

রাজা—[হেসে] 'কোনোদিনই পারবে না।'

ফ্রান্সিস—'দেখা যাক। অপেক্ষা করুন।'

রাজা—'না, আমি আর অপেক্ষা করবো না। দু'দিন সময় দিলাম। হয় স্বর্ণমূর্তি উদ্ধার করো, নইলে আমার রাজত্ব থেকে বিদেয় হও।'

ফ্রান্সিস—'দু'দিন অনেক সময়।'

রাজা—'আর একটা কথা। শুনলাম তুমি সোনার মূর্তি খুঁজতে গিয়ে দেবরক্ষীর মূর্তির ক্ষতি করেছো। ঐ মূর্তির আর ক্ষতি করা চলবে না।'

ফ্রান্সিস—'কিন্তু ঐ মূর্তি তো আপনার চিরশত্রু রাজা কোলার হাতে তৈরি।'

রাজা—'ঐ মূর্তির নিচে আমি আমার নাম

ভাস্কর হিসেবে খোদাই করে দেব। ওটা আমার তৈরি বলে সবাই জানবে।'

ফ্রান্সিস—'বেশ। তবে একটা কথা। ঐ মূর্তির আর একটু ক্ষতি আমি করবো, কারণ প্রথমবারে আমার হিসেব মেলেনি। এটুকু আপনাকে মেনে নিতে হবে।'

রাজা—'যদি স্বর্ণমূর্তি পাই তবে এটুকু মেনে নিতে আমার আপত্তি নেই।'

ফ্রান্সিসের সঙ্গে আর কোনো কথা হলো না। ওরা দু'জনে আস্তানায় ফিরে এল।

বিকেলে মারিয়া যেমন আসে এল। সঙ্গে রক্ষী দু'জন। মারিয়া ফ্রান্সিসের সেই ভেড়ার চামড়ায় লেখা অঙ্কের সংখ্যা দেখে বলল—'কী ব্যাপার তুমি কি পড়াশুনো শুরু করলে এই বুড়ো বয়সে?'

ফ্রান্সিস হেসে বলল—'মারিয়া তুমি তো জানো—পড়াশুনার সময়টা কেটেছে আমার বিচিত্র সব অভিযানে।'

—'কী যে বল ফ্রান্সিস? তোমাদের মতো মানুষ একটা জাতির গর্ব। পড়াশুনো তোমার না হয় নাই হলো।' মারিয়া বলল।

—'আজকে কিন্তু একটু দুঃখই হচ্ছে। এই দেখ একটা সাধারণ হিসেব মেলাতে পারছি না।' ফ্রান্সিস বলল।

—'ঠিক আছে আমাকে দাও। আমি মিলিয়ে দিচ্ছি।' মারিয়া বলল। তখন ফ্রান্সিস মূর্তির কপালে উৎকীর্ণ অঙ্কের সংখ্যা, দাঁতের সংখ্যা, চার-এর পার্থক্য ধরে চার নম্বর দাঁত ভাঙা এবং কিছুই না পাওয়া —সমস্ত ব্যাপারটাই বলল। মারিয়া মন দিয়ে সব শুনল। তারপর চামড়ায় লেখা অঙ্কের সংখ্যাগুলো দেখে বলল—'ফ্রান্সিস, তুমি একভাবে হিসেব করেছো। হিসেবটা অন্যভাবেও হয়। তুমি পার্থক্য ধরেছো চার-এর। কিন্তু তিন-এর পার্থক্যটাই বোধহয় ঠিক।'

—'তাহলে তিন সংখ্যার দাঁত?

—'না। কারণ চার নম্বর দাঁতে নিশ্চয়ই খোঁদল পেয়েছো?'

—'হ্যাঁ পেয়েছি।'

—'তাহলে সেইসঙ্গে তিন সংখ্যার দাঁতের খোঁদলটাও কাছাকাছিই রয়েছে। তিন সংখ্যার দাঁতে মূর্তি লুকানো থাকলে নিশ্চয়ই তার সামান্য অংশ হলেও দেখতে পেতে। না ফ্রান্সিস তিন সংখ্যা নয়।'

—'তাহলে?' ফ্রান্সিস বেশ সমস্যায় পড়ল।

—'আচ্ছা, মূর্তির কপালে আর কোনো চিহ্ন ছিল?' মারিয়া বলল।

—'নাঃ।'

—'কিন্তু আমার মনে হয় অঙ্কের সংখ্যাগুলোর কী ভাবে হিসেব হবে, মানে যোগ হবে না বিয়োগ হবে এরকম কোনো ইঙ্গিত নিশ্চয়ই ওখানে আছে। রাজা কোলা নিশ্চয়ই কিছু চিহ্ন রেখেছেন।' মারিয়া বলল।

—'সেটা তাহলে আর একবার দেখতে হয়। তুমিও চলো।' ফ্রান্সিস বলল।

সবাই চলল হুয়াকার বেদীর উদ্দেশে। সেখানে পৌঁছে মেস্তিজো মই বেয়ে উঠতে লাগল। ওর মনে তখনও সংশয়। মেস্তিজো মূর্তির কপালের কাছে পৌঁছল। ভালো করে দেখতে লাগল। অঙ্কগুলো ছাড়িয়ে একটু দূরে দেখা গেল অস্পষ্ট একটা চিহ্ন। এই চিহ্নটা উনকাদের ভাষায় যোগচিহ্ন। মেস্তিজো বেশ অবাক হলো। ও মনে মনে মারিয়ার বুদ্ধির প্রশংসা করল। মই বেয়ে দ্রুতই নেমে এল।

ফ্রান্সিসরা সবাই এসে ওকে ঘিরে ধরল। মেস্তিজো মারিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল—'রাজকুমারী মারিয়া, আপনি ঠিকই বলেছিলেন। অঙ্কগুলোর পরে একটা অস্পষ্ট যোগচিহ্ন আছে।' মারিয়া খুশির চোটে লাফিয়ে উঠল। ফ্রান্সিস বলল— 'কিন্তু মারিয়া এখন হিসেব করবে কী করে। চামড়া কালি কলম তো আনিনি।'

—'এই সামান্য হিসেবের জন্যে ওসবের প্রয়োজন নেই।' মারিয়া বলল। তারপর হুয়াকা দেবতার বেদীর নিচের সিঁড়িতে বসল। একটা লাল পাথরের টুকরো নিল। সব সংখ্যাগুলো লিখল। ফ্রান্সিসরা ওকে ঘিরে দাঁড়াল। মারিয়া সংখ্যাগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল—'সব সংখ্যা যোগ করলে হয় চল্লিশ। কিন্তু দাঁতের সংখ্যা ষোল। হবে না। যে সংখ্যার দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে তা ষোলর কম কোনো সংখ্যা।' তারপর মরিয়া সংখ্যাগুলোর দিকে তাকিয়ে নানাভাবে হিসেব করতে লাগল। কিন্তু ষোলর নিচের সংখ্যা পেল না। ও এবার ভাবল—আচ্ছা যদি প্রত্যেকটি পার্থক্যের সংখ্যাকে যোগ করি। ও বেদীর সিঁড়িতে এইভাবে লিখল—

০— ৪ = ৩
৪— ৮ = ৩
৮—১২ = ৩
১২—১৬ = ৩
নিচে টান দিয়ে লিখল— ১২

ফ্রান্সিস বলল—'তিন সংখ্যা কীভাবে পেলে।'

মারিয়া বলল—'শূন্য থেকে প্রত্যেকটি সংখ্যা বাদ দিলে পার্থক্য হয় ৩ অঙ্কের। যেমন শূন্য বাদ—১ ২ ৩ = ৩ সংখ্যা। তেমনি ৪ বাদ — ৫ ৬ ৭ = ৩ সংখ্যা। এভাবে পার্থক্যগুলো যোগ করেই পাই—১২ সংখ্যা।

মারিয়া আনন্দে হাততালি দিয়ে ফেলল। চেঁচিয়ে বলল—'ফ্রান্সিস, বারো সংখ্যার দাঁত।

ফ্রান্সিস ডাকল—'মেস্তিজো, হাতুড়ি ছেনি নিয়ে চলো।'

দু'জনে মই বেয়ে উঠতে লাগল। মূর্তির মুখের কাছে এসে দু'জনে দাঁড়াল। বিকেলের সূর্যের লালচে আলো পড়েছে মূর্তিটায়। ওদিকে নিচের প্রাঙ্গণে অনেক লোক জড়ো হয়েছে। অবাক চোখে দেখছে ফ্রান্সিসদের কাণ্ড। নিজেদের মধ্যে কী বলাবলি করছে। হয়তো মূর্তিটা এভাবে নষ্ট করছে ভিনদেশীরা— এটা ওদের পছন্দ নয়।

মেস্তিজো দাঁতের ওপরের পাটি থেকে গুনে বারো সংখ্যার দাঁতে হাতুড়ি ছেনি চালাল। বারকয়েক হাতুড়ি ঠুকে ছেনি চালাতেই দাঁতের সামনের পাথরের আস্তরণ খুলে এল। দেখা গেল হুয়াকা দেবতার সেই আসল স্বর্ণমূর্তি। খোঁদলে বসানো। অস্তগামী সূর্যের আলো পড়েছে সেই মূর্তির চোখে মুখে গায়ে। ঝিকিয়ে উঠছে মূর্তির গা, দুচোখে নীলকান্ত মণি, মাথায় কারুকাজ করা মুকুট, গায়ের অলঙ্কার। ফ্রান্সিস অবাক হয়ে দেখতে লাগল মূর্তিটা। একটু পরে ফ্রান্সিস বলল—'মেস্তিজো, আমি বিধর্মী। তোমাদের দেবমূর্তির গায়ে হাত দেব না। তুমি একা মূর্তিটা নিয়ে নামতে পারবে?'

—'পারবো। কাঁধে নিয়ে নামবো।' কথাটা বলে মেস্তিজো প্রথমে স্বর্ণমূর্তির সামনে কিছুক্ষণ মাথা নত করে রইল। মুখে বিড়বিড় করে কী বলল। তারপর মূর্তিটা খোঁদল থেকে বের করে কাঁধে তুলে নিল। এবার নিচে দাঁড়ানো চিকামার অধিবাসীরা মূর্তিটা দেখতে পেল। সবাই নিঃশব্দে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসল। তারপর মাথা নুইয়ে রইল। চারদিকে এত লোক। কোনো শব্দ নেই কারো মুখে।

প্রথমে ফ্রান্সিস মই থেকে নেমে এল। বিস্কো আর শাঙ্কো ছুটে এসে ফ্রান্সিসকে জড়িয়ে ধরল। ফ্রান্সিস হেসে বলল—'কৃতিত্ব আমার নয়, মারিয়ার। ওর অঙ্কের হিসেব ছিল নির্ভুল। মারিয়াও হেসে বলল—'কিন্তু সন্ধানের সূত্র তুমিই দিয়েছিলে। সব কৃতিত্ব তোমার।' ফ্রান্সিস হাসল। কোনো কথা বলল না।

মেস্তিজো স্বর্ণমূর্তি কাঁধে নিয়ে মই থেকে নামল। ফ্রান্সিসকে বলল—'এই মূর্তি নিয়ে কী করবো এখন?'

—'তোমাদের দেবতা, সেটা তোমাদের ব্যাপার। আমার কাজ ছিল মূর্তি উদ্ধার, তা আমি করে দিয়েছি। এখন আমরা জাহাজে ফিরে যাবো।' ফ্রান্সিস বলল।

—'স্বর্ণমূর্তিটা তোমরাই নিয়ে যাও না। রাজা লুপাকার হাতে পড়লে ও হয় মূর্তিটা গালিয়ে ফেলবে নয় তো নিজের রাজ্যে নিয়ে যাবে।' মেস্তিজো বলল।

ফ্রান্সিস হেসে মাথা নেড়ে বলল—'স্বর্ণমূর্তির ওপর আমাদের কোনো লোভ নেই। তোমাদের উপাস্য দেবতার মূর্তি। তোমাদেরই থাকবে।'

ওদিকে রাজা লুপাকার কাছে মূর্তি উদ্ধারের খবর পৌঁছে গিয়েছিল। রাজা লুপাকা ছোট পাহাড়ি ঘোড়ায় চেপে ছুটে এলো।

মেস্তিজোর কাঁধে আসল মূর্তি দেখে রাজা খুব খুশি। ফ্রান্সিস রাজার সামনে এসে দাঁড়াল। মেস্তিজোকে ইঙ্গিত করল ওর কথাগুলো রাজাকে বুঝিয়ে দিতে। ফ্রান্সিস মেস্তিজো মারফৎ বলল—'রাজা লুপাকা আমি কথা রেখেছি। আপনাদের দেবমূর্তি উদ্ধার করে দিয়েছি। এবার আমার দু'টো অনুরোধ জানাচ্ছি—আশাকরি আপনি রাখবেন।'

রাজা লুপাকা ফ্রান্সিসের দিকে তাকিয়ে রইল। ফ্রান্সিস বলল —'এক ঃ দেবমূর্তি আপনি আপনার দেশে নিয়ে যাবেন না। চিকামাতে এই বেদীতেই মূর্তিটা রাখবেন। দুই ঃ মেস্তিজোকেই এই দেবমূর্তির পূজারী হিসেবে আবার বহাল করবেন। অন্য কাউকে নয়।' রাজা লুপাকা মাথাটা একটু ঝাঁকিয়ে বললেন—'ঠিক আছে। তাই হবে।'

ফ্রান্সিস এবার মেস্তিজোর দিকে তাকাল। বলল—'মেস্তিজো, মূর্তি বেদীতে রেখে তুমি চলো আমাদের পথ দেখিয়ে সমুদ্রতীরে নিয়ে যাবে।'

মেস্তিজো স্বর্ণমূর্তিটা কাঁধে নিয়ে বেদীতে উঠল। কাঠের মূর্তির পাশে রাখল। মাথা নুইয়ে ভক্তি জানিয়ে নেমে এল। ততক্ষণে মন্দির প্রাঙ্গণে জড়ো হওয়া উনকারা আনন্দে নাচানাচি শুরু করেছে। রাজা লুপাকাও খুশি।

সবাইকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল মেস্তিজো। তখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ফ্রান্সিসরা দেখল চিকামাবাসীরা দলে দলে হুয়াকা দেবতার মন্দির প্রাঙ্গণের দিকে চলেছে। হাতে তাদের ফুলপাতা। আনন্দে হাসছে ওরা। এতদিন পরে আসল স্বর্ণমূর্তি পাওয়া গেছে। ফ্রান্সিস এই ভেবে খুশি হলো। এতগুলো মানুষের মুখে ও হাসি ফোটাতে পেরেছে।

মরুভূমির পথ নয়। অন্য পাহাড়ি পথে মেস্তিজো কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওদের সমুদ্রতীরে পৌঁছে দিল। জাহাজে উঠতে উঠতে ফ্রান্সিস ডাকল—'মারিয়া।'

—'বলো।'

—'এবারও আমাদের হাত শূন্য।' ফ্রান্সিস বলল।

—'তাহোক। এজন্যে আমার মনে কোনো দুঃখ নেই,' মারিয়া বলল।

ছবি ঃ প্রসাদ রায়

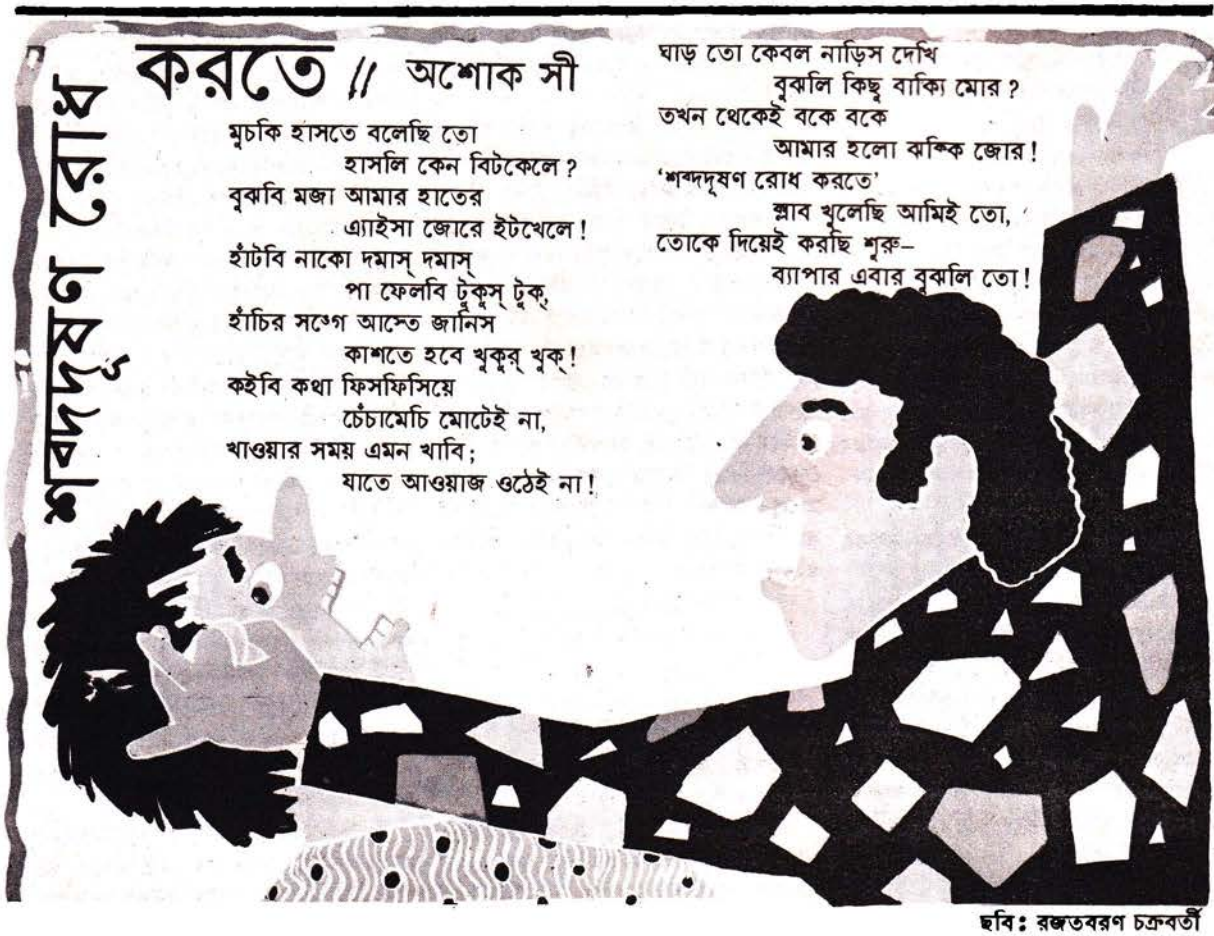


ছবিঃ রজতবরণ চক্রবর্তী

# নিষেধ

## মানবেন্দ্র পাল

কেন যে হঠাৎ সুদূর দিল্লি থেকে মধুপুরে মিসেস অ্যান্টনিকে চিঠি লিখে বসলাম সে কথাটা ভেবে আশ্চর্য হয়ে যাই।

লিখলাম–দিন দশেকের জন্যে নদীর ধারে মিস্টার গুহর সেই বাড়িটা ভাড়া পাওয়া যাবে কি?

উত্তর সঙ্গে সঙ্গেই পেলাম। মিসেস অ্যান্টনি লিখছেন–চেঞ্জে আসবে তো? তা ওটা কেন? ভালো বাড়ি আমার হাতেই আছে। মিস্টার গুহর বাড়িটা সংস্কারের অভাবে প্রায় অব্যবহার্য হয়ে গেছে।

উত্তরে লিখলাম–ঠিক চেঞ্জে যাবার জন্যে নয়। ঐ বাড়িটার সঙ্গে আমাদের পরিবারের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। হঠাৎই বাড়িটা একবার দেখতে ইচ্ছে করছে। আপনি অনুগ্রহ করে জানান কত ভাড়া লাগবে। টাকাটা পাঠিয়ে দেব। আর বাড়িটা মোটামুটি বাসোপযোগী (অন্তত একটি ঘর–কেননা আমি একাই যাব) করতে যা খরচ লাগবে তাও পাঠিয়ে দেব। তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যবস্থা করবেন। আমি আবারও বলছি–হঠাৎই যাবার খেয়াল হয়েছে। দেরি হলে হয়তো মত বদলে যাবে।

মিসেস অ্যান্টনিদের সঙ্গে আমাদের পরিবারের যোগ অনেক দিনের। আমরা যতবারই মধুপুরে চেঞ্জে গিয়েছি মিসেস অ্যান্টনিই বাড়ি ঠিক করে দিতেন। গুহসাহেবের বাড়িটাই আমাদের বেশ পছন্দ হয়েছিল। নদীর ধারে বাড়িটা। লোকের কোলাহলও নেই। শান্ত পরিবেশ। বাড়িটাও বেশ বড়ো। অনেকগুলো ঘর। চারিদিক ঘিরে বিরাট কম্পাউন্ড। তার অনেকটাই ঝোপজঙ্গলে ভর্তি হয়ে থাকত। গুহসাহেব কলকাতায় থাকেন। এখানে বড়ো একটা আসেন না। বাড়িটা দেখাশোনার ভার মিসেস অ্যান্টনিকেই দিয়ে রেখেছেন।

আগেই বলেছি, এ বাড়িতে আমরা সপরিবারে অনেকবার এসেছি। মাঝে কয়েক বছর আসা হয়নি। শেষ এসেছিল শুধু দিদি আর জামাইবাবু অসীমদা। মাসখানেক ছিল। তারপর কী যে হয়ে গেল! আর কেউ এমুখো হতে চায় না। মধুপুরের কথা উঠলেই বাবা গম্ভীর হয়ে যান। মা নিঃশব্দে চোখের জল ফেলে। আমিও ঠিক করেছিলাম আর কখনও এখানে আসব না। ব্যস। মধুপুরের সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ। তারপর হঠাৎই কী হলো, মধুপুরে সেই বাড়িতে যাবার জন্যে মনটা ছটফট করে উঠল।

টাঙ্গা থেকে যখন বাড়িটার সামনে নামলাম তখন শীতের বেলা মিইয়ে এসেছে। মাঘের শীত বেশ জেঁকে বসছে। মিসেস অ্যান্টনি হাসতে হাসতে ওঁর বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। আমাদের সকলের কুশল সংবাদ নিয়ে চাবিটা দিয়ে বলে গেলেন–জলটল সব রেডি আছে। হাতমুখ ধুয়ে নাও। চা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

গেট ঠেলে কম্পাউন্ডের মধ্যে ঢুকলাম। এই সেই বাড়ি। তাহলে আবার এখানে আসতে হলো।

তখন সূর্য ডুবছে। বাড়ির সামনে দীর্ঘ ইউক্যালিপ্টাস গাছের মাথায় পড়ন্ত সূর্যের ম্লান আলো। এমনি পড়ন্ত রোদ এর আগেও এই বাড়িরই কার্নিসে কার্নিসে, টানা বারান্দার পশ্চিম-দিকের মেঝের ওপর কতবার দেখেছি। কিন্তু এমন মন-কেমন-করা ভাব কখনো হয়নি।

তালা খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। এটাই এবার আমার বেডরুম। কিছু কিছু প্লাস্টারের কাজ হয়েছে, হোয়াইট ওয়াশও হয়েছে। জানলায়, দরজায় নতুন ছিটকিনি লাগানো

হয়েছে। একটা চৌকিরও ব্যবস্থা হয়েছে দেখে খুশি হলাম। বিছানাপত্তরও নিশ্চয় মিসেস অ্যান্টনিই দিয়েছেন। ঘরের কোণে জলভর্তি কুঁজোটি পর্যন্ত।

একটু পরে মিসেস অ্যান্টনির বাড়ি থেকে ডিমের ওমলেট, দু-স্লাইস পাঁউরুটি আর চা এল। খুবই খিদে পেয়েছিল। তাড়াতাড়ি প্লেটটা টেনে নিলাম।

দুবেলা খাওয়ার ব্যবস্থাও মিসেস অ্যান্টনির বাড়ি। কাজেই শুধু উদ্দেশাহীন বেড়ানো আর মিসেস অ্যান্টনির বাড়ি আড্ডা দেওয়া ছাড়া আমার আর অন্য কাজ ছিল না।

দেখতে দেখতে এক সপ্তাহ কেটে গেল। কোনো অসুবিধে নেই। অত বড়ো বাড়িতে একা থাকি, তাতেও ভয় পাই না। কিন্তু একটা কথাই বারে বারে মনে হচ্ছিল–কেন হঠাৎ এলাম? এমন কি আমার আসার খবর পর্যন্ত দেশের বাড়িতে জানাইনি। জানাইনি তার প্রধান কারণ–কেন এলাম তা তো পরিষ্কার করে কাউকে বোঝাতে পারব না।

সাত দিন কেটে গেল। আর মাত্র তিন দিন থাকব। কিন্তু আমার কেবলই মনে হচ্ছিল আমার এই আসাটা একেবারে নিরর্থক নয়, নিশ্চয় কিছু একটা ঘটবে। কিন্তু কী ঘটতে পারে সে সম্বন্ধে আমার কোনো ধারণাই ছিল না।

মিসেস অ্যান্টনির বয়েস হয়েছে। ছেলে, ছেলের বৌ, নাতি-নাতনি নিয়ে তাঁর বেশ বড়ো সংসার। ওঁদের বাড়ি গেলেই মিসেস অ্যান্টনি পুরনো দিনের কথা তোলেন। জিজ্ঞেস করেন–মা কেমন আছেন, বাবার বয়েস কত হলো, হাঁটাচলা করতে পারেন কিনা। তারপরেই স্মৃতি হাতড়িয়ে জিজ্ঞেস করেন–তুমি বোধহয় এখানে লাস্ট এসেছিলে যখন তোমার দিদি-জামাইবাবু এখানে ছিলেন।

কথাটা এড়িয়ে যাবার জন্যে সংক্ষেপেই উত্তর দিই–হ্যাঁ।

–তোমার জামাইবাবু মানুষটাও বেশ ভালোই ছিলেন। যেমন হ্যান্ডসাম চেহারা, তেমনি হৈচৈ করতে ভালোবাসতেন।

বললাম–অসীমদা সত্যিই খুব চমৎকার মানুষ। আমি তো যে ক'দিন এখানে ছিলাম–

বাধা দিয়ে মিসেস অ্যান্টনি বললেন–তবে উনি বোধহয় একটু ক্রেজি টাইপের ছিলেন।

–ক্রেজি! অস্বাভাবিক প্রকৃতির? না-না–

–আমি দুঃখিত। ক্রেজি বলাটা আমার ঠিক হয়নি। আসলে কিছু কিছু ছেলেমানুষি ছিল।

আমি হেসে বললাম–যত বয়স্কই হোক না কেন, সবার মধ্যেই অল্পবিস্তর ছেলেমানুষি থাকে।

–তা বলে নির্জন দুপুরে কোনো বয়স্ক মানুষ একা একা ইঁদুরের ল্যাজে দড়ি বেঁধে ঘোরায় না। বলে মিসেস অ্যান্টনি তাঁর সামনের পড়ে যাওয়া দাঁত দুটোর ফাঁক দিয়ে হাসলেন।

বললাম–সে হয়তো দিদিকে ভয় দেখাবার জন্যে। ইঁদুর, আরশোলা, মাকড়সায় দিদির খুব ভয় ছিল।

–তোমার দিদির হার্টের ট্রিটমেন্ট জামাইবাবু করিয়েছিলেন?

মিসেস অ্যান্টনির এই ধরনের জেরা আমার ভালো লাগছিল না। তবু একটু উঁচু গলাতেই বললাম–দিদির যে হার্টের অসুখ ছিল তা আমরাই কখনও জানতাম না।

দিদি হাতটা তুলে কারটা একবার যেন ছুঁলো

–তা বটে। বলে মিসেস অ্যান্টনি একটু যেন অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।

–এই দ্যাখো না আমার অবস্থা। একদিন মাথা ঘুরে পড়ে গেলাম। তবে না জানা গেল আমি হাই প্রেসারের রুগী হয়ে আছি। সে থাক, তোমার সেই সুন্দরী বোনটির খবর কি? কি যেন নাম?

–আমার পিসতুতো বোনের কথা বলছেন? মিণ্টু?

–হ্যাঁ–হ্যাঁ। ওর বিয়ে-থাওয়া হয়েছে?

বললাম–না, চেষ্টা চলছে।

পিসেমশাই, পিসিমা মারা যাবার পর সেই কোন ছোটবেলায় মা-ই ওকে নিজের কাছে এনে রাখে। সেই থেকে ও আমাদের সংসারেই রয়েছে। দিদির চেয়ে বেশ কয়েক বছরের ছোটো হলেও দিদি ওকে খুব ভালোবাসত। যখনই কোথাও যেত মিণ্টুকে সঙ্গে নিয়ে যেত। দুই বোন ম্যাচ করে একই রকম শাড়ি ব্লাউজ পরত। শুতোও দুজনে একসঙ্গে। এক কথায় ওরা শুধু দু-বোনই নয়, যেন দুই বন্ধু। দিদির বিয়ে দিতে গিয়ে বাবা প্রায় সর্বস্বান্ত হয়ে গেছেন। এখন দুর্ভাবনা মিণ্টুকে নিয়ে।

ন'টা দিন কেটে গেল। কাল চলে যাব।

মিসেস অ্যান্টনি বললেন, পুরো একমাসের ভাড়া গুনলে, আর কটা দিন থেকে যাও। এই সময়টাই তো চেঞ্জের পক্ষে ভালো।

বললাম–না মাসিমা, ছুটি ফুরিয়ে গেল। কাল যেতেই হবে।

মিসেস অ্যান্টনি বললেন, এত তাড়াতাড়িই যদি যাবে তাহলে দিল্লি থেকে এত খরচ করে মাত্র দশ দিনের জন্যে শুধু শুধু এলে কেন?

কি উত্তর দেব? শুধু একটু হাসলাম। সে প্রশ্নের উত্তর আমিও তো খুঁজছি।

রাত তখন ন'টা।

শীতের রাত। এমনিতেই পল্লীটা নিঝুম। এখন এই রাত নটাতেই মনে হচ্ছে যেন একমাত্র আমি ছাড়া আর কেউ জেগে নেই। মনে হলো যেন আমি কোনো মৃতের রাজ্যে বাস করছি।

মৃতের রাজ্য কথাটা মনে হতেই গা-টা কেমন ছমছম করে উঠল। এই ন'দিনের মধ্যে কোনোদিনই আমার এমন ভয় করেনি। হঠাৎ আজই বা কেন এইরকম একটা বিশ্রী অস্বস্তি হচ্ছে বুঝতে পারলাম না।

আমি একটা বই পড়ছিলাম। বইটা বন্ধ করে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ব বলে উঠে দাঁড়ালাম। আলো নেভাবার আগে দরজাটায় ঠিকমতো খিল দিয়েছি কিনা দেখে নিলাম। জানলাগুলোও দেখে নিলাম ভেতর থেকে বন্ধ।

আলো নেভাতে যাচ্ছি—হঠাৎ মনে হলো এই মুহূর্তে ঘরে আমি একা নই। এতক্ষণ ঘরের মধ্যে যে বন্ধ বাতাসটা ছিল হঠাৎ তার তাপমাত্রাটাও কেমন কমে গেল অস্বাভাবিক মতো। আমি শীতে কুঁকড়ে গেলাম। আর তখনই দেখলাম কেউ একজন প্রায় নিঃশব্দে আমার বিছানার দিকে এগিয়ে আসছে।

আমার সর্বাঙ্গ ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

তারপরই যা দেখলাম তাতে একই সঙ্গে ভয়, বিস্ময়, আনন্দ আমাকে একেবারে অভিভূত করে দিল।

দেখলাম—আমার দিদি, যে কয়েক বছর আগে এই বাড়িতেই হঠাৎ হার্ট অ্যাটাকে মারা গিয়েছিল সে আমার বিছানার এক কোণে তার সেই চিরঅভ্যস্ত ভঙ্গিতে বসে রয়েছে।

দিদির সেই সুন্দর মুখখানি এক স্বর্গীয় আভায় আরও সুন্দর লাগছিল। তাকে বাড়িতে যে প্রিয় শাড়িখানি পরে প্রায় ঘোরাফেরা করতে দেখতাম সেই শাড়িখানাই পরা, তার এলো খোঁপা ঠিক আগের মতোই কাঁধের ওপর যেন ভেঙে পড়েছে।

কয়েক মুহূর্ত আমি দিদির দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমি ভুল দেখছি কিনা মেলাবার জন্যে খুবই সচেতনভাবে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ লক্ষ্য করতে লাগলাম।

না, ভুল নয়। ভুল হতে পারে না। তার যে হাতখানি কোলের উপর রাখা তা কঙ্কাল নয়, জীবন্ত মানুষেরই হাত। তার চুড়ি, বিয়ের আংটি, কানের দুল সবই ঠিক ঠিক। শুধু গলায় কালো কারের সঙ্গে পাথরের যে লকেটটা সবসময়ে পরে থাকত সেই লকেটটা নেই। আছে শুধু কালো কারটা। পরিবর্তনের মধ্যে দিদি যেন একটু মোটা হয়েছে। কেননা ওর মেরুণ রঙের ব্লাউজটা গায়ে টাইট হয়ে এঁটে আছে—যেমন কালো কারটা বৈষ্ণবীদের কণ্ঠীর মতো গলার সঙ্গে লাগা।

এবার স্পষ্ট করে দিদির দিকে তাকালাম। দিদি একটু হাসল। কিন্তু বড়ো ম্লান সে হাসি। তারপরই স্পষ্ট দেখলাম দিদি ধীরে ধীরে হাতটা তুলে কারটা একবার যেন ছুঁলো।

—দিদি! বলে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। কিন্তু দিদি উত্তর দিল না।

আমি পাগলের মতো দিদিকে ছোঁবার জন্যে ছুটে গেলাম আর তখনই আলোটা নিভে গেল। বোধহয় লোডশেডিং হলো। আমি অন্ধের মতো এগোতে গিয়ে অন্ধকারে দেওয়ালে দেওয়ালে ঠোক্কর খেতে লাগলাম। কোনোরকমে বিছানায় গিয়ে টর্চটা নিয়ে জ্বাললাম। কিন্তু দিদি তখন অদৃশ্য।

দিল্লি যাওয়া হয়নি। পরের দিনই সোজা চলে গেলাম দেশের বাড়িতে। এত বড়ো খবরটা মা, বাবা, মিন্টুকে না দিলেই নয়। দিদির অকাল, অপ্রত্যাশিত মৃত্যুর পর থেকে ওদের মানসিক অবস্থা যাকে বলে অবর্ণনীয়, তাই।

যে উত্তেজনা নিয়ে খবরটা দিতে গিয়েছিলাম বাড়ি ঢুকেই আর একটা খবরে উৎসাহটা যেন মিইয়ে গেল।

প্রথমেই দেখা বাবার সঙ্গে। বাবা হেসে বললেন, এই যে তুমি এসে পড়েছ! আজই তোমায় সুখবরটা লিখতে যাচ্ছিলাম।

যাক—তবু সুখবর।

বাবা বললেন, শেষ পর্যন্ত অসীমের সঙ্গেই মিন্টুর বিয়ে ঠিক করলাম। রীণা চলে যাবার পর থেকে এ ক'বছর ও তো পাগলের মতো কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত মিন্টুকেই চাইল। বলল, আমাদের সঙ্গে সম্পর্কটা বাঁচিয়ে রাখতে চায়।

সুখবর বৈকি! অসীমদার মতো ছেলে দেখা যায় না। দিদির নিতান্ত দুর্ভাগ্য—এমন স্বামী পেয়েও এক বছরের বেশি ঘর করতে পারল না। চলে গেল হঠাৎই। সেই অসীমের সঙ্গে যদি মিন্টুটার—

তবে তোমার মায়ের তেমন ইচ্ছে ছিল না। ওর যে কী অদ্ভুত ধারণা! তা যাক। এখন উনি রাজী হয়েছেন।

একটু পরে চা জলখাবার খেয়ে সকলের সামনেই মধুপুরের ঘটনাটা হুবহু বলে গেলাম। বাবা ওঁর চিরাচরিত অবিশ্বাসী

মন নিয়ে ঠাট্টার হাসি হেসে ইজিচেয়ারে গিয়ে শুলেন। কিন্তু মা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগল। আর দু-চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়তে লাগল।

তারপর যখন গলায় লকেট ছাড়া কারটার কথা বললাম তখন মা হঠাৎ চমকে উঠল।

–লকেটটা ছিল না?

–না।

–কেন? শাড়ি থেকে আংটি পর্যন্ত সব রইল আর লকেটটাই নেই। শুধু কারটা?

–হ্যাঁ। আর সেটাও আবার বোধহয় মোটা হবার জন্যে, গলায় আঁট হয়ে বসেছিল। দিদি একবার হাত তুলে সেটা খোলবার চেষ্টাও করল যেন–তখনই লোডশেডিং হয়ে গেল।

–ওগো শুনছ! বলেই মা হঠাৎ কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল।

মায়ের অবস্থা দেখে বাবা চমকে উঠলেন।

–আমি যা ভয় করেছিলাম তাই। তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করনি, কিন্তু আজ এতদিন পর নিজে দেখা দিয়ে যা ঘটেছিল তা জানিয়ে গেল।

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।

মা যেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো ড্রয়ার হাতড়াচ্ছে। অনেক খুঁজে একটা ইনল্যান্ড খাম পেল। সেটা আমার দিকে ছুঁড়ে দিল।

–তোমার বাবাকে দেখিয়েছিলাম। হেসেছিল। এখন তুমি পড়ে দ্যাখো।

চিঠিটা মধুপুর থেকে লেখা। বিশেষ কিছু নয়। শুধু কয়েক ছত্র।

–মাগো, খুব ভয় পেয়ে এই চিঠি গোপনে তোমায় লিখছি। এখানে এসে দেখছি মাঝে মাঝে ও যেন কিরকম হয়ে যায়–বিশেষ গভীর রাতে। আমায় কিরকম ভয় দেখায়। আমি প্রথম প্রথম ভাবতাম মজা করছে। কিন্তু কাল রাত্তিরে যা করল–

আর লেখা হলো না। ও আসছে।.....

অর্ধেক লেখা চিঠিটা পড়েই আমার মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। মনে পড়ল মিসেস অ্যাণ্টনির কথা। –নির্জন দুপুরে অত বড়ো মানুষটা ইঁদুরের ল্যাজে দড়ি বেঁধে ঘোরাত। তবে কি–

মা বললে, তখনই বলেছিলাম পোস্টমর্টেম করাও। কিন্তু তোমরা কেউ শুনলে না। আমি মা বলেই তার সব কথা বুঝতে পেরেছিলাম। যাক, একটা মেয়ে গেছে, আর একটাকে কিছুতেই যেতে দেব না।

সেদিনই বাবা সম্মতি জানিয়ে অসীমদাকে চিঠি লিখে রেখেছিলেন। শুধু পোস্ট করার অপেক্ষা। মায়ের ওপর রাগ করে বাবা চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দিলেন।

দিল্লি ফিরে এসেছি।

মাস কয়েক পর কাগজে একটা খবর পড়ে চমকে উঠলাম। কলকাতায় কোন এক অসীম চৌধুরীকে পুলিশ খুনের অপরাধে গ্রেপ্তার করেছে। সে নাকি তার নব বিবাহিতা স্ত্রীকে গলায় কালো কারের ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করেছে। হত্যার কারণ জানা যায়নি। ছবিটাও দেখলাম। এ আমারই অতি প্রিয় জামাইবাবু।

আজ এক একসময় ভাবি, মিণ্টুর সঙ্গে যাতে বিয়ে না হয় সেই কথাই কি দিদি সেদিন রাত্তিরে ইঙ্গিতে জানিয়ে গেল? সেই কথা তাড়াতাড়ি জানাবার জন্যেই কি অদৃশ্য এক শক্তি সুদূর দিল্লি থেকে আমায় মধুপুরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল?

ছবি: বিজন কর্মকার

# চালভাজাতে ঘি // রমেন দাস

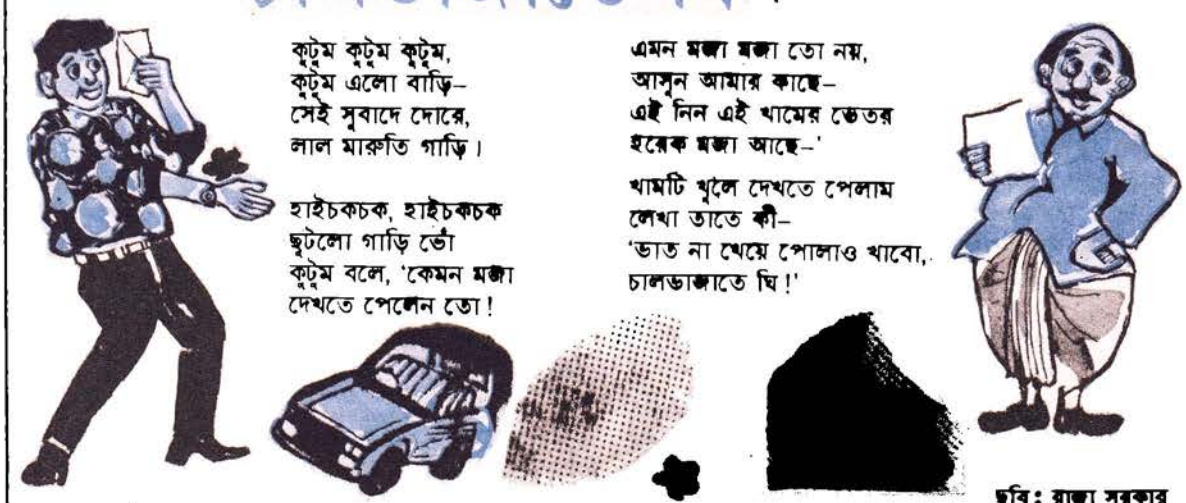


ছবি: রাজা সরকার

# ডুংরিবাবা

অগ্নিমিত্র

জগন লোহার এই অঞ্চলের সেরা কামার। আদিবাসী অঞ্চল। চারদিকে ঘন জঙ্গলের ভেতর মাঝে মাঝে অল্পস্বল্প ধানজমি আর এদিক-ওদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাঁচ-সাত ঘর মানুষের ছোটো ছোটো দু'একটা গ্রাম। কাছেই পাহাড়ের সারি। এখানকার লোকজন ছোটো পাহাড়কে বলে 'ডুংরি' আর বড়ো পাহাড়কে বলে 'বুরু'। পাহাড়ে হাতি, দাঁতাল শুয়োর, সাপ, হরিণ, ময়ূর আরো কত রকম জীব-জানোয়ার আছে। জঙ্গলেও কিছু কিছু থাকে। জীব-জানোয়ার থাক না থাক, একখানা টাঙ্গি এ অঞ্চলের মানুষ সবসময় কাছে রাখে। কোথাও যেতে-আসতে হলে টাঙ্গি তো কাছে থাকবেই। আর, সে টাঙ্গি যদি জগন লোহারের কামারশালার তৈরি জিনিস হয় তাহলে সবাই নিশ্চিন্ত। কারণ, জগন খারাপ লোহায় কাজ করে না, খারাপ জিনিস তৈরি করতে জানে না। তার নিজের হাতের তৈরি টাঙ্গি, বল্লম, তীরের ফলা যেমন মজবুত, ঘর-গেরস্থালির হাতা, বেড়ি, খুন্তি, সাঁড়াশি সবই ঠিক তেমনি মজবুত। তবে, আগে সারা মাস খেটে যত জিনিস তৈরি করতে পারতো এখন আর তত পারে না। বয়সও হয়েছে। তাছাড়া, আগে দুই ছেলে বুধন আর ছোটকু হাপরের হাতল টেনে বাপের কাজে সাহায্য করতো। বড়ো মেয়ে টুমরিও করতো। বিয়ের পর টুমরি চলে গেছে শ্বশুরবাড়ি। ছেলেদুটোও ঘাটশিলার কাছাকাছি মৌভাণ্ডারে তামার খনিতে কুলির কাজ নিয়ে চলে গেছে। বৌ চাঁদমণি আর ছোটো মেয়ে ফাগুনিকে নিয়ে জগনের সংসারে লোক বলতে এখন মোটে তিন জন। ফাগুনির বয়স এই সবে বছর পনেরো। সে-ই এখন হাপর টেনে বাবার কাজে সাহায্য করে। বড়ো মেয়ে টুমরি মোটামুটি শান্ত মেয়ে। ফাগুনি ঠিক উল্টো। একেবারে দুরন্ত দামাল। কিন্তু বাপের কামারশালায় যখন হাপরের হাতল টানতে বসে তখন শান্ত। একটা ব্যাপারে ওই দুরন্ত দামাল মেয়ের চেহারা একেবারে অন্যরকম। তা হলো ফুল। গাঁদা ফুলের চারা পুঁতে পুঁতে বাড়ির চারদিক তো ছেয়েই রেখেছে। তাছাড়া আছে মোরগফুল, ঝুমকোলতা, রঙ্গন।

সবে শীতকাল পড়তে আরম্ভ করেছে।

জগনের কামারশালা বলতে চারপাশ খোলা একটা চালাঘর। সন্ধ্যের পর সেখানে বসে আর কাজ করা যায় না। শীত একেবারে চেপে ধরে। দুপুরের পর থেকেই কাজ আরম্ভ করেছিল জগন। কিছুক্ষণ আগে ফাগুনি এসে বসেছে। পরের হাটে কিছু তীরের ফলার বায়না আছে। তাই তৈরি করছে জগন। অন্ধকার হয়ে আসছে বলে হাপরের আগুনে সবদিকটা কেমন লাল হয়ে উঠছে। আগুনের ভেতর থেকে গনগনে লাল লোহার টুকরো সাঁড়াশি দিয়ে তুলে নেহাইয়ের ওপর ধরে জোরে জোরে হাতুড়ি পিটে চটপট কেমন তীরের ফলা তৈরি করে ফেলছে জগন। তারপর জলের গামলায় ডোবাতেই ছ্যাঁক করে শব্দ।

কামারশালার ডানদিকে খুব বড়ো একটা হরতুকি গাছ। শুকনো পাতার ওপর বেশ ভারী রকমের মচমচ শব্দ শুনে চোখ তুলে সেদিকে তাকিয়েই মুখ শুকিয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেল ফাগুনির। একটা বিশাল বড়ো দাঁতাল হাতি এদিকেই এগিয়ে আসছে।

জগন কাজে ব্যস্ত। প্রথমে দেখতে পায়নি। ফোঁস করে একটা শব্দ হতেই চোখ তুলে তাকিয়ে তারও বুকের রক্ত হিম

হয়ে গেল। এখুনি তো শুঁড়ে তুলে আছড়ে শেষ করে দেবে। ফোঁস করে শব্দটা হাতির শুঁড় থেকেই বেরিয়ে এসেছে।

জগনের গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না। কোনোমতে ফ্যাঁসফেঁসে গলায় বললে, ছুট মার ফাগ্‌নি।

জগন ভাবছে, সে বুড়ো মানুষ। হাতির হাতে মরণই যদি তার কপালে লেখা থাকে তো তাই হোক। কিন্তু তাদের চোখের মণি কচি মেয়েটা অন্তত বাঁচুক। দেখেই বোঝা যাচ্ছে, এটা মাক্‌না হাতি। এসে যখন দাঁড়িয়েছে তখন একজনকে না মেরে ও ঠান্ডা হবে না।

হাতিরা দলবদ্ধভাবে থাকে। বয়স হয়ে গেলে জোয়ান হাতিদের কেউ এতদিনকার দলপতি বুড়ো হাতিটাকে গায়ের জোরে দল থেকে তাড়িয়ে দিয়ে নিজেই দলপতি সেজে বসে। দলছুট বুড়ো হাতির কোনোটা বা হিংস্র হয়ে চারদিকের মানুষজন মারতে থাকে, কোনোটা বা পাগল হয়ে যা খুশি তাই করে বেড়াতে থাকে। তাদেরই বলে মাক্‌না হাতি।

মাক্‌না হাতির কথা ফাগ্‌নির শোনা আছে, কিন্তু কোনোদিন চোখে দেখেনি। তার বাবা তাকে ছুটে পালাতে বললেও ছোটার মতো কোনো ক্ষমতাই তখন তার শরীরে নেই। ফাগ্‌নি চোখ বুজলো। হাতিটা ততক্ষণে কামারশালার একেবারে গায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কই শুঁড়ে পেঁচিয়ে আছড়ে ফেলার তো কোনো চেষ্টা করছে না? বরঞ্চ শুঁড়ের ফোঁসফোঁসানির সঙ্গে মাঝে মাঝে এমন একটা চাপা শব্দ বেরোচ্ছে যেন যন্ত্রণার গোঙানি। কয়েক মুহূর্ত পরে চোখ খুললো ফাগ্‌নি। না, ক্ষতি করবার কোনো চেষ্টাই করছে না হাতিটা। বরঞ্চ, সামনের ডান পা-খানা তুলে কিছু যেন বোঝানোর চেষ্টা করছে। ফাগ্‌নির ভয় যে কেমন করে কেটে গেল তা সে নিজেই হয়তো জানে না। জগন তখনো চোখ বুজে ঠকঠক করে কাঁপছে।

ফাগ্‌নি বুকে সাহস এনে বললে, বাবা, ইটা মাক্‌না হাতি লয়। ওর পায়ে কিছু হয়েছে তাই দেখাচ্ছে বটে। চোখ মেলে দ্যাখো।

জগন ভাবলো, মাক্‌না হাতি হলে এতক্ষণ তো তার শুঁড়ের প্যাঁচে উঠে এক আছাড়ে শরীরটা থেঁৎলে যাওয়ার কথা। তা তো হয়নি?

চোখ খুলেই জগন সঙ্গে সঙ্গে আবার চোখ বুজে ভাঙা গলায় চিৎকার করে উঠলো, কী করছিস ফাগ্‌নি? সরে যা। সরে যা–

ফাগ্‌নি হাতিটার একেবারে সামনাসামনি গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তার শুঁড়ে হাত বুলিয়ে বলছে, তোর কী হয়েছে বাপ? পায়ে কেউ কাঁড় মেরেছে?

কাঁড় মানে তীর।

হাতিটা যেন ফাগ্‌নির জিজ্ঞাসার মানে বুঝতে পারলো। পেছনের দু'পা মুড়ে বসে পড়ে সামনের ডান পা-খানা মেলে ধরলো। মুখে সেই চাপা কাতরধ্বনি।

ফাগ্‌নির আর কোনো ভয়ডর নেই। তার বাবার পাশ থেকে টেমিটা তুলে নিয়ে গিয়ে হাতির ডান পায়ের সামনে হাঁটু মুড়ে বসে ঝুঁকে একটুক্ষণ দেখেই চেঁচিয়ে বললে, ওর পায়ের তলাটা পেকে অনেক পুঁজ হয়েছে বটে বাবা। এসে দ্যাখো।

মেয়ের এতখানি সাহস দেখে জগন অবাক তো বটেই, সাহসও পেয়েছে। এগিয়ে গিয়ে হাতির পায়ের তলাটা কিছুক্ষণ দেখে বললে, ঠিকই বলেছিস রে মা। কিন্তু কী করব আখন?

কেনে, এই জায়গাটি ফেঁড়ে পুঁজ খসিয়ে দাও, ও আরাম পাবেক। হাতির কত বুদ্ধি তাই না বাবা? ও জানে তোমার ঠাঁই যন্তরপাতি আছে বটে, তাই চলে এলো। তাই লয়রে বাপ?

হাতিটা কী বুঝলো সে-ই জানে। মুখে সেই চাপা কাতরধ্বনি। কেবল খুব আলতো করে শুঁড়টা বাড়িয়ে ফাগ্‌নির গায়ে-মাথায় বুলিয়ে দিতে লাগলো।

দেখছ বাবা, আমাকে আদরসোহাগ জানাইছে কেমন? ইটা খু-উ-ব ভালো হাতি। লক্ষি ছেলে।–ফাগ্‌নির আনন্দের উচ্ছ্বাস আর ধরে না।

সদ্য তৈরি একটা তীরের ফলা দিয়ে হাতির পায়ের পুঁজের জায়গাটা জগন ছাড়িয়ে দিতেই একরাশ পুঁজ-রক্ত বেরিয়ে এল। জগন বললে, ভিতরে কিছু ফুটে আছে রে মা।

সন্না আর সাঁড়াশি দিয়ে ভেতরের জিনিসটা বের করে আনার পর দেখা গেল, কোনো মরা জন্তুর খুব ছুঁচলো এক টুকরো ছোটো হাড়। আরো পুঁজ-রক্ত বেরিয়ে গেল।

হাতিটা কিন্তু এতক্ষণ নিঃশব্দে চেরা-ফাঁড়া সবই সহ্য করেছে। হাড়খানা বেরিয়ে যাওয়ার পর তার মুখ থেকে যে চাপা শব্দ বেরোলো তা আর যন্ত্রণার গোঙানি নয়। যেন তৃপ্তি পাওয়ার অভিব্যক্তি। শুঁড় বুলিয়ে সে জগন আর ফাগ্‌নি দু'জনকেই আদর জানাতে লাগলো।

ফাগ্‌নি উঠে দাঁড়ালো। হাতির উদ্দেশে বললে, খালি আদরসোহাগ জানালেই তো হবেক নাই? আবার তো জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরবি। চুপ করে বসে থাক, গেন্দা পাতা লিয়ে আসি। বান্ডিজ করে না দিলে তো আবার কিছু কান্ড করে বসবি। বসে থাক, আমি আসছি।

ফাগ্‌নি ছুটে ঘরের দিকে চলে গেল।

গাঁদা গাছের পাতার রস অ্যান্টিসেপ্টিক। গাঁয়ের লোকেরা কেটে ছিঁড়ে গেলে হামেশাই সে-রস ব্যবহার করে।

একটু পরেই ঘর থেকে ছেঁড়া শাড়ির কতগুলো লম্বা ফালি আর একরাশ গাঁদাপাতা নিয়ে ফিরে এলো ফাগ্‌নি। কামারশালার নেহাইয়ের ওপর হাতুড়ি দিয়ে পাতাগুলো ছেঁচে রস করে হাতির পায়ে বাপ-মেয়ে দু'জনে মিলে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল। তারপর ফাগ্‌নি তার গায়ে ঠেলা দিয়ে বললে, ওঠ্ ইবার। খুব সাবধানে থাকবি কিন্তুক। ঘন জঙ্গলে যাবি নাই, পায় বেশি চাপ দিবি নাই। দিলে তোরই কষ্ট হবেক বটে। আমার কি? ডুংরির পারা গতরটি তো অ্যাত্ত বড়ো ধুম্‌সা বটে, দাঁত দুটাও কলাগাছের থোড়ের পারা কিন্তুক ঘটে বুদ্ধি আছে কিছু? অ্যাত্ত হাতি জঙ্গলে। কই, আর কারো তো পায় হাড় ফুটে না? খুব সাবধানে থাকবি, জানলি?

চিকিৎসা এবং রকুনি দুইই পেয়ে কিছুক্ষণ পরে হাতিটা আস্তে আস্তে জঙ্গলের অন্ধকারে মিশে গেল। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো জগন। ফাগ্‌নির কিন্তু মন খারাপ হয়ে গেছে। ও-বেচারাকে কে-ই বা দেখাশোনা করবে?

ঘটনার সময় চাঁদমণি বাড়িতে ছিল না। ফিরে এসে সব শোনার পর তার তখনই ভিরমি খাওয়ার অবস্থা। দামাল বলে

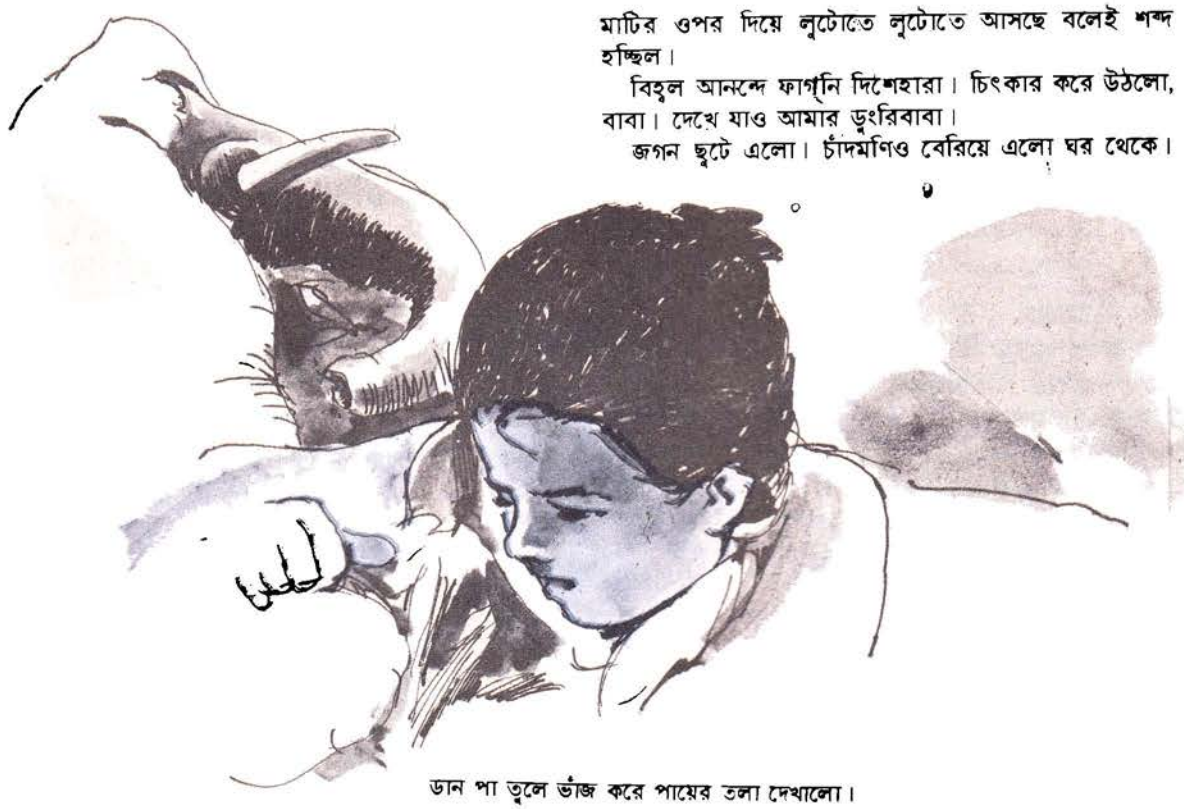

ডান পা তুলে ভাঁজ করে পায়ের তলা দেখালো।

কি এতই দামাল হতে হয়? হাতির মতো জানোয়ারকেও ভয়ডর নেই?

ফাগ্‌নি বললে, ওটা তো মাকনা হাতি লয়? ডর বাসবো কেনে? আহা, ডুংরির পারা অত্তবড়ো হাতিটা কত কষ্ট পাইছিল আর কত আরাম পেয়ে ফিরে গেল। ওটা আমাকে কত সোহাগ করলেক, মা। ও বটে আমার ডুংরিবাবা।

সেই থেকে হাতিটা ফাগ্‌নির ডুংরিবাবা।

মাঝে বনবিভাগের এক অফিসার এদিকে এসেছিলেন। সব ঘটনা শুনে তিনি বললেন, তোমার মেয়ে কিন্তু ব্যাপারটা ঠিকই বুঝতে পেরেছিল জগন। যাতায়াতের পথে তোমার কামারশালা কখনো দেখেছে। হাতির যথেষ্ট বুদ্ধি। চিকিৎসার জন্যেই তোমার কাছে এসেছিল। ও কিন্তু জীবনে কখনো তোমাদের ভুলবে না।

কথাটা যে কতখানি ঠিক, মাসদুয়েক পরেই একদিন তা বেশ বোঝা গেল।

সেদিনও তখন প্রায় সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। পরের দিন হাটবার বলে একটু হাত চালিয়ে কাজ করছিল জগন। ফাগ্‌নি যথারীতি হাপর টানছে। কিসের যেন একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে। গাছের ডাল ভেঙে মাটির ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে গেলে যেরকম শব্দ হয়, অনেকটা সেইরকম। শব্দটা বাড়ির উঠোনের কাছাকাছি আসতেই দেখা গেল, বিরাট এক কাঁদি কানাইবাঁশি কলা সমেত একটা গোটা গাছকেই শুঁড়ে জড়িয়ে এগিয়ে আসছে ফাগ্‌নির ডুংরিবাবা। কলার কাঁদি অক্ষত। পাতাগুলো মাটির ওপর দিয়ে লুটোতে লুটোতে আসছে বলেই শব্দ হচ্ছিল।

বিহ্বল আনন্দে ফাগ্‌নি দিশেহারা। চিৎকার করে উঠলো, বাবা। দেখে যাও আমার ডুংরিবাবা।

জগন ছুটে এলো। চাঁদমণিও বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

সন্ধ্যের ফিকে অন্ধকারে মিশে থাকা হাতিটা খুব সন্তর্পণে শুঁড়ের প্যাঁচ খুলে কলার কাঁদি সমেত গাছটাকে উঠোনে নামিয়ে শুঁড় দিয়ে একবার কলাগুলোর দিকে নজর কেড়ে তারপর ফাগ্‌নির গায়ে-মাথায় শুঁড় বুলিয়ে সে কি আদরের ঘটা! এইরকম সে তিন-চারবার করলো। অর্থাৎ, জংগল থেকে তোমাদের জন্যে একটু উপহার এনেছি। তোমরা খেলে আমি খুশি হবো।

জগন অভিভূত স্বরে বললে, ফরিস্টারবাবু তো ঠিক কথাই বলেছিলেন রে মা।

ফাগ্‌নি ব্যস্তভাবে বললে, কলার কাঁদিটা কেটে জলদি সরিয়ে নাও বাবা! দেখছো না, ডুংরিবাবা নিজে গাছের একটা পাতাও না খেয়ে গোটা গাছটা লিয়ে এসেছে? কলা আমাদিগের লেগে আর অ্যাই অ্যাত্ত বড়ো গাছটা তো ও নিজেই খাবে। তাই না ডুংরিবাবা?

ডুংরিবাবা হয়তো মশা তাড়াতে কান দুটো নাড়লো। কিন্তু ফাগ্‌নি লাফাতে লাগলো, দেখলে, আমার কথা বুঝে কেমন সাড়া দেয়? ডুংরিবাবা আমার লক্কি ছেলে! সোনামানিক ছেলে।

জগন কলার কাঁদিটা কেটে সরিয়ে নিতেই কলাগাছের কয়েকটা পাতা কেটে নিয়ে ডুংরিবাবার মুখের সামনে উঁচু করে ধরেছে ফাগ্‌নি। –খা বাবা, খা–

চাঁদমণি তো ভয়ে দিশেহারা। কিন্তু ডুংরিবাবা এমন সুন্দর কায়দায় শুঁড় দিয়ে পাতাগুলো মুড়ে নিল যে ফাগ্‌নির হাতে তার

শুঁড়ের ছোঁয়া পর্যন্ত লাগলো না। পাতা খাওয়া শেষ হওয়ার পর পা দিয়ে গাছটাকে চেপে শুঁড় দিয়ে খোলাগুলো ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে খেতে তার আধঘণ্টাও লাগলো না। হঠাৎ ফাগ্‌নির মনে পড়ে গেল, সেই পা-খানা কেমন আছে তা তো দেখা হলো না? টুক করে লণ্ঠনটা নিয়ে এসে ডুংরিবাবার ডানপায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল ফাগ্‌নি। বললে, পা তোল তো লক্কি ছেলে। কেমন আছে দেখি?

কথার সঙ্গে তার ডানপায়ে হাত বুলিয়ে দিতেই ডুংরিবাবা ইঙ্গিতটা বুঝলো। ডান পা তুলে ভাঁজ করে পায়ের তলা দেখালো। জগনও খুশি। ফাগ্‌নির তো কথাই নেই। ক্ষত জায়গাটা একেবারে সেরে গেছে। তার ভাঁজ-করা পায়ে আদরে একটা ঠেলা দিয়ে শাসনের সুরে ফাগ্‌নি বললে, হ্যাঁ ঠিক আছে বটে! আখন পা লামা। আর কক্কনো যেন ছাগলের পারা না দেখে পথ চলে আবার একটা ঝামেলা পাকাস্ নাই, বুঝলি? বারবার কে দেখবে, শুনি?

সব মিলিয়ে ঘণ্টাখানেকেরও বেশি সময় ছিল ডুংরিবাবা। খাওয়ার পর শুঁড় বুলিয়ে জগনকে আদর জানিয়েছে, ফাগ্‌নিকে আদরে আদরে ভরে দিয়েছে। তার বোধহয় ইচ্ছে ছিল, চাঁদমণিকেও একটু আদর জানিয়ে যায়। কিন্তু চাঁদমণি তার কাছে আসতেই সাহস পায়নি।

এর পরেও একদিন সকালবেলা দাওয়ায় এক কাঁদি কলা পাওয়া গিয়েছিল। গাছ ছিল না। ভেতর থেকে এবড়ো-খেবড়োভাবে মুচড়ে টেনে তোলা কিছুটা থোড় সমেত কলার কাঁদি।

এই সময়টা সামনের নিচু পাহাড়ে ময়ূরের দল পালক খসায়। তাদের গা থেকে পুরনো পালক খসে পড়ে আবার নতুন পালক গজায়। প্রত্যেক বছরই নানা গাঁয়ের মেয়ে-পুরুষ পাহাড়ের দক্ষিণ দিকের ছোটো ঝরণা মতো নদীটা পেরিয়ে পাহাড়ে পালক কুড়োতে যায়। আঁটি বেঁধে ময়ূরের পালক নিয়ে আসে সবাই। হাটে বিক্রি হয় আবার পাইকারের লোকেরা গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরেও কিনে নিয়ে যায়। তারা কম দাম দেয় তা সবাই জানে। তবে জিনিসটা তো আর কিনতে হয় না? ওই কুড়িয়ে নেওয়ার যা মেহনৎ। ডুংরিটাও খুব কাছে। এক ক্রোশ পথও নয়। সকালে গিয়ে পালক কুড়িয়ে দুপুরেই ফিরে আসা যায়।

আগের বছর থেকে ফাগ্‌নিও মায়ের সঙ্গে পালক কুড়োতে যাওয়া আরম্ভ করেছে। এ-বছর দু'তিন দিন যাওয়ার পরই অদ্ভুত কাণ্ড! সকালে সবচেয়ে আগে যারা গেছে তারা দেখে যে, একটা জায়গায় পাশাপাশি জড়ো করা দু'বোঝা পালক! এত সকালে এসে অত পালক কুড়োলো কে? ধারে কাছে কেউ নেই দেখে দু'তিনটি মেয়ে তা থেকে কিছু চুরি করে নেওয়ার মতলবে কাছে গিয়ে হাত দিতেই কাছেই একটা ঝোপ নড়ে উঠলো। তারা ভয়ে কাঠ। ঝোপের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এলো একটা দাঁতাল হাতি। ভয়ে শুকনো গলায় একটি মেয়ে তার সঙ্গিনীকে বললে, এটা তো ফাগ্‌নির ডুংরিবাবা রে! আখন কী হবে?

ডুংরিবাবা কিন্তু আর এগোলো না। সেখানে দাঁড়িয়েই কান নেড়ে নেড়ে শুঁড় দোলাতে লাগলো। মেয়ে-কটি একপা-একপা করে পিছু হটে সরে এসে পাথরের আড়ালে বসে পড়লো। তারা তখন গলগল করে ঘামছে।

ফাগ্‌নি আর চাঁদমণি আসার পর রহস্যটা সবায়ের কাছেই স্পষ্ট হয়ে গেল। ডুংরিবাবা এগিয়ে এসে শুঁড় দিয়ে পালকের গোছা দেখিয়ে ফাগ্‌নিকে আদর জানাতে লাগলো।

সবাই অনেক দূরে দাঁড়িয়ে কাণ্ডকারখানা দেখছে আর হিংসায় জ্বলছে। জঙ্গলের হাতি যদি রোজ এইভাবে সব পালক কুড়িয়ে ফাগ্‌নিকে দিয়ে দেয় তাহলে আর কেউ তো কিছুই পাবে না। ফাগ্‌নির সব কথা নাকি হাতিটা বুঝতে পারে। মেয়েটা নিশ্চয়ই হাতিটাকে শিখিয়ে দিয়েছে। নইলে এমন হয়?

আর সবায়ের মুখ দেখে ব্যাপারটা ফাগ্‌নি ঠিকই বুঝতে পেরেছে। ডুংরিবাবার শুঁড় জড়িয়ে একটা চুমু খেয়ে সে বলল, পাগল ছেলে বটে! তুই যদি আমার লেগে সব পালক কুড়িয়ে রাখিস তবে আর সবাই কেমন করে পাবে? ওদের হিংসা হবেক নাই? আর এমনপারা করিস না ডুংরিবাবা। লক্কি ছেলে। সোনা ছেলে। সব্বাইকে কিছু কিছু ভাগ করে দিই, কেমন?

ফাগ্‌নি আর ডুংরিবাবার সম্পর্কের ব্যাপারটা চারদিকের গ্রামেই ছড়িয়ে পড়েছে। কেউ বলে, ও মেয়েটা গুণ-তুক জানে। কেউ বলে, হাতিটা আগের জন্মে ওর ছেলে ছিল— এমনি আরো কত কী।

গরমকাল পড়বার পর একদিন সকালে দাওয়ায় একটা বিরাট বড়ো কাঁঠাল পেয়েছিল চাঁদমণি। ফাগ্‌নি তখনো ঘুম থেকে ওঠেনি। তাকে ডেকে তুলে এনে দেখিয়ে একগাল হেসে চাঁদমণি বললে, তোর পাতানো বেটা তোকে কত্ত ভালোবাসে দেখছিস?

ফাগ্‌নি বললে, ভালোবাসবেই তো! আমি যে ওকে কত্ত ভালোবাসি? আমার ডুংরিবাবার পারা হাতি দেশে আর একটাও আছে?

তখন বর্ষাকাল।

হঠাৎ একদিন সারা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো, একটা মাক্না হাতি বেরিয়েছে। দূরের দু'তিনটে গাঁয়ে অনেক ঘরবাড়ি ভেঙেছে, শুঁড়ে জড়িয়ে দু'জনকে আছড়ে মেরে ফেলেছে। হয়তো তিন-চার দিন পরে শোনা গেল, কাছেই কোনো একটা গাঁয়ে আর একজনকে মেরেছে। কেউ কেউ বলছে, এ-হাতি আর কেউ নয়, ফাগ্‌নির ডুংরিবাবা। ফাগ্‌নি তো কেঁদে আকুল। ডুংরিবাবা কিছুতেই মাক্না হতে পারে না। যার স্বভাব অত ভালো সে কখনো ওই ভাবে মানুষ মারতে পারে?

ক'দিনের ভেতরেই আশ-পাশের গাঁয়ের আরো চার-পাঁচজনকে পাগলা মাক্না হাতির কবলে পড়ে প্রাণ দিতে হলো। ঘর-বাড়িও অনেকেরই ভেঙে মাটিতে মিশে গেছে। সব মিলিয়ে পনেরো দিনের ভেতরে ক্ষ্যাপা হাতিটা মোট দশজনকে মেরে ফেলেছে। সরকারি আইনে বন্য জীব-জানোয়ার মারা নিষেধ। এক্ষেত্রে আর উপায় নেই। সরকার থেকেই শিকারী পাঠানো হলো। ওই মারাত্মক বিপজ্জনক হাতিটাকে না মেরে ফেলে এখন আর উপায় নেই। সবায়েরই মুখে মুখে একটা কথা ফিরছে, ফাগ্‌নির সোহাগের

দাঁতাল হাতিটাই এখন ক্ষ্যাপা মাক্না হয়ে এই কাণ্ড করে বেড়াচ্ছে। ওরে বাবা, জংগলের জানোয়ার জানোয়ারই। তাও আবার হাতি!

সেদিন ঘুম থেকে উঠে ফাগ্নি সবে ঘর থেকে বাইরে এসেছে, ঠিক সেই সময়েই জোর পায়ে হেঁটে এসে জগনের বাড়ির উঠোনে দাঁড়ালো বংকু মাহাতো। ডুংরিতে যেতে যেখানে ঝরণার মতো নদীটা পার হতে হয়, তার কাছেই বংকুর বাড়ি।

বংকু বললে, কাল শেষ রাতে ফাগ্নির ডুংরিবাবাকে শিকারীরা গুলি মেরেছে জগন! নদীর ধারেই সে পড়ে আছে।

ডুকরে কেঁদে উঠেই পাগলের মতো ছুটলো ফাগ্নি। মেয়ের পেছন পেছন জগন আর চাঁদমণিও ছুটলো। মেয়েটা কী করে বসবে, কে জানে!

ফাগ্নি গিয়ে যখন পৌঁছলো তখনো ডুংরিবাবার প্রাণটা বেরিয়ে যায়নি। পাগলের মতোই ডুংরিবাবার গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো ফাগ্নি। ডুংরিবাবার কানের পাশেই গুলি লেগেছে। তখন শুঁড় নাড়ার মতো ক্ষমতাও তার নেই। তবু শুঁড়ের ডগাটা একটু তুলে ফাগ্নিকে সে আদর জানাবার ব্যর্থ চেষ্টা করলো। একটু দূরে একটা কাঁঠাল ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে। হয়তো কাঁঠালটা ফাগ্নিকে দিতেই সে যাচ্ছিল।

আসল খুনে মাক্না হাতিটা মারা পড়লো দু'দিন পরে। ডুংরিবাবা জেনেও যেতে পারলো না যে, প্রকৃত অপরাধী সে নয়। তার পাতানো মাকে শেষ আদর করার জন্যেই হয়তো সে ফাগ্নির যাওয়া পর্যন্ত বড়ো কষ্ট করে বেঁচে ছিল।

ছবি: ধ্রুব রায়

ছবি: রজতবরণ চক্রবর্তী

# চন্দ্রাহত সাত্যকি সোম

## রেবন্ত গোস্বামী

আজ সেই প্রতীক্ষিত বৈশাখী অমাবস্যা তিথি। আজই রাত্রে কলকাতার বুকে ছড়িয়ে পড়বে সেই আলো–বিজ্ঞানীরা যার নাম দিয়েছেন কৃত্রিম জ্যোৎস্না।

সন্ধ্যার একটু আগেই বিষণ্ণ মন নিয়ে বৈঠকখানা ঘরের সোফায় এসে বসলেন বিজ্ঞানী সাত্যকি সোম। কয়েক বছর আগে আরেকবার এরকম ভারাক্রান্ত মনে এইভাবেই দু'হাতের তালুতে মুখ ঢেকে এখানে বসেছিলেন। যেবার শয়তান বিজ্ঞানী রিউবেন বুশ টাইটেনিয়াম গ্রহ থেকে পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করেন (রিউবেন বুশের মৃত্যুবাণ–শারদীয় শুকতারা ১৩৯৫)। কিন্তু সেদিন তাঁর বিষাদের অংশীদার ছিলেন পৃথিবীর সমস্ত বিজ্ঞানী। তাঁর পরিকল্পনায় সম্পূর্ণ আস্থা রেখে নির্ভর করেছিলেন তাঁরা। অবশেষে সাফল্যের বরমাল্য হিসাবে তাঁকে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার দিয়েও সমগ্র বিশ্বের সেদিন মনে হয়েছিল, আগামী এক শতাব্দীর সব কটি নোবেল পুরস্কার সাত্যকি সোমকে উৎসর্গ করলে তবেই হয়তো তাঁর অবদানের কিছুটা স্বীকৃতি দেওয়া হতো।

সমস্ত পৃথিবী যাঁকে সেদিন জীবনদাতা দেবতা বলে মনে করেছিল, আজ সেই ডক্টর সোমই নিজের ঘরে নিঃসঙ্গ, বিষণ্ণ। "কয়েকটি বছরেই সব উচ্ছ্বাস, কৃতজ্ঞতাভরা কথার মালা শুকিয়ে ঝরে গেল রে, নরোত্তম!"–ডক্টর সোম তাঁর একমাত্র সঙ্গী রোবট নরোত্তমকে উদ্দেশ করে বললেন। এই মুহূর্তে তাঁর বাসস্থান থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে ভাস্কর-ভবনে জড়ো হয়েছেন দেশবিদেশের তাবড় তাবড় বিজ্ঞানী–টেলি-কন্ট্রোলের মারফৎ কৃত্রিম জ্যোৎস্নার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে।

বিশদভাবে না বললে পাঠকদের কাছে প্রসঙ্গটা হয়তো বোধগম্য হচ্ছে না। তাই বিষয়টা প্রথম থেকেই বলি।

আজ থেকে দু'বছর আগে দিল্লীতে এক সম্মেলনে ভারতীয় বিজ্ঞানী ডক্টর রমেশ বেরি এক প্রস্তাব ও পরিকল্পনা দেন। সেটা হলো সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে রাত্রে ভারতের চার মহানগরীর রাস্তাঘাট আলোকিত করা। তিনি বললেন, চার মহানগরীর ঠিক ওপরে চারটি কৃত্রিম উপগ্রহ থাকবে। বার্তা-সঞ্চারের উপগ্রহের মতো ওগুলোও পৃথিবীর সঙ্গে একই কৌণিক গতিতে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে পৃথিবীকে আবর্তন করবে–যাতে করে আপাতদৃষ্টিতে তাদের সবসময়ই আকাশের একই জায়গায় থাকতে দেখা যাবে। এই উপগ্রহগুলিতে শক্তিশালী আলো-প্রতিফলক থাকবে–যেটাকে টেলি-কন্ট্রোল দিয়ে পৃথিবী থেকেই চালু অথবা বন্ধ করা যায়। আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ থাকুক কি না থাকুক–সন্ধ্যার পরেই ভাস্কর-ভবনের মতো কেন্দ্র থেকে রোতাম টিপে প্রতিফলিত সূর্যালোকের কৃত্রিম জ্যোৎস্না শহরে ছড়িয়ে দিলে রাস্তায় আর বৈদ্যুতিক আলো জ্বালানোর দরকার হবে না। ময়দানে, গঙ্গার বুকে সেই উজ্জ্বল জ্যোৎস্নার প্লাবন বয়ে যাবে।

দেশের যত বিজ্ঞানী ডক্টর বেরির এই প্রস্তাবে সাধুবাদ দিলেন। একবাক্যে সমর্থন করলেন। একমাত্র সাত্যকি সোমই

সেদিন আপত্তি তুলেছিলেন। সকলে তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করলেও তিনি বেঁকে বসেছিলেন। তাঁর আপত্তির কারণ শুনে সবাই অবাক হয়েছিলেন। ভেবেছিলেন, তিনি কি বার্ধক্যভারে দুর্বল আর আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন? নইলে–তাঁর আপত্তির ভাষা ঠিক বিজ্ঞানীসুলভ তো নয়। কবিরা অবশ্য এরকম ভাব-মাখা ভাষায় বলে থাকে–দাও ফিরে সে অরণ্য ইত্যাদি ইত্যাদি।

ডক্টর সোম যা বলেছিলেন, তার সারমর্ম হলো–পূর্ণিমার যেমন প্রয়োজন আছে, অমাবস্যারও সেরকম প্রয়োজন আছে মানুষের জীবনে। আলোর রূপের মতন আঁধারের রূপ আছে। আলো যদি হয় গতি, আঁধার বিরতি। যে অজ্ঞেয় প্রকৃতিদেবী পৃথিবীটাকে হেলিয়ে দিয়ে ঋতু পরিবর্তন করাচ্ছেন, তিনিই তাকে পাক খাইয়ে দিন আর রাত্রি ঘটাচ্ছেন। এই বৈচিত্র্যকে কৃত্রিমভাবে নষ্ট করে মিডাসের রাজার মতন সবকিছুকে সোনা করতে চাইলে একঘেয়েমির অভিশাপ মানুষের মনকে বিপর্যস্ত করে তুলবে। তাই শহর-জীবনের আলো-আঁধারের এটুকু বৈচিত্র্য অন্তত আপনারা ধ্বংস করবেন না। রাত্রে রাস্তার আলো থাকুক আপত্তি নেই–কিন্তু তার বাইরেও থাকুক বিদিশার নিশার সেই তিমির, যেখানে দু'দন্ড শান্তির বিশ্রাম নিতে পারে শ্রান্ত মানুষ। অন্তত কিছুক্ষণের জন্যও বলতে পারে–আমার আঁধার ভালো।

সাত্যকি সোমের ভাষণ শুনে অন্য সব বিজ্ঞানী অবাক হয়েছিলেন। কেউ কেউ আড়ালে হয়তো হেসেও ছিলেন। বলেছেন, ডক্টর সোম কি বিজ্ঞান ছেড়ে দিয়ে কবিতা লিখছেন? রমেশ বেরি তো বাঙালী বিজ্ঞানী ডক্টর দোলা চক্রবর্তীকে বলেই বসলেন, "আপনাদের বাংগালীদের ঐ এক গলৎ আছে ডক্টর চক্রবর্তী। বিজ্ঞানী হোবেন, খিলাড়ী হোবেন, বিজিনেসম্যান হোবেন–লেকিন কবি ভী হোবেন।"

ডক্টর সোমের আপত্তিকে নিছক সাময়িক আবেগপ্রবণতা ধরে নিয়ে তাকে কোনো মূল্য না দিয়ে যখন সত্যিই কৃত্রিম জ্যোৎস্না প্রকল্প অনুমোদন পেল, সেদিন সাত্যকি সোম বিরাট আঘাত পেলেন মনে। তাঁর আপত্তি কেন গ্রাহ্য হলো না, তার কারণটা পর্যন্ত তাঁকে জানানোর সৌজন্য দেখালেন না এ. এম. পি. সি বা কৃত্রিম জ্যোৎস্না প্রকল্প পরিষদের কর্তাব্যক্তিরা। তিনি কি তবে তাঁদের কাছে এতই মূল্যহীন হয়ে গেলেন যে, তাঁর বক্তব্যকে অকিঞ্চিৎকর প্রলাপ বলে মনে করা হলো?

তাই যখন ডক্টর বেরি তাঁকে টেলিফোনে ডেকে প্রস্তাব করলেন যে, বিজ্ঞানীকুলতিলক সাত্যকি সোমের প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ প্রথম কৃত্রিম জ্যোৎস্না কলকাতার আকাশেই ছাড়া হবে, আর তার উদ্বোধন ডক্টর সোমই করবেন–তখন ডক্টর সোম নিজেকে ঠিক রাখতে পারেননি। তাঁকে এরকম রাগে ফেটে পড়তে কেউ কখনো দেখেনি। তিনি কাঁপতে কাঁপতে বলেছিলেন, "আমি তো যাবই না, বরং সেদিন প্রতিবাদস্বরূপ আমার বাড়ি অন্ধকার করে রাখব।"

টেলিফোন রেখে দেওয়ার আগেই তিনি শুনতে পেয়েছিলেন ক্ষীণস্বরে একটু মৃদু হাসির আওয়াজ আর তার পরেই একটা শব্দ–পাগল! ডক্টর বেরি নিজের মনেই বললেন, অথবা হয়তো পাশে অন্য কেউ ছিল।

রিসিভার রেখে দিয়ে সশব্দে হেসে উঠলেন ডক্টর সোম। দন্ডায়মান রোবোট নরোত্তমকে চালু করাই ছিল। তিনি বললেন, "জানিস নরোত্তম, সেদিনের দেবতা সাত্যকি সোম আজ পাগল। কারণ ওদের মতে মত মেলাইনি।"

নরোত্তম রোবোট ডক্টর সোমের অবসরের সংগী। সমবয়সীর মতো তাঁর সংগে ঠাট্টা ইয়ার্কিও করে।

সে কিছু না জেনেই সাত্যকি সোমকে খুশি করার জন্য বলে উঠল, "তাতে কী হয়েছে? গ্যালিলিও কোপারনিকাস সবারই তো হেনস্হা হয়েছে। তবুও একসময় পৃথিবী জানবে–ঐ একজনেরই মাথা ঠিক ছিল, অন্য সকলেই পাগল বা মূর্খ।"

নরোত্তমের সংগে এই কথোপকথনের মাঝখানে ঘরে প্রবেশ করল গৌতম ব্রহ্ম। এই সংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচীনপন্থী তর্কবাগীশ তরুণটিকে ডক্টর সোম স্নেহ করেন–যদিও তার পৌরাণিক ঘটনার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়ার সময় তিনি কপালে হাত দেওয়ার ভান করে বুড়ো আঙুল দুটো দিয়ে নিজের দু'কান বন্ধ করে রাখেন।

গৌতম ঘরে ঢুকেই বলে উঠল, "কী ব্যাপার! দরজায় রোবোট দারোয়ান দ্বারিকনাথ দেখি দিনের বেলাতেই জেগে আছে। আমাকে দেখে বলল, তার স্পেশ্যাল ডিউটি পড়েছে দিনে, কারণ আপনি দিনের বেলাতেই নিশিপালন করছেন। আলো না জ্বালান, কিন্তু জানলাটা খুলে দিন। দেখবেন, একটু পরেই কেমন আলোতে ভরে যাবে চারদিক। একটু পরেই কৃজ্যোতের উদ্বোধন হবে। টেলিভিশনে দেখাবে।"

ডক্টর সোম অবাক হয়ে বললেন, "ক্রিয়োজোট!"

গৌতম হেসে বলল, "ক্রিয়োজোট নয়, কৃজ্যোৎ। কৃত্রিম জ্যোৎস্নার সংক্ষিপ্ত রূপ।" বলেই ঘরের কোণে রাখা টেলিভিশন চালিয়ে দিল।

"কেন আর তুমি কাটা ঘায়ে–" নরোত্তম তার মন্তব্য শুরু করতেই তাড়াতাড়ি সুইচ্ অফ্ করে ডক্টর সোম তাকে মৃত করে দিলেন। ঠোঁটকাটা রোবোট নরোত্তম রেখেঢেকে কথা বলে না। ওর জন্যে ডক্টর সোমকে অন্যের কাছে অনেকবার অপদস্হ হতে হয়েছে। সে কথা যারা নরোত্তমের কীর্তিকলাপের সংগে পরিচিত, তারা সবাই জানে। তবু গৌতম আজ একটু অবাক হলো।

টেলিভিশনে ভেসে উঠল ভাস্কর-ভবনের ভেতরের দৃশ্য। পাশাপাশি বসে আছেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানীগণ, তাবড় তাবড় ব্যক্তি আর মন্ত্রীরা। মাঝে মাঝে ক্লোজ-আপে দেখা যাচ্ছে রমেশ বেরির বিরাট মুখ–তাঁর গোঁফের আড়ালে হাসি। টি ভি. ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে তিনি যেন সাত্যকি সোমের উদ্দেশে একটা ব্যংগের হাসি পাঠিয়ে দিলেন–ডক্টর সোমের হঠাৎ এ কথা মনে হলো। একটা নাচের অনুষ্ঠান হচ্ছে। নেপথ্যে রবীন্দ্র সংগীত–'আজ জ্যোৎস্না রাতে সবাই গেছে বনে....'

একটু পরেই নাচগান শেষ হলো। রমেশ বেরি উঠে দাঁড়িয়ে সবাইকে স্বাগত জানালেন। তারপর বলতে শুরু করলেন, "আজ এই অনুষ্ঠানে যাঁর অনুপস্থিতি আমরা অন্তরে অনুভব করছি, তিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয় মহাবিজ্ঞানী ডক্টর সাত্যকি সোম। আমাকে টেলিফোনে তিনি জানিয়েছেন যে, প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও শারীরিক অসুস্হতার কারণে তিনি আজ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারলেন না।...."

হঠাৎ একটা প্রচন্ড হুংকারে চমকে উঠল গৌতম। দেখল,

সাত্যকি সোম রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন।

সাত্যকি সোম রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়েছেন। মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠেছে তাঁর। টেবিলে ঘুষি মেরে বললেন, "মিথ্যেবাদী শয়তান! আমাকে অপমান! এর প্রতিশোধ আমি নেব।"

শান্ত ধীর জ্ঞানবৃদ্ধের এই দুর্বাসারূপ গৌতম আগে কখনো দেখেনি। সে টি. ভি. বন্ধ করে বাক্যহারা হয়ে ডক্টর সোমের দিকে তাকিয়ে থাকল। তার সেই বিস্মিত চাহনির দিকে দৃষ্টি পড়তে নিজেকে সামলে নিলেন সাত্যকি সোম। তারপরে দু'হাতে মাথা ধরে মুখ নিচু করে সোফায় বসে পড়লেন।

এইভাবে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর পকেট থেকে একটা ছোট কৌটো বার করে তার থেকে সাদা বড়ি নিয়ে জল দিয়ে খেয়ে নিলেন। নির্বাক হয়ে বসে থাকা গৌতমকে দেখে বোধহয় একটু লজ্জিতই হলেন। একটু চুপ করে থেকে তারপর বললেন, "তোমাকে একটা গল্প বলব, গৌতম। গল্পের পরে একটা প্রশ্ন করব। যদি সঠিক উত্তর দিতে পারো, তবে যে বইটা আমি লিখছি সেটা আমি উৎসর্গ করব কুসংস্কারী অবিজ্ঞানী গৌতম ব্রহ্মকে। আর যদি ভুল উত্তর দাও, তবে আমার বাড়ির দরজা তোমার কাছে চিরকালের জন্য বন্ধ থাকবে।"

গৌতম হেসে বলল, "নিজেকে বিক্রমাদিত্যের চাইতেও নার্ভাস লাগছে। তবুও বলুন।"

সাত্যকি সোম বললেন, "শোনো তবে। এক যে ছিলেন রাজা। তোমার ঐ বিক্রমাদিত্যের মতনই বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান, দয়ালু, ন্যায়নিষ্ঠ আর সুশাসক। তাঁর সুশাসনে রাজ্যের সমস্ত প্রজার গৃহ সুখের নীড়। সুখ, স্বাস্থ্য, শান্তি আর সমৃদ্ধিতে দিন দিনই ভরে উঠতে লাগল রাজ্য। প্রজারা রাজার গুণগানে পঞ্চমুখ।

"রাজা প্রজার এই সুখসমৃদ্ধি সহ্য হলো না বুঝি অদৃষ্টদেবীর। সেই রাজ্যের মধ্যে একটি কুয়ো ছিল। প্রজারা তার জল পান করত। হঠাৎ কীভাবে সেই জল পরিণত হলো বিষাক্ত কারণবারিতে। যে খাবে সে মরবে না বটে, তবে সে পরিণত হবে বিকৃতমস্তিষ্ক উন্মাদে। কিন্তু সে জল হলো আরো সুস্বাদু, মিঠে আর শীতল। দলে দলে প্রজারা মহানন্দে সে জল পান করতে লাগল। সবাইকে ডেকে বলল, জলের স্বাদ গুণের কথা—যা খেলে সব রোগ সেরে যাবে। এইভাবে অল্পকালের মধ্যেই রাজ্যের সমস্ত লোক পাগল হয়ে গেল। প্রকৃতিস্থ থাকলেন একা রাজা নিজে। রাজ্যের লোকের পাগল হওয়ার কারণ তিনি বুঝতে পারলেন। সেই কুয়োর জলপান নিষেধ করে আদেশ জারী করলেন। কিন্তু খুব দেরি হয়ে গিয়েছে তখন। কেউ রাজী হলো না 'অদ্ভুত' এই আদেশ রাজ্যে ঢ্যাঁড়া পেটাতে। রাজা নিজে গিয়ে পাথরের চাঁই দিয়ে ঢেকে দিলেন কুয়োর মুখ। সবাই ক্ষিপ্ত হয়ে রাজাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে সরিয়ে দিল পাথরের ঢাকা। বলতে লাগল, 'আমাদের রাজা পাগল হয়ে গিয়েছে রে! আয় ওটাকে মেরে ফেলে আমরা সবাই মিলে এই কুয়োটাকে রাজা করি।'

"রাজা সেখান থেকে পালিয়ে এসে প্রাণে বাঁচলেন। তারপর ঘরে এসে জানলা-দরজা বন্ধ করে দু'হাতে মাথা চেপে ধরে ভাবেন—এ কী হলো! আমার সোনার রাজ্য কার কারসাজিতে এভাবে রসাতলে গেল! কী করবেন তিনি এখন? রাজ্য ছেড়ে পালাবেন? দুঃখে হতাশায় ক্ষণেকের জন্যে ভাবেন, নিজের বুকেই বসিয়ে দেবেন তাঁর তরবারি। পরক্ষণেই চিন্তা করেন, এ তো আত্মহত্যা! পলায়ন আর আত্মহত্যা দুটোই তাঁর কাছে সমান পাপ।

"সারারাত জেগে তিনি ভাবলেন আর ভাবলেন। ভোরের আলো ফুটতেই মনস্থির করে ফেললেন তিনি। সকলের ঘুম ভাঙার আগেই তিনি চুপিচুপি প্রাসাদ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন সেই কুয়োর উদ্দেশে। কুয়োর কাছেই দড়ি বালতি ছিল। দড়ি নামিয়ে তিনি এক বালতি জল তুললেন। তারপর সেই বালতিতে মুখ লাগিয়েই ঢকঢক করে পান করে যেতে লাগলেন সেই জল—যতক্ষণ না উদরপূর্তি হয়ে গেল বিষাক্ত মাদক-বারিতে।

"সকালে প্রজারা উঠে দেখল রাজার পাগলামি একদম সেরে গিয়েছে। তারা দু'হাত তুলে নাচতে নাচতে বলল—'আমাদের রাজাটা ভালো হয়ে গিয়েছে রে!' দেখল, রাজাও তাদের মতো উদ্বাহু হয়ে নৃত্য করছেন আর অবিরাম বকে চলেছেন মূল্যবান আবোল তাবোল বক্তৃতা।"

ডক্টর সোম তাঁর গল্প শেষ করে বললেন, "এবার বলো তো, রাজা কুয়োর জল খেয়ে প্রজাদের সঙ্গে এক হয়ে গিয়ে ঠিক কাজ করেছিলেন? না কি করেননি?"

গৌতম সজোরে বলল, "মোটেই করেননি। রাজা বিক্রমাদিত্য হলে ঐ কুয়োর জলের বদলে সত্যিকার বিষপান করাও শ্রেয় বলে মনে করতেন।"

সাত্যকি সোম সোফা থেকে লাফিয়ে উঠে গৌতমকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন! বললেন, "আমার মনের জোর তুমি অনেক বাড়িয়ে দিলে গৌতম। আমি বিজ্ঞানী আর তুমি অবিজ্ঞানী সংস্কারাচ্ছন্ন। তাই মাঝে মাঝে কর্মশ্রান্ত হয়ে তোমার ঐ সব আজগুবি ধারণার কথা শোনার মধ্যেও আমি বিনোদন পাই। কিন্তু আজ তোমার কাছে শুনতে পেলাম সত্যের ধ্বনি। ঐসব বিজ্ঞানীরা মিলে চাঁদকে তার সৌন্দর্যের সাম্রাজ্য থেকে নির্বাসিত করছে। যে চাঁদ মায়ের কোলে বাঙালী শিশুদের কপালে টিপ দিয়ে যেত। যে চাঁদের চলার ছন্দে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধদের উৎসব-অনুষ্ঠান আজও নিয়ন্ত্রিত হয়, সেই চাঁদের আলোকে বিদায় দিচ্ছে আজকের কৃত্রিম

জ্যোৎস্না। তাই আমার কাছে এটা শোকদিবস। গৌতম, কাকজ্যোৎস্না কাকে বলে জানো? নির্মেঘ আকাশে গভীর রাতে যখন পূর্ণিমার চাঁদ ওঠে–সেই জ্যোৎস্নার প্লাবনে মাঠঘাট ভরে যায়। গাছে গাছে কাকেরা জেগে উঠে ডাকতে শুরু করে। ভাবে, ভোর হয়েছে বুঝি। এই কৃত্রিম জ্যোৎস্নায় কাকরা আর আনন্দে চঞ্চল হয়ে উঠবে না। তাদের রাত্রের বিশ্রাম আর জাগরণের আনন্দের মধ্যে আক্রমণ হানবে এই কৃত্রিম জ্যোৎস্না।"

একটু থেমে সাত্যকি সোম আবার বললেন, "রমেশ বেরির মতন অনেক বিজ্ঞানীই হয়তো ভাবছেন, সাত্যকি সোমের মাথার গোলমাল দেখা দিয়েছে। যাকে বলে চন্দ্রাহত অবস্থা, তাই। যে কথাই জানুক তারা। এবার আমি কিছুদিন বিশ্রাম চাই। শুধু তোমাকেই বলছি গৌতম, আমি বেশ কিছুদিনের জন্যে আত্মগোপন করতে চাই এমন জায়গায় গিয়ে, যেখানে কেউ আমার পরিচয় জানবে না। সেখানে বেশি লোকজন থাকবে না। থাকবে প্রকৃতির শ্যামল সজল রূপ। এই বর্ষাকালেই যাব। তার আগে দুটো জিনিস তোমাকে এনে দিতে হবে গৌতম।"

গৌতম জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চাইতে ডক্টর সোম বললেন, "দাশু রায় কে গৌতম? পাঁচালি নামে কোনো বই লিখেছিলেন এই দাশু রায়। সাহিত্য পরিষদ থেকে আমার নাম করে সেই পাঁচালি বইয়ের একটা ফোটো কপি আনিয়ে দাও। আর কিছু তামাকও কিনে আনো কোনো দোকান থেকে।"

গৌতম অবাক হয়ে বলল, "কিন্তু আপনি তো ধূমপান করেন না। চিরদিনই এর বিরুদ্ধে।"

ডক্টর সোম মৃদু হেসে বললেন, "তা হোক। একবারই খাব। তবে সেটা দা-কাটা তামাক হওয়া চাই। অবাক হচ্ছ? আমার ভাইপোর আলমারি থেকে একটা পুরনো বাংলা বই বের করে পড়ছিলাম আজ। মন ভালো না থাকলে আমি বিজ্ঞান ছাড়া অন্য বই মাঝে মাঝে পড়ি। এই বইটা পড়তে পড়তে আমি যেন কোথায় ভেসে গেলাম। যেখানে শক্তি, ভর, গতি–সব যেন বুকের অণু-পরমাণুতে ধাক্কা দিতে লাগল। পড়ছিলাম–'রাত্রে নদীতে যাওয়া, ছোট্ট হাঁড়িতে মাছের ঝোল ভাত রাঁধিয়া খাওয়া, হয়তো মাঝে মাঝে তাদের সেই মহাভারতখানা কি বাবার সেই দাশু রায়ের পাঁচালীখানা মাটির প্রদীপের সামনে খুলিয়া বসিয়া বসিয়া পড়া! বাহিরে অন্ধকারে বর্ষারাতে টিপটিপ বৃষ্টি পড়িতেছে, কেহ কোথাও নাই, পিছনের ডোবায় ব্যাঙ ডাকিতেছে–কি সুন্দর'!"

সাত্যকি সোম আনন্দে হেসে উঠে বললেন, "আমিও যেতে চাই সেখানে, যেখানে ওরকম ব্যাঙ-ডাকা বর্ষা আছে। সঙ্গে থাকবে ঐ পাঁচালি আর তামাক। অবাক হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে না থেকে খুলে দাও জানলাটা। ভয় নেই, আমাকে হাসতে দেখে মনে করো না যে সেই পাগল রাজার দলে যোগ দিয়েছি। সাত্যকি সোম বিক্রমাদিত্যই আছে–থাকবে।"

গৌতম উঠে জানলা খুলে দিতেই ঘরের মধ্যে আছড়ে পড়ল ঝলমলে কৃত্রিম জ্যোৎস্নার আলো। সেই আলোর আঘাতে যেন আহত হয়ে বৃদ্ধ বিজ্ঞানী অস্ফুট আর্তনাদ করে গৌতমের বাহুমূল চেপে ধরলেন।

ছবি: বিজন কর্মকার

# নাই-তো-মামার বাড়ি

রঞ্জন ভাদুড়ী

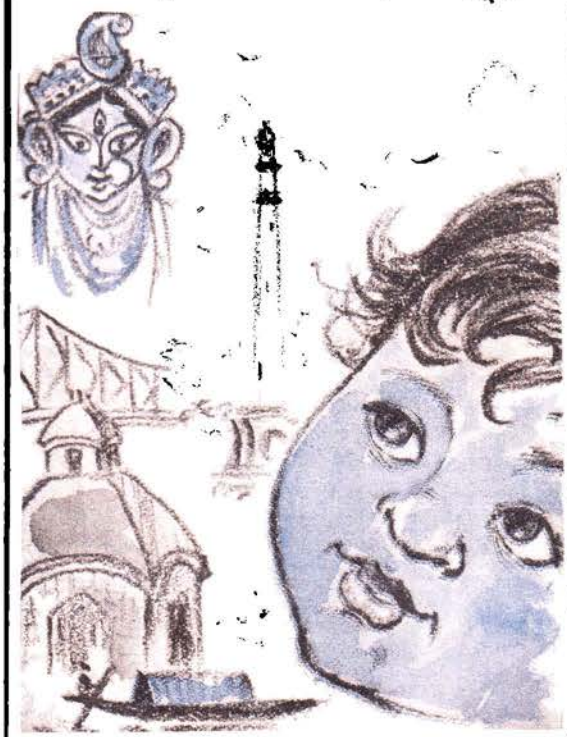

বুচকু যাবে মামার বাড়ি সঙ্গে যাবে কে
মুখিয়ে ছিল মা-জননী, তল্পি বেঁধেছে।
নেই মামা সেই মামার বাড়ি আছে একটি মাসি
শুধুই লেখে, 'বুচকু তোমায় বড্ড ভালবাসি!
এবার পুজোয় থাকবে তুমি এই-আমাদের কাছে
তোমার জন্যে ফুল ফোটাব টবের ছোট্ট গাছে।
তোমার সঙ্গে ভাব জমাবে শালিক-চড়াই পাখি
ময়না-টিয়াও কইবে কথা খাঁচায় যদি রাখি।
(কিন্তু খাঁচায় কথক-পাখি আকাশ কোথায় পাবে!
দরজা খুলে দিলে আবার ফুড়ুত হয়ে যাবে।)
গোলপানা চাঁদ মুখ বাড়াবে পুব-জানালা দিয়ে
ভোরের বাতাস খেলবে তোমার ফুরফুরে চুল নিয়ে।'
তাই তো এল বুচকু প্রথম নাই-তো-মামার বাড়ি
খানিকটা পথ বাস-মোটরে, তারপরে রেলগাড়ি।
বুচকু গেল বেড়ু করতে মামার বাড়ি এসে
কলকাতাতে ঘুরল অনেক, দেখল কেঁদে-হেসে
কত্তোখানি চওড়া সে, আর কত্তোখানি লম্বা,
কোথায় কোথায় পা রেখেছেন দুর্গা-জগদম্বা!

ছবি: রাহুল মজুমদার

# কুশলদার কৌশল

লীলা মজুমদার

এক

ঠাণ্ডা মাথায় সব কথা মনে করার চেষ্টা করতে লাগলেন কুশল বাঁড়ুজ্জে। কে না জানে বি-বা-দি-বাগের সব আপিস প্রায় একসঙ্গে ছুটি হয়? তারপর কোনো ট্র্যামে-বাসে ওঠাই দায়। অনেকবার অনেক চেষ্টাও করেছেন এবং অনেক লোকসানও দিয়েছেন। বুশ শার্ট ছিঁড়েছে; প্যান্টের পকেট উপে গেছে; হাতঘড়ি খোয়া গেছে; বুক-পকেট কাটা গেছে; নতুন স্যাণ্ডালের স্ট্র্যাপ গেছে— যে স্যাণ্ডাল নাকি আজীবনের সঙ্গী হবার জন্য তৈরি বলে বিজ্ঞাপন দেয় এবং যার দাম পাক্কা ৯০টি টাকার চাইতে এক পয়সাও কম নয়!

হুঁঃ! পয়সা! আজকাল কেউ একটা পয়সা কখনো চোখে দেখতে পায়? সেকালের কড়ির মতো ওটাও একটা হিসাবের ফ্যাচাং ছাড়া কিছুই নয়। সে যাই হোক; এতটা না হলেও হামেশাই ট্র্যামে-বাসে কুশল লোকসান দিয়ে থাকেন। তার জন্যে বাড়ির লোকেদের এতটুকু সমবেদনাও পান না। কেউ বলেছে ক্যাবলা, কেউ বলেছে আনাড়ি। এমন কি তাঁর গিন্নি মলিনারও কোনো সহানুভূতি নেই। সকলের সামনে নাক সিঁটকে বললেন—'এমন ন্যালাখ্যাপা মানুষ সংসার পাতে কেন তা বুঝিনা!'

হঠাৎ কানের কাছে একটা হৃদয়-বিদারক ফোঁস শব্দ শুনে, চমকে ফিরে দেখেন তিনি আর একা নেই! কখন যেন একদঙ্গল লোক এসে তাঁকে ঘিরে বসেছে, তিনি টেরই পাননি।

বসুক গে, থাক গে। এ জায়গাটা কিছু তাঁর কেনা নয়! তিনি বেপরোয়া, নির্ভয়! পকেটে মাসকাবারি টিকিট পর্যন্ত নেই। বার আষ্টেক সেটি খোয়া যাবার পর, তার মায়া ছেড়ে, প্যান্টের পকেটে কয়েকটা খুচরো পয়সা ছাড়া প্রায় কিচ্ছু রাখেন না। রুমালটাও এমন জঘন্য নোংরা যে, যে কোনো ভদ্র পকেটমার সেটা

ছুঁলে হাত ধোবে!

তবে হঠাৎ মালুম হলো যে চারদিকটা অসম্ভব নির্জন। কেমন যেন স্যাঁৎসেঁতে থমথমে। আগে তো এটা খেয়াল করেননি। এই প্যাণ্ডেলের মতো জায়গাটা নাকি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তৈরি। হয়তো ঢুলুনি এসেছিল। তাই ওরকম মনে হচ্ছিল। এখন চারদিকে চেয়ে দেখেন সব ভোঁভা। স্থান-মাহাত্ম্য বোধহয়। এইখানে নির্জনে রাতটা কাটিয়ে দিলেও হয়। এভাবে খালি ট্যাঁকে বাড়ি ফেরার মতো মনের জোর তাঁর যে নেই, এটা ঠিক। কিন্তু খিদে বড় জ্বালা। কাছেই একটা টিপকল আছে। বার তিনেক জল খেয়ে শরীরের জ্বলুনি কমলেও, মনের আর পেটের জ্বলুনি যায়নি। তার উপর কোথা থেকে ভাজা ভুজির সুগন্ধ আসছিল।

গঙ্গার ধারের বড় রাস্তায় ঠেলা গাড়িতে কাচের শো-কেসে গরম গরম চপ কাটলেট পেঁয়াজি আলু বড়া বিক্রি হচ্ছে। নীল জীন্‌স্ আর গলাবন্ধ নকল চামড়ার জামা পরে একসঙ্গে শীত-ঠেকন আর রূপ-বর্ধন করছে দুটো বেপরোয়া ছেলে।

হাজার হোক মানুষ তো, কুশলদা শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে, প্যান্টের কোমরের ভেতর দিকের গুহ্য পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করে, মত বদলাবার আগে তাড়াতাড়ি হেঁটে তাদের কাছে গিয়ে, লম্বা ছেলেটাকে বললেন, 'এই দিয়ে বাবা, তোমাদের সব চাইতে সস্তা আইটেম যত বেশি হয় আমাকে দিতে পারবে?'

তারা অবাক হয়ে তাঁর সম্ভ্রান্ত চেহারার দিকে চেয়ে বলল, 'ভালো চিকেন কাটলেট ছিল, স্যার—পকেটমার হয়েছে বুঝি? তা ফাউন্টেন পেন কি হাতঘড়ি জমা রেখে ভালো জিনিস নিয়ে যান না কেন? কাল-পরশু খালাস করে নিয়ে যাবেন। আমরা রোজ এই সময় এখানে থাকি।'

তাদের হালচাল দেখে অবাক হয়ে কুশলদা বললেন, 'কিছু নেই আমার। বাড়িতেও ঠাঁই নেই। ঐ পাঁচ টাকায় যা হয় দিও।' ওরা নিজেদের মধ্যে একটু আলোচনা করে বড় একটা ঠোঙায় করে পেঁয়াজি, ফুলুরি, শুকনো খোলায় পাঁচমিশেলি ভাজা, লেবুর কুচি ইত্যাদি কুশলদার হাতে ধরিয়ে দিল। বলল, 'টিপকলের জলটা ভালো। ঐটে খাবেন। আমরাও খাই।'

কুশলদা বললেন, 'তোমরা কি সারাদিন এখানে থাক?' ওরা হাসল, 'না, স্যার। এতকাল সারাদিন চাকরি খুঁজে বেড়াতাম আর সন্ধ্যেবেলায় এখানে বেঞ্চিতে বসে হা-হুতাশ করতাম। একজন পান-বিড়িওয়ালা ঠেলাগাড়ির বুদ্ধিটে দিল। রাতে বাড়ি যেতাম। সেখানে খুব একটা আদর ছিল না আমাদের। এখন সব বদলে গেছে। আমরা বি-বা-দি বাগে একটা ছোট খাবারের দোকান করেছি, সঙ্গে একটা

নস্যি গ্রহণ করে প্রমাণ করুন যে আমাকে মাপ করেছেন।

ঘরও পেয়েছি। ভালো পার্টনার পেলে এক্সপ্যাণ্ড করি।'

ওদের কথা শুনে কুশলদা আহ্লাদে আটখানা। ওরা এতদূর বলল যে টাকা খাটাতে না পারলেও ওদের কর্মী দরকার হবে। ইঙ্গিতটা বুঝে কুশলদা হেসে কথা দিলেন যে নিশ্চয় ভেবে দেখবেন যদি কাউকে পাওয়া যায়।

বললেই শোবার জায়গা পাওয়া যেত। তাই যদি বল তাহলে তো বাড়ি গিয়ে নাকে খৎ দিলেও পাওয়া যেত। তিনি অন্য ধাতু দিয়ে গড়া। কেন, বড় রাস্তার ধারে ঐ যে বড় বড় জলের না কিসের পাইপ দু-তিন বছর ধরে পড়ে আছে, ওর মধ্যেও তো কত লোকে ঘরকন্না করে। পাইপের মুখে চট ঝুলিয়ে আব্রু রক্ষা করে। পাইপের ওপর চড়ে বসে সন্ধ্যার আগে নদীর হাওয়া খায়। পয়সা দিলে ওরাও হয়তো পাইপের আধখানা ছেড়ে দেয়। কুশলদা কিন্তু নিজের দুরবস্থার ব্যাখ্যানা করে কারো সহানুভূতি কুড়োতে চান না। তাছাড়া পাইপে বোঁটকা গন্ধ।

তার চাইতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ভূতুড়ে ইমারতখানা ঢের ভালো। হোক ভূতুড়ে; তিনি মাইণ্ড করেন না। 'তাঁরা' আপত্তি করলে না হয় চলে যাবেন।

মাল বোঝাই নৌকোর মালিকরা আইনতঃ কিংবা বে-আইনীভাবে কাচাকোচা সেকণ্ড হ্যাণ্ড বড় বড় চটের থলে, বিক্রি করে, সস্তা দরে। ফেরত দিলে অর্ধেক দাম ফিরিয়ে দেয়। এখানে সব নগদের ব্যবসা। কেউ কাউকে ঠকায় না। কেন ঠকাবে? কুকুর কুকুর খায় না। বড়জোর কামড়া-কামড়ি করে। তাও করবে না? কুশলদার অন্নে পালিত বাড়ির লোকরাই বা কিরকম মিষ্টি ব্যবহার করে?

## দুই

কুশলদার একটা গোপন ব্যবসা ছিল। তিনি বেনামায় রোমাঞ্চকর ও ভূতের গল্প লিখতেন। সে সব গল্পের ভারি কাটতি ছিল। অনেক সময় নির্জন রাতে নিজের লেখা গল্পের কথা মনে করে নিজেই আঁতকে উঠতেন। গায়ের লোম খাড়া হতো, জিব-তালু জড়িয়ে যেত। সে-ই হলো গল্পের সাফল্যের সবচাইতে ভালো পরীক্ষা। কোনো এক বৈজ্ঞানিকের কথা শুনেছিলাম, তিনি নিজের আবিষ্কৃত ওষুধ নিজের ওপর পরীক্ষা করতে গিয়ে আরেকটু হলেই পৈত্রিক প্রাণটি বিসর্জন দিতেন! ভাগ্যিস তাঁর পরম শত্রু আরেক বৈজ্ঞানিক তার আবিষ্কৃত ওষুধ ইন্‌জেকশন দিতেই, তিনি চোখ মেলে চেয়ে বললেন—'আমি কোথায়?'

শত্রু 'দুত্তেরি ছাই!' বলে দু-হাত সরে গেছিল। বোধহয় তার অন্য উদ্দেশ্য ছিল। যাই হোক, ঐ ওষুধের জন্য সে খেতাব পেয়েছিল, অনেক টাকা পুরস্কারও পেয়েছিল।

কুশলদার মুখেই হয়তো ওটি শুনেছিলাম। তিনি খোশগল্পের রাজা ছিলেন। আজ কিন্তু ঐ নির্জন, প্রাচীন ছাউনির তলায় সর্বাঙ্গে চট ছড়িয়ে বসে তাঁর মনে হলো প্রাণের মধ্যে গল্পের উৎস একেবারে শুকিয়ে গেছে। এ জন্মে আর তাঁর মনে গল্প গজাবে না।—'কে?'

চমকে উঠলেন কুশলদা। এবার আর কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর অন্যমনস্কতার সুবিধে নিয়ে একদঙ্গল লোক তাঁকে ঘিরে বসেছে! জনা সাতেক তো হবেই। তবে তাদের দেখে খুব একটা দুষ্কৃতকারী বলে মালুম দিল না। কেমন একটা সৎ-সৎ ভাব। কুশলদা একটুও অবাক হলেন না। এই ঐতিহাসিক জায়গার নিজস্ব একটা গোপ্পে মেজাজ আছে। বিশেষ করে সেই যে ফরসা, ছোকরা পানওয়ালাটির সাজা স্বর্গীয় আস্বাদের দুটি মিঠে পান একসঙ্গে মুখে দিলে। গত দশ দিন ধরে তাই করেছেন কুশলদা এবং কম করে পাঁচটা আনকোরা নতুন প্লট মগজে গজিয়েছিল। পরদিন সকালে মনে থাকতে থাকতে পকেটের খুদে নোটবইতে টুকেও রেখেছেন। তবু বাড়ির লোকরা তাঁকে ন্যালাখ্যাপা বলে! যাকগে, ওসব ভেবে মন খারাপ করার কোনো মানে হয় না। বিশেষ করে যখন বটু ছোকরার স্বর্গীয় পান কটা পয়সা ফেললেই হাতের মুঠোতে এসে যায়।

শুধু তাই নয়, মনটা অসম্ভব ভালো হয়ে যায়, চিত্তে জোর পান। আজও একটু আগে দুটো বড় পান খেয়েছেন। কেমন একটা সাহস, একটা বেপরোয়া ভাব মনে টগবগ করে ফুটছে। এইরকম মেজাজেই জোরালো গল্প তৈরি হয়। অগামারা মিনমিনে গল্প কুশলকুমারের হাত দিয়ে বেরোয় না।

কি? ও হ্যাঁ, অন্যমনস্ক হলে তো চলবে না। কাল থেকে কি সত্যি করে ঠেলাগাড়ির মালিক ঐ ছোকরার আস্তানায় রাত কাটাবেন? বেশ হবে। আপিসে অনেক ছুটি পাওনা। মাইনে কাটলে মামলা করবেন! এ্যাঁ? কেউ কিছু বলল। ইমারতে কি সত্যি অন্য লোক ভিড় করেছে? ওরা তাঁর মনগড়া চরিত্র নয়? কি জ্বালা! গল্প পাকাতে হলে যে নৈঃসঙ্গ দরকার, সে কি তাঁর ভাগ্যে নেই?

কুশলদা পাশের মানুষটির দিকে সরাসরি তাকিয়ে চমকে গেলেন। আহা, বনেদী বিদেশী লোকটি, ইরাণী-তুরাণী হবেও বা। কায়দাদুরস্ত, ভদ্র, সম্ভ্রান্ত। জাব্বাজোব্বা পরনে, পায়ে নাগরা। লজ্জা পেয়ে নমস্কার করে বললেন, 'মাপ কিজিয়ে, আমি অন্য কথা ভাবছিলাম। তাছাড়া আমি খেতে পারতা, যেতে পারতা বলে কাজ চালালেও, আপনার সঙ্গে উর্দু-ফার্সি বলতে গেলে বেকুব বনে যাব।'

লোকটি নমস্কার করে চমৎকার বাংলায় বললেন, 'তাতে কি হয়েছে? আমিও তো অনুমতি না নিয়ে পাশে ঘেঁষে বসেছি। আমাকে হাফেজ বলে ডাকবেন। আমি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ফার্সি আর সংস্কৃত দুই-ই পড়াই। পালি ভাষা নিয়ে গবেষণা করি।'

এই বলে জোব্বার মধ্যে থেকে ছোট্ট একটি সোনার কৌটো বের করে বললেন, 'আমার নিজের হাতে মেশানো একটু নস্যি গ্রহণ করে প্রমাণ করুন যে আমাকে মাপ করেছেন।'

লজ্জা পেয়ে কুশলদা 'না' বলতে পারলেন না। অনভ্যস্ত হাতে এক চিমটি শুঁকে হেঁচে-কেঁদে একাকার করলেন। হাফেজ বললেন, 'অভ্যাস নেই দেখছি। হাতের ওপর এক চিমটি নস্যি নিয়ে আলগোছে শুঁকলে স্বর্গসুখ পেতেন। জিনিসে কিছু থাকে না, প্রয়োগই সব।'

কুশলদা মাথা নিচু করে বললেন, 'যা বলেছেন।' এমন সুন্দর অথচ এত সেকেলি হালচাল নিয়ে লোকটি আজকালকার এই বৈষয়িক জগতে বেঁচে আছেন কি করে তা ভেবেই পেলেন না।

হাফেজ বললেন, 'কিছু মনে করবেন না, কিন্তু আপনার মতো একজন শিক্ষিত ও পদস্থ ভদ্রলোক এমন অসময়ে চট গায়ে দিয়ে এই আঘাটায় পড়ে আছেন কেন, জানতে পারি কি?'

গায়ে পড়ে আলাপ-করা অচেনা অজানা চরিত্রদের কাছে মনের কথা প্রাণের কথা ঢেলে বলা কুশলদার স্বভাববিরুদ্ধ। তবু কে জানে কেন ঐ জায়গার গুণে কিংবা সহ্য করার সীমানা ছাড়িয়ে গেছিলেন বলেই কিনা বলা যায় না, তাঁর দিকে উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে থাকা ঐ সাতটা সাত রকমের অজ্ঞাতকুলশীলের কাছে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সমস্ত মনের কথা প্রাণের কথা কুশলদা ঢেলে বলে ফেললেন!

দু-একটা বিষয় ছাড়া প্রায় কিছুই গোপন রাখলেন না। আপিসের কথা, বাড়ির কথা, নিজের গল্প লেখার কথা, ন্যালাখ্যাপা স্বভাবের কথা, সব ঢালাও করে ঐ অচেনা লোকদের কাছে নিবেদন করে দিলেন! এতটুকু অপ্রস্তুত বোধ করলেন না। এঁরাই যেন ওঁর কত দিনকার প্রাণের সখা! ওঁর সব দুঃখের ভাগীদার!

হাফেজ বললেন, 'ভাইয়া, সবই তো বুঝলাম। কিন্তু আপনার বাড়ির লোকদের দিক থেকেও কিছুটা বলবার আছে বলে মনে হয়।'

কাষ্ঠ হেসে কুশলদা বললেন, 'তা তো আছেই। এবং আমার ভালো করেই সেটা জানা আছে। অষ্টপ্রহর কানের কাছে তার ব্যাখ্যানা শুনে শুনে, প্রতিজ্ঞা করেছি, আর নয়। আমি গত দশ বছরে হয়তো শ দেড়েক গল্প লিখেছি। প্রত্যেকটা গল্পে কম করেও দশ-বারোটা আলাদা রকমের চরিত্র আছে। তবু আমি অকপট চিত্তে বলতে পারি, তাদের একজনও এনাদের মতো হৃদয়হীন স্বার্থপর পাষণ্ড নয়। আমার হাতে গড়া তারা; কোনো দুজন একরকম নয়। তবু জোর গলায় বলব, তারা কেউ আমাদের নয়াপাড়ার ঘোষাল বাড়ির লোকদের মতো হৃদয়হীন নয়।'

হাফেজ এইখানে ফিক্ করে হেসে, বাধা দিয়ে বললেন, 'রোখ্‌খে দোস্ত, রোখ্‌খে! দুনিয়াতে আরো অনেক দুঃখী লোক আছে। এমন কি তোমার চাইতেও হয়তো বেশি দুঃখী। তবে মাথার ওপরে একজন মালিকও আছেন, সেটা ভুলো না। আমার এই সাতজন বন্ধুর জীবনকাহিনী মন দিয়ে শুনে, তারপর খোদাকে বিচার করতে বস।

ঐঁদের নাম হলো সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি আর রবি। তুমি গল্পের রসিক, ঐঁদের গল্প শুনলে তোমার লাভ বই ক্ষতি হবে না। তবে মেলা প্রশ্ন দিয়ে ঐঁদের জ্বালিও না। ঐঁরা যা কিছু বলবেন তার সবই ঘটে গেছে। তোমার গল্পের মতো পরে এখানে ওখানে দুটো একটা বাড়তি চরিত্র বা ঘটনা ঢুকিয়ে বা বদলে দেবার উপায় নেই। ধৈর্য ধরে আগাগোড়া শুনো। তাতে তোমার লাভ বই ক্ষতি হবে না। কৌতূহল হলেও প্রশ্ন কর না। যা চুকে বুকে সারা, তাকে ঘাঁটিয়ে কোনো লাভ নেই।'

কুশলদা বললেন, 'বেশ, আমি রাজী। তার আগে আমার পুঁজি থেকে আমি একটা স্পেশ্যাল মিঠে পান খেলে তো আপনাদের কোনো আপত্তি নেই?'

হাফেজ হেসে মত দিলেন।

## তিন

### সোমের কথা

সোম মানুষটাকে বাঙালী মনে হলো। রোগা, মাথায় বেশ লম্বা; গায়ের রং মাঝারি; চুলে ঢেউ খেলানো এবং একটু লম্বা; বয়স মনে হলো পঞ্চাশের কোঠায়; একটু যেন কম কথা বলে; লাজুক, নম্র, ভদ্র। কুশলদার অনেক গল্পে এই ধরনের চরিত্রের আবির্ভাব হয়েছে। হয়তো সেই জন্যেই প্রথম দেখাতে কেমন চেনা-চেনা মনে হলো। ওর পরনে মুগার পাঞ্জাবি, তার বাঁ দিকে সোনার বোতাম লাগানো। বোতামের ওপরকার নীল নক্সাটাও যেন আগে দেখা। বাদামী শালের পাড়ও চেনা।

হাসি পেল কুশলদার। এ রকম তাঁর জীবনে আরো ঘটেছে। নতুন জায়গায় গেছেন, নতুন মানুষদের সঙ্গে আলাপ হবামাত্র মনে হয়েছে এখানে আগেও কখনো এসেছেন, এ মুখ তাঁর খুব চেনা। সব কেমন গুলিয়ে যায়। যা পার্থিব আর যা অপার্থিব, সব মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়।

হঠাৎ খেয়াল হলো সোম হাতজোড় করে তাঁকে নমস্কার করে বলছে, 'কিছু বলবেন, দাদা?'

কুশলদা হাসলেন; বললেন, 'বলবে তো তুমি, ভাই। আমি শুনব। কিন্তু তোমাকে কি আগে কোথাও দেখেছি? কেমন চেনা-চেনা লাগছে।'

সোম চোখ তুলে তাকাল, বড় বড় ভাসা ভাসা চোখ, কৌতুকে ঝলমল করছে। বলল, 'তাই নাকি? নতুন জায়গায় গিয়ে মনে হয় এখানে আগেও এসেছি, অনেক দিন থেকেছি, এখানকার মানুষজনরা আমার আপনজন। আপনার আর আমার মাঝখানে দুস্তর পারাবার। তবু আমি আপনার নিজের লোক। অনুমতি করেন তো আমার জীবনের একটা ঘটনার কথা বলতে পারি।'

কুশলদা বললেন, 'বল।'

সোম বলল, 'আমি এখানকার লোক নই, দাদা। এখানকার হালচাল, ভাষা, খাওয়া-দাওয়া, নিয়মকানুন রপ্ত করতে আমাকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। আপনি হয়তো বলবেন, তাই যদি হয় তবে আমি এলাম কেন! এসেছি কি সাধে? কালের ফেরে পড়ে এসেছি। আর ফিরে যাবার পথ খুঁজে পাচ্ছি না।

আপনার অবস্থা যদ্দূর বুঝলাম, ঠিক তার উল্টো। সংসার আপনাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। আপনি নিজের তৈরি ফাঁদে পড়েছেন। এখন তার মধ্যে থেকে বেরুবার জন্য হাঁসফাঁস করছেন। কিছু মনে করবেন না, কিন্তু তাই দেখে আমার হাসি পায়। আছি আমরা একটুকু খুদে একটা গ্রহে। মহাকাশের মানচিত্রে একটা কালো ফুটকি হবারও যোগ্যতা তার আছে কিনা সন্দেহ।

সেই খুদে ফুটকির গায়ে সবচাইতে বিত্তহীন একটি দেশের একটা হত-সমৃদ্ধি পুরনো নোংরা শহরের কিনারায় একটা নগণ্য পাড়ায় নিজেদের দুর্বলতার ফল ভোগ করে ভাবছি বিধাতার কি অবিচার! সাধে কি বিধাতা অদৃশ্য হয়ে থাকেন! আমরা হলেও থাকতাম, ঘটে যদি অতটা বুদ্ধি থাকত।

আমার কপালে যা ঘটে গেছে, তার জন্য আমি নিজেকে ছাড়া কাউকে দোষ দিই না। আমার মুখ দেখে আপনি যাই মনে করে থাকুন না কেন, লোক আমি ভালো ছিলাম না। এ মুখই ছিল আমার মূলধন এবং আমার সর্বনাশের কারণ। আপনার মতো আমিও আপিসে চাকরি করতাম। তবে অতটা চাক্ষুষ এবং প্রকটভাবে নয়। আপিসের সহকর্মীরা পর্যন্ত আমাকে চিনত না। একরকম গুপ্ত গোয়েন্দাও বলতে পারেন আমাকে। আমার ডিউটি বিশেষ বিশেষ লোকের পিছু নিয়ে, তাদের সঙ্গে ভাব করে, তাদের মনের হাঁড়ির

তলা হাতড়ে গোপনতম কথা জেনে নিয়ে, স্যারের কাছে পাচার করে দেওয়া। তার জন্য মোটা পারিতোষিক পাওয়া যেত। তবে হ্যাঙ্গামোয় জড়িয়ে পড়লে আপিস আমাকে সাহায্য তো করবেই না, এমন কি ওঁদের কর্মী বলে স্বীকৃতিও দেবে না, সাহায্যও করবে না। এই সর্তেই ঐ পদে বহাল হয়েছিলাম। বাড়ির লোকে জানত আমি একটা সরকারি ট্রেনিং কলেজে পড়াই। পাড়ার লোকে স্যার বলে সম্বোধন করে; ভারি মান্য করে। মাঝে মাঝে পরীক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর শুধোতে আসে। আমি প্রশ্নোত্তরের বই ধরিয়ে দিই।

এইভাবে একটা মিথ্যা ভদ্রতার আড়ালে আমি গা-ঢাকা দিয়ে থাকতাম। আর আমার ব্যাংকের তহবিলে মোটা অঙ্ক জমত। তার জন্য আমার বিন্দুমাত্র বিবেক দংশন করত না। ওগুলো পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা তো আর ছিল না। প্রাণ-মান তুচ্ছ করে রোজগার করা। সর্বদাই মানসিক অশান্তিতে ভুগতাম। বিবেক দংশন করত বলে নয়। এই বুঝি ধরা পড়ে গেলাম, এই দুশ্চিন্তায়।

এইভাবে দিন কাটত। আমার চক্রান্তে কত লোক যে ফেরারি হলো, কত লোক যে নিখোঁজ হলো, কত লোক যে জানাজানির ভয়ে গলায় দড়ি দিল, তার গোনাগুন্তি নেই।—কি হলো? মুখ দেখে মনে হচ্ছে আপনারও যেন দুশ্চিন্তার অভাব নেই। বলেই ফেলুন না, মনটা হালকা হয়ে যাবে। এবং পকেটটা সম্ভবতঃ ভারি হয়ে উঠবে—'

এই অবধি শুনে কুশলদা হঠাৎ বেদম রেগে উঠে, যা তিনি কখনো করেন না তাই করে বসলেন। উঠে দাঁড়িয়ে কর্কশ গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'দূর হ'! দূর হ', পাপিষ্ঠ কোথাকার! তোর প্রলোভনের মুখে আমি ঝাড়ু মারি।'

সঙ্গে সঙ্গে সোমের মুখটা কেমন বদলে যেতে লাগল। সেই ধূর্ত ভাবটা বদলে যেতে লাগল। যেন সূর্যের সামনে থেকে একটা কালো মেঘ সরে গেল। সে আশীর্বাদের ভঙ্গীতে দু-হাত তুলে ধরে, নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর কুশলদার মনে হলো তাঁর বলিষ্ঠ পা দুখানি বুঝি ময়দার তৈরি। তিনি উদ্‌ভ্রান্তের মতো ইদিক-উদিক চেয়ে দেখলেন কেউ কোত্থাও নেই। প্রাচীন ইমারতের শান-বাঁধানো আসনে তিনি একা চট জড়িয়ে পড়ে আছেন। সব কল্পনা, সব স্বপ্ন। তারপর আর কিছু মনে নেই।

ঘুম ভাঙল সেই ভোরে। মুখটা বিস্বাদ, গা ম্যাজম্যাজ করছে। চট গায়ে দিয়ে কি ঐ গঙ্গার ধারের শীত ঠেকানো সম্ভব? রাস্তার কিনারায় কল ঘরের কাজ সেরে, কুশলদা দেখেন ঠেলাগাড়ির চুল্লি থেকে ধোঁয়া উঠছে। চা হচ্ছে, ডিম দিয়ে রুটি ভাজার গন্ধ বেরুচ্ছে! কুশলদা হাতে চাঁদ পেলেন।

তাঁকে দেখেই মন্টু-বলাই কোথা থেকে একটা খুদে ফোল্ডিং টুল পেতে দিয়ে বলল, 'আসুন, বসুন, চা ইচ্ছা করুন, রুটি ভাজা খান।'

কুশলদা আহ্লাদে গলে গিয়ে পকেট থাবড়াচ্ছেন দেখে, বলাই বলল, 'দাদা, ও সব থাক। আপনি আমাদের রেস্তোরাঁর দেনা-পাওনার হিসাব রাখার কাজে বহাল না হলে, ব্যবসায় লালবাতি জ্বলবে। বিশ্বাস করুন আমাদের কেউ যোগ-বিয়োগ পর্যন্ত সঠিকভাবে করতে পারি না। একফালি শোবার জায়গা আছে; খুদে চানের ঘরে অষ্টপ্রহর গরম জলের ঝরণা-কল আছে।'

কুশলদা হাত তুলে বললেন, 'আর বলতে হবে না। আমি সারাদিন খেটে দেব। রাতে থাকব না। পর-ভাতি হলে দোষ নেই, পর-ঘরি কদাচ নয়।'

একবার রাতের আস্তানা থেকে ঘুরে এলেন কুশলদা। নটে-পানওয়ালা একগাল হেসে কুড়িটা সুগন্ধী পান গছিয়ে দিয়ে গেল। কুশলদাকে চট দুটি গুছিয়ে বগলদাবাই করতে দেখে বলল, 'রাতের জন্য ভিন্ন আস্তানা দেখছেন বুঝি? সেই ভালো। আমিও ও বেলা আসব না, দাদা। শুনলাম সরকারি টিকটিকিরা নাকি হামলা দেবে। ওনাদের কথা শুনে গা জ্বালা করে। এত জায়গা থাকতে এখানে পান বিক্রি কেন? লাইছেন নিয়েছ? ঘরের ঠিকানা কি? আরে বাপু, চুরি করিনি, খুন-রাহাজানি করিনি, পুলিসের খাতায় নাম ওঠেনি। তাহলে অত আমার ব্যাপারে নাক গলানো কেন? তা মশায়ের কোথায় যাওয়া হবে?'

কুশলদা হঠাৎ সাবধান হয়ে গেলেন। সংক্ষেপে বললেন, 'দেখি, যা হয় একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।' বলা যায় না কিছুই, ও নিজেই হয়তো সরকারি চর। পান বেচে আর খবর পাচার করে। তাহোকগে,তবু মুখখানি এতই ইংরিজিতে যাকে বলে ফ্রেন্ড্‌লি যে-সব ক্ষমা করা যায়।

শেষ পর্যন্ত সারাদিন ধরে বি-বা-দি বাগে মন্টু-বলাইয়ের কাগজের কুচিতে লেখা হিসাবের জট ছাড়িয়ে পরিপাটি করে নতুন কেনা খাতায় সব তোলা হলো। গরম জলে স্নান; গরম মুরগির ঝোল-ভাত; রেলের বাংকের মতো খাটে শুয়ে ঘুম; বিকেলে আরো হিসাবপত্র ঘেঁটে, ভারি একটা সুখ-শান্তির ভাব মনটাকে পেয়ে বসল। মন্টু-বলাইকে বাড়িতে রাত কাটাতেই হতো। বুড়ো বাপ-মা আছেন। কাজেই দোকানে একটা খাটিয়া পেতে মতি ছোকরা আর বাংকে কুশলদা আরামে রাত কাটালেন।

## চার

কুশলদার মনে কেমন একটা সন্দেহ জেগেছিল। বিশেষ করে সেই কারণেই আগের রাতে আর সেই প্রাচীন আস্তানায় যাননি। তিনি ফেরারি হলে বাড়ির লোকদের যত না সুবিধা, তার পাঁচগুণো বেশি অসুবিধা হবে। তা ছাড়া অচেনা অনাত্মীয় নিখোঁজ হয়ে গেলেও তো পাড়ার ছেলেরা তাকে গোরু-খোঁজা করে ছাড়ে। কাজেই দলেবলে তাঁকে খুঁজতে আসা বিচিত্র নয়। হয়তো পুলিস-কনস্টেবলরাও আসতে পারে। এর মধ্যে একটা মজার কথা আছে যা কাউকে বলা যায় না। পরদিন ছেলেগুলোর আপিসঘরে বসে গত তিন মাসের হিসাবপত্র যথাযোগ্যভাবে লিখে, কষে, একেবারে আপ-টু-ডেট করে ফেললেন যখন, তার অনেক আগে সূর্য ডুবে গেছিল। ঐসব পাড়া সুনসান্ হয়ে গেছিল। নিজেদের ক্যাবিনের নরম গরম মোটা হাতরুটি আর কিমা দিয়ে স্বর্গীয় ছোলার ডালের কারি এবং এক খুরি চিনিপাতা দই খেয়ে, মতি ছোকরাকে বললেন, 'আমি একটু ঘুরে আসছি, ভাই, ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে এসে তোমাকে নাম ধরে ডাকলে তবে দরজা খুলো।'

এই বলে সঙ্গে তাঁর চিরসাথী বেঁটে ছাতা নিয়ে বেরিয়ে একবার তাঁর গঙ্গার ধারের পুরনো আস্তানায় হাজির হলেন। বলেছিই তো, জায়গাটার কিঞ্চিৎ দুর্নাম থাকাতে, রাত নয়টার পর চোর-ছ্যাঁচড়রাও এড়িয়ে চলে। একমাত্র নদীর ধারে মাঝিদের গলা শোনা যায়।

কুশলদা চাতালে গিয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে ছোকরা পানওয়ালা একগাল হেসে উদয় হলো, 'এত রাতে এলেন, আপনার তো খুব সাহস দেখছি। এই পান কটা নিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। মালিক বলেছেন এগুলি সেরা পান। আপনি যেখানেই থাকুন ঢুঁড়ে বের করে গছিয়ে দিতে। পাঁচ টাকা দেবেন স্যার, পাঁচটা বাদশাহী পান।"

কুশলদা হেসে পকেট থেকে টাকা বের করে দিয়ে, একটা পান মুখে দিলেন। ছেলেটা হঠাৎ তাঁর পায়ে পড়ে বলল, 'স্যার, আপনি দেবতার মতো মানুষ। এসব অভ্যাস করবেন না।' এই বলে এক নিমেষে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। কুশলদা তো হাঁ। এ আবার কি রহস্য? একটু যেন আলোর রেখাও দেখতে পেলেন।

কেমন যেন মাথায় চক্কর দিচ্ছিল। হাতড়ে হাতড়ে কুশলদা সেই বাঁধানো জায়গাতে বসে পড়লেন এবং সঙ্গে সঙ্গে টের পেলেন তিনি একা নেই। একজন মোটা বেঁটে লোকও বসে বসে বিড়ি ফুঁকছে। ওঁকে দেখেই বিড়ি ফেলে দিয়ে, পা দিয়ে মাড়িয়ে নিবিয়ে দিয়ে বলল, 'কিছু মনে করবেন না, স্যার। আমাদের পচ্ছি-কোটা গাঁওতে গরিবরা শীত তাড়াতে বিড়ি ফোঁকে। অত গরম কাপড়চোপড় আমরা কোথায় পাব? আমাকে চিনেছেন তো? আমি মোঙ্গল।'

কুশলদার মাথাঘোরাটা হঠাৎ সেরে গেল। তাই তো মোঙ্গল তো তাঁর অচেনা নয়। সে বলল, 'আজও এখানে চট গায়ে রাত কাটাবেন নাকি? দিনের বেলায় এদিকে খুব ধর-পাকড় চলেছিল। সবাইকে টেনে বের করে, লাইন দিয়ে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। তাই দেখে যাদের তখনো ধরেনি, তারা যে-যার পুঁটলি নিয়ে বেপাত্তা হয়ে গেছে। আপনি হাসছেন, স্যার? এটা আপনার কাছ থেকে আশা করিনি। দুঃখীর দুঃখ আপনি না বুঝলে, বুঝবেটা কে? দেখুন গিয়ে জলের পাইপ চাঁচাপোঁছা। একটা ছেঁড়া ন্যাকড়া পড়ে নেই। এই বাজারে তারও দাম আছে। একটা ফালতু নোংরা প্ল্যাস্টিকের থলি পর্যন্ত পড়তে পায় না। অমনি খোদ্দের এসে চটের থলি ভরে ওজনদরে কিনে নিয়ে যায়। কাছেই একটা থলি-ধোলাইয়ের মাঠ বলে একফালি জমি আছে। সেখানে সদাই খানিকটা জল জমে থাকে। কোত্থেকে আসে তা জানি না। বালিচাপা দিলে দেখা যায় না। বালি সরালেই খুদে পুকুর। সেই পুকুরে থলি ধোলাই হয়। মাঠে মেলে শুকোনো হয়। চট বোঝাই হয়ে টেম্পো চেপে কারখানায় নিয়ে গিয়ে, মেশিন দিয়ে ঐ থেকে নতুন প্ল্যাস্টিক থলি হয়। নষ্ট হয় না কোনো কিছু। মানুষ ছাড়া।'

হাঁ করে শুনছিলেন কুশলদা। মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। শুধোলেন, 'কোথায় গেল ঐসব উদ্বাস্তু মানুষগুলো?'

মোঙ্গলের কি হাসি! 'ওদের পল্টনে নেয় না, শরীরে রোগ। পুলিসে নেয় না, বলে রেকর্ড খারাপ।'

কুশলদা বললেন, 'পুলিসরাও কিছু জলে ধোয়া তুলসিপাতা নয়। ওরা নিজেদের লোক না হলে নিতে চায় না। মুটে, মজুর, ঠেলাগাড়ির কুলি হয় না কেন?

'শরীলে জোর নেই। ফোড়েরা বড় বেশি নজরানা চায়।

কুশলদা মোঙ্গলের মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'তুমি তো ফোর্টে চাকরি কর। সেখানে কিছু হয় না?' তাই শুনে মোঙ্গল হো-হো করে এমনি হাসল যে কুশলদা চমকে উঠলেন। ভালো করে তাকিয়ে দেখেন তিনি সেখানে একা দাঁড়িয়ে, মোঙ্গল কেমন সরে সরে যাচ্ছে। কানে এল, 'সাবধান! তদন্তকারীদের চর চারদিকে চারিয়ে আছে। এই বেলা হারিয়ে যান। নেই হয়ে যান।'

কুশলদা আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালেন না। নিশ্বাস বন্ধ করে সেই যে ছুট দিলেন, নতুন আস্তানায় না পৌঁছে থামলেন না। মতি ছোকরা ইঙ্গিত পেয়েই দোর খুলে দিয়ে আবার ছিটকিনি লাগিয়ে ফিরে বলল, 'কিছু হয়েছে, দাদাবাবু?'

কুশলদা হাসলেন। 'নতুন কি আর হবে? তুই কি জানতিস দোকানে যে ঐসব চকচকে নতুন প্ল্যাস্টিকের থলিতে জিনিস ভরে দেয়, ওগুলো ঠিক ঐরকমই পুরনো থলি গালিয়ে তৈরি? নতুন করে রাঙিয়ে, চকচকে হরপে নাম ছেপে, নতুন জিনিস ভরে দেয়?'

শুনে মতি অবাক! 'তাই নাকি? আগে তো আমিও বিনি পয়সায় ঐ থলি কুড়িয়ে, কিংবা চেয়ে, কিংবা ডাস্টবিন হাতড়ে, পুঁটলি বেঁধে নিউমার্কেটের পেছনে একটা গলিতে নগদ পয়সা দিয়ে বেচতাম। তাইতেই কতকাল আমার খাওয়া চলেছে। পাইপে আমিও ঘুমিয়েছি। খোকাবাবুরা আমাকে নতুন মানুষ বানিয়ে দিয়েছেন। কষ্ট হচ্ছে দাদা? মাথা টিপে দেব? ওনারা মানুষ না, দেবতা।'

কুশলদা হেসে বললেন, 'নারে। ওরাই আসল মানুষ। তোর ভালো হোক। একটু জল খাওয়া দিকি।'

জল খাইয়ে আর কোনো অনুমতি-টতি না চেয়েই, মতি কুশলদার পায়ে কি একটা কবরেজি তেল মালিশ করতে লেগে গেল। বলল, 'এটা ভালো জিনিস, দাদা। আমাদের পাইপে এক হেকিম থাকত, তার কেউ ছিল না, কিছু ছিল না। শেষটা চোখ দুটোও গেল। আমি তার দেখশুন করতাম। তা সে মরবার সময় বললে, 'আমাকে জোয়ারের মুখে মা গঙ্গায় ভাসিয়ে দিস্। মা তো আর জাতজোত মানে না। ছেরাদ্দে আমার বিশ্বাস নেই। কিচ্ছু করিস্ না। তোকে দেবার মতো আছে শুধু গুণীনের দেওয়া এই মালিশের ওষুধটে। এটা তোকে দিয়ে গেলাম। এতে সব ব্যথা দূর হয়। খেলে কিন্তু পেটের ব্যামো হয়।' সেই ইস্তক কত ব্যথা সারিয়েছি ওটা দিয়ে। দিই না, দাদা, পা তো তোমার ফুলে ঢোল।'

ওর ঐ বিনীতভাবে 'আপনি' থেকে 'তুমি' সম্বোধন কুশলদার কানে বড় মিষ্টি লাগল। তিনি নিজের ছেঁড়া জুতো, ফোলা পা দেখে হাসবেন না কাঁদবেন বুঝে উঠতে পারলেন না। নীরবে পা মেলে দিলেন আর সে তেলের এমনি গুণ যে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুমিয়ে কাদা। এবং এক ঘুমে রাত কাবার। ওষুধেরই গুণ কিনা কে জানে!

ঘুম ভাঙল পরদিন সকালে মন্টু-বলাইয়ের ডাকে।— 'ও দাদা, উঠুন, আপনাদের 'ছোটা-হাজরি' এনেছি। গরম লুচি আর মোহনভোগ। মায়ের হাতে তৈরি।' কুশলদার গিন্নি বলেন নুচি হালুয়া। যাকগে না, ওসব ভেবে কাজও নেই। সময়ও নেই। মন্টু-বলাই বাসি খাবারের কারবার করে না। সকালের জলখাবার বাড়ি থেকে করে এনেছে। দুপুরের আর সন্ধ্যের বাজার করে এনেছে। ওদের দিন শুরু হয় ভোর পাঁচটায়। ক্যাবিনের সব ভার মতির আর কুশলদার ওপর। তাদের সাহায্য করে জ্যাকি আর জিমি বলে দুই ছোকরা। তাদের বয়স বারো তের বলে মনে হয়। মাইনে চায় না। খালি খাওয়াটা আর বিনি পয়সায় লেখাপড়া শিক্ষা। শেষেরটার ভার কুশলদা আগ বাড়িয়ে নিলেন। মায় মাসে ত্রিশ টাকা করে হাতখরচারও ব্যবস্থা হলো। ওঁরা যা খাবেন ওরাও তাই খাবে। হিসাব লিখতে বসে ভাবেন কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। এরা যেচে খেটে দিতে চাইছে। একটু শিক্ষা পেলেই কেতাথ হয়। আর কুশলদার বাড়িতে?

জিমি-জ্যাকির মা নিউমার্কেটে একটা জামা-কাপড়ের দোকানে কাজ করেন। ওঁরা কেরালার খৃশ্চান। তিন পুরুষের কলকাতাবাসী। ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে কি একটা মিশন আছে, সেখানে মা শনি রবি কিছু সেলাই-ফোঁড়াই-রিপুকর্মের কাজ করে দেন। তার বদলে একটা ঘর,এক ফালি রান্নাঘর আর গোছলখানা মিনি-মাগনা পান। জ্যাকি-জিমিকে নিয়ে সেখানে থাকেন। তিন ক্লাস অবধি পড়াশুনো করেছে। এখন কাজ করতে করতে হায়ার সেকেন্ডারি অবধি পড়বে ঠিক করেছে। তারপর দেখা যাবে। ওদের মা নাকি বলেন যাদের দেখবার কেউ নেই, ভগবান নিজে তাদের দেখেন।

কুশলদার মনের বরফের চাঁইটা আগেই গলতে শুরু করেছিল, এখন শেষ টুকরোটিও বাষ্প হয়ে উপে গেল। বললেন, 'আমি তোদের পড়াব।'

কুশলদা অবাক হয়ে ভাবেন কে যেন বলেছিল এ দুনিয়া আজব চিড়িয়াখানা, সে জেনেই হোক বা না জেনেই হোক, জীবনের একেবারে মোদ্দা কথাটি টেনে বের করে দিয়েছিল। সত্যকে রক্ষা করা, পালন করা

যাদের কাজ এবং তার জন্য যারা মাইনে খায়, তাদের মতোও পাষণ্ড বদমাইশের জুড়ি মেলা দায়। আর যাদের কেউ নেই, কিছু নেই, কোনোদিন ছিল কিনা সন্দেহ, তাদের মনে দেবতা আসন পাতেন। ভেবেই হাসি পেল। এ কি হলো তাঁর! যত রাজ্যের গৃহহারা লক্ষ্মীছাড়া আকাট মুখ্যুদের সঙ্গে দেখা হচ্ছে, তাদের মধ্যেই মনের মানুষ খুঁজে পাচ্ছেন! বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনির এখনো দেখা হলো না। রবি না হয় ছুটির দিন। এর শেষ কোথায় দাঁড়াবে!

রান্নাঘরে একটা ইংরিজি-বাংলা ক্যালেন্ডার ঝোলে, যাতে ছুটিছাটার হদিস পাওয়া যায়। তাতে রোজ একটা টিক দিয়ে রাখেন কুশলদা, যাতে দিনের হিসাব না গুলিয়ে যায়। একমাস তো ছুটির মেয়াদ তাঁর। তার মধ্যে বাড়ির লোকদের আর কর্মস্থলের বাবাজিদের উচিত শিক্ষাটা সম্পন্ন করতেই হবে। তাছাড়াও একটা উদ্দেশ্য আছে, সে কথা এখন উহ্য থাক। কাউকে বলার মতো নয়।

সাত-পাঁচ ভেবে দুদিন বাদে জ্যাকি-জিমির পড়া হয়ে গেলে, মতিকে ডেকে বললেন, 'একটু খোলা হাওয়ায় তোর কেনা নতুন চপ্পল জোড়া পরখ করে আসি। ফিরে এসে খাব। হট কেসে খাবার তুলে রাখ্। খিদে পেলে নিজে খেয়ে নিস্।'

হাত-মুখে একটু জল দিয়ে বেরুতে যাবেন, দেখেন মতিও তার ক্যাম্বিসের জুতো পরে তৈরি।

'ও কিরে, কোথায় যাবি?'

'ঐ একটু খোকাবাবুদের কাজ সারা হলো কি না দেখতে যাই। আপনার বেড়ানো হলে ডাক দেবেন। একসঙ্গে ফেরা যাবে।'

আশ্চর্য হয়ে কুশলদা বললেন, 'সে কিরে? দোকানে মানুষ থাকবে না?'

'তা থাকবে না কেন, আজ গির্জায় কি একটা উৎসব আছে। রাতদুপুরে গানটান হবে, ওদের মা যাবেন। তাই ওরা রাতটা এখানেই থাকবে। খাওয়া-দাওয়া সেরে, বাইরের ঘরে পড়ছে বসে। মাদুর পেতে কম্বল জড়িয়ে ঘুমোবে। চলুন।'

এতো মহা জ্বালা! ব্যাটা তো নাছোড়বান্দা। অনুমতিরও অপেক্ষা করে না। দেখাই যাক কি হয়! তবে সঙ্গী থাকলে কিছু হবে মনে হয় না। আরেকটা দিন নষ্ট হলো। নষ্ট? এত শিক্ষা পাচ্ছেন, তাহলে নষ্ট হবে কেন? অবিশ্যি তেমন কিছু ঘটল না। নদীর ধারে পৌঁছেই মতি বলল, 'তোমার কাজ সেরে এসো দাদা, আমি ঠেলাগাড়ির নড়বড়ে চাকাটা সারাই গিয়ে। খোকাবাবুরা সেটাকে নিয়ে হয়রান হলো। কাজ সারা হলেই হাঁক দেব। তুমিও চলে এসো।'

দালানে উঠেই কুশলদা দেখেন সেখানে কারা বসে আছে। থমকে দাঁড়ালেন কুশলদা। বাড়ির লোকরা মরিয়া হয়ে ওঁৎ পেতে বসে নেই তো? ওঁর অভাবে তাদের বুক ফেটে যাচ্ছে এমন তিনি আশা করেন না।

পানের দোকানের মালিক হলে সে দলবল নিয়েও আসত না, আবার একা আসতেও ভূতের ভয়! জায়গাটার বড়ই দুর্নাম। কেউ সহজে আসে না, এদিকে সূর্য ডোবার পর। অর্থাৎ তিনি ছাড়া কেউ না। তাঁরও গা সিরসির করে একটু। ঐ সোঁদা গন্ধটাও বড় বিশ্রী। দিনের বেলা তো কখনো লক্ষ্য করেননি।

এইসব ভাবতে ভাবতে কুশলদা একেবারে দালানের সামনে পৌঁছে গেলেন। তাই তো! আজ যে এখানে মেলা লোকের ভিড়! অগত্যা খুদে টর্চটা জ্বাললেন কুশলদা। না, তারা উপে গেল না। উল্টে, উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে তাঁকে স্বাগত জানাল। 'আসুন, আসুন, অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছি। আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব আছে। অভয় দেন তো বলি।'

এতক্ষণ বাদে তাদের চিনতে পেরে, কুশলদা কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'নিজেই নানা ভয়ে কাবু, আবার অভয় দেব কোন আস্পর্ধায়? তবু, বলেই ফেলুন না। সংক্ষেপে।'

বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি বলল, 'সংক্ষেপে-ই বলা ছাড়া উপায় নেই। আমাদের প্রস্তাবটা ছাড়াও কোনো পথ নেই। আগে মালিকের দুটো বাদশাহী পান খেয়ে আরাম করে বসুন।'

কুশলদা পান দুটোকে পকেটে ভরে বললেন, 'আরাম হারাম হ্যায়। নির্ভয়ে বলুন।'

## পাঁচ

বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি—নামগুলো মনে করলেই একটা তীক্ষ্ণ মেধাবিয়ানার আবহাওয়া আপনা থেকেই তৈরি হয়ে যায়। তার সঙ্গে দয়া-মায়া-ক্ষমা-ভালোবাসার কোনো সম্পর্ক নেই। তা না থাকলেও বেশ একটা কড়া সাফল্যের গন্ধ পাওয়া যায়। কুশলদা নড়েচড়ে আরাম করে বসলেন। অন্যমনস্ক হলে চলবে না। তিনি যখন মনে মনে গল্প ভাঁজেন, তখন তাঁর চরিত্ররা এক মুহূর্তের জন্য অসাবধান হলেই সর্বনাশ হয়ে যায়। আর এ তো বানানো কবিকথার জায়গায় বাস্তব সংকটের সম্ভাবনায় ভরপুর! বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি যে কারণেই হোক, তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখে। সবাই জানে তিনি অতিশয় নিরীহ চেহারার একজন সরকারি কর্মী ছাড়া কিছু নন। তবে তাঁর মনে ডুবুরি নামালেও কোনো গোপন তথ্য তুলে আনা কারো বাপের সাধ্যি নেই, সে কথা এরা হয়তো সন্দেহ করে না।

চট্ করে মনে হলো, এদের নজর হয়তো আসলে ওঁর উপরে নয়। ওঁর নতুন বন্ধু মন্টু-বলাইয়ের বিষয়েই সম্ভবতঃ ওদের কৌতূহল। হাসি পেল। উনি কি একটা অপোগণ্ড শিশু? অথচ ভারি ধূর্ত দৃষ্টি ওদের। মন্টু-বলাইকে এক-মিনিটে শিশুপাঠ্য বইয়ের মতো পড়ে ফেলবে। তাহলে?

বুধ গলা নামিয়ে বলল, 'শুনলাম আপনার ধারণা আমরা ফোর্টে মোটা মাইনের চাকরি করি, আমাদের অসীম ক্ষমতা। বলাই-মন্টুকে ইচ্ছে করলেই ভালো চাকরি পাইয়ে দিতে পারি। সব ভুল। মাইনে ভালোই পাই। কিন্তু ওরাও তো আর ভিকিরি নয়, দয়ার দান নেবে কেন? আমরা জানি ওদের আত্মসম্মানে বাধবে। কিন্তু আপনি যদি ওদের পাশে আরেকটা ঠেলাগাড়িতে পান, সিগারেট, নানা রকম ঠাণ্ডা পানির ব্যবস্থা খোলেন, দেখবেন তাহলে ওদের আয় ডবল হয়ে যাবে। না, না, ব্যস্ত হবেন না। ঠেলাগাড়ি নিয়ে আপনাকে বসতেও হবে না, টাকাও খাটাতে হবে না। নামে মাত্র আপনি মালিক। নইলে ওরা সন্দেহ করতে পারে। নামে মানেই বেনামায়, বেশ একটা মনে-ধরা নামে। আমরা প্রকাশ্যে জড়িত হলেই আমাদের ফোর্টের ভাত উঠবে! এটুকু সৌজন্য আপনি না করলেই নয়।'

কুশলদা বললেন, 'এখন আমি কিছুই বলতে পারছি না। মন্টু-বলাইয়ের সঙ্গে কথা বলে, পরে জানাব—এই রে! আমার ডাক পড়েছে!' এই বলেই উঠে পড়ে বাইরে এলেন। মতি একটু দূরে খুদে একটা বাঁশি বাজিয়ে জানান দিচ্ছিল। একবার মাথা ঘুরিয়ে দেখলেন, ঠিক যেমনটা ভেবেছিলেন, তাই! বুধ-বৃহস্পতি-শুক্র-শনি ইতিমধ্যে অন্ধকারে উপে গেছে!! মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়, ওরা কি সত্যিকার মানুষ, নাকি উনি ওদের মনে মনে ভেবেছেন। আসলে ওরা নেই। নেই? তাই কখনো হয়? আছে নিশ্চয়। তবে তারা পৃথিবীর মাটিতে হেঁটে বেড়ায় কিনা, তাই বা কি করে বোঝা যাবে? হাঁটতে তো কখনো দেখেননি। এই আছে, এই নেই। বলে নাকি ফোর্ট উইলিয়মে অধ্যাপনা করে। সে তো বিদ্যাসাগরমশাইও করতেন। তাই বলে তিনিও কি আছেন? না, নেই। অন্ততঃ এ পৃথিবীতে নেই। অবিশ্যি তাঁকে দেখলে মনে করতেন তাঁর মতো সেজে আর কেউ এসেছে। কিংবা ভূত দেখছেন। তবে ভূতরা কি আর পান, সিগারেট, সোডা, লেমনেডের ব্যবসা করে? মাইনে দিয়ে

লোক রাখতে চায়? কলেজের মাইনেতে কুলোয় না বলে কম্‌প্লেন করে? না। এর মধ্যে কোনো ষড়যন্ত্র আছে। সেটা কি?

এই প্রশ্ন মনে জাগতেই সঙ্গে সঙ্গে তার উত্তরটাও বিদ্যুতের ঝলকানির মতো পেয়ে গেলেন। মনটা হাল্কা হয়ে গেল। একগাল হেসে মতিকে বললেন, 'দেরি করিয়ে দিলাম নাকি রে, মতি? ক্ষতিপূরণস্বরূপ, চল্ ফেরার পথে হারানের দোকান থেকে ছানার পায়েস কিনে নিয়ে যাই। এই সময় পাক হয়।'

মতি হেসে বলল, 'একটু বেশি করেই নিও, দাদা। জ্যাকি-জিমিও মিষ্টির ভক্ত।' ছানার পায়েস কেনা হলে, মতি বলল, 'দাদাকে খুব খুশি-খুশি মনে হচ্ছে। বেকারভাতা বাড়ল নাকি?'

কুশলদা বললেন, 'তাও বলতে পারিস, আবার এ-ও বলতে পারিস যে আমি হঠাৎ হাতে চাঁদ পেয়ে গেছি। হ্যাঁরে, দুজন বিশ্বাসী বেকার যুবক দিতে পারিস? ষণ্ডাগুণ্ডা, সাহসী ধরনের? খুব ধূর্ত আর চটপটে।'

শুনে মতি তো অবাক্! 'এ্যাঁ! আর কেউ হলে জেলখানায় খোঁজ নিতে বলতাম। তুমি বলেই দেব অমনধারা দুজন লোক। কিন্তু তাদের বিষয়ে কিছু জানতে চেয়ো না। আমাকে বিশ্বাস করতে হবে।'

ছেলে দুটো ছানার পায়েস দেখে আহ্লাদে আটখানা! বলে কিনা, 'আমাদের ভাগ থেকে একটুখানি মায়ের জন্য নিয়ে যেতে পারি? মা এসব খুব ভালোবাসেন, কিন্তু বড্ড দাম বলে কিনতে পারি না আমরা।'

কুশলদা ধমক দিয়ে বললেন, 'তোরা মাকে দেবার কে রে? আমরা দেব। কাল সকালে ঐ দোকান থেকেই কিনে দেব। এগুলো চেটেপুটে খেয়ে নে দিকিনি।'

অনেক দিন এত খুশিমনে ঘুমোননি কুশলদা। মন্টু-বলাইকে বললেন, 'দেখ, আর বেশি লোক রেখে কি হবে? দোকানের হিসাব লিখতে সবাই পারে। তোমরা বাপু, জমাখরচের অঙ্কের প্রতিটি পয়সার হিসাব সঙ্গে সঙ্গে দুটি কলামে লিখে রাখবে। কুচি কাগজ ফের যদি দেখি, তাহলে আমি তক্ষুণি ফরাক্কাবাদ চলে যাব বলে রাখলাম। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্যাকি-জিমি হিসেব রাখার নিয়মগুলোও শিখে নিক। পরে অ্যাকাউন্টেন্সি পড়বে। পাস করলে আমাদের ঐ ডিপার্টমেন্টে ভালো চাকরির যোগ্য হয়ে উঠবে বলে আমার বিশ্বাস। আমার আরও দশ বছরের সার্ভিস আছে। যদি না তোদের সঙ্গে মেলামেশা করি বলে কাজে ইস্তফা দিতে বাধ্য করে!'

মতি ভুরু কুঁচকে বলল, 'ঐরকম দপ্তরি ভাষা বললে আমি বুঝতে পারি না।'

মন্টু-বলাই হেসে বলল, 'তোর সঙ্গে তো আর কথা হচ্ছে না। চুপ করে শুনে যা।'

কুশলদা সেদিন দুপুরে তাঁর মনগড়া গল্পটাকে কাগজে নামাবার তোড়জোড় করতে লাগলেন। আপিসের সময়ে বেরুলে যে কারো না কারো চোখে পড়ে যাবেন এবং সে নিজেই হোক কিংবা লোক মারফতই হোক, ওঁর পদানুসরণ করে, গোপন আস্তানাটি ফাঁস করে দেবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বি-বা-দি বাগ অঞ্চলের জীবনযাত্রা সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গে স্তিমিত হয়ে, রাত আটটার মধ্যে সুনসান্ হয়ে যায়। বাধ্য না হলে কেউ বেরোয় না।

এর একটা সৃজনশীল দিকও যে আছে, তাতে সন্দেহ নেই। বর্ষাকালের দূর্বাঘাসের মতো টপ-টপ করে নানান লোমহর্ষক প্লট্ আপনা থেকেই মনে গজায়। ভূতের গল্প আর দুর্দান্ত কল্প-বিজ্ঞানের, কিংবা নানারকম অকর্ম-দুষ্কর্মের কাহিনী তাঁকে পেয়ে বসে। কতবার ভেবেছেন 'পার্ক-পঞ্জিকা' নাম দেবেন বইটার। দুই খণ্ডে বেরুবে তিনি অবসর নেবার পর। এখন থেকেই একটু একটু করে জিনিসটা এগুচ্ছে। কপি কাছে রাখেন না। কে জানে যদি ছিনতাই হয়ে যায়। ধর, অপহরণকারী নিজেই যদি ছেপে দেয়, নিজের বা অন্য কোনো নামে! সে ভাবা যায় না। তাই বাড়িতে লোহার সিন্দুকে থাকে পাণ্ডুলিপিগুলো। গিন্নি ভাবেন আপিসের গোপন ফাইলের কাগজ। গিন্নি যেমনি ভালো রাঁধেন, তেমনি সেলাই-ফোঁড়াই করেন, রোগসেবা করেন, ঠিক তেমনি হৃদয়হীনা আর প্রগল্‌ভা!—যাক্‌গে এসব ভেবে মন খারাপ করার কোনো মানেই হয় না। কয়েক মাস দেখুক সবাই তাঁর অনুপস্থিতি কত সুখের।

মুস্কিল একটাই। আপিসেও তাঁর বিনা নোটিসে অদর্শন নিয়ে কিছু কথা উঠে থাকবে। অবিশ্যি তাঁর ডিউটিই এমন, যে কিছুদিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকার দরকার হতে পারে, এ-কথাটা সকলেই জানে। গিন্নির কাছে মাসের গোড়ায় অর্ধেক মাইনে পাঠাবার নির্দেশও দিয়ে রেখেছেন। তাঁর তো কর্তব্যবোধ বলে একটা জিনিস আছে। গিন্নি যতই খরচে আর অবুঝ হন না কেন। তাছাড়া বাড়ির দায়িত্বজ্ঞানশূন্য কমবয়সীরা তাঁকে নিত্যি উস্কানি দেয়। সে যাক্ গে। গিন্নির হয়ে তিনি কিছু ব্যারিস্টারি করতে প্রস্তুত নন।

রাতে চোখে ঘুম আসে না বলেই না এত প্লট মগজে ভিড় করে আসে। কিন্তু আগের রাত্রে আর সে-রাত্রেও ছোট শিশুর মতো অকাতরে ঘুম দিলেন। আর সবচাইতে মারাত্মক কথা যে ঘুমের চোটে গল্প গজাল না বলে তাঁর এতটুকু অনুশোচনাও এল না। কয়েকটা মনগড়া দুষ্কর্মের কথা লেখার চাইতে তাঁর সত্যিকার অভিজ্ঞতাগুলো কিছু কম রোমাঞ্চকর নয়। এবার 'দুর্ভাগার ডাইরি' বলে যা একখানা বই লিখবেন তাতে অন্য এক স্তরের জীবনের নতুন এক প্রজন্মের জয়যাত্রার কথা থাকবে। আমাদের দেশে যাদের চামড়ার চোখ দিয়ে কেউ দেখেনি। ভাবলেন এক বর্ণ বানিয়ে লিখবেন না। তার দরকার হবে না। শিশিরলাগা ঘাসের মতো কাঁচা-কাঁচা পেয়ে যাচ্ছেন।

খুব কৌতূহল হওয়া সত্ত্বেও দিনের বেলা কুশলদা ওমুখোও হলেন না, ওর কথাও মুখে আনলেন না। আলো থাকতে ওদিকে গেলে যে গুপ্তচরদের কারো চোখে পড়ে যাবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বাড়ির লোকরা যে নিশ্চেষ্ট হয়ে এতদিন বসে থাকবে না, সে বিষয়েও তিনি নিশ্চিত। মতি ছাড়া কেউ তাঁর মনের কথা সন্দেহও করে না। তবে মন্টু-বলাই সাতঘাটের জল খেয়েছে, ওরা কতটা জানে, কতটা বোঝে আর কতটা অনুমান করে, তা বলা মুস্কিল।

দুদিন পরেই সকালে এসে খুশি হয়ে মন্টু-বলল, 'শুনে খুশি হবেন, দাদা, আমরা এতদিন যার জন্য চেষ্টা করছিলাম, মতির দৌলতে সেটা এবার কার্যে পরিণত হলো। ভালো পাটনার পাওয়া গেল। না, না, ব্যস্ত হবেন না, কোনো টাকাকড়ির লেনদেনের মধ্যে যাব না। রেষারিষির কথাও উঠবে না। ওরা সোডা-লেমনেড-কোল্ড ড্রিংকের সঙ্গে পান-সিগারেট বেচবে। ওদের আলাদা ঠেলাগাড়ি, আলাদা হিসাব। শুধু আমাদের পাশেই থাকতে চায়। মতি আশ্বাস দিচ্ছে।'

কুশলদার এই শেষ মুহূর্তে মনে একটা কিন্তু কিন্তু ভাব এল। বললেন, 'লাইসেন্সও যেন আলাদা থাকে। আমারও মনে হয় পাশাপাশি থাকলে, দুজনারই ব্যবসা বাড়বে।'

কার্যতঃ হলোও তাই। খেতে এলেই খোদ্দেরদের তেষ্টা পায়। যাবার সময় পান-সিগারেট কিনে নিয়ে যায়। আবার পান-সিগারেট কিনতে এলে, নাকে চপ-কাটলেটের গন্ধ গেলেই খিদে পায়। সে সপ্তাহে মন্টু-বলাইয়ের ডবলের বেশি রোজগার হলো। তারা আহ্লাদে আটখানা।

বরং কুশলদার মন থেকেই একটা সাবধান বাক্য বেরিয়ে এল, 'ওরে, যাই করিস্, মনে রাখিস্ কি বলেছিলাম। সর্বদা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য

বজায় রাখিস্। লোভ লাগলেও ওদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়িস্ না।' মতি তাই শুনে শুধু একটু মুচকি হাসল। পরে কুশলদাকে বলল, 'ভুলে যেয়ো না, দাদা, যারা নতুন কারবার চালাচ্ছে, তারা মালিক নয়। বরং আমার হাতে বাছাই করা আমার লোক। মালিক যে-ই হোক না কেন। ছেলেগুলো ডেলি নিয়মে কাজ করে। ইচ্ছে করলে বিনা নোটিসে ঠেলাগাড়ি ফেলে হাওয়া হয়ে যেতে পারে। মালিকদের সাধ্যি থাকবে না ওদের হদিস পায়। তুমি নিশ্চিন্তে থাক, দাদা।

তোমার বিষয়ে ভারি কৌতূহল। বলছিল, 'তোমাদের হিসাব-বাবুটির বেশ উঁচুদরের চেহারা এখানে তো পার্ট-টাইম; পাকা চাকরি কোথায়?'

'তুই কি বললি? মনে রাখিস্ যে আমি গা-ঢাকা দিয়ে আছি। এখানকার খোদ্দেরদের কাছেও আমি মুখ দেখাই না, খুপরি ঘরে গা-ঢাকা দিয়ে থাকি।'

মতি হাসল। 'তাতেই ওনাদের কৌতূহল আরও বেড়ে যায়। আমাকে বলেন, হিসাববাবু কি পরদানসীন? বেরোয় না কেন?'

'তুই কি বলিস্?'

'আমি বলি কেরানীর মাইনেতে কুলোতে পারে না। তাই বে-আইনীভাবে কিছু বাড়তি রোজগার হয়। নইলে পরিবার হাড় জ্বালায়। কেমন, ঠিক কিনা?'

ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে কুশলদা বললেন, 'একেবারে অক্ষরে অক্ষরে ঠিক। মানে, প্রায় ঠিক।'

মতি কথা পাল্টে বলল, 'মোট কথা, ঐ ছেলে দুটো আমারই লোক। আমার কাছে ওরা খবর সরবরাহ করে।'

কাষ্ঠ হাসলেন কুশলদা।—'ডবল ইন্‌ফর্মার বলে একটা কথা আছে, তা জানিস্? তারা যেমন ও-পক্ষের খবর এ-পক্ষকে সরবরাহ করে, তেমনি এ-পক্ষের খবর ও-পক্ষকে দেয়। ডবল্ রোজগার হয়।'

মতি বলল, 'তোমার কথা শুনে তাজ্জব বনে যাই, দাদা। বলতে চাও, এ-পক্ষ বা ও-পক্ষ কেউ-ই আসল ব্যাপারটা টের পায় না?'

কুশলদা বললেন, 'তা পাবে না কেন? পায় বৈকি। তাই তারাও সাজিয়ে-গুছিয়ে, নিজেদের সুবিধার যোগ্য করে খবর সাপ্লাই করে। এ খেল পাশা খেলার চাইতেও ইন্টারেস্টিং এবং জঘন্য। কই, কি খাবার-দাবার আছে? খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়া যাক।'

## ছয়

পরদিন সন্ধ্যেবেলায় কাজ সেরে, খাবার পৌঁছে দিতে এসে, মন্টু-বলাই সারাদিনের দেনা-পাওনার চটি খাতা দুটো জমা দিয়ে, পা ছড়িয়ে বসে মেলা গল্প করে গেল। বলল, 'ও দাদা, আপনার বিষয় নানা গুজব শুনে এলাম। সেগুলো একসঙ্গে জুড়ে দিলে খাসা এক রূপকথার বই হয়ে যেত। আমাদের ছোড়দা কাজকার্ম করে না, খালি সারাদিন অকাজ করে বেড়ায়, কিন্তু হাতে একটা ভোঁতা রঙীন পেনসিল আর ফালতু কাগজের টুকরো তুলে দিলেই কাগজটা যেন জ্যান্ত হয়ে লাফ দিয়ে ওঠে। নেচেকুঁদে গান গেয়ে এলাহি কাণ্ড লাগিয়ে দেয়। হাওড়ার পুলের কাছে ফুটের ওপর ও যে ভাঙা খড়ির টুকরো দিয়ে চোখের নিমেষে ঘরবাড়ি গ্রামগঞ্জ পেতে ফেলে, গৃহহারা পথবাসীরা সেখানে ওকে ঘিরে বসে থাকে। তাদের মুখ দেখে মনে হয় যেন তাদের সব চাহিদা মিটে গেছে।

ছোড়দাকে সবাই বলে বেয়াড়া বাউণ্ডুলে। ওর ট্যাঁক সদাই গড়ের মাঠ। কিন্তু ও জাদু জানে। আপনার বিষয় নানা গাঁজাখুরি গল্প ওর কানে পৌঁছয়। আমাদের গাড়ির স্ট্যাণ্ডে এলেই পেট পুরে খাইয়ে দিই আর রাজ্যের গল্প শুনি।'

কুশলদা বললেন, 'বাঃ! কিন্তু এর মধ্যে সে ভদ্রলোকের ভূমিকাটা তো বুঝতে পারছি না। আমার বিষয়ে কি এমন লোমহর্ষক কাহিনী রটেছে যে হাওড়া পুলে সাড়া জাগাবে?'

বলাই বলল, 'দাদা, আমাদের এই বুড়ো শহরটার পুলিসী তদন্ত বিভাগের কাণ্ডকারখানা দেখলে আপনার ঐ হ্যাণ্ডসম চেহারাটা শুকিয়ে আমসিপানা হয়ে যেত। আপনার পরিবার নাকি নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে, কেঁদে কেঁদে পদ্মলোচন দুটিকে জবাফুল বানিয়ে, পুলিসের "নিখোঁজ-তদন্ত বিভাগের" শরণাপন্ন হয়েছেন।'

কুশলদাকে চা খেতে গিয়ে বিষম খেতে দেখে মন্টু বলল, 'না না, দাদা, উনি নিজে যাননি। দুজন হাফ-বিদেশী চেহারার সুদর্শন ছোকরা, নীল রঙের আঁটো জীন্‌স্ পরে, আধা-হিন্দি, আধা-ইংরিজিতে সব বলেছিল। তাদের ব্যাকুলতা দেখে বড় সায়েব নিজে উঁচুতলা থেকে নেমে এসে তদন্ত চালাচ্ছেন।

হাওড়ার পুল পর্যন্ত সব খেটে খাওয়া মানুষদের ধরে ধরে কালো ভ্যানে ভরে নিয়ে গিয়ে ফাটকে পুরছেন!'

এ কথা শুনে ব্যাকুল হয়ে কুশলদা বললেন, 'তোমরা এত কথা জানলে কি করে? তোমাদের মেজদাকেও ধরেছে নাকি? তাকে তো আর বেকার বাউণ্ডুলে বলা যায় না!'

মন্টু-বলাই হাসল। মন্টু বলল, 'তা যায় কিনা দেখবার জন্য সে কি আর অপেক্ষা করেছিল! যেই না কথাটা পাচার হলো, সঙ্গে সঙ্গে খড়ি, পেনসিল, কাগজের কুচি, খড়ি-পোঁছা খাকি রুমাল সব তাঁর টিপিনের সঙ্গে কাঁধে ঝোলা শান্তিনিকেতনী ব্যাগে ভরে এক লাফে পুলের ছাদের একটা বরগা ধরে উঠে পড়ে, চক্ষের পলক না ফেলতে অদর্শন হয়ে গেলেন!

তারপর সর্বজন-চক্ষুর আড়ালে একটা সুবিধা মতো খাঁজে পা গুটিয়ে উৎসুক দর্শকের মতো বসে রইলেন। অলক চৌধুরী বলে যে আবার একটা লোক মাটির ওপর হেঁটে বেড়ায়, তার সাক্ষ্য দেবার জন্য ছবিগুলির পাশে একটা নিভৃত কোণে পড়ে রইল এক জোড়া রবারের চপ্পল। তার তলায় কালি দিয়ে লেখা এসি।

দম নেবার জন্য মন্টু একটু থামতেই, নরম গলায় কুশলদা বললেন, 'তুমি কি গল্প লেখটেখ নাকি?'

মন্টুর কান দুটো লাল হয়ে উঠল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার। তাই নিয়ে বাড়িতে অশান্তি হয়। ওঁদের ধারণা নাটক-নভেলই ধাপে ধাপে অধঃপাতে যাবার উপায়। এখন আর সময় পাই না।'

কুশলদা ওর পিঠে হাত রেখে বললেন, 'কিছু লেখাটেখা আমাকে পড়াও না কেন? ভালো হলে ছাপার চেষ্টা করব।'

মন্টু-বলাই পড়ে যায় আর কি!—'এ্যাঁ! ও মহলে আপনারও যাওয়া-আসা আছে নাকি?'

কুশলদা সংক্ষেপে বললেন, 'কিছু কিছু আছে। দিও কিন্তু। এবার বল, আমাদের বাড়িতেও ডিটেকটিভরা গেছিল?'

'গেছিল বৈকি। নাকি অনেক গোপন খবর পাওয়া গেছে। তাই নিয়ে জোর তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রতি মাসে নাকি আপনার রোজগারের চাইতে বেশি টাকা ব্যাংকে জমা পড়ে। কি হলো, দাদা? মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন যে? যদি কিছুদিন কোনো নিরাপদ স্থানে গা-ঢাকা দেবার দরকার থাকে তো বলুন। আমরা এখুনি, আজ রাতেই, আপনাকে নৌকো করে শিবপুর নিয়ে যাই। তার কাছেই গণ্ডগ্রামে আমার দিদিমার বাড়িতে নিশ্চিন্তে কিছু দিন কাটাতে পারবেন। তিনিও খুব খুশি হবেন। খাসা রাঁধেন। পিঠেপুলি, পায়েস, ধোঁকা।'

এই বলে উঠেই পড়েছিল বলাই-মন্টু। কুশলদা হঠাৎ হেসে তাদের মুখে-মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, 'না, না, কোনো বে-আইনী কাজ করিনি আমি। পাশের টাইপিং আপিস থেকে একটা ফোন করে দিলেই, সব ঠিক হয়ে যাবে। তা ঐ অতি চালাক ছেলে দুটো কি করছে? কেটে পড়েছে নাকি?'

মন্টু বলল, 'একেবারেই না। তাদের একমাত্র

ভয় তাদের মা-কে না ধরে নিয়ে যায়! ভাবনার চোটে খাঁটি বাংলায় কথা বলছে! তাদের বাবা নাকি রামকিষ্টোর মতো সাধু লোক। তাঁর বিষয় কেউ কিছু বললে ওরা দেখে নেবে।'

শুনে কুশলদা তাজ্জব বনে গেলেন। 'তোমরা বলছ ব্যাটারা নিজের থেকে বাংলা বলছে! মাই গড্!'

মতি এখানে হেসে ফেলল, 'দাদা, চমকে গিয়ে তুমি বলছ মাই গড্। আর ওরা দুজন নাকি খালি বলছে মা-কালীর দিব্যি। আমাদের বাবা কোনো অন্যায় কাজ করেন না। ওঁর চাইতে আমরা রোজ রোজ ঢের বেশি খারাপ কাজ করি।'

কুশলদা গা-ঝাড়া দিয়ে বললেন, 'রাবিশ্! আরো খবর আছে মনে হচ্ছে?'

'আছে। ঐ পানওয়ালা ছোকরা রাগমাগ করে স্রেফ্ বে-পাত্তা হয়ে গেছে। বলে গেছে নাকি যেখান থেকে হয়, যেমন করে হয়, আপনাকে খুঁজে বের করে নিজের কাছে লুকিয়ে রাখবে। কোনো পুলিসের বাবা আপনার খোঁজ পাবে না।'

কুশলদা ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা মন্টু-বলাই, তোমাদের ছোড়দা কি এখনো পুলের মাথায় লুকিয়ে আছে নাকি? তোমাদের এত কথা বলবার সুবিধে পেল কি করে?'

মন্টু বলল, 'সে আরেক বেত্তান্ত, দাদা। পুলের ছাদে কি দিনের পর দিন গা-ঢাকা দিয়ে থাকা যায়? শরীরটারও তো নানান চাহিদা আছে। রাত হলে যখন পুল নিঝুম হয়ে আসে, খালি গোটাকতক পাহারাদার লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে ঘুমোয়—'

মতি বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোনো যায় নাকি আবার?'

কুশলদা বললেন, 'যায়, যায়। আমি নিজের চোখে অনেক জায়গায় দেখেছি, ঘোড়ার পিঠে চমৎকার পোশাক-পরা পাহারাদারও নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে আর তার ঠ্যাং-এর ফাঁকে দাঁড়ানো বিশাল বিশাল ঘোড়ারাও ঘুমোচ্ছে।'

কথা বলতে বলতে ওরা একটু অন্যমনস্ক হয়ে থাকবে, কখন যে একজন রোগা, লম্বা, কদমছাঁট চুলওয়ালা, ফরসা লোক এসে জুটেছে কেউ নজরই করেনি। এখন সে হঠাৎ বলে বসল, 'কেন রে মন্টু-বলাই, মনে নেই সেই যে বুড়োদাদুর খেমো ঘোড়া আস্তাবলে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমোত? খড় পেতে দিলেও পা মুড়ে বসে পড়ত না।'

কুশলদা সহানুভূতির স্বরে বললেন, 'স্বাভাবিক অবস্থায় বুনো ঘোড়া পা মুড়েই

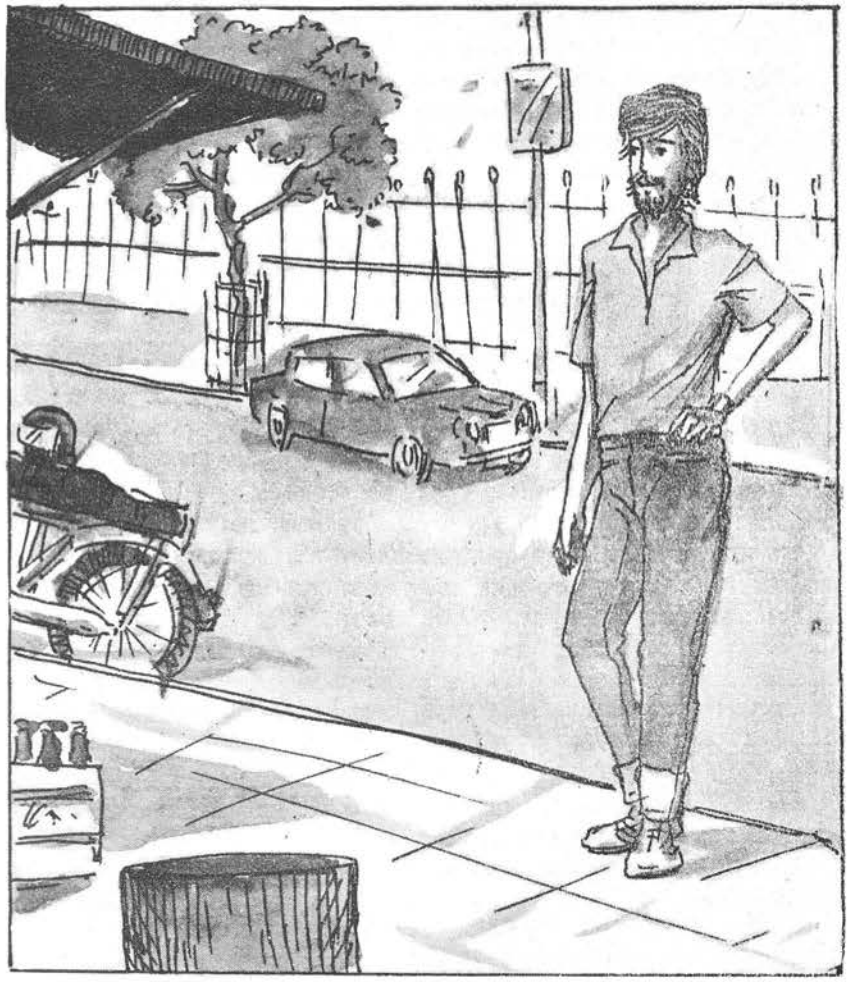

এক ছোকরা ছাই রঙের বুশ-শার্ট আর নীল জীন পরে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

ঘুমোয়। আমরা মানুষরাই ওদের দাঁড়িয়ে ঘুমোতে শেখাই।'

সঙ্গে সঙ্গে মন্টু-বলাই নবাগতকে তাড়া দিয়ে বলল, 'আহা, খুলেই বল্ না, ছোড়দা, পাহারাদারের ঘুমোনোর সঙ্গে তোর পুল থেকে ঝাঁপানোর সম্বন্ধটা কোথায়?'

ছোড়দা বলল, 'আছে, আছে। ওরা ঘুমুলেই আমি পুলের রেলিং অবধি নেমে এসে, ঝপাং করে জলে লাফ দিলাম।'

'এ্যাঁ! বল কি! তোমার না একতলার ছাদ থেকে নিচে তাকালেই মাথা ঘোরে?'

'আর বলিস্‌নি! ঠেকায় পড়ে মানুষ কিনা পারে? কি না হয় চেষ্টায়! খালি চোখে তো মনে হয় ঐটুকু উঁচু। অন্ধকার বলে সেটুকুও বুঝতে পারিনি। তা পড়ছি তো পড়ছি। মনে হচ্ছিল পাতাল ফুঁড়ে ওদিক দিয়ে বেরুব! মধ্যিখানে মা-গঙ্গা, তা মনেই ছিল না। ঝপাং করে জলে পৌঁছে থামলাম না! ডুবছি তো ডুবছিই আর জল খাচ্ছি। কি নোন্তা, কি নোন্তা! আর সে কি দুর্গন্ধ! বড় বড় পিছলা পিছলা মাছরা গা ঘেঁষে ডুব-সাঁতার দিয়ে বেড়াচ্ছিল।

ভাগ্যিস্ ঘ্যাচাং করে নৌকোর মাঝিদের বঁড়শীতে আটকে গেলাম! তাই পরাণটা বেঁচে গেল!! ওরা আবার আমার মুণ্ডু নিচু করে চেপে ধরল। প্রাণ যায় আর কি! তবু হড়হড় করে মুখ দিয়ে সব নোন্তা দুর্গন্ধ জল বেরিয়ে গেল। আমি মাঝিদের কোলে মুচ্ছো গেলুম।

ওরাই আমাকে ধুয়ে-মুছে, শুকনো কাপড়-চোপড় পরিয়ে, কি একটা গরম গরম জিনিস গলায় ঢেলে প্রাণ বাঁচাল। আহা, ওরা মানুষ না, সিরেফ দেবতা! ঐ আসলাম আর মামুদ চাচা। কথা দিয়ে এসেছি ওদের

নৌকোতে আগাগোড়া নক্সা করে দেব। বারবার ওদের পায়ে গড় করে, ওদের দেওয়া এই কাচা গেঞ্জি আর লুঙ্গি পরে, ওদের রান্না স্বর্গীয় লাল চালের ভাত আর গরগরে ঝাল ইলিশ মাছের ঝোল খেয়ে এইমাত্র আসছি।'

শ্রোতারা সবাই বাক্যহারা !!

কুশলদা ছোড়দার নাম-ঠিকানা তাঁর নোটবইতে লিখে নিলেন। নাম নাকি গোকুল দাস। কুশলদা বললেন, 'সেকি! অলক চৌধুরী নাম না? ঠিকানাও দিলে বলাই-মন্টুর এই দোকান।'

অলক বলল, এখন থেকে তাই। তার কারণ বাড়িতে সে আর ফিরবে না। তালগাছের বেহ্মদত্যিদের সাক্ষী করে গঙ্গার জলে পা ধুয়ে সে বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে মন্টু-বলাইয়ের দোকানে তাকে টেম্পোর‍্যারি ওয়ার্কার বলে বহাল করা হলো। রাতে আরেকটা ক্যাম্পখাটের ব্যবস্থা হলো। তার একটা ডিউটি হলো রোজ পান-বিড়ির একটা করে প্যাকেট কিনে আনতে হবে।

বলা বাহুল্য, এরকম ঢিমে তেতালা চালে চললে কোনোদিনও কোনো গল্পের শেষ পর্যন্ত পৌঁছনো যায় না। তাছাড়া কুশলদাও নিজের বাড়ি থেকে মনে মনে দু-মাসের ছুটি নিয়েছিলেন। সেও শেষ হতে খুব বেশি বাকি নেই। তিনি হঠাৎ এক সপ্তাহের নোটিস দিয়ে বসলেন। সে কথা শুনে ঐ ধাড়ি ধাড়ি কট্টর কর্মীদের সকলের চোখ, ছলছল! জ্যাকি-জিমি কেঁদেই ফেলল।

## সাত

এখন কথা হলো যে 'যাব' বললেই তো আর সব সময়ে যাওয়া হয় না। মতি কুশলদার কথার সোজাসুজি প্রতিবাদ না করে বলল, 'সেটা কি খুব ভালো কাজ হবে, দাদা? এতগুলো মানুষ তোমার মুখ-চাওয়া হয়ে আছে। সারাদিন তুমি এখনো গা-ঢাকা দিয়ে থাক। সন্ধ্যে না হলে বেরোও না। তাও পারলে দাড়ি কিংবা মুখোশ পরেই বেরুতে। নেহাৎ ওসব নেই, তাই। তোমার রকম-সকম দেখে তোমাকেই দুষ্কৃতকারী ছাড়া কিছু মনে হয় না। এমন কি আমাদেরই তোমাকে সন্দেহ করতে ইচ্ছা হয়। বাইরের দর্শক তো কা কথা!'

কুশলদা ফিক্ করে হেসে ফেলে বললেন, তোদের জ্বালায় যে সময়কালে আমার সন্ন্যাস নেবারও সাহস হবে না। তার আগে কোনো দুষ্কর্ম করবার বুকের পাটা তো নেই-ই। তবে সুখের বিষয়, চোরের স্যাঙাত বাটপাড়। তোতে আর আমাতে খুব বেশি ফারাক নেই রে।'

ততক্ষণে বাকি ক'জনেরও মুখে হাসি ফুটেছিল। তারা কুশলদাকে ঘিরে দাঁড়াল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে তিনি বললেন, 'ছুটি মঞ্জুর হলো না। চাকরি ছাড়ার নোটিসও গৃহীত হলো না। তা হলে বাকি মাইনেটাই দে।'

এ-কথা বলবামাত্র মন্টু-বলাই ব্রাউন পেপারে মোড়া দু-তাড়া একশো টাকার নোট ওঁর সামনের সরু টেবিলটার ওপর ফেলে দিল, 'এই নিন্ দাদা, ধরুন।' সব করকরে নতুন নোট। এত পরিষ্কার যে দেখলেই ঘোর সন্দেহ হয়। 'কোথায় পেলে?'

'একদিনে বিক্রির আমাদের শেয়ার। পার্টনার দিল।'

টাকা পেয়ে কুশলদা একটা অদ্ভুত কথা বললেন, 'আজ রাতে আমার কাছে থাক। কাল ভাগ করে দেব। কি বল?'

ওরা একটু আশ্চর্য হয়ে বলল, 'ভাগ আবার কিসের দাদা? আমাদের বিক্রির টাকা তো আমরা পেয়ে গেছি। ওটা আপনার এজেন্সির অংশ।'

কুশলদা তার কোনো প্রতিবাদ না করে নোটের তোড়া তাঁর কাঁধে ঝোলা ব্যাগে ভরে রাখলেন। কাগজের মোড়কটা পর্যন্ত খুললেন না।

যাবার আগে বলাই না বলে পারল না, 'একটু সাবধানে থাকবেন দাদা। সময়কালটা ভালো না।'

কুশলদা বললেন, 'আমার দলবলও কি ভালো না? ভয় নেই। আমি ওগুলো কাছে রাখব না।'

মন্টু-বলাই বিদায় নেবার পর, কুশলদা একটা টেলিফোন করলেন। তারপর মতিকে বললেন, 'তোরা একটু খেয়াল রাখিস্। একটু বাদেই খুব রোগা, খুব কালো, সাদা দাড়ি, কালো চুল একজন লোক আসার কথা। আমার আপিসের কর্মচারী, নাম তার ট্যাঙোস। হয় মোটরবাইকে, নয় খুদে গাড়িতে আসবে। দরজার আই-হোল দিয়ে দেখে নিয়ে কথা বলিস্। দরজা খুলিস্ না। আমাকে খবর দিস্। ভয় নেই, আমি ওর সঙ্গে বেরোব না।'

সকলের সে কি কৌতূহল! এ যে নাটকের মতো মনে হচ্ছে। সত্যি দাদা কাছে থাকলে সবকিছু অন্যরকম হয়ে যায়। সাধারণ জিনিসেও শিহরন লেগে যায়। সেই যাই হোক, দাদা তো খুপরির মধ্যে অদৃশ্য হলেন। এরা সময় কাটাবার জন্য বাসি খাবারদাবারের যা বাকি ছিল, সব চেটেপুটে সাবাড় করল। কল্পনাদেবী পিঠে ভর করলেই, পেটে যে খিদে জাগে, এ-কথা সব শিল্পীরাই জানে।

তা ছাড়া কে না জানে যে সব মানুষের মনের মধ্যে একটা শিল্পসত্তা নাক ডাকিয়ে ঘুমোয়। তাকে যদি জাগানো যায়, তাহলে চিরকালের মতো মন থেকে সুখশান্তি পাবার ইচ্ছেটা অবধি বিদায় নেবে এবং কেউ তাকে বিদায় সম্ভাষণও দেবে না। ওসবকে তুচ্ছ বলে মনে হবে। তাই দুনিয়ার পথে-ঘাটে দলে দলে স্নান-না-করা, খোঁচা-দাড়িগোঁফওয়ালা, ময়লা কাপড়চোপড় পরা কবিরা আর শিল্পীরা ঘুরে বেড়ায়। যত রাজ্যের বাপে-তাড়ানো, মায়ে-খেদানো ঘরছাড়াদের দল। মনগুলো সব উদার, দরাজ, হাট করে খোলা সদর দোরের মতো; কিন্তু গায়ে বোঁটকা গন্ধ।

এরকম খোদ্দের বি-বা-দি বাগে পা দেয় না বটে, দেবার চেষ্টা করলেই পাহারাওয়ালারা লগুড় নিয়ে তেড়ে আসবে। এখানে চ্যাপ্টা লম্বা নিচু চকচকে মটরগাড়ি চেপে যারা আসা-যাওয়া করে, তাদেরই সবচাইতে আদর। তবে নদীর ধারের কথা আলাদা। সেখানকার ঠেলাগাড়িতে এরা মাঝে মাঝে খাওয়া-দাওয়া করে। নদীর ঢালে পা ছড়িয়ে বসে, বই পড়ে; খাতা বের করে কি সব লেখে; খচখচ করে ছবি এঁকে ফেলে। নাকি সব উচ্চশিক্ষিত, বড় বংশের ছেলেমেয়ে। আধুনিক সভ্যতার ওপর ঘেন্না ধরে গেছে বলে, দুত্তোর বলে পালিয়ে এসেছে। সুখের বিষয়, শখ মিটে গেলে, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাবে। কিন্তু আমরা তখনো নিজেদের তৈরি কাদাজলে হাবুডুবু খাব।

কথাগুলো বলছিল ছোড়দা এবং একশোবার জন্মগত শিল্পীরই উপযুক্ত কথা। বই পড়া বিদ্যে নয়। সে-ও বাড়ি থেকে তাড়া খেয়ে, সাত ঘাটের জল খেয়ে অবশেষে নিজের পথ খুঁজে পেয়েছিল। আপাততঃ যদিও মন্টু-বলাইয়ের উপহার হলদে পাঞ্জাবি আর সাদা পাজামা আর রবারের চপ্পল পরে সেজেগুজে বিজলি পাখার তলায় বসেছিল। তাতে কি? সত্যিকার শিল্পীরা যা কিছু মিথ্যা সব পরিহার করে বটে, কিন্তু যেখানে যা কিছু ভালো, তাকে উপভোগ করে। ছোড়দা হঠাৎ পায়ের তলার মাটি আর মাথার উপর যথেষ্ট উঁচুতে হাতড়ালেই স্বর্গের সন্ধান পেয়ে গেছে। আর তার কিসের ভয় ভাবনা?

ঠিক এই সময় দরজায় টোকা পড়ল। মতি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, 'কে ডাকছে?'

'আমি ট্যাঙোস।'

দরজার ফুটোতে চোখ লাগিয়ে মতি দেখল কচি মিষ্টিপানা দাড়ি-মুখওয়ালা, রোগা, ঢ্যাঙা এক ছোকরা ছাই রঙের বুশ-শার্ট আর নীল জীন পরে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে কুশলদাও ছোট ঘর থেকে বেরিয়ে এসে

বললেন, 'আয় রে ট্যাঙোস।'

ছেলেটা ঘরে ঢুকতেই সব নিয়ম ভেঙে কুশলদা তাঁকে তাঁর খুদে ঘরে নিয়ে গেলেন। মিনিট পনেরো বাদে দুজনে বেরিয়েও এলেন। কুশলদা বললেন, 'তোর সঙ্গে গাড়ি আছে তো?'

ট্যাঙোস হেসে বলল, 'আছে।'

'তা হলেও মতি ওকে গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসো ভাই।'

আইসক্রীমের দোকানের সামনে ওর জন্য একটা খাকি রঙের বন্ধ ভ্যান দাঁড়িয়ে ছিল।

ওরা পালা করে রাত জাগল। দশটার মধ্যে রোজকার মতো দোকানের ঝাঁপ তুলে দেওয়া হয়েছিল। আসলে ভিতরটা শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত। মণ্টু-বলাইয়ের সাধ্য ছিল না ও ব্যবস্থা করে। পুরনো মেশিন, কিন্তু যত্নে থাকাতে এখনো সচল ও সামান্য শব্দ হয়। মাঝে মধ্যে চালানো হয়। একমাত্র মতি জানত যে কুশলদা তাঁর হিসাব রাখার মাইনের সবটাই এয়ার কন্ডিশনারের পিছনে খরচ করেন। বলেন, 'ওটাই আমার একমাত্র বিলাস। ওর পিছনে টাকা ঢেলে যদি আমি আনন্দ পাই, তাতে তোমাদের কি আপত্তি থাকতে পারে?'

পরে জ্যাকি-জিমি পাকা বুড়োর মতো মতির কাছে বলেছিল, বুঝলেন দাদা, কেউ মদ খেয়ে আনন্দ পায়; কেউ ডাকটিকিট জমায়; কেউ তীর্থদর্শন করে বেড়ায়; কেউ জামাকাপড় কিনে সুখ পায়। উনি যদি শীতের সময় ঘর গরম আর গ্রীষ্মের সময় ঠাণ্ডা করে আনন্দ পান তাতে কার কি আপত্তি থাকতে পারে? উনি একা কিছুই উপভোগ করতে পারেন না। ওঁর মতো কেউ হয় না। এমন মানুষও ঘর ছাড়ে!!'

মতিও মনে মনে ভাবছিল, অমন স্নেহশীল, তবু বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক নেই। তাদের কাছ থেকে গা-ঢাকা দিয়ে আছেন। তারা এদিকে হেদিয়ে মরছে। অন্ততঃ মণ্টু-বলাইয়ের সেইরকম ধারণা। ১০টা-১টা অবধি জ্যাকি-জিমি, তারপর ছোড়দা তিন ঘণ্টা; তারপর মতির পালা। আলো নিবিয়ে নিঃশব্দে রাতজাগা কি ব্যাপার, যে জাগেনি সে বুঝবে না।

নির্বিঘ্নে সারারাত কেটে গেল। ভোরে নিঃশব্দে কলঘরের কাজ সেরে এ ঘরে এসে মতির চক্ষুস্থির! কুশলদার শোবার বাংকটা খালি। পরিপাটি করে বিছানা পাতা!! মানুষটা কি উপে গেল? আজকাল আর কোনো কিছুতেই মতি চমকে যায় না। এ দুনিয়াতে সব সম্ভব। হেনকালে সদরের ঘন্টি বাজল। জ্যাকি-জিমি বাড়ি যাবে বলে তৈরি ছিল, তারাই দরজা খুলে দিতেই একগাল হাসি আর এই বড় বড় দুই চ্যাঙাড়ি গরম গরম জিলিপি আর হিংয়ের কচুরি নিয়ে কুশলদা ঘরে ঢুকলেন।

ঢুকেই কাউকে কোনো অনুযোগ-অভিযোগ করার সুযোগ না দিয়ে বললেন, 'তোমরা সকলে মিলে আনন্দ কর। আজ বড় ভালো দিন! আমার নতুন বই 'ঢাক-ঢাক-গুড়-গুড়, বেরিয়েছে!' এই বলে কচুরি-জিলিপির চ্যাঙাড়ি দুটো টেবিলে নামিয়ে, কাঁধে ঝোলানো শান্তিনিকেতনী থলি থেকে এক কুড়ি রঙচঙে বই বের করে দিলেন।

সকলের চক্ষু ছানাবড়া! ঐ সুন্দর পাতলা মানুষটার দেহে এই অসুরের বল কোথা থেকে আসে? নাকি ওটা মনের বল?

## আট

অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে যাওয়ার মুশকিল হলো যে মধ্যিখানে কোনো জিরোনো জুড়োনো নেই; এক কণা ছাড়ান-ছোড়ানও নেই; যতক্ষণ পর্যন্ত না ঝাড়ে-মূলে আপদ দূর হয়। সে চাট্টিখানিক কথা নয়। মন থেকে সব দুর্বলতা, সব মার্জনা বাদ দিতে হয়। একতিল প্রশ্রয় দিলেই আর দেখতে হবে না। সঙ্গে সঙ্গে পেয়ে বসে। অন্যায়ের সঙ্গে লড়তে হলে যেমনি ক্ষমাশীল হতে হয়, তেমনি সময়মতো নির্মম নিষ্ঠুরও হতে হয়। তখন কুশলদার নিখুঁত সুন্দর মুখখানি দেখলে মনে হয় বুঝি হৃদয়হীন মর্মরের মূর্তি। ওঁর দিকে তাকালেও মতির বুক কাঁপে।

সকলকে জিলিপি-কচুরি খাইয়ে, একখানি করে বই উপহার দিয়ে হঠাৎ কুশলদা বলে বসলেন, 'যাই, আজ একবার আপিসে মুখ না দেখালেই নয়। মার্চেন্ট আপিসের ব্যাপারই আলাদা। একজন কামাই করলে, তার জায়গায় দশজন পদপ্রার্থী দাঁড়িয়ে যায়। আমার চাইতে তাদের প্রত্যেকের অভাব ঢের বেশি আর যোগ্যতা ঢের কম। এই হলো মুশকিল।'

মতি বলল, 'আসলে মোট যতগুলো ভালো-মন্দ চাকরি আছে দেশে, প্রার্থী তার তিন গুণো। কোনোকালেও সক্কলের চাকরি হবে না। আমাদের মতো প্রাইভেট ব্যবসা না খুলে উপায় নেই। জনসাধারণের কত কি দরকার—ধোপা, নাপিত, দরজি, মুচি, ঝাড়ুদার, মিস্ত্রি, কামার, কুমোর, ভুজাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা—ইয়ে।'

কুশলদা মুচকি হাসলেন, আর, যে কারণেই হোক, কান লাল করে মতি থেমে গেল।

কুশলদা বললেন, 'ঠিক তাই।' ব্যাপারটা ওখানেই চুকে গেল। আর কোনো মন্তব্য না করে সবাই কাজে লেগে গেল। কুশলদার চেয়ারে ছোড়দা গিয়ে বসল। সেও যত কম প্রকট হয় ততই ভাল। জ্যাকি-জিমির সঙ্গে কুশলদা বেরিয়ে গেলেন। ওঁর কর্মস্থল, মান্ধাতার আমলের সেই সদাগরী আপিসে নাকি রোজ লাখ লাখ টাকার লেনদেন হয়। তবে বাইরে থেকে সেটা বুঝবার জো নেই। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হলেও, ব্রিটিশ-রাজ বিদায় নেবার পর থেকে আজ অবধি চুনকাম করা ছাড়া কোনো কিছুর সংস্কার হয়নি। তার ফলে জায়গাটার ভারি একটা পড়তি বনেদী ভাব গজিয়েছে।

জ্যাকি-জিমির পিঠ চাপড় দিয়ে সদরের লিফটে না চড়ে বাড়ির কোণা দিয়ে যে পুরনো কাঠের সিঁড়ি পাক খেয়ে খেয়ে উপরে উঠে গেছে কুশলদা টুপ করে সেখান দিয়ে ঢুকে পড়লেন। জ্যাকি জিমি লক্ষ্য করল যে নিচের দরওয়ান এক গাল হেসে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সেলাম করল। মানুষটাকে বোধহয় সবাই ভালবাসে।

সারাদিন কাজে কর্মে কেটে গেল। সকলেই খেটে খাওয়া মানুষ; অবান্তর দুশ্চিন্তা এলেও বাইরে সে-সব প্রকাশ করার সময় পায় না। মতি বারে বারে পথ চাইছিল। সন্ধ্যায় যে যার কাজ সেরে ক্যান্টিনে এসে জমায়েত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জ্যাকি-জিমির সঙ্গে নিচু গলায় গল্প করতে করতে প্রসন্ন মুখে কুশলদা এসে উপস্থিত হলেন। এসেই বললেন, 'ওরে মতি, বেজায় খিদে পেয়েছে রে। ফ্রাইড রাইসের লম্বা চাল আর অন্যান্য উপকরণ ন্যাড়াকে দিয়ে কিনিয়ে এনেছি। তোর হাতে তো জাদু আছে। তুই বানিয়ে দিবি। তার সঙ্গে আমাদের ক্যান্টিনের কালো ডাল আর নিরামিষ ফিশ ফ্রাই। এবং এক মুঠো চাল ভাপিয়ে, বেশ কন্‌ডেন্সড্ মিল্কের টিনে গুলে দিবি। তার ওপর কিসমিস আর বাদাম কুচো আর এলাচের গুঁড়ো ছড়াবি। সব এনেছি। ন্যাড়া কিনে দিয়েছে।

তার আগে গরম চা বানা আর এই চকোলেট বিস্কুটের প্যাকেটটা খোল দিকিনি। আমি কিন্তু তোদের চিজ-বিস্কুট খাব।'

মতি একটু আশ্চর্য হয়ে বলল, 'ঐ যে লোকটা তোমাদের আপিসের কাঠের সিঁড়ি ঝাড়ু দেয় আর সারা দিন চিঠিপত্র, অতিথি-অভ্যাগত নিয়ে এক তলা পাঁচ তলা করে তার নাম ন্যাড়া না? সে তো জাতে চামার। তার আনা খাবার সবাই খায়?'

কুশলদা হো হো করে হাঁটু চাপড়ে হাসলেন। বললেন, 'চামার আবার একটা জাত নাকি? ও তো একটা পেশা। যে সায়েবরা নর্থ ওয়েস্ট ট্যানারি বলে বিশাল ব্যবসা ফেঁদে লাখপতি হয়ে গেছিল আর এখন দিশি

এর শেষ না দেখে তিনি বাড়ি যাবেন না।

মালিকরা কোটিপতি হয়েছেন, তাঁরাও কি সবাই চামার বনে গেছেন নাকি?'

লজ্জা পেয়ে মতি বলল, 'না গো দাদা, আমার বলতে ভুল হয়ে গেছে। আমারো তো জাতপাত নেই। বাবা ব্রহ্মজ্ঞানী। মা খৃশ্চান ছিলেন। তা ন্যাড়া কোত্থেকে শিখল ও সব গুপ্ত বিদ্যে?

কুশলদা বললেন, 'কে জানে! বলে তো আমাদের ক্যান্টিন থেকে শিখেছে।' শুনে মতি পড়ে যায় আর কি! বুদ্ধিমানের মতো সে আর কথা বাড়াল না। 'লাও ঠ্যালা!' বলে কাজে লেগে গেল।

বাস্তবিক এদের একেক জনকে পাকশালার জাদুকর উপাধি স্বচ্ছন্দে দেওয়া চলে। এমন কি ছোড়দার অন্য যতই দোষ গুণ থাকুক না কেন, তার রান্না ভুনি খিচুড়ি যে খাবে সে সারা জীবন তার পায়ের কাছে পড়ে থাকতে চাইবে।

কুশলদার মতে, যারা নাচ-গান করে, ছবি আঁকে, মূর্তি গড়ে, গল্প লেখে, কবিতা লেখে, তারা সব রকম রসের সমঝদার হয়। পশ্চিমের জগদ্বিখ্যাত অপেরা গাইয়েরা যেমনি অপ্সরা বিনিন্দিত কণ্ঠ, তেমনি হাতির মুখে চূণকালি দেওয়া দেহের গঠন। জ্যাকি-জিমি বলে দাদার কথা শুনেই সারা জীবন সুখে কাটিয়ে দেওয়া যায়। তাছাড়া দাদা শুকনো খোলায় চিঁড়ে ভাজার সঙ্গে চীনে বাদাম, ডালমুট, ছোলা ভাজা, ছোলার ডাল ভাজা, নুন, গোলমরিচ, পাতি লেবুর রস দিয়ে যে স্বর্গীয় খাদ্য নিজের হাতে বানিয়ে দেন, তারও তুলনা হয় না।

তার ওপর ঐ রকম কাজের মানুষ! কখন যে ঝুলি থেকে কোন নতুন খবর বের করে সবাইকে চমকে দেন তার ঠিক নেই। সেদিনও যেমন সকালে চা-টোস্ট ডিমসেদ্ধ খাবার পর, দাদা বলে বসলেন, 'মতি রে তুই এবার কিছু-কালের জন্য সারাদিন গঙ্গার ধারের দুনম্বর ঘাঁটি আগলা গিয়ে। রাতে যেমন আছিস, এখানে থাকবি। আমাকে জ্যাকি-জিমির সঙ্গে নিজের কর্মস্থলে কিঞ্চিৎ যাওয়া-আসা করতে হবে। ও, হ্যাঁ ভালো কথা। ঐ দুনম্বর ঠেলাগাড়ির হাফ শেয়ারটা আমি আমাদের ক্যান্টিনের নামে কিনে ফেলেছি। আমাদের আপিসের উকিলমশাই সব লেনদেনের ব্যাপারটা পাকা করে ফেলেছেন। ঐ যে নতুন নোটের তাড়া দিয়েছিল আমাকে, সেইটে দিয়েই দাম মিটিয়ে দেবার কথা ছিল। সেইভাবেই লেখাপড়া হচ্ছে, এ-কথা ওদের জানানোও হয়েছিল। অবাক কাণ্ড! তাই শুনে ওরা রাতারাতি ঠেলা নিয়ে হাওয়া হয়ে গেছে। কলকাতা শহর চুঁড়ে বেড়ানো হচ্ছে; গেলটা কোথায়? আমি নতুন ঠেলার ব্যবস্থা করেছি, মিঠে পান, কোল্ড ড্রিঙ্কস, আইসক্রীম, সন্দেশ এইসব থাকবে। আমার নতুন বইয়ের রয়েল্টি থেকে দফায় দফায় দাম শোধ হবে। বইটার মালিকানা ক্যান্টিনকে দিলাম। ছোট্কু, তুমি চার্জে থাকবে। পুরনো জায়গা ছেড়ে তক্তা-ঘাটের কাছে ক্যান্টিন বসবে। ওয়াচ এণ্ড ওয়ার্ডের লোকরা যেখানে থাকে। অবসর সময় ছবি এঁকো। আচ্ছা চলি। গিন্নিকে নাকি পুলিশে ধরেছে!'

এই বলে কুশলদা হাওয়া হয়ে গেলেন। এরা সব নানান জল্পনা-কল্পনা করে দিনের বেশির ভাগ সময় কাটাল।

সন্ধ্যেবেলা মন্টু-বলাই রোজকার মতো এসে আসর জমিয়ে বসল। তাদের কাছে কুশলদার ঐ শেষ কথাগুলোর মানে বুঝবার জন্য সকলেই মুখিয়ে ছিল। কিন্তু মন্টু বলাই তাদের হতাশ করল। ছোট্কু অর্থাৎ ছোড়দা এদিকে ভারি আনন্দে দিন কাটিয়েছিল। মন্টু-বলাই কাজ করেছে আর ছোট্কু তাদের সুদ্ধু দুটো ঠেলাগাড়ি আর গোটা আষ্টেক মানুষ খোদ্দের এবং দুটো খুদে নেড়ি কুত্তো আর একটা লোমশ চকড়া-বকড়া হুলো বেড়াল আর মাথার ওপর কেষ্টচূড়োর কয়েকটা ফুলভরা ঝুলো ডাল, রেলের লাইন, গঙ্গাতীর, মাঝিদের নৌকো, সবসুদ্ধ একটা মস্ত ঘি রঙের কার্ডবোর্ডের

টুকরোর ওপরে, রঙিন খড়ির সাহায্যে কাঁচা কাঁচা তুলে বসিয়ে দিয়েছে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করা যায় না। এমন কি নদীর জলে জোয়ার-ভাঁটা লাগার সময় সেই যে কেমন একটা কুলকুল গুব্‌গুব্ শব্দ হয়, যা শুনলে মনে হয় দুনিয়ার সব সুখ-দুঃখের কথা ঐ নদী বলতে চাইছে—একটু কান পাতলে বোধহয়, তাও শোনা যায়! ছবি দেখে সকলে বাক্যহত!

তারই মধ্যে দরজায় টোকা না দিয়েই জ্যাকি-জিমির সঙ্গে কুশলদার প্রবেশ। ঘরে ঢুকে খুদে চেয়ারে বসেই, একগাল হেসে বললেন, 'উফ্, যা একখানা দিন গেছে না! কাঁধে ঝোলা থলিটা নথিপত্রে ঠাসা। সেটি নামিয়ে রেখে কুশলদা বললেন, 'ওরে গরম চা আর নিমকি বিস্কুট আগে খাওয়া!'

সকলে নিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'বৌদিদিকে পুলিশে ধরেছিল। তার কি হলো?'

কুশলদা খুব হাসলেন, 'কি আবার হবে? সেখানকার বড়-কর্তাকে চোখে আঙুল দিয়ে তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন, কোথায় কি ময়লা জমেছে, বে-বন্দোবস্ত হচ্ছে, কারা টুলে বসে ঘুমোচ্ছে ইত্যাদি। সব অব্যবস্থা এবার দূর হবে!'

নয়

এরা সবাই পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে দেখে, কুশলদা প্রসন্নমুখে বললেন, 'ওরে, সব ভালো যার শেষ ভালো। আমাকে একেবারে হৃদয়হীন পাষণ্ড ঠাউরেছিস্ বুঝি তোরা? দেখিস্ শেষ পর্যন্ত সব ঘুঁটিগুলো বোর্ডের ওপর যার যেখানে স্থান, কেমন সুন্দর টপাটপ করে বসে যাবে। যার যা পাওয়া উচিত পেয়ে যাবে আর যা দেওয়া উচিত আদায় করে নেওয়া হবে। ততদিন একটু ধৈর্য ধরে থাক্।

আর দেখ্, কোনো সৎকাজ তো আর আপনা থেকে হয়ে যায় না। তার পেছনে খাটতে হয়, তবে সে না শেষরক্ষা হয়!'

অন্য শ্রোতারা থ' মেরে গেলেও ছোটকুদা খুশি হয়ে বলল, 'আমি তোমার পেছনে আছি, দাদা। কি করতে হবে বল, সাধ্যি থাকলে আমি তা করবই করব।'

কুশলদা তার পিঠ চাপড়ে বললেন, 'বাহবা, বাহবা! দেখিস্ কথা যেন ঠিক থাকে শেষ পর্যন্ত। কারণ সব কাজের মধ্যে যেটা সবচাইতে শক্ত, সেটা হলো নিজেকে তৈরি করা। পারবি তো?'

সকলের চোখের সামনে ছোটকুদার চেহারাটা কেমন বদলে গেল। মনে হলো মাথায় আধবিঘৎ বেড়ে গেছে; ছাতি যেন দেড়া। সে বলল, 'তুমি পথ দেখিয়ে দিলেই পারব।'

কুশলদা বললেন, 'লেখাপড়াতেও ফাঁকি দিলি কোনো পাস্-টাস্ দিলি নে; অমন ছবি আঁকার হাত, অমন চোখ! তার ওপর একটু পঠন-পাঠন দরকার তো?'

ছোটকুদা তেলো হাঁড়ির মতো মুখ করে বলল, 'কোনো ছবি আঁকার কলেজে আমাকে নেবে না। হায়ার সেকেণ্ডারি সার্টিফিকেট চায়; সুপারিশের চিঠি চায়। আমার অপমান লাগে।'

কুশলদা খুব হাসলেন, 'ওরে ঐটেও ছাড়তে হবে। মানটি আগে কুড়িয়ে আন্, তাপ্পর অপমানের কথা ভাবিস্ না হয়।

খোলাখুলি বল আমাকে সল্ট লেকের কাছে যে বিশাল ওপেন ইয়ুনিভার্সিটি হচ্ছে, সেখানে তোকে ভরতি করে দিলে, আপ্রাণ খাটতে এবং শিখতে প্রস্তুত আছিস্ কিনা?'

ছোটকুদার মতো তুখোড় ছেলে তাই শুনে একবার মুখটা হাঁ করল; তারপর কিছু না বলে বন্ধ করল; তারপর ভাঙা গলায় বলল, 'চে-চেষ্টা করব।' বলেই কপ্ করে মুখ বন্ধ করে এক দৌড়ে কুশলদার খুপরি ঘরে ঢুকে দুম করে দোর এঁটে দিল। অনুমতিও চাইল না।

কুশলদা হেসে ফেলে, জ্যাকি-জিমিকে বললেন, 'তোদেরও অন্য চাকরিবাকরি ছাড়িয়ে ঐখানে ভরতি করতে চাই। মায়ের কাছেই থাকবি। বারো ক্লাস পাস করে যে লাইনে যেতে চাস্, বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। তবে খেটেখুটে ভালো পাস করতে হবে। যাবি তো?'

ওরা বলল, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়।'

তারপর সবাই মিলে কুশলদাকে চেপে ধরল, 'দাদা, তুমি সক্কলের সব সমস্যা মিটিয়ে দিলে, কিন্তু বৌদিদি কি হাজতেই পচে মরবেন? তুমি কিচ্ছু করবে না?'

কুশলদা কপালে দু-চোখ তুলে বললেন, 'আমি কিছু করব? সাধ্যি থাকলে তো করব। শুনলাম হাজতের ইন্‌চার্জের হঠাৎ নার্ভাস ব্রেক-ডাউন হয়েছে। তিনি সিক্-লীভ্ নিয়েছেন।'

মতি পর্যন্ত রেগে গেল, 'তাহলে ঐ কুঁড়ের হদ্দ সেকেণ্ড অফিসার কি করছেন?'

'শুনলাম তিনি তাঁর আপিসঘরে দোর দিয়েছেন। ইন্টারকম্ পর্যন্ত তুলছেন না। তাঁর বেয়ারা একবার এক ফ্লাস্ক বরফ নিতে বেরিয়েছিল। সে দরজায় 'ডোন্ট ডিস্টার্ব' নোটিস ঝুলিয়ে দিল। তোর যখন এতই ভাবনা, যা না ওঁকে উদ্ধার করে আন্। আমি এদিকে ঘাঁটি আগলাচ্ছি।'

রেগেমেগে সত্যি সত্যি গেছিল একবার মতি। যদি কিছু করতে পারে। গিয়ে শুনল হৈ-হৈ কাণ্ড। সব দরজা-জানলা তক্‌তক্ করছে। সব জায়গায় উগ্র ফিনাইলের গন্ধ। বৌদিদির ছাড়পত্র কোন কালে এসে গেছে, তবু তিনি না-ছোড়-বান্দা। সমস্ত ঘরদোর মায় চানের ঘর, পাইখানা সাফ করতে ছোটবড় নির্বিশেষে পুলিস এবং হাজতবাসী সবাইকে লাগিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, এর শেষ না দেখে তিনি বাড়ি যাবেন না। তিনি সন্দেহ করেন অনেকের মাথায় উকুন আছে। সব কটাকে ন্যাড়া করাবার তালে আছেন।'

এই বিবরণ দিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর, মতি আবার বলল, 'দাদা, আমাকে মাপ করবেন। আমি ভাবতাম আপনি বৌদির বিষয়ে কিঞ্চিৎ নিষ্ঠুর। এখন আপনার সঙ্গে একটু একটু সহানুভূতি হচ্ছে।'

কুশলদা বললেন, 'তবেই বোঝ। শুনে বোধহয় খুশি হবে যে এদিককার মাদক দ্রব্যের চোরা-কারবারীরা লক্ষ লক্ষ টাকার মাদকদ্রব্য সুদ্ধু ধরা পড়েছে। কুড়ি জন লোক এখন ফাটকে! এ অঞ্চলের ও ব্যবসাটা একেবারে নির্মূল হয়েছে।'

মতি বলল, 'তাদের মধ্যে নিশ্চয় তোমার পেয়ারের ঐ পানওয়ালা ছোকরাও আছে?'

কুশলদা যেন আকাশ থেকে পড়লেন, 'কি যে বলিস্ মতি, তার ঠিক নেই। তাকে ছোটবেলায় কোথা থেকে দুষ্কৃতকারীরা ধরে এনে ফাই-ফরমায়েস খাটাত। অবুঝ দুরন্ত ছেলে, তাকে হাত করতে বেশি দেরি লাগেনি। সুখের বিষয়, তার পিঠের একটা জরুল দেখে তার আসল পরিচয় জেনে ফেলতে খুব বেশি দেরিও হয়নি। লোকে আমাদের তদন্ত বিভাগকে যতটা অপদার্থ মনে করে, আসলে কিন্তু ততটা নয়। সে যাই হোক, ওকে ধরেবেঁধে নিয়ে যেতে হয়নি। খুশিমনেই বিদ্যালয়ের বয়স্ক শিক্ষার ক্লাসে নাম লিখিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে চামড়ার কাজও শিখছে। এখন বাপ-মা কি বলেন দেখা যাবে।'

মতি কাষ্ঠ হেসে বলল, 'আচ্ছা সব তো বুঝলাম, দাদা। কিন্তু সেই সুন্দরপানা লালচে চুলওলা ছেলে দুটো তো হাজতের খুপরি ওয়েটিং-রুম থেকে নড়ছে না। দেড় দিন ধরে নাছোড়বান্দার মতো ঐঁটে বসে আছে। খাওয়া নেই, ঘুম নেই। বলি বাঙালীর ছেলের লাল চুল হবে কেন?'

কুশলদা অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'তা তো হতেই পারে। ওদের ঠাকুমার মা তো খাস ইংরেজ ছিলেন। হতভাগারা বে-আইনীভাবে ঠায় বসে আছে। মামার বাড়ি পেয়েছে নাকি? হাসছিস্ যে বড়?'

দু-পায়ে দাঁড়িয়ে গলা চেটে দিতে লাগল।

মতি ঘাবড়ে গিয়ে বলল, 'ইয়ে, না, এমনি। মানে গলাটা খুশখুশ করছিল কিনা।'

কুশলদা বললেন, 'অবিশ্যি সব ঘুঁটিগুলোই যে যার জায়গায় বসে যাচ্ছে। আমারই বা এখানে ঘাঁটি আগলাবার কি দরকার? তোদের অনেকগুলো কর্মী ভাগিয়ে নিলাম। কিন্তু তাতে তোদের কোনো অসুবিধাই হবে না, জানি। স্টক্ থেকে আরো কিছু দক্ষ কর্মী আমদানি করে ফেলিস্।—হ্যাঁরে, মন্টু-বলাই, তোদেরও কি বাড়ি থেকে খেদিয়ে দিয়েছে নাকি? এতক্ষণ ধরে বড় যে এখানে বসে আছিস্?'

অম্লানবদনে মন্টু-বলাই বলল, 'ভেবেছিলাম যে এর শেষ না দেখে উঠব না। তুমি চললে কোথায় দাদা?' দাদা বললেন, 'আমার চাকরি আছে না?' নিশ্চিন্ত মনেই কুশলদা আপিসে চলে গেলেন। জ্যাকি-জিমিও তাঁর সঙ্গে গেল। রোজকার মতো কুশলদার আপিসের একেবারে দোরগোড়া অবধি তারা সঙ্গে গেল। ক'দিনের এই পুরনো রুটিনটা তাদের জীবনটাকেই যেন পাল্টে দিয়েছে। বেঁচে থাকাটাই যে এত রোমাঞ্চময়, ওরা কখনো ভাবেনি। যেতে যেতে কুশলদা বললেন, 'আর দেখ্, সল্ট লেকের ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়মিতভাবে শরীরচর্চা করে, যোগাসন করে। তোরাও যোগ দিবি। দুর্বল শরীরে কোনো কাজ করা যায় না। দুর্বল মনেও না। নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে সব্বাইকে; অন্য লোকের পায়ে দাঁড়ানো যায় না। গুড্-বাই।'

এই বলে কুশলদা হাসিমুখে আপিসের ছোট দরজা দিয়ে ঢুকতে যাবেন, এমন সময় বাধা পড়ল। দরওয়ান কাদের যেন খুব ধমকধামক করছিল, স্যার এসেছেন টের পায়নি। জ্যাকি-জিমির যেন পায়ে শিকড় গজিয়ে গেছিল। চেষ্টা করলেও বোধহয় লড়তে পারত না। অবিশ্যি চেষ্টাও করেনি কেউ।

এর মধ্যে কুশলদা ডাক দিলেন, 'এখানে হচ্ছেটা কি? দরওয়ানজি।' কথাটা কানে যাবামাত্র সকলের চোখের সামনে ঐ সিংহবিক্রম দরওয়ান একেবারে কেঁচো বনে গিয়ে, দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়াল। আর ভিতর থেকে একজন চোখের নিচে কালিপড়া, ফরসা ভদ্রমহিলা দু-পাশে দুটি সুন্দর লালচুল ছেলে নিয়ে বাইরে এসে, কুশলদার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

কুশলদাও তিনজনকে আলগোছে জড়িয়ে ধরে বললেন, 'এসো, আমার ঘরে এসো।'

## দশ

সহৃদয় পাঠকরা যদি মনে করে থাকেন যে অসাধারণ মেধা-বলে, তাঁর জনপ্রিয় টিকটিকির গল্পের নায়ক যেমন কত সহজে ঘৃণ্যতম দুষ্কৃতকারীদের সব ষড়যন্ত্র ভণ্ডুল করে দিয়ে, তাদের সব্বাইকে সারি সারি কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেন, ঠিক তেমনি সহজেই দুনিয়ার যাবতীয় দুষ্কর্মের নিষ্পত্তি হয়ে যায়, তবে তাঁরা ভুল ভেবেছেন। এ বিরোধের বোধহয় শুরুও নেই, শেষও নেই। এর বেড়াজাল গোটা পৃথিবী জুড়ে পাতা আছে। এ যেন জোয়ার-ভাঁটার খেলার মতো। তীর থেকে সাগর যত আবর্জনা ধুয়ে নিয়ে যায়, মাত্র ছয় ঘণ্টা বাদেই তার তিন গুণ আবর্জনা আবার তীরে এনে ফেলে। যদি কারো ঘটে সুবুদ্ধি থাকে তাহলে সে ঐ আবর্জনাগুলোকে সময় থাকতে কুড়িয়ে নিয়ে, পরিশুদ্ধ করে আবার কাজে লাগায়। শুধু অসাড় বস্তুর বেলাই এ-কথা খাটে না। পোকা-মাকড়, মাছ, পাখি, জীব-জন্তু মায় মানুষ—সব কিছুরই দাম আছে, তবে সে দাম বুঝতে পারা চাই।

আমি গপ্পে মানুষ, বানিয়ে বানিয়ে নানা ঘটনা পাকাই, কিন্তু ঐসবই হলো গিয়ে অঙ্কের মতো ধ্রুব সত্য। এর নড়চড় দেখি না। অন্যায়ের জোয়ার নানা আকার ধরে, বারে বারে ফিরে আসে এবং আসবে আর দুনিয়ার কুশলদারা তার সামনে রুখে দাঁড়াবে। এ আমার মনের কথাও নয়, স্রেফ ছোট্কুদার ডাইরি

থেকে টোকা। আদিমকাল থেকে দুনিয়া জুড়ে যে অন্যায়ের সঙ্গে ন্যায়ের লড়াই চলেছে এ নাকি তারই একটা নতুন অধ্যায়!

তবে এর একটা বৈশিষ্ট্যও আছে। সেটি হলো এতে ছবিটাকে বিপরীত দিক থেকে দেখা হয়। সত্যর অন্য একটা রূপ। আয়নায় যেমন ডান দিকটা বাঁ দিকে আর বাঁ দিকটা ডাইনে দেখা যায়। সবই দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপার। কুশলদা গল্প লেখেন, তাই অন্য লোকের চোখে যা এড়িয়ে যায়, উনি তাও দেখতে পান। তিনি জানেন মধ্যিখানে দণ্ডী কেটে একদিকে ভালোদের, অন্যদিকে মন্দদের ভাগ করে দেওয়া যায় না। গণ্ডীতে ফুটো থাকে, তাই ইদিকের মানুষের উদিকে, উদিকের মানুষের ইদিকে নিত্য যাওয়া-আসা। দর্শকের কিঞ্চিৎ ধাঁধা লেগে যায়। তার জট ছাড়াতে গিয়ে যদি দৈবাৎ নিজের সঙ্গে নিজের মুখোমুখি দেখা হয়ে যায়, তাহলে আর দেখতে হবে না। গোটা পৃথিবীর চেহারা পাল্টে গেছে বলে মনে হবে।

এসব কথা লিখে, তার নিচে ছোট্‌কুদা আরো লিখেছিলঃ কুশলদার হাওয়া আমাদের মধ্যে যাদের গায়ে একবার লেগেছিল, তারা সবাই বদলে গেছিল। সল্ট লেকের ঐ মুক্ত বিদ্যানিকেতনটাকে আমার মনের নিবাস বলে মনে হতো। যতদিন মুখ্যু ছিলাম, দুনিয়ার বাইরের চেহারাটাই আমাকে পেয়ে বসেছিল। মনে হতো এই যথেষ্ট, এই যথেষ্ট। বিধাতা মচ্ছি ভেঙে যা দিয়েছেন, এই জল-মাটি-হাওয়া-ফল তৃণ-তরু আর বিশ্বরাচরের যত জীবজন্তু—এই যথেষ্ট। এর বেশি পেলে রাখব কোথায়?

এখন বুঝতে পারছি এসব তো শুধু চোখের সামনে ঝোলানো রঙীন পর্দামাত্র। এর পেছনে আলোর অনন্ত বিস্তার। এত কথা জেনেও কুশলদার দৃষ্টি কেমন করে ছোট ছোট খুঁটিনাটির ওপর পড়ে? সে রহস্যের সমাধান পাইনি।

সেদিন আরো পরে নিজের বাড়িতে ফেরার আগে কুশলদা সপরিবারে ক্যান্টিনে খেতে এসেছিলেন। বৌদিদি নিজের হাতে ঘি-ভাত আর মাছের মইলু করেছিলেন। তাঁর দুই ছেলে গৌতম আর রাহুল, কুশলদার অন্যমনস্কতার ভারি মজার মজার সব গল্প করল। একবার নাকি কার্যব্যপদেশে সিমলা গিয়ে, এয়ারপোর্ট থেকে কোনো মেমসায়েবের ব্যাগেজ ভুলে নিয়ে এসেছিলেন। এবং তার মধ্যে থেকে তাল তাল বে-আইনী সোনা বেরিয়েছিল। মালিকরা নো-পাত্তা। বাবার সব মালপত্রও বে-হাত হয়েছিল। কিন্তু তাতে তাঁর কোনো আপত্তি ছিল না। কারণ ডাইরিটি ছিল তাঁর পকেটে আর নতুন গল্পের ম্যানুস্ক্রিপট ছিল হ্যাণ্ড-ব্যাগে।

এই গল্প শুনে কুশলদা একটু হেসে মাথা চুলকে বলেছিলেন, 'ইয়ে—হ্যাঁ,তা বটে!'

আসলে যে কথাটা কেউ বুঝে উঠতে পারছিল না, সেটা হলো, হাবভাব আর খাতিরের বহর দেখে মনে হতো ঐ ব্যবসায়ীদের কোম্পানিতে উনি নিশ্চয় একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। তার ওপর এখন তো জানা যাচ্ছে যে নানা বেনামায় প্রকাশিত তাঁর দুঃসাহসিক অ্যাডভেঞ্চারের বইগুলি থেকে তাঁর একটা মোটা আয় হয়। বইগুলির স্বত্বাধিকারী তাঁর গিন্নি। তাঁর নামেই আয়কর বিভাগের দাবি আসে। বুড়ো উকিলমশাই সবটার তদারকি করেন। কোনো অজ্ঞাত কারণে কুশলদা তাঁকে রাঙা পিসেমশাই বলে ডাকেন, অথচ তাঁর গাত্রবর্ণ হলো ঘোর কৃষ্ণ।

এ রহস্যের ব্যাখ্যানও কুশলদা দিয়েছিলেন। তাঁদের আদিবাড়ি হলো মৈমনসিংহে। সেখানকার পারিবারিক সম্বোধনগুলি বিচিত্র এবং রহস্যজনক। বড়দা হলেন ঠাকুরদা, মেজদা হলেন ছোট ঠাকুরদা, সেজদা হলেন সুন্দরদা, ন'দা হলেন ধনদা, বাকি রইল ছোড়দা। সে হলো রাঙাদা। গায়ের রং যাই হোক।

ছেলেরা জিজ্ঞাসা করেছিল, 'বড়দা-ই যদি ঠাকুরদা হবেন, তাহলে সত্যিকার ঠাকুরদা অর্থাৎ পিতামহকে কি বলা হয়?'

কেন, 'বুড়া-ঠাকুরদা।' ব্যস্, সহজ সমাধান হয়ে গেল! এখন কথা হচ্ছে কুশলদার মগজে বুদ্ধি গজ্‌গজ্ করে। সেগুলো প্রকাশ পাবার পথ খোঁজে। তাই তাঁকে নানা রকম জনহিতকর কাজ করতে হয়। যেমন মাদক দ্রব্য নিবারণ। বেকার যুবকদের চাকরি যোগানদারি। আধামুখ্যুদের পড়ার ব্যবস্থা।

কুশলদাকে নিয়ে এতটুকু হাসি-তামাসা দুজন মানুষ সইতে পারত না। এক হচ্ছে মতি, আর অন্যজন বৌদিদি। তাঁর মধ্যে একটা আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা গেছিল। যেন মনের সামনে থেকে একটা পরদা সরে গেছে। কোথায় গেল তাঁর খুঁত-খুঁত স্বভাব? আজকাল তিনি দস্তুরমতো কুশলদার চ্যালা বনে গেছিলেন। এবং মজার কথা হলো যে কুশলদা তাতে এতটুকু সন্তুষ্ট নন। উনি বোধহয় তর্কাতর্কি করে নিজের বুদ্ধিতে শান দেবার চেষ্টা করতেন।

আজকাল ছুটির দিনে মন্টু-বলাইদের জুদো ক্লাবে গিয়ে কুশলদার ছেলেরা শরীরচর্চা করে। আট-দশ দিন পরপর ক্যান্টিনে সবাই মিলে খায়-দায়, আড্ডা দেয়। কুশলদা আপিস থেকে ফেরার পথে ওদের সঙ্গে জোটেন। নানারকম নতুন রান্নাবান্না উদ্ভাবন করেন।

কিছুদিন থেকে তাঁকে কেমন অন্যমনস্ক লাগছিল। মন্টু-বলাই মজা করে বলল, অবিশ্যি তাঁর সামনে নয়, অতটা বুকে পাটা ছিল না ওদের, 'সম্ভবতঃ কিছুই হয়নি। মনে মনে ঝগড়া ভাঁজছেন।' সবাই তো হাঁ, সে আবার কি? 'কেন, উনি ভাবছেন অমুক যদি আমাকে হেনাতেনা বলে, তাহলে আমিও তাকে এই-এই বলব। তখন তার মুখখানা দিস্ কাইণ্ড অফ স্মল্ হয়ে যাবে, ঠিক হবে। মুস্কিল হচ্ছে, ঐসব কথা কেউ তাঁকে বলতে আসছে না আর অমন ভালো ভালো চ্যাটাং চ্যাটাং জবাবও কাউকে দিতে পারছেন না।'

মতি ছাড়া সকলে কথাটা খুব উপভোগ করলেও, মতি বলল, 'কি জানি, আজ আমার কিন্তু বেশ ভাবনা হচ্ছে। আশা করি দাদার কোনো বিপদ-আপদ হয়নি।'

গোড়ায় সকলে হেসেছিল; বলেছিল, 'যে দাদার ভয়ে বিপদ পিট্টান দেয়, সেই দাদাই কোনো বিপদে পড়বেন! কি যে বল মতিদা। আরেকবারও তো গা-ঢাকা দিয়েছিলেন। কই, তখন তো কিছু বলনি?'

মতি চুপ করে রইল। আরো রাতে একবার কোথা থেকে ঘুরে এসে বলল, 'দাদার আপিসেও তো কেউ কিছু জানে না বলে মনে হলো। নাকি আজ আপিসেই যাননি! কোনো খবরও দেননি। দাদাকে বাদ দিয়ে আমাদের কি করে চলবে বলদিকিনি?' এই বলে উঠে পড়ে ভিতরের ঘরে ঢুকে মতি দোর দিল। সেদিনের আসর ভেঙে গেল। মন্টু-বলাই চটে গেল, 'কি জ্বালা! দুর্ভাবনা জিনিসটা দেখছি বড্ড ছোঁয়াচে। যে মানুষটা সর্বদাই প্রাণ হাতে করে ঘুরে বেড়ায়, তার জন্য আবার দুশ্চিন্তা কিসের! মেকি টাকার মতো ঘুরেফিরে আবার আমাদের হাতে এসে যাবে ঠিক। কিন্তু মন যে মানে না, কি করি! ও মতিদা, এখন বাড়ি না গেলে মায়ের ফিটের রোগ ধরবে। এই টেলিফোন নম্বরটা দিয়ে গেলাম। যখনই হোক, যে-ই ধরুক, আমাদের নাম করলেই ডেকে দেবে।'

মতি দোকানের ঝাঁপ তুলে, দরজা এঁটে বাইরের ঘরে সেই অনেক দিন আগের মতো শুয়ে পড়ল। কুশলদা মাসখানেক আগে পথ থেকে একটা সাদা-কালো নেড়িকুত্তোর বাচ্চা কুড়িয়ে এনে পুষছিলেন। তাঁর সঙ্গে শুত; পায়ের কাছে বসে খেত। কোথাও এতটুকু সাড়া পেলে ডেকে জানান দিত। কুশলদা বলেছিলেন, 'ও আমাদের গার্ড-ডগ্। লোকে

নেড়িকুত্তো বলে যাদের ঘেন্না করে, তারা এতটুকু আদর-যত্ন পেলেই সেরা পাহারাদার হয়ে ওঠে। এক কান খাড়া করে ঘুমোয়। ওর নাম রাখা যাক "এইয়ো"।' আজ মতির এই দুর্ভাবনার সময়ে এইয়ো আস্তে আস্তে ওর হাঁটু বেয়ে কোলে উঠে দু-পায়ে দাঁড়িয়ে গলা চেটে দিতে লাগল। যেন বলছে 'ভয় কি! আমি তো আছি!' মতির মনের বল ফিরে এল। সে এইয়োকে পাশে নিয়ে ক্যাম্পখাটে শুয়ে পড়ল।

ভোরে কুশলদার আপিস থেকে কেউ ফোন করে জানাল যে খিদিরপুর ডকের কাছে গুরুতর আহত অবস্থায় কুশলদাকে পাওয়া গেছে। এখন তিনি হাসপাতালে আছেন। চব্বিশ ঘণ্টা না গেলে কিছু বলা যাচ্ছে না। কাউকে ধরাও যাচ্ছে না, কারণ জ্ঞান ফিরলেও মুখে কুলুপ এঁটে আছেন। তার কারণ বুঝতে মতির এক মিনিটও সময় লাগেনি। আততায়ীর মুখ দেখতে পাননি নিশ্চয়; যেহেতু পিছন থেকে ছোরা মেরেছিল। কুশলদা লম্বা মানুষ; তাই সে ছোরা হৃৎপিণ্ডে পৌঁছয়নি। ফুসফুস জখম হয়েছে, প্রচুর রক্তপাত হয়েছে। একটা শোরগোল হয়ে থাকবে; ফলে আততায়ী ভেগেছে।

কুশলদা যে প্রাণে বেঁচেছিলেন সেই যথেষ্ট। তবে ঐ অটুট স্বাস্থ্যে চিড় ধরেছিল এখন একটু বেশি পরিশ্রম করলেই হাঁপ ধরে যায়।

আপিসের কাজে ইস্তফা দিতে চেয়েছিলেন। ভারত সরকার নারাজ। ফলে তাঁর পদোন্নতি হয়েছে। বাইরে দূরে ঘুরে বেড়ানো বন্ধ। তবে তাঁর উত্তরাধিকারী কে হবে?

কে আবার? যাদের তিনি বছরের পর বছর ধরে তিলে তিলে মানুষ করেছেন, তাদের মধ্যেই একজন নিশ্চয়। সিংহাসন কখনো খালি থাকে না। এক রাজা চোখ বোজার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উত্তরাধিকারী রাজা হয়। এ-ও অনেকটা তাই। তবে বিভাগীয় ব্যবস্থাপক সভা ছাড়া কেউ কারো নাম জানে না। এইয়ো হয়তো গন্ধ চেনে।

মোট কথা, রাজনীতিই কর আর মন্ত্রীপদেই বসে থাক; গোটা গোটা রাজবাড়ির মতো বাড়িতে, সশস্ত্র প্রহরীবেষ্টিত হয়ে নিরাপদে বাসই কর যেখানেই যাবে ফুলের মালা দিয়েই ভূষিত হও আর লম্বা লম্বা গাড়ি চড়ে সভায় বসে দেশশাসন কর আর যাই কর—সকলেরই মনে রাখা উচিত যে একদল স্বার্থত্যাগী, অকুতোভয় কর্মী নিজেদের নিরাপত্তা তুচ্ছ করে, অন্তরাল থেকে এসবকে সম্ভব করে তোলেন। আমি তাঁদেরই আদর্শ দেশপ্রেমিক বলি। কুশলদা তাঁদের প্রতীক। এইয়ো তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে শান্তিরক্ষা বিভাগেও বহু বিশ্বাসঘাতকতা নিষ্ঠুরতা চলে থাকে। মানুষের সংসারে হয়তো চিরকাল তাই হয়ে আসছে, সেই আদম আর হবার সময় থেকেই।

কুশলদা এখন সল্ট লেকের পুনর্বাসন কেন্দ্রের অধিকর্তা। সকলে বলে ওঁর হাস্যময় মুখখানি দেখলেই, দর্শকের মনের মলিনতা খসে পড়ে। ক্যান্টিনে বলাই-মন্টু বসে। ঠেলাগাড়ির ব্যবসার অন্য মালিক। মাসে একবার সকলে ক্যান্টিনে জমায়েত হয়। কুশলদা রাঁধেন। কিন্তু তাঁর পুরনো পদে, মোড়ের মাথায় আপিসে কে বসে? কেন, যাকে তিনি এতকাল ধরে পাখিপড়া করে তৈরি করেছেন। যার ডাক নাম মতি। ভাল নাম বলা বারণ।

ছবি: রাহুল মজুমদার

# এককড়ির তীর্থদর্শন

কমল লাহিড়ী

এককড়ি পূজারীর নামডাক ভারি
ঠাকুরের মন্দিরে খায় গড়াগড়ি।
পয়সাকড়ির দিকে মন নেই মোটে,
হাসি মুখে হাতে নেয় যা যখন জোটে।

কেউ দেয় খই মুড়ি–কেউ দেয় দই,
ফলাহারী এককড়ি নাচে থৈ থৈ।
খোল করতাল নিয়ে ঠাকুরের কাছে
দিন-রাত নামগান করে আর নাচে।

সেই এককড়ি তার সেবা কাজ ছেড়ে–
একদিন পাড়ি দিল, তীর্থের ফেরে।
গয়া-কাশী-পুরীধাম আর বৃন্দাবন,
সব দেখে মন খুশি, জুড়াল নয়ন।

সবতীর্থ দেখা শেষ, শ্রান্ত এককড়ি–
এবার ফিরতে চায়, ছেড়ে আসা বাড়ি।
বিপত্তি তখনি ঘটে ফেরার বেলায়
পরিচিত পথঘাট অচেনা দেখায়।

কে যেন কানের কাছে, আধ আধ স্বরে
বলে যায়, এককড়ি চিনলি না মোরে!
আমি যে তোরই কাছে থাকি সারাক্ষণ,
প্রয়োজন ছিল না তো তীর্থ দরশন।

দৈববাণীর মতো সেই কথা শুনে
এতদিনে ভুল ভাঙে কাঁদে মনে মনে;
দুই হাত যুক্ত করে আকুল নয়নে–
এককড়ি বলে, প্রভু রেখ শ্রীচরণে।
সারাটি জীবন যেন, তোমারই সেবায়
দেহ মন প্রাণ মোর পূর্ণতা পায়।

ছবি: সুফি

# চিতার কবল থেকে

## সুকুমার ভট্টাচার্য

তাহলে আসুন, দুজনে একটু বসা যাক এখানে। তারপর বলব, কেন আমি ছাগলটা বিক্রি করব না আপনাকে। হ্যাঁ, ওই ছাগলটা—ওই যে—যেটা গলায় পেতলের গয়না পরে ঝুমঝুমিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখতে পেয়েছেন তো? হ্যাঁ ওটার কথাই বলছি। আর ওই যে ছোট্ট কুকুরটা—হাঁ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে একভাবে—ওটাকেও দেব না। তা সে আপনি পাঁচ বা পঞ্চাশ যত টাকাই দিতে চান না কেন?

যদিও ওটা রাস্তার কুকুর। আমি কোনোদিনই ওটার মালিক ছিলাম না। তবু। আমার অবস্থা তো দেখছেন, নিতান্ত গরিব মানুষ। এই লাঠি, টুপি আর গায়ে দেবার কালো কম্বলটা ছাড়া আর কিছুই নেই আমার। হিমালয়ের পথে পথে ঘুরেই আমার জীবন গেল। যদিও এক রাত্তিরের বেশি কোনোদিন কাটাইনি কোথাও।

সিগারেট দিচ্ছেন? দিন। আপনার অসীম অনুগ্রহ। বাঃ, এ যে দেখছি বেশ কড়া জাতের। ভাল ভাল, খুব ভাল। তা বসবেন কোথায়? এই পাথরটার ওপর বসতে কি খুব কষ্ট হবে? আচ্ছা দাঁড়ান, ওই ফার্ন গাছটার একটা ডাল কেটে এনে পেতে দিই এটার ওপর। তাহলে আর অসুবিধে হবে না বসতে।

এখন উল বুনতে বুনতে আপনার সঙ্গে কথা বলব আর নজর রাখব আমার ভেড়া-ছাগলগুলোর ওপর। না, ওরা দূরে কোথাও পালাবে না, সব এখানেই থাকবে। আসলে এখানকার ঘাস খুব মিঠে। হয়তো মাটি ভিজে বলেই। তাই এখানটায় চরে বেড়াতে ওরা খুব ভালবাসে। তাছাড়া এখানকার রডোডেনড্রনগুলোকে লক্ষ্য করে দেখেছেন? অন্য সব জায়গার তুলনায় অনেক বড় নয়? দেখুন না, কেমন দৈত্যের মতো মাথা উঁচিয়ে রয়েছে নীল আকাশের দিকে। বুক ভরে নিঃশ্বাস টেনে দেখুন—একটুও নোংরা গন্ধ পাবেন না। বিশেষ করে বাজার অঞ্চলের কোনো গন্ধই পাবেন না। আর চার পাশটা লক্ষ্য করে দেখুন—পাহাড় ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়বে না।

কোকরিঘাট থেকে যেদিন চিরকালের জন্যে বেরিয়ে পড়ি, সেদিনটাও ঠিক এমনি ছিল। গরিব লোক আমি। জিনিসপত্তর নেবার বলতে আর কিই বা ছিল আমার? কিছু গুড় আর নুন। তা সেগুলো আগেই ভরে রেখেছিলাম ঝোলাতে। ছাগল-ভেড়ার পিঠে চাপিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম বাড়ি থেকে। চড়াই উৎরাই আর গ্রাম পেরিয়ে হাঁটতে শুরু করেছিলাম হিমালয়ের পথে পথে।

না না, তা বলে ভাববেন না আমি নিঃসঙ্গ। আমি একেবারে একলা। পথ চলতে কত লোকের সঙ্গে দেখা হয়। গল্প করি তাদের সঙ্গে। বাজারের যে রাস্তাটার দুপাশে ফল আর গয়নাগাঁটির দোকান, ওরা সবাই আমার চেনা। যখন যাই, তখন কথা বলি তাদের সঙ্গে। এমনকি বাজারের পেছন দিকটায় যারা বসে, তারাও আমার অপরিচিত নয়। তাদের কেউ বেচে শিরাজ কম্বল, উল, কাশ্মীরী সিল্ক। কেউ কেউ বা আমেদাবাদ আর কানপুর থেকে আনে সুতির কাপড়চোপড়। জয়পুরের পেতল বাসনও বিক্রি করে কেউ কেউ। তাদের সকলের সঙ্গে আমার পণ্য বিনিময় হয়। ওখানকার মেয়েরাও কেউ আমার অচেনা নয়। কেউ কেউ আবার আমাকে গেঁও বলে। এটা সেটা নিয়ে মস্করা করে। আমি কিছু বলি না, হাসি।

ও হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, আমার বউ ছেলেমেয়েও ছিল। ছিল রীতিমতো সাজানো গোছানো সংসার। কিন্তু এক সময় কোকরিঘাটে এমন এক মড়ক এল যে—

ছাগল-ভেড়ার এই যে পাল দেখছেন সামনে, এখন এদের নিয়েই আমার সংসার। শুনতে অদ্ভুত লাগছে তাই না? কিন্তু

কি আর করা যাবে? পেতলের ঘণ্টা বাঁধা ওই ছাগলটা দেখছেন, ওটা আর ওই বেঁটে গুড়গুড়ে কুকুরটা, ও দুটোই সবথেকে পুরনো। ওদের নিয়ে এমন সব দুর্গম পথে গেছি যে, সেখানে উট নিয়েও কোনো ব্যবসায়ী পৌঁছতে পারেনি। কেন যাব না? এদিকে বাঁধা আমার ওই কুকুরদুটো লক্ষ্য করেছেন? একেবারে বাঘের মতো। কোনো অচেনা মানুষ যদি হঠাৎ ওদের সামনে পড়ে, তাহলে আর রক্ষে নেই। জান নিয়ে নেবে। আর সেইজন্যেই, আপনি হঠাৎ সামনে এসে পড়াতে ডেকে বসিয়েছি। বড় কথা হলো, আমার ডাকে সাড়া দিয়ে আপনিও এসে বসেছেন। নাহলে একটা কেলেংকারি ঘটে যেতে পারত।

ওই যে উঁচু পাহাড়টা দেখছেন? ওই যে–যেখানে নীল আফিম গাছগুলো তাদের ডালপালা ছড়িয়ে হাওয়ায় দুলছে। সেদিন আমি ওখানে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। সে সময় ওই ছোট্ট কুকুরটা আমার দলে আসেনি। তখন ওই শিকারী বাঘা দুটোই থাকত আমার সংগে। কোথা থেকে হঠাৎ একটা ঢিল এসে আমার পাশে পড়েই গড়িয়ে গেল নিচের দিকে। কি হলো? চোখ ফেরাতেই দেখলাম, এক পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের ছোকরা। পরনে খাকি প্যান্ট শার্ট। ছাগলের মতো গুঁড়ি মেরে পাহাড় বেয়ে উঠে আসছে আমার দিকে। তার পেছনে তার আর্দালি। তার হাতে রাইফেল আর কার্তুজের ঝোলা ব্যাগ। না জানি কে? তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে অভ্যর্থনা জানালাম তাকে।

'আরে তোমাকে ধরবার জন্যেই আমি পিছু পিছু ছুটে আসছি।' বলতে বলতে সে ছোকরা সামনে এসে দাঁড়াল। 'কোকরিঘাটের মোড়ল বলল, তুমি নাকি ছাগল বিক্রি কর। কিছুদিন হলো একটা চিতা এ অঞ্চলে খুব উৎপাত শুরু করেছে। কয়েকজনকে বেশ ঘায়েলও করেছে। পাকাপোক্ত মানুষ-খেকো হয়ে ওঠার আগে শয়তানটাকে খতম করা দরকার। তুমি একটা ছাগল দাও, যেটা বেশ ডাকবে। আমি সেটাকে টোপ হিসেবে গাছের নিচে বাঁধব।'

'সত্যিকারের এই যদি কারণ হয়, তাহলে ছাগল দেব।' বললাম আমি।–'যদিও দেবার মতো তেমন নেই উপস্থিত।'

'কিন্তু মনে থাকে যেন, ডাকবে এমন ছাগলই আমার দরকার। এমন দিও না, যে কেবল মাচার তলায় বসে খাবে, আর নাক ডাকিয়ে ঘুমোবে সারারাত।'

'ঠিক অমন ধরনেরই একটা আছে।' বলে ওই পেতলের গয়না পরা ছাগলটাকে দেখিয়ে দিলাম। পাহাড়ের কিনারে দাঁড়িয়ে ওটা তখন গুঁতোগুঁতি করছিল সংগীদের সংগে। ইয়া লম্বা লম্বা লোম, সূর্যের আলোয় ঝকমক করছিল তখন।

'বেশ কয়েক বছর ওটা আছে আমাদের সংগে। ওটাকে যদি নিয়ে যান, সংগছাড়া হয়ে নিশ্চয় ওটার মন খারাপ হবে। হাঁকডাক ফেলে দেবে মাচার নিচে। ফলে চিতাটা যত দূরেই থাক, ওর ডাকে এসে দাঁড়াবে আপনার রাইফেলের সামনে।'

'ঠিক আছে। তাহলে ওটাই নেব।' এক কথায় রাজী হয়ে গেল ছোকরা। একে উঠতি বয়েস, তায় শিকারে উৎসাহী। মেজাজ একেবারে শরীফ। জিজ্ঞেস করলে 'এবার বল, কত দিতে হবে ওটার জন্যে। নিশ্চয় খুব একটা বেশি নয়। তেমন কচি বয়েসের নধর একটা কিছু হলে না হয় কথা ছিল।'

দর কষাকষি চলল কিছুক্ষণ।

শেষে বললাম, 'না বাবু, অত কম দামে আমি দিতে পারব না। তুমি বরং তোমার কুকুরটাকে মাচার তলায় বাঁধো।'

বলে তার পিছু পিছু ছুটে আসা কুকুরটাকে দেখিয়ে দিলাম। 'দুবেলা দু-মুঠো পেটে দেবার জন্যেই এ কাজ করি। ঠিক ঠিক দাম না পেলে আমার চলবে কেন?'

ছোকরা এবার পিছু ফিরে দেখল কুকুরটাকে। বলল, 'ওটা আমার কুকুর নয়। রাস্তার বেওয়ারিশ জীব। বোধহয় একটা মালিক খুঁজে বেড়াচ্ছে। গ্রাম থেকে রওনা হবার সময় আমার পিছু নিয়েছে। ইচ্ছে করলে এখুনি একটি গুলিতে শেষ করে দিতে পারি। কিন্তু তাতে আমারই ক্ষতি। রাইফেলের আওয়াজ শুনতে পেলে চিতাটা হয়তো তল্লাট ছেড়ে পালাবে। আজ রাত্রের সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে যাবে।'

'তাহলে ওটাকে কোথাও বেঁধে রাখো।'

'অনেক চেষ্টা করেছি, ধরতে পারিনি। ব্যাটা বাঁদরের থেকেও চটপটে। ধরতে গেলেই পালাচ্ছে অথচ পেছনে আঠার মতো লেগে আছে। যদিও মনে করি, ওটা এক সময় ওর নিজের গ্রামেই ফিরে যাবে।'

ছোকরা একটা ঢিল কুড়িয়ে নিতে গেল মাটি থেকে। আর তাই দেখে লেজ গুটিয়ে দৌড় দিল কুকুরটা।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত দিয়েই দিলাম ছাগলটা। আসল দাম যা, তার থেকে একটু বেশিই পেলাম। মুখে এমন একটা ভাব দেখালাম যেন দামটা মোটেই মনঃপূত হয়নি। ছোকরা বিদায় হলো। তার আর্দালি ছাগলটাকে তাড়িয়ে চলল পিছু পিছু। আমার আরসব ছাগল-ভেড়াগুলোর ঘাস খাওয়া শেষ হলে, আমিও পাততাড়ি গুটোলাম। রওনা হলাম সেখান থেকে।

মাইল খানেক যাবার পর বড় রাস্তার ওপর একটা ফসল কাটা ক্ষেত চোখে পড়ল। চারপাশটা কাঁটা গাছের বেড়া দিয়ে ঘেরা। এ ধরনের জমির মালিকরা আমাদের খুব পছন্দ করে। পশুর পাল নিয়ে আমরা যদি তাদের জমিতে একটা রাত কাটাই, তাতে তাদের জমির উর্বরতা বাড়ে। জমিতে সার দেওয়ার কাজটা আমার পশুরা আপনা হতেই করে দেয়। আপনি যখন এ অঞ্চলে ঘুরছেন, তখন এমন জমি নিশ্চয় আপনার চোখে পড়েছে।

সন্ধ্যে হয় হয় সময়। লক্ষ্য করে দেখলাম, কাঁটা গাছের বেড়াটাও বেশ মজবুত। ঠিক করলাম পশুগুলোকে নিয়ে সেখানেই রাত কাটাব। তারপর আকাশে ভুটিয়া তারা দেখা দিলেই রওনা হয়ে পড়ব।

চিতা বাঘের কথাটা মনে এল। তা বলে যে খুব ভাবনায় পড়লাম এমন নয়। সংগে আমার দু-দুটো বড় জাতের শিকারী কুকুর। কিসের ভয়? যদিও শুনেছি শয়তানটা এ অঞ্চলেই উৎপাত করে বেড়াচ্ছে। অথচ এ বয়েসে সেই কথাটা আমার অজানা নয় যে, ভয়ই মৃত্যুকে কাছে ডেকে আনে। যে কারণে ভয় পাওয়াটা মোটেই কোনো কাজের কথা নয়।

সুতরাং কাজে লেগে গেলাম। বেড়াটার যে জায়গাগুলো একটু কমজোরী বলে মনে হলো, সেগুলো মেরামত করে নিলাম। অন্য জায়গা থেকে ডালপালা কেটে এনে চাপিয়ে দিলাম জায়গাগুলোতে। মশাল বানাবার জন্যে কেটে আনলাম

একটা পাইন গাছের ডাল। সারারাত আগুন জ্বালাবার জন্যে জড় করলাম শুকনো কাঠকুটো। তারপর দুটো শিকারী কুকুর আর পশুগুলোকে নিয়ে ঢুকে পড়লাম চৌহদ্দির ভেতর। শক্ত করে বন্ধ করে দিলাম আগড়টা।

অন্যদিনকার মতো কুকুর দুটোর বাঁধন খুলে দিতে গেলাম। যাতে ওরা ওদের ইচ্ছেমতো জায়গায় বসে নজর রাখতে পারে পশুগুলোর ওপর। কিন্তু তারপরই মনে হলো, না। সেটা ঠিক হবে না। ক্ষেতি জমিটা একেবারে বড় রাস্তার ওপর। হঠাৎ কোনো মানুষ ধারে কাছে এসে পড়লে আর রক্ষে থাকবে না। চোর ডাকাত সন্দেহ করে কুকুর দুটো তখনি ঝাঁপিয়ে পড়বে।

এ ধরনের সাত পাঁচ কথা ভেবে, ওদের গলার চেন আর আলগা করলাম না। পশুগুলোকে জমির মাঝখানে রেখে কুকুর দুটোকে দুদিকে বেঁধে দিলাম। আর একদিকের বেড়ার ধার ঘেঁষে আমি নিজে রইলাম। চারপাশ ঘিরে রইল কাঁটাগাছের বেড়া। ফাঁকা রইল শুধু একটা দিক। তেমন তেমন হিংস্র জানোয়ার যদি এসেও পড়ে, তাহলে সেটা আসবে ওই ফাঁকা দিক দিয়েই।

নিজে যেখানটায় থাকব ঠিক তার পাশেই আগুন জ্বাললাম। তারপর চাপাটি তৈরি করে দুধ আর মাখন সহযোগে রাতের খাওয়া খেয়ে নিলাম গরম গরম।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডাও বাড়ছিল পাল্লা দিয়ে। চাঁদ ওঠার আগে পর্যন্ত চারদিকে কালিগোলা অন্ধকার। শুধু মশাল আর চুল্লির আলোয় একটা রহস্যময় আলো-আঁধারির খেলা। কম্বল জড়িয়ে শুয়ে পড়ার আগে উঠে দাঁড়ালাম। একবার চারদিক ভাল করে নজর বুলিয়ে নেওয়া দরকার। বলা যায় না, আলোছায়ার আড়ালে হয়তো কোনো মহাপ্রভু গা-ঢাকা দিয়ে আছে।

ছোকরা শিকারীকে যে ছাগলটা দিয়েছি সেটার ডাক শোনার জন্যে কান পাতলাম। কিন্তু না, কোনো ডাকই কানে এল না। শুধু আমার কুকুর দুটোর চেনের নড়াচড়া আর পশুগুলোর গলার ঝুমঝুমির ঠুনঠান ছাড়া আর কিছুই কানে এল না।

সেই ছাগলটার না ডাকার কারণ আমি পরে বুঝতে পেরেছিলাম। শিকারী ছোকরাটা একেবারে আনকোরা, কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। তাই ছাগলটাকে মাচার নিচে বেঁধে, পরে বাবু ওপরে উঠেছিল। ভেবেছিল, ছাগল যেমন ডাকে, তেমনি ডাকবে, আর চিতাটা গুটি গুটি এসে হাজির হবে সামনে। তার উচিত ছিল, ছাগলটার অলক্ষ্যে মাচার ওপর ওঠা। তারপর কাউকে দিয়ে টোপটা বাঁধিয়ে নেওয়া। ছাগলটা ডাকেনি, তার কারণ সে তো জানে মাচার ওপর মানুষ আছে। অতএব নিশ্চিন্তে ঘাড় গুঁজে সেটা ঘুমোতে শুরু করেছিল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না, আমার কুকুর দুটোর ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম। আমার জ্বালা আগুন আর মশাল ততক্ষণে নিভে গেছে। সুন্দর চাঁদের আলোয় ধবধব করছে চারদিক। দেখলাম, বেড়ার যে জায়গাটা একটু খারাপ ছিল, ডালপালা দিয়ে যে জায়গাটা আড়াল দিয়েছিলাম, সে জায়গাটা নড়ছে। বাইরে থেকে কোনো একটা জানোয়ার ভেতরে আসার চেষ্টা করছে।

সত্যি কথা বলতে কি, রীতিমতো ভয় পেয়ে গেলাম।

সেদিনকার বোকামির কথা ভাবলে এখন লজ্জা লাগে। আমি, মানে একটা সুস্থ সবল মানুষ, জাগ্রত অবস্থায় হাতে অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে, বাঘের মতো দু'দুটো শিকারী কুকুর, হলোই

আসুন একটু বসা যাক

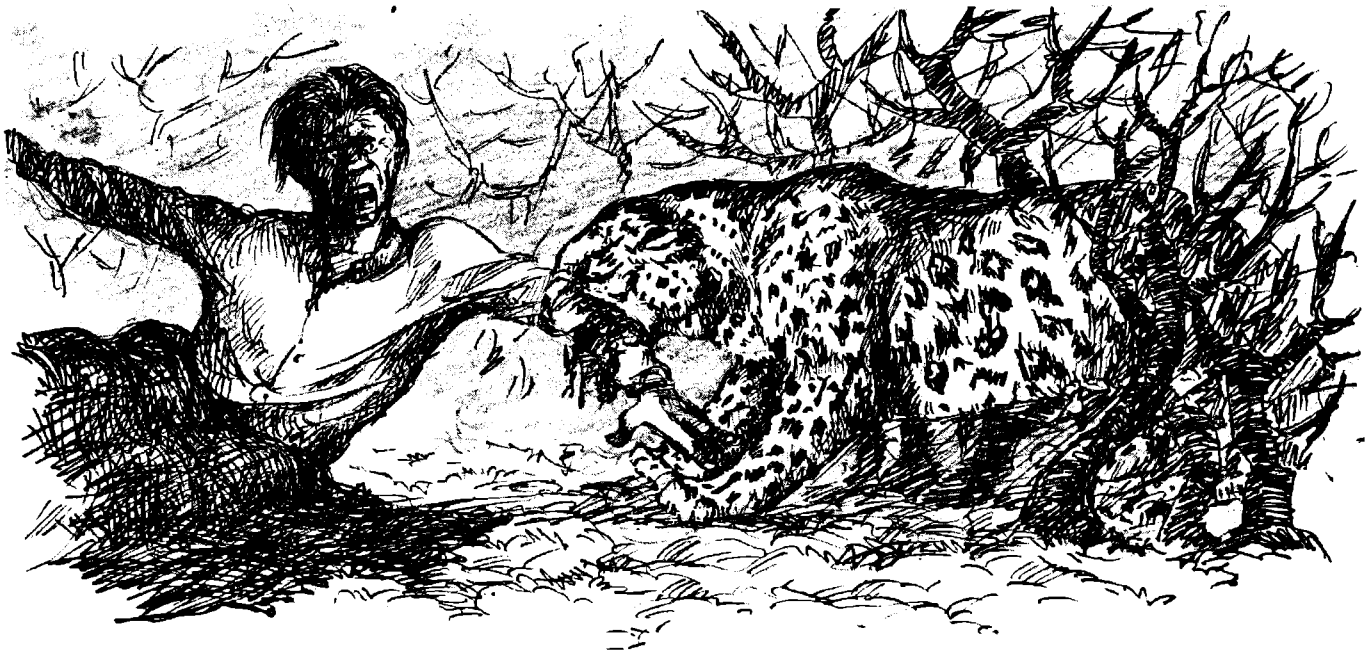

আমাকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে বাইরে।

বা চেন দিয়ে বাঁধা। তাতে কি হয়েছে, চিৎকার করছে গলা ছেড়ে, আর আমি কি করছি ? না একটা ছায়ার নড়নচড়ন দেখে ভয়ে কাঁপছি থরথর করে।

পরে ভেবে দেখেছি, এর পেছনে সেই ছোকরা শিকারীর মন্তব্যটা কাজ করছিল। সে বলেছিল, 'পাকাপোক্ত মানুষ-খেকো হওয়ার আগেই চিতাটাকে খতম করা দরকার।'

শিউরে উঠলাম। শুকিয়ে গেল অন্তরাত্মা।

ছুটে গিয়ে আমার কুকুর দুটোর চেন খুলব, এমন সময় বেড়ার ফাঁক গলে জানোয়ারটা ঢুকে পড়ল ভেতরে। দেখলাম চিতা নয়, সেই বেওয়ারিশ কুকুরটা। ছোকরা শিকারীর পিছু পিছু যেটা গ্রাম থেকে চলে এসেছিল।

আজ মুখ ফুটে এ কথা বলতে লজ্জা করে। তবে কি জানেন, চাঁদের আলোয় এসব জায়গায় এমনিই হয়। ছায়ার নড়াচড়ার মধ্যে মানুষ অনেক বিভ্রম দেখে। আমার নিজেরই একবার একটা বেড়ালকে বাঘ বলে মনে হয়েছিল।

চারপাশে প্রচুর পাথর পড়েছিল। ইচ্ছে করলে ছুঁড়ে আপদটাকে জমির বার করে দিতে পারতাম। কিন্তু ভয় পাওয়ার জন্যে নিজে এত লজ্জা পেয়েছিলাম যে, কুকুরটাকে তাড়াতে মন চাইল না। ভাবলাম, ওটাও তো আমার মতো ভয় পেয়েছে। আসুক, ভেতরেই আসুক। হাতের অস্ত্রটা ফেলে দিতেই কুকুরটা লেজ গুটিয়ে কুঁই কুঁই করতে করতে সামনে এসে দাঁড়াল।

এরপর যা করলাম, তা বিশ্বাস হবে না আপনার। এরপর ভাল করে খাওয়ালাম কুকুরটাকে। হ্যাঁ, আমার নিজের খাবার, সকালের জন্যে যা রেখে দিয়েছিলাম, সব তাকে ধরে দিয়ে, কম্বল জড়িয়ে শুয়ে পড়লাম। অনেক পরে খাওয়া সেরে কুকুরটা আবার আমারই কম্বলের ভেতর ঢুকে পড়ল। শুয়ে পড়ল আমার গা ঘেঁষে। গায়ে গা লাগতে দেখলাম, ঠাণ্ডায় সেটা তখনও কাঁপছে থরথর করে।

কিছু পরে দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

কতক্ষণ পরে জানি না, হঠাৎ কিসের আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল। পরে পরেই প্রচণ্ড গর্জন করে একটা জানোয়ার কামড়ে ধরল আমার হাতটা। কুকুরটা যেখান দিয়ে ঢুকেছে, সেখান দিয়ে মুখ গলিয়ে কামড়ে ধরে, আমাকে টেনে নিয়ে যেতে চাইছে বাইরে। ভেতরে ঢোকেনি শুধু শিকারী কুকুর দুটোর ভয়ে। সে জানে বাঘা দুটো ভেতরে। হাতটা কামড়ে ধরতেই আমি লাফ মেরে উঠে বসেছি।

ধান্দা তার একটাই। আমাকে বাইরে টেনে নিয়ে গিয়ে মেরে, অন্য কোথাও বয়ে নিয়ে যাওয়া।

একটা হাত ফাঁকা ছিল। সেটা দিয়ে কাঁটা গাছের গোড়াগুলো চেপে ধরে চিৎকার শুরু করলাম আমার বাঘা দুটোর উদ্দেশে। ঝাউ ঝাউ করে উঠল সে দুটো। শেকল ছেঁড়ার জন্যে লম্ফঝম্ফ শুরু করে দিল। বাকি পশুগুলো ভয় পেয়ে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল মাঝের জমিটায়।

জানেন কিনা জানি না, একটা চিতাবাঘের হিম্মত কিছু কম নয়। একটা আস্ত গরুকে মেরে বয়ে নিয়ে যাবার ক্ষমতা রাখে। আর আমার হাতটা শয়তানটা বেশ কায়দা করেই কামড়েছিল।

মানুষ হিসেবে আমিও কিছু দুর্বল নই। টিকে থাকার লড়াই শুরু হয়ে গেল দুজনের মধ্যে। চুল্লিটা থেকে একটা পোড়া কাঠ বা মশালটা নিতে পারলে ভাল হতো। কিন্তু নেব কি করে, দুটো হাতই তো জোড়া। শুধু তাই নয়, একসময় দেখলাম

চিতাটার টানে কাঁটাগাছের গোড়াগুলো উপড়ে আসছে। শেকড় ছিঁড়তে শুরু করেছে একটার পর একটা। আর আমিও বাইরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি একটু একটু করে।

আঙুল দিয়ে সজোরে চেপে ধরলাম পাথুরে মাটি। নখগুলোর অর্ধেক প্রায় উঠে যাবার দাখিল হলো। তবুও রুখতে পারলাম না নিজেকে। শয়তানটার টানে আমার মুখ গিয়ে পড়ল কাঁটা ঝোপের ওপর। ছড়ে কেটে গেল মুখটা।

এই অবস্থায় কম্বলটার ভেতর আটকা পড়ে বেওয়ারিশ কুকুরটার তখন দম বন্ধ হবার অবস্থা। অতি কষ্টে হাঁচড়-পাঁচড় করে সে বেরিয়ে এল বাইরে। আর তখনি দেখতে পেল আমার দশা।

এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে সটান ঝাঁপিয়ে পড়ল চিতাটার ওপর।

ওর মতো সামান্য একটা কুকুর, অতবড় চিতাটার কি এমন ক্ষতি করতে পারে? থাবার একটা ঘায়েই কুকুরটার ভবলীলা শেষ করে দিতে পারে চিতাটা। কিন্তু কুকুরটা খুব চালাক। চিতাটার মুখের ওপর শুধু লাফালাফি শুরু করে দিল। একবার এদিক তো পরমুহূর্তেই ওদিক। ঠিক গোখরো সাপের ওপর নেউলরা যা করে।

বোধহয় চিমটি কাটার মতো কোথাও একটু লেগেছিল চিতাটার। মেজাজ চড়ে গেল। দারুণ রোষে কামড়াতে গেল কুকুরটাকে।

ব্যস! এই এক সুযোগেই আমি আমার হাতটা টেনে নিলাম চিতার মুখ থেকে। যদিও আমার প্রায় জ্ঞানশূন্য অবস্থা, তবু গড়াতে গড়াতে গিয়ে পড়লাম আগুনটার পাশে। একটা জ্বলন্ত পোড়া কাঠ টেনে নিয়ে ছুঁড়ে দিলাম চিতাটার মাথা লক্ষ্য করে।

এক লাফে কয়েক পা পিছিয়ে গেল আপদটা। হলে হবে কি, পিঠ দেখাল না মোটেই। চাঁদের আলোয় সে ব্যাটাকে ঝোপের পেছনে ঘুরঘুর করতে দেখলাম। বেড়ার নতুন কোনো ফাঁক-ফোকর খুঁজে বার করার ধান্দা। সেখান দিয়ে সে আবার ঢুকতে পারে ভেতরে।

শিকারী কুকুর দুটোর শিকল খুলে দেবার জন্যে টলতে টলতে এগিয়ে চললাম। বেওয়ারিশ ছোট্ট কুকুরটাও আমার সঙ্গে সঙ্গে চলল। দেখলাম, সেটার কোথাও আঘাত লাগেনি। যদিও আমার অবস্থা খুবই কাহিল। কুকুর দুটোর কাছাকাছি হবার আগেই মাটিতে পড়ে গেলাম। ধুলো আর রক্তে সারা শরীর মাখামাখি।

আমার জীবন তখন চিতাটার দয়ার ওপর নির্ভর। কেননা সে ততক্ষণে বুঝতে পেরেছে যে, আমার বাঘা দুটো বাঁধা। অতএব তাদের না ডরালেও চলে। বেড়ার যে কোনো ফাঁক দিয়েই সে ঢুকতে পারে তখন।

ঠিক এই সময়, দূর থেকে আমার বিক্রি করা ছাগলটার ডাক শোনা গেল। সন্ধ্যে থেকে কোনো রকম ডাকাডাকি না করে, সে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছিল। কিন্তু তার এতদিনকার সঙ্গীসাথীদের সভয় চিৎকার কানে যেতেই, টনক নড়ে। ডাকাডাকি শুরু করে দেয় সরবে।

থমকে দাঁড়াল চিতাটা। আমাকে ছেড়ে দিয়ে সে চলে গেল ছাগলটার খোঁজে। সমস্ত ব্যাপারটা এবার বেশ সহজেই ঘটে গেল। ছোকরা শিকারী তৈরিই ছিল। চিতাটা মাচার কাছাকাছি হতেই, সে তার কাম্য কাজটা করে দিল অনায়াসে।

ভীষণ খুশি সে। কেননা ওটাই ছিল তার জীবনের প্রথম শিকার। ভোর হতেই সে চলে এল। আমাকে অমন বিশ্রী অবস্থায় দেখে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসার বন্দোবস্ত করল। উপহার হিসেবে আমায় ফিরিয়ে দিল আমার ছাগলটাকে। পরে অবশ্য ঘা-টা ভাল হলো, কিন্তু একটা দাগ চিরকালের মতই রয়ে গেল শরীরে। এই দেখুন, সেই দাগটা।

কিন্তু না, আর নয়। কিছু মনে করবেন না, আমি এবার চলি। অনেক গল্প হলো।

( Norah Burke এর গল্প অবলম্বনে)

ছবি : রাহুল মজুমদার

ছবি : সুফি

# পাল্‌কি

## কালিদাস ভট্টাচার্য

পাল্‌কি চড়ে যাচ্ছে কেরে এমন দুপুরবেলা?
যাচ্ছে কে তা জানার জন্যে লোক জুটেছে মেলা।
কেউ ভাবছে যাচ্ছে রাজা, কেউ ভাবছে রানী,
কেউ বলল, যাচ্ছে নায়েব সত্যি আমি জানি।
ভাবছি আমি যাচ্ছে বুঝি রাজার কোন ছেলে,
আমার খেলার পুতুল দেবো দেখতে তাকে পেলে।
পাল্‌কিটা তো থামলো এখন যাই তো দেখি গিয়ে,
চার বেয়ারা যাচ্ছে কাকে পাল্‌কিটাতে নিয়ে?
দেখতে পেলাম পাল্‌কিটাতে একটিও লোক নাই,
পাল্‌কিখানার তলায় ফাঁকা অবাক হলুম তাই।
"পাল্‌কি সারাই করতে যে যাই" বেয়ারা দেয় বলে,
খবর শুনে গোমড়া মুখে আমরা এলুম চলে॥

# গিলিগিলি ফুঃ

## গৌরী দে

বছর আঠাশের যুবক কেবলচন্দ্র বসু ওরফে ক্যবলা, এখন রীতিমতো একটা ছোটখাটো যাদুকর। কম করে পঞ্চাশটা খেলা সে শিখে নিয়েছে এদিক ওদিক করে। অথচ এই ক্যবলাই বি. এ. পাশ করে চাকরির পেছনে কত না ছুটেছে। কত ইন্টারভিউ দেবার পর হঠাৎ একদিন ক্যবলা চাকরি পেয়ে গেল–এক ম্যাজিসিয়ানের অ্যাসিস্টেন্ট হিসেবে। কিন্তু মাত্র একটা বছর কাটতে না কাটতেই ক্যবলা আর একজন ম্যাজিসিয়ানের কাছে কাজ নিল। সেখানেও একবছর। তারপর চাকরি ছাড়তে হলো। হ্যাঁ, মালিকই তাকে চাকরি ছাড়তে বাধ্য করেছিল। অথচ ক্যবলার মতো এমন ভদ্র ভালো ছেলে দেখাই যায় না। তবু যে কেন তার চাকরি গেল সে কাহিনী খুলেই বলা যাক।

ছোটবেলা থেকেই ক্যবলার ম্যাজিক দেখানোর ঝোঁক। সস্তায় দুএকটা ম্যাজিক শিখে পাঁচজনের কাছে ক্যারামতি দেখিয়ে হাততালি কুড়োতে তার মজা লাগত। এ হেন ক্যবলা যখন ম্যাজিসিয়ানদের কাছে চাকরিতে ঢুকলো–তার সবচেয়ে ভালো লাগল অদৃশ্য করে দেবার খেলা। সে সবসময় অবসর পেলেই খেলাটি অভ্যাস করত। গোপনে। কিন্তু গোপনটা আর গোপন রইল না। এই অদৃশ্য হবার মন্ত্রটা হঠাৎ একদিন সে বলে বসল মালিকের প্রিয় কাকাতুয়াটার উদ্দেশে। এদিক ওদিক তাকিয়ে ক্যবলা কাকাতুয়ার কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে চাপা গলায় বলল 'গিলিগিলি ফুঃ'। সঙ্গে সঙ্গে ডানা ঝটপট করে ভীতু পাখিটা হঠাৎ খাঁচার দরজা খুলে উধাও। ক্যবলা তখনও বুঝতে পারে না–তার মন্তরে এমন হলো, না রামু খাবার দিতে এসে খাঁচার দরজাটা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু মালিক গেল দারুণ ক্ষেপে। সঙ্গে সঙ্গে ক্যবলাকে বিদায় নিতে হলো। কি করবে! অদৃশ্য করতে শিখলেও সেটা ফিরিয়ে আনার মন্ত্রটা তো সে তখনও রপ্ত করতে পারেনি।

দ্বিতীয় বার সে ঐ অভ্যাস করতে গিয়েই হাওয়া করে দিয়েছিল রিস্টওয়াচ। এটাওতার কাছে রহস্য। সেখানে ছিল মালিকের খাস চাকর নন্দ। মালিক গেছেন বাথরুমে, নন্দ টেবিল পরিষ্কার করছিল। সেই টেবিলের ওপরই মালিকের সদ্য খুলে রাখা নতুন ঘড়িটা ছিল। সেই ঘরেই সে অপেক্ষা করছিল মালিকের সঙ্গে দেখা করবে বলে। ঐ যে আগে বলেছি সস্তায় হাততালি পেতে সে ভালোবাসত। আর সেইজন্যেই তো নন্দকে সে খেলাটা দেখাতে গিয়েছিল। অবশ্য দোষের মধ্যে সে নন্দকে বলেছিল, 'আমি অদৃশ্য করতে পারি কিন্তু ফেরাতে পারি না।' নন্দ তবু উৎসাহ দিয়েছিল–যে উৎসাহ তাকে কেউ কখনও দেয়নি। তারপরই মন্ত্র উচ্চারণ এবং নিমেষে উধাও। টেবিলের আশপাশ ওপর-নিচ সব খুঁজল ক্যবলা, পেলো না। সুতরাং দ্বিতীয় চাকরিটাও গেল। এখন তার মনে হয়–সব খোঁজার সময় নন্দর পকেটটাও দেখা তার উচিত ছিল। সে না হয় হয়েছে–কিন্তু বড় ম্যাজিসিয়ান হতে গেলে তাকেও আবার ফিরিয়ে আনার শিক্ষাটা পেতেই হবে। আচ্ছা! বড় বড় হাতি, গাড়ি, ঘোড়া সে অদৃশ্য করবে তারপর হঠাৎ ওরা এসে হাজির হবে–তখন দর্শকদের কি হাততালি! সারা বিশ্বে নামে নাম– 'ক্যবলচন্দ্র দি গ্রেট ম্যাজিসিয়ান' –কিন্তু....কিন্তু শিখবে কি করে–দু দুটো ম্যাজিশিয়ানই তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে পার্ক স্ট্রিট ধরে এগোচ্ছে ক্যবলচন্দ্র। পার্কের রেলিং ঘেঁষে একটা সাদা বেড়ালবাচ্চা হয়তো সদ্যঘুম থেকে উঠে আড়মোড়া ভাঙছিল–ক্যবলা এদিক ওদিক চেয়ে ডান হাতের পাঁচটা আঙুল নাড়িয়ে বলল, 'গিলি গিলি ফুঃ–।'

ক্যবলাকে অগ্রাহ্য করে দৃশ্যমান হয়ে রইল বেড়ালটা, অদৃশ্য হলো না। সেদিকে তাকিয়ে ক্যবলা গজগজ করে ভালোমন্দ সুমধুর কয়েকটি বাক্য প্রয়োগ করে এগিয়ে গেল কবরখানার দরজার কাছে। দরজার কাছে বসে আছে এক কুচকুচে কালো ফুলওয়ালা। ক্যবলা ভাবছে–কাকে অদৃশ্য করা যায়! ফুল না মানুষ! ভাবনা শেষ হলো না পেছন থেকে কে যেন বলল– 'দাদা একটা টাকা দিন না।' তারই বয়সী একটা লোক ময়লা জামাকাপড় পরা–চোখদুটি সপ্রতিভ, ডান হাতটা বাড়িয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। ক্যবলা কপালে হাতটা ঠেকিয়ে বলল, 'মাপ করো ভাই।'

'একটা টাকা দেবেন তার আবার অত মাপজোপের কি আছে জানি না।'

লোকটির কথায় বিরক্ত হলো ক্যবলা। ওঃ, ভিক্ষে চাইছে না খাজনা আদায় করছে! মাথা ঠান্ডা করেই ক্যবলা বলতে গেল–'এগোও ভাই–এখানে কিছু পাবে না।' কিন্তু কই ক্যবলা তো তা বলল না। তার বদলে তার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল 'গিলিগিলি ফুঃ।'

ঝট করে লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল। দারুণ চমকে গিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে কাবলা তাকে এদিক ওদিক খুঁজতে লাগল। এমনকি ফুলের ঝুড়ির ভেতরটাও সে দেখে নিল। পেছন থেকে এবার মাস্তানি গলায় কে যেন বলল, 'এই যে দাদা! এটা কি হলো? টাকা চাইতে গেলুম বলে একেবারে ভ্যানিস করে দেওয়া, অ্যাঁ! একেবারে ভূত! বেটা যাদুকর, মানুষ করবি তো কর, নয়তো সোজা ঘাড় মটকাবো বলে রাখলুম।'

কাবলা তখনও ক্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে। বলল, 'তুমি সত্যিসত্যি অদৃশ্য হয়ে গেছ নাকি?'

এবার যেন তেড়ে মারতে আসে লোকটা। বলল, 'তবে কি আমি তোমার সঙ্গে মস্করা করছি! যা করেছো করেছো এখন শীগ্গির মানুষ না করে দিলে তোমাকে সত্যি ভূত বানিয়ে দেবো। বুঝেছ?'

কাবলা প্রচন্ড ভয়ে চুপসে গিয়ে মিনমিন করে বলল, 'আমি তো ফেরাতে জানি না–।' সঙ্গে সঙ্গে একটা শক্ত হাত তার গলার কাছে অনুভব করতেই তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, 'তবে....'

'তবে কি?'–অদৃশ্য লোকটা হাতটা কিন্তু সরায় না।

কাবলার মাথায় চট্ করে একটা বুদ্ধি খেলে যায়। বলে, 'তবে, তোমাকে আমি একটা চাকরি দিতে পারি।'

'এ বাজারে চাকরি! তাও ভূত হয়ে। ইয়ার্কি হচ্ছে?' অদৃশ্য মানুষের হাতটা আর একটু গলার কাছে এগোল।

কাবলা বলল, 'আমি দেবো–এই অবস্থাতেই করবে। খাওয়াপরার অভাব হবে না।'

হো হো হাসির শব্দ হাওয়ায়। হাতটা একটু সরল। লোকটা বলল, 'পরা? অ্যাঁ? যখন ভালো কাপড় জামা পরার শখ ছিল হলো না, আর এখন তুমি তো কিছু পরার পাট চুকিয়েই দিয়েছ। তবে হ্যাঁ, খাবারের ব্যাপারটা–ভাবতে হবে বৈকি। তা কি করতে হবে শুনি?'

হাওয়ার সঙ্গে ফিসফিস করে কথা বলল কাবলা। তারপর ঠোঁটে হাসি চেপে বলল, 'এবার বুঝেছ, তোমার মতো ভূতুড়ে অ্যাসিস্টেন্ট আমার কত দরকার।'

'কি আমি ভূত? ওমনি বলে দিলে, অ্যাঁ?' রীতিমতো রেগে গেল লোকটা।

কাবলা অবাক হবার ভান করে বলল, 'তুমি ভূত আমি বলেছি নাকি? তোমার কাজটা হবে ভূতুড়ে। আমি অদৃশ্য করব, তুমি সেটা আবার ফিরিয়ে এনে দেবে। আমি এটা পারতুম না বলেই তো নামকরা যাদুকর হতে পারছি না।'

'বেশ আমি রাজী। কিন্তু একটা শর্ত। আমার কিন্তু একটা বিচ্ছিরি রোগ আছে। রোখও বলতে পারো, আমি আরম্ভ করলে আর থামতে পারি না। এই ধর কথা বলছি তো বলছি, তো বলছি, আবার খাচ্ছি তো খাচ্ছি, তো খাচ্ছি,খেয়েই চলেছি যতক্ষণ না সবকটা পয়সা শেষ হয়। আবার অন্যদিকে একটু আয়েসীও আছি–' হা হা করে হাই তুলে বলল অদৃশ্য মানুষ, 'এজন্যে তো আমার কিছু হলো না।'

অধৈর্য হয়ে বলল কাবলা, 'তা শর্তটা কি তাই তো বললে না।'

'বলছি, বাধা দিও না–এটাই আমার শর্ত।'

'মানে? কিছুই বুঝলুম না।'–হতাশ হয়ে বলল কাবলা।

'বুঝলে না? তবে শোন, বলতে পারো এটা আমার একটা বদ অভ্যাস। আমি আরম্ভ করলে আর সহজে থামতে পারি না। ধর খাচ্ছি তো খাচ্ছি তো খাচ্ছি....যতক্ষণ না পয়সাগুলো শেষ হয়। আবার কথা বলছি তো বলছি তো বলছি, বলেই চলেছি, এই সময় যদি কেউ আমাকে চুপ করতে বলে, আমার তখন মাথা খারাপ হয়ে যায়। তখন আর জ্ঞান থাকে না। এই তো সেবার বাগবাজারে দরিদ্রনারায়ণ সেবা হচ্ছিল। আমি তো প্রায় ৫/৬ বালতি খিঁচুড়ি সাবাড় করেছি, আর এদিকে....'

কাবলা বুঝতে পারল লোকটা এখন থামবে না। কিন্তু বাধা দিল না। পাঁচ মিনিট একনাগাড়ে কথা বলে যেই একটু দম নিতে থেমেছে, কাবলা বলল, 'আমি রাজী! এখন যাওয়া যাক।'

এই হলো কাবলার রীতিমতো ম্যাজিসিয়ান হবার পেছনের ইতিহাস। কিন্তু তার পেছনের ইতিহাসটা, এরা দুজন ছাড়া কেউ জানে না। কাবলা লোকটাকে ডাকে 'জিনি' বলে। এই ডাকাতেও কি অশান্তি! লোকটার ধারণা 'জিনি' মেয়েদের নাম, সুতরাং এ নামে ডাকা চলবে না। কাবলা অনেক করে বোঝাল। এটা মেয়েদের নাম নয়। এক ছোটখাটো দৈত্যের নাম। তখন শান্ত হলো। কিন্তু জিনির স্বভাবটা কাবলাকে রীতিমতো ভাবিয়ে তুলতে লাগল। প্রায়ই আশেপাশের দোকান থেকে খাবার অদৃশ্য হতে লাগল। হঠাৎ হঠাৎ পাড়ার লোকে শূন্যে গলার শব্দ শুনতে পায়। পাড়াপ্রতিবেশীদের ধারণা ম্যাজিসিয়ান ভূতদের নিয়ে বসবাস করে। সুতরাং কাবলা এখন প্রায় একঘরে। এর ওপর আবার খেলা দেখাতে গিয়ে সেকি বেইজ্জত। জিনির জন্যে বুঝি কাবলার রুজি-রোজগার বন্ধ হয়। ব্যাপারটা হলো কি–একটা স্টেজ শো ছিল। স্টেজের ওপর একটা বড় টেবিল রাখা হলো। তার মধ্যেখানটা কাটা। কাবলা সেই কাটা জায়গার ওপর তার লম্বা টুপিটা উল্টে রাখল। টেবিলটা ঢাকল লম্বা ঝুলওয়ালা টেবিল ক্লথে। টেবিলের নিচে মেজের ওপর কাঠ সরিয়ে একটা

এবার আসছে একটা খরগোশ....

বড় গর্ত করা। সেই গর্তের ধারে বড় একটা খরগোশের খাঁচা নিয়ে বসে আছে জিনি। তাতে কমপক্ষে কুড়িটা খরগোশ আছে। কথা ছিল ক্যবলা টুপির ভেতর থেকে তিনটি খরগোশ বার করবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, খরগোশ বেরোচ্ছে তো বেরোচ্ছে তো বেরোচ্ছে...! কি রকম হলো! স্টেজ ভর্তি হয়ে এলো। দর্শকদের মধ্যে হাসির ফোয়ারা। সঙ্গে সঙ্গে ড্রপসিন। ক্যবলা ছুটে গেল স্টেজের নিচে। ঠিক যা ভেবেছে তাই। খাঁচার দরজা খুলে গর্তের কাছে রেখে জিনি ঘুমোচ্ছে নাক ডাকিয়ে।

যথেষ্ট অপমানিত হবার পরও সল্ট লেকের একটা নতুন স্টেজে খেলা দেখাতে গিয়ে যে ঘটনাটা ঘটল, তাতে ক্যবলা ঠিক করেছে, নাঃ আর খেলা দেখিয়ে দরকার নেই, তাতে যদি সে ম্যাজিসিয়ান নাও হতে পারে তাতে তার দুঃখ নেই।

ব্যাপারটা হলো কি, যেদিন ক্যবলার ম্যাজিক শো, সেদিন শো-এর শেষে পাড়ার ছেলেরা একটা নাটক নামাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ পাড়ায় দুটো লড়িয়ে দল আছে। স্থানীয় লোকেরা যাদের নাম দিয়েছে 'পেটো' আর 'বোম'। পেটো দল 'দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ' নামাবে শুনে বোম দল 'লবকুশ ও বাল্মীকি' করার জন্যে একটা দলকে মোটা টাকা দিয়ে ব্যবস্থা করেছে। এই দুই দলই আগেপরে মোটা টাকা দিয়ে বলে গেল–'দেখুন দাদা–ম্যাজিক করার সময় ওদের সব জামাকাপড়, অস্ত্রশস্ত্র ভ্যানিশ করে দেবেন। তাহলে মোটা টাকা দেবো।' ক্যবলা খুব চিন্তা করছিল দেখে জিনি বলল, 'চিন্তা করো না তো। দেখো না কেমন মজা করি।' কিন্তু ক্যবলার চিন্তা আর যায় না। পেটো, বোম, আর জিনি এদের তিনজনকেই সে ভয় পায়। নাঃ, আর না। এবার খেলা বন্ধ করে পালাতে হবে।

ক্যবলা জিনিকে অনেক শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে গেল। তারপর প্রত্যেকবারের মতো টুপির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে বলল, 'এবার আসছে একটা খরগোশ।' ক্যবলা টুপির মধ্যে কনুই পর্যন্ত হাত ঢুকিয়ে চোখ বড় করে দাঁড়িয়ে থাকে। হাতও বেরোয় না–খরগোশও বেরোয় না। কি করে বেরোবে? ক্যবলার হাতে ঠেকছে খরগোশ নয়–নরম নরম বস্তু। দর্শকরা চেঁচাচ্ছে, 'কই দাদা খরগোশ কি জঙ্গল থেকে ধরে আনছেন?'

যা থাকে বরাতে বলে মুখে দেঁতো হাসি টেনে ক্যবলা বলল, 'তার আগে খরগোশদের লজ্জা রক্ষার জন্যে আসছে কাপড়।' টুপির মধ্যে থেকে বেরিয়ে চলেছে শাড়ি....শাড়ি....শাড়ি.... লাল নীল সবুজ হলদে....দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের জন্য এনে রাখা নানান রঙের শাড়ি। দর্শকদের মধ্যে হাসির ফোয়ারা। ক্যবলা টুপির মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে স্টেজের নিচের জিনিকে এক ধমক দিয়ে বলল, 'বন্ধ কর, এসব কি হচ্ছে কি?' এই প্রথম ক্যবলা বাধা দিল জিনিকে। একটু ভয়ে ভয়ে থাকলেও দেখল শাড়ি আসা বন্ধ হয়েছে। ক্যবলা মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। বলল, 'এবার দেখুন, আসছে....'

একি! ক্যবলার হাতে এটা কি? তীর? ধনুক? তবে কি লবকুশ পালাটাও পন্ড করবে জিনি। ক্যবলা যত টানে বেরোয়, গেরুয়া চাদর, ধুতি, বাল্মিকীর সাদা দাড়ি, রামের জরির চটি, মাথার মুকুট।

দর্শকরা চেঁচিয়ে ওঠে, 'খরগোশরা সব শাড়ি পরে মাথায় জটা এঁটে তীরধনুক ছুঁড়বে নাকি দাদা!'

রাগে লাল হয়ে ক্যবলা টুপির মধ্যে দিয়ে পুরো ডান হাতটা ঢুকিয়ে ঘুষি পাকিয়ে ইশারায় জিনিকে জানাতে গেল, খুন করে ফেলব তোমায়, আমায় বেইজ্জত করা? সঙ্গে সঙ্গে হ্যাঁচকা টান। টুপির মধ্যে দিয়ে ক্যবলা স্বয়ং একেবারে স্টেজের নিচে। বাইরে তখন দর্শকদের প্রচন্ড হাততালি। ক্যবলা চিৎকার করে উঠল রাগে, 'কি হচ্ছে কি এসব?'

ক্ষেপা কুকুরের মতো গোঁ ধরে জিনি বলল, 'বেশ করেছি। আমি দ্রৌপদীর কাপড় সাফ করছিলুম বলে আমাকে বকা? আমি এবার তোমার কাপড় জামাও সাফ করে দেবো বলে রাখছি।'

বাইরে গোলমাল ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। ক্যবলা পালাতে গেল, সামনে রক্তচক্ষু দুই দলের দুই নেতা। অদৃশ্যে জিনির সেকি হাসি। রাগে, ভয়ে ক্যবলা থমকে গেল। তারপর হঠাৎ তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। ম্যাজিক লাঠিটা তার নিজের দিকে ঘুরিয়ে বলে ওঠে, 'গিলিগিলি ফুঃ'।

আশ্চর্য ব্যাপার, ক্যবলা অদৃশ্য হয়ে গেল। অদৃশ্য হয়েই সে দেখতে পেলো তার সামনে দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে হাসছে জিনি। ক্যবলা রাগের চোটে ঠাস্ করে মারল এক থাপ্পর জিনিকে। তারপর দে ছুট্–যেদিকে দুচোখ যায়।

ছবি ঃ বিজন কর্মকার

# রাঙাদাদু

## অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়

আমাদের এই গল্পের কে নায়ক বা নায়িকা তা গল্পের শেষেই ঠিক করা যাবে। উপস্থিত নায়ক রেনটু, ভালো নাম অনীক মুখার্জী। এবারে স্কুল ফাইনাল দেবে। বাড়ি সল্ট লেকে। ক্রিকেটের নাড়ি-নক্ষত্র জানে, আবার কবিতাও লেখে। বাড়িতে আছেন বাবা, মা, দাদু। ঠাকুমা কবে মারা গেছেন রেনটুর মনে নেই। তখন ওরা ব্যারাকপুরে থাকত। দাদু কমল মুখার্জী জজ ছিলেন। রিটায়ার করেছেন। এখন ভোরবেলা উঠে মর্নিং ওয়াক করেন। ফিরে এসে চা বিস্কুট খেয়ে বাড়ির কাজের লোক লালুকে নিয়ে বাজার করতে যান। এই আশি বছর বয়সেও প্রতিদিন মাছ, মাংস, ডিম খান। বাবা উৎপল মুখার্জী ব্যারিস্টার। সকাল থেকেই বাবার ঘরে মক্কেলের ভিড়। বাবার ঐ ঘরটায় দেয়াল দেখা যায় না, মোটা মোটা আইনের বই ভর্তি। মা সুজাতা দেবী, একটি নামকরা মেয়েদের কলেজের ফিলজফির প্রফেসর। রেনটুরা বড়লোক এবং আধুনিক। ওরা সবাই লন্ডন, প্যারিস, রোম, আমেরিকা ঘুরে এসেছে। ওদের বাড়িতে কেউ ধুতি পাঞ্জাবি পরে না। বাঙালী হয়েও নিজেদের মধ্যে অধিকাংশ সময় ইংরিজিতে কথা বলে। সল্ট লেকের বাড়িটাও ছবির মতন। রেনটু এবং রেনটুর বন্ধু-বান্ধব সবাই ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়ে। বাংলা গল্পের বই পড়ে না, ইংরিজি বই পড়ে। বিদেশী গান শোনে। রেনটুর মা সুজাতা শিক্ষিতা আধুনিকা হলেও একটু অন্যরকম। পূজাআর্চা করেন না, বাড়িতে ঠাকুরঘরও নেই, কিন্তু রেনটুর ক্যাসেটের লাগাতার ইংরিজি পপ গান শুনে শুনে ক্লান্ত হয়ে মাঝে মাঝে বলেন, ভালো দেখে একটা হেমন্ত মুখার্জীর রবীন্দ্রসংগীত বাজা তো শুনি। রেনটু, রেনটুর বাবা, দাদুর তেমন পাড়ায় বড় একটা মেলামিশি নেই। ওঁদের কাছে ভিনপাড়া মানে নিউ আলিপুর, বালিগঞ্জ, লেকটাউন থেকে বন্ধুরা আসে। সুজাতা দেবীর কিন্তু পাড়ার সবার সংগেই বন্ধুত্ব। পাড়ার সব ছেলেমেয়েদের দিয়ে রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে নাচ গান নাটক করান। একবার তো রক্তকরবী নাটকে সুজাতা দেবী নন্দিনীর পার্ট করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

সুজাতা দেবীর মা ছোটবেলায় মারা গেছলেন। বাবা খুব আদর্শবাদী ছিলেন। স্বদেশী করে কয়েকবার জেলে যান এবং শেষে জেলেই অসুস্থ হয়ে মারা যান। সুজাতা দেবীর উদার স্নেহশীল মামারা তাঁকে মানুষ করেন। সুজাতা দেবীর কর্মশক্তি ও উদ্যম অসম্ভব। উনি একটা মফস্বল কলেজের অধ্যাপিকা। বাড়িতে দুটি গাড়ি। স্বামীর মারুতি নিজেই চালান। শ্বশুরের অ্যামবাসাডার। তাঁর ড্রাইভার রতন সিং কিন্তু উনি নিজের কাজে কখনও বাড়ির গাড়ি নেন না। সকাল সাড়ে সাতটায় কোনো রকমে কিছু খেয়ে বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকেন। সেখান থেকে উল্টোডাঙা (এখন বিধাননগর) স্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরেন। শ্বশুর-স্বামী, এমনকি রেনটুও পর্যন্ত মাকে অত কষ্ট করে প্রফেসারি করতে বারণ করে। উত্তরে সুজাতা বলেন, লেখাপড়া শিখলাম কি করতে, যদি অপরকে না শেখাতে পারি।

আবার বাড়ির পার্টিতে বা বিদেশীভাবাপন্ন বন্ধু-বান্ধবের আড্ডায় সুজাতা বেশ হৈ-হুল্লোড় করে তাঁদের সংগে গা ভাসিয়ে দেন। সুজাতার একমাত্র দুর্বলতা রান্না করায়। মাংস, কাটা পোনার ঝোল, ফ্রায়েড রাইস আর পুডিং ছাড়া বিশেষ কিছু রাঁধতে পারেন না। দাদু যদিও সাহেব কিন্তু আসলে বাঙালী তো। শুধু বাঙালী নন, ওঁর বাবা বিহারের মনিহারী গ্রামে প্রথম অ্যালোপ্যাথ ডাক্তার হয়ে যান–১৮৮০ সালে। এবং সেখানে তিনি বাঙালী বিহারী মিলিয়ে একটা সুন্দর সমাজ তৈরি করেন, যে সমাজের ভিত ভালোবাসা। দাদুর মা নাকি খুব ভালো শুক্তো, চচ্চড়ি, আলুপোস্ত, কলাইয়ের ডাল, করমচা দিয়ে ছোট মাছের ঝাল রাঁধতেন। জজ কমল মুখার্জী মাঝে মাঝেই এই সব মেনুর কথা বলতেন। কিন্তু মুসলমান বাবুর্চি এসব করতে পারে না।

সেদিন ছুটির দিন। কমলবাবু সুজাতাকে বললেন, বৌমা আজকে একবার শুক্তোটা ট্রাই কর না।

মায়ের মুখের এক্সপ্রেশন দেখে রেনটুর মনে হলো-এর চেয়ে দাদু যদি মাকে এভারেস্টের চূড়ায় উঠতে বলতেন তাহলে সেটা মায়ের কাছে অনেক সহজ হতো। সুজাতা 'দেখছি বাবা' বলে কিচেনের দুর্গে যেন যুদ্ধ করতে ঢুকলেন। শ্বশুরমশাই উচ্ছে, কাঁচকলা, বড়ি, পটল প্রভৃতি শুক্তো করার উপকরণ আগেই এনে দিয়েছিলেন। ডাইনিং টেবিলে রেনটু ও রেনটুর বাবা উৎপল সুজাতার রাঁধা শুক্তো একটু খেয়ে বললেন, এটা ঠিক শুক্তো হয়নি।

সুজাতা রেগে বলেন, জীবনে কখনো শুক্তো খেয়েছো?

কমলবাবু কিন্তু বেশ তৃপ্তি করে সুজাতার অপটু হাতের শুক্তো নামধেয় তরকারি দিয়ে ভাত খেতে খেতে বললেন, আমার তো বেশ লাগছে। আসল কথা, কি হয়েছে সেটা বড় কথা নয়, কি হতে চেয়েছে সেইটিই বড়।

রেনটু তো মনিহারী দেখলই না।

কমলবাবু তাঁর এই পুত্রবধূটিকে মেয়ের মতন স্নেহ করতেন, কারণ সুজাতার বাবার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, তিনিও ভালো আইনজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু আইনের বিদ্যে নিয়ে তিনি ব্যবসা করেননি। সে বিদ্যে দেশ উদ্ধারের কাজে লাগিয়ে, নিঃস্ব হয়ে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলেন। সেইজন্যে তাঁকে তিনি অসম্ভব শ্রদ্ধা করতেন।

ছোটবেলা থেকে রেনটু দেখে আসছে, বিহারের মনিহারী গ্রামের বাড়ি থেকে বছরে একবার অন্তত আসেন রাঙাদাদু, দাদুর ছোট ভাই। দেশেই থাকেন, চাষবাস করেন। রেনটুর ভাষায় একেবারে গাঁইয়া। পায়ে কাঁচা চামড়ার একটা রিং দেওয়া স্যান্ডেল গান্ধীজীর মতন। হাঁটু পর্যন্ত খদ্দরের ধুতি, গায়ে খদ্দরের হাফ হাতা পাঞ্জাবি, উস্‌কো খুস্‌কো কাঁচাপাকা চুল। চোখে মোটা সেলের চশমা। যখন আসেন দেখা যায় এক হাতে একটা বড় পুঁটলি আর এক হাতে কাঠের ছোট স্যুটকেসের মধ্যে চরকা, পেছনে এক বিহারী চাকর–তার মাথায় বিরাট একটা ট্রাংক, তার ওপর একটা ঝুড়ি। তার ওপর বিছানা। আর হাতে একটা বিড়ে দেওয়া মাটির কলসি। পেছনে রাঙাদি, লম্বাটে গড়ন। তাঁরও পরনে খদ্দরের শাড়ি। তাঁর হাতে বিরাট টিফিনকেরিয়ার। ট্যাক্সি থেকে রেনটুর বাবার ডাক নাম ধরে 'খোকা, খোকা' বলে চিৎকার করে ডাকেন, পাশেই যে কলিং বেলের বোতাম আছে, সেটা খেয়াল থাকে না। রেনটুদের অ্যালসেসিয়ান ব্যারেল, ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার করে। রেনটুর বাবা নিজের অফিসে কাজ করতে করতে বুঝতে পারেন রাঙাদাদু এসেছেন। ছুটির দিনে এলে, রেনটুর মা ছুটে গিয়ে গেট খুলে রাঙাদাদু ও রাঙাদির ধুলোমাখা পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতেন। রেনটু ও তার বাবা প্রণাম করত না। রেনটুর বাবা অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে একটু হেসে বলতেন; এসো রাঙাকাকা, খবর সব ভালো তো? যাও বাবা ওপরে আছেন।

ওপরে সিঁড়িতে ওঠার মুখেই বিরাট চেহারার ব্যারেলের সঙ্গে দেখা। অন্য কেউ হলে ব্যারেলের ভয়ে পেছিয়ে আসত এবং ব্যারেলও তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ত। কিন্তু রাঙাদাদু চুপ করে হাসিমুখে বলতেন, কি ব্যারলা কেমন আছিস?

ব্যারেল কিছুক্ষণ থেমে দাঁড়িয়ে রাঙাদাদুর গা শুঁকে সামনের দুটো পা তুলে রাঙাদাদুর গলা জড়িয়ে ধরে আদর করত। রাঙাদাদু সত্যিই ডগ-লাভার। রেনটু শুনেছে যে মনিহারীতে রাঙাদাদুর অনেক বড় বড় দিশী কুকুর আছে। তারপর ব্যারেলই রাঙাদাদুকে সিঁড়ি বেয়ে দাদুর ঘরে নিয়ে যায়। দাদু তখন দক্ষিণের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। রাঙাদাদু দাদুর চেয়ে মাত্র দু বছরের ছোট, তবু এই তিরাশি বছর বয়সে দাদুকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতেন। রেনটুর রাঙাদাদুর এই কান্ডকারখানা দেখে হাসি পেত। এরপর রাঙাদিও এক গলা ঘোমটা টেনে দাদুকে প্রণাম করতেন। তারপর সেই পুরনো বিহারী লোকটা যে একটা বিরাট ট্রাংক, ঝুড়ি মাথায় করে নিয়ে এসেছিল সেও ঝুড়িটা রেখে দাদুর সামনে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করার মতন হেঁট হয়ে সেলাম করে দাঁড়াত। দাদু একমুখ হেসে বলতেন, কি খবর মকবুল?

ম্যায় তো আচ্ছা হুঁ। মকবুল হেসে বলে, আপকা তবিয়ৎ ঠিক হ্যায়তো বড়াবাবু?

হ্যাঁ, দাদু বলেন, পঁচাশি বছর বয়সে যতটা ভালো থাকা যায়। তারপর রাঙাদাদুকে জিজ্ঞেস করেন, তুই কেমন আছিস পরু? তোরও তো এইট্টি থ্রি হলো! রাঙাদাদু, যাঁর ডাকনাম পরু ভালো নাম পরিমল, হেসে উত্তর দেন, ভালো আছি। আশি বছরের পর শরীর খারাপ হয়েছে, বলে যে ডাক্তার ডাকতে বলে, প্রথমেই তার মাথার চিকিৎসা করা উচিত।

কেন রাঙাকাকা? বাবা এসে জিজ্ঞেস করেন। রাঙাদাদু হাসিমুখে বলেন, আশি বছরের পর আর বাঁচার দরকার কি? অনেক তো পাওয়া গেছে, এবার তো পৃথিবীতে নতুনদের জায়গা করে দিতে হবে।

রেনটুর রাঙাদাদুর কথাগুলো পাগলের প্রলাপ মনে হয়।

দাদু রাঙাদাদুকে বলেন, নাড়ুর স্ত্রীকে আনলি না কেন? ওর মেয়ে মিট্টিকে তো দেখাই হলো না। নাড়ু মানে নারায়ণ রাঙাদাদুর ছেলে। উনিও এম. এসসি পাশ করে ওখানে রাঙাদাদুর মতন চাষবাস করছেন। গান্ধীজী, বিনোবা ভাবের ভক্ত।

রাঙাদাদু বলেন, দাদা তুমি একবার মনিহারী এসো না, অনেকদিন তো যাওনি, রেনটু তো মনিহারী দেখলই না।

ওখানে দেখার কি আছে? রেনটু প্রশ্ন করে।

তোর দাদুর বাড়ি, বাগান।

হঠাৎ রেনটুর বাবা উৎপল আইনজ্ঞ হয়ে যেন একটা বেআইনি কথা বলে ফেলেন, রাঙাকাকা, তুমি তো আলাদা বাড়ি করেছ ?

রাঙাকাকা উত্তর দেন, হ্যাঁ, কারণ ওবাড়িটা এজমালি, আর বাগানটাও এজমালি, তোমাদের আমাদের দুজনের সমান অংশ। তোমরা তো তোমাদের অন্য জমি আগেই বিক্রি করে দিয়েছ।

হ্যাঁ, রেখে লাভ নেই। এখন ঐ বাড়িটা আর বাগানটার দর কত হবে ?

তা প্রায় পঞ্চাশ লাখ টাকা, রাঙাদাদু বলেন।

উৎপল সঙ্গে সঙ্গে বলেন, এখুনি বিক্রি করে দাও। তুমি পঁচিশ আমরা পঁচিশ–ফিক্সড ডিপোজিট করে রাখলে অনেক লাভ। না হলে জবরদখল হয়ে যাবে।

দাদুও বাবাকে সমর্থন করে বলেন, খোকা অন্যায় বলেনি।

রাঙাদাদু অপ্রস্তুত হয়ে বলেন, কিন্তু বাবা বলেছিলেন ওগুলো আমাদের সেকেন্ড ফ্রন্ট। কোনো ভাই, আত্মীয় বিপদে পড়লে ওখানে এসে থাকবে।

তোর কি সেকেন্ড ফ্রন্টের দরকার ? দাদু হেসে রাঙাদাদুকে জিজ্ঞেস করেন।

রাঙাদাদু সলজ্জে হেসে বলেন,না দাদা, তোমার আশীর্বাদে আমার যা আছে তাতে বেশ চলে যাচ্ছে।

রেনটুর বাবা বলেন, পঁচিশ লাখ টাকা তো পেয়ে যাবে।

সুজাতা ইতিমধ্যে এসে বললেন, রাঙাকাকা ডাইনিং রুমে চলুন–সেখানে খেতে খেতেই গল্প করবেন।

বাবার পায়ের কাছে মেঝেতে বসে রাঙাদাদু বলেন এখানেই দিয়ে যাও। তারপর বাবাকে বললেন, দেখ খোকা, আমার মনে হয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা থাকাটা ভালো নয়, ওতে শরীর খারাপ হয়ে যায়। ঐ টাকায় ছেলেরাও খারাপ হয়ে যেতে পারে। একটু অভাব রাখতে হয়। টাকা নিয়ে ভালো কাজ করা খুব শক্ত। আমরা তো গৃহী, সন্ন্যাসী নই, অতএব লোভী।

রেনটুর বাবা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন। রেনটুর মা টোস্ট, মাখন, অমলেট, আপেল, কলা, সন্দেশ ট্রেতে করে নিয়ে এলেন। রাঙাদাদু বললেন, এত খেতে পারব না বৌমা। তোমার জন্যে কৈ মাছ, ছাতু এনেছি।

সুজাতা বললেন, দেখেছি। কত তরি-তরকারি ঘি মধু এনেছেন!

টোস্টে কামড় দিয়ে রাঙাদাদু বললেন, সবই তো বাড়ির–রেনটুকে, দাদাকে, খোকাকে মনিহারীর বালুশাই দাও। আমি জইয়ার দোকান থেকে আলাদা করে করিয়ে এনেছি।

জইয়া কে ? দাদু জিজ্ঞেস করেন।

রাঙাদাদু বলেন, ঐ যে ক্ষুদিয়া ছিল–তার ছেলে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, দাদু সাগ্রহে বলেন, একটা চোখ কানা ছিল। খুব ভালো বালুশাই আর লালমোহন করত!

লালমোহন কি ? রেনটু জিজ্ঞেস করে।

দাদু বলেন, ক্ষীরের লেডিকেনি। আজকাল করে না ?

রাঙাদাদু বলেন, করে। কিন্তু ক্ষুদিয়া মারা যাবার পর জইয়াটা বাপের মতন করতে পারে না। তবে বালুশাইটা মন্দ করে না। আমি এখানে আসছি জেনে–নিজে থেকে তোমার জন্যে করে দিয়েছে।

ইতিমধ্যে সুজাতা একটা ডিশে বড় বড় সাইজের বালুশাই দিয়ে গেল।

রেনটু দেখে আঁৎকে বলে, বাবা! এ যে এক একটা বোমা!

তারপর বাঁহাতে একটা তুলে নিয়ে কামড় দিয়ে বলে বাঃ, বেশ খেতে তো! কত করে দাম এক একটার ?

তা তো জানি না, রাঙাদাদু সলজ্জে বলেন, জইয়া দাম নেয়নি। তোমাদের জন্যে পাঠিয়েছে।

রেনটুর দাদু ছাড়া সবাই একটু অবাক হলো।

রাঙাদিও অদ্ভুত, সবাই খুশি হলে উনি খুশি। সেইজন্যে নিজেকে খুশি রাখবার জন্যে সবাইয়ের জন্যে প্রাণপাত করতেও প্রস্তুত। নিজের গ্রামে বাংলাদেশ থেকে যারা উদ্বাস্তু গেছে, তাদের নিয়ে একটা সমিতি করেছেন। তাদের দিয়ে টেবিলক্লথ, ফ্রক, ব্লাউজ, বটুয়া প্রভৃতি নানা রকম জিনিস করিয়ে বিভিন্ন জায়গায় আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবদের দিয়ে বিক্রি করান। এর জন্যে অনেকে ওঁর ওপর বিরক্ত। উনি কিন্তু এই বিরক্তি গায়ে মাখেন না। কারণ এগুলো বিক্রি হলে ঐ গরিব দুঃস্থ উদ্বাস্তুরা কিছু তো হাতে পাবে। সুজাতাকেও যখন আসেন দিয়ে যান। সুজাতা সেগুলো ওঁর চেনাজানা মহলে বিক্রি করেন।

সন্ধ্যেবেলায় দাদুর শোবার ঘরে দাদু, রাঙাদাদু, বাবা এবং বাবার এক বন্ধু রঞ্জনবাবু গল্প করছেন। রঞ্জনবাবুও খুব পন্ডিত মানুষ। বিলেতে ওঁর বাড়ি আছে। ওখানেই নাকি কোন ইউনিভার্সিটির প্রফেসার। এখন এখানে এসেছেন তাঁর শ্যামবাজারের পৈতৃক সম্পত্তি বিক্রি করতে। রাঙাদাদু মেঝেতে বসে চরকায় সুতো কাটতে কাটতে গল্প করছেন। রেনটু লক্ষ্য করেছে রাঙাদাদু যখন গল্প করেন তখনই চরকা কাটেন। বছরে নাকি নিজের চারটে ধুতি, চারটে পাঞ্জাবি, দুটো ফতুয়া ও রাঙাদির দুটো শাড়ির সুতো কাটেন। রঞ্জনবাবু হেসে বলেন, অভ্যেসটা মন্দ করেননি। তবে আমি খদ্দরের জামা পরতে পারি না।

রাঙাদাদু হেসে বলেন, আমার আবার মিলের কাপড় পরলে কিরকম অস্বস্তি হয়, মনে হয় অন্য কিছু একটা পরেছি।

মানে ?

যেমন দেখবেন মাথা কামালে ন্যাড়া মাথায় হাত দিলে প্রথম প্রথম মনে হবে পরের মাথা।

সবাই হা হা করে হেসে ওঠে। তারপরে এলো বিষয় বিক্রির কথা। রঞ্জনকে বিস্মিত করে রাঙাদাদু বলেন, আপনি এখানকার সম্পত্তি বিক্রি করে দিচ্ছেন ?

রেখে লাভ কি? রঞ্জনবাবু বলেন, আমি তো আর ইন্ডিয়ায় থাকব না, লন্ডনেই সেটল করেছি।

সে কি! পাকা চরকার সুতো কাটিয়ে রাঙাদাদুর চরকার সুতোটা ছিঁড়ে যায়। কিন্তু রঞ্জনবাবুর কথার সূত্র ধরেই রেনটুর বাবা মনিহারীর বড় বাড়ি ও আমবাগানটার বিক্রির কথা আবার বলেন। রাঙাদাদু চরকার ছেঁড়া সুতো জুড়তে জুড়তে বলেন বেশ, আমি দেখছি। তোমরাও চেষ্টা কর। তারপর রাঙাদাদু আবার বলেন, চল–কাল চিড়িয়াখানাটা দেখে আসি। রেনটু বলে, আমি অনেকবার দেখেছি, তুমিও তো প্রত্যেকবার দেখ।

রাঙাদাদু হেসে বলেন, হ্যাঁ, আমার কিন্তু বেশ লাগে। তারপর বিড়লা মিউজিয়াম, প্ল্যানেটরিয়াম, শুনেছি গুরুসদয় দত্ত রোডে বিড়লারা একটা অপূর্ব বৈজ্ঞানিক মিউজিয়াম করেছেন,

সেটাও দেখব। তারপর যাব বোটানিক্যাল গার্ডেন।

রাঙাদাদু যখনই কলকাতায় আসেন, এইসব জায়গায় যান। ছোট ছেলের মতন সাগ্রহে দেখেন। বোটানিক্যাল গার্ডেনে নিয়ে গিয়ে কতরকম গাছ চেনান। তা এবার রেনটুকে রাঙাদাদু জোর-জবরদস্তি করে গুরুসদয় দত্ত রোডে বিড়লার মিউজিয়ামে নিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে রাঙাদাদু প্রথমেই এক কান্ড করলেন। মিউজিয়ামের গেট দিয়ে ঢুকেই ডান দিকে একটা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রর সুন্দর স্ট্যাচু আছে। রাঙাদাদু করলেন কি, সেই স্ট্যাচুর পায়ের কাছে সাষ্টাংগে উপুড় হয়ে প্রণাম করলেন। সাদা খদ্দরের পাঞ্জাবিতে ধুলো ময়লা লেগে গেল। তারপর আরও এক কান্ড করলেন, বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র বসুর মোটর গাড়িটাকেও তার বনেটে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন। সবাই রাঙাদাদুকে পাগল ভাবতে লাগল। তবে একটা কথা, দেখা গেল বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর বিরাট জ্ঞান। এমনকি কম্পিউটার সম্বন্ধে যে লোকটা বোঝাচ্ছিল, সে রাঙাদাদুর সংগে কথা বলে বিস্মিত হয়ে বললে, আপনি তো বেশ ভালো জানেন। আপনি কি এই বিষয়ের প্রফেসার?

রাঙাদাদু সবিনয়ে বললেন, আমি বিহারের মনিহারী নামে একটি গাঁয়ের সাধারণ চাষী।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো, দাদুর হঠাৎ হার্ট অ্যাটাক হলো। ডাক্তাররা বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করলেন। পারলেন না। রাঙাদাদু দাদুর মৃতদেহের পায়ের ওপর মাথাটা ঠেকিয়ে নীরবে কাঁদতে লাগলেন। রেনটুর বাবার, দাদুর পরিচিত বন্ধু-বান্ধব ও কিছু পড়শি এলেন। পঞ্চাশ ষাট জন হবে। যখন শ্মশানে নিয়ে যাবার জন্যে হিন্দু সৎকার সমিতির কাঁচের গাড়ি এলো, রাঙাদাদু বিস্মিত এবং বিরক্তবোধ করলেন, দাদাকে কাঁধে করে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হবে না?

বাবা রাঙাদাদুকে বললেন, তোমার কি মাথা খারাপ। এই সল্ট লেক থেকে নিমতলাঘাট কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব?

বাবা অশৌচ হবিষ্যি করতে লাগলেন। রাঙাদাদু মকবুলকে পরের ট্রেনেই মনিহারী পাঠিয়ে–ভালো ঘি, কলা ও অন্যান্য ফল, আতপ চাল ইত্যাদি আনালেন। বাবাকে বললেন, দাদার শ্রাদ্ধে যা খরচ হবে আমি দেব। বাবা বললেন, তার দরকার হবে না। তবু রাঙাদাদু জোর করে মায়ের হাতে পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছিলেন। কিন্তু বাবা যখন পুরুতকে আলাদা মূল্য ধরে দিয়ে মাথা কামিয়ে ন্যাড়া হলেন না, রাঙাদাদু খুবই আঘাত পেলেন। শুধু বললেন, এটা কি ঠিক করলি? বাবা বললেন, ওগুলো কুসংস্কার। শ্রাদ্ধের দিন শুধু বারোজন ব্রাহ্মণ ভোজন হলো। খাওয়া যদিও নিরামিষ, কিন্তু অনেক রকম মেনু করা হয়েছিল। নিয়মভংগের দিন বাবা খুব ঘটা করে শহরের সবচেয়ে বড় ক্যাটারার দিয়ে নানান রকম মাছ মাংসর মেনু করেছিলেন। শ দুয়েক লোক খেয়েছিল। রাঙাদাদু কিন্তু খুশি হননি। প্রথমতঃ ঐ ক্যাটারারের উর্দিপরা ভাড়াকরা লোকদের দিয়ে পরিবেশন করিয়ে খাওয়ানোটা ওঁর কাছে কিরকম একটা বিজাতীয় ব্যাপার মনে হয়েছিল। তারপর খাসির মাংসের বিরিয়ানি, মুরগির মাংসের আইটেমটা তাঁর কাছে নৈবেদ্যর ওপর কাঁটালি কলা না দিয়ে পেঁয়াজ দেওয়ার মতন একটা বেমানান ব্যাপার মনে হয়েছিল। রেনটুরা কিন্তু রাঙাদাদুকে গোঁড়া গাঁইয়াই ভাবল। আজকের দিনে এই সব লোক অচল।

দাদুর নিয়মভংগের পরের দিনই রাঙাদাদু, রাঙাদি, তাঁদের ছেলে নাড়ুকাকা, তার স্ত্রী ও মেয়ে যারা মৃত্যুর খবর পেয়ে এসেছিল চলে গেল।

যাবার সময় বাবা রাঙাদাদু ও নাড়ুকাকাকে বলে দিলেন, ঐ এজমালি বাড়ি ও বাগানটা বিক্রির চেষ্টা করতে।

কিছুদিন পর মনিহারী থেকে রাঙাদাদুর চিঠি এলো, একটা খদ্দের পাওয়া গেছে। পঞ্চাশ লাখই দেবে। বাবা বললেন, ভালোই হলো–ঐ পঁচিশ লাখ টাকা রেনটুকে দিয়ে দেব। তবু ওটা নিয়ে এখানে ভবিষ্যতে একটা বিজনেস টিজনেস করবে। রেনটুর তো খুব আনন্দ। নানান স্বপ্ন দেখছে, ঐ পঁচিশ লাখ টাকা নিয়ে কি করবে! কোন বন্ধু বলছে, ছবি কর। কেউ বলছে, ফরেন ঘুরে আয়। কেউ বলে কেব্‌ল টি ভি কর। কত রকম পরিকল্পনা।

রেনটুর এক বন্ধু ঠাট্টা করে বললে, গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল না হয়। রেনটু বাধা দিয়ে বলে, আরে না না, রাঙাদাদুর অনেক কাঁঠাল গাছ আছে। একবার একটা মস্ত কাঁঠাল এনেছিল, আর শুনেছি ওঁর নাকি নিজের ঘানি আছে তার থেকে খাঁটি সরষের তেল বেরয়।

তাই নাকি? বন্ধুটি একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে। তাই তোর রাঙাদাদুকে দেখলে কিরকম মেড়ো মেড়ো মনে হয়। কতদূর পড়েছে?

বাবা বলেছেন, বোটানিতে এম. এসসিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট।

সে কি রে!

এমন সময় ফোনটা বেজে উঠল। রেনটু রিসিভারটা কানে তুলে বলে–হ্যালো–ট্রাংকল, উৎপলবাবু, হ্যাঁ। কোথা থেকে ট্রাংকল–কাটিহার আচ্ছা দিচ্ছি। রেনটু টেলিফোনের নব টিপে বাবার ঘরে ফোনের লাইনটা করে দেয়।

বন্ধু বলে, কাটিহার কোথায়?

বিহারে, রেনটু জানায়, মনিহারী গ্রামের ডিস্ট্রিক্ট টাউন।

একটু পরেই রেনটুর বাবা, সুজাতা সুজাতা, বলে ডাকতে ডাকতে ব্যস্ত হয়ে নিজের চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসেন। সুজাতা ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন। উৎপল বলেন, কাটিহার থেকে রাঙাকাকার বন্ধু ফণিবাবু ফোন করেছেন। রাঙাকাকা খুব অসুস্থ আমাদের দেখতে চাইছেন। আমরা যেন ইমিডিয়েটলি মনিহারী যাই। মনিহারী কাটিহার দিয়েও যাওয়া যায়। সাহেবগঞ্জ দিয়ে লঞ্চে পার হয়ে গেলে তাড়াতাড়ি পৌঁছুনো যায়। কোন দিক দিয়ে যাব, ফণিবাবুকে এখনি জানাতে হবে। সুজাতা বললেন, তাড়াতাড়ি যদি পৌঁছুনো যায় সাহেবগঞ্জ হয়েই চল। রেনটুর বাবা ফোনে ফণিবাবুকে জানিয়ে দিলেন, আমরা আজই ভায়া সাহেবগঞ্জ যাচ্ছি।

মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার করে ভোর সাড়ে চারটেয় রেনটুরা সাহেবগঞ্জে পৌঁছুল। রেনটুর বাবা-মা স্টেশনে নেমেই দেখেন মকবুল ও আর একজন লোক, যাদের রাঙাদাদু কালকে ফণিবাবুর ফোনের খবর পেয়েই রাত্রের লঞ্চে সাহেবগঞ্জে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

লঞ্চ ছাড়ে ছটায়, মকবুল আগে থেকেই ওখানকার দোকানে ভালো চা, গরম গরম

সিংগাড়া জিলিপি ভাজিয়ে খাওয়াল। রেনটুর বাবা দাম দিতে গেলেন। দোকানদার নিল না, বললে, পারুবাবুকো আদমি দে দিয়া। এখানে রাঙাদাদুকে সবাই পরু না বলে পারুবাবু বলে। রিকশা করে লঞ্চের ঘাটে যেতে একটু কষ্ট হলো। কারণ রাস্তা খুব খারাপ। রেনটু ঘাটে এসে অবাক হয়ে গেল, এখানকার গংগা কত চওড়া! ফাঁকা ঘাটে ছোট্ট একটা খড়ের চালের চা-পান-বিড়ির দোকান, ওখানে একটা সুন্দর মন্দির। লঞ্চে মকবুল আর ঐ লোকটা, যার নাম তোমলু, জাতে সাঁওতাল, কিন্তু কি সুন্দর স্বাস্থ্য, আগে থেকেই কেবিনে জায়গা করে রেখেছিল। লঞ্চের সারেং এসে নিজে থেকে 'প্রণাম বাবু' বলে আলাপ করে বললে, আপ্ পারুবাবুকা ভাতিজা? বৈঠিয়ে। তারপর যে ছোট্ট চায়ের দোকান আছে তার দোকানদারকে ডেকে বললে, এই রামশরণ, বাবু লোগোকো বড়িয়া চা-এ বানা দেনা, পারুবাবুকা ভাতিজা হ্যায়।

উৎপল বাধা দিয়ে বলেন, আমরা এইমাত্র চা খেয়ে আসছি।

কোই বাত নেহি, সারেং বলে, দরিয়া পার হোনে মে করিব দো ঘন্টা লাগেগা—তো বিচমে আউর এক দফে চা-এ পি লেংগে তো মেজাজ কুছ আচ্ছা হি লাগেগা। পারুবাবুকো কাল দেখ কর আয়েহেঁ হার্ট অ্যাটাক হুয়া হ্যায়। দেওতা যেইসা ইনসান। তারপর লঞ্চের স্টিয়ারিংটায় হাত দিয়ে মকবুলকে জিজ্ঞেস করে, বাবু লোগকা সব সামান ঠিক সে উঠায়া তো?

জী হাঁ, মকবুল বলে।

সারেং যেন মকবুলের অনুমতি চাইছে এইভাবে বলে, আব চলে?

হাঁ, মকবুল অনুমতি দেয়।

লঞ্চ স্টার্ট দিল। রেনটুর তো লঞ্চে চড়ে খুব ভালো লাগল। মনিহারীর দিকে দিগন্তপ্রসারী গংগা। সাহেবগঞ্জের দিকে রাজমহল হিল। বিরাট হাতির সারির মতো কুয়াশা ঢাকা সবুজ পাহাড়ের সারি। তাদের মাঝে মাঝে চড়া। কত রকম পাখি! একটা অদ্ভুত সুন্দর প্রকৃতি, যা কলকাতায় বসে একমাত্র টি. ভি.-তেই দেখা যায়।

মনিহারীঘাটে রাঙাদাদুর ছেলে নাড়ুকাকা গোরুর গাড়ি, আরও লোকজন এবং একটা জিপ নিয়ে হাজির ছিল।

কি যে আনন্দ হচ্ছে।

সুজাতা নেমেই বললেন, রাঙাকাকা কেমন আছেন?

ভালো না। তবে জ্ঞান আছে। কথা বলছেন, ওষুধ খেতে চাইছেন না।

মনিহারীর রাঙাদাদুর বাড়িটা দেখে রেনটু অবাক হয়ে গেল। ঠিক যেন আশ্রম। খড়ের চাল, মাটির দেওয়াল, মেঝে কিন্তু তকতকে ঝকঝকে। চারপাশে ফুল-ফলের, তরিতরকারির বাগান। একটু দূরে গোয়াল, অনেক গোরু। তার ওপাশে সাঁওতালদের ছোট ছোট বাড়ি করে দিয়েছেন। শুধু বাড়ি করেই দেননি নিজের জমি থেকে প্রত্যেককে পাঁচ বিঘে জমি এমনি দিয়ে দিয়েছেন। এজমালি বাড়ি ও বাগান দেখে তো অবাক। কুড়ি বিঘের ওপর বিরাট প্রাসাদতুল্য বাড়ি। আমবাগানটা একটু দূরে ষাট বিঘের ওপর। কত রকমের আম—বোম্বাই, ল্যাংড়া, হিমসাগর, ফজলি, গোলাপখাস, জর্দালু। লিচু জামও আছে।

এ সব আমাদের? রেনটু সবিস্ময়ে নাড়ুকাকাকে বলে।

হ্যাঁ, নাড়ু হেসে বলে। তোকে আমাদের কামত দেখাতে বলদিয়াবাড়ি নিয়ে যাব।

কামত কি?

ইংরিজিতে যাকে বলে ফার্ম।

রাঙাদাদু ওদের দেখে খুব খুশি। উৎপলকে দেখে একমুখ হেসে বললেন খোকা এসেছিস—কি যে আনন্দ হচ্ছে। নাড়ু—নাড়ু—

কি বলছ বাবা? নাড়ু আসে।

ফাঁসিয়াতলের ভেড়ি থেকে বড় মাছ ধরা। খোকা ছোট মাছ খেতে পারে না। আর মহেশ জেলেকে বল, বৌমার জন্যে যেন কৈ মাছ যোগাড় করে আনে।

তুমি ব্যস্ত হয়ো না রাঙাকাকা, উৎপল বলে ওঠেন।

চা, খাবার এলো। বাড়ির ঘিয়ের। জমির গমের ময়দায় লুচি, নিজের ক্ষেতের আলুর আলু চচ্চড়ি আর হালুয়া। রেনটুর মনে হলো অমৃত। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে উৎপল বললেন, বাঃ অপূর্ব চা তো! কি চা?

রাঙাদাদু বললেন দার্জিলিঙে আমার এক নেপালী বন্ধু আছে সেই পাঠিয়ে দেয়। রাঙাদাদুও উঠে বসে একটু লিকার চা খেলেন। শুধু খেলেন না, নাড়ুকাকাকে বললেন, চরকাটা দে তো।

নাড়ুকাকা বাধা দিয়ে বলে—এই দুর্বল শরীরে চরকা কাটবে? রাঙাদাদু হেসে বললেন, চরকা কাটলে—আমার দুর্বলতা চলে যায়। বলে চরকা কাটতে লাগলেন। রেনটু বাড়ির পুব দিকে একটা ঠিক হলদে নয় যেমন সবজে সবজে চাঁপা ফুলের গাছ দেখে অবাক হয়ে গেল। নাড়ুকাকা বললে, এই চাঁপা গাছটা বাবা অনেক কষ্ট করে যোগাড় করে এনে নিজের হাতে লাগিয়েছেন। চাঁপাফুলের গন্ধটায় উগ্রতা নেই। কি স্নিগ্ধ!

একটু পরে যে লোকটা এজমালি সম্পত্তি নেবে সে এলো। রাঙাদাদু রেনটুর বাবাকে দলিলটা দিলেন, তারপরে আর একটা দলিল বাবার হাতে দিয়ে বললেন, আমার অংশের টাকাটা নিয়ে আমার বাবা মার নামে একটা ট্রাস্টি করেছি। তাতে তুমি, বৌমা, আর থাকবে আমার দুই বিহারী বন্ধু, মাধোবাবু আর ইদ্রিশ। ঐ টাকার ইন্টারেস্ট এখানকার গরিব দুঃখীদের শিক্ষা এবং চিকিৎসার জন্যে দেওয়া হবে। নাড়ু ও তোমার কাকীমাও এই কমিটিতে আছেন। তুমি তো আইনজ্ঞ, ভালো করে পড়ে দেখ। আর তোমার অংশের টাকাটা নিয়ে যেও।

এতগুলো কথা বলে হাঁফাতে লাগলেন। রাঙাদি বললেন, বেশি কথা

বল না। রেনটুর বাবা যে লোকটা কিনবে ঠিক করেছেন তাকে বললেন, রাঙাকাকা একটু সুস্থ হোক তারপর ফাইনাল হবে।

সবাই ঘুমুচ্ছে। রাত্রি শেষ হয়ে আসছে। পূর্ব দিগন্তের শুকতারাটা যেন হীরের মতন জ্বলজ্বল করছে। পাখিদের কাকলিতে গাছগুলো গান হয়ে গেছে। এমন সময় নাড়ুকাকা এসে রেনটুর বাবা-মাকে তুলে বলল, দাদা-বৌদি এসো, বাবা যাচ্ছেন। রেনটুরও ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি রাঙাদাদুর ঘরে এলো। রেনটু দাদুর মৃত্যুর সময় দেখেছে দাদু কি কষ্টই পেয়েছিলেন। বুকটা হাপরের মতো উঠছিল, নামছিল, কিন্তু রাঙাদাদু হাসিমুখে শুয়ে আছেন। ডাক্তারবাবু নাড়ী দেখছেন। কব্জিতে পালস্ নেই। বাহুতে ক্ষীণ পালস্। রাঙাদি গম্ভীরভাবে বললেন, গঙ্গাজল দেব। দিন, বলে ডাক্তারবাবু বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন। রাঙাদি,নাড়ুকাকা,রেনটুর মা দাদুর মুখে গঙ্গাজল দিলেন। তারপর ভোরের বাতাসে সুগন্ধ ফুলের মতন রাঙাদাদুর প্রাণটা মিলিয়ে গেল। রাঙাদাদুর মুখে হাসি, সবার চোখে জল। রেনটুর মনে হলো–রাঙাদাদু একবার তাকে তুলসীদাসের একটা দোঁহা বলেছিলেন, তুই যখন পৃথিবীতে জন্মাবি, তুই কাঁদবি, সবাই হাসবে। আবার তুই যখন যাবি, সবাই কাঁদবে তুই হাসবি। রাঙাদাদু আজ সেই ভাবেই মহাপ্রস্থান করলেন। রাঙাদাদুর মৃত্যুসংবাদটা আগুনের মতন সকাল হতে না হতেই সারা গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। শত শত মানুষ–বাঙ্গালী, বিহারী, হিন্দু, মুসলমান, আদিবাসী কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এলো। কতগুলো বিহারী মেথর-বাগদী বুক চাপড়াতে চাপড়াতে কাঁদতে কাঁদতে বলছে–মেরা বাপ চলা গিয়া। মেরা বেটা চলা গিয়া। তিন গাঁ থেকে লোক আর ফুল আসতে লাগল–হাজার হাজার লোক। রেনটু, রেনটুর বাবা-মা স্তম্ভিত।

দুদিন পরে যে খদ্দেরটা এজমালি সম্পত্তি নিতে চেয়েছিল, এলো। রেনটুর বাবা বললেন, বিক্রি করতে কোনো অসুবিধে নেই, উনি তো সব সইসাবুদ করে গেছেন। তবে শ্রাদ্ধটাদ্ধ হয়ে যাক। আপনার টাকা রেডি আছে তো?

হাঁ। লোকটা বলে।

রেনটু কোথায়, রেনটুর মা এসে জিজ্ঞেস করেন।

জানি না তো, উৎপল বলেন।

কোথায় গেল? সুজাতা বলেন, ও কিরকম হয়ে গেছে। রেনটু রেনটু বলে, এধার ওধার খোঁজেন। নাড়ু বলে, আমি দেখছি।

একটু এগিয়েই দেখা গেল রাঙাদাদু যে সবজে সবজে ফুলের চাঁপা গাছটা লাগিয়েছিলেন–তার নিচে বসে রেনটু। গাছটার গুঁড়িতে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে আর বলছে, রাঙাদাদু তুমি আমায় কেন বলনি তুমি এত বড়।

রেনটুর বাবা, মা, নাড়ু, নাড়ুর মা সবাই চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। সবার চোখে জল।

খদ্দেরটা একটু অপ্রস্তুতবোধ করে। বলে, তাহলে শ্রাদ্ধের পর আসব।

নাড়ু বলে, শ্রাদ্ধের দিন আসবেন।

তারপর হঠাৎ সুজাতা বলেন, না নাড়ু ঐ বাড়ি-বাগান বিক্রি হবে না ওখানে তোমার বাবার শেষ ইচ্ছে পূরণ হবে।

খদ্দেরটা অবাক হয়ে উৎপলের দিকে তাকায়। উৎপল বলেন, হ্যাঁ, উনি যা বলবেন তাই হবে। বলে রেনটুর দিকে ঘুরে তাকায়। রেনটু তখনও চাঁপাগাছের তলায় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। তার মাথায় একটা দুটো করে চাঁপাফুল রাঙাদাদুর আশীর্বাদের মতন ঝরে পড়ছে।

ছবি: বিজন কর্মকার

# এখন কলকাতা

## সলিল মিত্র

তিনটি গাঁয়ে মিলে মিশে
একটি শহর 'কলকাতা'–
সেখান থেকে কবেই উধাও
হোগলা এবং গোলপাতা
ঘোড়া-ট্রামের কলকাতাতে
এখন পাতাল রেল চলে–
মেতে থাকে বইমেলা, আর
মিছিল, ক্রিকেট, ফুটবলে।

ছবি: সমল চক্রবর্তী

# গণেশ পরশুরামের যুদ্ধ

নন্দলাল ভট্টাচার্য

না, এবার আর পার্বতীর কোনো দুঃখ নেই। বাবা হিমালয় আর মা মেনকা জামাই শিবকে সব-সময় দেবতার আসনে বসিয়ে রাখেন। বাবা-মা যেভাবে শিবকে আদরযত্ন করেন তাতে আনন্দে বুকটা ভরে যায় পার্বতীর।

অথচ আগের জন্মে দক্ষ রাজার মেয়ে সতী হয়ে জন্মে বাবার মুখে পতিনিন্দা সইতে না পেরে দেহত্যাগ করতে হয়েছিল তাঁকে। আর সে খবর পেয়ে রাগে উন্মত্ত হয়ে শিব যে কান্ড করেছিলেন তা ভাবলে এখনও শিউরে ওঠে পার্বতী। অনেক তপস্যার পর সেই শিবের সঙ্গেই ফের যখন তাঁর বিয়ে হলো তখন যে ভয় একটু ছিল না তা নয়, কিন্তু বাবা-মার ব্যবহারে সব ভয় দূর হয়েছে পার্বতীর। এখন পার্বতী তাই আনন্দে ডগমগ।

আনন্দর মধ্যে একটা কাঁটা অবশ্য খচখচ করে মাঝে মধ্যেই। মা বলে ডাকার মতো এখনও কেউ এল না ঘরে। অনেক দিন বিয়ে হয়েছে তাঁদের। শিবের সঙ্গে সুখেই কাটছে দিন। নন্দীভৃঙ্গী দিনরাত মা-মা করে হুকুম তামিল করার জন্য একপায়ে খাড়া ঠিকই, কিন্তু নিজের ছেলে না থাকলে কী মন ভরে?

অনেকদিন আগে অবশ্য একটি ছেলে হয়েছিল তাঁর, কিন্তু দেবতাদের চক্রান্তে জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই নিখোঁজ হয় সে। তারপর আর কোনো ছেলে হয়নি—তাই অনেক সুখের মধ্যেও পার্বতীর বুকে দুঃখের ঢেউ উথাল-পাথাল।

পার্বতীর সেই দুঃখ একসময় ছোঁয় শিবেরও অন্তর। তাই শিব একদিন পার্বতীকে বলেন, এক কাজ কর তুমি, পুণ্যক ব্রত কর। তাহলেই সন্তুষ্ট হবেন শ্রীহরি। তোমারও ছেলে হবে।

শিবের কথায় পার্বতী পুণ্যক ব্রতের আয়োজন করেন। দেবাদিদেব মহাদেবের ঘরণী পার্বতী—তার ওপর নগাধিরাজ হিমালয়ের মেয়ে, তাই তাঁর ব্রত উদ্‌যাপনে হলো একেবারে এলাহি ব্যাপার। চারিদিকে শুধু দাও দাও, নাও নাও ব্যাপার। এক বছর ধরে চলল সে ব্রত। সে ব্রতে পুরোহিত হয়ে এলেন ব্রহ্মার ছেলে সনৎকুমার। এলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু থেকে শুরু করে স্বর্গের সমস্ত দেবতা। এলেন হিমালয়, মেনকা—এলেন ত্রিভুবনের যে যেখানে ছিল—সবাই। দানের জন্য তৈরি হলো সোনা, রুপো, প্রবাল, মণিমানিক্যের পাহাড়। দুধ, দই, গুড়, তেল, ঘিয়ের শত শত নদী বয়ে যেতে লাগল কৈলাসপুরীতে।

শুধু দানধ্যান বা খাবারদাবারের আয়োজন নয়, অতিথিদের মনোরঞ্জনের জন্য গন্ধর্ব অপ্সরাদের আনা হলো। নাচে-গানে মাতোয়ারা হয়ে উঠল কৈলাসপুরী।

ওদিকে পার্বতী ব্রতের নিয়ম অনুযায়ী প্রথম ছ'মাস হবিষ্যি করলেন। পরের পাঁচ মাস শুধু ফলমূল আর শেষ মাসের প্রথম পনের দিন ঘি এবং বাকি পনের দিন শুধুই জল খেয়ে কাটালেন।

ব্রতের শেষদিনে খুব নিষ্ঠা করে যজ্ঞ করলেন সনৎকুমার। তারপর পার্বতীকে ডেকে বললেন, এবার দক্ষিণা দাও, তাহলেই সাঙ্গ হবে তোমার ব্রত, সার্থক হবে যজ্ঞ, পূর্ণ হবে তোমার মনের ইচ্ছা।

পার্বতী বলেন, কী দক্ষিণা দেব আমি? কী দক্ষিণা পেলে খুশি হবেন আপনি?

বেশি কিছু নয়, শুধু তোমার স্বামী শিবকে দক্ষিণা হিসেবে দাও আমাকে।

সনৎকুমারের কথা শুনে পার্বতী তো চোখে অন্ধকার দেখেন। মূর্ছা যান তিনি। মূর্ছা ভাঙলে পার্বতী বলেন, আপনি অন্য আর যা খুশি দক্ষিণা নিন, কিন্তু মহাদেবকে আমি কিছুতেই দিতে পারব না। আপনি তো জানেন, আগের জন্মে ওঁর নিন্দা শুনেই দেহত্যাগ করেছিলাম আমি। আর ওঁকে দিয়ে দিলে আমি বাঁচব কেমন করে? আপনিই বলুন স্বামী ছাড়া কি কোনো স্ত্রী বাঁচতে পারে?

সনৎকুমার গম্ভীরভাবে বলেন, ওসব কথা আমি বুঝি না। কী দক্ষিণা পেলে আমি খুশি হব জানতে চেয়েছিলে, তাই বললাম। তোমার ইচ্ছে হয় দাও, না হলে এই আমি চললাম।

সনৎকুমারকে উঠতে দেখে হৈ হৈ করে ওঠেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং অন্য দেবতারা। বলেন, সে কী কথা, দক্ষিণা না নিলে ব্রতই যে সম্পূর্ণ হবে না! পার্বতীকেও তাঁরা বোঝান অনেক করে। সবার কথায় শিবকেই দক্ষিণা হিসাবে তুলে দেন পার্বতী সনৎকুমারের হাতে। তারপর হতচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়েন সেখানেই।

শিবকে বগলদাবা করে সনৎকুমার তখন বসে আছেন

আবির্ভূত হয়েছেন স্বয়ং শ্রীহরি।

দেবতাদের সংগে। এমন সময় মাঘের আকাশ আলোয় আলোময় হয়ে উঠল অপূর্ব এক জ্যোতিতে। সবাই চোখ মেলে দেখেন, আবির্ভূত হয়েছেন স্বয়ং শ্রীহরি। সবাই তাঁকে প্রণাম করতে থাকেন, তাঁর স্তব করতে থাকেন।

শ্রীহরি পার্বতীকে বলেন, কী ব্যাপার, তুমি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আছ কেন?

পার্বতী জানান তাঁর দুঃখের কথা। সব শুনে শ্রীহরি দেবতাদের বলেন, না, না, এটা তোমাদের ভারি অন্যায়। শিবকে ছেড়ে পার্বতী কেমন করে থাকবে তা একবারও ভাবলে না!

শ্রীহরির কথায় দেবতারা অনেক করে বুঝিয়ে বললেন সনৎকুমারকে। সনৎকুমার এবার ফিরিয়ে দিলেন শিবকে। মনের আনন্দে পার্বতী তখন দেবতা, ব্রাহ্মণ, পর্বত এবং সমাগত সবাইকে বেশ যত্ন করে খাইয়ে-দাইয়ে প্রচুর সোনা-রুপো, মণিমাণিক্য দক্ষিণা দিলেন। সবাই শিব-পার্বতীর জয়ধ্বনি দিতে দিতে চলে গেলেন।

সেই সময় শ্রীহরি তাঁর অপূর্ব রূপটি পার্বতীকে দেখালেন। পার্বতী মনে মনে বলেন, আমার যদি ঠিক এইরকম একটি ছেলে হতো তাহলে আনন্দ রাখার আর জায়গা থাকত না।

অন্তর্যামী শ্রীহরি পার্বতীর মনের কথা টের পেয়ে গেলেন। বললেন, তাই হবে পার্বতী, আমারই মতো ছেলে হবে তোমার।

বর পেয়ে পার্বতী মহা খুশি। পার্বতী খুশি, তাই মহাদেবেরও মহা আনন্দ। আনন্দের মধ্যেই দিন কাটতে থাকে শিব আর পার্বতীর। তারপর ব্রতের ফল আর শ্রীহরির বরে সত্যি সত্যি পার্বতীর ঠিক শ্রীহরির মতোই সুন্দর একটি ছেলে হলো। অপরূপ মনোহর সে রূপ। পার্বতী জানেন, এ ছেলে স্বয়ং হরি, তবু এখন তো নিজের ছেলে। তাই তাকে বুকে তুলে চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দেন। নাম রাখেন গণেশ।

এদিকে গণেশের জন্মের কথা জেনে গেছেন ততক্ষণে সবাই। আসতে থাকেন দেবতা, যক্ষ, কিন্নর, সবাই। ত্রিলোকের সবার ভিড় তখন কৈলাস ভবনে। পার্বতী সবাইকে বলেন, আপনারা আশীর্বাদ করুন আমার বাছাকে।

সবাই মনের মতো আশীর্বাদ করতে থাকেন। পার্বতীও সবাইকে ঠিক ঠিক আদরযত্ন করেন। কোনোদিকে এতটুকু ত্রুটি রাখেন না।

একসময় সবাই চলে যান। এতক্ষণ খাটাখাটনি করে পার্বতীও ক্লান্ত। একটু হাত-পা ছড়িয়ে বসতে যান পার্বতী। মহাদেবও হাঁফিয়ে উঠেছেন, তাই তিনিও বিশ্রাম নিতে বসেন।

এমন সময় সেখানে হাজির হন সূর্যের ছেলে শনি। শনিকে দেখেই মহাদেব বলেন, সবাই এসে চলে গেল আর এতক্ষণে সময় হলো তোমার? বলি আমার ওপর রাগ করেছ নাকি?

শনি জিব কেটে বলেন, ছিঃ ছিঃ, ওকথা কী বলছেন! আমি তো আসছিলামই। ওই একটু দেরি হয়ে গেল এই আর কী।

তা বেশ, চল তবে ভেতরে। আমার ছেলেকে দেখবে চল।

শনি বলেন, না, না, আর ভেতরে যাবার দরকার নেই। আমি এখান থেকেই আশীর্বাদ করছি।

কিন্তু শিব সেকথা শুনবেন কেন? তিনি জোর করে শনিকে নিয়ে যান ভেতরের ঘরে। পার্বতীও শনিকে দেখে বলেন, এতক্ষণে এলে? তা দেখ আমার ছেলেকে, বল কেমন হয়েছে?

শনি কিন্তু চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকেন। তা দেখে পার্বতী বলেন, ও, আমার ছেলের মুখ দেখবে না বুঝি?

শনি আমতা আমতা করে বলেন, তা, মানে আমার দেখাটা ঠিক উচিত হবে না।

পার্বতী বলেন, দেখা উচিত হবে না মানে, তুমি ওকে দেখ, আশীর্বাদ কর।

শনি চোখ বুজেই বলেন, এই তো আশীর্বাদ করছি আমি।

শনির কান্ড দেখে অভিমান হয় পার্বতীর। ওদিকে শনি জানেন, ছেলের দিকে তাকালেই একটা অঘটন ঘটে যাবে, তাই চোখ বুজেই থাকেন।

ব্যাপারটা হয়েছে কি, বহুকাল আগে মালী আর সুমালী নামে দুজন শিবভক্ত ছিলেন। কোনো এক কারণে সূর্য রেগে গিয়ে তাঁদের মেরে ফেলতে গেলেন। বিপদ দেখে মালী আর সুমালী একমনে মহাদেবকে ডাকতে থাকেন। আশুতোষ তাঁদের আকুল আহ্বানে সেখানে এসে সব দেখে সূর্যকে নিজের ত্রিশূল দিয়ে বেশ জোরে একটা খোঁচা দিলেন।

শিবের একটি খোঁচাতেই সূর্য কুপোকাৎ। তিনি মাটিতে চোখ উল্টে মরার মতো পড়ে রইলেন। ওদিকে সূর্যের বাবা

মহাঋষি কশ্যপ ছেলেকে ওই অবস্থায় দেখে ক্ষেপে গিয়ে মহাদেবকে অভিশাপ দিলেন, তুমি যেমন আমার ছেলেকে মেরেছ, তেমনি তোমার ছেলেও মুন্ডহীন হবে।

সূর্যপুত্র শনি একথাটা না জানলেও জানতেন, তিনি যার দিকে তাকাবেন তারই মাথাটা উড়ে যাবে। তাই পার্বতীপুত্রকে দেখার ব্যাপারে তাঁর এই আপত্তি।

এখন যদিও হরির অংশে গণেশের জন্ম, তবু ব্রহ্মবাক্য যাতে ব্যর্থ না হয় তার জন্য হরিই বারবার পার্বতীকে দিয়ে বলালেন, না, না, তুমি আমার ছেলের মুখটা দেখে বল, কেমন দেখতে লাগছে তাকে।

পার্বতীর এই বারবার অনুরোধে ধর্মকে সাক্ষী রেখে শনি বলেন, এরপর যদি কোনো অঘটন ঘটে যায় তাহলে আমাকে দুষবেন না কিন্তু।

পার্বতী হেসে বলেন, না, না, তুমি দেখই না আমার ছেলেকে।

এবার শনি চোখ খুলে যেই গণেশের দিকে তাকালেন অমনি তার মুন্ডটা গেল উড়ে। পার্বতী এতক্ষণ নিজেই শনিকে ছেলের মুখ দেখার কথা বললেও ছেলে গণেশকে মুন্ডহীন দেখে কিন্তু নিজেকে সামলাতে পারলেন না। তাই রেগে শনিকে বললেন, তুমি আমার এত বড় সর্বনাশটা করলে? আমি অভিশাপ দিচ্ছি তুমিও বিকলাংগ হবে।

এখন হয়েছে কী, শনিকে আসতে দেখে তাঁর বাবা সূর্য আর ঠাকুর্দা কশ্যপও সেখানে এসেছিলেন। তাছাড়া সাক্ষী রাখায় ধর্মও হাজির ছিলেন সেখানে। তাঁরা কিন্তু এ ব্যাপারটায় দারুণ রেগে গেলেন। সূর্য তো রাগের চোটে বলেই ফেললেন, আমার ছেলে তো কিছুতেই ওকে দেখতে চায়নি। তুমি বারবার বলাতেই দেখেছে। কিন্তু তুমি মিছিমিছি অভিশাপ দিলে। তাই আমিও বলছি, তোমার ছেলেও হবে বিকলাংগ।

ওদিকে কশ্যপ আর ধর্মও রেগেমেগে কৈলাসপুরী থেকে চলে যেতে চাইলেন। পার্বতী এবার বুঝতে পারেন সত্যিই তাঁর ভুল হয়ে গেছে। শনি তো তাঁর ছেলেকে দেখতেই চাননি। তিনিই তো জোর করেছেন। তাই বলেন, দেখুন, আপনারা রাগ করবেন না, আমারই অন্যায় হয়েছে। কিন্তু বলে যখন ফেলেছি তখন অভিশাপটা তো ফলবেই। তবে বলছি, শনি সামান্য একটু খুঁড়িয়ে চলবে মাত্র, আর কিছু হবে না ওঁর। আর খোঁড়া হলেও শনি হবেন গ্রহরাজ।

ওদিকে কৈলাসে যখন এইসব ধুন্ধুমার কান্ড চলছে, ততক্ষণে কিন্তু গোলোকে গণেশের সেই মুন্ডুটা গিয়ে পড়েছে হরির কোলে। পড়েই মুন্ডুটা মিলিয়ে যায় শ্রীহরির শরীরে। হরি তো পুরো ব্যাপারটাই জানতেন আগের থেকে। এরপর কী হবে তাও তাঁর অজানা নয়। তাই গড়ুরের ওপর চড়ে তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়েন এর একটা বিহিত করতে।

পথে পড়ল পুষ্পভদ্রা নদী। সেই নদীর ধারে এক জংগলে তখন হস্তিনী আর শাবকদের নিয়ে উত্তরদিকে মাথা করে শুয়েছিল দিগ্‌হস্তী। সাদা ধবধবে গজরাজকে দেখে হরি ভাবেন, হ্যাঁ, এটাই হতে পারে গণেশের উপযুক্ত মাথা। ভেবেই তিনি টুক করে কেটে নেন গজরাজের মাথা।

হস্তিনী কিন্তু কেঁদে পড়ে হরির পায়। বলে, ওকে যে মেরে ফেললেন তাহলে আমি থাকব কী করে? হস্তিনীর কান্নায় দয়া হলো শ্রীহরির। তিনি ওই কাটা মুন্ড থেকেই আর একটি মুন্ড বের করে সেটা বসিয়ে দিলেন গজরাজের মাথায়। বললেন, গজরাজ, তুমি তোমার পরিবার নিয়ে এখানেই সুখে

না, না, তুমি দেখই না আমার ছেলেকে।

মাথাটা বসিয়ে দিলেন গণেশের ধড়ে।

থাক। তারপরই সেই কাটা মুন্ড নিয়ে গড়ুরের পিঠে চেপে দ্রুত ছুটলেন কৈলাসে।

কৈলাসে এসে কোনো কথা না বলে শ্রীহরি তাড়াতাড়ি হাতির সেই কাটা মাথাটা বসিয়ে দিলেন গণেশের ধড়ে। তারপর তার দেহে হাত বোলাতেই দিব্যি বেঁচে উঠল গণেশ।

ছেলে বেঁচে উঠতেই পার্বতীর মুখে হাসি। কিন্তু ছেলের ওই হাতির মাথা দেখেই আবার চোখ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে জল।

পার্বতীর কান্না দেখে শ্রীহরি কিন্তু বলেন, কেঁদ না, ছেলের তোমার পুজো হবে সবার আগে। তাছাড়া দেখ, ছেলেকে কিন্তু তোমার আগের মতোই সুন্দর দেখাচ্ছে।

পার্বতী তাকিয়ে দেখেন, সত্যিই তাই। গণেশের ওই সাদা হাতির মাথা, বিরাট শুঁড়, কুতকুতে দুটি চোখ আর দুধসাদা বিরাট দুটি দাঁতে রূপ যেন খুলেছে আরো বেশি।

পার্বতী এবার ভাগ্যকে মেনে নিয়ে হাসিমুখেই ছেলেকে বুকে টেনে নিয়ে ওই হস্তীমুখেই খেলেন চুমো।

সত্যিই গণেশের মুখে বিরাট ওই দুটি দাঁতই ছিল দেখার মতন। দাঁত দুটোতে তার রূপও খুলেছিল শতগুণ। কিন্তু বাবা শিবের জন্যই গণেশকে আবার খোয়াতে হলো ওই দুটি দাঁতের একটি।

সেটা অবশ্য বেশ কিছুদিন পরের ঘটনা। দেবতাদের চক্রান্তে পার্বতীর প্রথম যে ছেলেটি গিয়েছিল হারিয়ে, এতদিনে তারও সন্ধান মিলেছে। ষড়ানন সেই কার্তিককে নিয়ে আসা হয়েছে কৈলাসে। ষড়ানন কার্তিক আর গজানন গণেশকে নিয়ে বেশ সুখেই কাটছে শিব-পার্বতীর দিন।

সেদিন ঘরে বিশ্রাম করছেন শিব-পার্বতী। কেউ যাতে তাঁদের বিরক্ত না করে তার জন্য বাইরে দরজায় বসে পাহারা দিচ্ছে দুই ভাই–কার্তিক আর গণেশ।

কার্তিক তার ছ'টা মুখে কথার পর কথা বলেই যাচ্ছে আর শান্ত গণেশ তার শুঁড়টি নেড়ে শুনে যাচ্ছে সেসব কথা। এমন সময় দূর থেকে তারা দেখে তাদের বাড়ির দিকেই আসছেন রাম–পরশুরাম।

ইয়া লম্বা তাঁর চেহারা। মাথার ওপর ঝুঁটি করে বাঁধা চুল। কাপড়টা মালকোচা দিয়ে পরা। কাঁধের ওপর তোলা রয়েছে ইয়া বড় একটি কুড়ুল। খড়ম পায় খটমটিয়ে আসছেন পরশুরাম। তাঁর চোখ দুটো যেন রাগে ঘন ঘন ঘুরছে। সব মিলিয়ে তাঁকে দেখলেই ভয়ে বুক কেঁপে ওঠে সবার।

কাঁপবে না কেন, পরশুরামের চেয়ে বড় বীর তখন কেউ ছিলেন না। একবার দু'বার নয়, একুশবার এই পৃথিবী থেকে সব ক্ষত্রিয়কে মেরে শেষ করেছেন রাম। যেখানে যখনই কোনো ক্ষত্রিয় দেখেন অমনি কাঁধের কুড়ুলটা দিয়ে লাগান একটি কোপ। ব্যস, ওই এক কোপেই শেষ।

কার্তিক-গণেশ কিন্তু পরশুরামকে এতটুকু ভয় পেল না। কার্তিক তো এমনিতেই অনেক যুদ্ধ করেছে। সাত বছর বয়সেই সে তারকাসুরের মতো ভুবনজয়ী অসুরকে মেরে শেষ করে দিয়েছে। তারই জন্য সে ওই বয়সেই হয়েছে দেবসেনাপতি।

আর গণেশ যুদ্ধটুদ্ধ তেমন না করলেও তারও শক্তি খুব। একবার যদি গদাটা ঘোরায় তাহলে কেউই তার কাছে আসতে পারে না। বীর হলেও গণেশ কিন্তু ধীরস্থির, সংযমী। সে রাগে না কিছুতেই, আর সবাইকে দেয় ভাল বুদ্ধি। তাই কার্তিক বা গণেশ ভয় পায় না পরশুরামকে। তাছাড়া পরশুরাম শিবের শিষ্য। শিবের শক্তিই তাঁর শক্তি। সেদিকে দিয়ে পরশুরাম আবার কার্তিক-গণেশের গুরুভাই। অতএব তারা কেন ভয় করবে পরশুরামকে!

পরশুরাম কিন্তু কটমটিয়ে তাদের দিকে একটা দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে গটমটিয়ে প্রাসাদে ঢুকতে যান। তাই দেখে কার্তিক তো তাঁর সঙ্গে পাঞ্জা কষার জন্য তৈরি হয়। কিন্তু গণেশ তাকে থামিয়ে পরশুরামকে বলে, এখন তো ভেতরে যাওয়া যাবে না, বাবা-মা বিশ্রাম করছেন। বিশ্রাম শেষ হোক, তারপর আমরা সবাই মিলে ভেতরে যাব।

বাধা পেয়েই পরশুরাম রেগে কাঁই। হোক গুরুপুত্র, কিন্তু তিনি যে পরশুরাম এ কথাটা তারা ভুলল কী করে? তাই পরশুরাম বেশ ঝাঁঝালো গলায় বলেন, দেখ ভাই, ওসব বাধানিষেধ অন্যর জন্য, আমার জন্য নয়। আমি ওঁদের কৃপায় একুশবার পৃথিবীকে ক্ষত্রিয়শূন্য করেছি, এখন ওঁদের প্রণাম করে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরব। তাই বলছি রাস্তা ছাড়, আমি ভেতরে যাই।

গণেশ বলে, না ভাই, তা হয় না। কোনো রকমেই বাবা-মা'র বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটাতে দেব না। তাছাড়া তোমারই বা অত তাড়া কিসের! একটু বসে আমাদের সঙ্গে গল্পটল্প কর, তারপর একসঙ্গে বাবা-মা'র কাছে যাওয়া যাবে।

বাধা পেয়ে পরশুরামের মাথা গেছে গরম হয়ে। তাই গণেশ শান্তভাবে, যত ঠিক কথাই বলুক না কেন, পরশুরামের

মাথায় তা ঢোকে না। তিনি কাঁধের কুড়ুলটাকে বেশ শক্ত করে ধরে বলেন, না, ভেতরে আমি এখনই যাব। তোমার সাধ্য থাকে আটকাও।

গণেশ বলে, দেখ ভাই, ওসব কুড়ুল টুড়ুলে হাত দিয়ে কিছু হবে না। মনে রেখ তুমিও ক্ষত্রিয় নও, আমিও ক্ষত্রিয় নই। অমন চট করে রাগ ক্ষত্রিয়েরই শোভা পায়, ব্রাহ্মণের নয়। তাছাড়া আমরা হচ্ছি গুরুভাই। আমাদের কী নিজেদের মধ্যে মারামারি করা শোভা পায়!

কপালে যখন দুর্ভোগ থাকে তখন ভাল কথা কানে ঢুকবে কেন? গণেশ যত সংযমই দেখাক পরশুরাম কিন্তু তাঁর কাঁধের কুড়ুলটা হাতে তুলে নেন, তারপরই সেটা সজোরে ছোঁড়েন গণেশের দিকে।

গণেশ কোনোরকমে তার ভারি শরীরটা একদিকে সরিয়ে কুড়ুলের আঘাত এড়ায়। তারপর বলে, ভাল কথা বললাম তা শুনলে না। এরপর যা হবে তার জন্য কিন্তু আমি দায়ী থাকব না। বলেই তার গোটানো শুঁড়টা দিল খুলে। দেখতে দেখতে সে শুঁড় নিল বিরাট আকার। যেমন লম্বা তেমনি মোটা।

সেই শুঁড় দিয়ে ঝপ করে পরশুরামকে জড়িয়েই গণেশ তাঁকে সোজা তুলে ফেলল শূন্যে। এমনভাবে যে আক্রান্ত হতে পারেন একথা পরশুরাম স্বপ্নেও ভাবেননি। এখন গণেশের শুঁড়ে আটকা পড়ে পরশুরাম শূন্যে হাত-পা ছুঁড়তে থাকেন।

গণেশ কিন্তু পরশুরামকে আরও একটু শিক্ষা দেবার জন্য ওইভাবে শুঁড়ে পেঁচিয়েই চরকির মতো ঘোরাতে লাগল। সপ্তদীপ, সপ্তলোক ঘুরিয়ে গোলোকের মাটি ছুঁইয়ে বেশ করে সমুদ্রের জলে চুবিয়ে অবার দুম করে আছড়ে নামিয়ে দিল কৈলাসের মাটিতে। তারপর শুঁড়টা গুটিয়ে যেমনকার শান্ত তেমনভাবেই রইল দাঁড়িয়ে।

পুরো ব্যাপারটা যেন ঘটে গেল চোখের নিমেষে। অত বড় বীর ভার্গবনন্দন পরশুরাম তখনও চোখে-মুখে মালুম পাচ্ছেন না কিছুই, গণেশের ওই শুঁড়ে পাক খেয়ে তাঁর মাথাটা তখনও ঘুরছে বনবন করে। তাই ধাতস্থ হবার জন্যই হাত-পা ছড়িয়ে বসে থাকেন পরশুরাম। তাঁর ঐ অবস্থা দেখে ফিকফিক করে হাসতে থাকে কার্তিক।

একে গণেশের হাতে এমনভাবে নাকাল হওয়া, তার ওপর কার্তিকের ওই ফিচেল হাসিতে পরশুরাম আর ঠিক রাখতে পারেন না নিজেকে। বলেন, হোক গুরুপুত্র, আজ আমি ওদের শেষই করে ফেলব। বলেই তিনি হাতে তুলে নেন গুরুদেব শিবের দেওয়া অমোঘ অস্ত্র পাশুপত।

ভয়ানক অস্ত্র এই পাশুপত। একবার ছুঁড়লে লক্ষ্যে সে আঘাত করবেই। কোনো কিছুই ঠেকাতে পারবে না তাকে। তাই কার্তিক এবার হাঁ হাঁ করে ছুটে আসে। বলে, ও কী করছ পরশুরাম! তুমি কী জান না ওই অস্ত্রের ক্ষমতার কথা। ছুঁড়ো না অস্ত্র–তাহলে যে সর্বনাশ হয়ে যাবে!

আর সর্বনাশ! পরশুরামের কী আর ওসব মাথায় আছে। তিনি চোখ বন্ধ করে শিবকে স্মরণ করে ছোঁড়েন পাশুপত অস্ত্র। আগুন ছড়াতে ছড়াতে পাশুপত ছুটে চলে গণেশের দিকে।

গণেশ ইচ্ছে করলেই কিন্তু পাশুপত অস্ত্রকে এড়াতে পারত। সে ক্ষমতা তার ছিল। কিন্তু সেটা করলে হতো বাবা

সজোরে ছোঁড়েন গণেশের দিকে।

মহাদেবের অপমান, তাই বাবা আর তাঁর অস্ত্রের সম্মান রাখতে আস্তে করে বাড়িয়ে দিল বাঁ দাঁতটা।

সেই অমোঘ অস্ত্র তখন প্রচন্ড গর্জন করতে করতে গণেশের বাঁ দাঁতটাকে কেটে আবার ফিরে গেল পরশুরামের হাতে। ওদিকে সেই বাঁ দাঁতটা স্ফটিকের বিরাট পাহাড় হয়ে পড়ল মাটিতে। তার শব্দে কেঁপে উঠল চারিদিক। আকাশ থেকে দেবতারা সে দৃশ্য দেখে ভয়ে কেঁপে উঠলেন। সবাই মিলে হায় হায় করতে লাগলেন।

সেই ভয়ানক শব্দে শিব-পার্বতীর ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এলেন তাঁরা। বাইরে এসে পার্বতী দেখেন রক্তে সারা মুখ ভেসে যাচ্ছে গণেশের। কিন্তু তার চোখে-মুখে রাগের এতটুকু চিহ্নমাত্র নেই। বরং অসময়ে বাবা-মা'র ঘুম ভাঙল দেখে লজ্জায় মাথা হেঁট করে গণেশ।

ছেলের ঐ অবস্থা দেখে পার্বতী নিজেকে সামলাতে পারেন না। প্রায় চিৎকার করে বলেন, কে, কে আমার ছেলের এমন অবস্থা করেছে? তাকে আর কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

পার্বতীর রাগ দেখে কেউ আর কথা বলেন না। তাতে আরো রেগে যান পার্বতী। বলেন, কার্তিক, কার্তিক, তুমি থাকতে কে এমন দশা করল আমার গণেশের?

কার্তিক মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে বলে সব কথা। শুনে পার্বতীর চোখ যেন জ্বলতে থাকে। কটমট করে পার্বতী তাকান পরশুরামের দিকে। সে দৃষ্টির সামনে পরশুরাম কুঁকড়ে যান

ভয়ে। যত বড় বীর হোক না কেন, মা পার্বতী রেগে গেলে যে কেউ তাঁকে বাঁচাতে পারবে না এ কথাটা তিনি বেশ ভালোভাবেই জানেন। তাই মনে মনে তিনি ডাকতে থাকেন গুরুদেব শিব আর পার্বতীকে। মনে মনে সব অপরাধ স্বীকার করে বারবার ক্ষমা চান তাঁদের কাছে।

ক্ষমা চাইলে কী হবে, পার্বতী ছেলের ওই অবস্থা দেখে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারেন না পরশুরামকে। শিব চুপচাপ থাকলেও রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে পার্বতী বলেন, পরশুরাম, শিষ্য হয়ে তুমি ভাল গুরুদক্ষিণাই দিয়েছ। গুরুর কাছে থেকে অস্ত্র পেয়ে তা দিয়ে তুমি আজ গুরুভাইকে খুন করতে গেছ। জেন এর ফল তোমাকে পেতেই হবে। গুরু তোমার চুপচাপ থাকলেও আমিই তোমাকে শাস্তি দেব, সাধ্য থাকে আটকাও তোমার গুরুর অস্ত্র দিয়ে।

পার্বতী রাগের চোটে দ্রুত চলে যান ঘরের ভেতর ত্রিশূলটা আনতে। পরশুরাম বুঝতে পারেন আজ আর তাঁর রেহাই নেই। তাই এবার তিনি সব বিপদের উদ্ধারকারী মধুসূদন শ্রীহরিকে ডাকতে থাকেন।

শ্রীহরি তখন ছিলেন শ্বেতদ্বীপে। ভক্তের আহ্বান পৌঁছোয় তাঁর কানে। তিনি আর স্থির থাকতে পারেন না। দ্রুত রওনা হয়ে যান কৈলাসের পথে।

পার্বতী তখন সেই ভয়ংকর ত্রিশূলটা নিয়ে বেরিয়ে এসেছেন। চোখে তাঁর আগুন ঝরছে। পার্বতী বলেন, পরশুরাম, তুই যেমন আমার ছেলের ওপর পাশুপাত অস্ত্র ছুঁড়েছিস, তার দাঁত ভেঙেছিস, আমিও তেমনি তোকে এই ত্রিশূলে এফোঁড়-ওফোঁড় করব। দেখি তোকে কে বাঁচায়!

ত্রিশূল ছোঁড়ার জন্য পার্বতী যখন সেটাকে উঁচু করে তুলেছেন ঠিক সেই সময়েই শ্রীহরি নামেন সেখানে। তখন যাঁরা একটা মহাপ্রলয়ের আশংকায় কাঁপছিলেন তাঁরা ফেলেন স্বস্তির নিঃশ্বাস।

সবার আগে শ্রীহরির পায়ে লুটিয়ে পড়েন পরশুরাম। কান্না ভরা চোখে বলেন, আমাকে বাঁচান প্রভু।

অন্য যাঁরা সেখানে ছিলেন তাঁরাও লুটিয়ে পড়েন। শিবও প্রণাম করেন হরিকে। পার্বতীও প্রণাম করার জন্য ত্রিশূলটা রেখে দেন। তাই দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন পরশুরাম।

শ্রীহরি এবার সবার দিকে তাকিয়ে বলেন, বলি তোমরা কী শুরু করেছ বল তো?

শ্রীহরির ধমকের সামনে সবাই যখন মাথা নিচু করেন তখন তিনি পরশুরামকে আচ্ছা করে বকাবকি শুরু করেন। বলেন, তুমি এমন বেকুব যে নিজের ভাইয়ের সংগে ঝগড়া করতে শুরু করেছ। গুরু হলো পিতা আর তাঁর ছেলে সেও গুরুর মতো, অন্যদিকে সে আবার ভাই। ভাইয়ের সংগে কেউ এমনভাবে মারামারি করে? বয়েস তো কম হলো না, বুদ্ধিসুদ্ধি কী তোমার কোনোদিনই হবে না? যাও, তুমি ক্ষমা চাও গণেশের কাছে, ক্ষমা চাও মা পার্বতীর কাছে। স্তব কর তুমি ওদের।

শ্রীহরির কথায় পরশুরাম নিজের অন্যায় বুঝতে পেরে গণেশ আর পার্বতীর কাছে ক্ষমা চান। গণেশ তো আগাগোড়াই শান্তশিষ্ট। স্থিরবুদ্ধি তার। তাই পরশুরাম ক্ষমা চাইবার আগেই ক্ষমা করে দেয় তাঁকে। এখন পরশুরামকে এগিয়ে আসতে দেখে বুকে টেনে নেয় তাকে।

গণেশ আর পরশুরামের কোলাকুলি দেখে পার্বতীর রাগও অনেকটা কমে যায়। তাই দেখে শ্রীহরি এবার পার্বতীকেও একটু অনুযোগের সুরে বলেন, আচ্ছা, তুমি কেমনধারা মা? এরা সবাই না তোমার ছেলে? তা ভায়ে ভায়ে ঝগড়া করছে দেখে তুমি এমনিভাবে একজনকে মারতে যাবে? এটা কী মা'র কাজ?

শ্রীহরির কথায় লজ্জা পান পার্বতী। বলেন, আমি কী করব, গণেশের ওই অবস্থা দেখে আমি নিজেকে ঠিক সামলাতে পারিনি, তাই। তা বাবা পরশুরাম, তুমি কিছু মনে কর না। শুধু একটা কথা বলি, যখন তখন এত মাথা গরম করতে নেই–এতে ক্ষতি হয় সবারই।

শ্রীহরি গণেশের গায়ে-হাতে হাত বোলাতে বোলাতে পার্বতীকে বলেন, তুমি যাই বল পার্বতী, তোমার গণেশকে কিন্তু এখন একটা দাঁতেই অনেক বেশি সুন্দর লাগছে, তাই না?

পার্বতীও হেসে বলেন, তুমি যখন বলছ ঠাকুর, তখন সুন্দর তো লাগতে হবেই। তুমি আর ও যে একই–।

হ্যাঁ, এই কথাটা মনে রেখ, একটা দাঁত ভাঙলেও তোমার গণেশ এই কৈলাসপুরীতে এসেছে কার্তিকের আগে, তাই সমস্ত দেবতার আগে পূজা হবে তার–সে হবে সবার পূজনীয়। এমন ছেলের মা তুমি–তোমার মতো সৌভাগ্য ক'জনের হয় বলতে পার! আর সেই তুমি কিনা ছেলের একটা দাঁতের শোকে ধুন্ধুমার কান্ড বাধাচ্ছিলে!

পার্বতী এবার হেসে বলেন, এ সবই তো তোমার কাজ! তুমিই তো আগের থেকে সবকিছু ঠিক করে রেখেছ। তাই দোষের যদি কিছু হয় তা হবে তোমারই।

শ্রীহরি এবার শিবকে বলেন, দেখলে তো, দেখলে তো, শেষে সবকিছুর জন্য কিনা পার্বতী দায়ী করছে আমাকে?

ভাল মানুষের মতো শিব বলেন, মিথ্যে তো বলেনি পার্বতী।

হতাশভাবে শ্রীহরি বলেন, ভাল মানুষকেই সাক্ষী মেনেছিলাম আমি!

হরিহরের রংগ দেখে হেসে ওঠেন সবাই। কৈলাসপুরীর তখনকার সেই খুশির হাওয়া দেখে কে বলবে, একটু আগেই সেখানে কী তুলকালাম কান্ডটাই না ঘটতে যাচ্ছিল!

যাই হোক, পরশুরামের সংগে লড়াইয়ে গণেশের একটা দাঁত গেলেও ওই দাঁতের জন্যই সে সবার কাছে পায় বিশেষ পূজা। নাকের বদলে নরুনের মতো বলা যায়, গণেশের এই পূজা যেন তাঁর দাঁতের বদলে দক্ষিণা।

(কাহিনীসূত্র: ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ)

ছবি: রজতবরণ চক্রবর্তী

# গাছ-মা

নারায়ণ সান্যাল

*একটা কথা। গল্পটা আমি তোমাদের জন্যে লিখিনি, বাপু। রাগ কর না, আমাকে বুঝিয়ে বলতে দাও। দেখ, তোমাদের জন্য তো গোটা পূজা বার্ষিকীটাই রইল। আমি যাদের কথা ভেবে গল্পটা লিখেছি সেই সব ক্ষুদে দিদিভাই-দাদুভাইরা নেহাতই পুঁচকে। ওদের অক্ষর-পরিচয় হয়েছে; কিন্তু ওরা যুক্তাক্ষর চেনে না এখনও। য-ফলা, র-ফলা, ঋ-কার, রেফ ইত্যাদি থাকলে ঠিক জুত করতে পারেনা। তোমরা যখন পূজা বার্ষিকীটা পড় তখন ওরা ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে রঙিন ছবিগুলোর দিকে। তোমরা দয়া করে যদি কোনো লেখা পড়ে শোনাও তবেই ওরা আনন্দ করতে পারে। আমি তোমাদের ছোট-ছোট ভাইবোনদের কথা বলছি—নিজের না হলেও, মাসতুত, পিসতুতো, মামাতো, খুড়তুতো, পাড়াতুতো, অ্যাপার্টমেন্ট-তুতো, হাউসিং-এস্টেটতুতো।*

*দ্বিতীয় কথা: পরিকল্পনার কৃতিত্বটা আমার নয়, একজন মার্কিন শিল্পীর—কথাশিল্পী এবং চিত্রশিল্পী। নিজেই লেখেন, নিজেই আঁকেন। তাঁর নাম শেল সিলভারস্টেইন। তাঁর লেখা একটা বই—"দ্য গিভিং ট্রি"-র একটা কপি আমাকে উপহার দিয়েছিল আমেরিকা-প্রবাসী আমার নাতনি—রিন্টি। তবে বাংলা রূপান্তরের সময় বেশ কিছু অদল-বদল করতে হলো—আপেল গাছের বদলে আমগাছ, ওভারকোটের বদলে নামাবলী। আরও একটা বড় জাতের পরিবর্তন। সিলভারস্টেইনের গল্পটি ছিল নিছক বিয়োগান্তক, টলস্টয়ের "দ্য ফার-ট্রী"-র মতো। আমার মন মানেনি। আমি যদি তোমাদের জন্য লিখতাম তাহলে হয়তো গল্পটা সেভাবেই শেষ হতো, কারণ সক্রেটিস থেকে যীশু, ক্ষুদিরাম থেকে মহাত্মা গান্ধীর মহামৃত্যুর কথা তোমরা জান। আরও জান সেসব মৃত্যু পরাজয়ের নয়, মহাবিজয়ীর পুরস্কার। কিন্তু যুক্তাক্ষরবর্জিত ঐ ক্ষুদে পাঠক-পাঠিকাদের রূপকথার রাজ্যে রাজপুত্রেরা হারতে জানে না। মরতে শেখেনি!*

*আরও একটা কথা। লেখক গল্পের ভিতর কী-একটা কথা বলতে চেয়েছেন। তোমরা বুদ্ধিমান-বুদ্ধিমতী। ঠিকই বুঝেছ। আমার প্রশ্ন, তোমাদের ছোটভাই- বোনেরা কি তা বুঝতে পারল? নিজে থেকেই? প্রথম ছবির খোকন-সোনা কেন, কী করে শেষদিকে খোকনদাদু হয়ে গেল? আর খোকনদাদুর ঐ প্রশ্নটা? বনের অত অত গাছ গেল কোথায়? আর শেষ ছবিতে নতুন যুগের খোকন-সোনার দিকে কোথা থেকে একটা গাছের ডাল এগিয়ে এল আদর করতে?*

৪ মুকুট বানিয়ে বনের রাজা সাজত।

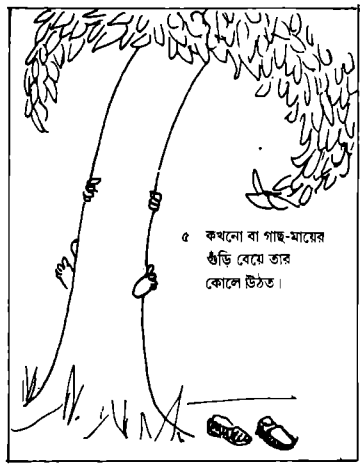
৫ কখনো বা গাছ-মায়ের গুঁড়ি বেয়ে তার কোলে উঠত।

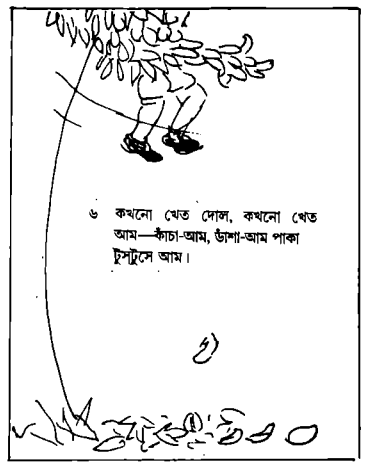
৬ কখনো খেত দোল, কখনো খেত আম—কাঁচা-আম, ডাঁশা-আম পাকা টুসটুসে আম।

৭ গাছ-মা আর খোকন-সোনা কখনো বা লুকোচুরি খেলত।

৮ খেলতে খেলতে হাঁপিয়ে পড়লে গাছ-মায়ের গায়ে ঠেস দিয়ে খোকন-সোনা ঘুমোত।

৯ দুজনেই দুজনকে খু—ব ভালবাসত।

১০ দিন যায়। খোকন বড় হতে থাকে। বড়, আরও বড়, অনেক বড়।

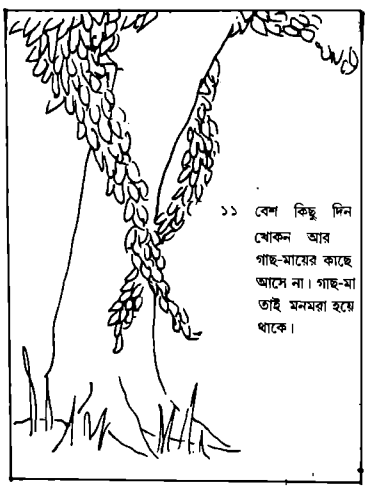
১১ বেশ কিছু দিন খোকন আর গাছ-মায়ের কাছে আসে না। গাছ-মা তাই মনমরা হয়ে থাকে।

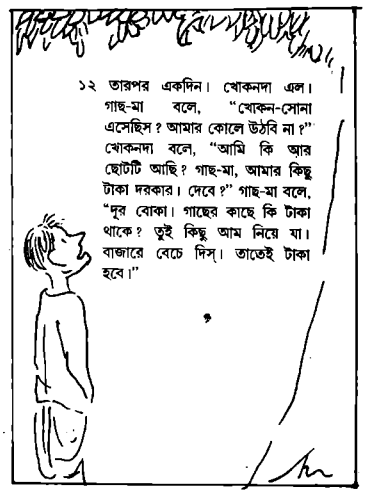
১২ তারপর একদিন। খোকনদা এল। গাছ-মা বলে, "খোকন-সোনা এসেছিস? আমার কোলে উঠবি না?" খোকনদা বলে, "আমি কি আর ছোটটি আছি? গাছ-মা, আমার কিছু টাকা দরকার। দেবে?" গাছ-মা বলে, "দূর বোকা। গাছের কাছে কি টাকা থাকে? তুই কিছু আম নিয়ে যা। বাজারে বেচে দিস্। তাতেই টাকা হবে।"

১৩ এরপর অনেক অনেক বছর খোকন-কাকুর আর কোনও খবর নেই। তারপর একদিন। খোকনকাকু ফিরে এল। গাছ-মায়ের কাছে টাকা চাইতে। সে একটা বাড়ি বানাবে। কাকিমাকে থাকতে দেবে। শুনে গাছ-মা বলে, "ওমা! তুই বিয়ে করেছিস? একদিন বৌমাকে নিয়ে আসিস। বাড়ি বানাতে চাস? তাহলে আমার ডালগুলো কেটে নিয়ে যা। তাই দিয়ে কাঠের বাড়ি বানাস্।" খোকন-কাকু তাই করল। তারপর অনেক-অনেক দিন তার দেখা নেই।

১৪ দশ বছর পরে ফিরে এল খোকন-জেঠু। বললে, "গাছ-মা, তোমার কাছে কিছু টাকা হবে? একটা নৌকা কিনতাম।" গাছ-মা বলে, "টাকা তো নেই। তুই বরং আমার গুঁড়িটা....."

১৫ খোকন-জেঠু তখন একটা কুড়ুল নিয়ে এল। গাছের গুঁড়িটা কেটে নিয়ে গেল। নৌকা বানাবে বলে। তারপর বহু বছর তার দেখা নেই।

১৬ অনেক - অনেক বছর পরে খোকন-দাদু ফিরে এল গাছ-মায়ের কাছে। গাছ-মা দুঃখ করে বলে, "তোকে আজ কী দিই খোকন-সোনা? আম নেই, পাতা নেই, ডাল নেই, ছায়াটুকুও নেই।" দাদু বললে, "ওসব কিছুই এখন দরকার নেই আমার। বড় হাঁপিয়ে পড়েছি গাছ-মা। একটু বসব?"
গাছ-মা বলে, "আহা ষাট-ষাট! বস! আমার গুঁড়িতে বসে একটু জিরিয়ে নে।"

১৭ দাদু তাই বসল। আগে চারিদিকে কত কত গাছ ছিল। এখন সবই নেড়া-নেড়া। একটু ছায়া নেই! দাদু বলে, "গাছ-মা! এ বনের এত এত সব গাছ কোথায় গেল বল তো?"

১৮ দাদুর একটু ঝিমুনি-মতো এসেছিল। খুটখাট্ আওয়াজে তার ঘুমটা ভেঙে গেল। পিছন ফিরে দেখে একটা ছোট ছেলে। দাদু বলে, "এই, তুই কী করছিস?"
নতুন খোকন-সোনা বললে, "আমি একটা গাছের চারা পুঁতছি।"

ছবি : লেখক

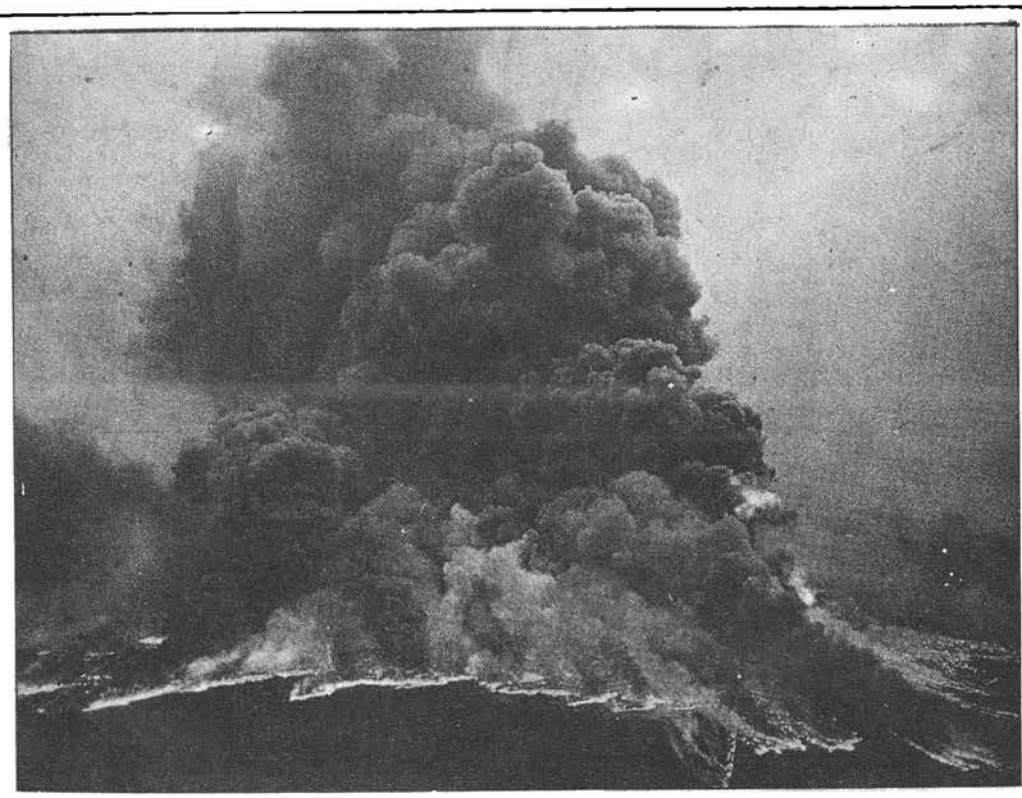

পোড়া তেল থেকে বেরিয়ে আসা ধোঁয়া পরিবেশ দূষিত করে তুলছে।

# ফাইটোপ্ল্যাংকটনরা আতঙ্কিত

সুনীত রায়

ওরকম করে আমার দিকে এগিয়ে আসছ কেন? কি ক্ষতি করেছি তোমাদের? তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না? দেখ, পুজোর ছুটিতে দুদিনের জন্যে এখানে বেড়াতে এসেছি, তারপরেই ফিরে যাব। তবুও দেখছি হাত, শুঁড়, পা নিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে অদ্ভুত রকমের দেখতে অজস্র সামুদ্রিক এককোষী থেকে শুরু করে বহুকোষী প্রাণী আর উদ্ভিদেরা। জেলির মতো থলথলে চেহারার একটা প্রাণী—একটা চোখ জ্বলছে আর নিভছে, হঠাৎ করে বলল, তোমরা তোমাদের মধ্যে যুদ্ধ করছ, তাতে কার কি বলার থাকতে পারে! কিন্তু আমরা তোমাদের কি ক্ষতি করেছি! একটা সামুদ্রিক পাখি, চেহারাটা দেখে মনে হচ্ছে দেহের রঙটা খুবই ফর্সা। কি একটা কালো কালো পদার্থ সারা দেহ দিয়ে ঝরে পড়ছে। পাখিটার চলার ক্ষমতা ক্রমশ কমে আসছে। ছটফট করছে আর বলছে, সমুদ্রের জলে তেল ফেলে আমাদের কি অবস্থা করেছ দেখেছ? কিন্তু কেন? এর কোনো উত্তর নেই। শুধুই ক্ষমতার নেশা! আমরা প্রতিশোধ নেব বলে একটা বিরাট আকারের প্রাণী বিশাল করে মুখটা হাঁ করে এগিয়ে আসতে লাগল। মুখটা এত বড় যে অনায়াসে চারটে মানুষ একসঙ্গে ঢুকে যাবে। প্রচণ্ড ভয়ে আর থাকতে না পেরে বাঁচাও বাঁচাও বলে চিৎকার করতেই সোহমের মা ছুটে এসে মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, কি হয়েছে! স্বপ্ন দেখছিলি বুঝি! বেলা অনেক হয়ে গেছে—এবার ঘুম থেকে উঠে পড়।

হাত-মুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে পড়ার টেবিলে বসেও কিন্তু সোহমের মাথার মধ্যে খালি স্বপ্নটাই ঘুরপাক খাচ্ছে। বহুদিন আগে থেকেই পুরী যাওয়া হবে বলে তোড়জোড় শুরু হয়েছে। আর পুরী গিয়ে যদি সত্যি এরকম ঘটনা ঘটে, তাহলে তো মুশকিল। ভোরের স্বপ্ন নাকি মিলে যায়। পড়াতেও ঠিক মন বসছে না। আজ রবিবার। তাই স্কুলে যাবার তাড়া নেই। হঠাৎ বাবার ডাকে চমক ভাঙল। বাবার দিকে তাকাতেই বাবা হাসতে হাসতে বললেন, তোমার শমীকদা এসেছে। এসেই প্রথম কথাটা হলো, সোহম কি করছে? শমীকদা এসেছে শুনে বসার ঘরের দিকে সোহম ছুটে গেল।

শমীকদার গলা জড়িয়ে ধরে সোহম জিগ্যেস করে, তুমি নাকি গাল্ফে গিয়েছিলে? এখনও তো ওখানে কয়েকশ তেলের কূপে আগুন জ্বলছে। সবসময় আকাশে শুধুই কি তেল-পোড়া

কালো ধোঁয়া ? সোহম হয়তো আরও কিছু বলত কিন্তু মা এসে যাওয়াতে একটু থেমে গেল। হঠাৎ করে ঐ খুনখারাপির দেশে যাওয়ার কি দরকার ছিল ? কোনো গবেষণার কাজ ছিল বুঝি ? শমীকদা এবার হাসতে হাসতে মার কথার উত্তরে বলল, বুঝলেন মাসীমা, গাল্ফ বলতে সবাই বোঝে পারস্য উপসাগরের ইরাক, কুয়েতের অঞ্চলটা। আমি কিন্তু ঐ গাল্ফে যাইনি। ভারতবর্ষের পশ্চিম দিকেও দুটি গাল্ফ বা উপসাগর আছে। সেগুলি গাল্ফ অব্ ক্যাম্বে আর গাল্ফ অব্ কাচ্ নামে পরিচিত। এই দুটি উপসাগর তৈরি হয়েছে আরব সাগর থেকে আবার আরব সাগর থেকে পার্সিয়ান গাল্ফও তৈরি হয়েছে। সোহমের মা এবার খানিকটা নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, তাই বল। আমি ভাবছি হঠাৎ ঐ যুদ্ধের দেশে কি কাজ পড়ল! যাক, তোমরা বসে গল্প কর, আমি রান্নাঘরে যাচ্ছি।

দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে সোহম দরজা খুলে দেখে নীলু, মিতুল, অর্ক সবাই একসঙ্গে হাজির। ওরাও শমীকদাকে দেখে আনন্দে আটখানা। কারণটা খুবই সোজা। শমীকদা মানেই একটা জমাটি গল্পের আসর। কিন্তু কি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা শুরু করা হবে ? সবাই যখন এ ব্যাপারে চিন্তিত, তখন সোহমই গতরাতের বিভীষিকাময় স্বপ্নের কথাটা সবাইকে বলল। সোহম যে স্বপ্নটা নিয়ে খুব চিন্তিত তা সবাই বুঝতে পারছিল। তাই সোহমের কথা শেষ হতেই শমীকদা বলল, পৃথিবীর সবথেকে ধনী দেশগুলির মধ্যে অন্যতম হলো মধ্যপ্রাচ্যের ইরাক, ইরান, কুয়েতের মতো কিছু দেশ। এদের রয়েছে অফুরন্ত তরল কালো সোনার ভাণ্ডার।

সোনা আবার কালো হয় নাকি ? মিতুলের কথায় শমীকদা থেমে গিয়ে বলল, সোনা কালো হয় না তা ঠিকই, কিন্তু এখানে কালো সোনা হলো পেট্রোলিয়াম। বর্তমান যুগে জ্বালানীর প্রধান উৎসই হলো তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস। এমন একটা সময় ছিল যখন মানুষ জানত না এসবের সঠিক ব্যবহার। আর কোথায় কিভাবে তেল থাকতে পারে সে ব্যাপারেও কোনো ধারণা ছিল না। যীশুখ্রীষ্টের জন্মের বহু বছর আগে থেকেই ব্ল্যাক সাগর আর ক্যাস্পিয়ান সাগর নিয়ে অনেক গল্পকথা প্রচলিত আছে। এই দুটি সাগরের জলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের রঙ দেখা যেত। কখনও সবুজ, কখনও হলুদ। আবার কখনও কালচে বাদামী কিংবা লালচে কালো, বিশেষ করে সূর্য অস্ত যাওয়ার পরে অদ্ভুত ধরনের রঙের খেলা জলের মধ্যে শুরু হয়ে যেত। তার মধ্যে সবুজ আর ময়ূরপঙ্খী রঙের বাহার দেখলে মনপ্রাণ জুড়িয়ে যেত। বিভিন্ন ধরনের রঙ ছাড়া যারা সমুদ্র উপকূলে বাস করত, তারা বিভিন্ন রকমের গন্ধ পেত। কখনও কর্পূরের গন্ধ, কখনও টার্পেন্টাইনের গন্ধ, আবার কখনও মিষ্টি ইথারের গন্ধ জলের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসত। তারপর বহু বছর কেটে গেছে। পরবর্তীকালে রহস্যের সমাধান হলো। জানা গেল, এইসব ঘটনার জন্যে দায়ী স্বাভাবিক উপায়ে সমুদ্রতল থেকে বেরিয়ে আসা তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস। আর এই তেল সারা বিশ্বে বিক্রি করে ইরাক, ইরান, কুয়েত প্রভৃতি দেশগুলি ক্রমশ সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠতে থাকে। মধ্যপ্রাচ্য থেকে সমুদ্রপথে জাহাজে করে আর পাইপলাইনের সাহায্যে বিভিন্ন দেশে তেল সরবরাহ করা হয়। কখনও কখনও জাহাজের তেলের ট্যাংকার ফুটো হয়ে গিয়ে কিংবা পাইপলাইন ফেটে তেল বেরিয়ে সমুদ্রের জলে মিশে যেত। তাতে সমুদ্রের জল দূষিত হতো।

শমীকদাকে থামিয়ে সোহম বলে উঠল, তেল কিভাবে জলের সঙ্গে মিশে যায় ? শমীকদা সোহমের কথার প্রশংসা করে বলল, সত্যিই তেল জলের সঙ্গে কখনও মেশে না। এখানে মেশাটা একটু অন্যভাবে বলা হয়েছে। একটা জলভর্তি বড় পাত্রের মধ্যে যদি একফোঁটা তেল ফেলা হয় তাহলে দেখা যাবে সেটা ধীরে ধীরে বৃত্তের আকারে বেড়ে যাচ্ছে আর জলের ওপর একটা পাতলা আস্তরণ তৈরি করছে। অপরিশোধিত তেল হলো একটা হাইড্রোকার্বন যৌগ, তাছাড়া তার সঙ্গে রয়েছে সালফার, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ইত্যাদি আরও অনেক পদার্থ। এই হাইড্রোকার্বন যৌগ বেশ কয়েক মাস পরে ভেঙে তৈরি করে প্যারাফিন, ন্যাপথেন আর অ্যারোমেটিক যৌগ। এইসব পদার্থই সমুদ্রের জলে বিভিন্নভাবে মিশে যায়। তার ফলে শুরু হয় সমুদ্রের জলের মধ্যে পরিবর্তন, সামুদ্রিক উদ্ভিদ আর প্রাণীদের মধ্যে পরিবর্তন। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে আমরাও তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি। আর তার পরিণতি যে মানবসমাজের ক্ষেত্রে খুবই ভয়াবহ সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

নীলু আজ একটু বেশি চুপচাপ। মনে হয় শমীকদার ওপর রাগ হয়েছে। সোহমের সঙ্গে আলাপ হওয়ার পর থেকে শমীকদা প্রায়ই এখানে আসে। কিন্তু নীলুদের বাড়িতে যাওয়াটা অনেক কমে গেছে। অবশ্য এসব কথা নীলু মনে মনে ভাবলেও মুখে কিছু বলে না। আজকের আসরে নীলু যে এসেছে সেটা বোঝানোর জন্যে নীলু নিজে থেকেই বলে উঠল, ১৯৬৯ সালে ইংলন্ডের করনেলের পশ্চিম উপকূলে একটা তৈলবাহী জাহাজ 'টরি ক্যানিয়ন' ভেঙে গিয়েছিল। তার থেকে প্রায় ১৩.৬ কোটি লিটার তেল সমুদ্রের বুকে এসে মিশেছিল। আর সেই তেল প্রায় ১২০০ মাইল এলাকা জুড়েও ছড়িয়েছিল। তাতে ইংলন্ড আর ফ্রান্সের উপকূল অঞ্চলের বহু মাছ, পাখি, অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণী মারা গিয়েছিল। নীলুর মুখে এ ধরনের একটা খবর শুনে শমীকদা খুশি হয়েই বলল, শুনে বেশ ভালো লাগছে, তোমরাও এসব বিষয় নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু করেছ। সমুদ্রের জলে তেল মেশার আরও অনেক ঘটনা আছে। ১৯৭৯ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার সান্টা বারবারাতে সমুদ্রের বুকে একটা তেলকূপ থেকে তেল ও গ্যাস প্রচন্ড চাপে নিজে থেকে বেরিয়ে এসে প্রায় আশি মাইল জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। এই তেলের কূপটির সঙ্গে যে তেল কোম্পানী জড়িত ছিল তারা কয়েক লক্ষ ডলার খরচ করে সমুদ্রের জলকে দূষণমুক্ত করে। ১৯৭০ সালে মেক্সিকো উপসাগরের কাছে লোউসিনিয়াতে একটা তেলের কূপে আগুন ধরে গিয়ে বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। ১৯৮৯ সালের মার্চ মাসে আলাস্কার 'এক্সেসান ভালডেজ' তেলের কূপ থেকে তেল বেরিয়ে প্রায় ১২০০ মাইল এলাকা দূষিত করেছিল। শোনা যায়, প্রায় এক কোটি গ্যালন অপরিশোধিত তেল ছড়িয়ে পড়েছিল। তাতেও হাজার হাজার মাছ, পাখি আর প্রাণী মারা গিয়েছিল।

দুর্ঘটনা কিংবা অসাবধানতাবশত বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গায় তেলের কূপে আগুন ধরেছে কিংবা তেল-গ্যাস নিজে

থেকেই বেরিয়ে এসে সমুদ্রের বুকে ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু ইচ্ছে করে তেলের কূপে আগুন ধরিয়ে সমুদ্রজলকে দূষিত করে যুদ্ধের হাতিয়ার হিসেবে পরিকল্পনা মনে হয় এই বছর ইরাক-কুয়েতের যুদ্ধেই প্রথম হলো। মানুষ মানুষের সংগে যুদ্ধ করছে, স্বার্থের লড়াই, ক্ষমতার লড়াই চলছে কিন্তু তা বলে লক্ষ লক্ষ নিরীহ সামুদ্রিক গাছপালা, প্রাণীদের মেরে ফেলার অধিকার তো মানুষের নেই। মিতুল হয়তো আরও কিছু কথা বলত, তার আগেই শমীকদা বলল, সত্যিই মানবজাতির ইতিহাসে এটা দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। কুয়েতের মিনা আল আহমডি তেলের কূপে আগুন ধরার সংগে সংগে প্রায় ১০০০ কোটি ব্যারেল তেল ছড়িয়ে পড়ে ৮৫ মাইল লম্বা আর ২৫ মাইল চওড়া আয়তন জুড়ে পারস্য উপসাগরের বুকে। যুদ্ধ থেমে গেছে। কিন্তু আজও সমুদ্রের ওপর অজস্র তেলের কূপে আগুন জ্বলছে। রাতের বেলায় মনে হয় মাইলের পর মাইল জুড়ে সমুদ্রের বুকে কেউ মশাল জ্বালিয়ে দিয়েছে। এই বিশাল পরিমাণ আগুন নিভিয়ে সমুদ্রের জলকে দূষণমুক্ত করতে বছর পাঁচেক লেগে যাবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন। সমুদ্রের লোনা জলকে লবণমুক্ত করে পানীয় জল হিসেবে কুয়েত ও সৌদি আরবে সরবরাহ করা হতো। আজ সেসব কারখানা অকেজো হয়ে গেছে। কয়েক কোটি টাকার মাছের ব্যবসা বন্ধ। পোড়া তেল থেকে বেরিয়ে আসা হাজার হাজার টন হাইড্রোজেন সালফাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড ও আরও অন্যান্য পদার্থ বাতাসের সংগে প্রতিদিন এসে মিশছে। তার ফলে আবহাওয়ার মধ্যেও পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে। বাহারিনে এবার মার্চ মাসে এত প্রচন্ড ঠান্ডা পড়ল যে গত আট বছরে এরকম ঠান্ডা পড়েনি। পরিবেশ বিজ্ঞানীরা মনে করছেন এবার থেকে এইসব অঞ্চলে ঘন ঘন বন্যা কিংবা খরা দেখা যাবে।

খবরের কাগজে আর টিভিতে দেখছিলাম কয়েকটা সামুদ্রিক পাখি তেলে-জলে মিশে দেহের আসল রঙটাই হারিয়ে ফেলেছে, আর নিঃশ্বাস নিতেও তাদের কষ্ট হচ্ছে। অন্যান্য সামুদ্রিক পাখিদেরও নিশ্চয়ই এরকম অবস্থা হয়েছে। নীলু বেশ চিন্তিতভাবে শমীকদাকে একটা প্রশ্ন করল। শমীকদা বলল, সাম্প্রতিককালে পারস্য উপসাগরের বুকে ভাসমান তেলের জন্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে 'সীগাল' নামে এক ধরনের পাখি। অবশ্য একদল চিকিৎসক এইসব অসুস্থ পাখিদের চিকিৎসা করে সুস্থ করে তুলছেন। তেলের পাতলা আস্তরণ সূর্যের আলোকে সমুদ্রের জলের ভেতরে ঢুকতে বাধা দিচ্ছে। তার ফলে বহু প্রাণী, উদ্ভিদ মারা যাচ্ছে। পাঁচ-ছয় মাস পরে এই তেলের যৌগগুলি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অণু-পরমাণুতে ভেঙে গিয়ে বিষাক্ত পদার্থ হিসেবে প্ল্যাংকটন, ফাইটোপ্ল্যাংকটন, নীল, সবুজ অ্যালগি ও অন্যান্যদের শরীরে আশ্রয় নেবে। তার ফলে এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বদলে যাবে। স্থলভূমিতে যেমন খাদ্য-শৃংখল আছে, সমুদ্রেও তেমন খাদ্য-শৃংখল আছে।

খাদ্য-শৃংখল বলতে কি শমীকদা তুমি এটাই বোঝাতে চাইছ যে গাছপালা যেমন মাটি থেকে রস আহরণ করে সূর্যের আলো আর ক্লোরোফিলের সাহায্যে খাদ্য তৈরি করে বেঁচে থাকে, আর সেই উদ্ভিদের ওপর তৃণভোজী প্রাণীরা বেঁচে থাকে, আবার মানুষ সেইসব তৃণভোজী প্রাণীদের মাংস খেয়ে বেঁচে আছে! অর্থাৎ একটি অপরটির ওপর নির্ভরশীল–সোহম বিজ্ঞসুলভভাবে ব্যাপারটা বেশ সোজাভাবে আমাদের সামনে তুলে ধরল।

শমীকদাও সোহমের কথায় সায় দিয়ে বলল, আমি ঠিক এটাই বলতে চাইছিলাম। সমুদ্রের জলে তেলের যেসব বিষাক্ত কণা কিছুদিন পর এককোষী প্রাণী বা উদ্ভিদের দেহে আশ্রয় গ্রহণ করবে তা পরবর্তীকালে কোনো একসময় খাদ্য-শৃংখলের নিয়ম অনুসারে মানুষের শরীরে প্রবেশ করবে না, তা কি কেউ হলপ করে বলতে পারে? আর যদি প্রবেশ করে তাহলে এমন সব রোগের সৃষ্টি হতে পারে যার নিরাময় আজও চিকিৎসাবিজ্ঞানের অজানা। এই তেলের কণা ঝিনুকের শরীরে প্রবেশ করে মুক্তো তৈরির ক্ষমতা নষ্ট করে দিয়েছে। পরোক্ষভাবে এটাও একধরনের ব্যবসায়িক ক্ষতি।

ভারতবর্ষের সমুদ্রের জলে কিংবা পরিবেশে এসব ঘটনার কি কোনো ছাপ পড়বে? মিতুল বেশ রহস্যময় ভংগিতে আমাদের মুখের ওপর প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিল। শমীকদা বলল, ঠিক এই ব্যাপারে সঠিক করে এখুনি কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে একদল জাপানী বিশেষজ্ঞদের মতে, পারস্য উপসাগরের এই তেল আস্তে আস্তে নিচের দিকে নেমে এসে ভারত মহাসাগরে মিশবে। তাতে শ্রীলংকা আর মালডিভ্সের উপকূলভাগ আক্রান্ত হতে পারে। তাঁরা মনে করছেন, সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে বংগোপসাগরেও কিছু প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পারে। আর একদল বিশেষজ্ঞদের মতে, এই দূষিত জল ভারতবর্ষের পূর্ব উপকূলে আসতে বছর দুই লেগে যাবে। পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এ বছর বর্ষা যখন আসবে তখন উত্তর-পশ্চিম বাতাসও বইবে। তার ফলে জ্বলন্ত তেলের ধোঁয়া ভারতের দিকে এগিয়ে আসবে। সেজন্যে বৃষ্টির রঙ কালো হলে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। লাক্ষাদ্বীপ ও মালডিভ্সের সমুদ্রের বুকে প্রবাল, স্পঞ্জ ও অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীদের মধ্যে অনেক পরিবর্তন দেখা যাবে। তাছাড়া বিভিন্ন ধরনের মাছ আর ফাইটোপ্ল্যাংকটন জাতীয় এককোষী প্রাণীরা এই দূষিত তেল খেয়ে মারা যাবে। আর সেজন্যেই আজ সমুদ্রের সমস্ত প্রাণী আর উদ্ভিদেরা একটা অজানা মৃত্যুভয়ে সদাই আতংকিত।

মনে হয়, সোহম এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে অদ্ভুত ধরনের সব সামুদ্রিক প্রাণী আর উদ্ভিদের দল স্বপ্নে কেন তোমাকে মারার জন্যে ছুটে আসছিল। তাদের রাগ তোমার ওপর নয়। তাদের রাগ সমস্ত মানবজাতির ওপর। কারণ মানুষের জন্যেই আজ তাদের জীবন বিপন্ন।

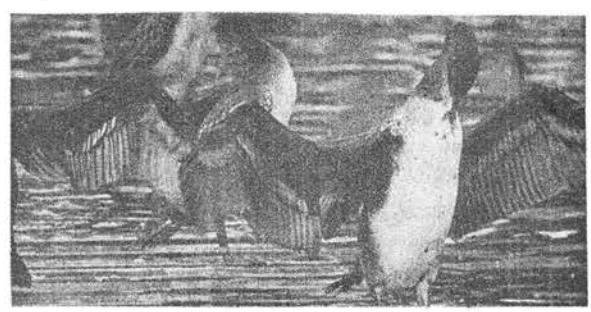

# পৃথিবীর অসুখ

ডাঃ অমিয়কুমার হাটি

পৃথিবীর অসুখ করেছে। সত্যিই তাই। আমাদের যেমন জ্বর হয়, পৃথিবীরও সেই রকম জ্বর হয়েছে। আর সেই জ্বর বেড়েই চলেছে। তার ফল হাতে হাতে পাচ্ছি আমরা। কোথাও জলোচ্ছ্বাস, কোথাও অস্ন্যুৎপাত, কোথাও সামুদ্রিক ঝড়, আবার কোথাও গ্লেসিয়ারের পথ পরিবর্তন মানুষের জীবনযাত্রাকে ওলোট-পালোট করে দিচ্ছে। এ সবই হচ্ছে পৃথিবীর অসুখ করেছে বলে। আর এ সবই অশনি সংকেত–পৃথিবীর শেষের সেদিন এগিয়ে আসছে। এর জন্যে কিন্তু দায়ী আমরাই। আমরা মানুষরাই পৃথিবীকে অসুস্থ করে তুলেছি। বন কেটে বসত গড়ছি। পরিবেশ দূষিত করে তুলছি, আণবিক বোমা ফাটিয়ে, মারণাস্ত্র ব্যবহার করে আমরা প্রকৃতির ভারসাম্য নষ্ট করে দিচ্ছি। তার প্রতিশোধ নিচ্ছে প্রকৃতি। কিভাবে?

গোমুখসহ হিমালয়ের সব হিমবাহ পেছন দিকে সরে যাচ্ছে। এর ফলে বরফ গলে আগে নামবে বান। ডুববে শহর জনপদ। পরে গংগা থেকে আরম্ভ করে হিমালয় থেকে নেমে আসা সব নদী শুকিয়ে যাবে। তখন কি ভয়ানক কান্ড হবে ভাবো দেখি একবার। আমরা যদি এখনও সতর্ক না হই তাহলে আমাদের দেশের অনেকটা অংশই মরুভূমি হয়ে যাবে।

সম্প্রতি যে সব প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটেছে তার পেছনেও আছে কিন্তু পৃথিবীর এই অসুখ। ঘটে যাওয়া ঐ ঘটনাগুলো পর-পর সাজানো যাক।

গত ২৯. এপ্রিল ১৯৯১ ভয়ানক ঘূর্ণিঝড় বয়ে যায় বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, নোয়াখালি প্রভৃতি অঞ্চলের উপর দিয়ে। তার সংগে ছিল প্লাবন। কোনো কোনো এলাকা চলে যায় ৫-৬ মিটার জলের তলায়। মারা যায় পাঁচ লক্ষ মানুষ। আগামী কয়েক বছর বংগোপসাগরে এরকম ঘূর্ণিঝড় আরও দেখা দিতে পারে–১০০ বছর পরে পুরো বাংলাদেশ হয়ত চলে যাবে সাগরের তলায়।

১৯৮৮ সালে উত্তর আমেরিকায় দেখা দিয়েছিল সাংঘাতিক খরা।

১৯৮৭ সালে উড়িষ্যার কালাহান্ডি ভুগেছে এরকম খরায়। দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল অনেকটা এলাকা জুড়ে।

আফ্রিকার ইথিওপিয়া খরার কবলে পড়ছে ফি-বছর। ১৯৮৪-৮৫ সালে ঐ দেশে দুর্ভিক্ষে কয়েক লক্ষ লোক মারা যায়।

পৃথিবীর কোনো কোনো জায়গা থেকে কোনো কোনো পশুপাখি লোপ পেতে বসেছে, যেমন আমেরিকার মিচিগানের সুন্দর গায়কপাখি, ফ্লোরিডার চিতা, সুন্দরবনের বাঘ। টিকে থাকা কঠিন হয়ে উঠছে নানা যাযাবার পাখির। কোনো কোনো গাছও লোপ পেতে চলেছে–যেমন আমেরিকার সুগারমেপল, যা থেকে হয় আসবাব, চিনি ও সিরাপ। চামড়ার কোনো কোনো ক্যানসার, চোখের ছানি পড়া কোনো কোনো দেশে আগের তুলনায় ৫০ শতাংশ বেড়ে গেছে।

এ সব কোনো আলাদা ঘটনা নয়, একটা যোগাযোগ আছে এদের ভেতর এবং এই তো সবে কলির সন্ধ্যা–এর থেকেও

খারাপ দিন আসবে–মানুষ এখনকার মতো বেহিসাবী বেপরোয়া হয়ে চললে মুছে যাবে সবুজ, জীবন লোপ পাবে, পৃথিবীটা হবে বরফের মরুভূমি।

কারণ পৃথিবীর জ্বর বাড়ছে। কোনো কোনো অসুখে মানুষের শরীরের তাপ যেমন বাড়ে, তাতে যেমন বিপদ ডেকে আনে, এও অনেকটা সেই রকম। এখন ততটা বোঝা যাচ্ছে না, কতকগুলো লক্ষণ ধীরে ধীরে শুধু ফুটে উঠছে। এ অসুখটা বাধাবার জন্যে দায়ী মানুষই। আমরা বোকা, তাই যে ডালে বসে আছি সেই ডালটার গোড়াই কেটে ফেলছি।

পৃথিবীকে ঘিরে আছে একটা চমৎকার আবহাওয়া। যার জন্যে আমাদের জগৎ এমন রূপময়, মনোরম। তুলনা করা হয় একটা কাঁচে ঢাকা সবুজ বাড়ির সংগে। ইউরোপ আমেরিকায় যা দেখতে পাওয়া যায়। কাঁচের ভিতর দিয়ে সূর্যের আলো ঢুকতে পারে, মাটি-জল-গাছ-বাতাস গরম হয়, তা ছাড়া তাপটা বেরিয়ে যেতে দেয় না। শীত থেকে বাঁচায়। না খুব গরম, না খুব ঠান্ডা।

পৃথিবীর আবহাওয়াও কাজ করে এইরকম কাঁচের মতো-এর ভিতর দিয়ে সূর্যের হলুদ আলো যখন আসে, তখন তার একটা অংশ প্রতিফলিত হয়ে মহাকাশে মিলিয়ে যায়। ৫০ শতাংশ মাটিতে পৌঁছায় এবং অবলোহিত রশ্মি বা ইনফ্রা-রেড রে তাপে পরিণত হয়। মাটি থেকে যে তাপ ওঠে, সে তাপের বেশির ভাগটা শুষে নেয় মূলতঃ কার্বন-ডাই-অক্সাইড ($CO_2$) এবং কিছুটা জলীয় বাষ্প ও মেঘে। কার্বন-ডাই-অক্সাইড ($CO_2$) তাপ ধরে রাখে বলে মাটি ঠান্ডা হতে পারে না। এর ফলে ধান হয় চাষীর খেতে, ঘাস বিছানো থাকে বাগানে, হিমালয়ে গজায় গহন বন, সাগরে শৈবাল। পৃথিবীর আবহাওয়াতে যদি $CO_2$ না থাকত, তাহলে তার তাপ হতো এখনকার থেকে অন্ততঃ ১৫.৫° সেলসিয়াস (৬০°F) কম, সে হতো মংগল-গ্রহের মতো জমাট বরফের রাজ্য, থাকত না কোনো জীবন।

কিন্তু কার্বন-ডাই-অক্সাইড যদি বেশি থাকে আবহাওয়াতে? তাহলে সে তাপ বেশি শুষবে, আবহাওয়া বেশি গরম হয়ে উঠবে। ভাল হবার বদলে ফল হবে তখন খারাপ।

আবহাওয়াতে আছে ৯১ শতাংশ নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন। এদের কোনটাই তাপ তেমন ধরে রাখতে পারে না। কিন্তু $CO_2$, জলীয় বাষ্প ও আর কোনো কোনো গ্যাস (যেমন মিথেন, ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন, নাইট্রাস অক্সাইড বা লাফিং গ্যাস) যদিও খুব কম পরিমাণ আছে, তাহলেও এরা তাপ শুষে নিতে, পৃথিবীকে গরম রাখতে দারুণ ওস্তাদ।

আবহাওয়াতে $CO_2$-র পরিমাণ দিন দিন এমনভাবে বাড়ছে, যাতে বিপদসীমা ছাড়িয়ে যেতে পারে। আবহাওয়া বদলে যাচ্ছে, গরম ও ঠান্ডার ফারাক কমে আসছে। ঝোঁকটা গরমের দিকে। কুড়ি হাজার বছর আগে পৃথিবীর তাপ ছিল এখনকার থেকে ৯ ডিগ্রী কম। তখন আবহাওয়ায় $CO_2$-র পরিমাণ ছিল ১৯০-২২০ পি পি এম (ppm–পার্টস পার মিলিয়ন–মাপের এক ধরনের একক, ১৯৫৮ সালে সেটা দাঁড়াল ৩১৫-তে, ১৯৯০-এ উঠেছে ৩৫৫-তে। ২০৫০ সাল নাগাদ দাঁড়াবে ৫৫০-৬০০-তে।

পৃথিবীর শরীরের উপরের গড় তাপ এখন ১৫°C (৫৯°F)। ঐ তাপের একটু হেরফের হলে বিরাট কিছু ঘটে যেতে পারে। ১৩৫০ সালে 0.৫°C(১°F) তাপ কমে যাবার ফলে গ্রীনল্যান্ডের বসতি উঠে গেছিল, ইউরোপে কৃষকেরা পালিয়েছিল মাঠ ছেড়ে। ১৮০০ শতকের মাঝামাঝি বহু কলকারখানা গড়ে উঠল। পৃথিবীর তাপ বাড়ল 0.৫°C। আবার ১৮০০ সালে যা ছিল, তার থেকে এখন তাপ বেড়েছে ১°C। ১৯৫০ থেকে ১৯৭৯ অবধি যদি পৃথিবীর তাপমান গড়ে একই ধরা যায়, তাহলে ২০০০ খ্রীস্টাব্দের মাঝামাঝি তাপ বেড়ে যাবে ৩°C (৫.৫°F) এবং বেড়ে যাবার এই হারটা গত সব শতাব্দীর তুলনায় অনেক বেশি, বিপদও তাই হবে অনেক গুণ।

$CO_2$ ও অন্যান্য গ্যাস আবহাওয়াতে যত বাড়ছে, তত তাপ বাড়ছে পৃথিবীতে। এর জন্যে দায়ী মানুষ। প্রকৃতির কার্বনবৃত্তকে মানুষ ধ্বংস করছে নানাভাবে। বন কেটে বসত বসছে। দক্ষিণ আমেরিকায় ব্রাজিলের বিশাল বৃষ্টিঝরা বনভূমি পুড়িয়ে দিয়ে খেতখামার তৈরি করছে, ফলে আবহাওয়ায় মিশছে $CO_2$, কার্বন মনোক্সাইড, মিথেন, নাইট্রোজেন অক্সাইড ও জলীয় বাষ্প। এই রকম অস্ট্রেলিয়ায়, মাদাগাস্কারে, আফ্রিকায় ও এশিয়ায় তৃণভূমি পুড়িয়ে ছারখার করছে মানুষ। বছরে পাঁচ কোটি একর বন ধ্বংস হচ্ছে। আফ্রিকার ৭০% জ্বালানি হয় কাঠ থেকে। ভারতে ৯০ শতাংশের বেশি লোক জ্বালানি হিসাবে ব্যবহার করে কাঠ বা কয়লা। গাড়ি–পেট্রোল ডিজেল। গ্যাস উনুন। এখনকার ৫০০ কোটি মানুষ একুশশো শতাব্দীর মাঝামাঝি দাঁড়াবে ১০০০ কোটিতে। আরো বেশি জ্বালানি লাগবে। আরো বেশি $CO_2$ মিশবে আবহাওয়ায় যা থাকতে পারে একশো বছর অবধি–জলীয় বাষ্পের পরই এর তাপ ধরে রাখার ক্ষমতা এবং মানুষ যতটা দায়ী পৃথিবীর তাপ বাড়িয়ে দেবার জন্যে, তার অর্ধেক হিস্যা এই $CO_2$-র।

মিথেন গ্যাস আবহাওয়াতে মিশলে থাকে দশ বছর, তাহলেও মিথেনের একটা অণু $CO_2$-র একটা অণুর তুলনায় ২০ গুণ বেশি তাপ ধরে রাখে। অক্সিজেন যেখানে থাকে না, সেখানে পচা-হাজা জৈবপদার্থ থেকে মিথেন তৈরি করে এক ধরনের বীজাণু। পচা জলা, গোরুর পেট থেকে বের হয় এই গ্যাস। একটা গোরুর পেট থেকে গড়ে রোজ ১৪ কিউবিক ফুট মিথেন বেরুতে পারে। পৃথিবীতে গোরুর সংখ্যা মানুষের থেকে বেশি বাড়ছে। মানুষের জন্যে যে তাপ বাড়ছে, মিথেনের দান তাতে ২০ শতাংশ।

ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন (CFC) নামে এক ধরনের গ্যাস ব্যবহার করা হচ্ছে ১৯৩০ সাল থেকে ফ্রিজ বা এয়ারকন্ডিশন মেশিন ঠান্ডা রাখতে বা ইনসুলেটরের কাজে। এটা লাগে ফোম প্লাস্টিকের কফি কাপ ও খাবারের বাক্স তৈরি করতে বা

কমপিউটারের যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করতে। যে দেশ যত উন্নত, সেখানে তত এ গ্যাসের ব্যবহার। যদিও খুব কম পরিমাণে আছে আবহাওয়াতে, তাহলেও এর তাপ ধরে রাখার ক্ষমতা $CO_2$-র থেকে ষোল হাজার গুণ বেশি। মানুষের জন্যে যে তাপ বাড়ছে, তাতে এই গ্যাসের দান ২০ শতাংশ।

নাইট্রাস অক্সাইড (লাফিং গ্যাস) বের হয় জৈব রাসায়নিক সার ব্যবহার করলে বা বন বা সারের জন্যে ঘাসপাতা পোড়ালে বা জ্বালানি জ্বালালে। $CO_2$-র তুলনায় তাপ ধরে রাখে ২০০ গুণ বেশি। মানুষ যে তাপ বাড়াচ্ছে, তার জন্যে এটা দায়ী ৫ শতাংশ।

প্রকৃতির নানা খেয়ালেও আবহাওয়ার তাপ বাড়তে পারে।

সাগর-মহাসাগর তাপ ধরে রাখার বড় আধার। তারা সারা পৃথিবীর আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণ করে। বছরে ৭০০ কোটি মেট্রিক টন কার্বন মিশছে বাতাসে, তার একটা বড় অংশ শুষে নেয় সাগরের জল। আবহাওয়াতে যদি আরও বেশি কার্বন মেশে, তাহলে সাগর কি তা শুষে নিতে পারবে ? এমন কোনো মাত্রা আছে কী না জানা নেই এ পর্যন্ত। জানা নেই সাগরজলের $CO_2$-র ধরে রাখার ঊর্ধ্বসীমা পার হয়ে গেছে কী না!

সাগর ও বাতাস যত বেশি গরম হবে, তত বেশি জলীয় বাষ্প ভাসবে বাতাসে, তৈরি করবে তত বেশি মেঘ। এই মেঘ আবহবিদ্‌দের কাছে আর একটা ধাঁধা।

মেঘ যেন এই গ্রহের জানালার সার্শি। সূর্য থেকে যে তাপ আসে, সেটা সামলাতে হয়ত সাগর এবং গ্যাসগুলোর থেকেও বড় ভূমিকা নেয়। দিনের বেলা পৃথিবীর কাছাকাছি ঘন মেঘে প্রতিফলিত হয়ে সূর্যরশ্মি মহাকাশে ফিরে যায়, পৃথিবী ঠান্ডা হয়। আবার রাতে মেঘ মাটি থেকে বিকীরিত তাপ ধরে রাখে, আবহাওয়া হয়ে ওঠে গুমোট গরম। উপরে ভাসমান হাল্কা মেঘ অন্যভাব কাজ করতে পারে, সবুজ বাড়ির কাঁচের ঢাকনার মতো থেকে বাড়াতে পারে পৃথিবীর তাপ। আবার ঝোড়ো মেঘ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় তাপ বয়ে নিয়ে ছেড়ে দিতে পারে।

সাগরের জল যখন গরম হবে ও বাড়বে, গ্রীনল্যান্ড কিংবা সুমেরু (দক্ষিণমেরু)-র বরফ যখন গলবে, সাগর উঠবে ফুলে। কয়েক হাজার বছর আগে শেষ তুষারযুগ কেটে গেছে। সে-কালের থেকে সাগর উঁচু হয়েছে ৩০০ ফুটেরও (৯৩ মিটার) বেশি।

যদি গ্রীনল্যান্ডের সব বরফ গলে যায়, তাহলে সাগর উঁচু হবে আরো ২০ ফুট (৬.০ মিটার)। আমেরিকার পূর্বদিকের সমুদ্র একশো বছরের ভিতর ১ ফুট (=৩০ সেন্টিমিটার) উঁচু হয়ে উঠেছে এবং আরো একশো বছর পর তার জলসীমা আর এক ফুট উঁচু হবে। তখন সাগরতীরের শহরগুলো যেমন মেরিল্যান্ড, ফ্লোরিডা; লুসিয়ানা যাবে সাগরের জলে তলিয়ে। মিয়ামি, ভেনিস, নিউইয়র্ক প্রভৃতি শহরে সাগরের ধারে দিতে হবে বড় বড় বাঁধ। কলকাতারও হতে পারে এক হাল। কলকাতা সাগরের পিঠ থেকে মাত্র ৬ মিটার উঁচু। সাগর থেকে মাত্র ১৪০ কিলোমিটার দূরে।

গত এক লক্ষ বছরের ইতিহাসে দশ হাজার বছর বাদ বাদ তুষারযুগ হানা দিয়েছিল পৃথিবীতে। যেহেতু পৃথিবীর তাপ বাড়ছে, সেই হেতু পরের তুষারযুগ আসতে দেরি হচ্ছে।

সূর্যের শরীরের তাপও সবসময় এক থাকে না–তার আলো, তাপ ও নানা বিকীরণ যা আসে পৃথিবীতে, তার একটু হেরফের হলে আবহাওয়া অনেকটা বদলে যেতে পারে। তিনশো পঞ্চাশ কোটি বছর আগে পৃথিবী যখন নতুন ছিল, সূর্য ছিল আরও ঝকমকে। সে তুলনায় এখন তার ঔজ্জ্বল্য কমে গেছে ২০-৩০ শতাংশ। ১৯৮৫ সালে আগের বছরের তুলনায় সামান্য একটু কমে গেছিল সূর্যের উজ্জ্বলতা–এক শতাংশের দশ ভাগের এক ভাগ। এতেও আবহাওয়ার বিরাট রদবদল হতে পারে।

চাঁদের মতো সূর্যেও আছে কলঙ্ক, সূর্যের মুখে কালো কালো এলাকা, বলে সূর্যবিন্দু। এগুলো বাড়লে তাপ বাড়ে। একবার বিন্দুগুলো মুছে গেছিল ছোট তুষারযুগে–ফলে ১৪০০-১৮০০ সালে ইউরোপে ছিল ভীষণ ঠান্ডা। বিন্দুগুলো বাড়ে কমে সূর্যের চৌম্বকক্ষেত্রের গোলমালের ফলে। এইরকম একটা কিছু গোলমাল হয়েছিল ১৯৮৯ সালে, তখন কানাডার একটা বিরাট এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেছিল, ফ্লোরিডা ও টেকসাসে দেখা গেছিল হঠাৎ লাল সবুজ সাদা আলোর ফুলঝুরি।

মানুষ নিজের কবর নিজে যে কীভাবে খুঁড়ছে, তার আর একটা উদাহরণ পৃথিবীর উপরের আকাশ যে ওজোন গ্যাসের ছাতা দিয়ে ঢাকা আছে, তাতে ফুটো হয়েছে তারই দোষে।

মাটির উপর আকাশে বারো কিলোমিটার অবধি এলাকাকে বলে ট্রোপোস্ফিয়ার। তারও উপরে (১২-৫০ কিলোমিটার) মহাকাশের এলাকাকে বলা হয় স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার।

ওজন গ্যাস অক্সিজেনের একটা রূপভেদ। অক্সিজেন গ্যাসে থাকে অক্সিজেনের দুটো পরমাণু অর্থাৎ $O_2$। ওজোন গ্যাসের অণুতে আছে তিনটি অক্সিজেনের পরমাণু, অর্থাৎ $O_3$। অক্সিজেন ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। শ্বাসের সঙ্গে নিই অক্সিজেন ওজোন ইত্যাদি কটু গ্যাস, ফুসফুসে গেলে জ্বালা করে। এ গ্যাস থাকতে পারে মাটির উপরে ঘনবসতি শহরের ধোঁয়াশায় মিশে, সাগরতীরে জানালার কাঁচের মতো থাকতে পারে এর পুরু আস্তরণ–আবহাওয়াকে যেন কলুষিতই করে, তবে ট্রোপোস্ফিয়ার ছাড়িয়ে উঠে যায় পরের স্ট্রাটোস্ফিয়ারে।

সেখানে এর কাজ একদম আলাদা–অতিবেগুনী রশ্মির কবল থেকে পৃথিবীকে বাঁচানো।

মাটি থেকে ঐ অতদূরে মহাকাশে ওজোনের পরিমাণ থাকে নামমাত্র ১০ পি পি এম (ppm)। কিন্তু ওজোনের প্রতিটি অণু যেন ভেলকি দেখায়। অতিবেগুনী রশ্মি যখন আঘাত করে একটা ওজোন অণুকে, তখন ওটা সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে হয় $O_2+O$।

ক্ষতিকারক অতিবেগুনী রশ্মি এর ফলে বাধা পায়, বদলে যায়, তাপ ছড়ায় শুধু, যা ক্ষতি করতে পারে না, আর সে তাপও পৃথিবীতে আসে না। ওজোন ভেঙে ঐ যে হলে $O_2+O$, পরে

মিলে গিয়ে আবার গড়ে $O_3$ বা ওজোন। তাই ওজোন নষ্ট হয় না, যেমন আছে তেমন থাকে। এই বৃত্ত ভাঙাগড়ার এ খেলা চলতে থাকে মহাকাশ জুড়ে, ওজোন কিছুতে অতিবেগুনী রশ্মিকে পৃথিবীতে ঢুকতে দেয় না, স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের স্তর থেকে ফিরিয়ে দেয়।

ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন (CFC) গ্যাস বিপদ ডেকে এনেছে ওজোনের। এই গ্যাস সহজে নষ্ট হয় না, কোনো কিছুর সংগে রাসায়নিক যোগও ঘটে না, বৃষ্টিও কিছু করতে পারে না–ধীরে ধীরে দশ বছরের ভিতর স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে চলে যায়, থাকতে পারে সেখানে কয়েকশো বছর।

CFC স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে ওজোন গ্যাসকে ধ্বংস করে। যখন অতিবেগুনী রশ্মি CFC অণুকে আঘাত করে, তখন তার থেকে ক্লোরিন (Cl) বের হয়। ঐ ক্লোরিন আঘাত করে ওজোন অণুকে। তখন তা ভেঙে তৈরি হয় ক্লোরিন মনোক্সাইড (ClO) এবং $CO_2$,তার পর ClO থেকে O টা খসে যায়, থাকে ক্লোরিন, যা আবার আরেকটা ওজোন অণুর সংগে রাসায়নিকভাবে যোগ দিয়ে তৈরি করে $ClO+O_2$। বৃত্তটা চলতে থাকে, ওজোন ভাঙে, আগে যেমন CFC না থাকাতে ওজোন গড়ে উঠেছিল, এখানে সেটা হয় না, ওজোন আবার গড়ে ওঠে না। একটা CFC অণু নষ্ট হবার আগে এক লক্ষ বার এরকমভাবে ওজোন অণু ধ্বংস করতে পারে।

তাই CFC-র পরিমাণ উপর আকাশে যত কম হোক না কেন, ফল হয় সাংঘাতিক। আশির দশকের মাঝামাঝি ধরা পড়ল দক্ষিণমেরুতে ওজোন ধ্বংস হয়েছে, ওজোনের ছাতা ফুটো হয়ে গেছে, ওজোন কমেছে ৫০ শতাংশ। নিম্বাস-৭ উপগ্রহ থেকে ওজোন কমার প্রামাণ্য ছবিও তুলেছেন বিজ্ঞানীরা।

পৃথিবীর দক্ষিণ গোলার্ধে বসতি কম। কিন্তু উত্তর গোলার্ধে আছে ঘনবসতি। সেখানেও ফুটো হতে অরম্ভ করেছে ওজোনের চাদর–তুলনামূলকভাবে কম–পনেরো থেকে সতেরো শতাংশ। এর ভিতর গত দশকে কমেছে চার থেকে ছয় শতাংশ।

তাই ক্ষতিকারক অতিবেগুনী রশ্মি বেশি পরিমাণে ঢুকছে পৃথিবীতে। ওজোন যদি ধ্বংস হয় এক শতাংশ, তবে চামড়ার ক্যানসার বাড়বে তিন শতাংশ। গত দশ বছরে পৃথিবীর আবহাওয়ার উপরিভাগ থেকে ওজোন কমেছে দু-শতাংশ, ফলে আরও চল্লিশ লক্ষ লোক ভুগছে চামড়ার ক্যানসারে। চামড়ার মারাত্মক ক্যানসার বেড়েছে ৫০%। এবং পরের দশ বছরে তা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়বে।

মানুষ পৃথিবীর অসুখকে কি গভীর থেকে গভীরতর করে তুলবে? টনক একটু আধটু নড়েছে। ৪০টি দেশ মিলে ঠিক করেছে, উন্নত দেশে ২০০০ সালের মধ্যে CFC-র উৎপাদন ১০০% বন্ধ করতে হবে, উন্নয়নশীল দেশের জন্যে সময়-সীমাটা বাড়ানো হয়েছে আরো দশ বছর। বনসৃজন বাঁচবার আর একটা পথ জ্বালানির অন্য বিকল্প ব্যবস্থা খুঁজতে হবে। সৌরশক্তি লাগাতে হবে কাজে। সৌর ব্যাটারিতে আজকাল ক্যালকুলেটার, এমনকি মোটর গাড়িও চলে। বাতাস থেকেও শক্তি পাওয়া যেতে পারে। মেটাতে পারে কোনো দেশের দশ শতাংশ চাহিদা। চোখ বুজে বসে থাকার সময় আর নেই।

ছবি: সুফি

# আকেকেল গুড়ুম

পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

'শিং' দিদি স্কুল যেতো
ট্রাই-সাইকেল চড়ে
রোজ রোজ স্কুল ভ্যান
দিদি তাতে চাপলেই
তারপর একদিন
দেখলাম দিন গেলো
সেই থেকে স্কুল থেকে
খেতে হয় এগারো ঘা
'হোম টাস্ক' না-করার
নতুন কবিতাগুলো

'পিং' বোন হাঁফ ছেড়ে
দিদির খেলনা নিয়ে খেলতো
পুতুলটা কোলে করে
নকল আটায় রুটি বেলতো!
ঘড়ি ধরা সকালে
যেই না বাজাতো এসে ঘণ্টা
উসখুস করতো যে
পিং-এর ফুকেতে ঢাকা মনটা!
'ড্রেস' পরে উঠলো যে
পিং সেই স্কুল ভ্যানে লাফিয়ে
শিং পিং দুজনকে
একসাথে স্কুল ভ্যানে চাপিয়ে!
ফিরে আসে পিং রোজ
হাতে নিয়ে প্লাস্টিক স্কেলটা
বাড়িতে 'টকিং' করে
গুড়ুম হয় যে আকেকেলটা
অপরাধে আমাকেই
'পানিসড' হতে যে হয় তখুনি
'ইরেজারে' মুছে যায়
খেতে হয় 'ইংলিশে' বকুনি!

ছবি: অমল চক্রবর্তী

# দাও ফিরে সে অরণ্য

## বৈদ্যনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

দিবা তার কঠিন দুটো হাতে মাটি কাটার যন্ত্র দিয়ে, মাটির স্তরগুলো কাটতে কাটতে যখন এগিয়ে যায় তখন তার মনে হয় কারা যেন তার চারপাশে ফিস্‌ফিস্‌ করে কথা বলছে। একদিন মাটিকাটা শেষ করে কুলিদের মাটি সরানো দেখতে দেখতে দিবার একটু ঝিমুনি এসেছে, এমন সময় সে শুনতে পেলো, মাটির তলা থেকে কারা যেন ধিক্কার জানিয়ে বলছে, পৃথিবীর মানুষদের কি কৃতজ্ঞতা বলতে কিছু নেই। যুগ যুগ ধরে, আমরা আমাদের পিঠ দিয়ে মানুষের অস্তিত্বকে বাঁচিয়ে রেখেছি। বুক নিংড়ে দিয়েছি ফসল, পানীয় জল আর সেই সঙ্গে মাটিতেই মানুষদের জন্মাবার এবং মরবার ভার বহন করেছি। এই মাটিতেই আমরা বিজ্ঞানী, বুদ্ধিজীবী, লেখক, লেখিকা ও অন্যান্য অনেককেই প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং অনেক মহাপুরুষ, অবতার ও আদর্শবাদী মনীষীদের চিহ্নিত করে মানুষের কল্যাণ সাধনে এগিয়ে দিয়েছি। আমাদেরই উত্তাপে গলে ঝরে পড়েছে বিদেশী শক্তি আবার আমাদেরই ওপর তৈরি হয়েছে শহীদ বেদী। আমরা আমাদের বুক দিয়ে আটকে রেখেছি কোটি কোটি রোগবাহী বীজাণু। এই দলবদ্ধ বীজাণুরা যদি পৃথিবীর মানুষকে স্পর্শ করে, তাহলে পারবে কি মানুষ পৃথিবীকে টিকিয়ে রাখতে। আমাদের সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়ে তোমরা তোমাদের কবরের পথ তৈরি করছ। তোমাদের আঘাতে আমাদের পিঠের চারপাশে যে গর্তের সৃষ্টি হয়েছে, সেই ফাঁক দিয়ে বীজাণুরা আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে, তোমাদের কাছে এসে মনের জ্বালা মেটাতে তোমরা মূর্খের স্বর্গে বাস করছ বলেই ভেবে নিয়েছ যে আমাদের অস্তিত্বকে খতম করে তোমরা গড়ে তুলবে আধুনিক পৃথিবী। আমাদের ওপর এই বর্বরোচিত আক্রমণের খেসারত দিতে হবে একদিন তোমাদের।

এই তো কিছুদিন আগে বিজ্ঞানের ঘেরাটোপ ভেদ করে, রাশিয়াকে কাঁপিয়ে তছনছ করে দিয়েছে, শুধুমাত্র কয়েকটা কিশোর মাটির স্তর। সেখানকার মানুষগুলো হঠাৎই একদিন ডুবে গেল মাটির গভীরে। পারলো রাশিয়ার মতো অতি আধুনিক বিজ্ঞানীপুষ্ট দেশকে বাঁচাতে। এখনও সময় আছে পথ পরিবর্তন করো। দেখছো তো জাপান আর ফিলিপিনসের আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখগুলো কি রকম জ্বলে উঠছে।

তোমরা হয়তো বলবে যে–বিহারের মজঃফরপুরে যখন ভূমিকম্পের তান্ডব চলেছিল তখন তো আমাদের পিঠে যন্ত্রদানবের আঁচড় লাগেনি বা বিজ্ঞান আমাদের আজকের মতো ভাবিয়ে তোলেনি। তবুও কেন নির্মমভাবে মানুষকে খতম করে তাদের সবকিছু কেড়ে নিয়েছিলে। এর উত্তর শুনতে চাও। তবে শোন, তোমাদের অর্থাৎ মানুষদের সামাজিক স্তরে, তখন যে অত্যাচার চলছিল, বিদেশী রাষ্ট্রের প্রভাবে এবং,

ভারতবর্ষের চেহারা তখন যে রূপ ধারণ করেছিল, সেই নির্মমতা দেখে আমরা মানুষের দুঃখে কেঁপে উঠেছিলাম আর তারই পরিণাম ভয়াবহ ভূমিকম্প। ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখতে পাবে যে, ভারতবর্ষের মাটিতে তখন রাজা, মহারাজা, সম্রাট, বাদশা থেকে শুরু করে ইংরেজ পর্যন্ত এই মাটি দখল নেবার জন্যে অগণ্য মানুষের রক্ত ছিটিয়ে দিয়েছিল আমাদের গায়ে। মাটি পবিত্র এবং জন্মভূমির মাটি আরও পবিত্র, তাই পবিত্র মাটির জন্যে যারা সংগ্রাম করেছিল, সেদিন তাদেরই উদ্দেশে শুরু হয়েছিল আমাদের কম্পন। হয়তো বলবে যে, বেশ কিছু নিরীহ মানুষ তো সেদিন আকালে মরে পড়েছিল। হ্যাঁ–পড়েছিল, যুদ্ধ যখন হয়, তখন কি বাছবিচার করা চলে? দেখছো না, বিশ্বের চারদিকে এখন ভূকম্পন-এর সংখ্যা বেড়ে গেছে কি ভাবে। এরও কারণ আবার জমা হয়ে যাচ্ছে–নিপীড়ন, অত্যাচার ও আত্ম অহংকার। তোমরা বিদেশীদের কাছে মাথা নত করেছ, ভুলে গেছ জন্মভূমি মাটির পবিত্রতা। বিদেশী শক্তির প্ররোচনায় এখন তোমরা হাতিয়ার ধরেছ নিজেদেরই খতম করতে। আমরা নিরীহ এবং উত্তাপহীন মাটি হলেও তোমাদের জন্যেই এই মাটি থেকে পরাধীনতাকে তাড়িয়েছি এবং সর্বস্ব দিয়ে আজও তোমাদের রক্ষা করে চলেছি।

বাবু–বাবু, সাঁজ ধরে গেছে, তাঁবুতে ফিরবেন না?

দিব্য ধড়মড় করে উঠে বসে বললো, কে রাম সিং।

রাম সিং বললো, হুজুর হামি দেখলুম যে, আপনি স্টিয়ারিং পর, শির লাগিয়ে নিদ যাচ্ছেন।

দিব্য বললো, হ্যাঁ আমি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

শহর থেকে কিছু দূরে আজকাল তৈরি হচ্ছে আধুনিক কায়দায় ও নামে অসংখ্য ইমারত। জংগল, ডোবা, অরণ্য পরিষ্কার করে অতি আধুনিক নামে পরিচিত হয়ে জাতে উঠছে সেই সব জায়গা। খোলা মাঠের একপাশে একটা বকুল গাছের তলায় তাঁবু খাটিয়ে সেখানে হয়েছে মাটি কাটার দপ্তর এবং অফিসবাবু, ইঞ্জিনীয়ার, যন্ত্রদানব চালাবার ড্রাইভারদের থাকার ব্যবস্থা। ঠিক এরই উল্টো দিকে আদিবাসী কুলিদের মাথা গোঁজার ঠাঁই। মাদল বাজিয়ে গান আর নাচই সময় কাটাবার এদের একমাত্র পথ। তাই পূর্ণিমার চাঁদ যখন সমস্ত মাঠকে সাদা চাদরে মুড়ে দিয়ে যায়, তখন ওরা উল্লাসে ফেটে পড়ে। কাঠের উনুন থেকে বাতাসে ভেসে আসে রান্নার গন্ধ। দুদিকের তাঁবুর মাঝখানে শুধু চাপ চাপ মাটি আর কাদা জল ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। দিব্য শুনতে পাচ্ছে আদিবাসীদের মাদলের আওয়াজ আর বাঁশির সুর।

রাতের খাওয়া শেষ করে, ক্লান্ত দেহটা বিছানায় এলিয়ে দিয়ে দিব্য শুয়ে পড়লো এবং জোনাকিদের আলোর মালা দেখতে দেখতে তলিয়ে গেল ঘুমে। পিলপিল করে মাটির ফাঁক দিয়ে উঠে আসছে কোটি কোটি বীজাণুর মিছিল, পায়ে পায়ে নিঃশব্দে দিব্যর খাটিয়ার দিকে এগিয়ে আসছে। ওদের চোখে মুখে প্রতিবাদের ভাষা। দিব্য ঘামছে।

ওরা বলছে, তোমরা মাটির স্তর চূর্ণ করে দিয়ে আমাদের মুক্তি দিয়েছ। আমরা বহুকালের বীজাণু, যুগ যুগ ধরে আটকে ছিলাম মাটির বুকের নিচে। আমাদের বন্দীদশা ঘোচাবার জন্যে আধুনিক যন্ত্রদানব এবং নতুন চিন্তাধারার মানুষকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। এত দিন ধরে মাটি আমাদের ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল অ-সভ্যতার সুযোগ নিয়ে। তোমাদের বর্তমান সভ্যতাই আমাদের মুক্তির কারণ। মাটির আস্ফালন শুধু মাটিতেই। আমরা এবার বাতাসে ভাইরাস ছড়িয়ে মানুষের দেহে বিভিন্ন রোগ নিয়ে ঢুকে বাসা বাঁধবো আর ছড়িয়ে দেবো আমাদের বহুদিনের জমানো নানা রোগ, পৃথিবীর মানুষদের মধ্যে। মাটি থেকে ভূমিকম্প আসার আগেই আমরা আনবো মহামারী, মড়ক এবং মৃত্যু। আধুনিক চিকিৎসার সাধ্য নেই, অতীতের রোগবীজাণুকে ধ্বংস করবে। অতীতের রোগকে ধ্বংস করতে পারে একমাত্র অতীতেরই চিকিৎসা কিন্তু এই চিকিৎসা চালাবার জন্যে যে সমস্ত লতা পাতা বা শেকড়ের প্রয়োজন সেগুলো এখন দুষ্প্রাপ্য। কারণ অরণ্য তোমরা ধ্বংস করে বসে আছ। অরণ্য না থাকলে যে জীবজন্তু প্রাণী বাঁচে না–সে কথা কিন্তু আধুনিক যুগের সভ্য মানুষরা জানে না।

দিব্যর ঘাম ভিজিয়ে দিয়েছে বালিশ। ভীষণ তেষ্টা নিয়ে দিব্য জেগে উঠে বিছানায় বসে পড়লো। নিজেকে একটু সামলে নিয়ে হারিকেনের আলোয় এগিয়ে গিয়ে কলসি থেকে জল গড়িয়ে কিছুটা জল খেয়ে আবার ফিরে এল বিছানায়। দূরের সেই সাদা চাঁদটা এখন বেশ নিষ্প্রভ, সোঁ সোঁ করে বাতাস বইছে। বালিশের তলায় রাখা হাতঘড়িটা বার করে দিব্য দেখলো রাত তিনটে। তাঁবুর ওপরে বকুল গাছের ডালগুলো মাঝে মাঝে ধাক্কা মারছে ঠিক মা যেমন করে সন্তানকে ঘুম পাড়াবার সময় সোহাগের হাত দিয়ে চড় মারে সেই রকম। সামনের মাঠে কাদাঘোলা জলে চাঁদের ছায়াটা শুধু কাঁপছে। বকুলের স্নেহ ঘেরা তাঁবুর ভেতরে ভোরের হাওয়া দিব্যকে আবার ঘুম পাড়িয়ে দিল এবং সেই বকুল গাছটা অরণ্যের প্রতিনিধি হয়ে দিব্যকে বললো, বাছা ঘুমোও। আমরা অরণ্যের বাসিন্দা হলেও আমাদের ছায়া নীড়ে যারা আশ্রয় নেয় তাদের মমতাময়ী মায়ের মতো রক্ষা করি। জল, ঝড় এবং বজ্রপাতে নিজেকে নিংড়ে দিয়েও আশ্রিতদের বাঁচাই। অরণ্যের এই একটাই ধর্ম। তোমাদের বিজ্ঞানেও অতি আধুনিক চিন্তাধারায় মাতৃহত্যার যে পরিকল্পনা রয়েছে তাতে তোমরাই অরণ্যহীন হয়ে মাতৃহারা হবে। তুমি এখন ঘুমোও।

বন্ধুগণ, আমরা কাঁপছি। আমাদের স্তব্ধতাকে যন্ত্রের আওয়াজে এবং আক্রমণে যারা জখম করছে, তাদের প্রতিরোধ করতে এগিয়ে চলো। ভাইসব, মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে ওদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে আমরা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলবো। এগিয়ে আসছে মিছিল। তাল তাল মাটি কালো কাদার রক্ত ছড়িয়ে এগিয়ে আসছে। চাপ-চাপ মাটির মাংসগুলো থেকে আওয়াজ আসছে ঝপাং ঝপ্। চারদিকে কাদা-গোলা জল ছড়িয়ে ছিটিয়ে ওরা আসছে। দূরের চাঁদও ভয়ে মুখ লুকোচ্ছে মেঘের মধ্যে, পৃথিবীর আসন্ন ধ্বংস দেখে। মাটির উগ্র বাসিন্দারা শ্লোগান তুলে বলছে, ভেঙে ফেলো ভালবাসার বন্ধন। আমাদের বুকে যারা জন্মেছে, বড় হয়েছে, ফসল তুলেছে, জীবনধারণ করেছে, ইমারত বানিয়েছে তারাই আজ আমাদের ওপর বোমা ফাটিয়ে চালাচ্ছে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা আর আমাদের অস্তিত্বকে করছে অস্বীকার।

যন্ত্রদানব নিয়ে দিব্য মাটি কাটতে কাটতে সমানে এগিয়ে

চলেছে। হঠাৎ যন্ত্রটা গেল আটকে। দিব্য স্টিয়ারিং ছেড়ে মাটিতে নেমে এসে দেখলো, একটা লম্বা পাথর যন্ত্রদানবের গতিকে আটকে দিয়েছে। জনা পাঁচেক কুলি দিয়ে পাথরটাকে তুলে তাঁবুতে পাঠিয়ে দিয়ে দিব্য আবার স্টিয়ারিংটা শক্ত করে চেপে ধরে যন্ত্রদানবকে এগিয়ে নিয়ে গেল তার গতিতে। সারাদিনের কাজ সেরে দিব্য ক্লান্ত হয়ে তাঁবুতে ফিরলো। পরের দিন সাপ্তাহিক ছুটি ও বিশ্রাম এবং কাজের হিসেব আর অর্থ পাওয়া। আজ ভাল খাওয়া-দাওয়ারও আয়োজন হয়েছে তাঁবুতে। প্রতি সপ্তাহেই ছুটির আগের দিন ভাল খাওয়া এবং ছুটির দিনে শুধু ঘোরাফেরা কিংবা পরিচিত কারুর সঙ্গে দেখা করা। আদিবাসী কুলিরাও ছুটির দিনে বেরিয়ে পড়ে এদিক-ওদিক,একঘেয়েমি কাটানোর জন্যে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে অনেক রাত হলো দিব্যর বিছানায় যেতে। পেঁজা তুলোর মতো মেঘের ব্যারিকেড, বাতাসও কমে গেছে। একটা গুমোট ভাব। দিব্য বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনতে পেলো মেঘের গর্জন আর বৃষ্টির আওয়াজ। রাত মানেই এখন দিব্যর কাছে বিভীষিকা। চোখ বুঝলেই অতীত এসে ওর ঘুম ভাঙায়। দিব্য মাঠের দিকে তাকিয়ে,কেটে রাখা মাটির দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলো, মাটির স্তূপ ধুয়ে গিয়ে, আবার কালকের রোদে জমাট বাঁধবে আবার সেই মাটিকে পরশুদিন কাটতে হবে আর একই কাজ দুবার করে, কাজের মাপও বাড়বে না এবং তার ফলে সাপ্তাহিক পয়সাটাও কম পাবে। কাজের মাপের ভিত্তিতেই এখানে টাকা দেওয়ার নিয়ম।

কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিল দিব্য জানে না। হঠাৎ মনে হলো কে যেন তাকে ধাক্কা দিয়ে বলছে, আমি আমার অস্তিত্ব নিয়ে, মানবসভ্যতা থেকে অনেক দূরে মাটির গভীরে ছিলাম, দু-হাজার বছর ধরে। আমাকে নিয়ে তোমাদের আধুনিক জগতের কবি এবং সাহিত্যিকরা অনেক কিছুই লিখেছে। ভূতত্ত্ববিদরাও অঙ্ক কষেছে। স্রেফ মিথ্যে কিছু প্রমাণ ও কাহিনীতে রং চাপিয়ে কেউ বা আবার পুরস্কারও পেয়েছে। মানুষের কাছে ভুল তথ্য দিয়ে তোমাদের সমাজব্যবস্থাকে যারা আঘাত করেছে, তারাই আজ তোমাদের সমাজে সমাদৃত।

দিব্য বললো, আপনি কে?

মূর্তিটি বললো, আমি অতীত, আমি ইতিহাস।

দিব্য বললো, কিন্তু আমি তো–

মূর্তিটি বললো, হ্যাঁ–তুমি বর্তমান এবং পরিহাস। অতীতকে মুছে ফেলে, আজ বর্তমান নিজের ঢাক নিজেই পেটাচ্ছে। কিন্তু ওহে, বর্তমান তোমাদের জন্ম কোথা থেকে? আসলে তোমরা জানোই না যে, কি বলছ, এবং কি করতে চাইছ।

দিব্য বললো, বর্তমান যা কিছু করছে সবই আগামী প্রজন্মের জন্যে। কারণ জনসংখ্যা যে হারে বেড়ে চলেছে তাতে আপনাদের সেই সীমাবদ্ধ সীমানা, বিশ্বাস ও শ্রেণীভেদ ইত্যাদি মেনে নিলে, জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম হয়ে যাবে। তাই জঙ্গল কেটে শহর গড়ে তুলছি শ্রেণীহীন মানুষদের অসীম আনন্দ ও শান্তি দিতে।

মূর্তিটি বললো, যুক্তি ঠিকই খাড়া করেছ, কিন্তু শহর গড়তে গিয়ে জঙ্গল ধ্বংস করা মানেই বাসস্থানের ক্ষতি করছ তোমরা। বাতাসকে বিষাক্ত করে কি সুখে শান্তিতে থাকা যায়।

দিব্য কি একটা বলতে যেতেই আবার একটা ধাক্কা এবং রাম সিং বললো, বাবু নাস্তা করে নিন, বেলা হয়ে গেছে।

দিব্য একটা বড় করে হাই তুলে রাম সিংকে জিজ্ঞেস করলো, কটা বাজে?

রাম সিং বললো, সাড়ে সাত।

পরের দিন সকালে শুরু হলো নিয়মিত কাজ। কাজের চাপে দিব্য ভুলে গেছে গতকালের সন্ধ্যেবেলার ঘটনা। চাপ চাপ মাটি উঠছে আর জমা হচ্ছে একধারে। মাটি সরাতে গিয়ে হঠাৎ কুলিরা কাজ বন্ধ করে দিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

দিব্য স্টিয়ারিং ছেড়ে মাটিতে নেমে পড়ে কুলিদের সর্দারকে জিজ্ঞেস করলো, কি হলো, কাজ বন্ধ করে কুলিরা দাঁড়িয়ে পড়লো কেন?

কুলিসর্দার একটা মাটির স্তূপের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললো, বাবু ইখানে শুধু লাশ উঠছে। কেউ কাজ করতে চাইছে না।

দিব্য কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে সেই মাটির স্তূপের কাছে গিয়ে দেখলো, বেশ কিছু হাড় এবং কঙ্কাল মাটির মধ্যে মিশে রয়েছে।

কুলিরা আস্তে আস্তে সবাই কাজ বন্ধ করে দিয়ে নিজেদের তাঁবুর দিকে চলে গেল, নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে করতে।

তাঁবুতে ফিরে দিব্য তার সুপারভাইজার মিঃ দত্তকে সব ঘটনা জানালো, কিন্তু কোনো কিছু ব্যবস্থা নেবার আগেই সেই রাতেই কুলিদের তাঁবু খালি হয়ে গেল।

একটা বিশ্রী আবহাওয়াকে পাশ কাটিয়ে, দিব্য সোজা গিয়ে হাজির হলো সুপারভাইজার মিঃ দত্তর তাঁবুতে।

মিঃ দত্ত বললেন, কি ব্যাপার দিব্য, তোমাকে যেন চিন্তিত বলে মনে হচ্ছে, আবার ফিরে এলে!

দিব্য বললো, সুভদ্রা পার্কের কাজে ইস্তফা দেবার জন্যে আমি আপনার কাছে এসেছি।

মিঃ দত্ত হেসে বললেন, ইয়ং ম্যান, তুমিও কি কুলিদের মতো ভয় পেলে।

দিব্য বললো, না মিঃ দত্ত ভয় আমি পাইনি। তবে গত কয়েক দিন ধরে আমি যা স্বপ্ন দেখেছি তাতে আমার মনে হয়েছে যে, শহর গড়তে গড়তে আমরা যেভাবে প্রকৃতিকে হত্যা করে চলেছি তাতে আমরা আমাদের আগামী প্রজন্মদের সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকার ব্যাপারে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছি।

দিব্য মিঃ দত্তর তাঁবু থেকে পায়ে পায়ে এগিয়ে চললো নিজের তাঁবুর দিকে। সুভদ্রা পার্ক নিস্তব্ধ। আগামী সূর্য ওঠার আগেই দিব্য এখান থেকে চলে যাবে। তারপর আন্দোলন করবে অরণ্য বাঁচাতে, পরিবেশকে দূষণমুক্ত করতে। স্লোগান দেবে, দাও ফিরে সে অরণ্য, বাঁচাও মানুষকে।

ছবিঃ রাহুল মজুমদার

শুকতারার বন্ধুরা,

ভালো আছো তো সকলে ?

কি মজা—আবার পুজো এসে গেলো। তা পুজো সংখ্যা হাতে এসে যাওয়া মানেই তো পুজো এসে যাওয়া তাই না। শুকতারার এবারের পুজো সংখ্যা তোমাদের কেমন লাগছে ? কার লেখা কেমন লাগলো জানাবে কিন্তু ! এবারের পুজো সংখ্যা ঠিক তোমাদের মনের মতো করে করা হয়েছে। এখন দেখো তোমাদের কেমন লাগে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা তাঁর নিজেরই ছবি আর অপ্রকাশিত কবিতাটা নিশ্চয়ই তোমাদের মন ভরিয়ে দিয়েছে।

এখন কি তোমরা কোনোদিন আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখেছো নীল আকাশে সাদার মেঘের দল পাখির মতো কেমন সুন্দর ডানা মেলে উড়ছে। শরতের আকাশ যে ঐ রকমই হয়। আর একটু খেয়াল করে দেখো বাতাসে ভাসছে কেমন যেন একটা পুজো-পুজো গন্ধ। আসলে শিউলির সুবাস তোমাদের দাদুমণিকে টেনে নিয়ে যায় তার ছোটবেলার দিনগুলোতে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে বিশাল পুজোর দালানে পালমশাইয়ের ঠাকুর তৈরি করার দৃশ্য। তারপর মহালয়া কেটে গেলেই শুরু হয়ে যেতো হৈহৈ কাণ্ড। বোধনতলা পরিষ্কার করা হতো, বলিদানের জায়গাটায় বালি ফেলে হাঁড়ি-কাঠ পোঁতা হতো। হাঁড়ি-কাঠ দেখে আমার খুব হাসি পেতো। হাসি পাবে না ? ছাগলের বদলে বলি দেওয়া হতো চালকুমড়ো আর মহিষের জায়গায় আখ। তা আমাদের কিন্তু ভালোই লাগতো। রক্ত-টক্তর ব্যাপার ছিলো না তো ! পুজোর ক'দিন চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কুড়ি ঘণ্টাই আমাদের পুজোর দালানে কাটতো। তখন কিন্তু একদম ভয় করতো না। রাত্তিরেও দিব্যি একা একা যেতাম। বড় বড় গোখরো সাপগুলো পুজোর ক'দিন আর বেরুতো না। অন্য সময় প্রায়ই সন্ধ্যের পর ওদের ফোঁস ফোঁস শব্দ কানে আসতো। অথচ পুজোর সময় সব কেমন চুপচাপ। ব্রহ্মদৈত্যর ভয়ও পেতাম না তখন। অথচ অন্য সময় রাত্তিরে ঘুম ভেঙে গেলে পুজোর দালানের পাশের ঘরে শুয়ে শুয়ে আঁতকে উঠতাম এই বুঝি ব্রহ্মদৈত্যর খড়মের শব্দ শোনা গেলো। উনি নাকি বোধনের বেলগাছে থাকেন। টকটকে গায়ের রং, বিশাল চেহারা, পরনে ধুতি, গলায় মোটা পৈতে। মাঝ রাত্তিরে উনি বেলগাছ থেকে নেমে পুজোর দালানে ঘোরাঘুরি করেন। আমি অবশ্য খড়মের শব্দ-টব্দ কোনোদিন শুনিনি। তবে বিশ্বাস করতাম ওঁরা আছেন। তা যে বাড়ি লর্ড ক্লাইভের আমলে তৈরি, যে বাড়িটার এদিক থেকে ওদিকে হেঁটে যেতে পাক্কা পনেরো মিনিট লাগে, যে বাড়ির অজস্র ঘরটরগুলো পুজোর সময় ছাড়া বাকী সময়ে বন্ধ থাকে সেই বাড়িতে ভূত-টুতের না থাকাটাই তো বিস্ময়ের ব্যাপার।

আমি থাকতাম পুজোর দালানের লাগোয়া বিশাল একটা ঘরে। ঘরটা এতো বড় যে রীতিমতো ফুটবল খেলা যেতো। আমরা বলতাম বাইরের ঘর। সেই ঘরের পেছনের দরজা দিয়ে বেরুলেই পুজোর দালানের সামনের চক। সেই চকের নিচে ছিলো গুপ্ত ঘর। জমিদারবাবুরা নাকি তাঁদের দুষ্টু প্রজাদের শায়েস্তা করতেন ঐ ঘরে। চকের উল্টো দিকে ছিলো মস্ত বড় ভাঁড়ার ঘর। সেই ঘরে সিঁড়ি ছিলো গুপ্তঘরে নামার। কিন্তু সাপের ভয়ে ঐ ভাঁড়ার ঘরেই কেউ যেতো না। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামা তো দূরের কথা ! তবে পুজোর সময় সবাই ও ঘরে যেতো। পুজো থাকলে ফলটল কাটা হতো ঐ ঘরে। সাপরাও তখন দিব্যি ভালো ছেলের মতো লুকিয়ে থাকতো। অন্য সময় ঘরের বাইরে থেকে সাপের ফোঁসফোঁসানি শোনা যেতো।

দুর্গাপুজো থেকে কালীপুজো পর্যন্ত দালান জমজমাট থাকতো। চকে বিশাল স্টেজ বেঁধে থিয়েটার হতো। জলসা হতো। আরও কতো কী যে হতো ! কালী পুজোর পর অমাবস্যার অন্ধকার আবার ছেয়ে থাকতো দালানে। বিকেলের দিকে আমরা একটা আধটু খেলতাম, কিংবা কোনোদিন বিপদে পড়া লক্ষ্মী পেঁচাকে বাঁচাতে কাক-চিল তাড়াতে হল্লা করতাম। তারপর প্রতীক্ষা করতাম আবার কবে পুজো আসবে। রথের দিন কাঠাম কাটা হতো। সেইদিন থেকে শুরু হতো আমাদের দিন গোনা। পালমশাই প্রথমে কাঠাম তৈরি করে ফেলতেন। তারপর খড় বেঁধে তার ওপর মাটির কাজ করতেন। দো মেটন হবার পর ঠাকুরদের মুখ বসতো। তখন আমাদের উৎসাহ দেখে কে ! ততোদিনে নারায়ণের ঘরে পুজোর ঘট বসে গেছে। রোজ দুবেলায় ঢাক বাজছে ড্যাং-ড্যা ড্যা-ড্যাং, কাঁসি বাজছে তাই-না-না, তা-ই-না-না করে। তার মানে পুজো এসে গেছে।

এখনো পুজো এলেই আমার ছোটবেলার সেই সব হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যায়। সেই পুজোর দালান এখনও আছে,যদিও গত বছর তার ছাদ ভেঙে গেছে, সেই চক আজও তেমনি আছে, তেমনি বয়ে চলেছে ইছামতী নদী, সবই ঠিক আছে নেই শুধু সেই মনটা। জানো তো মানুষের জীবনে সব থেকে ভালো সময় হলো তার ছোটবেলাটা। বড় হয়ে গেলে ছোটবেলার কথা ভাবতে কী যে ভালো লাগে ! এই ধরো না তোমাদের দাদুমণিকে। পুজো এলেই তার মনে পড়ে যায় ছোটবেলার কথা। চোখের সামনে ভেসে ওঠে হারিয়ে যাওয়া সেইসব দিনের দৃশ্য।

তোমরা নিশ্চয়ই ভাবছো, দাদুমণির হলোটা কী ? নিজের ছোটবেলার কথা বলতেই ব্যস্ত। আমার ছোট্ট বন্ধুরা, দুদিন পরে তোমরাও বড় হয়ে যাবে। তখন দেখবে ছোটবেলার কথা ভাবতে, ছোটবেলার গল্প বলতে কি ভালোই না লাগে। এক কাজ করো না। খাতায় কিংবা ডায়েরিতে পুজোর ক'দিন তোমরা কি মজা করলে, কোথায় গেলে, কতো ঠাকুর দেখলে, কি খেলে—সব লিখে রাখো। সেই সঙ্গে যে সব ঘটনা ঘটবে তাও। পরে দেখবে ওগুলো পড়তে ভীষণ ভালো লাগবে। ইচ্ছে করলে গল্পও লিখে ফেলতে পারবে।

ও সব কথা থাক। তোমরা তো এখন পুজো সংখ্যা পড়া নিয়ে ব্যস্ত। আমায় কিন্তু জানাবে, কার লেখা কেমন লাগলো। নতুন কিছু চাইলে তাও লিখে পাঠিও কেমন !

পুজোর সময় খুব মজা কোর, অনেক ঠাকুর দেখো, কেউ কেউ তো বেড়াতেও যাবে—তবে যে যাই কোর না কেন সব সময় নিজেকে বাঁচিয়ে করবে। দেখো শুকতারার বন্ধুরা কেউ যেন কোনো ঝামেলায় পড়ো না।

আজ তাহলে এই পর্যন্তই। অনেক আদর আর ভালোবাসা নাও।

জয় হিন্দ।

তোমাদের দাদুমণি

# তোমাদের পাতা

দেবব্রত সরকার
বয়স সাত, দ্বিতীয় শ্রেণী
হিন্দু স্কুল, কলকাতা

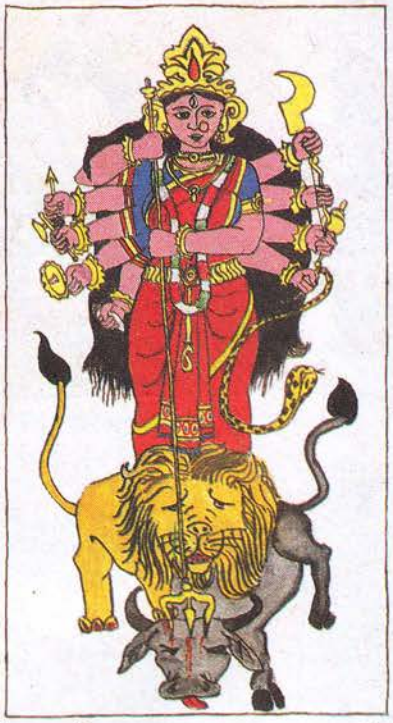

সৈকত সিন্‌হা, বয়স বারো, সপ্তম শ্রেণী
রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ, পুরুলিয়া

## মা দুর্গা

চতুর্দিকেই বয়ে চলে মলয় মৃদুমন্দ
তারই সঙ্গে ভেসে বেড়ায় পূজার মিষ্ট গন্ধ।
গাছে গাছে ফুল ফুটিয়ে দশভুজা আসছে
রংবেরঙের পদ্ম শালুক দীঘির জলে ভাসছে।
শিউলি গাছে শিউলি ফুল কদম গাছে কদম
আসছে শুভ মহালয়া মা দুর্গার বোধন।
নদী তীরে কাশফুল মৃদু হাওয়ায় দুলছে
ঠিক যেন মার মাথার উপর সাদা চামর ঝুলছে।
পদ্মদীঘির কালো জলে বেড়ায় শ্বেতহংস
মহিষাসুর-মর্দিনী মা করে অসুর ধ্বংস
হাতে নিয়ে বরণ-ডালা বাঙালী-মা সাজছে
চারিদিকে ঢ্যাং-কুরাকুর ঢাকের বাদ্যি বাজছে।
মা আসছেন চতুর্দোলায় সাজিয়ে চতুর্দিক
আত্মহারা বাঙালীরা তাই আনন্দে নেই ঠিক।
নীলাকাশে নীলাম্বরী শুভ্র মেঘের ছটা
মা আসছে মর্তে নেমে তাইতো এতো ঘটা।
বাপের বাড়ি আসছে মেয়ে তিনটি দিনের তরে
আবার সে ফিরে যাবে দিন ফুরোলে পরে।

অঞ্জন রায়, বয়স আঠারো, দ্বাদশ শ্রেণী, কলিকাতা

## গল্প হলেও সত্যি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম আমরা সবাই জানি। অনেক কষ্টে লেখাপড়া শেখেন। এরপর তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে চাকরি পান। এখান থেকে তিনি সংস্কৃত কলেজে উপাধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। তখন কলেজের ছাত্র এবং অধ্যাপক কেউই সময় মতো আসতেন না। বিদ্যাসাগর অনেক ভেবে চিন্তে একটি অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করলেন। যখনই দেখতেন একজন অধ্যাপক দেরি করে আসছেন তখনই তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলতেন, 'এইমাত্র এলেন বুঝি ?' এতেই কাজ হলো। তবে জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন নামে একজন অধ্যাপক কিছুতেই সময় মতো আসেন না। বিদ্যাসাগর শুধু কলেজের সামনে দাঁড়িয়ে থাকেন। জয়নারায়ণবাবু একদিন রেগে বললেন, 'তুমি যে কিছু বলো না, এটাই সর্বনাশ করেছে। কিছু বললে তো একটা জবাব দিতে পারতাম। আচ্ছা দেখি কাল থেকে ঠিক সময়ে আসতে পারি কিনা।'

বিদ্যাসাগর কয়েক বছর পরে এই কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। বিদ্যাসাগরই এই বিদ্যায়তনের বিধি ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করেন।

সুশান্ত রক্ষিত, বয়স এগারো, ষষ্ঠ শ্রেণী
রমণীকান্ত ইনস্টিটিউশান, রামেশ্বরপুর, হুগলী

অপরাজিতা বসু
বয়স চোদ্দ, নবম শ্রেণী
হোলি চাইল্ড ইনস্টিটিউট, কলকাতা

শুভম মুখোপাধ্যায়, বয়স এগারো, পঞ্চম শ্রেণী
সালকিয়া হিন্দু হাই স্কুল, হাওড়া

মণিকণিকা ভৌমিক, বয়স আট, তৃতীয় শ্রেণী
সেন্ট্রাল কল্যাণী চিলড্রেন্স হোম, নদীয়া

## লড়াই

লড়াই....লড়াই....লড়াই....!
চারদিকে এই কথাটির দেখি চলছে শুধুই বড়াই।
হয়েছেটা কি আমাদের এই বিশ্বের!
মহামারী নয়, ক্যান্সার নয়, রোগটা কি তবে হিংসের!
লড়ছে কুয়েত, লড়ছে ইরাক, লড়ছে আমেরিকা,
এই অসুখের প্রতিষেধক নাই! নাই কি কোনো টিকা?
অনেক ভাবি, অনেক ভাবি, উপায় কিছুই পাই না,
তবু হিংসার এই বীজকে আমি গাছ হতে দিতে চাই না।

আশুতোষ ভট্টাচার্য, বয়স চোদ্দ, নবম শ্রেণী
সরকারী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়, করিমগঞ্জ, আসাম

অরুণাংশু ভট্টাচার্য, বয়স আট, তৃতীয় শ্রেণী
ডনবসকো স্কুল, কলকাতা

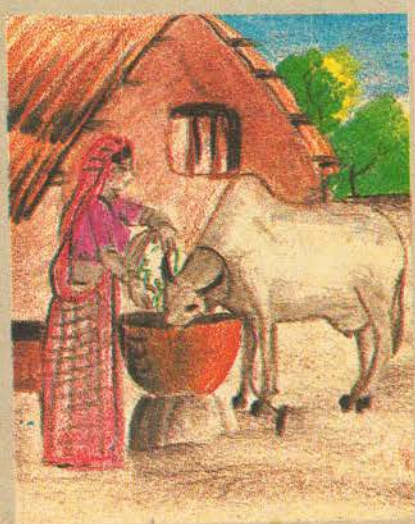

সুদীপ্ত হালদার, বয়স বারো, সপ্তম শ্রেণী
কে. কে. হিন্দু একাডেমী, বিরাটি

## গাছ কেটো না

গাছপালাকে কাটলে পরে
প্রকৃতি হয় নষ্ট,
অনাবৃষ্টিতে মানুষ তাই
পায় ভীষণ কষ্ট।
গাছকে দেখো গাছকে বাঁচাও
লাগাও গাছের চারা,
গাছ যারা কাটে
সমাজের পরম শত্রু তারা।
তাই তো বলি, সবাই বলো
গাছ আমাদের প্রাণ
গাছ হলো প্রকৃতির
অমূল্য এক দান।

রমিতকুমার রায়, বয়স তেরো, সপ্তম শ্রেণী, সাউথ পয়েন্ট স্কুল, কলিকাতা

অমিত ঘোষ, বয়স তেরো, সপ্তম শ্রেণী
শিলিগুড়ি বয়েজ হাই স্কুল

# মিঙ রাজাদের সমাধিক্ষেত্রে

সুমন ভট্টাচার্য

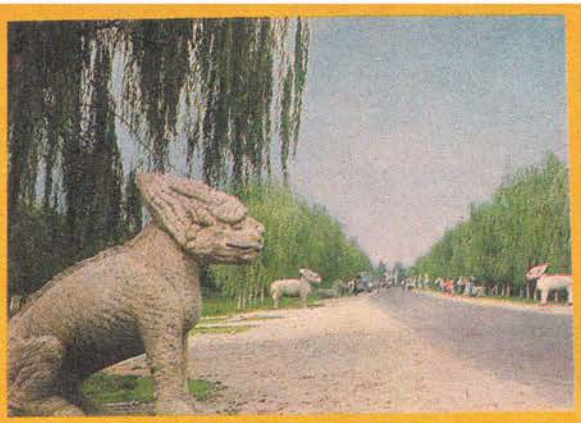

মিঙটুম্বের প্রবেশতোরণের দুপাশ

নিশ্চয়ই মনে আছে, ঠিক এক বছর আগে এই সময় পিকিংয়ে এশীয় ক্রীড়ার আসর বসেছিল। আমি তখন চীনে গিয়েছিলাম সাংবাদিক হিসেবে এশিয়াড কভার করতে। তা এশিয়াডের খবর-টবর তো রোজ কলকাতায় আমাদের কাগজে পাঠাতাম। আর সময় পেলেই এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতাম। চীনে কতো কী যে দেখার আছে। চীনের প্রাচীর, সামার প্যালেস, রাজবাড়ি–তা সে সব কথা তো শুকতারায় আগেই লিখেছি। আজ লিখছি মিঙ রাজাদের সমাধিক্ষেত্রের কথা। সমাধিক্ষেত্র যে এত বৈচিত্র্যপূর্ণ হতে পারে তা এখানে আসার আগে ভাবতেও পারিনি। সেই সমাধিক্ষেত্রে যেতে এক আধ নয় পুরো সাততলা অবধি নিচে নামতে হয়েছিল। আর জায়গাটা এত বড় যে খালি মনে হচ্ছিল, এই বুঝি হারিয়ে গেলাম!

চীনের ইতিহাসে মিঙরাজবংশ অনেকটা জায়গা দখল করে আছে। তাছাড়া শেষ প্রকৃত চৈনিক রাজবংশও ছিল ঐ মিঙরাজবংশ। সেজন্যও চীনাদের কাছে এই রাজবংশ অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়। আজ থেকে প্রায় সাড়ে ছ'শ' বছর আগে, ১৩৬৮ সালে মোংগলদের হাত থেকে মিঙেরা দেশের অধিকার কেড়ে নেন। প্রথম রাজা ছিলেন একজন বিদ্রোহী বৌদ্ধ সন্ন্যাসী, যাঁর নাম ছিল ঝু ইউয়ানঝাং। মাত্র ১৪ বছরের চেষ্টায় ঝু প্রায় সমগ্র চীনকে ঐক্যবদ্ধ করেন। পরবর্তী প্রায় ৩০০ বছর, ১৬৪৪ সাল অবধি এই মিঙরাজবংশ চীনকে শাসন করেন। তাঁদের আমলে চীনে শিল্প-সাহিত্যের বিশেষ অগ্রগতি হয়। চীনের বাইরে জাভা, শ্রীলংকা এমনকি সুদূর পারস্য উপসাগর পর্যন্ত তাঁরা রাজ্যবিস্তারে উদ্যোগী হয়েছিলেন। চীনের এই উন্নতি এবং খ্যাতি দেখে সেই সময়ই পাশ্চাত্যের মানুষ এগিয়ে আসে, ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজ আর স্পেনীয়রা চীন উপকূলে আধিপত্য বিস্তারে উদ্যোগী হয়। জেসুইট পাদ্রীরাও চীনের অভ্যন্তরে ধর্মপ্রচার এবং মিঙ রাজাদের দরবারে মর্যাদা পেতে থাকেন। বিদেশীরা আকৃষ্ট হয় এই সময়কার বিখ্যাত দৃষ্টিনন্দন চৈনিক শিল্প কারুকার্যময় নীল ও সাদা পোর্সেলিনের ব্যবহার্য দ্রব্যাদির উপর। সংকলিত হয় কয়েক হাজার খন্ডে ব্যাপৃত বিশালাকার বিশ্বকোষ,চৈনিক পন্ডিতদের দ্বারা। এই বংশের তৃতীয় সম্রাট ১৪২১ সালে তাঁর রাজধানীকে পিকিংয়ে সরিয়ে আনেন। শুরু হয় প্রাসাদে, স্থাপত্যে পিকিংকে নতুন রূপ দেবার প্রচেষ্টা।

ষোড়শ শতাব্দী থেকেই মাঞ্চুরা ক্রমশঃ দক্ষিণদিকে সরে আসছিল, কিন্তু মিঙ সাম্রাজ্যের চরম বিপর্যয় ঘটে সপ্তদশ

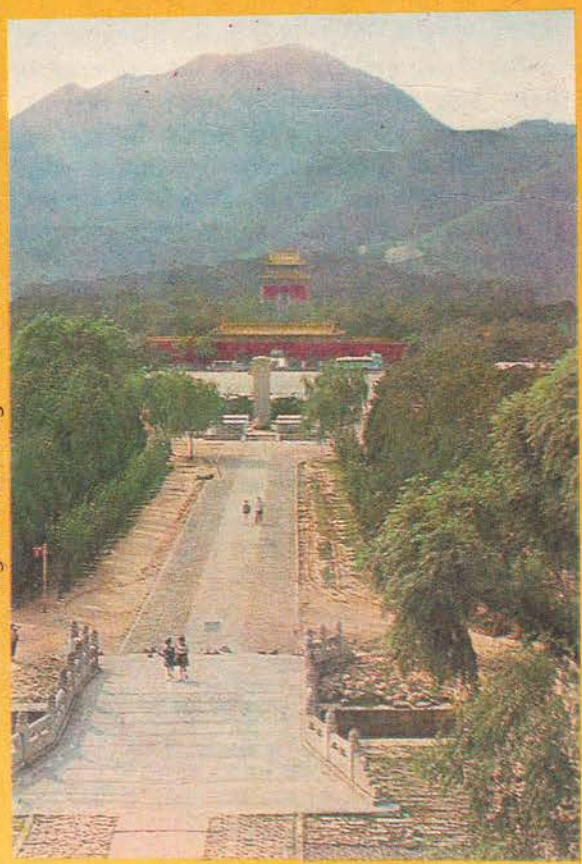

আমরা এসে গেলাম মিঙরাজাদের সমাধিক্ষেত্রে

মিঙটুম্বের অপরূপ স্থাপত্য

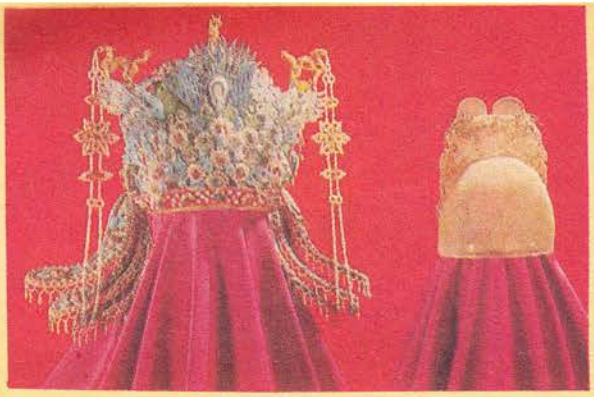

রাজা-রানীর মুকুট

পাতালপ্রাসাদে রাজাদের শবাধার

শতাব্দীতে। যখন দুর্বল মিঙ সম্রাটকে সাহায্যের অজুহাতে মাঞ্চুরাজ তাঁকে সরিয়ে নিজের পুত্র চুন-চিকে সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন (১৬৪৪)। তারপর থেকেই চীন চলে যায় তথাকথিত বিদেশী শাসকদের অধীনে। প্রিয় মিঙদের পুনরায় সিংহাসনে বসানোর জন্য এরপরও চীনারা বহুবার বিদ্রোহ করবার চেষ্টা করেছে। যেমন ১৮৫৩-র তাইপিং বিদ্রোহ। দুর্ভাগ্যক্রমে সে বিদ্রোহ সফল হয়নি।

সে যাই হোক, মিঙ রাজবংশের পতনের পরে সবাই ভুলে গেছিল তাদের সমাধির কথা। কারণ প্রাচীন মিশরের মতো চীনেও রাজাদের বাসস্থান থেকে সমাধিক্ষেত্র সবই লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখার প্রথা ছিল। ফলে সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে চীনও ভুলে গেল তাদের এই ঐতিহ্যশালী বংশের বিশাল স্থাপত্যকীর্তি ও স্মৃতির কথা। তারা তখন চলেছে বিদেশী মাঞ্চু ও তৎপরবর্তী ইউরোপীয় শাসকদের অধীনে। অবশেষে এই শতকের পঞ্চাশের দশকে চীনে প্রতিষ্ঠিত হলো নতুন গণতান্ত্রিক সরকার। প্রচলিত হলো নতুন সমাজব্যবস্থা। চীনারা শুরু করলো নিজেদের প্রাচীন ইতিহাস চর্চা, প্রাচীন গৌরব ও ঐতিহ্যের অন্বেষণ। দেশের বিভিন্ন স্থানে খননকার্য চালিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অতীতকে খুঁজতে শুরু করলেন।

১৯৫৮ সাল। রাজধানী পিকিং থেকে ৫০ কি. মি. দূরবর্তী একটি জায়গা গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। পিকিং থেকে উত্তরদিকে বিখ্যাত চীনের প্রাচীরে যাবার পথে পার্বত্য এই জায়গাটি অনেকদিন ধরেই অনুসন্ধিৎসুদের ঔৎসুক্য সৃষ্টি করছিল। কারণ পার্বত্য হলেও ওখানকার অনেকগুলি ঢিবি ঠিক স্বাভাবিক বলে মনে হচ্ছিল না। কিন্তু খননকার্যেও কিছু বাধা ছিল। কারণ সাধারণ মানুষের সংস্কার ছিল ওগুলির সঙ্গে ভৌতিক কোনো ঘটনা জড়িত। খুঁড়লে তাদের অকল্যাণ হবে। অবশেষে সরকারের প্রত্যক্ষ চেষ্টায় শুরু হলো খননকার্য। আবিষ্কৃত হলো মিঙরাজাদের সমাধিক্ষেত্র। খুলে গেল চীনের ইতিহাসের এক রুদ্ধ দ্বার। পাওয়া গেল ভাস্কর্য, লিপি, মুদ্রা, অলঙ্কার ইত্যাদি বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক জিনিসপত্র। প্রায় ৪০ বর্গ কি. মি. জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এই সমাধিক্ষেত্র শুধুমাত্র চীনের জনসাধারণের নয় সারা বিশ্বের পর্যটকদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করল, আসতে শুরু করল সাদা, কালো, হলদে প্রভৃতি সকল বর্ণের মানুষ। আজ থেকে প্রায় ৫৮২ বছর আগে ১৪০৯ সালে শুরু হয়েছিল এই সমাধিক্ষেত্র নির্মাণের কাজ। ঐ বিশাল এলাকায় চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন ১৩ জন মিঙসম্রাট, তাঁদের রানী আর প্রিয় পুত্র-কন্যারা।

মূলত, চ্যাংলিং এবং ডিংলিং নামে দুটি স্থানে বিভক্ত এই সমাধিক্ষেত্র। সবচেয়ে আগে আবিষ্কৃত হয়েছে চ্যাংলিং-এর সমাধিক্ষেত্রগুলি এবং শেষে ডিংলিং-এর গুলি। তিনপাশে পাহাড় দিয়ে ঘেরা এই অঞ্চলটি, তার মধ্যে প্রধান দুটি হলো ড্রাগন পাহাড় ও টাইগার পাহাড়। মুখোমুখি দাঁড়ানো এই দুটি পাহাড় যেন চৈনিক রাজাদের নিষিদ্ধ গোপন সমাধিক্ষেত্রের প্রবেশপথে দুই নিঃশব্দ প্রহরী। সমগ্র অঞ্চলটি পাথুরে হলেও এখন পাহাড় কেটে রাস্তা বানানো হয়েছে পর্যটকদের জন্য। এখনো কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে খননকার্য চলছে আরো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন উদ্ধারের জন্য।

সেদিন রোদ-ঝলমলে সকালে আমরা অর্থাৎ একদল সাংবাদিক চললাম মিঙরাজাদের সমাধিস্থান বা মিঙটুম্ব দেখতে। প্রায় ৫-৭টি বাসে ৩০০-৩৫০ জন লোককে নিয়ে যাওয়া হলো পাহাড় কেটে তৈরি রাস্তা দিয়ে। যাওয়ার সময়ই চীনা গাইড আমাদের বুঝিয়ে দিলেন মিঙটুম্বের গুরুত্ব এবং কিভাবে এই টুম্ব আবিষ্কৃত হয় তার কাহিনী। গল্পের মতো সেই কাহিনী শুনিয়ে তিনি বললেন, আমাদের প্রথমে নিয়ে যাওয়া হবে চ্যাংলিং-এ এবং তারপর ডিংলিং-এ।

মিনিট চল্লিশ চলার পরই দূর থেকে দেখতে পেলাম পাহাড়ের ফাঁকে উঁকি মারছে মিঙটুম্বের প্রবেশপথ, প্রায় ৫০ ফুট উঁচু হলুদ রঙের প্রবেশপথ। টিকিট কেটে মূল এলাকায় ঢোকবার ফাঁকে একবার দেখে গেলাম সেই বিশাল প্রবেশদ্বার। চমৎকার বাঁধানো রাস্তার শেষে এই প্রবেশদ্বার, রাস্তার দুপাশে ৫০ গজ দূরে দূরেই বিভিন্ন ভাস্কর্যের নমুনা সাজানো। কোনো ভাস্কর্য হয়তো বা ঘোড়া বা হাতির মুখের আদলে সাজানো। আবার কোনোটা প্রাগৈতিহাসিক জন্তু-জানোয়ারের অনুকরণে তৈরি। সবুজ ঘাসের মধ্যে সাদা পাথরের তৈরি ঐসব ভাস্কর্যের চেয়ে বেশি কারুকার্যময় ঐ বিশাল প্রবেশদ্বার। হলুদ স্তম্ভের উপরে কাঠের আস্তরণ দিয়ে তৈরি। কাঠ এবং পাথরের উপর বিস্ময়কর কারুকার্য। চীনা লৌকিক কাহিনী এবং দেব-দেবীর মূর্তি দিয়ে সাজানো ঐ প্রবেশদ্বার দেখার পরই আমরা চলে গেলাম চ্যাংলিং এলাকায়।

১৩টি টুম্বের মধ্যে চ্যাংলিং-এর টুম্বটিই সর্ববৃহৎ এবং মাটির উপর দাঁড়ানো স্থাপত্যের মধ্যে সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ। "দ্য হল অফ লেজেন" (রাজকীয় ক্ষমতা ও অনুগ্রহ গৃহ) এই টুম্বের সবচেয়ে সামনের সভাগৃহ। এই সভাগৃহ তিনতলা সমান উচ্চতার পার্বত্য কাঠামোর উপরে তৈরি। উপরে সভাগৃহটি পুরোটাই কাঠের। ১৯৫৬ বর্গমিটার এলাকার গৃহের দেওয়াল হলুদ আর লাল রঙের টুকরো পাথর

দিয়ে সাজান। প্রায় ৫০ ফুট উঁচু স্তম্ভগুলির প্রত্যেকটিই এক-একটি বিস্ময়। কারণ একটি মাত্র গাছ দিয়ে স্তম্ভগুলি তৈরি হয়েছে। প্রত্যেকটা স্তম্ভ চওড়ায় প্রায় ৫ ফুট। এখান থেকে বেরিয়ে চলে গেলাম কাছাকাছি অন্যান্য টুম্বগুলি দেখতে। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে ছড়ানো ঐসব টুম্বগুলি আকারে তত বিশাল না হলেও কারুকার্যের দিক থেকে অত্যন্ত সুন্দর। পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে টুম্বগুলি ঘুরে দেখতে দেখতে কেউ ক্লান্ত হয়ে পড়লে বিশ্রাম নেবার জন্যে আছে সুন্দর রেস্তোরাঁ। এ ছাড়াও বিভিন্ন দোকান, যেখানে বিক্রি হচ্ছে বিভিন্ন স্মারক দ্রব্যাদি বা টী শার্ট, যাতে ইংরাজীতে লেখা "আমি মিঙ টুম্ব দেখেছি।" এ ছাড়াও আছে একটি ছোটখাটো মিউজিয়াম, যাতে ওখান থেকে পাওয়া বিভিন্ন মুদ্রা, জামাকাপড়, অস্ত্রশস্ত্র বা আরো প্রত্নতাত্ত্বিক জিনিসপত্র সাজানো আছে। আর আছে বিভিন্ন প্রাচীন পুঁথি, ছবি, চিঠি ইত্যাদি।

ডিংলিং-এ যে একমাত্র টুম্বটি পাওয়া গেছে সেটিকেই বলা হয় পাতালপ্রাসাদ, যার কথা আগেই বলেছি। মাটির ২৭ মিটার নিচে। সাততলা এই প্রাসাদটিই মিঙটুম্ব এলাকায় সর্বশেষ আবিষ্কার। পাথর দিয়ে তৈরি ঐ প্রাসাদ তৎকালীন স্থাপত্য শিল্পেরও এক বিস্ময়। কারণ অদ্ভুত কৌশলে মাটি কেটে তৈরি হয়েছে প্রাসাদ, যাতে মাটির চাপে প্রাসাদের বা তার ভিতরের সমাধিক্ষেত্রের কোনো ক্ষতি না হয়। এইজন্যই মূল সমাধিক্ষেত্রের পাশে অতিরিক্ত কয়েকটি ঘর তৈরি করা হয়েছিল ভারসাম্য রক্ষার জন্য। মোট ১১৯৫ বর্গমিটার আয়তনের সমাধিক্ষেত্র সাততলা প্রাসাদের একেবারে তলায় অবস্থিত। ক্যামেরা বা অন্য কিছু নিয়ে ঢোকা যায় না এই প্রাসাদে। ফলে জমা থাকে আমাদের সঙ্গের অনেকের দেশী-বিদেশী ক্যামেরা, এমনকি ভিডিও ক্যামেরা অবধি। যেসব বিদেশীরা একটু আগেও মহানন্দে লেগেন হলের স্তম্ভগুলির সামনে কিংবা পিছন থেকে জড়িয়ে মজা করতে কিংবা ছবি তুলতে ব্যস্ত ছিলেন তাঁরাও কেমন নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন "পাতালপ্রাসাদে"র সিঁড়িতে পা রাখতেই। কতক্ষণ ধরে যে আমরা সিঁড়ি দিয়ে নামছিলাম তার হিসাব বোধহয় আমাদের ছিল না, শুধু পরস্পরের হাত ধরাধরি করে কোনোক্রমে পা টেনে টেনে নামা, আলো বলতে প্রত্যেক তলাতে একটিমাত্র অনুজ্জ্বল বাল্ব আর তার নিচেই পথনির্দেশিকা। আমাদের অজান্তেই আমাদের উপর চেপে বসেছিল রাজকীয় সমাধিক্ষেত্রের নৈঃশব্দ্য আর রহস্যময় গাম্ভীর্য।

অবশেষে পৌঁছে গেলাম নিচের তলায়। প্রথমেই একেবারে শেষের ঘরে। প্রায় ৩০ মিটার লম্বা আর ১০ মিটার চওড়া এই ঘরটাই সবচেয়ে বৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ। এখানেই আছে রাজা শেংঝং আর তাঁর দুই মহিষীর শবাধার। সম্রাট শেংঝং, যিনি প্রজাদের কাছে পরিচিত ছিলেন ঝুজিয়ান নামেও, নিজের মৃত্যুর পর চলে যেতে চেয়েছিলেন লোকচক্ষুর অন্তরালে, তাই নির্মাণ করেছিলেন এই পাতালপ্রাসাদ। পরবর্তীকালে সেখানেই সমাধিস্থ হন তাঁর দুই পত্নীও। বিশাল পাথরের তিনটি শবাধার,যার ভিতর কোনো আশ্চর্য উপায়ে রক্ষা করা হয়েছিল মৃতদেহগুলি। লোহার চেন দিয়ে শবাধার ঘেরা থাকলেও সবচেয়ে বড়টি যে রাজার সেটা বোঝাই যাচ্ছিল। গাইডের অনুচ্চ কণ্ঠস্বর আমাদের কেমন যেন অপার্থিব অনুভূতির স্পর্শ দিল। পলকের জন্য মনে পড়ে গেল হাওয়ার্ড

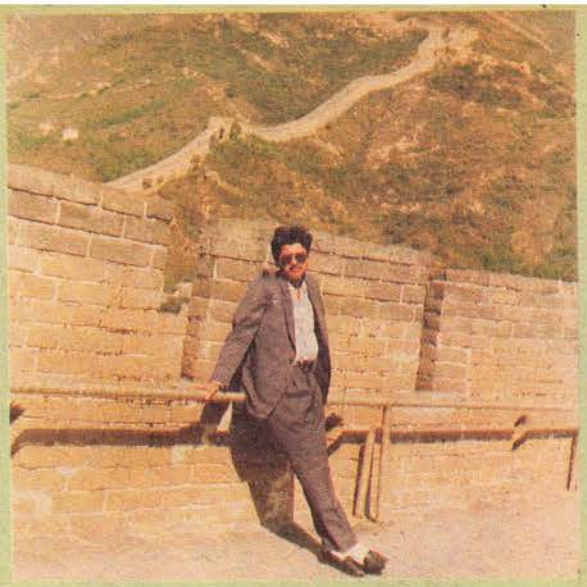

চীনের প্রাচীরের ওপর লেখক

কার্টারের মিশরীয় ফারাও তুতানখামেনের সমাধি আবিষ্কারের কথা। শবাধারের গায়ে চৈনিক ভাষায় কিছু লেখা, আধো-অন্ধকারে যা বোঝা যাচ্ছে না। পাশের কক্ষে সাজান রাজারানীর বিভিন্ন ব্যবহৃত জিনিসপত্র। কিছু আছে জেড পাথরের বাক্সের মধ্যে। আবার কিছু এমনি পাথরের উপর সাজানো। লোহার রেলিং এবং নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন এইসব অমূল্য সম্পদ রক্ষার জন্য, যার মূল্য পৃথিবীর যে কোনো টাঁকশালকে লজ্জা দিতে পারে। প্রায় ৩০০০-এর মতো জিনিসপত্রের মধ্যে আছে সোনা, রুপো, হীরে, সিল্কের পোশাক। লতাপাতার কারুকার্যকরা উন্মুক্ত লাল বাক্সে আছে রানীদের বিভিন্ন অলংকার। হীরে, মুক্তা থেকে শুরু করে বৈদুর্যমণির হার। সবচেয়ে বহুমূল্য হলো রাজার রত্নখচিত রাজমুকুট। কম যায় না অবশ্য দুই রানীর মুকুটও। যাদের প্রত্যেকটিতে আছে ৫০০০-এরও বেশি মুক্তা ও ১০০টি বহুমূল্য পাথর। আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পড়ছিলাম এইসব বহুমূল্য দুষ্প্রাপ্য জিনিস দেখতে দেখতে যেন, নাকে এসে লাগছিল বহুকালের পুরনো কোনো গন্ধ। মনকে ছুঁয়ে যাচ্ছিল ইতিহাসের পাতায় স্থান পাওয়া অতীতের সেই সব ঘটনাগুলো। সবচেয়ে অবাক হলাম রানীদের অলংকারসমৃদ্ধ বস্ত্র দেখে। বস্ত্রগুলিতে শিল্পীরা সুনিপুণ হাতে চিত্রিত করেছেন তাঁদের শত সন্তানকে।

দুটি শূন্য গৃহ ছাড়াও একটি ঘরে আরো কিছু শবাধার নজর কাড়ল, গাইড জানিয়ে দিলেন ঐগুলি রাজার অসময়ে মৃত পুত্র এবং কন্যাদের। এক সময় দেখার পালা শেষ হলো। এবার ফেরার পালা। নামবার সময় যে সময় গড়াচ্ছিল না, উঠে এলাম যেন সেই ঘড়ির কাঁটাকে হারিয়ে দিয়ে। অন্য এক প্রান্তে বেরিয়ে এসে মুক্ত আকাশের তলায় যখন শ্বাস নিলাম, সূর্যদেব তখন মধ্যগগন থেকে অনেক সরে গেছেন। হিসেব করে দেখলাম, বেশ কয়েক ঘণ্টা আমরা কাটিয়েছি পাতালে মিং রাজাদের সমাধিক্ষেত্রে।

ছবি : লেখক

# কৈলাসপতির কলকাতা দর্শন

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

দারুণ রেগে শিব বললেন দুলিয়ে মাথার জটা
রাত-দুপুরে সবার এতই কিসের সাজের ঘটা ?
ঘষছো কি সব হাতে-পায়ে, মাখছো মুখে যা-তা
সেন্ট-আতরের গন্ধে আমার ঘুরছে ভীষণ মাথা ! !

ক্রীম্-পাউডার দেখলে আমার গুলোয় যে গা ভারি
তাই আমি ছাই মাখি সদাই যখন যেথায় পারি !
কিন্তু সবাই মিলেই কোথায় চললে সেজেগুজে ?
দুর্গা, কথার দাও না জবাব, রও কেন মুখ বুজে ! !

মুচকি হেসে দুর্গাদেবী বললে, পশুপতি–
সন্দেহ নেই, স্মৃতিশক্তি প্রখর তোমার অতি !
এই ব্যাপারে বারবার বলেছি এর আগে
একই কথা লাখবার কার বকতে ভালো লাগে ?

সাজগোজটাই দেখছো শুধু, ভাবছো সবই 'ফর-শো'
গণশা-কেতোর মনের কোণে কিসের খুশির স্পর্শ ?
লক্ষ্মী-সুরোর মুখে কেন ধরছে না আজ হর্ষ ?
কারণ জানো ? কলকাতারই তিনশ-তম বর্ষ ! !

হো-হো করে হেসেই জোরে বললেন ব্যোম-ভোলা,
স্মৃতি আমার লোপ পেয়েছে রোজ খেয়ে গুড়-ছোলা !
কাল থেকে 'হোপ্-নাইনটি ওয়ান' হচ্ছে হোথায় শুরু
আমায় হাজির থাকতে হবেই, আমিই 'নাটের গুরু' !

'বিষ্ণু' হবেন 'চিফ্-গেস্ট' আর 'ব্রহ্মা' সভাপতি
আমি ছাড়া আর নেই তো ওদের অন্য কোনোই গতি !
'ব্রেক্-ড্যান্স'-এ একাই আমি মাতিয়ে দেবো আসর
নন্দী-ভৃঙ্গী আমার সাথেই বাজাবে ঢোল-কাঁসর ! !

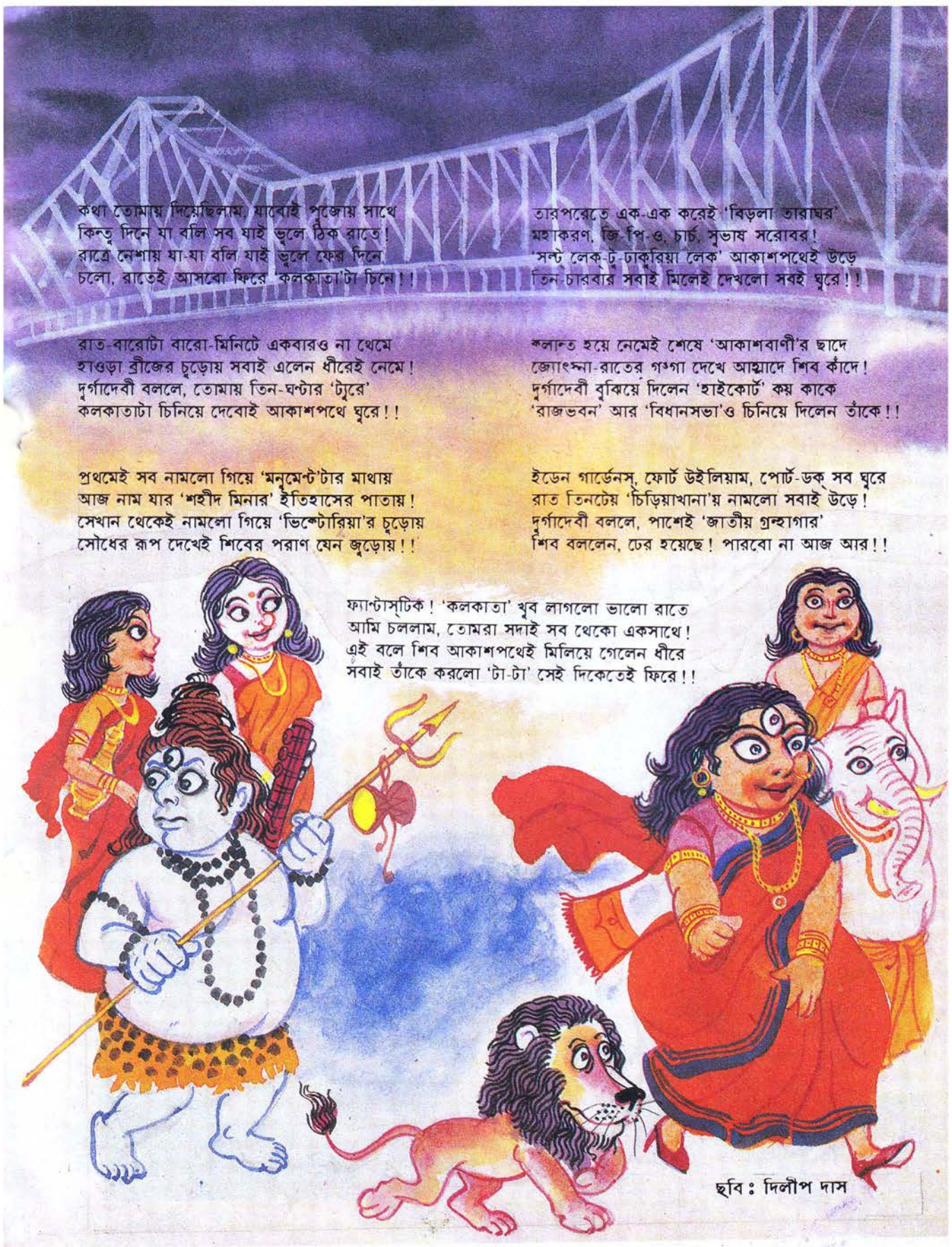

কথা তোমায় দিয়েছিলাম, যাবোই পুজোয় সাথে
কিন্তু দিনে যা বলি সব যাই ভুলে ঠিক রাতে!
রাত্রে নেশায় যা-যা বলি যাই ভুলে ফের দিনে
চলো, রাতেই আসবো ফিরে 'কলকাতা'টা চিনে!!

তারপরেতে এক-এক করেই 'বিড়লা তারাঘর'
মহাকরণ, জি.পি.ও, চার্চ, সুভাষ সরোবর!
'সল্ট লেক্-টু-ঢাকুরিয়া লেক' আকাশপথেই উড়ে
তিন-চারবার সবাই মিলেই দেখলো সবই ঘুরে!!

রাত-বারোটা বারো-মিনিটে একবারও না থেমে
হাওড়া ব্রীজের চূড়োয় সবাই এলেন ধীরেই নেমে!
দুর্গাদেবী বললে, তোমায় তিন-ঘন্টার 'টুরে'
কলকাতাটা চিনিয়ে দেবোই আকাশপথে ঘুরে!!

ক্লান্ত হয়ে নেমেই শেষে 'আকাশবাণী'র ছাদে
জ্যোৎস্না-রাতের গঙ্গা দেখে আহ্লাদে শিব কাঁদে!
দুর্গাদেবী বুঝিয়ে দিলেন 'হাইকোর্ট' কয় কাকে
'রাজভবন' আর 'বিধানসভা'ও চিনিয়ে দিলেন তাঁকে!!

প্রথমেই সব নামলো গিয়ে 'মনুমেন্ট'টার মাথায়
আজ নাম যার 'শহীদ মিনার' ইতিহাসের পাতায়!
সেখান থেকেই নামলো গিয়ে 'ভিক্টোরিয়া'র চূড়োয়
সৌধের রূপ দেখেই শিবের পরাণ যেন জুড়োয়!!

ইডেন গার্ডেনস্, ফোর্ট উইলিয়াম, পোর্ট-ডক্ সব ঘুরে
রাত তিনটেয় 'চিড়িয়াখানা'য় নামলো সবাই উড়ে!
দুর্গাদেবী বললে, পাশেই 'জাতীয় গ্রন্থাগার'
শিব বললেন, ঢের হয়েছে! পারবো না আজ আর!!

ফ্যান্টাস্টিক! 'কলকাতা' খুব লাগলো ভালো রাতে
আমি চললাম, তোমরা সদাই সব থেকো একসাথে!
এই বলে শিব আকাশপথেই মিলিয়ে গেলেন ধীরে
সবাই তাঁকে করলো 'টা-টা' সেই দিকেতেই ফিরে!!

ছবি : দিলীপ দাস

# এভারেস্টের কাছাকাছি

তপনকুমার দাস

চারপাশে পাহাড়ে ঘেরা ছোট্ট একটা জায়গা। প্রায় সমতল। এটাই এয়ার-স্ট্রিপ। একটু আগে কাঠমান্ডু থেকে ছোট্ট একটা প্লেনে চেপে আমরা এখানে এসে নেমেছি। প্লেনটা নেহাতই ছোট। আমরা তিন বন্ধু ছাড়া ফ্রান্সের একটি ছেলে আর একটি মেয়েই শুধু প্লেনটায় ছিলো।

প্লেন থেকে নামতেই আমাদের ছেঁকে ধরলো একদল কুলি। তাদের মধ্যে ছেলেরা যেমন আছে তেমনি আছে মেয়েরাও। ওরাই আমাদের জিনিসপত্তর বয়ে নিয়ে যাবে। কোথায় ? ওহো, আসল কথাটাই তো বলিনি। আমরা এবার যাচ্ছি মাউন্ট এভারেস্টের কাছাকাছি। আরও পরিষ্কার করে বলি, আমরা যাচ্ছি

এভারেস্টের বেস ক্যাম্প গোরেকসেপে আর কালাপাথারে। এভারেস্ট অভিযানে যাঁরা যান তাঁরা এই গোরেকসেপেতেই বেস ক্যাম্প ফেলেন। বেস ক্যাম্প থেকেই সমস্ত অভিযানটা পরিচালনা করা হয়। আমরা ঐ পর্যন্ত যেতে যেতেই হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছিলাম এভারেস্ট অভিযান কি দুঃসাহসিক, কি প্রচণ্ড কষ্টকর প্রচেষ্টা। শুধু তাই নয়, ভাগ্য সহায় না থাকলে কিছুতেই পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিখরে ওঠা সম্ভব হয় না।

থাক ও সব কথা। আমরা বরং লুকলায় ফিরে যাই। পাহাড়ের কোলে এবড়োখেবড়ো এয়ার স্ট্রিপে প্লেনটা এসে থেমেছিলো। আগেই বলেছি, প্লেন থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের ঘিরে ধরেছিলো কুলির দল। তাদের মধ্যে থেকে আমরা বেছে নিলাম প্রেম বছরী আর তার বোন কামী ফুরুয়াকে। ওরাই আমাদের জিনিসপত্তর নিয়ে পথ দেখিয়ে সাগরমাতার কাছাকাছি নিয়ে যাবে। এভারেস্টকে ওরা সাগরমাতা বলে।

লুকলা মানে আমরা প্লেন থেকে যে জায়গাটায় নেমেছিলাম তার উচ্চতা প্রায়

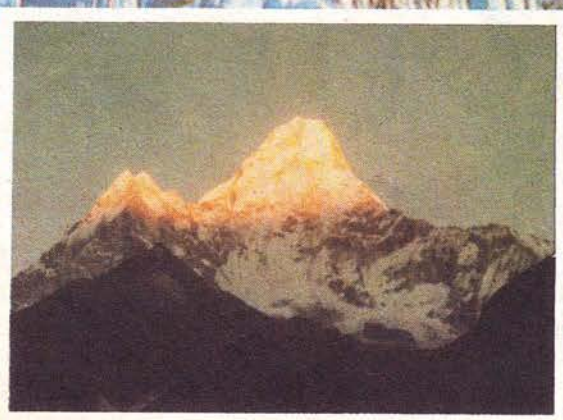

সাড়ে আট হাজার ফুট। আমাদের হাতে নষ্ট করার মতো সময় একদম নেই। তাই তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নিয়ে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। চড়াই-উতরাই ভেঙে আমরা এগিয়ে চলেছি। আমাদের বাঁ পাশে দুধকোশী নদী। ঘণ্টা দুয়েক হাঁটার পর আমরা এসে গেলাম চুটুয়া গ্রামে। নামেই গ্রাম। ঘর বলতে মাত্র পাঁচ-ছটি। দু ঘণ্টা ধরে ঐ রাস্তায় হেঁটে আমরা তখন রীতিমতো ক্লান্ত। চারদিকে ধূ ধূ ফাঁকা মাঠ। ছোট বড় পাথর ছড়ানো।

প্রেম বছরী আর কামী ফুরুয়া আমাদের আগে আগে হাঁটছিলো। ওদের সঙ্গে কথা বলাটাই সমস্যা। ওরা আমাদের ভাষা বোঝে না, আমরাও বুঝি না ওদের কথা। তবে প্রেম খানিকটা হিন্দী বোঝে। দু-চারটে হিন্দী কথা বলতেও পারে। আর কথায় কথায় শুধু বলে—ইয়েস স্যার, ভেরি গুড স্যার, থ্যাংকু স্যার। আসলে অভিযাত্রীদের মাল বইতে বইতে দুচারটে হিন্দী আর ইংরেজী কথা শিখেছে এই যা!

চুটুয়া গ্রামে একটু বিশ্রাম নেবার জন্যে আমরা এখানে ওখানে ছড়ানো পাথরের ওপর বসে পড়লাম। আমাদের বসতে দেখে দুই ভাই-বোন হাওয়া। মালপত্তর সব আমাদের পায়ের কাছে। একটু দূরে একটা কাঠের দোতলা বাড়ি দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু প্রেম আর কামী গেলো কোথায়? দেখতে দেখতে কেটে গেছে বেশ খানিকটা সময়। আর বসে থাকা যায় না। কিন্তু আমাদের পথপ্রদর্শক কাম মালবাহক দুজনেরই যে পাত্তা নেই। বিরক্ত হয়ে মলয় বলে উঠলো, পোর্টারগুলো সুবিধের মনে হচ্ছে না।

ওর কথায় সায় দিয়ে দিলীপ বললো, দু'ঘণ্টা চলার পর যদি আধঘণ্টা বিশ্রাম নিতে হয় তাহলে আর দেখতে হবে না। কালাপাথার আমরা কবে পৌঁছুবো?

আমি বললাম, আমার মনে হয় ওরা বোধহয় খাবারের সন্ধানে গ্রামে গেছে।

আমার কথা শেষ হলো না, হঠাৎ হেই-ই হেই-ই আওয়াজ কানে এলো। দিলীপ বললো, ঐ দোতলা বাড়িটা থেকে কে যেন হাত নেড়ে আমাদের ডাকছে। মনে হচ্ছে পেম্বা। আমরা প্রেম বছরীকে পেম্বা বলে ডাকছিলাম।

আমরা একটু এগিয়ে গেলাম। যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। মূর্তিমান পেম্বাই

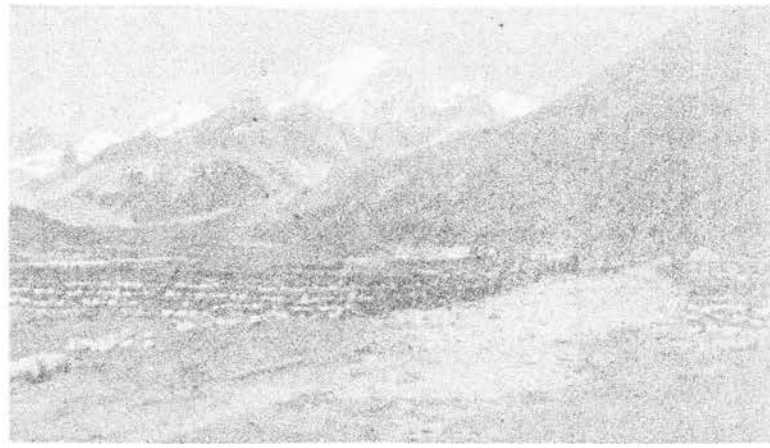

এভারেস্টের পথে ফেরিচে গ্রাম।

হাত নেড়ে আমাদের ডাকছে আর দাঁত বের করে হাসছে।

মলয় তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো। হাতের ঘড়িটা দেখিয়ে বললো, এতো দেরি.....কি করতা হ্যায়?

মলয়ের বাংলা-হিন্দীর জগাখিচুড়ি কথা পেম্বা কি বুঝলো কে জানে ইশারায় আমাদের দোতলায় উঠে আসার জন্য বললো।

কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলাম লম্বা হলঘর। পেম্বা এগিয়ে এসে বললো, আজ এখানে রাতটা কাটিয়ে কাল সকাল সকাল যাত্রা করবো।

মলয় স্বভাবতই ক্ষুব্ধ মাত্র দু'ঘণ্টা চলা হয়েছে। সন্ধে হতে যথেষ্ট দেরি আছে। যতোটা সম্ভব এগিয়ে যাবার দরকার। কিন্তু পেম্বা বললো, এটা ওদেরই বাড়ি। আজ রাতটা ওখানে কাটিয়ে গেলে সুবিধেই হবে। তবে রাত্তিরের ডিনারটা পেম্বারাই খাওয়াবে। ততোক্ষণে পেম্বার মা আর ওর বোন কামী এসে দাঁড়িয়েছে। ওরাও চাইছে, রাতটা আমরা ওদের বাড়িতে কাটাই। আমরাও আর আপত্তি করলাম না। কিন্তু রাত্তিরের ডিনার দেখে আমাদের চক্ষু চড়কগাছ। থালা ভর্তি আলুসেদ্ধ আর শাকের স্যুপ।

পেম্বা বললো, সাব খেয়ে নিন।

আলুসেদ্ধর পরিমাণ দেখে আমরা এওর মুখের দিকে তাকাচ্ছিলাম। আমি বললাম, পেম্বা আমরা তো এতো আলু খেতে পারবো না! নষ্ট না করে তুমি ভাই খানিকটা তুলে নাও।

দিলীপ একটা থালায় আলু তুলে রাখতে লাগলো। একটু দূরে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে তাই দেখছিলেন পেম্বার মা

চলার পথে বিশ্রাম। পেছনে খুম্বু রেঞ্জ।

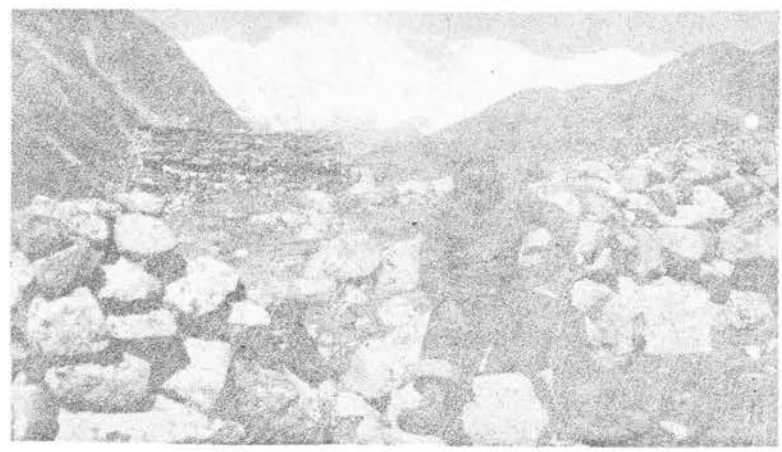

আর বোন। ওঁদের চোখ-মুখ দেখে মনে হলো, ওঁরা বোধহয় ভাবছেন– অতিথিসেবায় কোনো ত্রুটি হয়েছে।

আমি বললাম, এতো আলু তো আমরা খেতে পারবো না। যা রইলো এই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।

আমি স্যুপের বাটিতে চুমুক দিলাম। জংলা শাকের বোটকা গন্ধ। বমি হয়ে যাবার যোগাড়।

মলয় বললো, খেয়ে নাও, খেয়ে নাও– স্বাস্থ্যকর জিনিস।

আমি ব্যাগ খুলে মাখন আর নুন বের করে মিশিয়ে নিলাম। তবু কি খাওয়া যায়! যতোই খাবার চেষ্টা করি ততোই উল্টে বেরিয়ে আসতে চায়। কিন্তু উপায় নেই। পেম্বারা অতি উৎসাহে অতিথি সৎকার করছে। না খেলে ওরা দুঃখ পাবে। তাই বাধ্য হয়েই আমাদের ডিনার সারতে হলো আলুসেদ্ধ আর জংলা শাকের স্যুপ দিয়ে। তবে পেম্বাদের বাড়িতে রাতটা আমাদের ভালোই কাটলো।

**১ নভেম্বর**

ব্রেকফাস্ট সেরে সকাল আটটার সময় আমাদের যাত্রা শুরু হলো। আমাদের লক্ষ্য নামচেবাজারে যাওয়া। আধ ঘণ্টা চল্যার পর আমরা পৌঁছে গেলাম ফাকদিং গ্রামে। একই রকম ছোট্ট গ্রাম। গুটিকয়েক ঘর আছে মাত্র। কিন্তু চারপাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সার সার পাহাড়। না থেমে আমরা এগিয়ে চললাম। শুধু চড়াই আর চড়াই। ওক, পাইন গাছের মধ্যে দিয়ে আমরা চড়াই ভাঙছি। বাতাসে ভাসছে অদ্ভুত একটা মিষ্টি গন্ধ। বেলা এগারোটা পর্যন্ত টানা হেঁটে এসে আমরা দুধকোশী নদীর ধারে আবার এসে পৌঁছুলাম। আমরা মালপত্তর নামিয়ে রেখে ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসতে না বসতেই পেম্বা আর ফুরুয়া ছুটলো কাঠ আনতে। মলয় আর দিলীপ বসলো উনুন বানাতে। দুপুরের খাবার এখানেই তৈরি হবে।

পেম্বা চটপট খিচুড়ি বানিয়ে ফেললো। খেয়ে দেয়ে বেলা দেড়টা নাগাদ আবার আমরা হাঁটতে শুরু করলাম। চড়াই ভাঙতে ভাঙতে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। কারো মুখে কথা নেই। হাঁপাচ্ছি। হৃদপিণ্ডের গতি অনেক বেড়ে গেছে। হঠাৎ মলয় বলে উঠলো,

প্যাংবোচে গ্রাম।

সামনে তাকিয়ে দেখ।

তাকাতেই বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। সামনে সার সার স্নো পিক। মনে হচ্ছে মাথায় রুপোর মুকুট পরে যোগীরাজরা ধ্যানে বসে আছেন। নিমেষে দূর হয়ে যায় সব ক্লান্তি। অদ্ভুত একটা আনন্দে ভরে ওঠে মন। নতুন উদ্যমে শুরু করলাম হাঁটতে। আজ আমাদের বীর শেরপাদের গ্রাম নামচেবাজারে পৌঁছুতেই হবে। কিন্তু কতো দূর আর কতো দূর। পা যে আর চলতেই চায় না। ধুঁকতে ধুঁকতে বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ আমরা পৌঁছুলাম নামচেবাজারে। বেশ বড় গ্রাম। অনেকগুলো একতলা-দোতলা বাড়ি চোখে পড়লো। চোখে পড়লো বেশ কয়েকটা সাজানো-গোছানো দোকান। বিদেশী জ্যাকেট, স্লিপিং ব্যাগ, টিনড্‌ফুড থেকে আরম্ভ করে আলু-পেঁয়াজ সবই পাওয়া যায় সেখানে। কয়েকটা হোটেলও আছে। এভারেস্ট অভিযানের জন্যে, ট্রেকিংয়ের জন্যে আর হিমালয়কে তার বুকের ওপর দাঁড়িয়ে দেখার জন্যে প্রত্যেক বছর প্রচুর বিদেশী আসেন নামচেবাজারে। তাই সব ব্যবস্থাই আছে।

বিকেল গড়িয়ে এসেছে। দূরের তুষারশৃঙ্গ আর একটাও দেখা যাচ্ছে না। মেঘের আড়ালে চলে গেছে সব। ঠান্ডাও বেড়ে গেছে খুব। আমরা তাড়াতাড়ি গিয়ে একটা হোটেলে উঠলাম। ইচ্ছে, চটপট খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়া। সারাদিন হাঁটার ক্লান্তি কাটাতে ঘুমের বড় দরকার।

সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার চোখে আর ঘুম আসে না। মলয়ের নাক ডাকছে। অন্যরাও ঘুমিয়ে কাদা। হঠাৎ দেখি দিলীপ বিছানায় উঠে বসে ছটফট করছে। তাড়াতাড়ি স্লিপিং ব্যাগ থেকে বেরিয়ে ওর কাছে গেলাম।

কি হয়েছে রে?

ভীষণ শরীর খারাপ লাগছে। মাথাটাও ভারী হয়ে উঠেছে।

বুঝতে পারলাম আল্টিচিয়ুড সিকনেসের শিকার দিলীপ। ব্যাগ থেকে বের করে ওষুধ দিলাম। ও এখনই ঘুমিয়ে পড়বে। আমিও শুয়ে পড়লাম। মনটা খারাপ হয়ে গেলো। অসুস্থ দিলীপকে এখনই আর আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যাবে না। ওকে এখানেই রেখে যেতে হবে।

সকালবেলায় ঘুম ভাঙতেই চোখ জুড়িয়ে গেলো। হোটেলের কাচের জানলার গায়েই যেন গা লাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তুষার শৃঙ্গগুলো। কোয়াংদে, থামসারকু শৃঙ্গ চিনতে অসুবিধে হলো না। অসুস্থ দিলীপকে নামচেবাজারে রেখে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। এখন আমরা যাবো গোকিও লেকের দিকে। চারদিন পরে আমরা প্যাংবোচে পৌঁছুবো। দিলীপ যদি চটপট সুস্থ হয়ে ওঠে তাহলে সে সেখানে আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে পারবে। ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

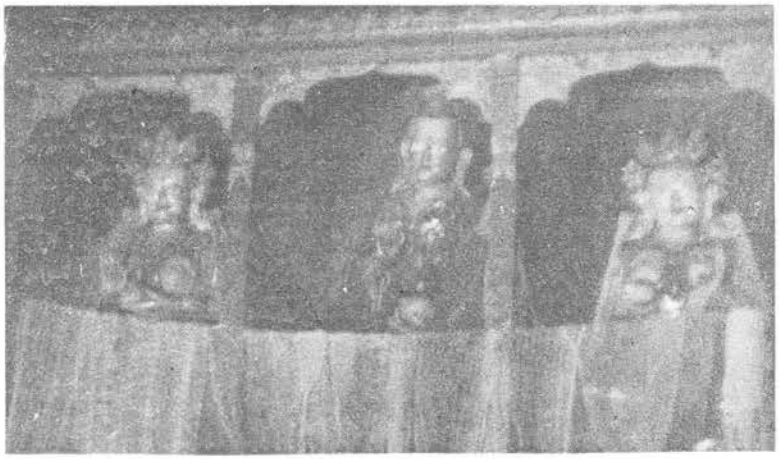

প্যাংবোচে গুম্ফায় দেবীমূর্তি।

কিছুদূর যাবার পর দুদিকে দুটো রাস্তা চলে গেছে দেখলাম। আগেই ম্যাপ দেখে রেখেছিলাম তাই বুঝতে অসুবিধে হলো না। ডান দিকের রাস্তাটা চলে গেছে থিয়াংবোচে, প্যাংবোচে, ফেরিচে, কালাপাথার আর মাউন্ট এভারেস্টের পথে। বাঁ দিকে পথটা ধরেই আমরা এখন যাবো গোকিও লেকে। বাঁদিকের পথটা ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। একটু পরে মাথা তুলতেই অবাক বিস্ময়ে থমকে দাঁড়ালাম। মনে হলো যেন দেবাদিদেব মহাদেব ধ্যানে বসে আছেন। কি তাঁর রূপ। জ্যোতি ঠিকরে বেরুচ্ছে। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম ৬৮৬৫ মিটার উঁচু আমাডাবলামের দিকে তাকিয়ে। মনে হলো দেবাদিদেবের আশীর্বাদ যেন পেলাম আমরা।

বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখার উপায় নেই। সময় যে আমাদের বাঁধা। তাই আমাডাবলামকে প্রণাম জানিয়ে এগিয়ে চললাম। হাঁটছি তো হাঁটছি। চড়াই ভেঙে উঠছিই শুধু। হঠাৎ ফুরুয়া আমার জামা টেনে ধরলো। আঙ্গুল তুলে কিছু দেখালো। সেদিকে তাকাতেই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো মাউন্ট এভারেস্ট। চোখ সরাতে পারি না। সকালের রোদে এভারেস্টকে যে কী সুন্দর দেখাচ্ছে। বেশিক্ষণ দেখা হলো না। আবার হাঁটতে শুরু করলাম। ভূজগাছ আর রডোডেনড্রন গাছের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছি আমরা। আজ আমাদের পৌঁছুতে হবে দোয়ালে গ্রামে। একটা জায়গায় থেমে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে নেওয়া হলো। একটু বিশ্রাম নিয়ে আবার হাঁটা। শুধু চড়াই আর চড়াই। পা যেন আর চলতে চায় না। প্রায় পাঁচটা নাগাদ আমরা দোয়ালে এসে পৌঁছুলাম। ছোট্ট গ্রাম। কিন্তু একদম ফাঁকা। চোখে পড়লো না একটা মানুষও। আসলে শীত আসছে তো। তাই সবাই নিচে নেমে গেছে। না গিয়ে উপায় নেই। এখনই যা ঠান্ডা তা সত্যিই অসহ্য মনে হচ্ছে। তাহলে শীত পড়লে কি হবে। হঠাৎ ঝড়ের মতো হাওয়া বইতে শুরু করলো। সেই বাতাসে মিশে আছে হিম। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। তাই তাড়াতাড়ি ঢুকে গেলাম তাঁবুর মধ্যে। সারাদিন হাঁটার পর শরীরটা আর ভালো লাগছে না। ক্লান্তি তো আছেই। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়লাম।

পরের দিন, তেসরা নভেম্বর, সকাল সাড়ে সাতটার সময় আমরা আবার হাঁটতে শুরু করলাম। হাঁটা মানে চড়াই ভাঙা। পাইন বনের ভেতর দিয়ে পায়ে চলা পথ। কোথাও ওপর থেকে জলের ধারা নেমে আসছে। নিচে জমা সেই জলের ওপর বরফের পাতলা স্তর। চড়াই ভাঙতে ভাঙতে আমরা হাঁফিয়ে উঠেছি। হাপরের মতো আমাদের সকলের বুক ওঠা-নামা করছে। হঠাৎ মলয়ের গলা কানে এলো, আর পারছি না। দম বন্ধ হয়ে আসছে।

মলয়কে একটা পাথরের ওপর বসানো হলো। আমাদের সকলেরই তখন এক অবস্থা। আমরাও বসে বসে হাঁপাতে লাগলাম। কিন্তু বেশিক্ষণ বিশ্রাম করার অবসর নেই। মলয় একটু সামলে নিতেই আমরা আবার হাঁটতে শুরু করলাম। একটু এগোতেই এসে পড়লাম ছোট্ট একটা সমতল জায়গায়। গোটা তিনেক ঘর। কিন্তু কেউ নেই। শীত আসছে বলে নিচে নেমে গেছে। এটাও একটা গ্রাম। নাম লুজো। লুজো পেরিয়ে আমরা এসে পড়লাম ম্যাচুরমা গ্রামে। গ্রামটা ৪৪৬৫ মিটার উঁচুতে। গোটা আটেক বাড়ি আছে এখানে। কিন্তু কেউ কোথাও নেই। দু-একটা বাড়ির দরজা খোলা। উঁকি দিয়ে দেখলাম টুকটাক জিনিসপত্তর রয়েছে। কিন্তু মানুষজন কেউ নেই। আমরা সময় নষ্ট না করে এগিয়ে চললাম। বেলা আড়াইটে নাগাদ পাহাড়ে ঘেরা সুন্দর একটা জায়গায় এসে পৌঁছুলাম। ঠিক হলো, আজ আর এগোন হবে না। চটপট তাঁবু খাটিয়ে ফেলা হলো। তাঁবু খাটানো শেষ হতে না হতেই একরাশ কালো মেঘ এসে জমলো আমাদের মাথার ওপর। হঠাৎ ঠান্ডাও বেড়ে গেলো ভয়ংকর রকম। শুরু হলো শ্বাসকষ্টও। আমরা তাড়াতাড়ি তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়লাম। সামনের পাহাড়ের একটা গুহায় গিয়ে রাত কাটাবার ব্যবস্থা করে নিলো আমাদের গাইড কাম মালবাহক ভাই-বোন।

পরদিন সকাল সাতটা নাগাদ শীতে কাঁপতে কাঁপতে আমরা গোকিও লেকের পথে পাড়ি দিলাম। এতদিন আমরা শুধু চড়াই ভেঙেছি। এখন তো উতরাই অর্থাৎ নিচেও নামতে হচ্ছে। খানিকক্ষণ হাঁটার পর শীতের সেই আড়ষ্ট ভাবটা কেটে গেলো। স্বচ্ছন্দে হাঁটতে লাগলাম। আমাদের ডান দিক দিয়ে বিকট গর্জন করতে করতে বয়ে চলেছে দুধকোশী। বড় বড় বোল্ডার অর্থাৎ পাথরের ওপর দিয়ে আমাদের হাঁটতে হচ্ছে। পাথরের ওপর বরফ জমে আছে। আইস-অ্যাক্স দিয়ে কেটে কেটে আমাদের পথ তৈরি করে নিতে হচ্ছে। পথ ভিজে আর পেছল। একটু অসাবধান হলেই পড়ে গিয়ে চোট পাবার সম্ভাবনা।

সকাল দশটায় আমরা গোকিও লেকের ধারে পৌঁছুলাম। ৪৭৫০ মিটার উঁচুতে এই লেক। জল গাঢ় নীল। গোকিও লেক দেখে আমার মনে পড়লো অমরনাথের

পথে শেষনাগে দেখা লেকটির কথা। সেখানকার জলও গাঢ় নীল। সে যাই হোক গোকিও লেকের গা দিয়ে উঠে গেছে একটা ছোট্ট পিক। ওপরটা তুষার জমে সাদা হয়ে আছে। এর নামও কিন্তু কালাপাথার (উচ্চতা ৫৩১৮ মিটার)। হঠাৎ দশ বারোজন বিদেশী ট্রেকার এসে সেখানে হাজির হলেন। ওঁদের অফুরন্ত উৎসাহ। তিন-চারজন চলেছেন কালাপাথারে চড়তে। বাকীরা হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লেন। আমার খুব ইচ্ছে করছিলো ওঁদের সংগে কালাপাথারে চড়তে। ঘণ্টা দুয়েক লাগবে। কিন্তু সে উপায় নেই। একটু বিশ্রাম নিয়েই আমাদের আবার হাঁটতে শুরু করতে হবে। গোকিও লেকের পাশে দাঁড়িয়ে ভীষণ ভালো লাগছিলো। লেকের নীল জল তখন শান্ত। এখানে ওখানে ভাসছে তুষারকণা। রিজের ওপাশেই আছে বিরাট গ্লেসিয়ার। সেখান থেকে দলছুট তুষারস্রোত এসে পড়ছে লেকের জলে।

দেখতে দেখতে ঘড়ির কাঁটা বারোটার ঘর পেরিয়ে গেলো। আমরা গোকিও লেক পেছনে ফেলে উঠে এলাম বাঁ দিকে রিজের ওপর। নিচের দিকে তাকাতে চোখ জুড়িয়ে গেলো। পাঁচশ ফুট নিচে বিরাট গ্লেসিয়ার। ঐ গ্লেসিয়ার আমাদের ডিঙিয়ে যেতে হবে। গ্লেসিয়ার বড় ভয়ংকর জিনিস। একে চলমান তুষার নদীও বলা যেতে পারে। তবে এর গতি খুবই সামান্য। হয়তো ঘণ্টায় এক ইঞ্চিও নয়। কিন্তু গ্লেসিয়ারের ওপর দিয়ে চলা মানেই পায় পায় মৃত্যুর সংগে লড়াই করা। যে কোনো মুহূর্তেই দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তাই অতি সন্তর্পণে আমরা দেড় ঘণ্টায় পার হয়ে এলাম সেই তুষার নদী। গ্লেসিয়ার পার হয়ে এসে আবার আমাদের চড়াই ভাঙা শুরু হলো। মিনিট চল্লিশ ওঠার পর, আবার নামার পালা। নিচে ডানদিক থেকে আসছে দুধকোশীর গর্জন। ওপর থেকে সেদিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়, ভয় করে। তবে নিচে কিংবা এদিক-ওদিকে তাকাবার কোনো উপায় নেই। আমাদের পথ কোথাও ছয় ইঞ্চি, কোথাও আট ইঞ্চি মাত্র চওড়া। কোথাও কোথাও পথটা আবার বরফে ঢেকে আছে। তাই আমাদের চলতে হচ্ছে অতি সাবধানে, প্রাণ হাতে নিয়ে। একটু এদিক ওদিক হলেই গড়াতে গড়াতে একেবারে দুধকোশীতে।

আমরা তখন চলেছি আমাডাবলামের পাশ দিয়ে। পাশে বয়ে চলেছে তুষারের স্রোত।

বেলা তিনটে নাগাদ আমরা নালা গ্রামে এসে পৌঁছুলাম। গোটা আটেক বাড়ি নিয়ে এই গ্রামটা। দূরে তিন-চারটে চমরীগাই চরে বেড়াচ্ছে। একটা পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে আমরা বসে পড়লাম। ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। আজ রাতটা আমরা এখানেই কাটাবো। তাঁবু ফেলার কাজ শুরু হয়ে গেছে। আমি চোখ বুঁজে বসে রইলাম। হঠাৎ ভারী বুটের শব্দে চমকে তাকাতেই দেখি সামনে দুই সাহেব দাঁড়িয়ে। আমি তাকাতেই ওরা বললো, নমস্তে। আমিও বললাম। ওরা গোকিও লেকে যাবে। পথটা জেনে নিয়ে ওরা গট্‌গট্‌ করে চলে গেলো।

পরদিন সকালে তাঁবু গুটিয়ে আমরা আবার হাঁটতে শুরু করলাম। আবার সেই চড়াই উতরাই। এক এক জায়গায় তো প্রায় দু হাজার ফুট পর্যন্ত উঠতে হচ্ছে। বেলা ন'টায় পাহাড়ের কোলে বসে ছাতু দিয়ে আমাদের ব্রেকফাস্ট সারা হলো। তারপর আবার চলা। চারদিকে ছোট-বড় বোলডার ছড়ানো। এখানে ওখানে জুনিপারের ঝোপ। কোথাও শ্যাওলা জমে আছে। কোথাও জমে আছে বরফ। তাই পথটা বড়ই পেছল। চলতে চলতে আমরা একটা ঝর্ণার ধারে এসে পৌঁছুলাম। মলয় বললো, দারুণ জায়গা, দুপুরের রান্নাটা এখানেই হোক। জলের অভাব নেই। অভাব নেই জ্বালানীরও। জুনিপারই জ্বালানির কাজ করবে। জায়গাটা দশ হাজার ফুট উঁচুতে। অনেক নিচে দুধকোশীকে সাদা সুতোর মতো দেখাচ্ছে।

পেম্বা নিয়ে এলো জুনিপারের ঝাড়। ফুরুয়া পাকা গিন্নীর মতো রান্না করতে বসলো। খেয়ে দেয়ে বেলা একটা নাগাদ আমরা ফরসের পথে পাড়ি দিলাম। এবার শুধু নামার পালা। এখানে ওখানে পাথরের ওপর বরফ জমে রয়েছে। বেশ পেছল। তাই সাবধানে নামতে হচ্ছে। এর ওপর আবার মলয়ের শরীরটা ভালো নয়। ও বার বার পিছিয়ে পড়ছে। নামতে নামতে আমাদের হাঁটু ব্যথা হয়ে উঠছে। শেষ পর্যন্ত আমরা ফরসে গ্রামে এসে পৌঁছুলাম। বেশ বড় গ্রাম। গোটা পঞ্চাশেক বাড়ি। কাঠ আর পাথর দিয়ে তৈরি। বেশিরভাগই দোতলা, একটু লম্বা ধরনের। প্রত্যেকটা বাড়ির সামনেই মাদুরের ওপর শুকোতে দেওয়া হয়েছে চটকানো আলুসেদ্ধ। চারদিকে আলুর ক্ষেত। আলু এখানে খুব ফলে। বেশ বড় বড় সাইজের আলু। তাঁবু না খাটিয়ে আমরা একটা বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। সন্ধ্যে হতেই প্রচণ্ড শীতের কামড়ের হাত থেকে রেহাই পেতে বাড়ির মালিক কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। সংগে সংগে ধোঁয়ায় ভরে গেলো ঘর। দম বন্ধ হয়ে আসতে চায়। ফলে সেদিন রাত্তিরে ঘুমটা ভালো হলো না।

পরদিন সকালে কফি আর বিস্কুট খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। দিলীপের জন্যে মনটা চঞ্চল হয়ে আছে। কেমন আছে কে জানে। বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ আমরা প্যাংবোচে পৌঁছুলাম। এখানেও আমরা একটা বাড়িতে আশ্রয় নিলাম। দোতলায় জায়গা দেওয়া হলো আমাদের। বিছিয়ে দেওয়া হলো তিব্বতী কার্পেট। ঘরে আগুন জ্বলছে। তাই বেশ

আরামদায়ক পরিবেশ। একটু পরেই বাড়ির মালিকের সংগে আলাপ হলো। নাম ফুরুয়া। বয়স পঁয়ষট্টি। ওঁর কাছে বেশ কিছু টিনডফুড আর স্যুপ পাওয়া গেলো। কেনা হলো মুখ বদলাবার জন্যে। ঠিক হলো পরের দিনটাও আমরা এখানেই বিশ্রাম নেবো। আর সকালবেলায় পেম্বাকে নামচেবাজারে পাঠানো হবে দিলীপির খোঁজ আনার জন্যে।

পরদিন সকালে ব্রেকফাস্ট সেরে আমরা চললাম প্যাংবোচের বিখ্যাত বৌদ্ধ গুম্ফা দেখতে। তিনশ বছরের পুরোনো গুম্ফা। গুম্ফা-প্রাংগণে মন্ত্র লেখা নানা রংয়ের নিশান উড়ছে। আমরা গুম্ফায় ঢোকার জন্যে এগিয়ে গেলাম। একতলার দরজায় মস্ত বড় একটা তালা ঝুলছে দেখে উঠে গেলাম দোতলায়। দোতলার সামনের ঘরেই অনেক দেবদেবীর মূর্তি। চারপাশে বহু পুরোনো সব পুঁথি থরে থরে সাজানো। তিন চার জন জাপানি পর্যটক মন দিয়ে পুঁথিগুলো দেখছেন।

আমাদের দেখে দুজন লামা এগিয়ে এলেন। আমাদের গুম্ফার মূর্তি আর পুঁথিগুলো দেখাতে লাগলেন। শুনেছিলাম, এই গুম্ফাতেই ইয়েতির মাথার খুলি রাখা আছে। লামাকে সে কথা বলতেই তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন কোণের আর একটা ঘরে। সেখানে একটা কাঠের বাক্স খুলে বের করলেন একটা মাথার খুলি। খুলিটার গায়ে এখনো বাদামী রংয়ের কিছু কিছু লোম লেগে আছে। আর একটা বাক্স থেকে বের করলেন হাতের পাঞ্জার হাড়গোড়। খুলিটার আকার খুব বড় নয়। ইয়েতির যে বর্ণনা আমরা শুনেছি তার সংগে খুলিটা কিছুতেই মিলোতে পারলাম না। কিন্তু ও নিয়ে আর কিছু বললাম না। এরপর লামা আমাদের নিচে নিয়ে এলেন। নিচের ঘরে ঢুকতেই চোখে পড়লো তিনটি বড় বড় মূর্তি। মধ্যের মূর্তিটি পুরুষ দেবতার, তাঁর দুপাশে দুটি নারীমূর্তি। এই ঘরের মধ্যেও থরে থরে সাজানো আছে পুরোনো পুঁথি।

গুম্ফা দেখে ফিরে এলাম আমরা। ছবি তুলে এদিক ওদিক ঘুরে সময় কেটে গেলো। সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ পেম্বার সংগে দিলীপ এসে যোগ দিলো আমাদের সংগে। সারাদিন পথ চলার ক্লান্তি ওর চোখে মুখে।

একদিন বিশ্রাম নিয়ে ৮ নভেম্বর সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ আমরা বেরিয়ে পড়লাম। পেম্বা আর ফুরুয়া চলেছে আগে আগে। কিছু দূর আসার পর দেখলাম, একটা পাথরের ওপর একজন বৃদ্ধ বসে আছেন। কাছেই খেলছে একটা ছেলে আর মেয়ে। আমরা বাচ্চা দুটিকে লজেন্স দিলাম। ওরা ভীষণ খুশি। লজেন্সের বদলে ওরা আলু দিলো। দিলীপ বললো, খেয়ে দেখ, বেশ লাগবে।

ঘণ্টা দুয়েক চলার পর আমরা একটা দুমুখো রাস্তার সামনে এসে দাঁড়ালাম। পেম্বা বললো, ডান দিকের পথটা দুধকোশী নদীর ধার দিয়ে ডিংবোচে চলে গেছে। বাঁ দিকের পথটা লবুচের। দেখলাম ফুরুয়ার পেছনে পেছনে মলয় চড়াই ভেঙে বাঁ দিকের পথটা দিয়েই এগিয়ে চলেছে। দিলীপকে সংগে নিয়ে আমি আস্তে আস্তে চড়াই ভাঙতে লাগলাম। যতো উঠছি কষ্ট ততোই বাড়ছে। গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। দম নিতেও কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু থামার বা বিশ্রাম নেবার উপায় নেই। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলি। বেলা এগারোটার একটু পরেই আমরা পৌঁছলাম খুম্বু খোলার ধারে। নদীর ওপরে কাঠের ব্রিজ। ব্রিজ পেরিয়ে এসে গেলাম ফেরিচে গ্রামে। ফেরিচের উচ্চতা ৪২৬০ মিটার।

যেমন ঠাণ্ডা, তেমনি প্রচণ্ড হাওয়া। আমরা ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছি। বিদেশী ট্রেকাররা হিমালয়ের পরিবেশের সংগে মানিয়ে নেবার জন্যে ফেরিচে গ্রামে এসে দু একদিন কাটান। ছোট্ট একটা হাসপাতালও আছে সেখানে। বেশ কয়েকজন বিদেশীর সংগে আলাপ হলো। এক জার্মান ট্রেকারের সংগে আলাপ হলো। তিনি মাকালু দেখতে যাচ্ছেন। জিজ্ঞেস করলাম, কোথা থেকে দেখতে পাবেন।

হাসি মুখে ভদ্রলোক বললেন, প্রায় এসে গেছি। বাঁ দিকে আর মাত্র চারশ ফুট উঠলেই একটা ছোট্ট গ্রামে পৌঁছুবো। সেখান থেকেই দেখতে পাবো বিশ্বের পঞ্চম উচ্চতম শৃংগ মাকালু। আমার খুব ইচ্ছে করছিলো, কিন্তু উপায় নেই। দুপুরের খাওয়া সেরে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাদের বেরিয়ে পড়তে হবে।

খেয়ে দেয়ে বেরুতে বেরুতে প্রায় আড়াইটে বেজে গেলো। তারপর শুরু হলো আমাদের হাঁটা। খানিকটা যাবার পর আকাশ ছেয়ে গেলো ঘন কালো মেঘে। যে কোনো মুহূর্তে ঝড়-বৃষ্টি শুরু হতে পারে। পেম্বা বললো, আর এগোন ঠিক হবে না সাব। পেম্বার কথা মেনে নিয়ে পছন্দসই একটা জায়গায় তাঁবু ফেলা হলো।

আমরা যতোই এভারেস্টের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি হাওয়ার বেগ, ঠাণ্ডার প্রকোপ ততোই বাড়ছে। হিমেল হাওয়া

গাকিও লেক। এখানেই আমাদের সংগে দেখা হয়েছিলো স্যার এডমন্ড হিলারির

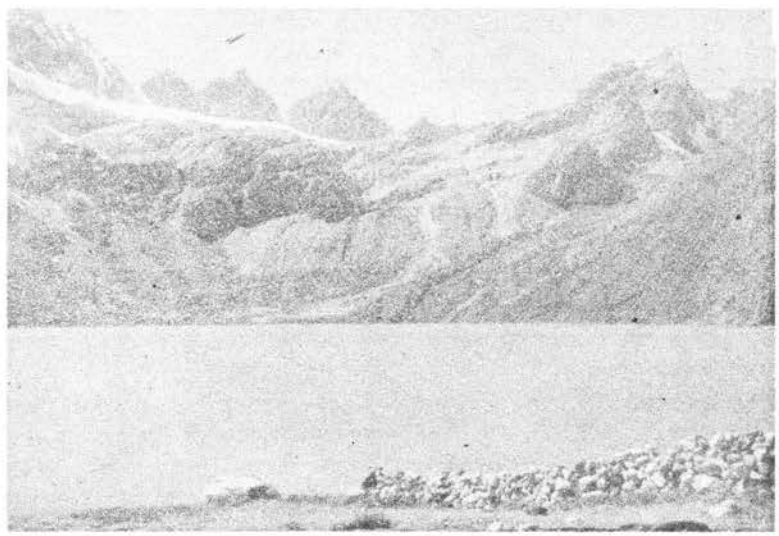

মোটা জামা, জ্যাকেট ভেদ করে একেবারে হাড়ে গিয়ে ঘা মারছে। তা মারুক। আর তো মাত্র দুটো দিন। তারপরই আমরা গিয়ে পৌঁছুবো পৃথিবীর উচ্চতম শৃংগ মাউন্ট এভারেস্টের পাদদেশে। হঠাৎ মলয়ের গলা কানে এলো, অনেকদিন মাছ খাওয়া হয়নি। আজ হয়ে যাক।

দিলীপ - এগিয়ে দিলো সার্ডিনের টিনটা। পেম্বা আর ফুরুয়া রাঁধছে। দিলীপ আনন্দে গান গাইতে শুরু করলো–হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে.....

মলয় চুপচাপ বসেছিলো এক কোণে।

গান শেষ করে দিলীপ জিজ্ঞেস করলো, কি মলয়দা গান ভালো লাগেনি ?

ভালোই তো গাইলি !

তাহলে এতো চুপচাপ বসে আছো কেন ? মলয় আস্তে আস্তে বললো,

কাল ভাইফোঁটা, তাই মনটা.....

দিলীপ হো হো করে হেসে উঠলো, হোম সিকনেস.....

তখনই কানে এলো পেম্বার ডাক, সাব খানা রেডি।

পরদিন সকাল নটা নাগাদ আমরা বেরিয়ে পড়লাম। পরিষ্কার আকাশ। ঝলমলে রোদ। কিন্তু চড়াই ভাঙার নামে গায় জ্বর আসে। গলা শুকিয়ে যায়। পা দুটো ওপরে উঠতে উঠতে বিদ্রোহ করতে শুরু করে। অথচ আমাদের সামনে পেম্বা আর তার বোন ফুরুয়া পিঠে প্রায় পঁচিশ কেজি করে মাল নিয়ে দিব্যি চড়াই ভাঙছে। দেখে মনেও হচ্ছে না, ওদের কষ্ট হচ্ছে।

আরও খানিকক্ষণ চলার পর ছোট্ট একটা ভ্যালিতে এসে গেলাম। আর পারছি না। বসে পড়লাম একটা পাথরের ওপর। কিছু দূরে পাথর সাজিয়ে তৈরি করা হয়েছে ক'টা মনুমেন্ট। পাহাড়ে চড়ার সময় কারো মৃত্যু হলে কবর দিয়ে তার স্মরণে এইভাবে পাথরের মনুমেন্ট তৈরি করা হয়।

মলয় বললো, শুনেছি ১৯৭০ সালে এক জাপানি এভারেস্ট এক্সপিডিশান টিমের ছজন শেরপা মারা গিয়েছিলো। এগুলো তাদের কবর নয় তো ?

গুনে দেখলাম ছটাই আছে। বললাম, হতেও পারে।

আমরাও তো এভারেস্টের পাদদেশে যাচ্ছি। তাই নিহত শেরপাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমরা এগিয়ে চললাম লবুচের দিকে। প্রায় ঘণ্টা তিনেক ওঠার পর শেষ হলো চড়াই। এবার নামার পালা। অল্প শ্বাসকষ্ট অনুভব করছি। আমাদের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে একটা পাহাড়ী নদী। জল জমে বরফ। মাঝে মাঝে বরফের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে সামান্য জল। স্রোতের চাপা আওয়াজ কানে আসছে। কিছুটা এগুবার পরই চোখের সামনে ভেসে উঠলো মাউন্ট পামোরি। ৭১৪৫ মিটার উঁচু। কি সুন্দর যে দেখতে। চোখ ফেরানো যায় না। এক একটি শৃংগের এক একরকম রূপ। বেলা বারোটার কিছু পরেই আমরা লবুচে এসে পৌঁছুলাম। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে লবুচে ১৬,৩০০ ফুট উঁচু। মাউন্ট পামোরি আর দেখা যাচ্ছে না। তার বদলে দেখতে পেলাম নাপৎসে পিক্। নাপৎসের উচ্চতা ২৫,৬৮০ ফুট।

চারদিকে পাহাড়ে ঘেরা সুন্দর একটা জায়গায় তাঁবু ফেলা হলো। ওপাশে ছোট্ট একটা বাড়ি। এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, বাড়িটায় চারটে ঘর। তার মধ্যে দুটোয় আবার তালা দেওয়া। একটু পরেই বিদেশী ট্রেকররা আসতে আরম্ভ করলেন। যাঁদের তাঁবু আছে তাঁরা পছন্দসই জায়গায় তাঁবু ফেললেন। যাঁদের নেই তাঁরা মুশকিলে পড়লেন। দুখানা ঘরে কজনেরই বা জায়গা হবে।

আমাদের তাঁবু আগেই ফেলা হয়ে গিয়েছিলো। দেখলাম মলয় শুয়ে আছে। বোধহয় ওর শরীর খারাপ। তখনই দিলীপ এসে বললো, চল চা, ওমলেট খেয়ে আসি।

কোথায়?

ওমলেটের নামে মলয় লাফিয়ে উঠলো।

তালাবন্ধ ঘর দুটোর একটা তখন খোলা। দিলীপ আমাদের নিয়ে ঢুকলো। প্রচন্ড ঐ ঠান্ডায় গরম চা আর ওমলেট মনে হলো অমৃত। দিলীপ বললো, দামটা বড্ড বেশি রে। এক একটা ওমলেট পাঁচ টাকা করে।

কলকাতা থেকে আসার সময় দীপকদা বলে দিয়েছিলেন,

তপন আর যাই করো লবুচে থেকে নাপৎসের সূর্যাস্ত যেন মিস্ কোর না।

তাই সূর্যাস্ত দেখবো বলে অধীর আগ্রহে বসে আছি। চিরতুষার শৃংগের ওপর থেকে সূর্যদেব তখন যাই যাই করছেন। চারদিকটা যেন লাল আবিরে রাঙা হয়ে উঠেছে। সে যে কী অপরূপ দৃশ্য ! স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকি। কিন্তু ভালোলাগার সেই ঘোর কেটে গেলো বড় তাড়াতাড়ি। লাল রং ধীরে ধীরে পান্ডুর হয়ে এলো। সূর্যদেব আগেই হারিয়ে গিয়েছিলেন। এবার হারিয়ে গেলো তাঁর রেশটুকুও। সংগে সংগে মনে হলো প্রচন্ড ঠান্ডায় যেন হিম হয়ে যাচ্ছি।

পেম্বার খিচুড়ি রান্না হয়ে গিয়েছিলো। তাড়াতাড়ি গরম খিচুড়ি খেয়ে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে পড়লাম। স্লিপিং ব্যাগের মধ্যে শুয়ে আছি। শ্বাসকষ্ট হচ্ছে একটু একটু। তা হোক, আমরা তো প্রায় এসে গেছি।

সেদিন নভেম্বর মাসের ১০ তারিখ। সকাল সাতটায় ঘুম থেকে উঠে তৈরি হয়ে নিয়েছি। এতো ঠান্ডা, মনে হচ্ছে আমি যেন জমে গেছি। আমাদের তাঁবুর পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া পাহাড়ী নদীটা জমে বরফ হয়ে গেছে। পেম্বা খাবার তৈরি করছে। খেয়ে নিয়েই আমরা বেরিয়ে পড়বো। বিদেশী ট্রেকাররা রংবেরংয়ের জ্যাকেট গায়ে দিয়ে হাঁটা শুরু করে দিয়েছে। দূরে পাহাড়ের গায় রোদ। কিন্তু সেই রোদের গা ছুঁতে আমাদের এখনও অনেক দেরি। রোদ গায় লাগলে বড় আরাম পেতাম। ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে রোদের দিকে তাকিয়ে বসে আছি। একটু পরেই পেম্বা নিয়ে এলো গোলারুটি। ইতিমধ্যে আমরা কাঠমান্ডু থেকে সকলের জন্যে ভাড়া করে আনা পাখির পালকের গরম জ্যাকেট আর প্যান্ট পরে নিয়েছি। ওগুলো পরে বেশ আরামই লাগছে।

শুরু হলো আমাদের হাঁটা। আজ আমরা এভারেস্টের পাদদেশে পৌঁছুবো। সার্থক হবে আমাদের সব কষ্ট, সব পরিশ্রম। যাঁরা ট্রেকিং করেন তাঁরাই শুধু জানেন, এই সাফল্যের কি আনন্দ। বড় বড় বোল্ডারের পাশ দিয়ে আমরা অতি সাবধানে হাঁটছি। খানিকটা এগিয়ে পেম্বা পশ্চিমদিকের পথ ধরলো। পেম্বার পেছনে পেছনে আমরা চড়াই ভাঙছি। একে ওপরে ওঠা তার ওপর বড় বড় পাথরের পাশ দিয়ে ওঠা বেশ কষ্টকর। সাবধানে দেখেশুনে পা ফেলতে হচ্ছে। একটু এদিক ওদিক হলেই বিপদ।

আরও খানিকটা এগিয়ে থমকে দাঁড়ালাম। সামনে মূর্তিমান বাধার মতো দাঁড়িয়ে আছে একশ ফুট উঁচু একটা ঢিবি। আস্তে আস্তে সেই ঢিবিতে উঠতে লাগলাম। ওপরে উঠেই আবার নামা। এইভাবে ওঠানামা করতে করতে চলেছি। কিন্তু পা যেন আর চলে না। শীত যেন কোথায় পালিয়েছে। গায়ের জ্যাকেট আর প্যান্ট খুলে পেম্বার কাছে চালান করে দিলাম। কিন্তু পা আর চলে না। মনে হচ্ছে বুকটা ফেটে যাবে। ইচ্ছে করছে বসে পড়তে, একটু বিশ্রাম নিতে। কিন্তু পেম্বা আমাদের বসতে দিল না। একরকম জোর করে টেনে নিয়ে চলেছে। দিলীপের শরীর ভালো না। আমি ওর পাশে থেকে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছি।

বেলা দশটা চল্লিশ মিনিটে আমরা এসে পৌঁছুলাম এভারেস্টের পাদদেশে–গোরেকসেপে। সামনেই বরফ জলের বিরাট পুকুরের মতো কুন্ড। ৫১৮৪ মিটার উঁচুতে সেই কুন্ডের জলের ওপর বরফের সর। কোথাও কোথাও বরফ জমেছে পুরু হয়ে। আমরা এভারেস্টের তুষাররাজ্যে এসে গেছি। রোদ পড়ে বরফ-ঢাকা শৃংগগুলো দেখতে কি সুন্দরই না লাগছে। এভারেস্টের উচ্চতা ৮৮৪৮ মিটার। তার মানে আমাদের থেকে সাড়ে তিন হাজার মিটারের কিছু বেশি উঁচু। কিন্তু এইটুকু পথ পেরুবার যে কি কষ্ট, কি পরিশ্রম তা লিখে বোঝানো যাবে না।

ওদিকে দিলীপ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ওর পক্ষে কালাপাথারে যাওয়া সম্ভব নয়। ঠিক হলো ও লবুচে নেমে যাবে। আমি সংগে যেতে চাইলাম। ও রাজী হলো না। আমার হাত ধরে বললো, এ সুযোগ জীবনে আর পাবি না। তুই যা, আমি ঠিক নেমে যেতে পারবো। আমরা তাড়াতাড়ি করে সামান্য কিছু খেয়ে নিলাম। দিলীপ লবুচের দিকে নেমে গেলো। পেম্বাকে সংগে নিয়ে মলয় আর আমি এভারেস্টকে পেছনে রেখে কালাপাথারের দিকে চড়াই ভাঙতে শুরু করলাম। কিন্তু এগোনই মুশকিল। শ্বাসকষ্ট বাড়তে থাকে। দশ পা হাঁটতে না হাঁটতেই হাঁফ ধরে যায়। তাই বিশ্রাম নিয়ে নিয়ে এগিয়ে চলেছি। যতো ওপরে উঠি, পবন দেবতার রুদ্র মূর্তি ততোই প্রবল হয়ে ওঠে। সেই সংগে বাড়তে থাকে ঠান্ডা। মলয় আর পেম্বা এগিয়ে গেছে। জ্যাকেটটা থাকলে এতো শীত করতো না। ঠান্ডায় আমি কাবু হয়ে গেছি। মনে হলো কাজ নেই আর এগিয়ে। বরং ফিরে যাই। এই ঠান্ডা হাওয়ার ঝাপটা সহ্য করতে পারছি না।

হঠাৎ দেখি আমার সামনে একজন ট্রেকার। তিনি ফরাসি। ইংরিজিতে জিজ্ঞেস করলাম, আর কতো দূর? দেখারই বা কি আছে?

ভদ্রলোক উৎসাহ দিয়ে বললেন, আর মাত্র আধ ঘন্টার পথ। এগিয়ে যাও জীবন সার্থক হবে। দেখবে সে কি বিচিত্র সৌন্দর্য।

ভদ্রলোকের কথায় চাংগা হয়ে আবার হাঁটতে শুরু করলাম। খানিকটা এগিয়ে দিশাহারা হয়ে পড়লাম। সামনে শুধু বড় বড় পাথর। কোনো রকমে উঠলাম। এতো বাতাস মনে হচ্ছে, এই বুঝি ঝাপ্টা মেরে ফেলে দিয়ে আমায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে। একটা পাথর থেকে আর একটা পাথরে উঠছি। কিন্তু কোন দিকে যে যাচ্ছি বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে, পথ বোধহয় হারিয়ে ফেলেছি। হঠাৎ কানে এলো পেম্বার চিৎকার। অনেক দূর থেকে ও সাব–সাব বলে চেঁচাচ্ছে। আমিও চেঁচিয়ে উত্তর দিলাম। তারপরই দেখলাম অনেক উঁচু থেকে পেম্বা তাড়াতাড়ি নেমে আসছে। কাছে এসে ও এগিয়ে দিলো জ্যাকেটটা। জ্যাকেটটা গায় দিতে আরাম পেলাম। তারপর পেম্বার সংগে এগিয়ে চললাম। এক সময় এসে পৌঁছুলাম সেই স্বপ্নরাজ্যে।

চারদিক শুধু তুষারাবৃত পর্বতশৃংগ দিয়ে ঘেরা। আর আমরা এসে পড়েছি চিরতুষার রাজ্যে। যেদিকে তাকাই, আশেপাশে, কাছে-দূরে যেখানেই চোখ যায় ধূধূ করছে শুধু সাদা ধবধবে সীমাহীন বরফরাশি। আর আমাদের সামনেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশৃংগ মাউন্ট এভারেস্ট (৮৮৪৮ মিঃ)। বাঁয়ে নাপৎসে (৭৮৭৮ মিঃ), ডাইনে লোৎসে (৮৫০১ মিঃ), পেছনে মাউন্ট পামোরি (৭১৪৫ মিঃ) আরও অসংখ্য নাম-না-জানা পর্বতশৃংগ।

এই সেই এভারেস্ট! যুগে যুগে এরই টানে দেশবিদেশ থেকে কতো অভিযাত্রী এসেছেন! কেউ প্রাণ হারিয়েছেন আবার কেউ উঠেছেন পৃথিবীর এই ছাদে। তিব্বতীরা এভারেস্টকে বলে চোমোলুংমা। তার মানে পৃথিবীর জননী। গাড়োয়াল আর নেপালের মানুষের কাছে এভারেস্ট হলো সাগরমাতা। এভারেস্টের দিকে তাকিয়ে মনে পড়লো তেনজিং আর হিলারির কথা। মনে পড়লো সেই সব নাম-না-জানা অভিযাত্রীদের কথা যাঁরা দুর্গম ঐ শিখরের পথে প্রাণ হারিয়েছেন। বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়েছিলাম এভারেস্টের দিকে। মনে হলো সার্থক হলো আমার জন্ম, সার্থক এই কষ্ট আর পরিশ্রম। আর সৌন্দর্য–সে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। বুঝলাম, কালাপাথারে না এলে কী ভুলই না করতাম।

ছবি : লেখক

## পাপান ॥ মুস্তাফা নাশাদ

ছবি : সুফি

পাপান, পাপান, পাপান,
হইচই আর হট্টগোলে–
গোটা বাড়ি কাঁপান!

পড়াশোনায় ঢুঢু
খেলেন ক্যারাম লুডু,
হেরে গেলেই কান্নাকাটি
তিড়িং বিড়িং লাফান!

পাপান, পাপান, পাপান,
দু'ই পকেটে ভরেন বাবু–
পোকা-মাকড় যা-পান!

ভাল্লাগে না খেতে
দিনে কিমবা রেতে,
মাংস-পোলাও, মিষ্টি ফেলে–
করেন শুধু চা পান!

# হাঁদা-ভোঁদার

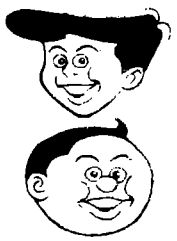

কর্মোদ্যম

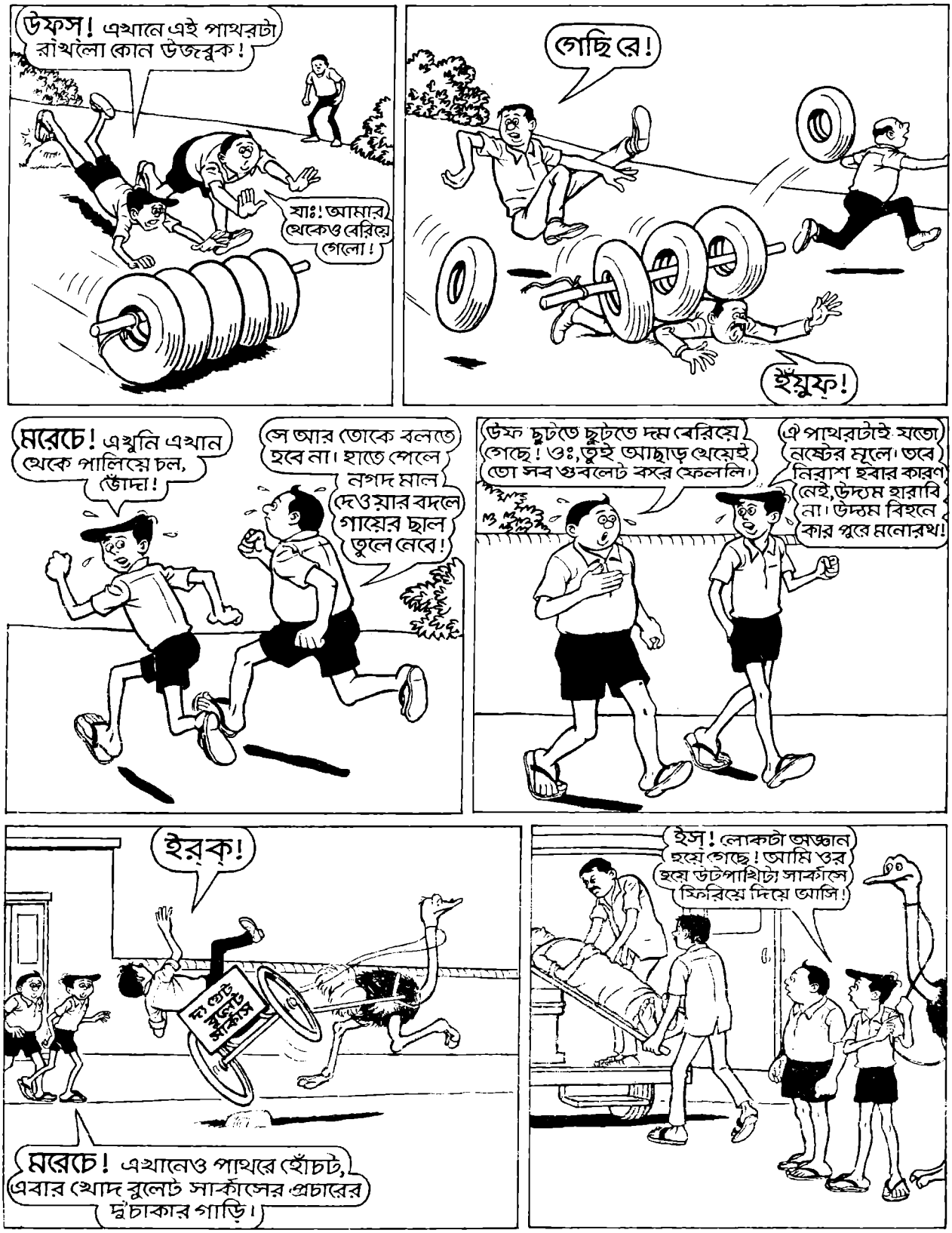
উফস্! এখানে এই পাথরটা রাখলো কোন উজবুক!
যাঃ! আমার থেকেও বেরিয়ে গেলো!
গেছি রে!
ইঁয়ুফ্!
মরেচে! এখুনি এখান থেকে পালিয়ে চল, ভোঁদা!
সে আর তোকে বলতে হবে না। হাতে পেলে নগদ মাল দেওয়ার বদলে গায়ের ছাল তুলে নেবে!
উফ্ ছুটতে ছুটতে দম বেরিয়ে গেছে! ওঃ, তুই আছাড় খেয়েই তো সব গুবলেট করে ফেললি!
ঐ পাথরটাই যতো নষ্টের মূলে। তবে নিরাশ হবার কারণ নেই, উদ্যম হারাবি না। উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ!
হুর্‌ক্!
দ্য গ্রেট বুলেট সার্কাস
মরেচে! এখানেও পাথরে হোঁচট, এবার খোদ বুলেট সার্কাসের প্রচারের দু'চাকার গাড়ি।
ইস্! লোকটা অজ্ঞান হয়ে গেছে! আমি ওর হয়ে উটপাখিটা সার্কাসে ফিরিয়ে দিয়ে আসি!

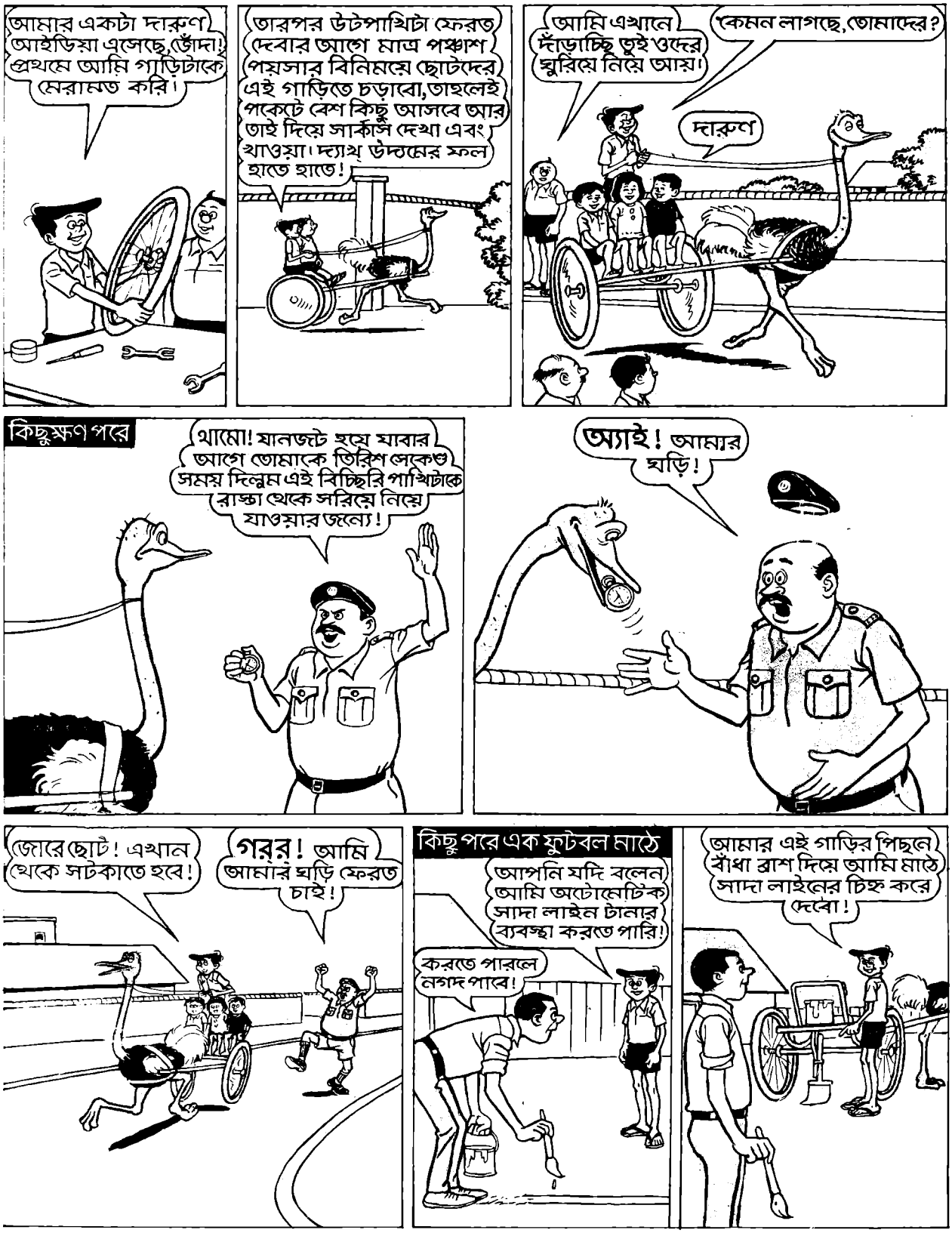
আমার একটা দারুণ আইডিয়া এসেছে,জোঁদা! প্রথমে আমি গাড়িটাকে মেরামত করি।
তারপর উটপাখিটা ফেরত দেবার আগে মাত্র পঞ্চাশ পয়সার বিনিময়ে ছোটদের এই গাড়িতে চড়াবো,তাহলেই পকেটে বেশ কিছু আসবে আর তাই দিয়ে সার্কাস দেখা এবং খাওয়া। দ্যাখ্ উদ্যমের ফল হাতে হাতে!
আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি তুই ওদের ঘুরিয়ে নিয়ে আয়।
কেমন লাগছে,তোমাদের?
দারুণ
কিছুক্ষণ পরে
থামো! যানজট হয়ে যাবার আগে তোমাকে তিরিশ সেকেণ্ড সময় দিলুম এই বিচ্ছিরি পাখিটাকে রাস্তা থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে!
অ্যাই! আমার ঘড়ি!
জোরে ছোট! এখান থেকে সটকাতে হবে!
গর্‌র! আমি আমার ঘড়ি ফেরত চাই!
কিছু পরে এক ফুটবল মাঠে
আপনি যদি বলেন আমি অটোমেটিক সাদা লাইন টানার ব্যবস্থা করতে পারি!
করতে পারলে নগদ পাবে!
আমার এই গাড়ির পিছনে বাঁধা ব্রাশ দিয়ে আমি মাঠে সাদা লাইনের চিহ্ন করে দেবো!

খেলা শেষে খাওয়া দাওয়ার জন্যে কেক যাচ্ছে – মরেচে! ব্যাটা উটপাখি যে কেক খাবার জন্যে ওদিকেই ছুটেছে!

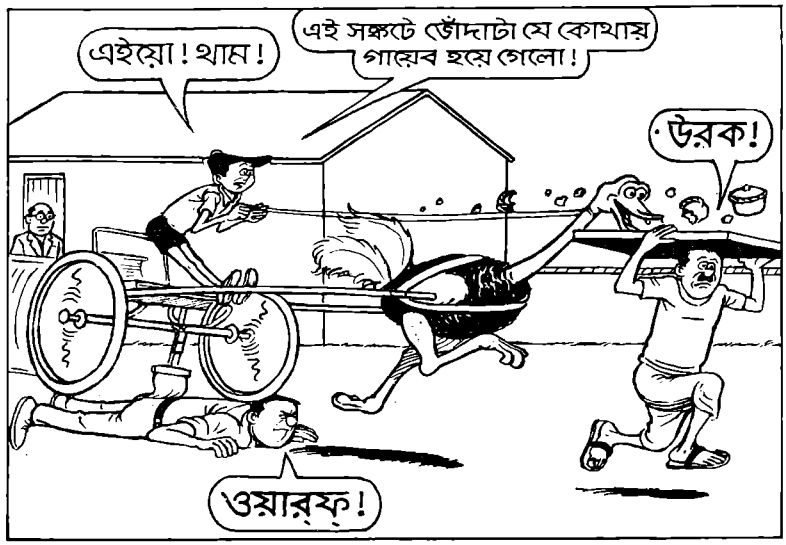
এইয়ো! থাম!
এই সঙ্কটে ভোঁদাটা যে কোথায় গায়েব হয়ে গেলো!
উরক!
ওয়ারফ্!

দেখুন! সাদা রংএর দাগ ঐ দিকে গেছে!

আমি একটা নতুন ঘড়ি চাই!
আমার জামা কাপড় কাচার পয়সা দিতে হবে!
আমি দু'ডজন কেকের জন্যে একটা বিল নিয়ে এসেছি!
ওকে! বাগানের ঘরটার মধ্যে ঢুকে নিজেকে চাবি আটকে রাখি

হাঁদা! তোর সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই!
অ্যাই! চাবিটা গিলবি না তাহলে আমি গেছি!

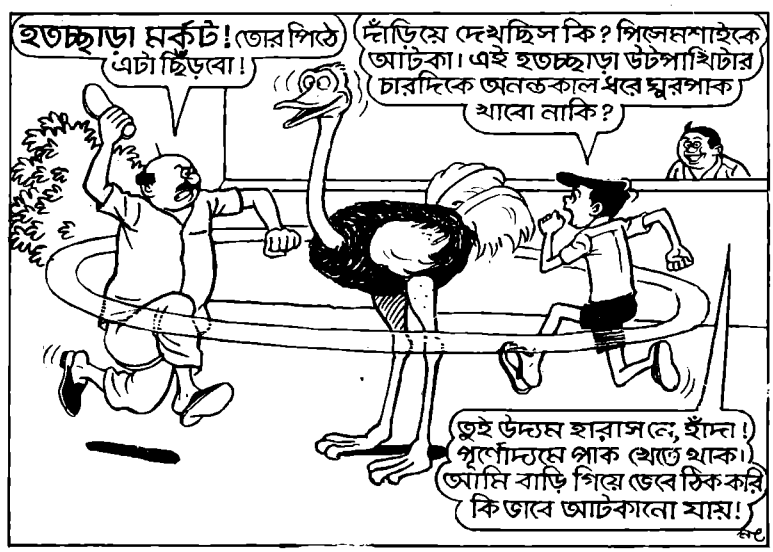
হতচ্ছাড়া মর্কট! তোর পিঠে এটা ছিঁড়বো!
দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? পিসেমশাইকে আটকা। এই হতচ্ছাড়া উটপাখিটার চারদিকে অনন্ত-কাল ধরে ঘুরপাক খাবো নাকি?
তুই উদ্যম হারাস নে, হাঁদা! পূর্ণোদ্যমে পাক খেতে থাক। আমি বাড়ি গিয়ে ভেবে ঠিক করি কি ভাবে আটকানো যায়!

# হিটলার বনাম নরউইজীয়ান ইলেভেন

জ্যোতির্ময় মজুমদার

১৯৮৯ থেকে ১৯৯৫ সাল অবধি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সুবর্ণ জয়ন্তী চলছে। ঐ যুদ্ধেরই এক অল্পপরিচিত কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার কথা বলছি।

১৯৪০ সালের কথা। এক ইংলন্ড ছাড়া বাকি ইওরোপ হিটলারের সামনে লুটিয়ে পড়েছে। স্রেফ মনের জোর আর কিছু অসাধারণ বৈমানিকদের সাহস সম্বল করে ইংলন্ড লড়ে যাচ্ছে। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল। ঠিক এ বছর এপ্রিল মাসে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিকমহলে কানাঘুষোয় শোনা যেতে লাগল যে জার্মানীর কাইজার উইলহেল্‌ম্‌ ইন্সটিটিউট-এ অ্যাটম ফাটাবার চেষ্টায় জোরকদমে কাজ চলছে। এর দু'বছর পর ১৯৪২ সালে যখন মিত্রশক্তির দেশগুলো অ্যাটম বোমা বানাবার জন্য অপারেশন ম্যানহাটান্‌ পরিকল্পনার তোড়জোড় শুরু করেছেন ঠিক তখনই এক ভয়ানক খবর তাঁদের কানে এসে পৌছোল। ইংলন্ডের মিনিস্ট্রি অফ্‌ ইকনমিক ওয়ারফেয়ার বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেলেন যে নরওয়েস্থিত (নরওয়ে তখন জার্মানদের দখলে) পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ইলেকট্রোকেমিক্যাল কারখানা, নর্স্‌ক্‌ হাইড্রোকে (Norsk Hydro) জার্মান কর্তৃপক্ষ হুকুম দিয়েছেন যে ডিইটেরিয়াম অক্সাইড (অর্থাৎ ভারী জল)-*এর উৎপাদন বছরে ৩০০০ পাউন্ড থেকে ১০,০০০ পাউন্ড অবধি বাড়াতে। এ খবরের তাৎপর্য একটাই, তা হলো জার্মান নাৎসীরা অ্যাটম বোমা বানাবার চেষ্টা করছে। ঐ আমলে অ্যাটম বোমা তৈরি হয়নি কিন্তু এটা বোঝা গেছে যে ধাতুদের মধ্যে ইউরেনিয়াম ২৩৫ বা U-235 এ-ব্যাপারে সবচেয়ে কাজে লাগবে। আর এই U-235 তৈরি করতে দরকার ভারী জলের। এই হেভী ওয়াটার বা ভারী জল খুব ভাল 'মডারেটর'-এর কাজ করে অর্থাৎ যখন অ্যাটমগুলো চেন রিয়্যাকশনে একের পর এক দ্রুত ভাঙতে শুরু করে তখন ভারী জল এই প্রক্রিয়াকে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করে। নয়ত এত বেশি তাপ আর তেজস্ক্রীয় রশ্মি বেরোবে যে ল্যাবরেটরি ও বৈজ্ঞানিক দু'জনেই লোপাট হয়ে যেতে পারেন। তখনও অবধি মিত্র শক্তির কাছে যথেষ্ট পরিমাণে ভারী জল ছিল না, তা তৈরি করতে এক-দেড় বছর লেগে যেতো। সে জন্য তাঁরা গ্রাফাইটকে নিয়ন্ত্রক হিসেবে ব্যবহার করছিলেন। মোদ্দা কথা হলো এই যে, জার্মানরা অ্যাটম বোমা বানাবার ব্যাপারে অনেকটা যে এগিয়ে গেছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

ব্রিটিশ ওয়ার ক্যাবিনেট এ সময় সিদ্ধান্ত নেন যে নর্স্‌ক্‌ হাইড্রো কারখানা ধ্বংস করা ও সেই সংগে ভারী জলের সমস্ত রসদ নষ্ট করাই সবচেয়ে জরুরী। কিন্তু ব্যাপারটা কি অতই সোজা! এই কারখানার চারধারে উঁচু খাড়া পাহাড়, সেই বাধা ডিঙিয়ে এরোপ্লেনের সাহায্যে বোমা মেরে ধ্বংস করা অসম্ভব; অন্তত তখন ইংলন্ডে যে মডেলের প্লেন আছে তাদের পক্ষে তা সম্ভব নয়। এ হচ্ছে কম্যান্ডোদের কাজ।

কিছুদিন আগে নরওয়ের বেজিস্‌টেন্স-এর ক'জন (যে সমস্ত নরউইজীয়ানরা নাৎসীর বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছিলেন) গ্যালটেসুন্ড (Galtesund) বলে একটা স্টীমার কব্‌জা করে তাকে উত্তর স্কটল্যান্ড-এর অ্যাবর্ডীন শহরে চালিয়ে নিয়ে আসেন। জলে রাখা মাইন বা জার্মান সাবমেরিনকে তাঁরা তোয়াক্কাই করেননি। এই অসমসাহসী দলের যিনি নেতা তাঁর নাম ছিল আইনার (Einar)।

আইনার সাহেব নরওয়ের আন্ডারগ্রাউন্ড বিরোধীদের সুসংবদ্ধ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন এবং কিছুটা সাফল্যও পেয়েছিলেন। এই দূরচেতা ভদ্রলোককে লন্ডন-এর স্পেশাল ফোর্স (special force)-এর হেড-কোয়ার্টারে হাজির করা হলো। একে দেখে সবাই খুশি ও আশ্বস্ত হলো। কারণ নর্স্‌ক্‌

হাইড্রো কারখানা ধ্বংস করার পক্ষে এঁর চেয়ে যোগ্য আর কেউ ছিল না। আইনার শুধু যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন তাই নয়, তাঁর অন্যান্য গুণের মধ্যে ছিল স্কী চালাবার অসাধারণ ক্ষমতা, নিঁখুত গুলি চালাতেও পারতেন। প্রচন্ড বিপদের সময়েও মাথা ঠান্ডা রাখতে পারতেন। সবচেয়ে বড় কথা, এই নর্স্‌ক্ হাইড্রো কারখানার কয়েক মাইলের মধ্যেই তাঁর সারাজীবন কেটেছে। তিনি নিজেও একজন হাইড্রোইলেকট্রিক বিশেষজ্ঞ এবং তাঁর এক ভাই ও বন্ধুরা ঐ কারখানাতেই গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন।

স্পেশাল ফোর্সের হেড-কোয়ার্টার-এ মিঃ আইনার-এর আলাপ হলো ডঃ লিফ্ ট্রনস্টাড (Dr. Lief Tronstad)-এর সংগে। উনি যে সে লোক নন, নর্স্‌ক্ হাইড্রোর ভারী জলের কারখানার পরিকল্পনা এঁরই কীর্তি। যুদ্ধের আগে জার্মানীর নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানীদের সংগে এঁর ভালই দহরম মহরম ছিল। এক কথায় জার্মানীর অ্যাটম বোমা বানাবার ব্যাপারে ডঃ ট্রনস্টাড যতটা ওয়াকিবহাল ছিলেন ততটা পৃথিবীতে আর কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ। ১৯৪১-এর শেষে নরওয়ের রেজিস্‌টেন্স ডঃ ট্রনস্টাডকে নরওয়ে থেকে লুকিয়ে সুইডেন-এ বার করে আনতে সক্ষম হন! সেখান থেকে তিনি লন্ডন চলে আসেন।

ডঃ ট্রনস্টাডের সংগে আলাপের পরে আইনারকে জিগ্যেস করা হলো–স্রেফ ষড়যন্ত্র করে নর্স্‌ক্ হাইড্রোকে ধ্বংস করা কি সম্ভব? তিনি বোঝালেন যে কারখানাটা সাততলা উঁচু কংক্রীট সিমেন্ট-এ তৈরি এক পেল্লায় ব্যাপার। কারখানা এবং তার বিদ্যুৎকেন্দ্র দুটোই ১০০০ ফিট উঁচু এক খাদের উপর অবস্থিত। চারদিকে বাছা বাছা জার্মান সৈন্য পাহারা দিচ্ছে। আশেপাশের পাহাড়গুলো এত খাড়া যে চড়া বা নামা প্রায় দুঃসাধ্য। 'কিন্তু আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব।' আইনারের জবাব।

আইনারকে এবার নিয়ে যাওয়া হলো স্পেশাল ফোর্সের ট্রেনিং ক্যাম্পে। একটা ছোট বেশ শক্তিশালী শর্টওয়েভ রেডিও ট্রান্সমিটার তাঁকে দেওয়া হলো। রেডিও অপারেট করার ব্যাপারে আইনারের হাতেখড়ি আগেই হয়েছিল, সুতরাং এ ব্যাপারটায় সড়গড় হতে সময় বেশি লাগল না। গোপন কোড কি করে পাঠাতে হয় তাও শিখে নিলেন, আর শিখলেন প্যারাসুট বেঁধে ঝাঁপ দেওয়ার কায়দাকানুন। তাঁর উপর হুকুম হলো নরওয়ে ফিরে গিয়ে নর্স্‌ক্ হাইড্রো সংক্রান্ত আরো খবর যোগাড় করে লন্ডনে পাঠাতে। লন্ডন থেকে আর একটা দল পাঠাবার কথাও ঠিক হলো। তাদের জন্যও আইনারকে অপেক্ষা করতে হবে।

এক অন্ধকার রাতে রয়্যাল এয়ারফোর্সের বোমারু বিমান থেকে আইনার ঝাঁপ দিলেন তাঁর বাড়ির থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে। পড়লেন এসে এক পাহাড়ের গায় আর সেখান থেকে স্কী চালিয়ে বাড়ি এসে পৌছোলেন। মার সংগে ভোরবেলা ব্রেকফাস্ট সারতে সারতে মাকে জানালেন যে স্কী করার জন্যই তাঁকে দূরে যেতে হয়েছিল। তিনি একটা ব্যাপারে আশ্বস্ত হলেন অন্ততঃ গ্যালটেসুন্ড স্টীমারের ব্যাপারে কেউ তাঁকে সন্দেহ করছে না।

ভারী জলের উৎপাদন বাড়াবার জন্য নর্স্‌ক্ হাইড্রোতে একটা নতুন বাঁধ তৈরি হচ্ছিল। আইনার তাঁর ভাইয়ের সাহায্যে এখানে চাকরি পেলেন। অত্যন্ত যত্নের সংগে তিনি বন্ধুদের সাহায্যে একটা গোপন গোয়েন্দাচক্র তৈরি করে ফেললেন আর যাবতীয় খবর সংগ্রহ করতে লাগলেন। বলা বাহুল্য, সমস্ত খবরই পাচার হতে লাগল ব্রিটিশ সেন্ট্রাল ইনটালিজেন্সে।

এদিকে খবর আসতে লাগল যে ডিউটেরিয়াম অক্সাইড-এর উৎপাদন বেড়েই চলেছে এবং প্রতি মাসে তা জাহাজে করে জার্মানীতে চলে যাচ্ছে। আর দেরি নয়, ব্রিটিশ ওয়ার-ক্যাবিনেট তৎক্ষণাৎ নর্স্‌ক্ হাইড্রোতে কম্যান্ডো আক্রমণের আদেশ দিলেন।

আদেশ তো হলো, কিন্তু নরওয়ে বড় কঠিন ঠাঁই। চতুর্দিকে খাড়া বরফ-ঢাকা পাহাড়। সেখানে আবার থেকে থেকেই এক ধরনের গরম হাওয়া হয় যাতে ঘন্টাখানেকের মধ্যে ১০ থেকে ১২ ডিগ্রি টেম্পারেচার বেড়ে যায়, হঠাৎ বরফ গলতে শুরু করে। প্যারাসুট বা গ্লাইডার করে আক্রমণ হানার পক্ষে বোধহয় নরওয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে বিপজ্জনক দেশ। সুতরাং কম্বাইন্ড্ অপারেশনের পোড়-খাওয়া কম্যান্ডোরাও কিছুটা চিন্তিত ছিল। কিন্তু ডঃ ট্রনস্টাড কারখানার এমন একটা খাসা মডেল বানিয়েছিলেন আর ওদিকে আইনার সাহেব ঠিকঠাক সব খবর পাঠাচ্ছিলেন যে তারই সাহায্যে তৈরি হলো কম্যান্ডো বাহিনী, দলটার নাম ঠিক হলো অপারেশন সোয়ালো (Operation Swallow)।

চারজন নরওয়েবাসী বাছা হলো, তারা যে শুধু স্কী চালাতে দক্ষ তাই নয়, সবাই নর্স্‌ক্ হাইড্রো কারখানা অঞ্চলেরই বাসিন্দা। এদের গ্লেন থেকে সেখানে নামিয়ে দেওয়া হবে। তারা আইনারের সংগে যোগ দেবেন এবং একটা ছোটখাটো অভ্যর্থনা কমিটি বানিয়ে তৈরি থাকবেন। পরে একটা ব্রিটিশ প্যারাসুট বাহিনী এঁদের সংগে যোগ দেবে। এরকমই আপাতত ঠিক হলো।

এদিকে দু'দুবার ব্রিটিশ বোমারু বিমান সোয়ালোদের নিয়ে নরওয়ের উপর উড়ে এলো। এত ঘন মেঘ যে কিছুই ঠাহর হলো না, এঁদেরও ঝাঁপ দেওয়া হলো না। ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসের এক রাতে এঁদেরকে কয়েক মিনিটের নোটিশে গ্লেনে তুলে নরওয়ের উপর নিয়ে আসা হলো। রাতের গভীর অন্ধকারে ওঁরা লাফিয়ে পড়লেন। পরের দিন সকালের আলোয় যখন নিজেদের অবস্থান হিসেব করলেন, বুঝলেন যে অকুস্থল থেকে এঁরা একশ মাইল দূরে এসে পড়েছেন। এরপর আরো দু'দিন লাগল সমস্ত মালপত্র, যন্ত্রপাতি খুঁজে বার করতে যা গ্লেন থেকে তাঁদের সংগে ফেলে দেওয়া হয়েছিল।

আগামী পনেরো দিন ধরে সোয়ালোরা এক অসাধারণ কাজ করলেন। ঐ চার হাজার ফিট উচ্চতায় যখন টেম্পারেচার হিমাংকের অনেক নিচে সেই অবস্থাতেও তাঁরা মালপত্র নিয়ে নর্স্‌ক্ হাইড্রোর দিকে এগোতে লাগলেন। এ অবস্থায় একজনের পক্ষে ৬০ পাউন্ডের বেশি মাল বওয়া সম্ভব ছিল না। তার মানে একেক জনকে ১২০ পাউন্ড মাল টানতে বেশ কয়েকবার আসতে যেতে হচ্ছিল। দৈনিক রেশন ছিল, একটা ছোট্ট চীজের টুকরো, চারটে বিস্কুট আর সামান্য ময়দা।

অবশেষে নয়ই নভেম্বর ইংলন্ডের কম্বাইন্ড্

হঠাৎ খেয়াল করল যে .....

অপারেশনের চিন্তিত অফিসাররা বহু আকাঙ্ক্ষিত সোয়ালোদের কোড রেডিওতে শুনতে পেয়ে নিশ্চিন্ত হলেন। তাঁরা নর্স্‌ক্ হাইড্রোর কাছে পৌঁছে গেছেন এবং আইনার-এর সংগে যোগাযোগও হয়েছে। এসময় যদি গ্লাইডার করে বাকি ষড়যন্ত্রকারীরা আসতে চান তবে তাঁদের আলো দেখিয়ে বা রেডিও তরংগের সাহায্যে এঁরা পথ দেখাতে পারবেন।

নভেম্বর মাসের পনেরো তারিখে দুটো হ্যালিফ্যাক্স্ বোমারু ইংলন্ড থেকে উড়লো, তাদের পেছনে বাঁধা দুটো গ্লাইডার। প্রত্যেকটাতেই রয়েছে প্যারাসুট বাহিনী সৈন্য। কয়েকঘণ্টা পরেই ইংলন্ডে খবর এলো যে বোমারু বিমান আর গ্লাইডার সবই ধ্বংস হয়েছে আর সমস্ত সৈন্য হয় মারা গেছে নয় ধরা পড়েছে।

আরো দুঃসংবাদ বাকি ছিল। একজন জার্মান ইনটালিজেন্স বাহিনীর অফিসার ঐ প্লেনের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে থেকে একটা ম্যাপ খুঁজে পেলেন, তাতে আবার নরওয়ের ভামর্ক (Vemork) শহরের পাশে একটা লাল দাগ দেওয়া। হবি তো হ এই শহরের কাছেই হচ্ছে নর্স্‌ক্ হাইড্রো কারখানা। জার্মানদের মধ্যে হৈচৈ পড়ে গেল। নরওয়ের রাইখ কমিশনার যোশেফ টারভোবেন (Joseph Tervoben) ছুটে এলেন আর সংগে এলেন জেনারেল ফন ফকেনহর্স্ট (Gen Von Falkenhorst)। দুজনে নিজেদের সৈন্যবাহিনীর অবস্থিতি আরো জোরদার করলেন। আশেপাশের অঞ্চলে গেস্টাপো বাহিনী বাড়ি বাড়ি তল্লাশি শুরু করল আর যাকেই ব্রিটিশপন্থী বলে সন্দেহ হলো তাকেই অ্যারেস্ট করা হলো। আশ্চর্য ব্যাপার, সোয়ালোদের কেউই কিন্তু ধরা পড়ল না।

লন্ডনে হতাশ ও চিন্তিত কম্বাইন্ড্ অপারেশন্স্ আবার পুরো ব্যাপারটা গোড়ার থেকে শুরু করলেন। এবার আর গ্লাইডার-এর সাহায্যে আক্রমণ-এর কথা কেউ বলল না। ঠিক হলো ছ'জন স্পেশাল ফোর্সের নরউইজীয়ানকে প্যারাসুট করে নামান হবে। ডঃ টুনস্টাড্ আবার ম্যাপ আর মডেল নিয়ে বসলেন এই নতুন গ্রুপটাকে ট্রেনিং দিতে। হাতে আর সময় নেই। সোয়ালোদের অবস্থাও একেবারে কাহিল, খাবার ফুরিয়ে আসছে। চার হাজার ফুট উঁচু পাহাড়ে ঐ চার বেচারা এক ছোট্ট কটেজে কোনোরকমে বেঁচে আছে। সোয়ালো গ্রুপের দলপতি জানালেন যে তিনি ছাড়া দলের আর সবাই জ্বর আর পেটের যন্ত্রণায় ভুগছে। শ্যাওলা জাতীয় জিনিস খেয়ে কোনোক্রমে বেঁচে আছেন। কয়েক মাইল দূরে আইনার সাহেবও অতিকষ্টে গেস্টাপোর চোখ এড়িয়ে চলছেন। তবে রোজ সন্ধ্যায় তিনি স্কী চালিয়ে বিশ্বস্ত অনুচরদের সংগে দেখা করে সব খবরাখবর পেতেন। তিনিও এক ক্যামোফ্লেজ করা কুটিরে থাকতেন।

মিঃ আইনার এক অবিশ্বাস্য খবর ইংলন্ডে পাঠালেন। জার্মানরা বোকা বনেছে। তারা, ভগবান জানে, কেন সন্দেহ করছে যে কম্যান্ডোদের লক্ষ্য হচ্ছে নতুন নির্মীয়মান বাঁধটা, মূল নর্স্‌ক্ হাইড্রো কারখানাটা নয়। সেজন্য বাঁধের কাছে মোতায়েন করা হয়েছে একশ জন গার্ড আর কারখানা পাহারা দিচ্ছে মাত্র বারোজন জার্মান।

ডিসেম্বরের শেষে ইংলন্ডে অন্য দলটাও তৈরি হয়ে উঠল। এদের নাম হলো অপারেশন গানারসাইড (Operation Gunnerside)। ছ'জন নরওয়েবাসী এক বিকেলে বরফে ঢাকা স্ক্রাইকেন (Skryken) হ্রদের উপর প্লেন থেকে লাফিয়ে পড়লেন। তাঁরা জড়ো হলেন সোয়ালোদের গোপন ঘাঁটি থেকে ত্রিশ মাইল উত্তরে। তাঁরা চলতে শুরু করেছেন কি করেননি শুরু হলো এক ভয়ংকর তুষার ঝড়। পাঁচ দিন তাঁরা একটা খালি হান্টিং লজে অতিকষ্টে উপোস করে কাঁপতে কাঁপতে কাটালেন। অবশেষে ঝড় থামল আর তাঁরাও অবসন্ন অবস্থায় ওখান থেকে বেরোলেন। তাঁরা কিছুটা এগিয়েছেন, এমন সময় সবাইকার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে এলো, দেখেন কি সামনে থেকে দুজন স্কী করতে করতে ওঁদের দিকে এগিয়ে আসছেন। এঁরা যদি জার্মান হয় তো সর্বনাশ। একজন গানারসাইড তাড়াতাড়ি নিজের ইউনিফর্মের ওপর একটা সিভিলিয়ান স্কী স্মক আর মাথায় ক্যাপ চড়িয়ে কিছুটা যেন ছদ্মবেশ ধারণ করলেন। যদি ঐ দুজন জার্মান হয় তাহলে ইনি নিজেকে বন্যহরিণের পাহারাদার বলে পরিচয় দেবেন। বাকিরা সব বন্দুক বাগিয়ে বরফের উপর বসে পড়লেন। ঠিক এই সময় বাতাসের আওয়াজ ছাপিয়ে তিনবার উল্লাস বা হর্ষধ্বনি শোনা গেল। গানারসাইড আর সোয়ালোদের দেখা হয়েছে।

এরপর ঘটনা দ্রুত এগোতে লাগল। সোয়ালোদের গোপন ঘাঁটিতে সবাই, এখন সংখ্যায় এগারোজন জড়ো হলেন। আইনার যা যা জানতেন, সব বললেন। কারখানার কোন গেট বন্ধ থাকে, কিভাবে বন্ধ থাকে, কোথায় পাহারা থাকে, কখন পাহারা বদল হয় ইত্যাদি। তাদের কি ভাবে যেতে হবে তাও জানালেন, তবে তা সত্যিই রূপকথার মতন–যে রাস্তা ধরে রাজপুত্র হারিয়ে যাওয়া রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে যায়। প্রথমে বেশ কয়েক মাইল খাড়া বরফে ঢাকা বনের মধ্যে দিয়ে নামতে হবে। তারপর এক হাজার ফুট খাদ প্রায় ঝুলতে ঝুলতে নামতে হবে। এর পর এক খরস্রোতা নদী পেরোতে হবে। আবার এক হাজার ফুট খাড়া পাথরের দেওয়াল

টপকাতে হবে। এসব পেরোলে এঁরা এসে পড়বেন এক রেললাইনের ওপর, সেটা ধরে এগোলে তবে ফ্যাক্টরি বা কারখানা। যদি সামান্য কিছু ভুল হয় বা জার্মানদের সন্দেহ জাগে তবে সঙ্গে সঙ্গে জায়গাটা সার্চলাইটের আলোয় ভরে যাবে।

১৯৪৩ সালের সাতাশে ফেব্রুয়ারি ন'জন যাত্রা শুরু করলেন। দলপতির নাম রনি। কাঁধে মারাত্মক সব বোমা আর বিস্ফোরক নিয়ে খাড়া পাহাড় বেয়ে নামা দুঃস্বপ্নের চেয়ে কম কিছু ছিল না। জায়গায় জায়গায় হড়হড়ে বরফ হঠাৎ একটু গরম পড়ে যাওয়ায় পাহাড়ী নদীতে বরফগলা জল ছুটে চলেছে। অনেক কষ্টে খুঁজে একটা বরফের সাঁকো পাওয়া গেল, অনেকটাই জলে ডুবে আছে কিন্তু তবু পেরোনো যায়। এরপর সোজা পাহাড় বেয়ে এক হাজার ফুট চড়াই। ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোতে হচ্ছিল, একবার পা ফসকালেই নিশ্চিত মৃত্যু। রনি হাতের ঘড়ি দেখছিলেন—নষ্ট করার মতন সময় একেবারেই নেই।

অবশেষে অসম্ভব সম্ভব হলো, তাঁরা রেললাইনের উপর উঠে এলেন। সবাই হাঁপাচ্ছেন। এবার প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে যাত্রা। কারখানা আর মাত্র পাঁচশ ফুট দূরে। কারখানার ভারী মেশিন চলার গুমগুম আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। রনি শেষবারের মতন সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন যে কি কি করতে হবে। 'আর দেরি নয়, চলুন' এই বলে এগিয়ে গেলেন। একজনের হাতে বড় শেকল কাটার যন্ত্র। মজার কথা, এদিকের গেটটা শুধু মোটা চেন আর একটা পেল্লায় তালা ছাড়া আর কিছু দিয়ে আটকানো ছিল না। চেন ভাঙার বেশ জোরে আওয়াজ হলো, সবাই দমবন্ধ করে দাঁড়িয়ে। ভেতর থেকে কিন্তু কোনো শব্দ এলো না। সবাই চটপট গেট পেরিয়ে কারখানার ভেতরে এলেন। পাঁচজনের একটা দল টমি গান হাতে জার্মান ব্যারাকটাকে ঘিরে রইল, ভিতরে বারোজন জার্মান প্রহরী থাকার কথা, যদি তারা বেরিয়ে আসে, তক্ষুণি গুলি চলবে।

ডঃ ট্রনস্টাড এত ভালো ট্রেনিং দিয়েছিলেন যে বাকি চারজনের মাত্র কয়েক মিনিট লাগল ইলেকট্রিক তারের সুড়ঙ্গটা (cable tunnel) খুঁজে পেতে। এই সুড়ঙ্গটা শেষ হয় কারখানার প্রধান অংশটার পাশেই। রনির দুই শাগরেদ অন্ধকারে হারিয়ে গেল কিন্তু বাকি দুজন তারের জঙ্গলের মাঝে হাতড়ে হাতড়ে এগোতে লাগলেন।

যে নরউইজীয়ান গার্ড প্রধান অংশটা পাহারা দিচ্ছিল সে হঠাৎ খেয়াল করল যে দুটো বন্দুকের নল তারি দিকে তাক করা আর আশ্চর্য বলতে হবে সেও বাধ্য ছেলের মতন এঁদের সব কথা শুনল, কোনো গোলমাল করেনি। রনি খুব দ্রুত ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে দেখে নিলেন কোথায় জলের ট্যাঙ্ক, পাইপ, মেশিন আর ঠিক সেই মতন বিস্ফোরকগুলোও বেঁধে দিলেন। ইংলন্ডের ট্রেনিংটা খুব কাজে এলো। এমন জায়গায় সব বোমাগুলো বাঁধা হলো যে সেগুলো ফাটলে কারখানাটা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এমন সময় হঠাৎ ঝনঝন করে বেসমেন্টে কাঁচ ভাঙার শব্দ। কেউ একটা জানলা ভেঙেছে। রনি প্রায় গুলি চালাতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তখুনিই বুঝতে পারলেন ওঁদেরই দলের একজন রাস্তা হারিয়ে জানলা ভেঙে

ঢুকছে। উত্তেজনায় ওঁর হাত কাঁপছে, সেই অবস্থাতেই দ্রুত সব কাজ শেষ করলেন।

ভগবান সত্যিই আছেন বলতে হবে। কেননা, এখনো অবধি কোনো গোলমাল হয়নি, অ্যালার্ম বেল বা পাগলা ঘন্টি বেজে ওঠেনি। রনি এবার তিরিশ সেকেন্ডের ফিউজ বোমাগুলোর সঙ্গে বেঁধে দিলেন। ঐ পাহারাদার এবং তাঁরা এবার দে ছুট, ঘর থেকে প্রায় কুড়ি গজ দূরে তাঁরা বিস্ফোরণের আওয়াজটা শুনতে পেলেন। মোটা মোটা কংক্রীটের দেওয়ালের আড়ালে তা তেমন জোরালো শোনালো না বটে কিন্তু পায়ের তলার মাটি থরথর করে কেঁপে উঠল।

এখন ঘুমন্ত জার্মানদের জেগে ওঠার পালা কিন্তু তাঁরা আসবার আগেই রনি আর তাঁর দলবল হাওয়া। সেই অসম্ভব রাস্তা দিয়েই তাঁরা ফেরৎ গেলেন। জার্মানরা কল্পনাও করতে পারেননি যে ওদিক থেকেও আক্রমণ হতে পারে। ইতিমধ্যে এক হাজার পাউন্ড অমূল্য ভারী জল ভাঙা ট্যাংক থেকে বেরিয়ে নর্দমায় গিয়ে পড়েছে।

কয়েক ঘন্টার মধ্যেই জার্মান কম্যান্ডার জেনারেল ফন ফকেনহর্স্ট্ গাড়ি নিয়ে অকুস্থলে উপস্থিত। ক্ষয়ক্ষতি দেখে তিনি মন্তব্য করলেন, 'এত সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র আমি জীবনে দেখিনি।' তারপরেই তাঁর হুকুমে পুরো এক ডিভিশন অর্থাৎ ১২,০০০ জার্মান সৈন্য জায়গাটা গরুখোঁজা করতে শুরু করল। তাঁদের সঙ্গে চিরুনী তল্লাশি চালালো স্কী-জানা সৈন্যেরা আর এরোপ্লেন থেকেও পাহাড় উপত্যকায় নজর রাখা হলো। সমস্ত রাস্তা বন্ধ করে প্রতিটি বাড়িতে তল্লাশি করলো গেস্টাপোরা। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীদের কোনো পাত্তা পাওয়া গেল না।

এমন সময় হঠাৎ ঝনঝন করে.....

গানারসাইড দলের ছ'জনের মধ্যে পাঁচজন তক্ষুণি স্কী. চালিয়ে সুইডেনের সীমানার দিকে এগিয়ে গেলেন এবং প্রচুর কষ্ট স্বীকার করে সেখানে পৌছোলেনও। এবং সেখান থেকে প্লেনে করে ইংলন্ড। তাঁদের এক সাথী বোন্‌জো (Bonzo) আর সোয়ালো দলের চারজন আরো কিছু গোপন কাজের জন্য নরওয়েতে রয়ে গেলেন। বলা বাহুল্য, জার্মানদের সঙ্গে তাঁদের লুকোচুরি খেলতে হচ্ছিল। আইনার তাঁর গোপন আস্তানায় চলে গেলেন কিন্তু নর্স্‌ক্ হাইড্রোর উপর নজর রাখা বন্ধ হলো না।

. ১৯৪৩ সালের শেষের দিকে আইনার রেডিও মারফৎ জানালেন যে জার্মানরা কারখানাটা মেরামত করে ফেলেছে আর ভারী জলের উৎপাদন আবার শুরু হয়েছে। খবরটা পাওয়া মাত্রই আমেরিকার এইট্‌থ্ এয়ারফোর্স বাহিনীর বোমারু বিমান নর্স্‌ক্ হাইড্রোর বিজলী স্টেশনটাকে নষ্ট করে দেয়। জার্মানরা দেখল নরওয়েতে তেমন সুবিধে হচ্ছে না, তাই ঠিক হলো যে যন্ত্রপাতি আর ভারী জলের বাকি রসদ সমস্ত জার্মানীর এক গোপন ঘাঁটিতে পাচার করা হবে।

হাইড্রো (Hydro) বলে একটা ফেরীবোট টিন্‌সজো (Tinnsjo) হ্রদ পেরিয়ে এসব জিনিস নিয়ে যাবে। কবে যাবে, কখন যাবে এসব খবর আইনার পেলেন। তৎক্ষণাৎ ইংলন্ড থেকে অনুমতি চেয়ে পাঠালেন জাহাজটা ডোবাবার জন্য. অনুমতি তখনই এসে গেল। আইনার সাহায্যের জন্য

Bonzo-কে ডেকে পাঠালেন। উনি তখন পঞ্চাশ মাইল দূরে আর একটা আন্ডারগ্রাউন্ড দলের সঙ্গে কাজ করছিলেন। বোনজো হুকুম পেয়েই হাজির। উনি কিছু জাল কাগজপত্র যোগাড় করে নিজের পরিচয় দিলেন যেন নর্স্ক হাইড্রোরই কর্মী। সেই সুবাদে হাইড্রো জাহাজে চড়বার অনুমতিও পাওয়া গেল। উনি জাহাজে চড়ে লক্ষ্য করলেন যে কোন জায়গায় বোমা ফাটালে জাহাজটা সবচেয়ে ভালো ডুববে। এমন ডোবা ডুবাতে হবে যে কেউ যেন পরে জাহাজটাকে টেনে তুলতে না পারে। যে কথা সেই কাজ, জাহাজের সবচেয়ে তলার ডেকে একটা শক্তিশালী টাইম বোমা রাখা হলো।

১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে হাইড্রো জাহাজ তার অগস্তাযাত্রা আরম্ভ করল। যখন টিন্‌সজো হ্রদের মাঝামাঝি পৌঁছেছে তখনই এক প্রচন্ড বিস্ফোরণে জাহাজটা কাৎ হয়ে গেল আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সলিল সমাধি। সঙ্গে সঙ্গে তলিয়ে গেল হিটলার আর নাৎসী পার্টির আটম বোমা বানাবার স্বপ্ন।

আজ কল্পনা করতেও আতঙ্ক হয় যে হিটলারের হাতে আটম বোমা থাকলে কি হতে পারতো! এই এগারোজন দুঃসাহসী, অসীমসহিষ্ণু নরওয়েবাসীদের কাছে পৃথিবী চিরঋণী থাকবে।

---

*তোমরা জানো যে হাইড্রোজেন গ্যাসের অণুতে থাকে একটা প্রোটন আর একটা ইলেকট্রন, ডিউটেরিয়াম হচ্ছে হাইড্রোজেনেরই এক আইসোটোপ। এর অণুতে থাকে দুটো প্রোটন আর একটা ইলেকট্রন, স্বভাবতই এটা হাইড্রোজেনের থেকে কিছুটা ভারী। দুটো ডিউটেরিয়াম অণু আর একটা অক্সিজেন অণু মিলে তৈরি হয় $D_2O$ ডিউটেরিয়াম অক্সাইড বা ভারী জল। সাধারণ জলের মাত্র 0.0145% হচ্ছে ভারী জল। এটা আলাদা করতে গেলে আগে ডিসটিলেশন, পরে ইলেকট্রোলিসিস পদ্ধতির সাহায্য নিতে হয়। আর ভারী জল সাধারণ জলের থেকে অতি সামান্য ভারী হয়।

ছবি: রজতবরণ চক্রবর্তী

# মিঠির চিঠি

## রূপক চট্টরাজ

"জানো বাবাই, এবার পুজোয়
থাকব যে কলকাতায়
ঘুরব না আর দেশ-বিদেশে
বনে ও ফুল পাতায়।
পাড়ায় পাড়ায় ছুট লাগাব
বাজলে ঢাকের কাঠি
খুশির হাওয়ায় ভাসব তখন
সাজব পরিপাটি।
রঙের সাথে রঙ মিলিয়ে
নানান রকম ফিতে
ছোট্ট বেণী দুলিয়ে যাব
ফুল-আরতি দিতে।
চড়ব রকেট, মেট্রো, মনো,
চড়ব নাগরদোলা
সামনে জানি ভিড় জমাবে
আলুকাবলিওলা।
পার্ক সার্কাস, কলেজ স্কোয়ার
সিমলা, যাদবপুর
ঠাকুর দেখে কাটবে ফি-রাত,
মনে রঙের সুর।
পুজোর শহর, আলোর শহর
আসছে পায়ে পায়ে–"
ছোট্ট মিঠি লিখল চিঠি
নীল আকাশের গায়ে॥

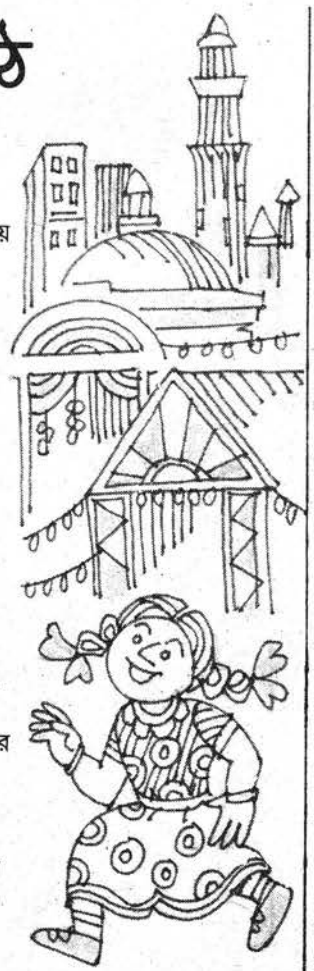

# ডাং খেলব

ধূর্জটি চন্দ

নিতাইকুমার চক্কোত্তি
ঝনঝনাচ্ছে পকেট ভর্তি
ওগুলো কি?

–ও কিছু না, এখন ছাড়
যাচ্ছি কিনতে গংগাদা'র
ছিপ-বঁড়শি।

ধরলাম কই ছাড়ব যে
যাবি না হয় মাছ ধরতে
দেমাক্ কেন?

মনে রাখিস শিবতলায়
আমি, ফুচু দুই জনায়
ডাং খেলব।

–খেলবি তো যা, আমার কি
নিতাইকুমার চক্কোত্তি
ভয় পায় না,
গংগাদার এক গুঁফোমামা
বিলেত থেকে আনলো জামা
গায়ে হয় না

তুই ভাবছিস তোকে দেবে
গংগাদাকে চেনে না যে
কি বলব–
তার চেয়ে বরং আয়
তিনজনাতে শিবতলায়
ডাং খেলব।

ছবি: সুফি

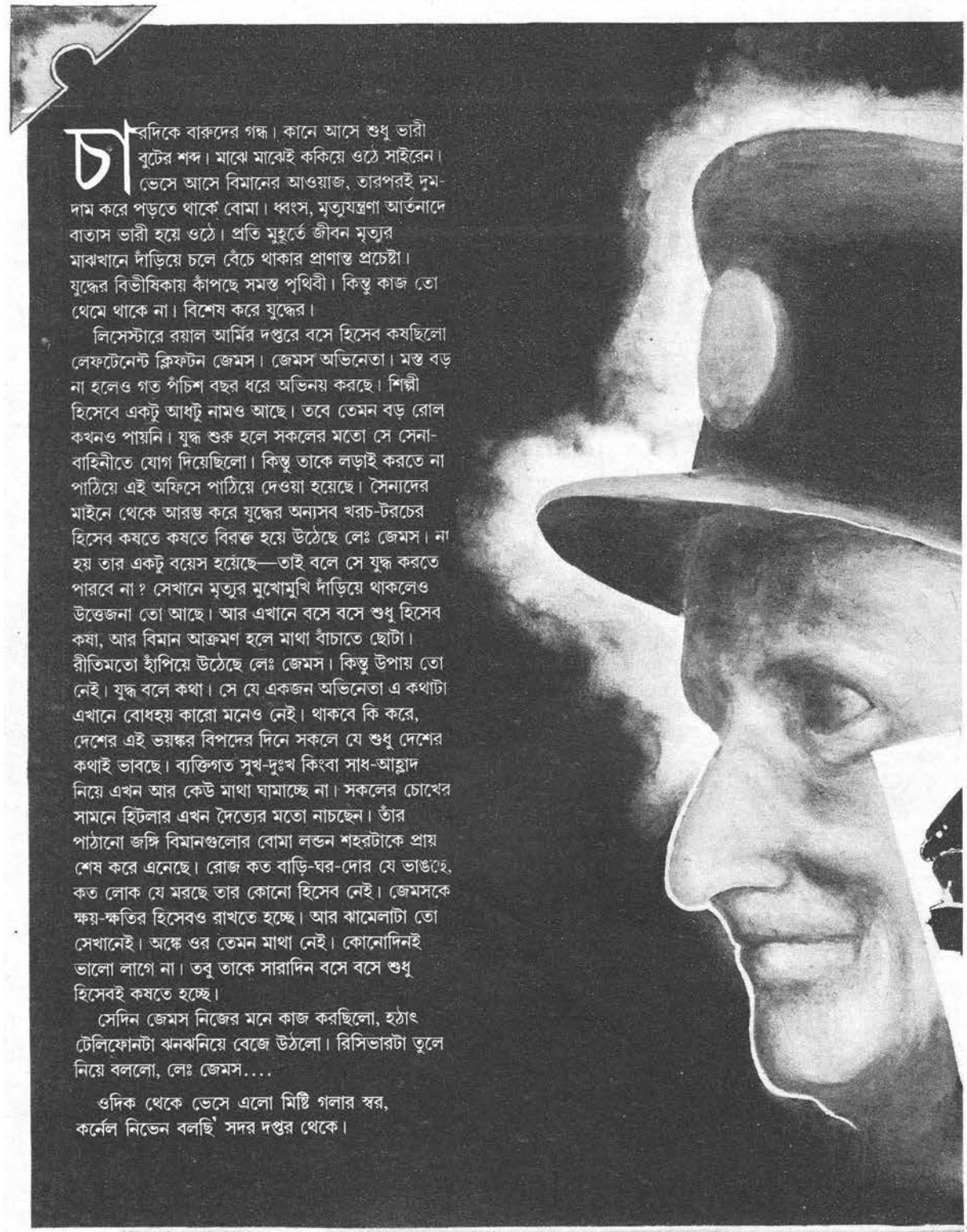

চারদিকে বারুদের গন্ধ। কানে আসে শুধু ভারী বুটের শব্দ। মাঝে মাঝেই ককিয়ে ওঠে সাইরেন। ভেসে আসে বিমানের আওয়াজ, তারপরই দুম-দাম করে পড়তে থাকে বোমা। ধ্বংস, মৃত্যুযন্ত্রণা আর্তনাদে বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। প্রতি মুহূর্তে জীবন মৃত্যুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে চলে বেঁচে থাকার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা। যুদ্ধের বিভীষিকায় কাঁপছে সমস্ত পৃথিবী। কিন্তু কাজ তো থেমে থাকে না। বিশেষ করে যুদ্ধের।

লিসেস্টারে রয়াল আর্মির দপ্তরে বসে হিসেব কষছিলো লেফটেনেন্ট ক্লিফটন জেমস। জেমস অভিনেতা। মস্ত বড় না হলেও গত পঁচিশ বছর ধরে অভিনয় করছে। শিল্পী হিসেবে একটু আধটু নামও আছে। তবে তেমন বড় রোল কখনও পায়নি। যুদ্ধ শুরু হলে সকলের মতো সে সেনা-বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলো। কিন্তু তাকে লড়াই করতে না পাঠিয়ে এই অফিসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সৈন্যদের মাইনে থেকে আরম্ভ করে যুদ্ধের অন্যসব খরচ-টরচের হিসেব কষতে কষতে বিরক্ত হয়ে উঠেছে লেঃ জেমস। না হয় তার একটু বয়েস হয়েছে—তাই বলে সে যুদ্ধ করতে পারবে না? সেখানে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকলেও উত্তেজনা তো আছে। আর এখানে বসে বসে শুধু হিসেব কষা, আর বিমান আক্রমণ হলে মাথা বাঁচাতে ছোটা। রীতিমতো হাঁপিয়ে উঠেছে লেঃ জেমস। কিন্তু উপায় তো নেই। যুদ্ধ বলে কথা। সে যে একজন অভিনেতা এ কথাটা এখানে বোধহয় কারো মনেও নেই। থাকবে কি করে, দেশের এই ভয়ঙ্কর বিপদের দিনে সকলে যে শুধু দেশের কথাই ভাবছে। ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ কিংবা সাধ-আহ্লাদ নিয়ে এখন আর কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না। সকলের চোখের সামনে হিটলার এখন দৈত্যের মতো নাচছেন। তাঁর পাঠানো জঙ্গি বিমানগুলোর বোমা লন্ডন শহরটাকে প্রায় শেষ করে এনেছে। রোজ কত বাড়ি-ঘর-দোর যে ভাঙছে, কত লোক যে মরছে তার কোনো হিসেব নেই। জেমসকে ক্ষয়-ক্ষতির হিসেবও রাখতে হচ্ছে। আর ঝামেলাটা তো সেখানেই। অঙ্কে ওর তেমন মাথা নেই। কোনোদিনই ভালো লাগে না। তবু তাকে সারাদিন বসে বসে শুধু হিসেবই কষতে হচ্ছে।

সেদিন জেমস নিজের মনে কাজ করছিলো, হঠাৎ টেলিফোনটা ঝনঝনিয়ে বেজে উঠলো। রিসিভারটা তুলে নিয়ে বললো, লেঃ জেমস....

ওদিক থেকে ভেসে এলো মিষ্টি গলার স্বর, কর্নেল নিভেন বলছি সদর দপ্তর থেকে।

# ছদ্মবেশী

## শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

জেমসের বুঝতে অসুবিধে হলো না, সিনেমার ডাকসাইটে স্টার ডেভিড নিভেন কথা বলছেন। ওঁর গলা এত পরিচিত যে কারোরই চিনতে ভুল হয় না। ডেভিড নিভেনও জেমসের মতো যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন। জেমস উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলো কর্নেল নিভেন কি বলেন শোনার জন্যে।

তোমার জন্যে একটা ভালো খবর আছে জেমস। তুমি কি কয়েকটা আর্মি ফিল্মে অভিনয় কবতে চাও ?

নিশ্চয়ই চাই স্যার.....

গুড.....তাহলে তোমাকে একবার লন্ডনে আসতে হবে।

আমি যাবো স্যার।

ঠিক আছে, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

রিসিভারটা নামিয়ে রেখে জেমসের মনে হলো সে বোধহয় স্বপ্ন দেখছে। হিসেব কষতে কষতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলো। এতদিনে বোধহয় নিজের মনের মতো কাজ পাবে সে। খুশি হয়ে উঠলো লেঃ জেমস।

লন্ডনে যাবার চিঠিও এসে গেলো। আনন্দে নাচতে নাচতে জেমস

এসে হাজির হলো কার্জন স্ট্রিটের অফিসে। একমুখ হাসি নিয়ে ডেভিড নিভেন অভ্যর্থনা জানালেন জেমসকে। ডেভিড নিভেন মস্ত বড় অভিনেতা। জেমস ভীষণ পছন্দ করে ওঁর অভিনয়। কয়েকটা বইয়ে একসঙ্গে কাজও করেছে। ডেভিডকে দেখে জেমসের খুব ভালো লাগছিলো। মনে হচ্ছিলো, সে যেন নিজের জগতে ফিরে এসেছে। ফৌজি পোশাকে হলেও ওর সামনে বসে আছেন ডেভিড নিভেন।

জেমস....

ডেভিড নিভেনের গলা শুনে চমকে উঠলো জেমস। জেমসের জিজ্ঞাসুদৃষ্টির ওপর চোখ রেখে কর্নেল নিভেন বললেন, জেমস আমি তোমায় যে কথাটা বলতে যাচ্ছি তা শুনে তুমি যেন ঘাবড়িয়ে যেও না। আমি দুঃখিত তোমায় এইভাবে ডেকে আনতে হলো বলে। কোনো আর্মি ফিল্মে তুমি অভিনয় করছো না। তোমাকে বাছা হয়েছে জেনারেল মন্টগোমারির ডবল হিসেবে।

উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো জেমস, এ কী বলছেন স্যার?

হ্যাঁ জেমস। অভিনয় তোমায় করতে হবে ঠিকই—তবে জেনারেল মন্টির ভূমিকায়। ক্যামেরার সামনে নয় এই যা।

চেয়ারের ওপর ধপ করে বসে পড়লো লেঃ জেমস। নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। তাকে হতে হবে মন্টির ডবল! জেমস জানতোই,তাকে অনেকটা জেনারেল মন্টগোমারির মতো দেখতে। এই নিয়ে বন্ধু-বান্ধব মহলে কম ঠাট্টা-ইয়ার্কিও চলে না। একবার তো একটা খবরের কাগজে তার একটা ছবি ছাপা হয়েছিলো। তলায় ক্যাপসান ছিলো — উঁহু, আপনি ভুল করছেন। এঁর নাম লেঃ ক্লিফটন জেমস। তার মানে ছবিটি দেখে সকলেই ভুল করবেন জেনারেল মন্টি বলে!

সে তো অন্য কথা। কিন্তু তাই বলে তার পক্ষে কখনো সত্যি সত্যিই জেনারেল মন্টি সাজা সম্ভব! হতাশ হয়ে ধপ করে চেয়ারের ওপর বসে পড়লো জেমস। তবে সে ভালোভাবেই জানে, এখানে তার মতামতের কোনো মূল্য নেই। ডেভিড নিভেনের কথাই ফৌজি নির্দেশ। ভয়ঙ্কর একটা ভয়ের ভাব জেগে ওঠে জেমসের মনে। শরীরের মধ্যে শিরশির করে বইতে শুরু করে ঠাণ্ডা রক্তের স্রোত। হৃদপিণ্ডের গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়।

কর্নেল নিভেন ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছেন। জেমস, আমার সঙ্গে এসো।

নিভেনের পেছনে পেছনে জেমস এসে ঢুকলো কর্নেল লিস্টারের ঘরে।

লিস্টার, এই যে জেমস।

তারপর জেমসের দিকে ফিরে বললেন, তুমি এখানে থাকো। কর্নেল লিস্টার তোমায় সব বুঝিয়ে দেবেন।

ডেভিড নিভেন ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। জেমস লক্ষ্য করলো কর্নেল লিস্টার তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন। দেখতে দেখতে ওঁর মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

কর্নেল লিস্টার বললেন, জেমস, বুঝতে পারছো তোমার ওপর কত বড় দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে? আমরা হিটলারের ওপর যে শেষ আঘাত হানতে যাচ্ছি তার সাফল্য নির্ভর করছে তোমার ওপরে।

কিন্তু আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না।

জেমসের গলায় দুর্ভাবনার স্পষ্ট আভাস।

কর্নেল লিস্টার হাসলেন। বললেন, বসো, আমাদের পুরো পরিকল্পনাটা তোমায় বুঝিয়ে দিচ্ছি।

কর্নেল লিস্টার একটুখানি চুপ করে থাকলেন। তারপর বললেন, শোন 'ডি ডে' আসন্ন। আমরা বিরাট একটা বাহিনী নিয়ে ফ্রান্সে নামবো। তারপর লড়তে লড়তে পৌঁছে যাবো বার্লিনে। হিটলারের গুপ্তচরবাহিনীর কাছ থেকে পুরো ব্যাপারটা লুকিয়ে রাখা অসম্ভব। আমরা যে বড় একটা আঘাত হানতে চলেছি তা ওরা বুঝতে পারবে। তবে দিনক্ষণটা ওরা ধরতে পারবে না। ওরা অবশ্য এ সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেবে না যে আমরা অন্য যে কোনো একটা জায়গা দিয়ে আঘাত হানতে পারি। কিন্তু ওদের চররা হন্যে হয়ে ঘুরছে। তাই অনেক ভেবেচিন্তে আমরা এই পরিকল্পনাটা নিয়েছি। জেনারেল ইসেনহাওয়ারও অনুমোদন করেছেন।

একটু থেমে কর্নেল লিস্টার আবার শুরু করলেন, আমাদের আক্রমণের কম্যান্ডার মন্টি-ই হবেন। কিন্তু আমরা প্রচার করবো জেনারেল মন্টগোমারি তাঁর অফিস ছেড়ে পৃথিবীর ক'য়েকটি দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তোমাকে সেই কাজটাই করতে হবে। তোমাকে মন্টি সেজে কয়েকটি দেশে যেতে হবে। তার মানেই তোমাকে মন্টির ভূমিকায় অভিনয় করতে হবে। কিন্তু সাবধান, ঘুণাক্ষরেও কেউ যেন এর বিন্দু-বিসর্গও না জানতে পারে। এখন বলো, তোমার আর কিছু জানার আছে?

জেমস মাথা নাড়লো। ওর মনের মধ্যে তখন হাজার প্রশ্ন। সেই সঙ্গে ভয়, ভাবনা, আশঙ্কা। কিন্তু ভাবনার সময় জেমস পেলে না। কর্নেল লিস্টার তাঁর দু'জন সঙ্গী মিলে জেমসকে জেনারেল মন্টিগোমারি বানাবার কাজ শুরু করে দিলেন। মন্টির নিউজরিল, মন্টির ছবি দেখিয়ে জেমসকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো জেনারেলের হাঁটা-চলা, হাসি, অভিনন্দন গ্রহণ করার খুঁটিনাটি সব কিছু। দিনের পর দিন ধরে জেমসকে ড্রিল করানো হলো। মন্টি যা করেন তাই করানো হলো। সবই গোপনে এবং নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার মধ্যে। জেমসের ধারে কাছে পৌঁছুবার কোনো উপায় কারও ছিলো না। একদিন ট্রেনিংয়ের শেষে কর্নেল লিস্টার বললেন, জেমস, পুরো ব্যাপারটা তুমি খেলা হিসেবে নাও। খেলাটা হচ্ছে আমাদের শত্রুর সুবিধের জন্যে। সব সময় মনে রেখো আমাদের প্রতিপক্ষ কিন্তু মোটেই সাধারণ নয়। জার্মান হাইকমান্ডকে, হিটলারের গুপ্তচরবাহিনীকে বোকা বানাতে হবে।

প্রাথমিক প্রস্তুতির পর জেমসকে পাঠিয়ে দেওয়া হলো জেনারেল মন্টগোমারির ব্যক্তিগত রক্ষীদের মধ্যে। যাতে কোনোরকম সন্দেহ না দেখা দেয়, তাই জেমসকে ইন্টেলিজেন্স কোরের সার্জেন্ট হিসেবে ওখানে কাজ দেওয়া হলো। জেনারেলকে যাতে খুব কাছ থেকে দেখে জেমস নিজেকে তৈরি করে নিতে পারে সেইজন্যেই এই পোস্টিং।

এই ডিউটির প্রথমদিন ভোরবেলায় জেমসকে দেখা গেলো জেনারেল মন্টির রোলসরয়েসের ঠিক পেছনে একটি জিপে। তার পরনে আই সি সার্জেন্টের পোশাক। জিপের পেছনে পর পর আরও অনেকগুলো গাড়ি। প্রত্যেকটা গাড়ির মধ্যে তফাৎ মাত্র পাঁচ গজ করে। গাড়িগুলো এগিয়ে চলেছে দ্রুত গতিতে। ভোর গড়িয়ে সকাল, কিন্তু চলার বিরাম নেই। সন্ধ্যের মুখে জেনারেলের গাড়ি এসে থামলো পোর্টস মাউথে। গাড়িগুলো পাক্কা পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে রইলো। চারদিকটা তখন টেনশানে টানটান। তারপর এক এক করে মন্টির ব্যক্তিগত সহচররা গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে এলেন। তাঁরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কনভয়ের প্রত্যেকটা গাড়ি আর আরোহীদের দেখলেন। তারপরই মন্টিকে দেখা গেলো গাড়ি থেকে নেমে আসতে। মন্টির মাথায় সেই বিখ্যত ব্ল্যাক বেরেট টুপি, গায় চামড়ার জ্যাকেট। জেমস খুব কাছ থেকে জেনারেলের প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গি লক্ষ্য করছিলো। মন্টির স্যালুট একটু অন্য রকম। হাতটা দুবার নেড়ে কপালে ঠেকান। অনেকটা অভিনন্দন জানাবার ভঙ্গিতে।

একটু পরেই গাড়িগুলো আবার চলতে শুরু করলো। মন্টির রোলস-

রয়েসের ঠিক পাঁচ গজ পেছনে ছুটছে জেমসের জিপ। জেমস গাড়ির মধ্যে বসা জেনারেলের প্রত্যেকটি অঙ্গভঙ্গি লক্ষ্য করছে। শহর ছেড়ে গাড়িগুলো ততক্ষণে গ্রামের পথ ধরেছে। সকালবেলায় যে দু চারজন লোক পথের ধারে ছিলো তারা মুহূর্তের মধ্যে মন্টিকে চিনে ফেললো। খুশি হয়ে তারা হাত নেড়ে জেনারেল মন্টগোমারিকে অভিনন্দন জানাতে লাগলো। মন্টিও হাত নেড়ে, হেসে স্যালুট করতে লাগলেন। মন্টি কাউকে বাদ দিলেন না। প্রত্যেকের অভিনন্দনের উত্তর দিলেন। একজন বৃদ্ধ শ্রমিক মন্টির হাসি আর স্যালুট পেয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো। তার মনের ভাব বুঝতে জেমসের একটুও অসুবিধে হলো না। বৃদ্ধ মানুষটি নির্ঘাৎ ভাবছিলো, এই মানুষটিই আমাদের জয় এনে দেবে। বৃটেনের প্রত্যেকটি মানুষ বিশ্বাস করতো, পরবর্তী আক্রমণে মন্টি বৃটেনকে নির্ঘাৎ জয় এনে দেবেন। তাই মন্টিকে দেখলেই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা খুশি হয়ে পাগলের মতো হাত নাড়তো। বৃদ্ধ জেনারেলও তাঁর মাথা থেকে টুপিটা খুলে জনতার দিকে ধীরে ধীরে নাড়াতেন।

সমুদ্রের ধারে পৌঁছে জেমস অবাক হয়ে গেলো। বুঝতে পারলো, কত বড় একটা আক্রমণের প্রস্তুতি চলছে। যত দূর চোখ যায় সার সার যুদ্ধজাহাজ আক্রমণের জন্যে তৈরি হয়ে আছে। আকাশে চক্কর দিচ্ছে অগুন্তি যুদ্ধবিমান। অজস্র ট্যাঙ্ক, আমারডকার, গোলা-বারুদ জাহাজে তোলা হচ্ছে। সমুদ্রের ধার থিক থিক করছে হাজার হাজার সৈন্যে। ওঁরাই 'ডি ডে'র বিশাল আক্রমণে হিটলারের বাহিনীকে হারাবার জন্যে লড়বেন।

সমুদ্রের ধারের একটা হোটেলের ওপর থেকে মিত্রবাহিনীর সৈন্যাধ্যক্ষরা প্রস্তুতিপর্ব লক্ষ্য করছিলেন। মন্টি উঠে গেলেন হোটেলের ছাদে। সেখান থেকে সব কিছু খুঁটিয়ে দেখে কম্যান্ডারদের সঙ্গে খানিকক্ষণ আলোচনা করে নিচে নেমে এলেন মন্টি। তাঁর পেছনে রীতিমতো একটা প্রসেসান। মন্টিকে খুব কাছ থেকে দেখার জন্যে, তাঁর অঙ্গ-ভঙ্গি, মুদ্রাদোষ ইত্যাদি লক্ষ্য করার জন্যে জেমস চললো তাঁর ঠিক পেছনে পেছনে। মন্টি চলে গেলেন সাধারণ সৈন্যদের কাছে। সেখানে কারো সঙ্গে কথা বললেন, কারো পিঠ চাপড়ে দিলেন, কাউকে উপদেশ দিলেন। সেই সঙ্গে অফিসারদের দিতে লাগলেন টুকটাক নির্দেশ।

জেমস লক্ষ্য করলো, মন্টির ব্যক্তিত্বই আলাদা। তিনি আসার সঙ্গে সঙ্গেই সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। কথা না বললেও তাঁর আশেপাশে যাঁরা থাকেন তাঁরা ম্লান হয়ে যান সেই রাশভারি মানুষটির কাছে। জেমসের মনে হলো, মন্টি যদি অভিনয় করতেন তাহলে সহজেই তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নায়ক হয়ে যেতেন। তাঁর ধারে কাছে কেউ পৌঁছুতে পারতো না।

স্থলবাহিনীর কিছু সৈন্যকে জাহাজে করে অন্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আনা হয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ পুরো সুস্থ নয়। সি-সিকনেসে ভুগছে। তারা আপ্রাণ চেষ্টা করছিলো অসুস্থভাব লুকোতে। মন্টি যে অসুস্থতা একেবারেই পছন্দ করেন না তা সকলেরই জানা। একটি তরুণ আপ্রাণ চেষ্টা করছিলো নিজেকে সুস্থ রাখতে। রাইফেলটা তার কাছে কয়েক টন ওজনের বলে মনে হচ্ছিলো। মন্টিকে স্যালুট করে ওদের প্লাটুনটা চলে যাবার মুহূর্তে ছেলেটা দুম করে পড়ে গেলো। কোনোরকমে উঠে দাঁড়িয়ে সে হাঁটতে শুরু করলো উল্টো দিকে। মন্টি চট করে তার কাছে চলে গিয়ে তাকে ঠিক দিকে ঘুরিয়ে পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, এদিকে, এদিকে—ওদিকে নয়। তুমি খুব ভালো প্যারেড করছো। খুবই ভালো করছো। কিন্তু সব সময় তোমার সামনে যে আছে তার দিকে খেয়াল রাখবে। তাকে ফলো করবে।

**একদম ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।**

ছেলেটার কাঁধে হাত রেখে মন্টি বন্ধুর মতো কথা বলছিলেন। আর আনন্দে, আত্মবিশ্বাসে উজ্জ্বল হয়ে উঠছিলো তার অসুস্থ ম্লান মুখটা। মুহূর্তের মধ্যে কোথায় যে হারিয়ে গেলো তার অসুস্থ ভাব। একজন সুস্থ সৈনিকের মতো সে ঠিক পথে মার্চ করে চলে গেলো। জেমস বুঝলো, এইভাবেই মন্টি সকলকে অনুপ্রাণিত করেন। সেইজন্যেই সকলে তাঁকে অত ভালোবাসে।

পরের ক'দিন জেমস আরও ভালোভাবে এবং কাছ থেকে মন্টিকে লক্ষ্য করলো। মন্টি সিগারেট খান না, কোনো পানীয় তো নয়ই। তাঁর শারীরিক ক্ষমতা চমকে দেবার মতো। ব্রেকফাস্টে পরিজের সঙ্গে দুধ খান না। খেতে বসে পাখি, জন্তু-জানোয়ার আর ফুল নিয়ে কথা বলতে ভালোবাসেন। অফিসারদের পেছনে লাগেন, তাঁরা পরিবেশ আর প্রকৃতি নিয়ে বিশেষ কিছু জানেন না বলে। কিন্তু ভুলেও কখনো যুদ্ধ-টুদ্ধ নিয়ে কথা বললেন না।

জেমস মন্টিকে লক্ষ্য করতো আর অবসর সময়ে তার অনুশীলন করতো। মন্টির মতো দু'হাত পেছনে মুঠো করে হাঁটতো। মন্টির মতো থুতনি হাতের ওপর রেখে গভীরভাবে কিছু চিন্তা করতো। অনুশীলন করতো তাঁর কথা-বলার ধরন। ধীরে ধীরে জেমস আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠলো। ও পারবে—মন্টি-র ভূমিকায় ও ভালোভাবেই উতরে যাবে। শুধু একটা বিষয়েই জেমস সন্দীহান। ও বোধহয় কিছুতেই জেনারেল মন্টগোমরির প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব আয়ত্ত করতে পারবে না। তবে জেমস আত্মবিশ্বাসী। ও অভিনেতা। সুতরাং মন্টির ভূমিকায় ওর সুষ্ঠুভাবে অভিনয় না করতে পারার কারণ নেই। জেমস কর্নেল লিস্টারকে ফোন করলো, আমি তৈরি স্যার।

ঠিক আছে। তুমি তাহলে কালই চলে এসো। জেনারেলের সঙ্গে তোমার একটা ইন্টারভিউয়ের ব্যবস্থা করে রাখছি। একেবারে গোপন সাক্ষাৎকার কিন্তু।

কাল জেনারেলের সঙ্গে ইন্টারভিউ! কথাটা মনে হতেই জেমসের পেটের মধ্যে প্রজাপতিরা ফরফর করতে শুরু করে!

**একটা কথা মনে রেখো,....তুমি আর তুমি নও....**

পরদিন জেমস যখন জেনারেলের ঘরে ঢুকলো তখন উনি কিছু লিখছিলেন। জেমসকে দেখে হেসে উঠে দাঁড়ালেন। জেমস অবাক হয়ে তাকিয়েছিলো। ওর মনে হলো, আয়নায় ও বুঝি নিজেকেই দেখছে। নিজেকে সামলে নিয়ে জেমস জেনারেলের ভ্রূর দিকে তাকালো। বুঝলো ওর নকল ভ্রূ লাগাবার দরকার নেই। বয়সে মন্টি জেমসের থেকে অনেকটাই বড়। কিন্তু দু'জনের চেহারার মিল সত্যিই চমকে ওঠার মতো।

চেয়ার থেকে উঠে জেনারেল জেমসের কাছে চলে এলেন। গল্প শুরু করে দিলেন। জানা গেলো দু'জনেরই জন্ম অস্ট্রেলিয়ায় এবং কাছাকাছি। জেমস জেনারেলের শব্দ চয়ন আর কথা বলার ঢংটা লক্ষ্য করলো। কাটা কাটা কথা বলেন মন্টি।

মন্টি জেমসের কাঁধে, হাত রেখে বললেন, তোমায় যে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে তা কতটা গুরুত্বপূর্ণ নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো? তোমার কোনো অস্বস্তি হচ্ছে না তো? আত্মবিশ্বাসী তো তুমি?

জেমসের ইতস্ততঃ ভাব দেখে মন্টি বলে উঠলেন, একদম ভেবো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।

মন্টির ব্যক্তিত্ব আর আন্তরিকতার ছোঁয়ায় জেমসের মনের মধ্যে যে ভয় আর আশঙ্কার ভাবটা জেগে উঠেছিলো তা নিমেষের মধ্যে মিলিয়ে গেলো। আত্মবিশ্বাসে টানটান হয়ে উঠলো জেমস। সে আর লেঃ জেমস নয়— সে এখন জেনারেল মন্টগোমারি।

কেটে গেলো এর পরও কয়েকটা দিন। জেমস সকলের চোখের আড়ালে নিজেকে তৈরি করে নিতে লাগলো। অপেক্ষা করতে লাগলো সেই নির্ধারিত সময়ের। দেখতে দেখতে এসেও গেলো সেই দিনটা।

সেদিন দুপুরে কর্নেল লিস্টার এসে হাজির হলেন। বললেন, এবার সময় হয়েছে 'তোমার আত্মপ্রকাশ করার। কাল সন্ধ্যে সাড়ে ছটা থেকে তুমি জেনারেল মন্টগোমারি হয়ে যাচ্ছো। তোমায় সোজা সকলের চোখের সামনে দিয়ে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাওয়া হবে। এমনভাবে নিয়ে যাওয়া হবে যাতে সকলেই জেনারেলের যাওয়াটা দেখতে পায়। সেখানে প্রধানমন্ত্রীর প্লেন তোমার জন্যে রেডি থাকবে। পরদিন সকাল সাতটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে তুমি জিব্রালটারে নামবে।

জেমস চুপ করেছিলো। ওর সারা শরীরটা শিরশির করছে। একটা ভয়ভয় ভাব ওকে গ্রাস করতে চাইছে। জেমস বুঝলো ও নার্ভাস হয়ে পড়ছে। তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নিতে চেষ্টা করলো। কর্নেল লিস্টার তখন বলছেন, আমরা আফ্রিকার চারিদিকে গুজব ছড়িয়ে দিয়েছি যে জেনারেল ওখানে আসতে পারেন। অ্যাঙ্গলো-আমেরিকান আর্মি নিয়ে তিনি দক্ষিণ ফ্রান্সে আক্রমণ চালাতে পারেন। এই গুজবকে যাতে সকলে সত্যি ভাবেন তাই তুমি মধ্য-প্রাচ্য দিয়ে যাবে। সেইরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে। মনে রেখো, তোমার প্রত্যেকটি মুহূর্তের ওপর হিটলারের গুপ্তচরবাহিনী লক্ষ্য রাখবে।

আমরা তোমায় বলে দিতে পারি কি করতে হবে না হবে—কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সবকিছু সব সময় ঠিক ঠাক হয় না। তখন অবস্থা বুঝে তোমাকেই ব্যবস্থা নিতে হবে। একটা কথা মনে রেখো, এখন থেকে সিনিয়ার অফিসাররা সবাই তোমার আজ্ঞাবাহক। তুমিও বস। তুমিই জেনারেল মন্টগোমারি। জনগণ যদি অভিনন্দন জানায় তাহ'লে জানবে তা শুধু তোমাকেই জানাচ্ছে। তাদের প্রত্যুত্তর দেবে তুমি। তুমি আর তুমি নও কিন্তু। তুমি হচ্ছো জেনারেল মন্টগোমারি। আমাদের সর্বাধিনায়ক। এই কথাটা মুহূর্তের জন্যেও ভুলবে না। লেঃ জেমস বলে যে একজন ছিলো সেই কথাটা আর মনে রাখবে না।

কর্নেল চলে গেলেন। জেমস মন দিয়ে শুনেছেন তাঁর প্রতিটি কথা। কিন্তু কর্নেল চলে যেতেই আবার সেই ভয়-ভয় ভাব তার বুকের ওপর চেপে বসলো। আশঙ্কায় ভারী হয়ে উঠলো নিঃশ্বাস। আতঙ্কে সে যেন নীল হয়ে গেলো। কর্নেল না বললেও সে স্পষ্টই বুঝতে পেরেছে, হিটলারের বাহিনী তার প্রাণনাশের চেষ্টা করবেই।

চব্বিশটা ঘণ্টা যে কোথা দিয়ে কেটে গেলো জেমস তা বুঝতেও পারলো না। পরের দিন জেনারেলের পোশাক পরে যখন আয়নার সামনে দাঁড়ালো তখন ও যেন নিজেকেই আর চিনতে পারছে না। মাথায় মন্টির বিখ্যাত কালো টুপি পরে, আর্মার্ড কোরের ব্যাজ লাগিয়ে জেমস যখন সামনে এসে দাঁড়ালো কর্নেল লিস্টার তখন চমকে গিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। তারপরই তাঁর মুখে খেলে গেল এক চিলতে হাসি। বললেন, দারুণ!

তারপর এক গোছা খাঁকি রুমাল যাতে জেনারেলের নামের আদ্যাক্ষর বি এল এম লেখা জেমসের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, এগুলো জেনারেলের রুমাল। তোমার যেখানে প্রয়োজন মনে হবে সেখানেই ইচ্ছে করে ভুলে একটা করে রুমাল ফেলে যাবে। এতে হিটলারের গুপ্তচররা আরও বেশি নিশ্চিত হবে। তাদের খবর যে ভুল নয় তার প্রমাণ হিসেবে হয়তো তারা ঐ রুমালটাকেই হিটলারের সদর দপ্তরে পাঠিয়ে দেবে।

হ্যান্ডসেক করে, শুভেচ্ছা জানিয়ে কর্নেল ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে জেমসের দু'পাশে এসে দাঁড়ালেন জেনারেলের দুই এ ডি সি ব্রিগেডিয়ার হেউড আর ক্যাপ্টেন মুর। ঠিক মন্টির মতো করে টুপিটা পরে জেমস ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। তার পেছনে দুই এ ডি সি।

নিচে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে ছিলো সেনাবাহিনীর তিনটি গাড়ি। জেনারেলের গাড়ি চিনতে কারো ভুল হয় না। ফ্ল্যাগ লাগানো ছিলো

গাড়িটায়। একদল কৌতূহলী মানুষ গাড়িটার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন। মন্টিকে দেখেই তাঁদের মধ্যে দেখা গেলো চাপা উচ্ছ্বাস। তাঁরা চিৎকার করে উঠলেন, গুড মর্নিং মন্টি!

জেনারেলের মুখে সেই পরিচিত হাসি। সেই পরিচিত স্যালুট।

জেনারেলকে নিয়ে সদর দপ্তর থেকে গাড়ি তিনটি ছুটলো বিমানবন্দরের দিকে। রাস্তার ধারে যাঁরা দাঁড়িয়েছিলেন মন্টিকে চিনতে তাঁদের বিন্দুমাত্রও অসুবিধে হয়নি। তাঁরা হাত নাড়িয়ে, চিৎকার করে জেনারেলকে শুভেচ্ছা জানাতে লাগলেন। জেনারেলের মুখে তখন লেগে আছে সেই পরিচিত হাসি। বিমানবন্দরে আসার আগেই চোয়াল ব্যথা হয়ে গেলো জেনারেল মন্টগোমারিরূপী জেমসের।

বিমানবন্দরে জেনারেলকে বিদায় জানাবার জন্যে সিনিয়ার অফিসাররা সার বেঁধে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন মন্টিকে ঘনিষ্ঠভাবে চেনেন। জেমসের বুকের মধ্যেটা আবার ধর্ক্ করে উঠলো। এও এক বড় পরীক্ষা।

মন্টিকে যেভাবে গাড়ি থেকে নামতে দেখেছে ঠিক সেইভাবেই নেমে এলো জেমস। মুখে তার সেই বিখ্যাত হাসি। তার পিছনে ব্রিগেডিয়ার হেউড।

জেনারেল এক এক সিনিয়ার অফিসারদের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছেন। তাঁরা শক্ত হয়ে অ্যাটেনশানে দাঁড়িয়ে। অফিসারদের স্যালুট নিয়ে জেনারেল এগিয়ে গেলেন প্লেনের কর্মীদের দিকে। তাঁরা এক পাশে সার দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। পাইলটকে গিয়ে জেনারেল জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছো স্লি? কি মনে হচ্ছে, আমাদের যাত্রাটা ভালোভাবেই কাটবে তো?

বিমানের কর্মীদের সঙ্গে দু চারটে কথা বলে জেনারেল সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে নিচে সার দিয়ে দাঁড়ানো সকলকে স্যালুট করে প্লেনের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

জেমসের মনে হলো, তার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। প্রথম পরীক্ষাটা জেমস ভালোভাবেই উৎরে গেলো।

প্লেনটা গর্জন করে উঠে সবে ট্যাক্সিং শুরু করেছে, নিচে দাঁড়ানো মন্টির ঘনিষ্ঠ একজন অফিসার আর একজনকে বললেন, বুড়োটিকে লক্ষ্য করেছো—কিরকম ফিট। তবে ওঁকে একটু ক্লান্ত দেখালো, তাই না?

পরদিন সকালে প্লেন এসে জিব্রালটারে নামলো। প্লেন থেকেই জেমসের চোখে পড়লো জিব্রালটারের সেই ফেমাস রকটা। জেমস আরও দেখলো, দুদল অফিসার সার দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। ওপাশে একদল দর্শক। তাদের মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু স্পেনের শ্রমিক। ব্রিগেডিয়ার হেউড বললেন, ঐ শ্রমিকদের মধ্যে বেশিরভাগই জার্মানির গুপ্তচর। সুতরাং....

প্লেনটা ততোক্ষণে দাঁড়িয়ে গেছে। জেমস নামার জন্যে রেডি হয়ে উঠে দাঁড়ালো। হেউড বললেন, প্লেনের দরজা খুললেই আপনি সামনে গিয়ে একটু দাঁড়াবেন। যতো বেশি সংখ্যায় লোক আপনাকে দেখে ততোই ভালো।

দরজা খুলে গেলো। জেনারেল এসে বাইরে দাঁড়ালেন একমুখ হাসি নিয়ে। একটুখানি দাঁড়িয়ে দিলেন সেই বিখ্যাত মন্টি-স্যালুট। তারপর গ্যাংওয়ে ধরে টকটক করে নিচে নেমে এলেন। স্বাগত অনুষ্ঠানের পর জেনারেলকে নিয়ে গাড়ি ছুটলো গভর্নরের প্রাসাদের দিকে। রাস্তার দু ধারের মানুষ লক্ষ্য করলেন, জেনারেল মন্টগোমারি চলেছেন। কেউ কেউ হাত নাড়লেন। প্রত্যুত্তরে পেলেন সেই বিখ্যাত স্যালুট আর হাসি।

জেমসের বুকের মধ্যে তখন হাতুড়ি পিটছে। জেনারেল স্যার রাল্ফ ইস্টউড তখন জিব্রালটারের গভর্নর। তিনি আবার মন্টির বন্ধু। ঘনিষ্ঠ বন্ধু। জেমস ভেবে পাচ্ছে না রাল্ফের কাছে নিজেকে লুকোবে কি করে। গাড়ি দ্রুত এগিয়ে চললো।

গভর্নর হাউসে বেশ ভিড়। জেনারেলকে দেওয়া গার্ড অফ্ অনার দেখছেন তাঁরা। গার্ড অফ অনারের পর দুই বন্ধু—জেনারেল মন্টগোমারি আর স্যার রাল্ফ এগিয়ে এলেন কাছাকাছি, স্যার রাল্ফ হাত বাড়িয়ে হাসিমুখে বললেন, হ্যালো মন্টি—কতদিন পরে আবার দেখা হলো। ভীষণ ভালো লাগছে।

জেমসকে বারবার করে বলে দেওয়া হয়েছিলো, স্যার রাল্ফকে মন্টি সব সময় ডাকনামে ডাকেন। জেমস হাসি মুখে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, কেমন আছো রুস্টি? তোমায় দারুণ ফিট দেখাচ্ছে।

জেমস এগিয়ে গিয়ে এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলেন স্যার রাল্ফকে। তারপর দু'জনে এগিয়ে চললেন গভর্নরের পড়ার ঘরের দিকে। করিডোর দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ঘরে ঢুকেই স্যার রাল্ফ দরজা বন্ধ করে দিলেন। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন জেমসের মুখের দিকে। আশঙ্কায় ঘামতে লাগলেন জেমস। তার হৃদপিণ্ডের গতি তখন দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। বুঝতে পারছেন না কি করবেন। হঠাৎ দেখলেন, গভর্নরের মুখে হাসি। তিনি জেমসের হাতটা নিজের হাতে তুলে নিয়ে বললেন, আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে তুমি মন্টি নও। আমার মনে হচ্ছিলো, পুরো পরিকল্পনাটা বদলে গেছে। আর মন্টি নিজেই এসেছে।

আপনি সব জানেন?

**আমার বিশ্বাসই হচ্ছে না যে তুমি মন্টি নও।**

জেমস স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

গভর্নর হাসছিলেন। বললেন, তোমার কি মনে হয় জেমস—আমি কি সব জানি?

দু'জনে এক সঙ্গে হেসে উঠলেন। জেমসের বুকের মধ্যে জমে ওঠা ভার অনেকটাই নেমে গেলো।

নিজের ঘরে বসে ব্রেকফাস্ট সেরে জেমস গিয়ে দাঁড়ালো জানলার কাছে। ইচ্ছে, আকাশে মেঘটেঘ করেছে কিনা দেখা। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আকাশের দিকে তাকাতে গিয়েই আতঙ্কের শিহরণ খেলে গেলো জেমসের শরীরে। গভর্নর হাউসের উল্টো দিকে একটা বাড়ির ছাদে কিছু শ্রমিক কাজ করছিলো। জেমস দেখতে পেলো দুটো লোককে। পরিষ্কার দেখলো, একটা রাইফেলের নল ওর দিকে তাক করা। জেমসের মনে হলো, ওর শরীরটা হিম হয়ে গেছে। ও নড়তে পারছে না। যে কোন মুহূর্তে গুলিটা ছুটে এসে ওর হৃদপিণ্ড ফুটো করে দেবে।

অল্প সময়ের মধ্যেই জেমস নিজেকে ফিরে পেলো। ভয়ের ভাবটা মন থেকে তাড়িয়ে ভালো করে তাকালো ছাদটার দিকে। দুজন লোক ছাদের ওপর কাজ করছে। তাদেরই একজন একটা টেলিস্কোপ দিয়ে জেমসকে আরো ভালো করে দেখার চেষ্টা করছে। জেমস জানলার সামনে থেকে নড়লো না। ওরা যাতে তাকে আরও ভালোভাবে দেখতে পায় সেইজন্যে সেখানে দাঁড়িয়ে রইলো। দেখতে লাগলো বাগান, গাছ-গাছালি, ফুল-পাখি, আকাশ।

একটু পরেই একজন অফিসার এসে জেমসকে স্যার রাল্ফের ঘরে নিয়ে গেলেন। স্যার রাল্ফ বললেন, ঠিক বারো মিনিট পরে তোমায় নিয়ে আমি বাড়ির পেছনের বাগানে বেড়াতে যাবো। ওখানে আমরা ঘুরবো। দুজন স্প্যানিস ব্যবসায়ী মরক্কোর কার্পেট বিক্রি করতে আসবে। ওরা আমাদের বন্ধু ভাবে, আসলে কি বুঝতে পারছো তো! তা ওরা ফেরার পথে বাগানে হঠাৎ তোমায় দেখে ফেলবে। ব্যাপারটা কেমন হবে বুঝলে?

জেমসের খুব মজা লাগলো। ওর বুঝতে বিন্দুমাত্রও অসুবিধে হলো না যে ঐ লোক দুটো জার্মানির গুপ্তচর। বন্ধুর বেশ ধরে গভর্নর হাউসে আসে খবর-টবর সংগ্রহ করতে। ওদের পরিচয় স্যার রাল্ফ ভালোভাবেই জানেন।

পরিষ্কার আকাশ। ঝলমলে রোদ বাগানের রং-বেরংয়ের ফুলের ওপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়েছে। মৃদুমন্দ বাতাস বইছে। ভেসে আসছে পাখির ডাক। দুই বন্ধু—গভর্নর স্যার রাল্ফ ইস্টউড আর জেনারেল মন্টগোমারি বাগানে ঘুরছিলেন গল্প করতে করতে। গল্পের বিষয় ছিলো হর্টিকালচার। বাঁ-দিকে ঘুরে একটু এগোতেই দেখা গেলো একদল

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে....
তাকাতে গিয়েই–

শ্রমিক একটা পাঁচিল সারানোর কাজ করছে। তাদেরই একজনের নজর জেনারেলের ওপর। একমনে দেখছে জেনারেলকে। জেমস চিনতে পারলো, একটু আগে এই লোকটাই টেলিস্কোপ দিয়ে তাকে দেখছিলো।

হঠাৎ লোহার গেট খুলে গেলো। দুজন লোককে এগিয়ে আসতে দেখা গেলো। দুজনেরই পরনে স্যুট। নিখুঁতভাবে দাড়ি গোঁফ কামানো। স্যার রাল্ফ আস্তে আস্তে বললেন, জেমস, নারভাস হয়ো না।

লোক দু'জনকে না দেখার ভান করে জেমস যুদ্ধ আর প্ল্যান ৩০৩ নিয়ে কথা বলতে লাগলো। লোক দুজন কাছাকাছি আসার পর গভর্নর আলতো করে জেনারেলের গায় হাত দিলেন। জেনারেল চমকে উঠে সামনে লোক দুজনকে দেখে কথা থামিয়ে দিলেন।

ব্যবসায়ী দুজন স্পেনের কায়দায় বাও করে গভর্নরকে অভিনন্দন জানালো। জেনারেলের সঙ্গে ওদের দু'জনের আলাপ করিয়ে দিলেন গভর্নর। দুজনেরই চোখে মুখে বিস্ময় আর শ্রদ্ধা। জেনারেল ওদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করলেও ঘনিষ্ঠতার আগ্রহ দেখালেন না। তাঁর স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে পেছনে হাত দিয়ে হেঁটে একটু দূরে সরে গেলেন। দূর থেকেই জেমস লক্ষ্য করলো একজন তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। দুজনে আগেই জেনারেলকে যুদ্ধ ও প্ল্যান ৩০৩ নিয়ে কথা বলতে শুনেছিলো। এবার শুনলো আবহাওয়া, ফুল আর গভর্নর হাউসের ইতিহাস নিয়ে কথা বলতে।

জেমসের মনে হলো ওরা তাকে ভালোভাবেই দেখে নিয়েছে। জেমস আর সময় নষ্ট করলো না, গভর্নরের দিকে তাকিয়ে বললো, তোমার কি মনে হয় রুস্টি, আবহাওয়া এইরকমই থাকবে। আমাকে আবার প্লেনে অনেকটা পথ যেতে হবে।

জেনারেল আর কথা বাড়ালেন না। অন্যদিকে চলে গেলেন। গভর্নরও ব্যবসায়ী দুজনকে নিয়ে ঘরে গেলেন। জেমস নিশ্চিন্ত, গুপ্তচর দুজন নিঃসন্দেহ হয়েছে। এখানে ওরা যা শুনলো তার সবটাই কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে যাবে হিটলারের সদর দপ্তরে। সেই সঙ্গে বদলে যাবে হাজার হাজার সৈন্যের ভাগ্য।

জেমস পরে শুনেছিলো, ঐ দুজনই ছিলো হিটলারের বিশ্বস্ত এবং চতুর গুপ্তচর। জেনারেলের খবরাখবর পাঠাবার জন্যে ওদের জিব্রালটারে পাঠানো হয়েছিলো। ওরা শুধু দুজনই ছিলোনা। আরও দুজন ছিলো ওদের দলে। একজনকে ওরা রেখেছিলো বিমানবন্দরে। অন্যজন শ্রমিকের বেশে প্রথমে সামনের বাড়ির ছাদ থেকে এবং পরে গভর্নরস হাউসের পাঁচিলে কাজ করার আছিলায় জেনারেলের ওপর নজর রেখেছিলো। চারজন গুপ্তচরই আলাদা আলাদাভাবে তাদের রিপোর্ট বার্লিনে পাঠিয়েছিল। এদের একজনের সঙ্গে জেমসের আবার পরে দেখা হয়েছিল। জেমস চিনতে পারলেও সে পারেনি।

গুপ্তচর দুজন গভর্নর হাউস ছাড়ার দুঘণ্টার মধ্যেই মাদ্রিদে হিটলারের প্রতিনিধি খবর পেয়ে গিয়েছিলেন যে জেনারেল মন্টগোমারি জিব্রালটারে পৌঁছে গেছেন। শীগগিরই আফ্রিকায় যাবেন। সেই সঙ্গে বার্লিনে জরুরী খবর গেলো, যেভাবেই হোক প্ল্যান ৩০৩ কি তা জানার চেষ্টা করো। তোমরা কি কোনো খবর পেয়েছো? এর পরই নাৎসীবাহিনী প্ল্যান ৩০৩ কি তা জানার জন্যে তার এজেন্টদের কাজে লাগার নির্দেশ দিয়েছিলো।

জেনারেলের বিদায় অভিনন্দনও একই রকম হলো। সেই গার্ড অব অনার। সেই স্যালুট। সেই হাসি। বিদায় অনুষ্ঠানের পর জেমস স্যার রাল্ফকে একরকম জড়িয়ে ধরে বিমানবন্দরের ক্যান্টিনে এসে ঢুকলো। জেমস জানতো নরওয়ের এক গেস্টাপো এজেন্ট ক্যান্টিন থেকে নজর রাখছে জেনারেলের ওপর। ক্যান্টিনে এসে দুজনে পায়চারি করতে

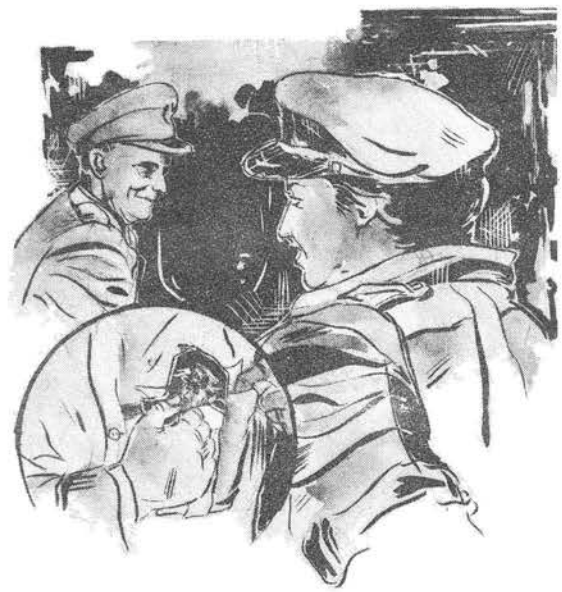

জেমস সই করা একটি ছবি ভদ্রমহিলার হাতে তুলে দিয়ে....

করতে কথা বলছিলেন। জেনারেল বললেন, জাহাজঘাটার নিরাপত্তার ব্যাপারটাও তো আছে। আমি প্রধানমন্ত্রীকে $C_4$ এর কথা বলেছি। আমি জাহাজগুলোকে এমনভাবে চাই যাতে গোলন্দাজবাহিনীর একটুও সময় নষ্ট না হয়। রুস্টি, আমার প্ল্যানটা বুঝতে পেরেছো তো? আমরা যদি রাত তিনটে নাগাদ বন্দর থেকে যাত্রা করি তাহলে ইঞ্জিনিয়াররা সহজেই প্ল্যান ৩০৩ এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারবে।

গভর্নর চোখ টিপে ইশারা করলেন—এখনকার মতো যথেষ্ট হয়েছে। টোপ গিলেছে গুপ্তচররা। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে প্লেনে চড়ো।

প্লেন উঠলো আকাশে। এবার থামবে আলজিয়ার্সে। খুবই একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজে জেনারেল মন্টিগোমারি আসছেন বলে গুজব ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো। সম্ভবতঃ অ্যাংলো-আমেরিকান সৈন্য নিয়ে তিনি ফ্রান্সের দক্ষিণ দিক দিয়ে জার্মানদের ওপর আঘাত হানার পরিকল্পনা করছেন এই রকম একটা ধারণা হয়েছিলো ঐ অঞ্চলের মানুষজনের। এই ধারণাটা অবশ্য তৈরি করে দেওয়া হয়েছিলো। মন্টির 'টপ সিক্রেট ভিজিটে'র কথাটা এমনভাবে কানাকানি করে দেওয়া হয়েছিল যাতে জার্মান গুপ্তচরবাহিনী আগেভাগেই তৈরি হয়ে নিতে পারে।

বিমানবন্দরে জেনারেল উইলসনের বাহিনী স্বাগত জানালেন মন্টিকে। গার্ড অব অনার নেবার সময় মন্টি লক্ষ্য করলেন, তাঁকে দেখার জন্যে ছোটখাটো একটা ভিড় জমেছে। ঐ ভিড়ের মধ্যে আছে দুজন ইতালিয়ান। মিত্র বাহিনীর পক্ষে সহানুভূতিশীল হলেও ওরা দুজনে আসলে জার্মান গুপ্তচর। ওদের 'বস' একজন ফরাসি মেজর। তিনিও এসে গেছেন। তিনি ফরাসি ইনটেলিজেন্সের অফিসারের ভান করলেও আসলে তিনি যে গেস্টাপোর লোক, এ কথাটা মিত্রবাহিনীর ওপর মহলের লোকজন জানেন। তিনি মন্টির সঙ্গে সাক্ষাৎকার চেয়েছেন। তাও মঞ্জুর করা হয়েছে।

বিমানবন্দরেই সেই মেজরের সঙ্গে মন্টির আলাপ করিয়ে দিলেন একজন কর্নেল। লোকটাকে দেখলেই বোঝা যায়, সে একটি আস্ত শয়তান। তার কালো চোখ দুটো চকচক করছিলো। চোখের তলা থেকে ঠোঁট পর্যন্ত একটা কাটা দাগ মুখটাকে আরও বীভৎস করে তুলেছে। লোকটা যে কোনো সময় যে কোনো অন্যায় কিংবা অপকর্ম করতে পারে। মেজরকে দেখেই জেমসের গা শিরশির করে উঠলো। সন্দেহজনক চোখে একবার তাকালো মেজরের দিকে। জেমসের মনে হলো, লোকটা বোধহয় তাকে গুলি করার চেষ্টা করবে। সে-সব অবশ্য কিছুই হলো না। হাসিমুখে জেনারেলের সঙ্গে করমর্দন করলেন সেই ফরাসি মেজর।

একজন মার্কিন কর্নেলের সঙ্গে জেনারেল এগিয়ে গেলেন গাড়ির দিকে। গাড়ির কাছে এসে মন্টি দাঁড়াতেই তাঁকে স্যালুট করলেন একজন সুদর্শনা। তাঁর পরনে মার্কিন মহিলা ফৌজিবাহিনীর পোশাক। স্যালুট করে মহিলা জেনারেলের অটোগ্রাফ চাইলেন।

অটোগ্রাফের ব্যাপারটা যে ঘটতে পারে কর্নেল লিস্টার তার আঁচ আগেই করেছিলেন। তাই মন্টির সই করা অনেকগুলো ছবি কর্নেল লিস্টার জেমসকে দিয়েছিলেন। হাসিমুখে জেমস সই করা একটি ছবি ভদ্রমহিলার হাতে তুলে দিয়ে বললো, মনে হয় এতেই হবে। সই করা ছবিটা হাতে পেয়ে মহিলার চোখ মুখ খুশিতে জ্বলজ্বল করে উঠলো। আবার একটা স্যালুট করে ড্রাইভারের সিটে গিয়ে বসলেন তিনি।

বিমানবন্দর থেকে আর্মি হেড কোয়ার্টার—এই বারো মাইল পাড়ি দেবার কথা জেমস জীবনে কোনোদিন ভুলবে না। খবর ছিলো, পথেই

কূলে উঠছে সৈন্যরা

জেনারেলের প্রাণনাশের চেষ্টা করতে পারে জার্মান গুপ্তচররা। অথচ সারা পথ সেইভাবে পাহারা দেওয়া সেই মুহূর্তে সম্ভব নয়। তাই জেনারেলের মার্কিন এসকর্ট-বাহিনীকে রকেট গতিতে গাড়ি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো। যাত্রা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই নির্দেশ পালন করা হলো অক্ষরে অক্ষরে। জেমসের মনে হলো, তার গাড়িটা যেন ছিটকে বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে গেলো। তারপর দুরন্ত গতিতে ছুটতে লাগলো বারো মাইল পথ। পথে জেমস মন্টির মতোই কথাবার্তা বলতে লাগলো কর্নেলের সঙ্গে। এমনভাবে বলছিলো যাতে প্রত্যেকটি কথাই সেই মহিলা ড্রাইভারের কানে যায়।

পথে জেমসের চেয়ে অনেক বেশি টেনশনে ছিলেন তার পাশে বসা

দুরন্ত গতিতে ছুটতে লাগলো গাড়ি।

# পেটের গোলমাল ?
## অম্লরোগ? ক্ষুধামান্দ্য? কোষ্ঠকাঠিন্য?

### ডাঃ সরকার বলেন—
### স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য রক্ষায় লিভার।

যদি লিভার ও স্টম্যাকের কাজ ভালো না হয় বা মানসিক অশান্তি জনিত ভালো ঘুম না হয়, তবেই পেটের গোলমাল হয়। সর্বাধিক রোগের কারণ এই পেটের গণ্ডগোল, তাই যদি সুস্বাস্থ্য চান — পেটের গোলমাল সারান, আর লিভারের সুরক্ষায় হন যত্নবান।

পেটের গোলমাল সারাতে
ও লিভারের সুরক্ষায়
ডাঃ সরকারের এক ফলপ্রসু আবিষ্কার
(মাইকেল মধুসূদন একাডেমী পুরস্কৃত)
লিভোসিন - আয়ুর্বেদিক লিভার টনিক।

# লিভোসিন

লিভার করেক্‌টিভ, কারমিন্যাটিভ
অ্যাপিটাইজার, রেস্টোর‍্যাটিভ্‌-টনিক্‌।

ব্যবহার বিধি ঃ

দু'-চা চামচ করে লিভোসিন এক গ্লাস অল্প গরম জল-সহ সকালে খালি পেটে ও রাতে শোয়ার আগে সেবন করুন, যতদিন না- বুক জ্বালা সারে, হজমশক্তি বাড়ে, অম্লরোগ, ক্ষুধামান্দ্য ও কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়, পেটের গোলমাল সারে আর সৌন্দর্য বাড়ে।

অ্যালোপ্যাথিক ও আয়ুর্বেদিক ওষুধ প্রস্তুতকারক ঃ
**জুপিটার ফার্মাসিউটিক্যালস্ প্রাঃ লিঃ**
২৫, ইডেন হস্‌পিটাল রোড, কলিকাতা-৭৩
ফোন ঃ ২৬-০১৫৬/২৭-০২২৪/৭৭-৭০৭৫/৩৩-৭০২৬

আর্ণিকাপ্লাস-ট্রায়োফার নির্মাতাদের সহযোগী সংস্থা Jupiter এর আয়ুর্বেদিক গবেষণার একটি উপহার।

যাদের যত্নেই আপনার আরোগ্য ও আস্থা

সমস্ত অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের দোকানে পাওয়া যায়।

Allen's Ad. India

সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ

কর্নেল। সব সময়ই তিনি একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটে যাবার আশঙ্কায় ঘামছিলেন। তাঁর মুখে আবার হাসি ফিরে এলো যখন গাড়িগুলো জেনারেল উইলসনের সদর দপ্তরের বিশাল কমপাউণ্ডের মধ্যে ঢুকে পড়লো। জেমস দেখলো, গাড়িগুলো ঢুকে যেতেই তাদের পেছনে বন্ধ হয়ে গেলো বিশাল গেটটা। স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়লো জেমসের। সে মনে মনে নিজেকে তৈরি করে নিলো পরবর্তী পদক্ষেপের জন্যে।

এর পরের দিনগুলো কেটে যেতে লাগলো স্বপ্নের মতো। কখনো সম্বর্ধনা সভায়, কখনো সিভিলিয়ানদের সঙ্গে, কখনো অফিসারদের সঙ্গে আলোচনায়, আবার কখনও গার্ড অব অনার নিতে নিতে জেমস ক্লান্ত হয়ে পড়লো। তবে মন্টিকে ব্যক্তিগতভাবে চেনেন এমন কিছু অফিসার ছাড়া অন্যদের জেনারেলের কাছে যাবার অনুমতি দেওয়া হতো না। আর গ্রহণ করা হতো না কোনো লাঞ্চ বা ডিনারের আমন্ত্রণ।

সেদিন সকালে ব্রিগেডিয়ার হেউড একজন ভদ্রলোককে সঙ্গে এনে বললেন, মার্জনা করবেন স্যার, অধ্যাপক সালভাডর এক্স, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান। উনি একজন খুব নামকরা আর্কিওলজিস্ট আর বিশ্বস্ত ইতালিয়ান।

হেউডের কথা শুনে জেমস প্রথমটায় একটু বিরক্ত হয়েছিলো। একজন আর্কিওলজিস্টের সঙ্গে কথা বলে সে কেন মিছিমিছি সময় নষ্ট করবে! তারপরই মনে পড়লো হেউড একজন ঝানু অফিসার—তিনি যখন বলছেন, তখন অধ্যাপক ভদ্রলোক নিশ্চয়ই...

জেনারেলের সঙ্গে অধ্যাপক অত্যন্ত বিনীতভাবে কথা বললেন। আর্কিওলজি নিয়ে দুজনের মধ্যে কথা হলো। তারপর হঠাৎ কিছু মনে পড়েছে এমন ভাব করে জেমস হেউডকে নিয়ে একটু দূরে সরে গিয়ে মিলিটারি প্ল্যান নিয়ে একটু জোরে জোরে কথা বলতে লাগলো। অধ্যাপক ভদ্রলোক কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করলেন। জেমস যা চেয়েছিলো সেই সব কথা শুনলেনও। তারপর বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

এরপরই ঘটলো একটা হৃদয়-বিদারক ঘটনা। এক ফরাসি ভদ্রলোক জার্মানদের বিরুদ্ধে রেজিস্টেন্স গ্রুপের হয়ে কাজ করতেন। কিন্তু তিনি নাৎসীবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে যান। জার্মানবাহিনী এর পর ভদ্রলোকের স্ত্রীকেও ধরে। তাঁকে বলা হয়, তিনি যদি তাদের গুপ্তচর হয়ে কাজ করেন তাহলে তাঁর স্বামীকে মেরে ফেলা হবে না। যুদ্ধের পর ছেড়ে দেওয়া হবে। ভদ্রমহিলা রাজী না হলে ভদ্রলোককে এখনই মেরে ফেলা হবে। ভদ্রলোকের মতো তাঁর স্ত্রীও পরম দেশভক্ত। তিনি স্বামীর প্রাণ বাঁচানোর জন্যে নাৎসীবাহিনীর প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন। কাজ করছেন আলজিয়ার্সে।

সেই ভদ্রমহিলা এলেন জেনারেলের সঙ্গে কথা বলতে। ভদ্রমহিলার বয়স পঞ্চাশের মতো। নিখুঁত সাজপোশাক। গড়ন একটু লম্বাটে। গায়ের রং একটু যেন চাপা। মন্টি মেয়েদের সঙ্গে খুব স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। দু-চারটে কথা বলে বিদায় করে দেবার তালে থাকেন।

ঠিক মন্টির মতো করেই মহিলাকে আহ্বান করলো জেমস। দু-চারটে কথা বলার পরই ভদ্রমহিলা ধীরে ধীরে ভেঙে পড়তে লাগলেন। তারপর হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। আসলে দেশের সঙ্গে শত্রুতা করাটা তিনি মন থেকে কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। কাঁদতে কাঁদতে তিনি যুদ্ধকে শাপ-শাপান্ত করতে লাগলেন সেই সঙ্গে জেনারেলকে বসালেন একেবারে পুরোহিতের আসনে। আসলে একদিকে দেশপ্রেম অন্যদিকে স্বামীকে বাঁচানোর তাগিদ ভদ্রমহিলার মন ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। অত্যন্ত বেদনাদায়ক পরিস্থিতি। জেমস ভেবে পাচ্ছিলো না ভদ্রমহিলাকে কি বলবে। হেউড তাড়াতাড়ি এসে ভদ্রমহিলাকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেলেন।

জেমস এই ক'দিনে মনে-প্রাণে জেনারেল মন্টিগোমারি হয়ে গিয়েছিলো। যখন একা একা থাকতো তখনও। একদিন প্লেন থেকে নামার আগে হেউড জেমসকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, নারভাস লাগছে না তো?

নারভাস হেউড... ভোন্ট টক রট! জেমস একটু বিরক্ত হয়েই উত্তর দিয়েছিলো। তাই দেখে ব্রিগেডিয়ার হেউড তাড়াতাড়ি বলে উঠেছিলেন, সরি স্যার।

ক'দিনে আরও ক'য়েকটি দেশ ঘুরে জেমস আলজিয়ার্সে ফিরে এলো। সে যে জেনারেল মন্টগোমারি নয় এ সন্দেহ কারো মনে স্বপ্নেও আসেনি। অর্থাৎ সে তার ওপর দেওয়া দায়িত্ব ভালোভাবেই পালন করতে পেরেছে। ধোঁকা দিতে পেরেছে হিটলারের বাঘা বাঘা সব গুপ্তচরদের। এবার তার কাজ শেষ। 'ডি ডে'র আর মাত্র ক'য়েকদিন দেরি। সব প্রস্তুতি শেষ। যে জন্যে জেমসকে জেনারেলের ছদ্মবেশে দেশে দেশে ঘুরতে হয়েছিলো তা পুরোপুরি সফল। রোমেলের অপরাজেয় গোলন্দাজবাহিনীকে সরিয়ে নিয়েছেন হিটলার। ফলে নির্ধারিত দিনে মিত্রবাহিনীর আক্রমণের কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেছে। সব চেয়ে বড় ভয় ছিলো রোমেলের বাহিনীকে। কিন্তু গুপ্তচরদের খবরগুলো মিলে যাওয়ায় হিটলারের সন্দেহ ছিলো না, মন্টি আফ্রিকার দিকে গিয়েছেন। সুতরাং...

জেনারেলের মধ্য-প্রাচ্য সফরের খবর বার্লিনে পৌঁছুবার পরই জার্মান হাইকম্যান্ড নির্দেশ দিয়েছিলেন মন্টির প্লেন গুলি করে নামিয়ে তাঁর প্রাণনাশ করতে। পরে অবশ্য এই নির্দেশ বদলে যায়। জার্মানরা নিশ্চিত হতে চাইছিলো, সত্যিই জেনারেল মন্টি সফরে যাচ্ছেন, নাকি তাঁর ছদ্মবেশে আর কেউ। এরপর জার্মান হাইকম্যান্ড ঠিক করেন স্পেন কিংবা আফ্রিকার কোথাও মন্টিকে খুন করা হবে। জার্মান হেড কোয়ার্টার যখন নিশ্চিত হলেন যে সত্যি সত্যিই জেনারেল মন্টিই লণ্ডন ছেড়ে ক'য়েকটি দেশ ঘুরে আফ্রিকায় যাচ্ছেন তখন মন্টির জীবন বাঁচাতে এগিয়ে এলেন স্বয়ং হিটলার। তিনি নির্দেশ দিলেন, ঠিক কোথা

থেকে জেনারেল আক্রমণ চালানোর পরিকল্পনা করেছেন যতক্ষণ না জানা যাচ্ছে ততক্ষণ কোনো মতেই জেনারেল মন্টগোমরিকে মারা চলবে না।

জার্মানরা কোনোদিনই তা জানতে পারেনি। ফলে বেঁচে গেলো জেমসের জীবন। বলা যায় হিটলারই বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন জেমসকে। হিটলার বাধা না দিলেই পথেই কোথাও হয় জেনারেলের প্লেনটা গুলি করে নামানো হতো, না হয় তো অন্য কোথাও গুলি করে মারা হতো ছদ্মবেশী জেনারেলকে। জেমসের ভাগ্য ভালো কোনোটাই ঘটেনি।

নির্ধারিত দিনে জেমস জেনারেলের ছদ্মবেশে জেনারেল উইলসনের হেড কোয়ার্টারে গেলো। নিজের ঘরে গিয়ে জেনারেলের পোশাক ছেড়ে পরে নিলো তার নিজের লেফট্যান্যান্টের ইউনিফর্ম। তারপর বেরিয়ে এলো পেছনের দরজা দিয়ে। জেমসের সঙ্গে জেনারেল মন্টির চেহারার অদ্ভুত মিল দেখে পাছে কারো মনে এতটুকুও সন্দেহ জাগে তাই তখনই জেমসকে একটি প্লেনে চাপিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হলো কায়রোয়। কায়রোর জনারণ্যে হারিয়ে গেলো জেমস।

ওদিকে হিটলারের নাৎসীবাহিনীকে বিধ্বস্ত করে দিতে মিত্রবাহিনী জঘন্য আবহাওয়ার মধ্যেই ফরাসি উপকূল দিয়ে এগিয়ে গিয়ে জল এবং অন্তরীক্ষে ঝাঁপিয়ে পড়লো নরম্যান্ডির বুকে। জেনারেল মন্টগোমারি যে তাঁকে কতটা বোকা বানিয়েছেন তা বুঝতে সেদিন বোধহয় আর অসুবিধে হয়নি হিটলারের। এবং তার পুরো কৃতিত্ব ইংলিশ পে কোরের সামান্য একজন অফিসার লেঃ ক্লিফটন জেমসের।

আর যেদিন নরম্যান্ডিতে সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ হচ্ছে, জাহাজ থেকে সৈন্যরা নেমে নৌকোয় চড়ে গোলা বারুদ নিয়ে গিয়ে কূলে উঠছে, ভারী ট্যাঙ্কগুলো জাহাজ থেকে নেমে জল ভেঙে পাড়ে উঠছে, আকাশে প্লেনের গর্জনে কান পাতা দায় তখন জেমস কায়রোর কোনো এক হোটেলে বসে আরামে খবর শুনছে। —লংগেস্ট ডে-র রোমাঞ্চকর সেই যুদ্ধকে সফল করতেই জেমসকে সাজতে হয়েছিলো জেনারেল মন্টগোমারি। এবং সেটাই অভিনেতা ক্লিফটন জেমসের জীবনের সেরা অভিনয়।

(এম.ই ক্লিফটন জেমসের 'আই ওয়াজ মন্টি'স ডবল' অবলম্বনে।)

শেষ

ছবিঃ রজতবরণ চক্রবর্তী

# ধেই

## সুনীল বসু

আকাশটা ভুতুড়ে
শকুনের খোকা কাঁদে আঁতুড়ে
এই রাত দুপুরে

বাতাসটা ঝোড়ো
ফাঁকা মাঠে কুঁড়ে এক পোড়ো
ওইখানে লুকিয়ে
কাঁদে কেউ কঁকিয়ে

ওরে বাবা ওটা কি
কালো ছায়া মোটা কি
দিয়ে যায় হামাগুড়ি
গায়ে কালো কাঁথা মুড়ি

কাছে আসে ওরে বাবা
তিন ঠ্যাং-এ মোটা থাবা
ভয়ে কাঁপে বুকটা
থামে ধুকপুকটা

নাকি সুরে পেত্নী
বলে ভূত-পত্নী
কোথা যাও রাত্রে
জামা কই গাত্রে

আমাদের গায়ে নেই চামড়া
কংকাল আমরা
এই গাছে থাকি, খাই আমড়া

চোখ-ছাড়া দেখি ফুটো গর্তে
আমাদের পারো না তো ধরতে
কেন চোখ ছানাবড়া
দেখে দুটো বাসী মড়া
ভয় পাও কেন তুমি
এসো বাছা, হাওয়া খাও মৌসুমী
কেন তুমি ভয় পাও
শোনো বাপু কোথা যাও
ভূত বলে ভয় নেই
নাচি আয় ধেই ধেই
ধেই ধেই! ধেই ধেই!

ছবিঃ সৃফি

# যত্তোসব

আশাপূর্ণা দেবী

এমন কিছু ব্যাপার নয়!

শুধু একটা 'মোপেড্'!

রাস্তায় যা শত শত দেখতে পাওয়া যায়। তার জন্যে এই হাড়েহল্লুদ করে খাটা! কিন্তু লেটুস যে সেই কবে থেকে ওই পরম বস্তুটির স্বপ্ন দেখেছে! সে একটা 'মোপেডে'র মালিক হয়েছে। নিজে হাতে স্টিয়ারিং ধরে তাকে চালাচ্ছে, ঘোরাচ্ছে, রাস্তা দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু লেটুস বোকার মতো অসময়ে তার স্বপ্নসাধ পাঁচজনের কাছে প্রকাশ করে বসেনি। দিন আসার অপেক্ষায় দিন গুনেছে।

তা অবশেষে একদিন সেই দিন এলো।

মাধ্যমিকের সময় বাবা কাকা জ্যেঠু মামা সব্বাই একযোগে বলতে শুরু করলেন, লেটুস, মনে রাখিস এইটাই হচ্ছে জীবনের আসল পরীক্ষা! এটায় রেজাল্ট খারাপ করে বসলে, সারা জীবন তার জের টানতে হবে। আর এতে একটা মারকাটারি রেজাল্ট দেখাতে পারলে–

'পারলে' কী হবে তা অবশ্য কেউ খুলে বলেন না, তবে সেটা যে বেশ ভালো একটা কিছু হবে, তা বোঝা যায় তাঁদের ভাবভঙ্গীতে।

লেটুস বললো, 'মারকাটারি রেজাল্ট'? আমার দ্বারা আর হয়েছে!

কেন হবে না রে বাবা! তোর কী 'মাথা'টা কম? ফাঁকি মেরে চালাস বলেই ক্লাশে ফার্স্ট সেকেন্ড হতে পারিস না! একটু উঠে পড়ে লেগে পড়লেই দেখবি–

লেটুস বললো, পটাই আর টুকলিদির মতো রাত-দিন পড়া! দূর! তার বদলে পাবোটা কী?

আরে। কী আবার? ভবিষ্যতে–

আমি অতো ভবিষ্যৎ-টবিষ্যৎ বুঝি না।

লেটুস একটু দুষ্টু হাসি গোপন করে উদাস ভাব দেখিয়ে বলে, হাতে হাতে কিছু পেয়ে যাবার আশা থাকলে না হয় চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে!

হাতে হাতে?

মেজকা বলে ওঠে, তার মানে একটা ভালো মতো প্রাইজ বাগাতে চাস, এই তো? ঠিক আছে! তুই যদি তেমন একখানা রেজাল্ট করতে পারিস, দেওয়া যাবে 'তেমন' একখানা প্রাইজ।

লেটুস বললো, তেমন-টেমন বুঝি না! টোট্যাল কতটা নম্বর পেলে, আমার মনের মতো একখানা প্রাইজ দেবে প্রমিস করো!

একদম প্রমিস! বাবা! তোর মনের মতো? ঠিক আছে। বল সেই মনের মতোটা কী? যদি সাধ্যে কুলোয়–

তোমার কড়ে আঙুলের সাধ্যেই কুলোতে পারে।

তাহলে বলেই ফ্যাল!

আগে তোমারটা বলো! মানে দেবে কিনা।

আগে তোরটা শুনি।

আগে তোমারটা!

আচ্ছা ঠিক আছে। বলছি–

বলে মেজকা হকার্স কর্নারের দোকানীদের পদ্ধতিতে প্রথমে টোট্যাল নম্বর সম্বন্ধে একটা অবিশ্বাস্য অংক বলে বসলো!

লেটুস রেগে বললো, নাক ঘুরিয়ে কান দেখাবার দরকার নেই মেজকা! দেবে না তাই বলো। ওই নম্বরটা পেতে হলে ফার্স্ট-এর ওপর উঠে যেতে হবে তা জানো?

আচ্ছা বাবা, আচ্ছা! ভুল হয়েছে। তাহলে–না হয়–

এবারের শর্ত শুনেও লেটুস মুখ গাবদা করে বললো, অতো নম্বর পেতে হবে? অসম্ভব। আমার প্রাইজ চাই না!

উঃ। এ তো আচ্ছা ছেলে! বেশ বাবা, আরো একটু নামছি। এটুকুও তো করবি খেটেখুটে?

তা 'সেটুকু'ও নেহাৎ কম নয়। তাতেই লেটুসের খেলাধুলো মাথায় উঠবে। পড়ে পড়ে মাথা ধরে যাবে! কাজেই আরো কিছুক্ষণ দরাদরির পর একটা জায়গায় দুজনের মতামতটা স্থির

হলো! তখন লেটুস তার বক্তব্য পেশ করলো!

অাঁ! একখানা মোপেড?

জ্যেঠু বললেন, সে তো একটা বিপজ্জনক জিনিস।

'বিপজ্জনক' আর কোনটা নয় জ্যেঠু? রাস্তায় বেরোনোটাই তো বিপজ্জনক। তাহলে রাস্তায় বেরোনো ছাড়ো।

তোদের সঙ্গে কথায় কে পারবে? বলি তুই কী চালাতে জানিস?

জ্যেঠু! 'জলে না নামিলে কেহ শেখে না সাঁতার!'

মেজকা তাড়াতাড়ি বলে, বেশ বাবা, তাই হবে। তবে হ্যাঁ! ওই নম্বরটি অন্তত রাখা চাই।

অতঃপর লেটুসের ওই হাড়েহলুদ করে খাটা। আসলে বসে বসে পড়াটাতেই তার আলিস্যি! খেলাধুলো দৌড়ঝাঁপ এটা-সেটায় মন তার। তবু ওই অনেকদিনের স্বপ্নটি সফল হবার আশায় খুব পড়লো লেটুস! পটাই টুকলিদির মতো রাতদিন এনতার পড়লো। আর পরীক্ষা দেওয়ার পর আবার দিন গুনতে শুরু করলো! কী হয়! কী হয়!

যতই আত্মবিশ্বাস থাকুক, তবু মাধ্যমিক দিয়ে বুক দুরুদুরু করে না, এমন ছেলেমেয়ে কমই আছে! লেটুসেরও করলো তা।

কিন্তু সেই পরম দিন যেদিন এসে পড়লো?

সত্যি বলতে, আর সবাই তো বটেই, লেটুস নিজেই 'নম্বর' দেখে তাজ্জব বনে গেল। এতোটা পাবে আশা করেনি। মেজকার দেওয়া 'দর' ছাপিয়ে নম্বর অনেকটা ওপরে উঠে গেছে!

বাড়িতে আহ্লাদের হাওয়া। হৈ হৈ হাসিখুশী! আবার তার সঙ্গেই কিছু উল্টো গাওনা .....দেখলি তো? একটু চেষ্টা করলেই হয় আরও একটু খাটলে নির্ঘাৎ প্রথম পাঁচজনের মধ্যে হয়ে, কাগজে ছবি ওঠাতে পারতিস।

থাক বাবা! কাগজে ছবি উঠে দরকার নেই! এখন–আসল কাজের কথায় এসো তো! মেজকা! কথা না রাখলে কিন্তু আমি উচ্চমাধ্যমিকে স্রেফ ফেল করে তোমাদের নাম ডোবাবো।

ওরে সর্বনাশ! এ কী ছেলে! কে বলেছে কথা রাখবো না? শুনি শুনি। এক্ষুণি শুনি। দেখি তোর কী রকম কী পছন্দ!

'কী রকম কী' আবার? সব সময় অ্যাডভার্টিসমেন্ট্ দ্যাখো না?

তা দেখে হয়তো সবাই! কিন্তু লেটুসের মতো অমন গোগ্রাসে কে দেখে? আর সেই দেখাটি লেটুস আজ নয়, অনেকদিন থেকেই দেখে আসছে! মেয়েরা যেমন শাড়ির বিজ্ঞাপন দেখে।

কথা হলো পরদিনই কিনতে বেরোনো হবে। নিদেনপক্ষে বুক করে আসা হবে। মেজকা বিজনেস-টিজনেস করা লোক, যাকে বলে 'রইস আদমি'! কাজেই টাকার ব্যাপারে নো প্রবলেম!

ইতিমধ্যেই এদিকে প্রেজেনটেশানের গাদা জমে গেল ঝপাঝপ। জ্যেঠু একটা 'টাইটান কোয়ার্টজ' ঘড়ি দিলেন, মা-বাবা বেশ দামী একটা স্যুট! দিদি-জামাইবাবু পুরো 'ফেলুদা সমগ্র'। মানে ফেলুদা সংঘটিত যত বই! রবীন্দ্রসঙ্গীত-গায়িকা পিসি একখানা গীতাঞ্জলি ভরে দিয়ে ছোট্ট ছিমছাম একটা বুককেসই দিয়ে বসলো!

বাড়ির প্রথম মেয়ের বিয়ের সময় সবাই যেমন আগে থেকেই উপহারের বিষয় ঠিক করে রাখে, এও যেন ছিল প্রায় তাই! রাত পর্যন্তই হৈচৈ! পিসি-পিসে,দিদি-জামাইবাবু এবং তস্য পুত্রকন্যারা এ বাড়িতে এসে তো আর খাওয়া-দাওয়া না করে যাবে না?

তবু অনেক রাতে শুয়েও সারারাত ঘুমই হলো না লেটুসের। ও সমস্ত রাত কলকাতার ভালো ভালো সব রাস্তায় নতুন ঝকঝকে একখানা মোপেড চালিয়ে বেড়াতে লাগলো।

উঃ। কতোক্ষণে সকাল হবে! অতঃপর কতোক্ষণে সেই মহামুহূর্ত আসবে!

তা এলো সে মুহূর্ত। কিন্তু? কাকা-ভাইপোয় যাত্রা করছে! বাইরে গাড়ি প্রস্তুত, ঠিক সেই সময় কিনা বট্ঠাকুমা, অর্থাৎ লেটুসের বাবা–কাকা–জ্যাঠারও জোঠিমা গঙ্গাস্নান করে ফিরলেন। গঙ্গা কাছেই। অতএব তাঁর নিত্য গঙ্গাস্নানের অভ্যাস।

'কোথায় যাচ্ছিস?' এ তো তিনি জিগ্যেস করবেনই। পারলে বাড়ির একটি মাছিরও গতিবিধির হিসেব রাখতে চেষ্টা করেন তিনি। তাহলে? মানুষের ব্যাপারে নীরব থাকবেন? আর অসম্ভব তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্না এই উনআশী বছরের মহিলাটির কাছে গোঁজামিল চলে না, রেখেঢেকে বলাও চলে না। অনায়াসে মুখের ওপর বলে দিতে পারেন, 'বলতে ইচ্ছে না হয়, স্পষ্ট করে বল বলবো না।' মিছে কথা বলে মুখ নষ্ট করছিস কেন?'

কাজেই কোথায় যাচ্ছি সেটা বলতেই হলো।

অবশ্য লেটুসকে বলতে হলো না, মেজকাই সে ভারটা নিলেন।

বট্ঠাকুমা শোনামাত্রই একবার মেজকার দিকে বেশ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, ও না হয় ছেলেমানুষ! জ্ঞানগম্যি থাকার কথাও নয়। কিন্তু তুই? তোরও কী জ্ঞানগম্যি লোপ পেয়েছে ঘটাই? একটা আহ্লাদের জিনিস কিনতে যাচ্ছিস এই শনিবার ভরা অমাবস্যেয়!

শনিবার। আবার ভরা অমাবস্যাও।

শনিবার যে একটা গোলমেলে বার, অবশ্য কাকা ভাইপো দুজনেরই জানা, কিন্তু 'ভরা অমাবস্যা' মানে? লেটুস হাঁ করে তাকায়। কিসে ভরা হয়েছে ওই অমাবস্যাটাকে?

ঘটাই অর্থাৎ 'ঘটোৎকচ' অর্থাৎ মেজকা অবশ্য হাঁ হন না। তিনি তো ওই জ্যাঠাইমার হাতেই মানুষ! ওঁর নামকরণও তো জ্যাঠাইমার অবদান। জন্মমাত্রই নাকি খুব বিকট শব্দে কেঁদে উঠেছিলেন মেজকা। এটা নাকি ঘটোৎকচিয় লক্ষণ। কাঁদতেই পারেন। জন্মেছিলেন যে প্রচণ্ড শীতের সময়। হঠাৎ পৃথিবীর হিম হাওয়াটা লেগে–তা সে যাক, এখন ঘটাই জ্যাঠাইমার সামনে এমন ভাব দেখালেন, যেন ব্যাপারটা কিছুই নয়। বললেন, আহ্লাদের জিনিস বলেই তো তাড়াহুড়ো। সেই কবে থেকে দিন গুনছে বেচারী!

বাঁক নিতে গিয়ে লেটুসের ঘাড়ে এসে পড়ে!

জ্যাঠাইমা ভিজে গামছাটাকে ঝাড়তে ঝাড়তে বলেন, এতোগুলো দিনই যখন গুনেছে, তখন আরো একটা দিন গুনলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না। কাল কিনিস।

লেটুস আর থাকতে পারে না, চেঁচিয়ে বলে ওঠে, কাল রবিবার না? তোমার জন্যে সব দোকান-টোকান খোলা থাকবে বুঝি?

আ। তাহলে পরশুই হবে। সোমবার শুভবার।

সোমবার!! তার মানে আজ, কাল, পরশু! এই তিন দিন ধরে লেটুসকে কেটে কেটে নুন দেওয়া হবে। লেটুসকে মুরগীর মতো জবাই করে উঠোনে ছেড়ে রাখা হবে। তিন দিনের মতো (লেটুস তিন দিনই ভাবে) লেটুসের খাওয়া-ঘুম সব ঘুচে যাবে!

কেন? না কী এক 'অমাবস্যে' আর শনিবার। যার কোনো মানে নেই।

লেটুস নীরবে মেনে নেবে অকারণ এই অন্যায় শাস্তি?

লেটুস আরো চেঁচিয়ে বলে উঠবে না, আজ বুঝি রাজ্যের দোকানে কিছু বিক্রি-টিক্রি হচ্ছে না? শনিবার বলে দোকানীরা দোকান বন্ধ করে ঘুমোচ্ছে? কী হয় শনিবারে জিনিস কিনলে? যতোসব কুসংস্কার! বল না হয়টা কী?

চেঁচানোটা বেশ জোরই হয়েছিল। কারণ ওটা তো ডুকরে কেঁদে ওটাকে চাপা দিতেই!

বট্ঠাকুমা এখন বেশ শান্তভাবেই বলেন, 'কী' হয়, তা আর বিস্তার করতে বসতে চাই না। কিছু না হলেই মঙ্গল। তবে আমার যা বলবার বলেছি, এখন তোমাদের যা করবার করবে।

ঘটাই একবার লেটুসের মুখের দিকে তাকান। মুখ লাল, চোখ ফাটো ফাটো। সামাল দিতে না পারলে কী হয় কী না হয় বলা যায় না। আহা বেচারা! তা তিনি বুদ্ধি করে ফট করে বলে বসেন, সোমবার! আমার যে আবার সোমবার দুর্গাপুরে যাবার কথা আছে! ('কথা আছে'! যাবই এমন কথা বলেন না) কী জানি যদি কাজে আটকে দুদিন দেরি হয়ে যায়! বড্ড গড়িয়ে যাবে। আমি বলি কী জিনিসটা নিয়ে আসামাত্রই তুমি একটু গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিও!

গঙ্গাজল ছিটিয়ে! বলছিস কী ঘটাই? তাতে কী হবে?

এবার বট্ঠাকুমাই হাঁ। গঙ্গাজল ছিটিয়ে শনি অমাবস্যের দোষ কাটবে?

লেটুস অকূলে কূল পায়। লেটুসের লাল লাল মুখ আবার ফর্সা ফর্সা হয়ে যায়। লেটুস মহোৎসাহে বলে, কেন নয়? তুমিই তো রাতদিন গান গাও 'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে'-তো পতিত মানেই তো যতসব পাপটাপ দোষটোষ! হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই ভালো। তুমি একটুখানি ওই গঙ্গাজলই ছিটিয়ে দিও বট্ঠাকুমা। বেশী দিও না! নতুন জিনিস তো, দাগ ধরে যেতে পারে। ইস্ মেজকা! ভাগ্যিস মনে করলে! গঙ্গাজলের কী সোজা গুণ? রাতদিন রাজ্যির যত নোংরা আর জঞ্জাল, এমন কী মরা মরা জন্তুজানোয়ার পর্যন্ত গঙ্গায় পড়ছে, 'গঙ্গাদূষণ গঙ্গাদূষণ' বলে কতো সব কথা। তবু দেখো সেই গঙ্গাজলেই যতসব ঠাকুরের পুজো হচ্ছে। বট্ঠাকুমা গঙ্গায় চান করে এসে পবিত্র না কি হচ্ছেন। আর ওই গঙ্গাজলের চন্নামেত্তর খাচ্ছেন! তা হলেই ভাবো–গঙ্গাজল কী জিনিস! .....চলো চলো মেজকা, ওই কথাই থাকলো বট্ঠাকুমা। গঙ্গাজল।.....

কথাগুলো বলতে বলতে মেজকাকে প্রায় হিঁচড়ে টেনেই বাড়ির বার করে এনে ছাড়ে লেটুস।

আর ওদের দেখামাত্রই ড্রাইভার গাড়িতে স্টার্ট দেয়।

অতঃপর?

অতঃপর লেটুসের স্বপ্ন সফল আর সাধনা সিদ্ধি!

বিজ্ঞাপনে দেখে রাখা কাগজের গোছা মেজকার হাতে ধরিয়ে দেয় লেটুস। যথাবিধি কাজ হয়। লেটুসের নাম-ঠিকানা লেখানো গ্যারান্টি ইত্যাদি নেওয়া, যা যা করার সব মিটোতে সময় অবশ্য লাগে বেশ। বাড়ি ফিরতে বেলা গড়িয়ে যায়।

কিন্তু তাতে কী?

লেটুস এখন একটা সাম্রাজ্যের অধীশ্বর না?

সেই সাম্রাজ্য লেটুসের বাড়িতে এসে পৌঁছে যাচ্ছে না? তার কাছে একটু বেলায় খাওয়া! তাছাড়া মেজকা তো বার দুই খাইয়েওছে।

লেটুস একটা 'মোপেড' প্রাইজ পাবে এ বার্তা লেটুসের বন্ধুমহলে রটেই বসে আছে। কেউ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে

বলেছে, কী 'লাকী' বাবা তুই! .....কেউ বা আবার বলেছে, দেবে না হাতী! পরীক্ষায় একটু ভালো রেজাল্ট করেছিস বলে, একেবারে একখানা গাড়ি দিয়ে বসবে? এতো সস্তা! ভুলিয়ে-ভালিয়ে তোকে দিয়ে বেশী পড়িয়ে নিলো। দেখিস কাঁচকলা ঠেকাবে।

তা ওদের সব উচিতমতো জবাব দেওয়া যাবে। কালই বেরিয়ে পড়বে লেটুস বন্ধুদের বাড়ি বাড়ি। দুটো বন্ধু তো আবার লেটুসের মামাতো আর মাসতুতো ভাই। ওরাই বেশী বেশী বলেছে।

লেটুস একসময় আনন্দ বিগলিত মুখে বলে, কী মেজকা, তোমার জ্যেঠিমার ওই অমাবস্যেভরা শনিবারে আহ্লাদের জিনিস কিনতে গিয়ে কী কিছু গড়বড় হলো? আমার তো ভাবনা হচ্ছিল, যদি ওই দোকানী কোম্পানী বলে বসে, 'চেক-টেক চলবে না, ক্যাশ চাই।' তাহলেই তো হয়ে গেল। আজ তো ব্যাংক বন্ধ হয়ে গেছে, আর কালকেও তো রবিবার।

মেজকা হাসেন, 'চেক' চলবে না বলবে কেন? আমার নিজের একটা কোম্পানী নেই? তার সংগে ওদের জানাচেনাও আছে। যাক বাবা! তোর পছন্দ তো?

পছন্দ। লেটুস 'হ্যাঁ' বলতে গিয়ে আবেগে প্রায় কেঁদেই ফেলে।

হ্যাঁ, সেদিনের ইতিহাস এই।

কিন্তু পরদিনের?

নতুন দামী স্যুটটা পরে নতুন ঘড়ি কব্জিতে বেঁধে নতুন মোপেডে চেপে লেটুস প্রথমেই চললো তার সব থেকে প্রাণের বন্ধু অরিন্দমের বাড়ি। অরিন্দমের দাদার একটা মোপেড আছে, সে চালানোর কায়দা-কানুন সব জানে। দাদার গাড়ি নিয়ে বেরিয়েও পড়ে। সত্যি বলতে তলে তলে তার কাছে চালানোটা একটু শিখেই রেখেছিল লেটুস।

অরিন্দম ওর পিঠ চাপড়ে বাহবা দিল।

লেটুস তারপর ওর প্রতিদ্বন্দ্বী বন্ধু মামাতো ভাই শৌনককে দেখাবার জন্যে মামার বাড়ির পথ ধরলো।

পথ অবশ্য বেশী নয়। কাছাকাছিই। হরদমই যাওয়া-আসা। লেটুস যখনি মামার বাড়ি বেড়াতে যায়, বটঠাকুমা হেসে হেসে বলেন, 'তাই তাই তাই! মামার বাড়ি যাই!'

কিন্তু আজ?

আজ কি মামার বাড়ি যাওয়া হলো লেটুসের?

কী করে হবে? ওই রাস্তাটায় যাবার সময় ঠিক মোড় ঘোরবার মুখেই যদি সামনে আচমকা একটা টেম্পো তেড়ে আসে, আর একটা সাইকেল রিকশা পাশ কাটাবার জন্যে বেমক্কা বাঁক নিতে গিয়ে লেটুসের ঘাড়ে এসে পড়ে!

ঠিক কী রকম কী ঘটেছিল তা অবশ্য বলতে পারবে না লেটুস। কারণ ওই রকম একটা পরিস্থিতিতে মাথাটা কেমন তালগোল পাকিয়ে গিয়ে চোখটা ধোঁয়া ধোঁয়া লাগল। আর ধোঁয়াটা কাটলে দেখতে পেলো লেটুস নিজেই সে তালগোল পাকিয়ে ফুটপাথের ধারে শুয়ে পড়ে আছে।.....তারপর আবার ধোঁয়া!

সে ধোঁয়া কাটতে লেটুস আবার আবিষ্কার করলো এখন সে বাড়িতে নিজের ঘরে বিছানায় শুয়ে আছে। তাকে ঘিরে সারা বাড়ির লোক! আর শুনতে পেলো পাড়ার ডাক্তার ঘোষের গমগমে গলার স্বর।

হলে অনেক কিছুই হতে পারতো! মারাত্মকও হতে পারতো! খুব ভাগ্য অল্পের ওপর দিয়েই গেছে। রক্তপাত ঘটেনি, কোথাও কোনো ফ্র্যাকচারও হয়নি, শুধু ডান হাতের কব্জির হাড়টা খুব একখানা চোট খেয়েছে। গাঁটের হাড়টা একটু সরে গেছে মনে হচ্ছে। নাও হতে পারে। একটা এক্সরে প্লেট নিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে! তা একটু যদি সরেই যায়, সেটা এমন কিছু ব্যাপার নয়। কিছুদিন প্লাস্টার করে রাখলেই—নাঃ, সত্যি খুব রক্ষে পেয়ে গেছে।

তা সত্যি, 'খুব রক্ষে পেয়ে গিয়েছেই' বলতে হবে। কব্জিতে বাঁধা জ্যেঠুর দেওয়া ঘড়িটাই যা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেছে, কোনোখানের হাড়গোড় চূর্ণ হয়নি। তবে মা-বাবার দেওয়া উপহার দামী স্যুটটার শার্টের একটা হাতা ফেঁসে ফর্দাফাঁই হয়ে গেছে আর প্যান্টে মস্ত একটা খোঁচা লেগেছে। এ ছাড়া চশমাটা চোখ থেকে খুলে ছিটকে কোথায় পড়ে গেছে দেখতে পাওয়া যায়নি। বাস।

তা এটুকুও আর হবে না?

গাড়িখানা যে একদম যেমনকে তেমন রয়েছে।

সেটাই কী কম লাভ?

আসলে টেম্পোটা তো আর ধাক্কা মারেনি! মেরেছে সাইকেল রিকশাটা। আর মেরেছে লেটুসকেই। কাজেই 'অল্পের ওপর দিয়েই' গেছে।

শুধু গাড়িখানা এখন অনিশ্চিতকাল চালাতে পারবে না লেটুস এই যা!

তো তাতে কী? প্রাণে বেঁচেছ এই ভাগ্যি!

কিন্তু লেটুসের কী মনে হচ্ছে, সে প্রাণে বেঁচেছে?

ওই তার স্বপ্নের মোপেডখানা সিঁড়ির তলায় পড়ে থাকবে, আর লেটুস প্লাস্টার করা ডানহাতখানা গলায় ঝুলিয়ে শুধু বাঁ হাতটাকে তার ওপর বুলিয়ে বুলিয়ে নিঃশ্বাস ফেলবে।

কিন্তু শুধুই কী এই?

কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে নেই?

জ্যেঠু উদাস গলায় বলছেন না,—তখনি বলেছিলাম, শখটি বিপজ্জনক।

মা আক্ষেপের গলায় বলছেন না, সবই একটু রয়ে সয়ে করতে হয় রে! চালাতে শিখে-টিখে তবেই না—তা নয়, যেই পেলাম, ভালো জামাজুতো পরে হাতে ঘড়ি বেঁধে সফরে বেরিয়ে পড়লাম। ইস! অমন ঘড়িটা!

মা হেন সম্পর্ক! তবু মার কথা শুনে মনে হলো—লেটুসের কব্জির হাড়টার থেকে কব্জিতে বাঁধা ঘড়িটাই বুঝি বেশী দামী!

গাড়িটা অটুট আছে। কাজেই ঘড়িটা নিয়েই কথা!

জনে জনে সকলেই অল্পবিস্তর আক্ষেপ করছেন বটে, তবে সকলেরই যেন ভেতরের কথা দোষটা লেটুসেরই। গাড়ি চালাতে না শিখেই তাড়াহুড়ো করে—

যেন যারা বেদম ভালো চালাতে জানে, তাদের কখনো অ্যাক্সিডেন্ট হয় না। রাস্তায় যত গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হয় সবাইয়ের চালকই বুদ্ধু!

ওই সাইকেল রিকশাটা বেটক্কর ঘাড়ে এসে না পড়লে হতো কিছু? তা সে কথা কে শুনবে? তা না শুনুক, মুখে

'আহা'টা করছে। কিন্তু বট্ঠাকুমা?

তিনি উল্লাস গোপন না করেই বীরদর্পে বলেন, এরকম হবে এ তো জানা কথা! আরো বেশী কিছু যে হয়নি, এই পরম ভাগ্যি! শনি অমাবস্যে দুদুটো ধাক্কা। হুঁঃ। চিরকেলে কথা, গুরুজনের কথা না শোনো কানে, কানটি যাবে হ্যাঁচকা টানে। তা শুনলে না যখন, তখন রেহাই পাবে?

মেজকা তাড়াতাড়ি বলেন, আহা! ওকথাই বা বলছো কেন বড়জ্যেঠি? ব্যাপারটা স্রেফ্ কাকতালীয়ই তো ভাবতে পারো।

তোরা ভাবগে যা! আমার আর নতুন করে ভাবাভাবির বয়েস নেই।

মেজকা আবার তাঁর প্রাণের ভাইপোটির দিকে তাকান। তোর দুচোখে যে ব্রহ্মতেজের আগুন জ্বলে উঠেছে, 'সেকাল' হলে সে আগুনে ওই কাঠ-ঠকঠকে চেহারা শুকনো বুড়িটি স্রেফ ভস্ম হয়ে যেতো! তো কালটা সেকাল নয়, এই রক্ষে।

মেজকা তবু সেই আগুনে জল ঢালবার চেষ্টায় নরম সুরে বলেন, আচ্ছা বড়জ্যেঠি, বলছো বটে। কিন্তু শহরের রাস্তায় এই যে রাতদিন ভয়ংকর ভয়ংকর সব অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, তাহলে সবই তোমার ওই শনি মংগলে অশ্লেষা অমাবস্যেয় কেনা গাড়ি?

এবার জ্বলন্ত দৃষ্টি বড়জ্যেঠির। কুতর্ক করতে আসিসনে ঘটাই। কে কী করেছে, তার হিসেব তুই রাখিস? না আমি রাখি? এই যে নৌকোডুবি হয়ে একগাদা লোক 'জলসই' হয়, তারা সব্বাই একই অপয়া সময়ে নৌকোয় ওঠে কিনা? তর্ক করে এই বড়জ্যেঠিকে হারাতে পারবি এ আশা রাখিস না! হাতে হাতে ফুফল দেখলি, তবু একবগ্গামি! যাকগে, না মানলি তো আমার বড় বয়েই গেল!

লেটুসের হঠাৎ রাগের চোটে গায়ের জোর বেড়ে যায়। হঠাৎ খাট থেকে লাফিয়ে নেমে এসে রেগে রেগে বলে, করবোই তো! তোমার ওই যত্তোসব কুসংস্কার মানবো না কী? মেজকা যা বলেছেন সেটাই ঠিক। ওই লেগে যাওয়াটা স্রেফ ওই তালীয় কাক না কি যেন তাই। দ্যাখো না। প্লাস্টার খোলা মাত্রই আবার চড়ি কিনা।

লেটুসের এই বীরমূর্তির সামনেও ঘাবড়ে না গিয়ে বট্ঠাকুমা নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলেন, চড়লেই ভালো। আবার আছাড় খেয়ে না পড়লেই মংগল। হাতপায়ের হাড়গোড়গুলো আর গাড়িখানা আস্ত থাকলেই হলো! তবে আমার মতে ওই শনি অমাবস্যের কেনা গাড়িখানাকে বিদেয় করে, দিনক্ষণ বার তিথি দেখে আর একখানা নতুন গাড়ি কেনাই উচিত। প্রাণে যখন এতো শখ। আর কাকারও যখন টাকার মা-বাপ নেই!

শুনে শুনে লেটুস কেন, বাড়িসুদ্ধ সবাই 'থ'। 'হাঁ'।

ওই আনকোরা ঝকঝকে নতুন গাড়িখানা বিদেয় করে দিয়ে আবার আর একখানা কেনা?

ঘটাই হাঁ বুজে বললো, বিদেয় করা মানে?

বিদেয় করা মানেও জানিস না? বলি 'সেকেন্ডো হ্যান্ডে' নাকি করে বেচে দেওয়া যায় না? আর তা যদি না হয়, খদ্দের না জোটে, দান-খয়রাৎ করে দে। আমার এই সাফ কথা।

ঘটাইয়ের তো মাথায় হাত!

লেটুসের গোড়ালি মচকালো, কব্জির হাড় সরে গেছে, তবু উচ্চিংড়ের মতো লাফাচ্ছে। .....তো জ্যেঠু শুনে বললেন, ছেড়ে দেনা ও কথা!.....বলে, 'আকালে কী না খায়, আর পাগলে কী না কয়।' তুই হাতখানা সারিয়ে ফেল চটপট।

মা বললো, পা-টাও। গোড়ালি মচকানো সহজ জিনিস নয়, ভোগায়।

লেটুসের মনে হয় মা যেন সবসময় তার বিরোধী পক্ষ। কোথায় 'সিম্প্যাথি' ভাব আসবে, তা নয়, কেবল দমিয়ে দেওয়া কথা! তা হলে 'মা' হয়ে তুমি বিশেষ আর কী হলে? এ তো বট্ঠাকুমারই জেরক্স কপি।

যাকগে, দিন কী আর আসবে না?

লেটুসের এই অ্যাক্সিডেন্টে বাড়িতে বাড়তি বেশ খানিকটা খরচ বেড়ে গেছে সিঙাড়া কচুরি সন্দেশ রসগোল্লা ডালমুট বিস্কুট বাবদ। কারণ আত্মীয়জনেরা তো আসছেই, তাছাড়া লেটুসের বন্ধুরাও আসছে হরদম।

আহা, বেচারী বাড়িতে পড়ে আছে, আড্ডা দিতে যেতে পারছে না! জগতে 'বন্ধু' বলে একটা জিনিস আছে বলেই মানুষ পৃথিবীতে টিঁকে থাকতে পারছে। এটাই লেটুসের ধারণা।

আজ প্রাণের বন্ধু অরিন্দম এলো। মানে লেটুসের পড়ার দিন থেকে ক'দিনই এসেছে, আজ হয়তো চতুর্থ বা পঞ্চম।

চানাচুর আর ঝুরিভাজার সংগে সংগে গল্প করতে করতে, মানে দুটোই তো মুখ চালানো, লেটুস হঠাৎ বলে ওঠে, এই অরিন্দম, গাড়িটা পড়ে পড়ে জং ধরে যাচ্ছে, তুই আজ একটু চালিয়ে চাংগা করে দিবি ওকে?

ওরে বাবা। এ যে মেঘ না চাইতেই জল। বিনা চেষ্টায় হাতে স্বর্গ!

সত্যি বলতে–লেটুসদের বাড়িতে ঢোকামাত্রই সিঁড়ির তলায় প্লাস্টিক সিট চাপা দেওয়া 'মোপেড'খানাকে নিথর হয়ে পড়ে থাকতে দেখে হাত নিশপিশ করে অরিন্দমের। 'জং ধরা' কথাটা লেটুসের কাছে পাড়বার জন্যে মন উসখুস করে, কিন্তু চক্ষুলজ্জা বলে একটা কথা তো আছে? কী বলে বসবে লেটুস, তোর সংগে সংগে তোর গাড়িখানাও পড়ে থেকে জং ধরছে, আমি কী একটু চালিয়ে আসবো?

সেটা তো সোজা বাংলায় দাঁড়ায়, তুই হাতখানা গলায় ঝুলিয়ে বসে আছিস। কী মজা! আমি তোর গাড়িটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ি।

কিন্তু এ প্রস্তাব স্বয়ং লেটুসের দিক থেকেই! চক্ষুলজ্জার প্রশ্ন নেই। তবু অরিন্দম মুখটাকে যথাসম্ভব কাঁচমাচু করে বলে, তুই চড়তে পারছিস না, আর আমি মজা করে তোর নতুন গাড়িটা চেপে–

আহা, এ তো তোর 'মজার' জন্যে নয়, তোর খুব খারাপই লাগবে সে তো বুঝতেই পারছি। এ শুধু আমার আর গাড়িটার ভালোর জন্যেই। .....মানে গাড়িটা জং ধরে গেলে, হয়তো আমি যখন চড়তে যাবো, বেগড়বাঁই করবে! তুই মাঝে মাঝে যদি–

তবে আর কী করবে বেচারী অরিন্দম?

বন্ধুর উপকার করবে না?

তবু যতোটা সম্ভব মলিন মলিন মুখে বলে, দেখুন মেজকা লেটুসের কান্ড! বলে কিনা–'গাড়িটা জং ধরে যাচ্ছে তুই চড়ে

বেড়া।'

মেজকা অর্থাৎ ঘটাই মহোৎসাহে বলেন, ঠিক তো। ঠিক তো। বুদ্ধিমানের কথাই তো বলেছে লেটুস! আমারও তো গাড়িটাকে দেখলেই মনটা 'হু হু' করে ওঠে। নিজে পারলে চড়ে চড়ে চালু রাখতাম।

অরিন্দম অবলীলায় বলে, পারা আর কী শক্ত। একবার চেপে বসে হ্যান্ডেলটা দু-হাতে চেপে ধরে জোর একটা ঝাঁকুনি

অরিন্দম তার প্রাণের মোপেডখানায়

দিয়ে প্যাডেল করলেই—দেখুন না চেষ্টা করে।

না বাবা! বুড়ো বয়েসে আর হাড় ভেঙে লোক হাসাতে চাই না। তুমিই বরং—

তবে আর কী করা? যতই মন খারাপ লাগুক, বন্ধু বলে কথা! তার উপকার করবে না?

গলায় হাত-ঝোলানো লেটুস খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বারান্দায় গিয়ে দেখে, অরিন্দম তার প্রাণের মোপেডখানায় চেপে ঝমাঝম করতে করতে শোঁ করে বেরিয়ে যায়। বুকটা খালি খালি লাগে। তবু যা হোক বন্ধুটাও তো প্রাণের। তা ছাড়া লেটুসেরও তো প্লাস্টার খোলার দিন এগিয়ে আসছে। গাড়িটা সড়গড় থাকবে!

তা রোজই নিজের শতকর্ম ফেলেও অরিন্দম বন্ধুর উপকার করতে ছুটে আসে একবার করে।

ও চলে গেলে, মেজকা গাড়িখানাকে ঝেড়েমুছে আবার প্লাস্টিক চাপা দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখেন।.....

লেটুস রোজই আঙুল তুলে তুলে বলে, কী বটঠাকুমা, কী হলো? তোমার শনিভরা অমাবস্যে নাকি, তার কী হলো? দেখতে পাচ্ছো, ও কেমন ড্যাংডেঙিয়ে রোজ ওটাতে চেপে বেড়িয়ে আসছে। হাড়গোড় ভাঙছে?

বটঠাকুমা অনমনীয়ভাবে বলেন, ও তো পরের জিনিস! ওর গায়ে 'দোষ' লাগবে কেন? 'পরের পয়সায় বিষ খেলেও মৃত্যু হয় না' তা জানিস না? ডালরুটিখোরদের যদি জিগ্যেস করিস, 'তুমি কতোটা ডালরুটি খেতে পারো?' তো সে উল্টে জিগ্যেস করবে, 'আপকা না পরকা?'.....আপকা হোগাতো 'আধাসের গোহুমকা রোটি আউর পাওভর ডহর ডাল! ওর বেশী হলেই না কি তার 'পেট দুখায়'। কিন্তু 'পরকা' হোগা? তো ঢাড়াই সের ডহর ডাল আউর সাড়ে তিন সের কা রোটি'! তাতে পেটফেটে কিছু 'দুখায় না'। তবেই বোঝ, আপকা আর পরকায় তফাৎটি!

তবে বাড়ির কেউই 'বটঠাকুমার' এই থিয়োরিটি গ্রহণযোগ্য মনে করে না। সকলেই বলে, গাড়িখানা 'মারকাটারি' দেখো না ওই ছেলেটা কী ভাবে বোঁ করে বেরিয়ে যায়!

ফিরে এসে অরিন্দম রোজই বলে, ইস! যদি তোর মতো একখানা খলিফা মেজকা থাকতো রে সক্কলের!

শৌনক আর লাটিমের ওই একই মত। মানে লেটুসের সমবয়সী মামাতো আর মাস্তুতো ভাই। সহপাঠী, কাজেই বন্ধুও। তারাও আসেই প্রায় প্রায়।.....আর তারা এলে কিছু আর শুধু সিঙাড়া নিমকি সন্দেশ রসগোল্লা দিয়েই কাজ সারা হয় না! তাদের জন্যে লুচিভাজা হয়, আলুভাজা হয়, রাতের জন্যে রান্না করে রাখা মাছের তরকারি, মুরগির মাংস ফ্রীজ থেকে বার করে গরম করা হয়।

তা হবে না? বাড়িটা তো শুধুই বন্ধুর বাড়ি নয়।

মাসির বাড়ি আর পিসির বাড়ি বলে কথা!

তা এইভাবেই সুখে দুঃখে তিন সপ্তাহ কেটে গেল লেটুসের!

প্লাস্টার কাটা হলো।

আর যে কথা সেই কাজ!

পরদিনই লেটুস তার প্রাণের মোপেডে চেপে বসলো!

আহা। কী সুখ! কী আনন্দ!

ঝনাৎ করে একবার উঠে পড়ে চেপে বসে দু-হাতে হ্যান্ডেলটা বাগিয়ে ধরে জোর একখানা ঝাঁকুনি মেরে প্যাডেল করে ঝমাঝম এগিয়ে যাওয়া।.....

দেখুক! দেখুক সবাই।

এ হাতটা একটু ন্যাংপেতে লাগছে?

ও কিছু না। অনেকদিন আলো হাওয়া লাগেনি তো।

এই গোড়ালিটা একটু খুচখুচ করছে?

ও কিছু না। অনেকদিন হাঁটা হয়নি তো?

তবে এবারে সাবধান হয়েছে লেটুস। ন্যাতাজোবড়া সাজে আর নয়। স্রেফ হাফপ্যান্ট আর স্যান্ডো গেঞ্জি। হাফপ্যান্ট তো এখনো চলছে। ঠিক করেছে কলেজে উঠলে ওটা বাতিল

করে ফেলবে।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে একবার দেখে নিলো। বাঃ। কী স্মার্ট দেখাচ্ছে!.....ব্যাস, একবার মোপেডে চেপে চক্কর মেরে এসে বট্ঠাকুমার চোখ ট্যারা করে দেবে।.....

মা বললো, আজ না বেরোলেই হতো। আর দুটো দিন সবুর করা যেতো না?

অসহ্য। যে ছেলেটা নতুন গাড়িখানা ছুঁতে না ছুঁতে বাইশ দিন ধরে হতাশ নিঃশ্বাস ফেলে ফেলে সবুর করলো, তাকেও এই কথা বলতে ইচ্ছে করলো? তো মা না হয় বরাবরই ওইরকম লেটুসের বিরোধী পক্ষের মতো, কিন্তু বাবা? যিনি বড় একটা সাতে-পাঁচে থাকেন না, তিনিও কিনা ঠিক যাত্রাকালে বলে উঠলেন, কাজটা কী ঠিক করছিস লেটুস! আর দুদিন পরে হলে ভালো হতো না?

এমন কি কাজের মেয়ে মলিনাদি, সেও কিনা বলে উঠলো, ওমা। দাদাবাবু! তোমার কী সাহস গো? এক্ষুণি ওই দোতিদানো গাড়িখানায় চেপে বসছো?

আর জ্যেঠু? তিনি তো নেতিবাচক কথাই বলবেন। গোড়াতেই যখন বলেছিলেন, 'শখটা বিপজ্জনক'।

শুধু মেজকাই বলেছিলেন, বুঝছি,আজই চড়তে যাওয়া ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু বেচারীর মনের অবস্থাটা বুঝতে হবে তো? ইয়া একখানা মন্ডা হাতে পেয়ে কামড় বসাতে যাবার সংগে সংগেই যদি সেটা হাত থেকে পড়ে যায়, তার মনের অবস্থাটি কেমন হয় ভাবো? .....বেশীদূর যাসনে বাবা। একটা চক্কর মেরেই ফিরে আয়।

তাই করেছিল লেটুস। একটু চক্কর মেরেই চলে এসেছিল। কিন্তু অতোগুলো প্রবল বিরুদ্ধ শক্তির কাছে আধখানা মাত্র সমর্থন আর কতোটুকু কী করতে পারে? ফলে যা হবার তাই হলো।

বাড়ির কাছ বরাবর এসে হঠাৎ রাস্তায় পড়ে থাকা একখানা ভাঙা ইঁটের গায়ে ঠোক্কর খেয়ে টাল-খাওয়া মতো হলো, সারা শরীরে ঝাঁকুনি লাগলো, আর ডান হাতের কব্জিটা বেশী ন্যাংপেতিয়ে গেল, এবং বাঁ পায়ের গোড়ালির শিরাটা সিঁটকে টেনে ধরলো।

তারপর আর কী? দুইয়ে দুইয়ে চার।

আবার একখানা আছাড়!

হয়তো তেমন কিছু না। নিজেই যখন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়লো।

কিন্তু তাতে কী?

সেই বৃদ্ধা ছাড়বেন?

তিনি বলে উঠবেন না, ঘটাই! তবু ওই অপয়া জঞ্জালটাকে বিদেয় করবি না?

কিন্তু কী মুশকিল। জিনিসটাকে 'অপয়া' বলার কোনো মানে হয়? আনাড়ি হয়ে দুম করে চালাতে যাওয়াটা গাড়ির দোষ নয়। আর কব্জির হাড়টা আর একটু শক্ত না হতেই আবার চড়াটাও গাড়ির দোষ নয়। নিজেদেরই ভুল। নাচতে না জেনে উঠোনকে বাঁকা বলা আর কী। ডাক্তারেরই বারণ করে দেওয়া উচিত ছিল। ওই তো ওর বন্ধু রোজ চালালো–

সে উত্তর আগেই দিয়েছি ঘটাই। পরের পয়সায় বিষ খেলে, বিষ লাগে না। মৃত্যু হয় না। তো আমার ছোটবেলায় দেখা আমাদের গ্রামের সেই নীলা পাথরের আংটির গল্প করিনি তোদের কাছে?

হ্যাঁ হ্যাঁ, করেছিলে! একশো বার দুশো বার! সেই তো একজন জমিদারবাবু কার কাছে শুনেছিলেন নীলার আংটি পরলে আরো বাড়বাড়ন্ত হয়, তাই অনেক টাকা দিয়ে একটা নীলার আংটি করিয়ে পরেছিলেন। আর তারপরই নাকি তাঁর জমিদারী-টারী লাটে উঠে গেল আর বানের জলে কাছারিবাড়ি ভেসে গিয়ে সর্বস্বান্ত হলেন। তাই রাগ করে আংটিটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। আর সেটা কে একটা হাড়-গরীব লোক কুড়িয়ে পেয়ে মনের আনন্দে পরে বেড়াতে বেড়াতে, হঠাৎ করে হু-হু করে তার ভাগ্য ফিরে গেল। সেই গপ্পো তো?

ও। সেটা তোদের কাছে গপ্পো? আসলে লক্ষ্য করলি না নিজের পয়সা আর পরের পয়সার গুণের তফাৎ! নীলা হলো গিয়ে শনিঠাকুরের পাথর–আর তোদের গাড়িটাও ওই শনিবারের দোষে দুষী।

আঃ। বড়জ্যেঠি। আবার তোমার সেই কুসংস্কারের কথা। আসলে সবই কাকতালীয়। এ যুগে আবার কেউ ওই সব কুসংস্কারে বিশ্বাসী হয় না কী? চালাতে না শিখে চালাতে গেছে, আছাড় খেয়েছে, এ তো একটা সরল অংক। বেশ বাবা। তোমার যখন এতোই খুঁতখুঁতুনি, পাঁজীপুঁথি দ্যাখো। আমি আর একখানা নতুনই কিনে দেবো। ওটা না হয় কম দামে আধাদামে ছেড়ে দেওয়া যাবে।.....এই তো ওই অরিন্দমই তো বলছিল, ওর দাদা বলেছে, তোর এতো শখ, কেবলই আমারটা নিয়ে টানিস, তোর নিজের একখানা হলে ভালো হয়। কিন্তু নতুন-টতুন তো এক্ষুণি আমার পক্ষে কিনে দেওয়া শক্ত। চেষ্টা দেখি যদি একখানা ভালো কনডিশানের সেকেন্ড হ্যান্ড যোগাড় করতে পারি। .....তো এর থেকে ভালো কনডিশান আর কী হবে? আনকোরাই। ওকেই দেবো। অর্ধেক দামেই ছেড়ে দেবো। ওকে বলে দেবো বড়জ্যেঠির প্রেজুডিশের কথা।

লেটুসের প্রাণের বন্ধু অরিন্দম!

তারও লেটুসের ওই আবার আছাড় খাওয়ার ফলে নিজের ভাগ্য খুলে যাওয়ায়, এ কান থেকে ও কান পর্যন্ত হাসি ছড়িয়ে গেল। মনে হলো, একই সংগে হাতে চাঁদ সূয্যি স্বর্গ সব পেয়ে যাচ্ছে।

এতো কমে?

তার দাদাও ড্যাম গ্ল্যাড্। যা যা, এক্ষুণি নিয়ে ফেলগে যা।

কিন্তু তারপর? তারপর যে কী ঘটলো ভগবান জানেন।

পরদিন এসে ছেলেটা মলিন মলিন মুখে বললো, থাকগে মেজকা। ও আপনি আর কাউকেই বরং–

সে কী? কেন? কী হলো? আরে বাবা, বলেছিতো দামের জন্যে তাড়া নেই, যখন হোক সুবিধেমতো–

নাঃ। তার জন্যে নয়!

তা হলে? ব্যাপারটা কী?

অরিন্দম দুঃখ উত্তেজিত গলায় বলে ওঠে, আর বলবেন না। মার অদ্ভুত প্রেজুডিশ! মার মতে গাড়িখানা নাকি 'অপয়া'।

অ্যাঁ? বলো কী? তোমার মা? তাঁরও বড়জ্যেঠির মতো?

অবাক হতেই পারেন মেজকা। দেখেছেন অরিন্দমের মাকে। বেশ স্মার্ট টিপটপ মহিলা। কোনো এক স্কুলের কিসের যেন টিচার।

অরিন্দম মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, ওই তো। যতই বলি চালাতে না শিখে সর্দারি করতে গেলে আছাড় তো খাবেই! কে শোনে

সে কথা? সেই এক জেদ, দরকার কী বাপু রিস্ক নিয়ে? জগতে কী আর গাড়ি নেই?

রেগেমেগে চেঁচান ঘটাই, আমাদের এই বাঙালি মেয়েদের যে কী ভীষণ কুসংস্কার!

লেটুসের মা বলে ওঠেন, ইস! একেবারে বাঙালি মেয়ে তুলে মন্তব্য। 'শহুরি একগাড়ি'। টাকার কথাটি বাদ দিয়ে ঘোষণা করো দিকি, 'বিনামূল্যে বিতরণ'! দেখবে দরজায় ভিড় জমে যাবে। আসলে টাকার ব্যাপারটাই ঘুরিয়ে বলেছে।

ঠিক আছে, কাগজে ঘোষণার আগে বাড়ির লোককেই বলো না? লেটুসের আর দুটো বন্ধুও তো রয়েছে বৌদি, তোমারই ভাইপো আর বোনপো।

হ্যাঁ, আছে বটে, শৌনক আর লাটিম!

কিন্তু? তারপর?

হ্যাঁ, বিরাট এক 'কিন্তু'। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি।

তাদের মায়েদেরও অর্থাৎ লেটুসের মামী আর মাসির ওই একই মতবাদ।

যে জিনিসটাকে 'অপয়া' বলে বাতিল করা হচ্ছে, সেটাকে আমার ছেলের ঘাড়ে চাপাতে আসা কেন বাপু? .....শনিফনি হ্যানোত্যানো ওইসব পচামার্কা কুসংস্কার অবশ্য বিশ্বাস করি না, তবু দরকার কী বাবা? কাজ নেই অমন উপহারে।

ঠিক আছে, ওই 'অপয়া'টা থাক পড়ে সিঁড়ির তলায়, ঘটাই তাঁর প্রাণতুল্য ভাইপোর মুখের হাসি আর প্রাণের আনন্দ ফুটিয়ে তুলতে আবার একখানা আনছেন কিনে।

কিন্তু সেখানেও এক মস্ত প্রতিরোধের পাঁচিল।

খবর তো বড়জ্যেঠির কাছে চাপা থাকে না? বাতাসে গন্ধ পান তিনি খবরের।

অতএব—দ্যাখ ঘটাই, ওই জঞ্জালটা বাড়িতে থাকতে থাকতে আবার একখানা টাটকা নতুন এনে বাড়িতে ঢোকাসনি।

কেন? তাতে আবার কী হয়েছে?

কী হয়েছে তোকে বোঝাতে আমার সময় নেই। বলি ছোঁয়াচ বলে একটা জিনিস আছে মানিস তো? নাকি তাও মানিস না?

তর্ক-বিতর্ক। শেষ পর্যন্ত যা হয় তর্কে হার। বড়জ্যেঠির দর্পিত উক্তি, যা খুশী করগে যা। তবে পরে পস্তালে 'ভাগ্যকে' দূষতে যাসনি। বুঝবি 'কৃতকর্মের' ফল।

শেষ পর্যন্ত?

হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত সেই আনকোরা নতুন মোপেডটাকে মেজকা রেগেমেগে বৈঠকখানা বাজারে নিয়ে গিয়ে ভাঙা লোহার দরে বেচে দিয়ে এলেন।

দেবেন না কী করবেন? কতোদিন আর ছোঁয়াচে রোগগ্রস্ত জিনিসটাকে বাড়িতে পুষে রেখে আবহাওয়া দূষিত করবেন?

লেটুসদের এই ফ্ল্যাটবাড়ির আশেপাশে বি ব্লক আর সি ব্লক। লেটুসের সহপাঠী আরো দু-তিনজন বন্ধু ছিল, তাদের দাদা কাকাও ছিল, সবাই অবাঙালি। তাই তাদের কাছে অফার করেছিলেন মেজকা, 'হাফ প্রাইসে' একটা নতুন মোপেড কিনতে চাও?

অ্যাঁ? তাই না কী? শুনি শুনি কী ব্যাপার?

হাফ প্রাইস!

এ তো দারুণ ঘটনা।

কিন্তু তারপর?

ঘটনাটি আর ঘটতে পেলো না। কারণ ইতিমধ্যে তিন তিনটে 'ব্লক'-এই রটনা হয়ে গেছে নতুন গাড়িটাকে আধাকড়িতে বেচে দেওয়ার চেষ্টার কারণটি!

তবে?

কে নেবে বাবা ওই ভূতুড়ে জিনিস?

কার হাত-পা হাড়গোড় এতো সস্তা?

মিসেস গুজরাল বলেছে, 'কেনো? নিউ মালটা হাফ প্রাইসে ছেড়ে দিবেন কেনো? কুছ গলতি তো হ্যায়ই? তব?'

মিস্টার ভাটিয়া বলেছেন, 'হামি তো 'ভূত' আউর 'অমংগল' বলে কুছ বিশোয়াস করি না, লেকিন হামার মিসেস ভি উসব জরুর বিশোয়াস করেন।'

আর মিস্টার আগরওয়াল তাঁর সবে কলেজে ওঠা যে মেয়ের জন্যে ওই মোপেডটা কিনতে আগ্রহী হচ্ছিলেন (সস্তায় পাচ্ছিলেন বলেই) তাঁর সেই মেয়েই না কী ওইরকম একটা গোলমেলে জিনিসের মালিক হতে রাজী হয়নি। সে বলেছে, সে অনেক গল্পের বইতে পড়েছে, বাড়ি-গাড়ি বা কোনো পুরনো কালের দামী গহনা ইত্যাদির মধ্যে 'প্রেতাত্মা' বাসা করতে পারে এবং অনিষ্টসাধন করতে পারে। অতএব—ও গাড়ি তার জন্যে কেনা চলবে না। গাড়ির হিস্ট্রিটা যখন জানাই হয়ে গেছে।

এরপর আর কী করবার থাকে? 'প্রেতাত্মা' ভর-করা সেই গাড়িটাকে ভাঙা লোহার দরে বিক্রী করে দেওয়া ছাড়া?

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে খদ্দের জোটানো যেতো না?

তা হয়তো যেতো। কিন্তু ঘটাই ক্রমশ রেগে ঘটোৎকচতুল্য হয়ে উঠছিলেন।

তবে তিনি অতঃপর বাড়িতে ঘোষণা করে বলে উঠেছেন, এরপর থেকে আর বড়জ্যেঠিকে কেউ 'যত্তোসব' বলতে পাবে না। দেখা যাচ্ছে বাঙালি অবাঙালি বুড়ি না-বুড়ি সব মেয়েই এক একটি বড়জ্যেঠি। অর্থাৎ 'যত্তোসব'।

ছবি: বিজন কর্মকার

ছবি: সুফি

# সোনা চোর

চিত্রকাহিনী • সুফি

তুমি যাদের নাম বলছো, আমি তাদের কাউকে চিনিনা। এটা দেখ, এই নেট দিয়ে আমি প্রজাপতি ধরি।
!
কিছু মনে করোনা, আমার ভুল হয়ে গেছে।
আমি, শর্মা আর নাইডু তিনজন সোনার চোরাচালানকারি। ওরা এক বাক্স সোনার বিস্কুট আমাকে না দিয়ে ঠকিয়ে নেবে ভেবেছিল।
আমি তাই সব সোনা নিয়ে পালিয়ে এসেছি।
ওরা আমার পিছু নিয়েছে, ধরতে পারলে আমাকে খুন করবে। ওরা এখানে পৌঁছোনোর আগে আমি এ বন থেকে পালিয়ে যেতে চাই।
আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে দেবো।
তাড়াতাড়ি কর।
একটু দাঁড়াও, আমাকে ধরতে পারলেও ওরা যাতে সোনাগুলো হাতে না পায় তার ব্যবস্থা করছি।
তুমি মোটেই ভাল লোক নও। এসব চুরি জোচ্চুরি ছেড়ে দাও।
কথা দিচ্ছি, তাই করবো।
বন থেকে বেরুবার একটা সহজ পথ আছে, ওখান থেকে তাড়াতাড়ি শহরে পালাতে পারবে।

এমন সময়..
পালাবার পথ তোমার বন্ধ! বেইমান, সোনা ভর্তি ব্রীফকেসটা আমার হাতে দাও
পালাতে হবে।
চকিতে ওদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো ডাকু।
গেছি!
ওফ্‌স!
তারপর গভীর বনে লুকিয়ে পড়লো।
যেভাবেই হোক লোকটাকে বাঁচাতে হবে!
চুপচাপ হাত তুলে এগিয়ে চল, তোমার বেইমানির শাস্তি হবে মৃত্যু।
আমরা বোধহয় নদীর কাছাকাছি এসে গেছি। এখানেই তো স্পীড বোট থাকার কথা
ওই তো রয়েছে।
এবার লক্ষ্মী ছেলের মত বোটে উঠে পড়।

এদিকে··
ওইতো ওরা সবাই স্পীডবোটে উঠেছে। লোকটাকে উদ্ধার করতে পারবো, মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে!
সর্বনাশ, বোমা ফাটতে আর মাত্র দু'মিনিট বাকি; তার আগে পালাবো কী করে!
এবার এ ব্যাটাকে গুলি করে নদীর জলে ফেলে দাও।
এদিকে চুপি চুপি ডাকু সাঁতার কেটে এগিয়ে গেল বোটের কাছে। তারপর··
এ কি!
জলে লাফিয়ে পড় শীগগির।
ডাকু ব্রীফকেসটা টেনে নামিয়ে নিল।
আরে তাড়াতাড়ি ব্রীফকেসটা আমার হাতে দাও, ওটার মধ্যে টাইম বোমা লুকনো আছে, কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ফাটবে।
হুররে, সোনাগুলো ফেরত দিয়েছে!
লোকটা ব্রীফকেসটা বোটের দিকে ছুঁড়ে দিল।
পরমুহূর্তে টাইম বোমার বিস্ফোরণ ঘটলো!
বু·উ·উ·ম
পরে··
নিজেদের পাপের জন্যই ওরা মরলো। আমিও এবার ভালভাবে বাঁচার চেষ্টা করবো। তোমাকে অনেক ধন্যবাদ।

# কি খাব, কি খাব না

তুষার শীল

খাবার জন্য বাঁচা, না-বাঁচার জন্য খাওয়া, এ কথাটা প্রায়ই অনেককে বলতে শুনি। আজ সারা বিশ্বে খাদ্যের উপর নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। শুধু মাত্র চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় আহার করলে চলবে না। এমন খাবার খেতে হবে যা খেয়ে আমরা সুস্থ সবল থাকতে পারি এবং নিজেদের শরীর ও মন গঠন করতে পারি, অর্থাৎ বাঁচার জনাই খাওয়া।

পুজোর সময়ে মা দুর্গা ছেলেমেয়েদের নিয়ে মর্ত্যে আসছেন আর আমরাও সেই উৎসবে তাল দিয়ে মেতে উঠব আনন্দে। সেই সংগে শুরু হবে খাওয়া-দাওয়া। পুজোর সময় খাওয়া-দাওয়া কিন্তু সাবধানে করো, বিশেষ করে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে বাইরের খাবার একদম খেয়ো না। হঠাৎ গজিয়ে ওঠা দোকানগুলো যতই তোমাদের প্রলোভন দেখাক, মনের জোরে তোমরা তা সংবরণ কোরো। কারণ কি জান, এদের থালা-বাটি চামচগুলো সবসময় পরিষ্কার থাকে না। তাই একের রোগ অপরের শরীরে যাওয়ার সুযোগ ষোল আনা থাকে।

এবার আমাদের প্রয়োজনীয় খাদ্যের কথায় আসি। কেননা শুধু শরীর চর্চা আর খেলাধূলা করলেই চলবে না। খাদ্য সম্বন্ধেও আমাদের সচেতন হতে হবে। শরীর গঠন করতে চাই সুষম খাদ্য। সুষম খাদ্যের কাজ শরীরকে সুস্থ সবল রাখা ও শরীরের গঠন ও বৃদ্ধিতে সাহায্য করা।

তবে খাদ্য নিয়ে আলোচনার আগে যে প্রধান বিষয় নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন তা হলো জল। আমাদের শরীরের ওজনের প্রায় ৭০ শতাংশই জলীয়। সুতরাং সারাদিন কম করে ৮–১০ গ্লাশ বা তার বেশি জল খাবার চেষ্টা করবে। তবে খেয়াল রেখো জল যেন অবশ্যই বিশুদ্ধ হয়। যারা পেটের অসুখে ভুগছো তারা জল ফুটিয়ে, ঠান্ডা করে খাবে।

মানুষের খাদ্যের প্রধান অংশ হলো শর্করা বা কার্বোহাইড্রেট, যা মানবদেহের শক্তির প্রধানতম উৎস। শর্করা সহজপাচ্যও বটে। এই শর্করা মিলবে–চাল, ডাল, গুড়, বিভিন্ন মিষ্টি, গম ইত্যাদি থেকে। এবার ফ্যাট বা স্নেহ জাতীয় পদার্থের কথায় আসি। ঘি, মাখন, চর্বি, বিভিন্ন তেল ইত্যাদিতে পাওয়া যায় ফ্যাট বা স্নেহ পদার্থ। এ ছাড়াও স্নেহ পদার্থ আমরা পাই বিভিন্ন উদ্ভিদ ও চর্বিযুক্ত প্রাণীর মাংস খাদ্য হিসাবে খেয়ে। একটা কথা মনে রেখো তোমাদের মধ্যে যারা অতিরিক্ত মোটা তারা এই জাতীয় খাবার থেকে একটু দূরে থাকবে। আর যারা লিভারের অসুখে ভুগছো তারা বেশি ভাজা-ভুজি, তেল, ঘি বা চর্বি জাতীয় খাবার কম খাবে। ভাজা-ভুজি খেলে অনেকক্ষণ পেট ভরে থাকে কেন বল তো? এই ধরনের খাবার খুব ধীরে ধীরে হজম হয়।

এবার আসছি প্রোটিনের কথায়। দেহবৃদ্ধি ও গঠনে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। তোমাদের বয়সী ছেলেমেয়েদের শরীরের ক্ষয়পূরণে ও বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে এর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। আমাদের দেহের দাঁত, হাড়, পেশী, চুল, নখ, রক্তকণিকা ইত্যাদি সবই প্রোটিন দিয়ে গঠিত। তোমরা যারা মাছ, মাংস, ডিম, দুধ পাও তারা খাবে, কেননা এসবে আছে প্রাণীজ প্রোটিন। যাদের পক্ষে এগুলো ব্যয়সাপেক্ষ তারা এসব না খেয়ে ডাল, ছোলা, বাদাম, সোয়াবীন ইত্যাদি খাবে। বিজ্ঞানীরা বলেন দৈনিক গড়ে ৬৫–১০০ গ্রাম প্রোটিনের দরকার হয় প্রত্যেকের। তবে যারা শরীরচর্চা ও খেলাধূলা করে তাদের প্রয়োজনটা আরেকটু বেশি। আমাদের শরীরের পক্ষে অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির মধ্যে আছে লবণ, ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ। লবণ আমরা রোজই খাদ্যের সংগে পেয়ে থাকি। আর ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ পাই কাঁচা ও রান্না করা শাকসব্জী থেকে।

আমরা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে থাকি। তাই আমাদের খাবার হবে সহজপাচ্য। রান্না করা শাকসব্জী ছাড়াও কিছুটা কাঁচা শাকসব্জী দরকার। যেমন লেটুস পাতা, শশা, পেঁয়াজ, মুলো, বীট, গাজর, টমেটো, ধনেপাতা, পুদিনা পাতা প্রভৃতি।

মরসুমী ফল যখন যা পাবে তাই খাবে। যেমন পেয়ারা, শাঁকালু, যে কোনো লেবু, জামরুল, আম, জাম, কলা ইত্যাদি। আপেল দামী ফল, তবে পেলে খেও, না খেলেও ক্ষতি নেই।

খাবার সময় খুব ধীরে ধীরে চিবিয়ে খাবে। হজমের প্রথম ধাপ হলো চিবানো, তা শুরু হয় মুখ থেকে। সম্পূর্ণ পেটভরে কখনও খাবে না। রাত্রে খাবার পর এক-দেড় ঘন্টা জেগে থাকবে। তাই খাওয়া-দাওয়া একটু আগে সেরে নেবে। দরকার হলে খাওয়ার পরে পড়তে বসবে। খেতে বসে বেশি জল না খাওয়াই ভাল। খাবার এক ঘন্টা পরে জল খাবে। বিশেষ করে যারা অম্ল রোগে ভুগছো।

যোগ গ্রন্থে বলা হয়েছে উপবাসের কথা। অনেকে সপ্তাহে একদিন উপবাস করতে বলেন। যদি সম্ভব না হয় অন্তত মাসে একদিন উপবাস করবে। উপবাসের সময় প্রচুর পরিমাণ জল খাবে। তবে তোমাদের বয়সের ছেলেমেয়েদের একবেলা করে উপবাস করলেই চলবে। উপবাসের সময় ডাবের জল, মিছরির জল, বার্লি, দইয়ের ঘোল, ফলের রস এই সব খেয়ো।

শেষে তোমাদের মতো ছেলেমেয়েদের জন্যে একটা খাদ্য তালিকা করে দিচ্ছি। যার পক্ষে যা সম্ভব এই থেকে বেছে নিও।

সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে এক গ্লাস জল খেও। যাদের সর্দিকাশির ধাত রয়েছে তারা জলটাকে ঈষদুষ্ণ করে নিও। পরে জলখাবারের সময় দুধ-চিঁড়ে-কলা বা ডিমের পোচ বা অর্ধ সিদ্ধ ডিম, সংগে দুটি হাতে গড়া রুটি কিংবা দুটি টোস্ট খেতে পারো। আর যাদের পক্ষে এগুলি খাওয়া সম্ভব নয়, তাদের একটি গরম আলুসিদ্ধ, দুটি রুটি আর একটু আখের গুড় খেলেই চলবে। দুপুরের খাবার খাবে বেলা ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে। ভাত, ডাল, একটু পেঁপে সিদ্ধ, যাদের প্রায়ই পেট খারাপ করে তারা কাঁচকলা সিদ্ধ। জুটলে পরে মাছ বা মাংস। ঘরে পাতা দই যদি পাও এর সংগে খেতে পারো। ডালটা একটু বেশি পরিমাণে নিও। বিকালে ছোলা, মুগ, চিনে-বাদাম ভিজিয়ে তাতে আদা-লবণ শশাকুচি টমেটো দিয়ে খেও। যাদের স্কুল থেকে ফিরে ভাত খাওয়া অভ্যাস রয়েছে তারা তাই খাবে। স্কুলের টিফিনের সময় বাড়ি থেকে সিদ্ধ করে নিয়ে যেও আলু, ট্যাঁড়স, বীট, গাজর ইত্যাদি। লবণ, গোলমরিচ, মাখন বা ঘি দিয়ে একটু নেড়ে দিতে বলো মাকে।

নয়তো এই সময় মুড়ি বাদাম খেতে পারো। বাড়ি থেকে রুটিও নিয়ে যেতে পারো। সব্জি বা গুড় দিয়ে খেয়ো। সন্ধ্যাবেলায় খেলাধূলা করে বা ব্যায়াম করে উঠে ক্ষিদে একটু পাবেই পাবে। তখন তোমরা যারা পাবে একটু দুধ খেও। যারা এটা পাবে না, সোয়াবিন সিদ্ধ করে খেও বা এর দুধ খেতে পারো। এটা কেমনভাবে করতে হয় জান–সোয়াবিনকে ভিজিয়ে বেটে নিলে দুধ পাবে। এটাকে ফুটিয়ে নিয়ে খাবে। এই দুধে গন্ধ লাগলে এতে তেজপাতা বা ছোট এলাচ ফেলে খেও। রাত্রে যার যা জুটবে তাই খেও। স্যালাডটা একটু খাবার চেষ্টা করবে। অর্থাৎ মাকে বলবে–শশা-বীট-গাজর কাঁচা অবস্থায় কুচিয়ে দিতে। এতে একটু লেটুস পাতা দিয়ে দেবে।

শেষে কথাটা আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি–অবশ্যই খাবার সময় মনে আনন্দ রেখো। এতে মনের এবং শরীরের শ্রী বৃদ্ধি হবে।

# এসো শিখি জাগলিং

অভয় মিত্র

শুকতারার ছোট ভাইবোনেরা, আজ তোমাদের একটা মজার খেলা শেখাব। তোমরা হয়তো বল লোফালুফির খেলা, ঘুরন্ত ডিশের খেলা, চরকির খেলা, ফিতে নাচনের খেলা, ছুরির খেলা, মশালের খেলা দেখেছো। এইসব খেলাগুলোকেই বলে জাগলিং। জাগলিং-এর প্রধান খেলা হলো বল লোফালুফি। তাই সেই খেলাটাই আজ তোমাদের শেখাব। তার জন্য লাগবে কয়েকটা ছোট রবারের বল।

এসো এবার খেলাটা শুরু করা যাক। প্রথমে, একটা বল ডান হাতের তালুতে ধর। এবার বলটা ওপরদিকে পনেরো ইঞ্চি থেকে বিশ ইঞ্চি উঁচুতে এমনভাবে ছুঁড়ে দাও যাতে বলটা তোমার ঐ ডানহাতের তালুতে এসে পড়ে। এই ভাবে কয়েক বার অভ্যাস করো। এরপর ঐ রকম আরেকটি বল বাঁ হাতের তালুতে ধরে আগের বারের মতো একই উচ্চতায় ছুঁড়তে থাকো একই ভাবে বাঁ হাতে।

এবার একটা বল নিয়ে আগের মতো একই উচ্চতায় ডান হাত থেকে বাঁ হাতে ছুঁড়ে দাও, তারপর বাঁ হাত থেকে ডান হাতে ছুঁড়ে দাও। এইভাবে বারবার লোফালুফি করতে থাক। প্রথম দিকে একটু অসুবিধা হবে তবে বারবার অভ্যাস করলে ঠিকই পারবে।

এবারে, এক হাতে দুটো বল কি ভাবে লোফালুফি করতে হয়–সেটা শেখা যাক। প্রথমে ডান হাতের তালুতে একটা বল আর তার ওপর দিয়ে আঙুলের দিকে আর একটা বল ধর। হাত চিৎ করে পনেরো থেকে কুড়ি ইঞ্চি উচ্চতায় আঙুলের দিকের বলটা ওপর দিকে ছুঁড়ে দাও। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে যে মুহূর্তে বলটা নিচের দিকে নামতে থাকবে, সেই মুহূর্তেই হাতের তালুর বলটা মালার আকারে আগের উচ্চতায় ছুঁড়ে দাও। এইভাবে বারবার বল দুটো লোফালুফি করতে থাকো। লক্ষ্য রাখবে যেন বল দুটোর মধ্যে ধাক্কা না লাগে। বাঁ দিক থেকে ডান দিকে বল দুটো মালার আকারে ঘুরে ঘুরে যাবে। প্রথম দিকে বলগুলো হয়তো মাটিতে পড়ে যাবে, তাতে হতাশ হয়ো না। বারবার অনুশীলন করলে খেলাটা তোমাদের আয়ত্তে এসে যাবে।

এবারে এসো, দুই হাতে তিনটে বল কিভাবে লোফালুফি করতে হয় সেটা শেখা যাক। ডান হাতে দুটো বল ধর, আগের মতো করে আর বাঁ হাতে একটা বল। ডান হাতের আঙুলের দিকের বলটাকে ১নং, তালুর বলটাকে ২নং আর বাঁ হাতের বলটাকে ৩নং ধর। ১নং বলটাকে তোমার নির্দিষ্ট উচ্চতায় ছুঁড়ে দাও। বলটা যেই নিচের দিকে নামতে থাকবে, সেই মুহূর্তে ২নং বলটাকে ছুঁড়ে দাও ওপর দিকে। ১নং বলটা বাঁ হাতে ধরার আগেই ৩নং বলটাকে ডান হাতে ধরে নাও। ডান হাতের বল বাঁ হাতে আর বাঁ হাতের বল ডান হাতে এমন ভাবে লোফালুফি করতে থাকো যাতে সব সময়েই একটা করে বল শূন্যে থেকে যায়। অবশ্যই খেয়াল রাখবে যে উচ্চতায় তোমার প্রতিটি বল উঠছে, তোমার দৃষ্টি যেন ঠিক সেইখানে থাকে। এই খেলাটা অন্য খেলাগুলোর চাইতে একটু শক্ত। আগের খেলাগুলো পুরোপুরি আয়ত্তে এলে তবেই এই খেলাটা পারবে। প্রতিদিন যদি আধঘণ্টা করে অনুশীলন করো তবে তিন মাসেই বেশ ভালভাবে বল লোফালুফির খেলা আয়ত্তে এসে যাবে। তবে মনে রাখবে জাগলিং শিখতে হলে চাই ধৈর্য আর মনের স্থিরতা। অস্থির, অধৈর্য হলে এই খেলা শিখতে পারবে না।

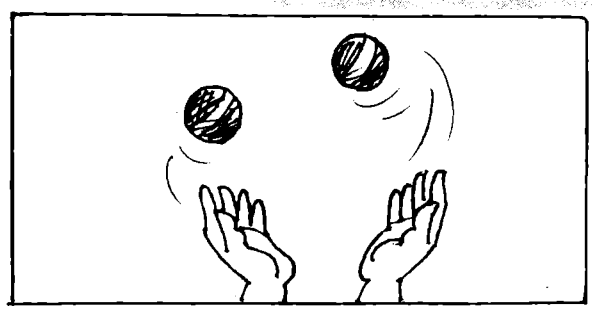

এই খেলা নিছক আনন্দ বা হাসির খেলাই নয়, এই খেলা শরীরকে সুস্থ সবল রাখে। ছোট থেকে অভ্যাস করলে পরিণত বয়সেও হাত পা সচল থাকে, আর শরীরের ক্ষিপ্রতা বা রিফ্লেক্স বেড়ে যায়।

তাহলে আজ থেকেই শুরু করে দাও। তাড়াতাড়ি শিখে নিয়ে সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দেবে কেমন!

শব্দমালার উত্তর ঃ

পাশাপাশি / ১. কংকত ৪. লম্বকর্ণ ৭. প্লবগ
ওপর-নিচ / ১. কল্লোল ২. তক্ষক ৩. মৃগ
৫. নিব ৬. বরা

# শুধুই অন্ধকার, তবু স্বপ্ন দেখি

## পি টি উষা

সেদিন মনটা দারুণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল। বাবাকে দেখতে নিজের গ্রাম পাইওলিতে এসেছিলাম। আমাদের বাড়ির থেকে একটু দূরে একটা সুন্দর সবুজ মাঠ আছে। ঐ মাঠেই বাবা পাইথলের চোখ এড়িয়ে আমি শুধু ছোটবেলায় কেন, এই সেদিনও অনুশীলন করতাম। ছোটবেলায় কঠোর অনুশীলন করতাম বড় হবার চেষ্টায় আর পরে তা করি কেরলের উষা থেকে ভারতের পি টি উষা হয়ে দেশের মর্যাদা বাড়াবার জন্য। কি জীবনই না ছিল তখন! আমার কোচ নাম্বিয়ারের তত্ত্বাবধানে সেই অনুশীলন ছিল কঠোর, কঠিন আর নিয়মানুবর্তিতায় বাঁধা। সেদিন মাঠের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম আমার কোনো উত্তরসূরী দেখার প্রত্যাশায়। অনেকগুলো ছেলেমেয়ে দৌড়চ্ছিল, কিন্তু তাদের কারোর মধ্যেই মিলখা সিং, শ্রীরাম সিং, গুরবচন সিং রণধাওয়া বা নিদেনপক্ষে পি টি উষার মতো হবার ডেডিকেশন দেখতে পেলাম না। কাউকেই দেখলাম না নিজের পারফরমেন্স নিয়ে মাথা ঘামাতে। রুটিনমাফিক কোচের অনুশীলন করানোর পর যে যার নিজের কাজে মেতে রইল। গল্পগুজব, আড্ডা এসব আর কি! কিন্তু কোচ কি বললেন, তার বিশ্লেষণ কাউকে করতে দেখলাম না। আমি দাঁড়িয়ে আছি, আমাকে এসে কেউ জিজ্ঞাসাও করল না স্প্রিন্টটা কিভাবে বাড়াব, হার্ডলস সহজে টপকানোর সেরা উপায় কি? বরং সবার জিজ্ঞাসা, শ্বশুরবাড়িতে আমি কেমন আছি, আমার স্বামী শ্রীনিবাসন কেমন আছেন, কোথায় বেড়াতে যাচ্ছি এইসব। আমি দারুণ দুঃখ পেয়েছিলাম ঐদিন।

নিজের কথা বলতে খারাপ লাগে তবুও বলছি। ক্যান্নানোরে স্পোর্টস ডিভিসনের যে স্কুলটিতে আমি অ্যাথলেটিকসের শিক্ষা নিয়েছি সেখানে একটা মন্দির ছিল। আবাসিক এই স্কুলটির হস্টেলের ঘরের কোণে একটা ছোট্ট জায়গায় ছিল সেই মন্দির। অনেক দেবতার মূর্তি থাকলেও ঐ জায়গাটি ছিল আমার সব শক্তির মূল উৎস। অনুশীলনের পর, কোনো টুর্নামেন্টে জয়ী অথবা ব্যর্থ হয়ে ফেরার পর আমি সাধনা করতাম সেই দেবতার যিনি ট্রাকে আমার উপর ভর করবেন সঠিক লক্ষ্যে পৌছনোর জন্য। পালঘাট মার্সি কলেজে এক বছর পড়েছি। তখন আমি অনেক সফল। কিন্তু একদিনের জন্যও ঐ সাধনায় ছেদ পড়েনি।

স্কুলের ঐ ঘরটি আজও আছে। আমাকে সম্মান দেবার জন্য কেরল সরকারের ক্রীড়াদপ্তর ঐ ঘরটিতে আমার অনুশীলনের ও অন্যান্য ছবি ঝুলিয়ে প্রদর্শনীর জন্য রেখে দিয়েছেন। ঐ ঘরটি কোনো আবাসিক অ্যাথলেটিকস ছাত্রীকে দেওয়া হয় না। তবে অনুশীলনে যাবার আগে প্রত্যেককেই এই ঘরটি দেখানো হয় নিষ্ঠা আর সাধনার পথটি খুঁজে নেবার জন্য। কিন্তু তাতে কি কোনো কাজ হচ্ছে? একটি মেয়ে ছাড়া কেরল কেন, সারা ভারতে সেরকম প্রতিভা আর চোখে পড়ছে কৈ! ওড়িশার মেয়ে রচিতা পান্ডার মধ্যে একটু যেন আলো দেখছি। পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি ছিপছিপে মেয়েটির মধ্যে সম্ভাবনা আছে। সম্প্রতি রেলে যোগ দেওয়া মেয়েটি ১০০, ২০০ মিটার দৌড়ে ভালই দৌড়চ্ছে। দেখা যাক কি হয়! কতটা এগোতে পারে রচিতা।

বিভিন্ন জায়গায় গেলে মাঝে মধ্যেই আমাকে একটা প্রশ্ন শুনতে হয়–আমার পর তেমন কোনো প্রতিভা বেরোচ্ছে না কেন? সুযোগ তো কম বাড়েনি। তাহলে? স্পষ্ট কথা সবসময় বলা যায় না। তাই এড়িয়ে যাই বেশির ভাগ সময়। তোমাদের কাছে ব্যাপারটা খোলসা করে বলি। অল্পেতে সন্তুষ্ট হবার অভ্যাস জীবনের সর্বক্ষেত্রেই খারাপ। কি পড়াশুনায়, কি খেলাধূলায়, কি চাকরি-বাকরিতে–স্বপ্ন না দেখতে শিখলে এক ইঞ্চিও এগোনো সম্ভব নয়। শুধু স্বপ্ন দেখলেই চলবে না, পাওয়ার আকৃতি, লক্ষ্যে একাগ্র থেকে এগোনোর মানসিকতাও চাই। এখনকার ছেলেমেয়েরা দেখেছি খেলে একটা চাকরি পেল তো ব্যস। সব পাওয়া হয়ে গেল। ধরো আমরা যদি সবাই মনে করি মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়ার পর আর পড়ব না। শিক্ষিত হওয়া দরকার–হয়ে গেছি। এই মানসিকতায় থাকলে তো দেশে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বেরোবেই না। অ্যাথলেটিকসের ক্ষেত্রেও তাই। দু-একটা জুনিয়ার, সিনিয়ার, সাবজুনিয়ার প্রতিযোগিতায় পদক পেয়েই অনেকে সন্তুষ্ট হয়ে যাচ্ছে। চাকরিটা এতে হয়ে গেল তো শেষ। আন্তর্জাতিক স্তরে আর পদকের লক্ষ্য নেই। ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তারের মতো তাই মিলখা, উষাও বেরোচ্ছে না বা বেরোবে না এই জন্যই। দু ধরনের ছেলেমেয়েরা এখন খেলাধূলায় আসছে। একদল আসছে কেরিয়ার তৈরির জন্য। যাতে স্পোর্টস কোটায় ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়া যায়। আর একদল চাকরির লোভে। জাতীয় স্তরে দু-একটা পদক পেয়ে চাকরির জন্য ধর্না দেওয়া।

অথচ আমার জীবনেই দেখুন সাফল্য যেমন পেয়েছি, ব্যর্থও তো তেমনি হয়েছি। স্কুল থেকে এশিয়ান লেভেলে অন্তত ২৬টা নতুন রেকর্ড আছে আমার। সোনার পদক কত পেয়েছি

তার হিসাব নেই। তবুও মনের মধ্যে এখনও একটা আকৃতি রয়ে গেছে। সেটা হলো ওলিম্পিক পদক। মস্কো, লস অ্যাঞ্জেলস এবং সিওল–কোনো জায়গাতেই ভারতের পতাকাকে তুলে ধরতে পারলাম না, এটা কি আমার কাছে কম দুঃখের! সারাজীবন এই যন্ত্রণা আমাকে তাড়া করে ফিরবে। এখনও সুযোগ পেলেই আমি ভাবতে বসি কেন আমি পারলাম না? অনেক পাওয়ার তৃপ্তির মাঝেও এই অতৃপ্ত বাসনা মনে জেদ এনে দেয়। এটা না হলে কেউ বড় হতে পারে না। হবেও না।

আমার স্বামী চান আমি খেলাধূলার সংগে জড়িয়ে থাকি। আমার অবশ্য তেমন ইচ্ছা নেই। কোচিং ডিগ্রি নেবার ইচ্ছা থাকলেও কোচিং করানোর ইচ্ছা নেই। এও জানি, কোচিং করানোর দায়িত্ব হয়তো আমি এড়াতে পারব না। কারণ সবুজ মখমলের প্রিয় ট্র্যাকে অনেক দিন দৌড়বার পর এখন আমি সংসারের ট্র্যাকে। আমার লক্ষ্যই হলো যখন যেখানে থাকব তখন সেই বিষয়টির ওপরই মনপ্রাণ সঁপে দেব। যখন মাঠে ছিলাম তখন আমার জীবন আর স্বপ্নই ছিল ট্র্যাক, হার্ডলস আর দ্রুত ফিতে ছোঁয়া। এখন সংসারে এসেও একই কথা লিখতে হবে। প্রকৃত গৃহকর্ত্রী আর মার মতোই চলতে হবে আমাকে। আমার ছেলে বা মেয়ে হলে তাকে আমার ইচ্ছা ডাক্তার করার। আমার স্বামীর অবশ্য ইচ্ছা সে হবে আমারই মতো অ্যাথলিট।

তবে যতই সংসারের ট্র্যাকে ঘুরি না কেন, আমার মন পড়ে থাকবে মাঠে। প্রতিদিন খবরের কাগজে চোখ রাখব, খুঁজব রেকর্ড ভাঙাগড়ার খবর, দেখতে চাইব কে কবে আমার রেকর্ড ভাঙছে, কিভাবে ভাঙছে। যেদিন আমার কোনো রেকর্ড ভেঙে যাবে সেদিন আমিই সবচেয়ে বেশি আনন্দ পাব। দেশের পতাকা যদি কেউ অন্য দেশের মাটিতে নিজের পারফরমেন্সের জোরে ওড়াতে পারে তাহলে তাকে ছুটে গিয়ে অভিনন্দন জানাব। জানি সেদিন আসতে অনেক দেরি। আমাদের দেশের খেলাধূলায় অন্ধকারের আধিক্য বড় বেশি চোখে পড়ে। ৮৫ কোটি লোকের মধ্যে থেকে একজনও ওলিম্পিকে সাফল্য পায় না। তবুও–হ্যাঁ, তবুও আমি স্বপ্ন দেখি! কেন দেখি? আগেই লিখেছি, প্রত্যেক সাফল্যের পিছনেই থাকে এক-একটি স্বপ্ন।

# বাংলাদেশও এগোচ্ছে, আমরা শুধুই পিছোচ্ছি

## অমল দত্ত

নবিকে সেদিন চিনতেই পারিনি। দারুণ ব্যবসা করছে। দেখতেও যথেষ্ট সুন্দর হয়েছে। এই নবি আমার দারুণ বন্ধু ছিল। সেবার তিপ্পান্ন সালে কোয়াড্রেংগুলার টুর্নামেন্ট খেলতে রেংগুনে গিয়েছিলাম। পাকিস্তানের সংগে লীগে আমাদের খেলা পড়েছিল। মনে রাখতে হবে সে সময় বাংলাদেশ ছিল না। তখন ছিল শুধুই পাকিস্তান। বর্তমান বাংলাদেশ ছিল তারই মধ্যে। আমাদের বিরুদ্ধে কি অসাধারণ ফুটবল খেলেছিল ও। তখন আমাদের এখানকার মতো ওখানেও কোটা সিস্টেমে দল হতো। তৎকালীন পাকিস্তান ফুটবল দলের হেডকোয়ার্টার ছিল করাচি। সুতরাং ঢাকা, চট্টগ্রাম বা খুলনার খেলোয়াড়রা ঐ দলে প্রায় থাকতই না। সেবারের দলটিতেও তাই ঢাকার একমাত্র প্লেয়ার ছিল ঐ নবি। সেন্টার হাফ খেলত। ওদের সংগে আমাদের ম্যাচটি চলার সময় ও-ই গড়ে দিচ্ছিল সমস্ত ব্যবধান। কি আসাধারণ বল কন্ট্রোল, বল ডিস্ট্রিবিউশন আর ড্রিবলিং। মনে রাখার মতো। আজও চোখ বুঝলে প্রায় আটত্রিশ বছর আগের ঐ খেলা দেখতে পাই।

সেই নবির সংগেই আবার দেখা হয়েছিল সাতাশিতে। মোহনবাগানের কোচ হিসাবে যখন ঢাকায় এশিয়ান ক্লাব কাপ চ্যাম্পিয়নশিপে গিয়েছিলাম। সেখানেই নবিকে প্রশ্ন করেছিলাম, তোমরা মাত্র ছ-কোটি মানুষের দেশ হয়েও কিভাবে আমাদের নব্বই কোটি মানুষের দেশ এই ভারতকে ফুটবলে এভাবে পিছনে ফেলে দিচ্ছ?

নবি সেদিন আমাকে চমকে দেবার মতো বেশ কিছু কথা বলেছিল। তার মধ্যে আমার সব থেকে ভাল লেগেছিল ওদের জাতীয়তাবোধ আর ফুটবলকে জনপ্রিয় করার জন্য ওদের দেশের কাজগুলোর কথা। ও বলেছিল, স্বাধীনতা পাবার পর আমাদের জাতীয়তাবোধ এত প্রবল হয়েছে যে মাঠের বাইরের যে কোনো কাজের মতো মাঠের মধ্যেও দেশ অথবা জাতির সম্মানরক্ষার্থে আমরা জীবন দিতেও প্রস্তুত থাকি। এবং আমাদের দেশে ফুটবল নিয়ে কোনোরকম রাজনীতি হয় না। তাই ফুটবল বিষয়ের যে কোনো স্কিমই আমরা সফল করতে পারি। আর দ্বিতীয়ত ফুটবল ছাড়া আমাদের দেশে অন্য খেলা প্রায় নেই। ক্রিকেটও তেমন জনপ্রিয় নয়। আমরা ঐ খেলাটি নিয়েই পড়ে থাকি। দেখবেন সোম, বুধ, শুক্র আমাদের টিভি-তে ইতালিয়ান লীগ, বৃটিশ লীগ, বিশ্বকাপসহ প্রায় সব বড় আন্তর্জাতিক ফুটবল টুর্নামেন্টগুলি নিয়মিত দেখানো হয়। সেই কারণেই বিশ্বকাপ প্রথম সরাসরি বাংলাদেশই দেখিয়েছে। ভারত নয়। এই যে গণমাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে একটা খেলাকে পপুলার করা এটা বাংলাদেশ করছে। যার জন্য অনেক বড়লোকের ছেলেও ফুটবল খেলতে আসে। কোয়ান্টিটি বেশি হলেই কোয়ালিটি ভাল হয়। এটা বাংলাদেশ প্রমাণ করেছে।

ফুটবল নিয়ে বাংলাদেশীদের ভাবনাচিন্তাও অন্যরকম। নবির সংগে আলোচনার পরদিন ওখানকার সাংবাদিকরা মোহনবাগানের কোচ হিসাবে আমার একটি মিট দ্য প্রেসের আয়োজন করেছিলেন। সেখানে ওঁদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলাম আমি। তারপর ওঁদেরই পাল্টা প্রশ্ন করেছিলাম, আপনাদের এখানকার লীগে এত বিদেশী খেলোয়াড় খেলে কেন? মুচকি হেসে একজন সাংবাদিক বন্ধু সেদিন বলেছিলেন, ফুটবল লীগটাকে জনপ্রিয় করার জন্য আমাদের দেশের ফুটবল দলগুলো ওদের খেলাচ্ছে। আপনাদের সাইয়ের মতো আমাদেরও ফুটবল স্কুল আছে। ওখানকার ছাত্ররা তৈরি হয়ে

গেলেই বিদেশী ফুটবলার খেলানো নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা হবে।

এবং সত্যিই তাই হলো। '৮৮-তে ওরা বিদেশী ফুটবলার খেলানো নিষিদ্ধ করল এবং সত্যিই উঠে এল একঝাঁক খেলোয়াড়। আজকের রুমি, মুন্না, আসলাম, সাবির সব ঐ আকাদেমীরই ছাত্র। এখন এরাই দাপাচ্ছে বাংলাদেশের ফুটবলে। বাংলাদেশের জাতীয় কোচ হামিদ আমাকে একদিন নিয়ে গিয়েছিলেন ওদের আকাদেমী দেখাতে। ঢাকা থেকে একটু দূরে একেবারে আমাদের সাইয়ের ধাঁচে আবাসিক ট্রেনিং। ওদের মাত্র ওই একটাই আকাদেমী। তবে অবশ্যই অনেক বড় মাপের। আর আমাদের এখানে ওরকম আকাদেমী অনেকগুলো আছে। অথচ দেখো তাদের মধ্যে থেকে কটা ভাল খেলোয়াড় উঠেছে! আমি বলতে চাইছি সেই মাপের খেলোয়াড়দের কথা যারা ভারতের প্রতিনিধিত্ব করবে। ক্লাব লেভেলে অবশ্য কয়েকজন আছে, কিন্তু তাদের তো বড় দলগুলি খেলাতেই ভয় পায়। এই তো লীগের প্রথম পর্বের মোহনবাগান-ইস্টবেংগল ম্যাচে মোহনবাগানের কোচ একজন উনিশ বছরের খেলোয়াড়কে নামালেন। তারপর আরও একজন উনিশ বছরের খেলোয়াড়কে নামালেন। এরপর দুজনকেই তুলে নিয়ে প্রবীণ খেলোয়াড়দের নামালেন। এইভাবে জুনিয়র খেলোয়াড়দের অভিজ্ঞতা অর্জন করানো যায় না। আমাদের এখানে এই ধারাবাহিকতা বা চ্যানেলেরই বড় অভাব। সাই খেলোয়াড় তৈরি করলেও উপযুক্ত জায়গায় বা জাতীয় ফুটবলার হবার লাইনে ঢুকিয়ে দিতে পারছে না। জাতীয় দলে খেলোয়াড় পাঠাতেও অনেকের অনীহা। ভাল খেলানোর কোনো প্রস্তুতিরও ব্যবস্থা নেই। এই তো '৮৭-তে শিলিগুড়িতে নেহেরু কাপের ট্রেনিং করাতে গিয়ে দেখলাম কেরল, গোয়া একজনও খেলোয়াড় পাঠায়নি। অথচ অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সচিব ওখানকার। আর বাংলার মতো কেরল, গোয়ার খেলোয়াড়রাও বর্তমানে ভারতীয় ফুটবলে অপরিহার্য। ট্রেনিং-এর সময় পেলাম মাত্র সাত দিন। সাত দিনে বেশ কিছু ভাল খেলোয়াড় বাদ দিয়ে দল গড়ে আমাকে লড়তে হলো আমাদের দেশের চেয়ে প্রায় চার-পাঁচ গুণ শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে। এই যে ফুটবল নিয়ে ছেলেখেলা, দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা, এর ফলেই আমরা পিছোচ্ছি। আন্তর্জাতিক ফুটবলে আমরা এখন শূন্যতে দাঁড়িয়ে। ক্লাব দলের প্রতি সব থাকবে আর দেশের প্রতি নিষ্ঠা, একাগ্রতা আর ভালবাসা থাকবে না, এর ফলেই—হ্যাঁ, শুধুমাত্র এর ফলেই বাংলাদেশও আমাদের পিছনে ফেলছে।

ক্লাবগুলির কথাই বা কি লিখব! তারা বাজেট বাড়াচ্ছে অথচ বাংলাদেশে গিয়ে লজ্জাজনক হার হচ্ছে! জাতীয় পর্যায়ের মতো বাংলাদেশের সংগে পরিকাঠামোগত দারুণ পার্থক্য হচ্ছে। আমাদের এখানকার তিন বড় দল ইস্টবেংগল, মোহনবাগান, মহামেডানের মতো ওদের ওখানেও আছে ঢাকা মহামেডান, আবাহনী ক্রীড়াচক্র এবং ব্রাদার্স ইউনিয়ন। ক্লাব থেকে ওদের দেশের খেলোয়াড়রা এখানকার তুলনায় দ্বিগুণ টাকা পায়, পরিবর্তে পুরো এফর্ট অর্থাৎ সমস্ত খেলা উজাড় করে দেয়। ওরা প্রায় কেউই চাকরি করে না। একসংগে ক্লাবের মেসে থাকে, একসংগে অনুশীলন করে। যার জন্যে দারুণ বোঝাপড়া হচ্ছে। ওদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই একটা প্রফেশনাল অ্যাপ্রোচ বা পেশাদারী মনোভাব গড়ে উঠেছে।

আর আমাদের এখানে খেলোয়াড়রা একসংগে থাকা দূরে থাক, ম্যাচের আগের দিন তাদের একসংগে অনুশীলন করানোই ভার। আমার কোচিং অভিজ্ঞতায় দেখেছি, কেউ হাওড়ায় ঘুমোচ্ছে, বলছে চোট, আবার কারো অফিস-খেলা, কারো বাড়ির অসুবিধা, সব ম্যাচের আগের দিন। এরা ক্লাব থেকে টাকাও নেয়, আবার অফিসেও চাকরি করে। ফলে দু জায়গায় খেলতে হয়। ম্যাচের সংখ্যা বাড়ে। সময়মত শরীর টানে না। পুরো এফর্টও দিতে পারে না। যার ফলে ক্লাবগুলির খেলার মানও বাড়ে না।

আমাদের বা বাংলাদেশের ফুটবল পরিকাঠামোয় ক্লাব বা অফিস দলগুলির উন্নতি না হলে দেশও পিছিয়ে পড়ে।

আরও নানা পার্থক্যেরও অবদান আছে ওদের এগিয়ে যাবার পিছনে। ওদের লীগ হয় ফিফার নিয়ম অনুযায়ী নব্বই মিনিটের এবং সেপ্টেম্বরে। আর আমাদের কলকাতায় সত্তর মিনিটের এবং জুনের তপ্ত গরমে। আমাদের ফ্লাড লাইট আছে অথচ তার কোনো ব্যবহারই নেই। প্রখর রৌদ্রে খেলতে গেলে শক্তি তো খেলা শুরুর প্রথম পনেরো মিনিটেই নিঃশেষ হয়ে যায়। অথচ বাংলাদেশে খেলা হয় ফ্লাড লাইটে। অর্থাৎ ভারতের ফুটবলের সমস্ত কিছুই চলছে অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে। কোনো পরিকাঠামো নেই, পরিকল্পনার অভাব। তাৎক্ষণিক কিছু পাবার চেষ্টায় সবাই ব্রতী। যার জন্যে ছোট্ট দেশ বাংলাদেশও আমাদের পিছনে ফেলছে ফুটবলে।

স্বাধীনতার আগে বা তার পরে ঢাকা থেকে শ্রদ্ধেয় গোষ্ঠ পাল, বাঘা সোম, সূর্য চক্রবর্তীরা এখানে এসে সফল হয়েছেন। এই সেদিনও ভাস্কর, প্রশান্তদের সাদরে বাংলাদেশের দলগুলি খেলতে নিয়ে গিয়েছিল। আর আজ আমরা রুমি, মুন্না, আসলাম, কাইজারদের এখানে এনে নাচানাচি করছি। আর কত পিছোব আমরা?

# হকি—সেকাল একাল

// লেসলি ক্লডিয়াস

আমাকে আমাদের সময়কার হকির সংগে আজকের হকির তুলনা করতে বলা হয়েছে। প্রথমেই বলতে হবে আমরা যখন হকি খেলতে শুরু করি তখন ভারতবর্ষে হকিই প্রধান খেলা ছিল। ফুটবল, ক্রিকেট খেলা হলেও সেগুলির অতটা প্রাধান্য ছিল না। কারণ আমরা তখন হকিতে বিশ্বজয়ী ছিলাম, তাই সমগ্র দেশে হকি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল এবং প্রত্যেক তরুণ খেলোয়াড়ই হকি খেলোয়াড় হবার স্বপ্ন দেখত।

আমাদের সময় আন্তর্জাতিক হকিতে ভারতের প্রাধান্যর কারণ হলো তখন বিশ্বের অধিকাংশ দেশই নিয়মিতভাবে হকি খেলত না এবং স্বল্পসংখ্যক যে কটি দেশ হকি খেলত তাদের খেলার মান খুব একটা উন্নত ছিল না। পাকিস্তানের হকি দল ভাল হলেও তাদের ধারাবাহিকতা ছিল না এবং তাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে অনেক সময় লেগেছিল। যার

ফলস্বরূপ ৫৬ সাল পর্যন্ত আমাদের সেরকম শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হতে হয়নি। সেই সময় ইউরোপিয়ান দেশগুলিতে ভাল হকি খেলবার মতন উপযুক্ত মাঠের অভাব ছিল। তাছাড়া ঐসব দেশে ক্রিকেট, টেনিস ও ফুটবলই বেশি জনপ্রিয় ছিল। শীতকালে স্বল্প সময়ের জন্য হকি খেলা হতো। কিন্তু সময়ের সংগে সংগে সবকিছুই বদলায়। তাই আস্তে আস্তে ঐসব দেশও হকিতে উন্নতি করবার জন্য সচেষ্ট হলো। এরপর তারা সারা বছর ধরে অনুশীলন ও খেলবার জন্য এ্যাসট্রোটার্ফ এনেছে। এ্যাসট্রোটার্ফে খেলবার ফলে তাদের শারীরিক সক্ষমতা বেড়েছে। সর্বোপরি এইসব দেশগুলি সুস্থ, সুন্দর পরিকল্পনা অনুযায়ী হকির উন্নতিকল্পে বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিজেদের আত্মনিয়োগ করেছে, যার ফলস্বরূপ আজ তারা অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে।

ভারতবর্ষে এইভাবে হকির উন্নতির জন্য কোনোরকম পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়নি। এইজন্য আমাদের দেশের সরকার আংশিকভাবে দায়ী। যে হকি দেশকে খেলাধূলায় সর্বপ্রথম বিশ্বজয়ীর সম্মান এনে দিয়েছে সেই হকির প্রতি সরকারের উদাসীন মনোভাব এবং সুস্থ পরিকল্পনার অভাব ছিল। বিশ্বজয়ী হওয়া সত্ত্বেও দেশে আমরা হকি খেলোয়াড়েরা কখনই ক্রিকেট বা ফুটবল খেলোয়াড়দের মতন সম্মান, অর্থ, মর্যাদা পাইনি। যেখানে বিদেশী দলগুলি সকলেই এ্যাসট্রোটার্ফে হকি খেলে সেখানে ভারতে আমরা সব জায়গায় এ্যাসট্রোটার্ফে অনুশীলন করবার সুযোগ পাচ্ছি না। তার কারণ এ্যাসট্রোটার্ফ অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এইসব কারণেই আন্তর্জাতিক আসরে আমরা আগের থেকে অনেক পিছিয়ে পড়েছি।

আজকালকার ছেলেরাও হকি খেলতে সেভাবে এগিয়ে আসছে না। হয়তো হকির সাজসরঞ্জামের দাম বেড়ে গিয়ে এই খেলাকে ব্যয়বহুল করে তুলেছে বলে। তাছাড়া ক্রিকেটার, ফুটবলারদের মতন জনপ্রিয়তা এখনকার হকি তারকাদের নেই। হকি খেলা দেখার প্রতিও কারো উৎসাহ নেই। তবুও বেশ কিছু ছেলেমেয়ে যাদের উৎসাহ আছে তারাও সেভাবে মনোযোগী হতে পারছে না। পড়াশুনার চাপ এত বেড়ে গিয়েছে যে ছাত্ররা খেলাধূলার জন্য বেশি সময় দিতে পারছে না। তাদের অভিভাবকরাও তাঁদের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনা ছাড়া শুধুমাত্র খেলাধূলায় মনোযোগী করার ঝুঁকি নিতে পারছেন না। খুব প্রতিভাধর কয়েকজন খেলোয়াড় হয়ত 'নর্মাল ওয়েতে' উঠে আসছে তবে সংখ্যায় তারা খুবই কম।

সাধারণত ছোট ছেলেরা হকির প্রতি উৎসাহিত হলেও খেলাধূলা করবার সময় কিন্তু তারা ক্রিকেট, ফুটবলটাই বেছে নেয়। হকি খেলতে গেলে ২২টা স্টিক দরকার যা সবার পক্ষে যোগাড় করা সম্ভব নয়। অথচ সেখানে একটা বল হলেই তারা ফুটবল খেলতে পারে।

আমাদের ছোটবেলায় দিনকাল অন্যরকম ছিল। তখন জীবন এত জটিল ছিল না, পড়াশুনারও এত চাপ ছিল না। আমাদের অনেক অবসর ছিল। সেই অবসর সময়ে আমরা খেলাধূলা করতাম। আর আজকে দেখি বাচ্চাদের অবসর নেই-ই বলতে গেলে। স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে খেয়ে উঠতে না উঠতেই তাদের গৃহশিক্ষক এসে পড়েন এবং তাঁর কাছে পড়ে উঠতে উঠতেই রাত হয়ে যায়। খেলবার অবকাশ কোথায়?

আমাদের সময়কার চিত্রটা এরকম ছিল না। আমার কথাই বলি, আমার শিক্ষাগত যোগ্যতা বিরাট কিছু নয়। পড়াশুনার পাট চুকিয়ে আমি প্রথমে ফুটবল ও পরে হকিতে আত্মনিয়োগ করি, আর একজন সফল হকি খেলোয়াড় হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করি। আজ জীবনে যত সম্মান, প্রতিপত্তি যা কিছু আমি পেয়েছি তা হকির দৌলতে। সে-দিন আজ আর নেই। আজ সবকিছু বদলে গিয়েছে। শুধু ভারতবর্ষেই নয়, সমগ্র বিশ্বে হকি তার জনপ্রিয়তা হারাতে বসেছে। হকি খেলা দেখতে দর্শক সেভাবে মাঠে আসছে না। এমনকি অলিম্পিক থেকে হকিকে বাদ দেবার কথা ভাবা হচ্ছে। এর কারণ হলো হকি খেলা দেখবার জন্য দর্শকদের সেভাবে সাড়া মিলছে না। অন্যান্য খেলাধূলায় প্রচুর পরিমাণে 'স্পনসরশীপ' পাওয়া গেলেও দর্শকদের অনীহার জন্য কোনো বাণিজ্যিক সংস্থা হকি প্রতিযোগিতা 'স্পনসর' করতেও রাজী হচ্ছে না।

ফুটবলে যদিও আমরা বিশ্বমানের নই তবুও ভারতে ফুটবল অত্যন্ত জনপ্রিয়। ক্রিকেটের যদিও প্রাধান্য আছে তবুও আন্তর্জাতিক আসর ছাড়া জাতীয় ও ঘরোয়া ক্রিকেটের আসরে সেভাবে দর্শক সাড়া দেয় না। ফুটবল ক্রিকেট আজকের তরুণেরা খেলতে আগ্রহী, কারণ এই দুটি খেলার মাধ্যমে তাদের ভবিষ্যৎ গড়ার ও অর্থ উপার্জনের সুযোগ আছে যা হকিতে নেই। সারা বিশ্বে কোথাও হকিতে প্রফেশনালিজম চালু নেই।

আজকে হকি খেলার ব্যয় বহন করা সাধারণ লোকের আয়ত্তের বাইরে। আমাদের সময় অধিকাংশ উচ্চমধ্যবিত্তরাই হকি খেলত কিন্তু আজকালকার উচ্চমধ্যবিত্তরা হকির চেয়ে টেনিস, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন প্রভৃতির প্রতি বেশি উৎসাহী।

ব্যক্তিগতভাবে আমি হকির উন্নতিকল্পে কিছু করতে আগ্রহী হলেও আমার ক্ষমতা অত্যন্ত সীমিত। তাই আমার পক্ষে বিরাট কিছু করা সম্ভবপর নয়। এজন্য আমি অত্যন্ত অনুতপ্ত। আজ আমি কিভাবে ছোট ছোট ছেলেদের হকি খেলবার জন্য উৎসাহিত করব যেখানে হকিতে তাদের জন্য কোনো ভবিষ্যৎ নেই?

আমার জীবনের ভিতটাই হকির দ্বারা গঠিত তাই উত্তরসূরীদের জন্য যদি কিছু নাই করলাম তাহলে তো বলতে হবে আমার মনুষ্যত্বই নেই। আমি যা শিখেছি তা উজাড় করে দিতে তো সর্বদাই প্রাণ চায়। আমার বন্ধুবান্ধবেরা আমাকে বলেনও সেকথা, কিন্তু পরিকল্পনাবিহীন কিছু করতে আমি রাজী নই। যদি কোনো সংস্থা ১১/১২ বছরের ছেলেদের বেছে নিয়ে 'টাটা ফুটবল একাডেমী'র মতন তাদের সমস্ত দায়-দায়িত্ব নিয়ে এক লং-টার্ম কোচিং ক্যাম্প করেন এবং আমাকে তার দায়িত্ব নিতে বলেন তাহলে আমি সম্পূর্ণভাবে তাদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত। তবে অবশ্যই সেখানে আমার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। ঐ ছয় সপ্তাহের জন্য ২০ জন ছেলেকে নিয়ে ট্রেনিং দিয়ে তাদের ছেড়ে দিলাম এরকম প্রশিক্ষণ শিবিরে আমি প্রশিক্ষণ দিতে রাজী নই। এরকম উদ্দেশ্যবিহীন প্রশিক্ষণের কোনো মূল্য নেই।

এ ছাড়া আমাদের এখানে বছরে মাত্র ছয় সপ্তাহ হকি খেলা হয়। এতে ভাল ফল পাওয়া সম্ভব নয়। দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ বাদে ভারতের প্রায় সর্বত্রই হকি জনপ্রিয়তা হারিয়েছে।

আজ পর্যন্ত পশ্চিমবংগ সরকারের পক্ষ থেকে হকির উন্নতিকল্পে কিছু করবার জন্য আমায় আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। যদি সরকারের পক্ষ থেকে আমায় এ বিষয়ে কোনোরকম দায়িত্ব দেওয়া হয় আমি আমার সবকিছু উজাড় করে সেই দায়িত্ব পালন করবার চেষ্টা করব।

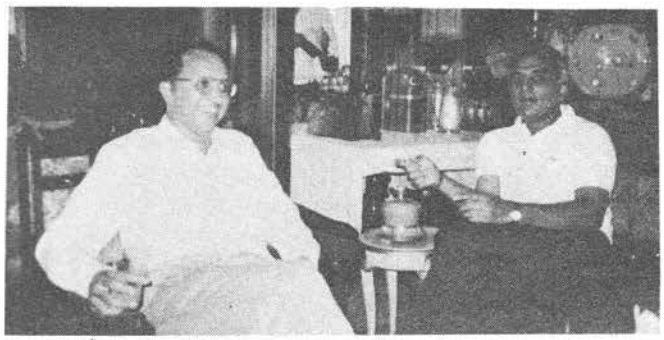

# বিশ্বকাপঃ ভারতের চান্সই নেই

## রাজু মুখার্জী

বিশ্বকাপ এই বছরে? সে কী! এই তো সেদিন ইডেনে বিজয়মালা পরে অ্যালান বর্ডাররা সারা মাঠ প্রদক্ষিণ করল। হ্যাঁ, ঠিক কথাই। তবে নিমেষের মধ্যে চার বছর কেটে গেছে। সে দিনটা ছিল ৮ নভেম্বর, ১৯৮৭। অর্থাৎ পরবর্তী বিশ্বকাপের সময় হয়ে এসেছে। গতবারের মতো এইবারও যৌথ উদ্যোগ। প্রধান ভূমিকায় অব্যশ ভারত ও পাকিস্তান নেই। এবার দায়িত্ব সামলাবে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড। তার মানে পঞ্চম বিশ্বকাপ হতে চলেছে বিষুবরেখার দক্ষিণে এই প্রথমবার।

প্রথম তিনটি বিশ্বকাপ হয়েছিল ইংলন্ডে আর চতুর্থটি হয় আমাদের উপমহাদেশে। ইংলন্ডে আয়োজিত বিশ্বকাপের ম্যাচগুলো হয় ইংলিশ সিজিনের মাঝামাঝি, জুলাই-আগস্টে। ভারত-পাকিস্তানে ওই মাসগুলোতে প্রবল বর্ষার জন্য ক্রিকেট খেলা সম্ভব নয়। সেই জন্যই উপমহাদেশের ক্রিকেট সিজন অক্টোবর-নভেম্বর মাসে শুরু হয়। বিশ্বকাপও তাই ঐ সময়েই হয়েছিল।

প্রথম তিনটি বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে ১৯৭৫, ১৯৭৯, ১৯৮৩ সালে। চার বছরের ব্যবধানে আয়োজন করার প্রচলিত নিয়ম অনুসারে ভারত ও পাকিস্তান তাদের যৌথ দায়িত্ব পালন করেছে ১৯৮৭ সালে। কিন্তু এবারের পঞ্চম বিশ্বকাপ হবে ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম। ১৯৯১-এ না হয়ে হবে ১৯৯২-এর ফেব্রুয়ারি-মার্চে। প্রথম দিন অর্থাৎ ২২ ফেব্রুয়ারি হবে ২টি ম্যাচ। একটি নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডে আর অপরটি অস্ট্রেলিয়ার পার্থে।

আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ইনটারন্যাশনাল ক্রিকেট কনফারেন্স-এর (আই. সি. সি) সাতটি ফুল-মেম্বারদের অর্থাৎ যে দেশগুলি টেস্ট ম্যাচ খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে, যেমন ভারত, পাকিস্তান, ইংলন্ড, শ্রীলংকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া। অষ্টম দল হিসেবে খেলবে আই. সি. সি. ট্রফি চ্যাম্পিয়ান জিম্বাবুয়ে।

প্রথা অনুযায়ী আই. সি. সি-র পূর্ণ সদস্যরা বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের অনুমতি পেয়ে থাকে। কিন্তু আরো যে বহু দেশ ক্রিকেট খেলে (হয়তো অবাক লাগছে, কিন্তু আরো প্রায় ৩০টা দেশে নিয়মিত ক্রিকেট খেলা হয়), তাদের বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ করতে হলে একটি কোয়ালিফাইং টুর্নামেন্ট খেলতে হয়। এই প্রতিযোগিতা ইংলন্ডে হয়, আই. সি. সি. ট্রফির জন্য চার বছর অন্তর। গত বছরের আই. সি. সি. ট্রফি জেতার পুরস্কার হিসেবে জিম্বাবুয়ে আগামী বিশ্বকাপ প্রতিযোগিতায় অষ্টম দল হিসেবে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

আসন্ন বিশ্বকাপে দক্ষিণ আফ্রিকাকে আমন্ত্রণ জানানো হতে পারে বলে বিভিন্ন সংবাদপত্রে জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়েছে। যদি তা সত্যি হয় তাহলে বিশ্বকাপে এবারই প্রথম দক্ষিণ আফ্রিকার আবির্ভাব হবে।

এবারের বিশ্বকাপে কী ধরনের ফল হতে পারে তা নিয়ে এবার আলোচনা করা যাক। এটা সত্যি যে ক্রিকেট এমনই একটা খেলা যা যে কোনো হিসেবকেই ওলট-পালট করে দিতে পারে যে কোনো সময়েই। তবুও ক্রিকেট আড্ডায় জল্পনা-কল্পনা না হলে ঠিক যেন জমে না। আমার মতে, পাকিস্তান অথবা অস্ট্রেলিয়ার জেতার সম্ভাবনা সবথেকে বেশি। এর প্রধান কারণ দুটি দলই ক্রিকেটের পরিভাষায় 'ব্যালান্সড্'। অর্থাৎ ম্যাচ জেতার জন্য কোনো দলের যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন তা ওই দুদলেরই আছে। যেহেতু কোনো দেশই তাদের বিশ্বকাপের খেলোয়াড়দের নাম এখনও পর্যন্ত ঘোষণা করেনি, তাই আমাদের পক্ষে এক একজন খেলোয়াড়কে আলাদাভাবে বিবেচনা করা সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও আমাদের অনুমান অনুযায়ী মনে হতে পারে যে, বিশ্বস্তরের সেরা খেলোয়াড়রা প্রায় সবাই নিজের নিজের দেশের দলে স্থান পাবেন। এই যুক্তিকে সামনে রেখে যদি বলি, পাকিস্তান এবং অস্ট্রেলিয়া বিশেষ শক্তিশালী, খুব অন্যায় হবে কী?

ওয়েস্ট ইন্ডিজ মনে হয় খুব সুবিধে করতে পারবে না আগামী বিশ্বকাপে। একদিনের ক্রিকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সাফল্য প্রায় নগণ্য। নিজেদের মাঠে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে হেরেছে, আবার তার ওপর ইংলন্ড সফরেও ইংলন্ডের কাছে তিনটি ম্যাচেই পরাজিত হয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের এই করুণ অবস্থার প্রধান কারণ হলো রিচার্ডস,গ্রিনিজ, হেনস্‌দের সেরা দিনগুলো শেষ হয়ে এসেছে অথচ ওদের জায়গা নেবার মতো ব্যাটসম্যান এখনো তৈরি হয়নি। রিচার্ডসন, হুপারদের ছোট করছি না, তবে মানতেই হবে ওরা এখনও বিশ্বসেরাদের আসনে জায়গা করে নিতে পারেনি। ওয়েস্ট ইন্ডিজ ফাস্ট বোলারদের নিশ্চয় অস্ট্রেলিয়ার 'হার্ড ও ফাস্ট' পিচ পছন্দ হবে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বিশাল বিশাল মাঠগুলোতে স্পিনারদের প্রয়োজনীয়তা ওয়েস্ট ইন্ডিজ পদে পদে টের পাবে। শুধু ফাস্ট বোলারদের ওপর নির্ভর করে অস্ট্রেলিয়ার মাঠে একদিনের ম্যাচ জেতা সহজ কাজ নয়।

আসন্ন বিশ্বকাপে ইংলন্ডকেও আমি 'ফেভারিট'দের মধ্যে রাখছি না। এটা ঠিক যে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ইংল্যান্ড সবেমাত্র নিজেদের মাঠে হারিয়েছে, তবে ওই ফলকে বিশেষ প্রাধান্য দেবার পক্ষপাতী আমি নই। ইংলন্ডের ব্যাটিং খুবই ভাল। গুচ আর রবিন স্মিথ খুব ভাল ফর্মে আছে। ল্যাম্ব, আর্থারটন আর গ্রেম হিকও প্রয়োজনে দলের অবস্থা অনুযায়ী ইনিংস খেলতে অভ্যস্ত। কিন্তু বোলিং-এর দশা তেমন আশাপ্রদ নয়। ধারাবাহিকতার অভাব রয়েছে। ফ্রেজার, ডিফ্রেটাস, ম্যালকম, প্রিংগলরা যে কবে কেমন বল করবে তা বোঝা কঠিন। এইসব মিডিয়াম-ফাস্ট বোলাররা ইংলন্ডে সাফল্য পায়, কারণ পিচে সবুজ ঘাস থাকায় বল 'কাট' করে। নিউজিল্যান্ডের আবহাওয়া ও পিচ ইংলন্ডের মতো হওয়ার দরুন, এরা নিউজিল্যান্ডের পিচে সুবিধে পাবে ঠিকই। তবে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে কতটা সফল হবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। অস্ট্রেলিয়ার শক্ত পিচে ইংরেজ বোলাররা আহা মরি কিছু করতে পারবে বলে মনে হয় না।

শ্রীলংকা কেমন ফল করবে? দারুণ ব্যাটিং শক্তি তাদের আছে। অরবিন্দ ডি. সিলভা যে ধরনের আক্রমণাত্মক ব্যাটসম্যান, ও যে কোনো দিন যে কোনো দলকে একাই হারিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে। গুরুস্বামীও প্রমাণ করেছে বিশ্বের সেরাদের সংগে পাল্লা দেবার ক্ষমতা তার আছে। অনেক নতুন মুখ আছে যারা একদিনের ম্যাচে নিজেদের শক্তির পরিচয় দেবার যোগ্যতা রাখে। তবে, শ্রীলংকার ক্ষেত্রে একটা বিরাট 'কিন্তু' হলো ওদের অতি নিম্নমানের বোলিং। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এটা সত্যি বেমানান। অবাক লাগে, যখন দেখি ব্যাটিং-এ ওরা যতটা এগিয়ে গেছে, বোলিং-এ ঠিক ততটাই পিছিয়ে রয়েছে। অতি সাধারণ মানের বোলিংশক্তি শ্রীলংকার বহুদিনের দুর্বলতা। অনেক ম্যাচে দুর্দান্ত ব্যাট করে, স্রেফ দুর্বল বোলিং-এর জন্যে হেরেছে।

নিউজিল্যান্ড নিজের মাঠে খেলার একটা বাড়তি সুবিধে নিশ্চয়ই পাবে। তবে নিউজিল্যান্ড দল রিচার্ড হ্যাডলি ছাড়া এতই দুর্বল যে পরিবেশের কোনো সুবিধেই তারা কাজে লাগাতে পারবে না। নিউজিল্যান্ডের বোলিং-শক্তি অনেকাংশে ইংলন্ডের মতো 'মিডিয়াম পেস' নির্ভর। তাই নিউজিল্যান্ড তাদের দেশের পিচে বল 'কাট' করাবার সুযোগ পেলেও অস্ট্রেলিয়ার শক্ত পিচে তাদের বল বাঁকানোর প্রবণতা অনেকটাই লোপ পাবে। সাম্প্রতিক ফল দেখে নিউজিল্যান্ডের প্রতি উচ্চাশা রাখা কঠিন ব্যাপার।

জিম্বাবুয়ের অবস্থাও অনেকটা নিউজিল্যান্ডের মতোই। বোলিং-শক্তি সীমিত, ব্যাটিং-এ ধারাবাহিকতা নেই। তবে জিম্বাবুয়ের যা আছে তা আর কোনো দলের নেই। আমি জিম্বাবুয়ের অসাধারণ ফিল্ডিং-এর কথাই বলছি। যেমন রানিং, ক্যাচিং তেমনি থ্রোইং। ফিল্ডিং-এর নিপুণতায় দর্শকদের মাতিয়ে দেবে সন্দেহ নেই, তবে বিশ্বকাপে কোনো বিরাট বিপর্যয় ঘটাতে পারবে বলে মনে হয় না।

বাকি রইলো ভারত। ভারতের বোলিং-এ না আছে ভেদশক্তি, না আছে রান আটকাবার ক্ষমতা। অতএব সব ম্যাচে তেন্ডুলকার, মঞ্জরেকার, আজহারদের ঝড়ের গতিতে বিশাল 'টোটাল' করতে হবে যদি ম্যাচ জিততে হয়। ভারতীয় ফিল্ডিং-ও একই রকম দুর্বল। কেবলমাত্র আজহার, তেন্ডুলকার ছাড়া বিশ্বমানের একজনও নেই। তার ওপর ভারত বিশ্বকাপ খেলবে প্রায় তিন মাস অস্ট্রেলিয়া সফর করার পরে। ঐ তিন মাসে ভারত খেলবে পাঁচটি টেস্ট, তিনটি প্রথম শ্রেণীর ম্যাচ এবং কম করে দশটি একদিনের খেলা। অতএব সহজেই অনুমেয় কী ভীষণ রকম ক্লান্ত থাকবে ভারতীয় খেলোয়াড়রা। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, ভারতীয় দলের বিশ্বকাপ জেতার মতো শক্তি নেই।

# আমার বন্ধুরা

## সৌরভ গাংগুলি

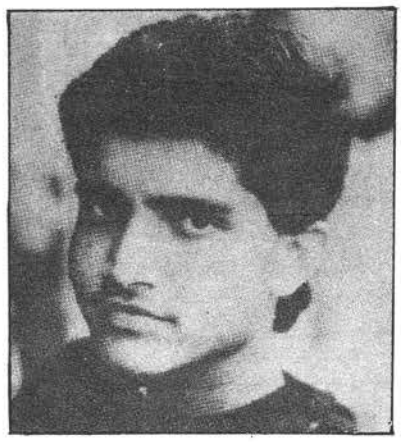

তোমরা হয়তো অনেকেই জান না যে স্কুল ক্রিকেটে আমি কোনোদিন খেলিনি। সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে যখন পড়তাম তখন আমার প্রিয় খেলা ছিল ফুটবল। স্বপ্ন দেখতাম অ্যারান্টাস ডু নাসিমেন্টো বা পেলে হবার। স্কুলে যাদের সংগে ফুটবল খেলতাম সেই অভিজিৎ চ্যাটার্জি, ফ্রান্সিস, জেমস, রণজয়রা ছিল আমার বন্ধু। এদের সংগে বন্ধুত্ব আমার আজও অটুট। তবে অনেকেরই প্রিয় বন্ধু থাকে, আমার সেরকম কিছু না থাকলেও অভিজিতের সংগে আমার মনের মিলটা মনে হয় একটু বেশি। বড়িশাতে আমার ক্রিকেট জীবনের শুরু। সেখানেও অভিজিত আর আমি একসংগে খেলেছি। যেমন এখন শুধু স্পোর্টিং ইউনিয়নে একসংগে খেলি বলে নয়, অফিসে একসংগে চাকরি করি বলেও নয়, কেন জানি না দেবাং গান্ধী আমার সব থেকে কাছের বন্ধু। খেলার বাইরেও ওর সংগে আমার কোথায় যেন একটা একাত্মতা থেকে যায়।

আমার শুকতারার বন্ধুদের কার কি হয় জানি না তবে আমার কাছে বন্ধুত্বের সংজ্ঞা একটু অন্যরকম। যেমন অনেকে একসংগে ক্রিকেট খেলে বলে বা ফুটবল খেলে বলে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে, অনেকে একই পাড়ায় থাকে বলে গভীর বন্ধুত্বে জড়িয়ে পড়ে, আবার অনেকে একই গুরুর শিষ্য হয় বলেও বন্ধুত্ব করে। আমার কিন্তু তা নয়। ক্রিকেট না খেললেও যদি কারও

মনের সংগে মিল হয় তাহলেই তার সংগে আমার বন্ধুত্ব হয়। যেমন ধরো, আমার দাদা স্নেহাশিসের সংগে আমার সেরকম গাঢ় বন্ধুত্ব না থাকলেও ইডেন গার্ডেনসের মালী মহেশদার সংগে আমার দারুণ মনের মিল। ও যেরকম পিচ পছন্দ করে, যেরকম আবহাওয়া পছন্দ করে, আমিও সেরকম ভালবাসি। আবার বাড়ির খোকনদা, বা কাকাদের সংগেও আমার দারুণ সম্পর্ক। সেটা প্রায় বন্ধুর মতোই। স্কুলের শিক্ষক অনিন্দ্য মুখার্জি, রোজারিও অথবা ফাদার বুসে আমার শ্রদ্ধেয় হলেও, তাঁরাও একরকম বন্ধুর মতো ছিলেন। অর্থাৎ বুঝতেই পারছো আমার মতে বয়স্ক শ্রদ্ধেয় মানুষরাও বন্ধুর মতো ব্যবহার করলে, তাঁদের সংগে মনের মিল হলে বা ভাল লাগলে তাঁদেরও আমার বন্ধু বলে মনে হয়।

অনেকেই আমাকে প্রশ্ন করেন শচীন তেন্ডুলকর, সঞ্জয় মঞ্জরেকর, বিনোদ কাম্বলি বা যতীন পারপুপের সংগে আমার সম্পর্ক কেমন? সম্পর্ক আমার সকলের সংগেই ভাল। প্রায় সমবয়সী বলেই শুধু নয়, একসংগে রুমমেট থেকেছি বলে শচীন, বিনোদ বা যতীনের সংগে মনের আদান-প্রদান হয়েছে। তবে সঞ্জয়ের সংগে আমার শুধুই মৌখিক আলাপ। শচীনের সংগে আমার প্রথম দেখা সাতাশীর অনূর্ধ্ব-পনেরো-বছর বয়সীদের ইন্ডিয়া ক্যাম্পে। ইন্দোরে আমরা একই হোটেলে পাশাপাশি ঘরে থাকতাম। নিয়মিত দেখা হতো, কথা হতো। বিজয় হাজারে ট্রফির সেমিফাইনালে আমরা পশ্চিমাঞ্চলকে হারিয়েছিলাম। পূর্বাঞ্চল জিতেছিল ৬ উইকেটে। ওরা করেছিল ৪৪৬। আর আমরা ৩ উইকেটে ৪৪৭। শচীন পশ্চিমাঞ্চলের পক্ষে দুর্দান্ত খেলেছিল। করেছিল ১৭০। আমি ব্যাট পাইনি। কারণ আমার আগের তিনজনই সেঞ্চুরি করেছিল।

ইংলন্ড ট্যুরে বিনোদ, শচীন, আমি আর যতীন রুমমেট ছিলাম। দারুণ হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল আমাদের। তারপর যোগাযোগের অভাবে সব বিচ্ছিন্ন। আবার হয়ত কোনো ট্যুরে অথবা টুর্নামেন্টে দেখা হবে, কথা হবে। আসলে আমি এমনিতে পাড়ার ক্লাবে অথবা রাস্তায় ঘুরেফিরে কোনোদিনই আড্ডা দিতে ভালবাসি না। অনুশীলন, অফিস বা ক্রিকেটের আলোচনার বাইরে আমার আড্ডা তাই ঘরেই। আমার প্রিয় হবি গান শোনা। তাই গান শুনতে শুনতে আড্ডা মারতে ভাল লাগে। আর অফিসে যাদের সংগে আড্ডা মারি, তাদের মধ্যে দেবাং ছাড়া সকলেই আমার শ্রদ্ধেয়। গোপাল বসু, রুসি জিজিবয়, রাজা বেংকট, সম্বরণ ব্যানার্জি বা অরুণলালের সংগে সময় কাটাতেও ভাল লাগে।

তোমরা অনেকেই জান যে ভারতে আমার প্রিয় ক্রিকেটার দিলীপ বেংসরকার। বিদেশীদের মধ্যে রিচার্ড হ্যাডলি আর মার্ক টেলর। দিলীপের সংগে কথা বলেছি। কথা বলেছি ক্রিকেটের কিংবদন্তী সুনীল গাভাসকারের সংগেও। কিন্তু বন্ধুত্ব পাতানো বা আড্ডা মারা আজও হয়ে ওঠেনি। সুযোগ পেলে সানির সংগে দীর্ঘক্ষণ কথা বলার ইচ্ছা আছে আমার। যেমন মাঠের মানুষদের মধ্যে রিচার্ড হ্যাডলির সংগে কথা বলার ইচ্ছা আছে।

আর মাঠের বাইরে–হ্যাঁ, স্বপ্ন দেখি দুজনের সংগে কথা বলার। দুজনেই ক্রিকেটার না হলেও ওঁদের 'আলাদা চরিত্র' আমাকে মুগ্ধ করে। এঁরা হলেন–অমিতাভ বচ্চন আর দিয়েগো মারাদোনা। দুজনেই আমার স্বপ্নের জগতের মানুষ। ওঁদের সংগে যদি কোনোদিন আলাপ করতে পারি বা বন্ধুত্ব পাতাতে পারি তাহলে নিজেকে ধন্য মনে করব। কেন জান–ঐ যে বললাম ক্রিকেটার না হলেও মনের মিল হলেই আমি তাদের সংগে বন্ধুত্ব করি।

শুকতারার ছোট্ট বন্ধুরা, তোমাদের সংগে কি আমার মনের মিল হলো? হলে জানিও কিন্তু। উত্তর ঠিকই পাবে।

●●●

# বড় দলের ছোটোরা

## শ্যামল ব্যানার্জী

এই বছর থেকে আই. এফ. এ. যে নিয়ম চালু করেছে অর্থাৎ প্রত্যেক সুপার-ডিভিসনের দলগুলিতে দুজন করে অনূর্ধ্ব ১৯ বছরের খেলোয়াড়কে খেলাতে হবে, এটা নিঃসন্দেহে খুব প্রশংসনীয় উদ্যোগ। যদিও এই নিয়ম প্রবর্তন করা নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলছেন, কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে আই. এফ. এ-র এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাচ্ছি। বর্তমানে কলকাতা ময়দানে প্রতিশ্রুতিবান খেলোয়াড়ের যে আকাল চলেছে তার ফলস্বরূপ আমাদের আজ বিদেশ থেকে, এমনকি প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে খেলোয়াড় এনে খেলাতে হচ্ছে। এর কারণ হলো, বর্তমানে বড় ক্লাবগুলোর কর্মকর্তাদের আগের মতো নতুন নতুন প্রতিভা খুঁজে বের করা ও তাদের সুযোগ দেবার অনীহা। আশার কথা

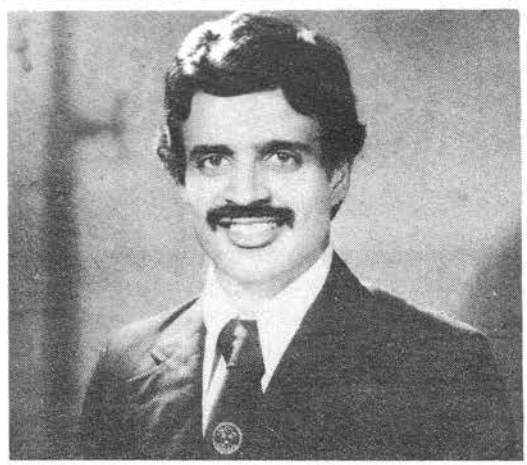

শ্যামল ব্যানার্জী

এই যে আই. এফ. এ-র এই নতুন নিয়ম চালু হবার কিছুদিনের মধ্যেই আমরা বেশ কয়েকটি প্রতিভাবান খেলোয়াড়ের সন্ধান পেয়েছি, যাদের ঠিকমত গড়ে তুলতে পারলে ভবিষ্যতে বাংলার ফুটবল উপকৃত হবে।

এই মুহূর্তে যে ক'জন ফুটবলার আমাদের নজর কেড়েছে

শ্রীকান্ত দেবনাথ (মোহনবাগান) অজয় দাস (মোহনবাগান) অমিত দাস (ইস্টবেংগল) আবিদ হুসেন (মহামেডান)

তাদের মধ্যে ইস্টবেংগলের অমিত দাস, সোমনাথ ঘোড়ুই, প্রসেনজিৎ পাল, মহামেডান স্পোর্টিং দলের তৌসিফ জামাল ও আবিদ হুসেন, রাজস্থান দলের গৌতম দে ও মোহনবাগান দলের অজয় দাস ও শ্রীকান্ত দেবনাথ উল্লেখযোগ্য।

ইস্টবেংগলের মাঝ মাঠের খেলোয়াড় অমিত দাস বিধাননগর গভর্নমেন্ট স্কুলের ছাত্র। অমিতের সবচেয়ে বড় গুণ এই বয়সেই বড় দলের হয়ে দাপটে খেলবার মানসিকতা। বলের উপর ওর নিয়ন্ত্রণ খুব ভাল। সতীর্থদের নির্ভুল পাস বাড়ানোর ক্ষমতা আছে। আর যথেষ্ট সাহসীও বটে। তবু অমিতের খেলায় দোষত্রুটিও কিছু আছে। যেমন আক্রমণে গিয়ে ও তাড়াতাড়ি নিচে নামতে পারে না। বেশি সময় পায়ে বল রাখার এবং উঁচুর বল খেলবার প্রবণতা আছে। উচ্চতা কম হওয়ার জন্য ভাল হেড করতে পারে না। শারীরিক দুর্বলতার জন্য বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়কে ট্যাকল করতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। আর গোলে শট নিতেও একটু দ্বিধা করে। তবে এই ত্রুটিগুলো কাটিয়ে উঠতে পারলে অমিত আরও ভাল খেলতে পারবে।

সোমনাথ ঘড়ুইয়ের মধ্যে ভাল ফরোয়ার্ডের অনেক গুণ থাকলেও ওকে বলের উপর নিয়ন্ত্রণ আরও বাড়াতে হবে। আসলে ইস্টবেংগলের ফরোয়ার্ড লাইনে খেলোয়াড় থাকায় নইমউদ্দিন ওকে খেলাবার ঝুঁকি নিতে চাইছেন না। সেক্ষেত্রে মাঝমাঠে খেলোয়াড়ের অভাব থাকায় অমিত দাস সুযোগ পেয়েছে নিজেকে প্রমাণ করার।

বিধাননগর গভর্নমেন্ট স্কুলের আরেক ছাত্র প্রসেনজিৎ পালও প্রতিভাবান খেলোয়াড় তবে ইস্টবেংগলের মাঝ মাঠের এই খেলোয়াড়টি নিজেকে সেভাবে প্রমাণ করার সুযোগ পায়নি এখনও। পেলে হয়ত কিছু চমক দেখাতে পারে। প্রসেনজিতের বলের উপর ভাল নিয়ন্ত্রণ এবং পাস করবার ক্ষমতা আছে। তবে শুটিংয়ে কিছুটা দুর্বলতা আছে, সেটা কাটিয়ে উঠতে হবে।

মহামেডান স্পোর্টিংয়ে টাটা ফুটবল একাডেমী থেকে আসা ফরোয়ার্ড তৌসিফ জামালের খেলা খুব ভাল লেগেছে। দুপায়ে ইনসাইড আউটসাইড সুন্দর ডজ্ আছে এবং গোল লক্ষ্য করে সুন্দর শট নেবার ক্ষমতা আছে। তৌসিফের খেলার ধরনটা অনেকটা বিশ্বজিৎ ভট্টাচার্যের মতন। একটু শৌখিন খেলোয়াড় তবে পরিশ্রম করে উঠে নেমে খেলে, আর সর্বদা বিপক্ষ দলের ডিফেন্ডারদের ব্যস্ত রাখে যেটা আধুনিক ফুটবলে অত্যন্ত জরুরি। তবে ওকে গোল করার ক্ষমতা আরও বাড়াতে হবে। খেলাতে ঠিকমতন মনসংযোগ করতে পারলে তৌসিফ আরও ভাল খেলতে পারবে।

মাঝমাঠের খেলোয়াড় আবিদ হুসেনও নজর কেড়েছে। আবিদ অত্যন্ত পরিশ্রমী খেলোয়াড়–অনেকটা জায়গা নিয়ে খেলে, সাহসী, সহজে হার মানতে চায় না, শারীরিক দিক থেকেও পটু, পায়েও ভাল শট আছে। ইতিমধ্যে ক্লাবের হয়ে দুটি গোল করেছে। আবিদ একটা ছোট্ট ইনসাইড ডজ করে থাকে তবে সেটা খুব একটা কার্যকরী হয় না। ও ছোট ছোট পাসে খেলতে অভ্যস্ত, কিন্তু সময় বিশেষে ওকে বড় পাসে খেলাও অভ্যাস করতে হবে।

রাজস্থানের গৌতম দে সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়। দুপায়ে সুন্দর ইনসাইড আউটসাইড ডজ্ আছে, গোল লক্ষ্য করে সুন্দর শট নিতে পারে। তবে ছোট দলে খেলার ফলে সহখেলোয়াড়দের থেকে খুব একটা সহযোগিতা না পাওয়ায় গৌতম নিজেকে সেভাবে প্রকাশ করতে সক্ষম হচ্ছে না।

সোমনাথ ঘোড়ুই (ইস্টবেংগল) প্রসেনজিৎ পাল (ইস্টবেংগল)

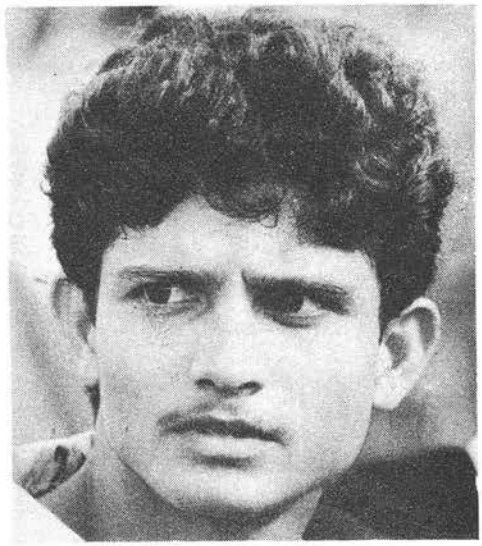

তৌসিফ জামাল (মহামেডান)

মোহনবাগান দলের অজয় দাস ও শ্রীকান্ত দেবনাথ আশানুরূপ ভাল খেলতে পারছে না। শ্রীকান্ত দেবনাথ আউটের খেলোয়াড়। গতি মন্দ নয়, তবে ওকে সেন্টার করবার ক্ষমতা আরও বাড়াতে হবে আর পাসিংও নিখুঁত করতে হবে। শ্রীকান্তের শুটিংয়েও দুর্বলতা আছে। মাঝমাঠের খেলোয়াড় অজয় দাসের পরিশ্রম করার ক্ষমতা থাকলেও মাঝমাঠে খেলতে গেলে বলের উপর যতটা নিয়ন্ত্রণ থাকা প্রয়োজন তা অজয়ের নেই। এ ছাড়া ওকে পাসিং করার ক্ষমতা বাড়াতে হবে ও শুটিং উন্নত করতে হবে।

অনূর্ধ্ব ১৯ বছরের ফুটবলারদের খেলিয়ে শুরুতেই যে ভাল সাড়া পাওয়া গিয়েছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে আমার মনে হয় এই নিয়ম শুধুমাত্র সুপার-ডিভিসনের ফুটবল দলগুলির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সমস্ত বিভাগেই চালু করা উচিত। তাতে আরও ভাল ফল পাওয়া যাবে। সম্ভবত আই. এফ. এ. সামনের বছর থেকে জুনিয়ারদের জন্য একটি ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করবে। এই প্রচেষ্টার জন্য অজিত সেনগুপ্ত ও প্রদ্যোত দত্তকে ধন্যবাদ। নিয়মটি চালু হবার পর আশা করা যায় ভবিষ্যতে আমরা আরও অনেক নতুন প্রতিভার সন্ধান পাব।

# বাংলার সুমিতা এশিয়ার সেরা

## রতন চক্রবর্তী

কয়েক মাস আগে দিল্লিতে বিশ্ব পাওয়ার লিফটিং-এ নিজের বিশ্বরেকর্ডটি সুমিতা লাহা নিজেই ভেঙে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ভি ভি আই পি বক্সে বসে থাকা ক্রীড়ামন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি নিরাপত্তারক্ষীদের কথাকে অমান্য করে দৌড়ে চলে এলেন ফ্লোরে এবং গর্বিতভাবে জড়িয়ে ধরলেন বাংলার গর্বের মেয়েটিকে। বললেন, "তুমি আমাদের গর্ব। তোমার জন্য শুধু বাংলার ছ'কোটি মানুষই নন, সারা ভারতের নব্বই কোটি মানুষ আজ গর্ববোধ করছে।" ক্রীড়ামন্ত্রীর কথার মাঝেই ব্যান্ডে বেজে উঠলো জাতীয় সংগীতের সুর, পতপত করে গর্বিতভাবে উড়তে শুরু করলো ভারতের ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা–চোখ দুটো এই আনন্দ-ঘন মুহূর্তে চিকচিক করে উঠেছিল সুমিতার।

কিন্তু এমন দৃশ্য আমরা ভারতবাসীরা কবার দেখতে পাই! আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে আমাদের অবস্থা সত্যিই করুণ। ওলিম্পিকের আসরে আমরা শূন্যে, এশিয়াডে উষা যতদিন ছিলেন সোনার মুখ দেখা যেত, নচেৎ রুপো অথবা ব্রোঞ্জ। সাফ গেমসে অবশ্য আমরা ওলিম্পিক বা এশিয়াডের মতো লিলিপুট নই, বরং দৈত্যই। বেশ কিছু পদক জোটে বটে কিন্তু তার দাম বড় কম। যাঁদের হারিয়ে আমরা পদক জিতি তাঁদের শক্তি হাতির কাছে পিঁপড়ের মতো।

এরই মধ্যে এমন কয়েকজন গত দু-তিন বছরে উঠে এসে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যাঁদের নিয়ে ভারতবাসী গর্ব করতে পারেন। এবং সব থেকে বড় কথা, এঁদের মধ্যে বেশিরভাগই বাংলার। নামগুলো নিশ্চয়ই অজানা নয়।

বিলিয়ার্ডে বিশ্ব-চ্যাম্পিয়ন মনোজ কোঠারি, জুনিয়র উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন লিয়েন্ডার পেজ, দাবার গ্র্যান্ডমাস্টার দিবেন্দু বড়ুয়া এবং অবশ্যই 'এশিয়ার সব থেকে শক্তিশালী মহিলা' আখ্যা পাওয়া হুগলির বেগমপুরের সুমিতা লাহা। সুমিতা বিশ্বরেকর্ড করেছেন এবং 'বিশ্বের সব থেকে শক্তিশালী মহিলা' আখ্যাও পেয়ে যেতেন এবার দিল্লিতে। কিন্তু কিছুটা ভাগ্য আর কিছুটা ভুল তাকে সেই সম্মান এনে দেয়নি। যা হয়নি তা থাক। এশিয়ার প্রায় একশ কোটি

মহিলার মধ্যে সব থেকে বলশালী মহিলাটির বেড়ে ওঠার চমকপ্রদ গল্পটি তাঁর মুখ থেকেই শোনা যাক।

শুকতারার বন্ধুদের আগেই জানিয়ে রাখি সুমিতা খুব ভাল গল্প করতে পারেন। কোল ইন্ডিয়ার অফিসে ওঁর বন্ধুরা সবাই প্রায় ফুটবলার। মোহনবাগানের সত্যজিৎ চ্যাটার্জি, উত্তম মুখার্জি, অচিন্ত্য বেলেল, অনিরুদ্ধ কোলে, মহামেডানের সুব্রত রায়দের সংগেই ওঁর আড্ডা জমে ভাল। এরই মধ্যে একদিন দুপুরে জমিয়ে আমার সংগে গল্প করতে শুরু করলেন সুমিতা। এসো আমরাও সেই গল্প শুনতে বসে পড়ি।

"আমাদের বাড়ি হুগলির বেগমপুরে। স্টেশন থেকে মিনিট তিনেকের পথ। লাহাবাড়ি বললেই যে কেউ দেখিয়ে দেবে। ছোটবেলায় স্কুলের স্পোর্টসে সবার মতো আমিও দৌড়তাম। স্কুলের হয়ে জেলার প্রতিযোগিতাতেও গেছি। ছোটবেলা থেকেই আমার খেলাধূলার প্রতি ছিল গভীর আগ্রহ। বাড়িতে বাবা, দিদি, দাদারাও দারুণ উৎসাহ দিতেন সেই সময়। একদিন হঠাৎ-ই পাড়ার একজন দাদা এসে বললেন, সুব্রতা দেবনাথের কাছে অনুশীলন করবি। আমি তো রাজী। সুব্রতাদি বাংলা ও ভারতের নামী অ্যাথলিট। বালীতে সুব্রতাদির কাছেই জ্যাভলিন আর শটপাট ছোঁড়া শেখা শুরু করলাম। এবং কিছুদিনের মধ্যেই সাফল্য পেলাম। সারা ভারত গ্রামীণ ক্রীড়ায় হাজারিবাগে গিয়ে দ্বিতীয় এবং সারা ভারত স্কুল গেমসে পুনায় গিয়ে ষষ্ঠ হলাম। এই সাফল্যে আরও জোর দিয়ে অনুশীলন শুরু করলাম। মনের জোরও বেড়ে গেল। হয়তো অ্যাথলিট-ই হয়ে যেতাম কিন্তু বাড়ি থেকে ট্রেনে একদিন অনুশীলনে আসার পথেই দেখা কোচ দ্বৈপায়ন চক্রবর্তীর সংগে। উনিই বললেন, পাওয়ার লিফটিং করবি? আমি বললাম, বাড়িতে গিয়ে বাবার সংগে কথা বলি, তিনি যদি পারমিশান দেন তাহলে করব। জানো তো বাবাই হচ্ছেন আমার ফ্রেন্ড, ফিলোজফার এবং গাইড। অর্থাৎ এককথায় পথপ্রদর্শক। যাই হোক বাবা মত দিলেন। চলে এলাম শক্তি উত্তোলনে। থ্রো ইভেন্টগুলিতে অনুশীলন থাকায় অবশ্য অসুবিধা হলো না। তারপর '৮৩তেই জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হলাম। তখন আমার বয়স বছর পনেরো। ভারতীয় শক্তি উত্তোলন সংস্থার সচিব মনোজিৎ বসু আমাকে বললেন তোমাকে আমরা ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে পাঠাতে চাই। প্রথমে শুনে তো অবাকই হয়ে গিয়েছিলাম। বিশ্বপর্যায়ে! সে তো দারুণ কঠিন কাজ। মানসিকভাবে আমায় অবশ্য প্রস্তুত করে দিলেন আমার বাবা-ই। তিনিই মনোজিৎবাবুর কাছে বললেন, আগের ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়নশিপের একটা বুলেটিন যোগাড় করে দিতে পারেন। বুলেটিনে দেখা গেল আমার পারফরমেন্স বিশ্ব ক্রমপর্যায়ের দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর সমান। ব্যস, '৮৪-তেই চলে গেলাম আমেরিকায়। হলাম তৃতীয়। তারপর '৮৫-তে ভিয়েনায় একই প্রতিযোগিতায় চতুর্থ হলাম। '৮৬তে সুইডেনে দ্বিতীয়।"

তারপর? সুমিতা চুপ করে গেলেন, লাজুকভাবে হাসলেন। বুঝতে অসুবিধা হলো না এর পরের সাফল্যের সিঁড়িগুলোর গল্প বলতে উনি লজ্জা পাচ্ছেন। কিন্তু আমরা তো ছাড়বার পাত্র নই। কেননা চ্যাম্পিয়নের মুখ থেকে তাঁর সাফল্যের গল্প শোনার একটা আলাদা আনন্দ সবসময়ই পাওয়া যায়।

সুমিতা আবার শুরু করলেন, "সাতবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়ে ভারতের সব থেকে শক্তিশালী মহিলা হবার সম্মান পেলেও এ পর্যন্ত বিশ্বরেকর্ড ছাড়াও আমার সেরা সাফল্য মনে হয় জাপানের এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের পারফরমেন্স। সেবার শুধু এশিয়ার সেরা সম্মান পেলাম তা নয়, ৭৫ কেজি বিভাগে ২১২.৫ কেজি তোলার বিশ্বরেকর্ড ভেঙে নতুন বিশ্বরেকর্ডও করলাম। তুললাম ২২২.৫। আর সেই থেকেই আমার নাম সুমিতা লাহা থেকে হয়ে গেল 'হেভি লাহা'। আদর করে এখনও পাড়ায় আমাকে অনেকে ঐ নামেই ডাকে।

জাপানে 'চ্যাম্পিয়ন অব চ্যাম্পিয়নস' বা সেরার সেরা হব একবারও ভাবিনি। তোমাদের জানিয়ে রাখি, আমাদের পাওয়ার লিফটিং বা শক্তি উত্তোলনে মোট দশটি ইভেন্ট হয়, তার মধ্যে সব ইভেন্ট মিলিয়ে যার পয়েন্ট বেশি হয় সেই হয় 'এশিয়ার শক্তিশালী মহিলা'। সম্মানটা এতই দুর্লভ যে যখন এর জন্য আমার নাম ঘোষিত হলো তখন মনে হলো স্বপ্ন দেখছি। এরপর '৮৯তে বিশ্ব নন-ওলিম্পিক প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় হলাম। তারপর '৯১তে দিল্লিতে সাফল্য। ৭৫ কেজি স্কট ইভেন্টে নিজের রেকর্ড ভেঙে ২৩৫.৫ কেজি তুলে বিশ্বরেকর্ড গড়লাম। তিনটি ইভেন্ট ছিল। বাকি দুটি অর্থাৎ বেঞ্চ এবং ডেড লিফট-এ নিউজিল্যান্ডের ক্যাথি জিতল। সেই সংগে 'বিশ্বের সব থেকে শক্তিশালী মহিলা' আখ্যা পেল। কিন্তু আমি চ্যাম্পিয়ন অব চ্যাম্পিয়নস হতে না পারলেও দেশের মাটিতে বিশ্বরেকর্ড গড়তে পেরেছি, এজন্য দারুণ আনন্দ হচ্ছিল। সব দুঃখ চাপা দিচ্ছিল দেশের জাতীয় সংগীত, মমতাদির আন্তরিকতা আর স্টেডিয়ামে উপস্থিত সমস্ত দর্শকের সমর্থন।"

এই পর্যন্ত বলে সুমিতা থামলেন। তাঁকে প্রশ্ন করলাম, আপনার পরবর্তী লক্ষ্য কি? একটু ভেবে সুমিতা উত্তর দিলেন, "শক্তি উত্তোলন ইভেন্টের সংগে ভারোত্তোলন ইভেন্টেও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়া। ইতিমধ্যেই আম্বালায় ৬৭.৫ কেজি বিভাগে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছি আমি। এরপর আমার লক্ষ পরবর্তী এশিয়াডে যোগ দিয়ে ভারোত্তোলনের পদক জেতা।"

সুমিতাকে নিয়ে শুধু ওঁর বাবা, ভাই, বোনের নয়, এই মুহূর্তে মিষ্টভাষী, অত্যন্ত নম্র স্বভাবের এই মেয়েটিকে নিয়ে গর্বিত আমরা সকলেই। তিন বোন এক দাদার মধ্যে সুমিতা মেজো। ওর ছোট বোনেরও সম্প্রতি বিয়ে হয়েছে। সুমিতার কিন্তু আপাতত কোনো দিকেই চোখ নেই। শুধু অনুশীলন আর অনুশীলন। দিনে ছ'ঘণ্টা প্র্যাকটিশ করেন। সকালে শিবাজী সংঘ ব্যায়ামাগারে আর বিকেলে হাওড়ার দত্ত জিমন্যাসিয়ামে।

পাঁচ ফুট উচ্চতার একাত্তর কেজি ওজনের সুমিতাকে দেখলে মনে হয় মোটা। মোটা অর্থে যে মেদবহুল শরীর বোঝায় তা কিন্তু মোটেই নয়। বরং অনেকের ভাষায় 'হেভি' পেটানো চেহারা। অসম্ভব শক্তি। চুল বয়কাট। অফিসে যে কোনো চেয়ারে বসে যখন সকলের সংগে গল্প করেন তখন আলাদা করে চেনার উপায় থাকে না। সম্ভবত সেজন্যই কলকাতা ক্রীড়াসাংবাদিক ক্লাবের এক অনুষ্ঠানে কপিলদেব তাঁকে 'ইয়ার' সম্বোধন করে লজ্জায় পড়ে গিয়েছিলেন। ছেলেদের মতোই ডানপিটে। যে কোনো বাধাকেই সরিয়ে দেবার মানসিক শক্তি ওঁর জন্মগত। অফিসে একগাদা নামী

খেলোয়াড়ের সঙ্গে গল্প করলেও এখনকার ফুটবল সম্পর্কে এতটুকু আগ্রহ নেই। তবে ভালোবাসেন দিয়েগো মারাদোনাকে। অন্য খেলার মধ্যে পছন্দ টেনিস। প্রিয় খেলোয়াড় অবশ্যই স্টেফি গ্রাফ। শক্তির দেবীকে পূজা করার আগে পূজা করেন নিজের বাবাকে।

নিষ্ঠা, একাগ্রতা, হার-না-মানা মনোভাব এশিয়ার সব থেকে শক্তিশালী মহিলাটির সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। অসংখ্য সম্বর্ধনা, ফুলের মালা আর শুভেচ্ছার মধ্যেও ওঁর মনে বিশ্বের সেরা শক্তিশালী মহিলা হবার স্বপ্নটি প্রতি মুহূর্তেই উঁকি দেয়। আমরাও আশায় থাকলাম কবে সুমিতার নামের আগে লিখতে পারব 'স্ট্রংগেস্ট উওম্যান ইন দ্য ওয়ার্ল্ড'।

আর আশা নয়, ভারতের ক্রীড়ামন্ত্রীর কাছে আমাদেরও একটা দাবি আছে–আমাদের গর্বিত-করা সুমিতা লাহাকে এবারই অর্জুন পুরস্কার দেওয়া হোক। আমার সঙ্গে তোমরা সকলে একমত তো?

# স্কুলের দুই সেরা ক্রিকেটার–জয়ন্ত ও বিশ্বজিৎ

জয়ন্ত

বিশ্বজিৎ

শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়

জয়ন্ত ঘোষ দস্তিদার ও বিশ্বজিৎ মুখার্জীকে এ বছর সি. এ. বি. যথাক্রমে অনূর্ধ্ব ১৯ ও অনূর্ধ্ব ১৬ বছরের বর্ষশ্রেষ্ঠ স্কুল ক্রিকেটার নির্বাচিত করেছেন। বিশ্বজিৎ ও জয়ন্ত দুজনেই এই মুহূর্তে বাংলার ক্রিকেট মহলে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে।

দমদমের জয়ন্ত ঘোষ দস্তিদার ডানহাতি ফাস্ট বোলার। ব্যাটিংয়েও যথেষ্ট পারদর্শী। আঠারো বছরের ছেলেটি বর্তমানে আগরপাড়া মহাজাতি বিদ্যাপীঠের দ্বাদশ শ্রেণীর কমার্সের ছাত্র। বাবা সুহৃদ ঘোষ দস্তিদার, মা সান্ত্বনা দেবী ও দিদি রীতা জয়ন্তকে সব সময় খেলাধূলার ব্যাপারে উৎসাহ দেন। এঁদের সঙ্গে আছেন ওর প্রশিক্ষক সঞ্জীবন আচার্য যাঁর কাছে জয়ন্তর হাতেখড়ি। ছোট্ট বয়স থেকেই পাড়ার বন্ধুদের সঙ্গে ক্যাম্বিস বলে চুটিয়ে ক্রিকেট খেলে বেড়াত জয়ন্ত। উৎসাহ দেখে ওর মা অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় ওকে পাড়ায় সঞ্জীবন আচার্যর প্রশিক্ষণ শিবিরে ভর্তি করে দেন। জয়ন্তর খেলা দেখে সঞ্জীবনবাবু বলেছিলেন, যদি তুমি আমার কথা শুনে অনুশীলন করো, তাহলে অনেকদূর এগোতে পারবে। সেইদিন থেকেই কোচের নির্দেশ মতো অনুশীলন শুরু করে দেয় জয়ন্ত। আর ফলও পেতে থাকে।

সেই বছরই ১৫ বছরের অনূর্ধ্ব বাংলা দলের ট্রায়ালে যায় জয়ন্ত। ১৯৮৭-৮৮-র মরশুমে বাংলার হয়ে বিজয় মার্চেন্ট ট্রফিতে ওড়িশার বিরুদ্ধে ৭২ রান করে। ঐ মরশুমেই দুটি খেলায় মোট ১০টি উইকেট দখল করে সেরা বোলার নির্বাচিত হয়। ঐ বছরই জয়ন্ত ব্যাঙ্গালোরে অয়োজিত ১৫ বছরের অনূর্ধ্ব ভারতীয় দলের শিবিরে ডাক পায়। ১৭ বছরের অনূর্ধ্ব পূর্বাঞ্চল দলে সরাসরি সুযোগ পায়। হায়দ্রাবাদে বিজয় হাজারে ট্রফির ফাইনালে মধ্যাঞ্চলের বিরুদ্ধে নবম উইকেটের জুটিতে অসমের গৌতম দত্তকে নিয়ে ৮৫ রান তুলে দলকে জেতায়। জয়ন্ত ৩৭ রানে অপরাজিত থাকে। সি. এ. বি. জয়ন্তকে ১৫ বছরের অনূর্ধ্ব বর্ষশ্রেষ্ঠ স্কুল ক্রিকেটার নির্বাচিত করে। ঐ বছরে ১৭ বছরের অনূর্ধ্ব পূর্বাঞ্চল দলে জয়ন্ত সুযোগ পায় এবং উত্তরাঞ্চলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়। একই সঙ্গে ১৯ বছরের অনূর্ধ্ব বাংলা দলেও সুযোগ পায় জয়ন্ত। কোচবিহার ট্রফিতে বাংলার হয়ে দুটি খেলায় জয়ন্ত ও সঞ্জীব গোয়েল মোট ১১টি করে উইকেট পায়।

৮৯-৯০-তে ইডেনে ১৯ বছরের অনূর্ধ্ব পাকিস্তান দলের বিরুদ্ধে পূর্বাঞ্চলের খেলায় জয়ন্ত শাকিল আহমেদ ও জাহিদ ফজলের উইকেট দুটি পায়।

৯০-৯১-তে ১৯ বছরের অনূর্ধ্ব বাংলা ও পূর্বাঞ্চল দলের হয়ে ৫টি খেলায় জয়ন্ত ২৪টি উইকেট দখল করে। এ ছাড়া বিহারের বিরুদ্ধে ৫০ ও অসমের বিরুদ্ধে ৪৮ রানে অপরাজিত থাকে। জয়ন্ত এবার ১৯ বছরের অনূর্ধ্ব ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছে। নিউজিল্যান্ড ভারত সফরে এলে তাদের বিরুদ্ধে খেলবে ও বাংলাদেশে কয়েকটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলতে যাবে। এ ছাড়া মাদ্রাজে বুচিবাবু টুর্নামেন্টেও এই দলটি অংশগ্রহণ করবে। ওখানকার পারফরমেন্সের ভিত্তিতেই অস্ট্রেলিয়া সফরে ভারতীয় দলের খেলোয়াড় নির্বাচিত করা হবে।

এম. আর. এফ. আয়োজিত ডেনিস লিলির ক্যাম্পে লিলির কাছে প্রশিক্ষণ নেবার সুযোগ হয়েছে জয়ন্তর। লিলি ওর বোলিং দেখে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন, নানান টিপস্ দিয়েছেন। জয়ন্তর উচ্চতা কম হওয়ায় মজা করে ওকে লিলি বলেছেন, তোমাকে যদি টেনে আরেকটু লম্বা করতে পারতাম তাহলে ভাল হতো।

বেহালার ব্রাহ্মসমাজ রোডের বিখ্যাত মুখার্জী পরিবারের

ছেলে বিশ্বজিৎ ইতিমধ্যেই ডানহাতি লেগস্পিনার হিসেবে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। বিশ্বজিৎ অলরাউন্ডার, তবুও বোলার হিসেবেই বেশি নজর কেড়েছে। রোগা চেহারা, চশমার ফাঁকে বুদ্ধিদীপ্ত চোখ সকলের নজর কাড়ে। বড়িশা হাই স্কুলের দশমশ্রেণীর ছাত্র বিশ্বজিৎ, খেলাধূলায় উৎসাহী হলেও পড়াশোনা ঠিকমতো করে।

ছেলের কৃতিত্বে খুশি হলেও সামনের বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা নিয়ে বিশ্বজিতের বাবা রণজিৎ মুখার্জী ও মা শিপ্রা দেবীর চিন্তার অন্ত নেই। ছেলেবেলা থেকেই বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল, ক্রিকেট খেললেও ক্রিকেটেই বিশ্বজিতের উৎসাহ বেশি। ওর উৎসাহ দেখে কাকা কামজিৎ মুখার্জী ওকে দুঃখীরাম অনুশীলন কেন্দ্রে ভর্তি করে দেন ৮৭ সালে। মাস তিনেক বাদেই সি. এ. বি-তে ১৩ বছরের অনূর্ধ্ব বাংলা দলের ট্রায়ালে যায় ও। ওখানে ১৩ ও ১৫ বছরের অনূর্ধ্বদের দলে বোলার হিসেবে সুযোগ পায়। ৮৮-৮৯ মরশুমে কটকে বিজয় মার্চেন্ট ট্রফিতে ওড়িশার বিরুদ্ধে প্রথম খেলতে নেমে ৬৪ রানে ৫টি উইকেট দখল করে। ঐ বছরই ইডেনে ১৭ বছরের অনূর্ধ্ব বিজয় হাজারে ট্রফিতে বাংলা দলে সুযোগ পায়।

৮৯-৯০-এ ১৫ বছরের অনূর্ধ্ব বাংলা দলের হয়ে ত্রিপুরাতে বিজয় মার্চেন্ট ট্রফিতে তিনটি খেলায় ২টি উইকেট পায়।

৮৮-৮৯-এ জামশেদপুরে পূর্বাঞ্চল শিবিরে ডাক পেলেও অল্প বয়সের জন্য বিশ্বজিৎকে বাদ দেওয়া হয়।

৯০-৯১-এ ১৬ বছরের অনূর্ধ্ব বাংলা দলের হয়ে বিজয় মার্চেন্ট ট্রফিতে তিনটি খেলায় ৯টি উইকেট দখল করে।

গত তিন বছর ধরে বড়িশা স্কুলের ক্রিকেট দলে খেলছে বিশ্বজিৎ। এ বছর ও অধিনায়ক। ওর স্কুল সি. এ. বি. আয়োজিত ১৬ বছরের অনূর্ধ্বদের ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ন হয় সিঁথি রামকৃষ্ণ সংঘকে পরাজিত করে। ৬টি খেলায় বিশ্বজিৎ ১৭৬ রান করেছে। ১৮টি উইকেটও দখল করেছে। সি. এ. বি. ১৬ বছরের অনূর্ধ্ব বর্ষশ্রেষ্ঠ ক্রিকেটার হিসেবে ওকে নির্বাচিত করেছে। ৮৮-৮৯-তে দ্বিতীয় ডিভিশনের সাহাপুর স্পোর্টিং

সি.এ.বি গ্রীন দলের সঙ্গে বিশ্বজিৎ

ক্লাবের হয়ে ময়দানে খেলা শুরু করে বিশ্বজিৎ। ৮৯-৯০-তে এই ক্লাবের হয়ে তিনটি খেলায় ১২৪ রান করে ও ৭টি উইকেট দখল করে। ৯০-৯১ সালে প্রথম ডিভিশনে এরিয়ান্স ক্লাবের হয়ে খেলতে আসে। মরশুমের শেষের দিকে স্পোর্টিং ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ৮ ওভার বল করে ৩টি মেডেন দিয়ে ১৫ রানের বিনিময়ে ৩টি উইকেট দখল করে বিশ্বজিৎ। প্রথম ডিভিশনে জীবনের প্রথম উইকেট পায় প্রণব রায়কে বোল্ড করে। লীগে ৫টি ম্যাচে খেলার সুযোগ পায়। জে. সি. মুখার্জী ট্রফির সেমি-ফাইনাল ও ফাইনালে স্পোর্টিং ইউনিয়ন আর মোহনবাগানের বিরুদ্ধেও ভাল বল করে।

ব্যাঙ্গালোরে এরিয়ান্স ক্লাবের হয়ে 'ক্যানাজি পেপসি কাপ' প্রতিযোগিতায় ৩টি খেলায় ৬টি উইকেট দখল করে প্রতিযোগিতার সেরা বোলারের সম্মান পায় বিশ্বজিৎ।

# ওলিম্পিকের ছড়া

## নীলিমা সেন-গঙ্গোপাধ্যায়

পিক পিক পিক–ওলিম্পিক
ওলিম্পিকের ট্র্যাকের কোলে
যজ্ঞমশাল উঠছে জ্বলে
দিক্‌বিদিকের পতাকাতে
বাসেলোনার–চক্ষু ঠিক।

স্বপ্ন দেখো–ঘাস মাড়ানো
পায়ের ছন্দে দুলছে দিক
স্বপ্ন দেখো–ঊর্ধ্বপানে
উচ্চতাকে জিতবে ঠিক।

ও ভাই সোমা–ও অ-শ্বিনী
কোথায় আর এক উষার প্রতীক
বাহাদুররা আনবে সোনা
লুট্‌বে পয়েন্ট্‌–বিলকুল ঠিক।

সিটিউস আর অলটিউসের
ফোর্টিউসের ওলিম্পিক
ওলিম্পিকের মন্ত্র শেখো
হোক না সেটা–প্রাচীন গ্রীক॥

ছবি: সুফি

# ভরা পাতায়

## নতুন ধাঁধা

১. জলাশয়ে জল নেই
জল খুঁজি তাই,
বালুময় কাদা নেই
ঘুরে মরি তাই।

–স্বপন পাত্র, মনসাতলা/আরামবাগ, হুগলী

২. ব্রহ্মপুত্রের আরেক নাম
তিব্বতে তার অবস্থান।

–সুমন্ত রায়, কল্যাণনগর/রহড়া

৩. দিও না হাত
'র' দাও বাদ
হয়ে গেল শস্য
পিষে তাকে খাচ্ছ।

–প্রিয়রঞ্জন ও পিয়ালি সাহা, রামপুরহাট, বীরভূম

৪. মা-কে ছেড়ে জলে চলে
'রবি'-র কাহিনী সবে মিলে
শেষ গেল জিনিস রইল
উত্তরটা কী হবে বল।

–শুভ্রা হালদার, গড়িয়া/কলকাতা-৮৪

ছবিতে শব্দমালা □ উত্তর □ ২৯১ পাতায়

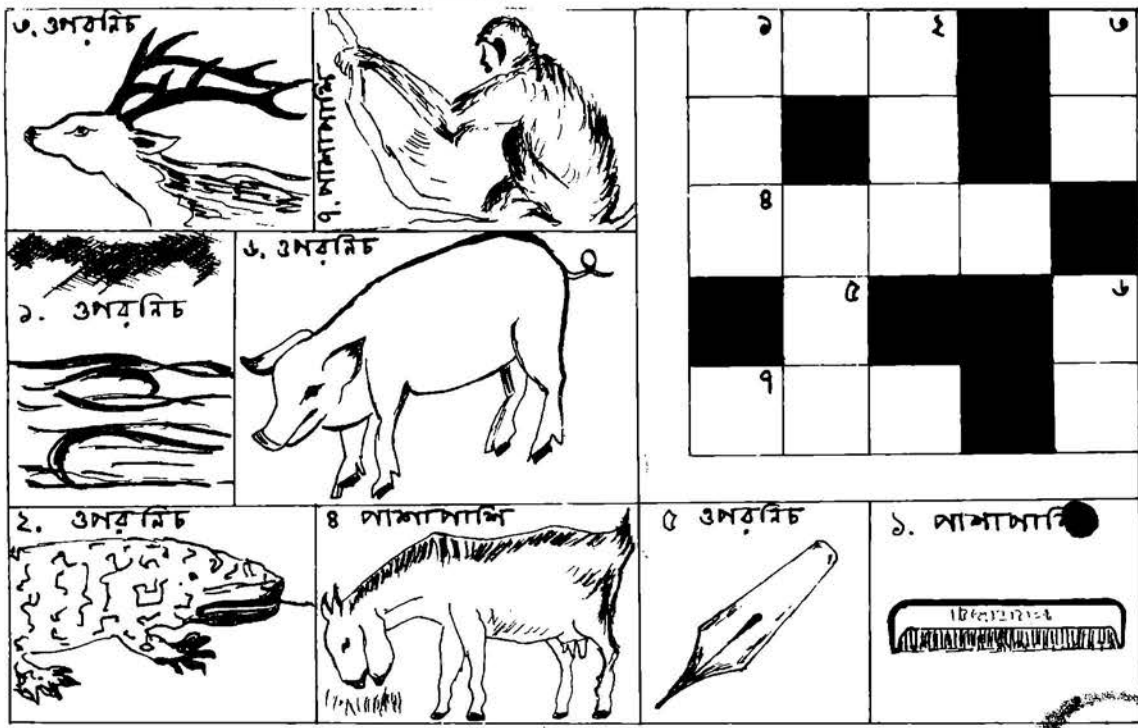


বি. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত
ও ১১ নং কামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রী অরুণচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত

# মায়ের স্নেহের মত খাঁটি

উৎসবের আনন্দমুখর দিনগুলিকে
খুশীর জোয়ারে ভরিয়ে তোলে
মায়ের স্নেহ ও মমতা-
খাঁটি সোনার মতই যা অকৃত্রিম।
দিন বদলের পালায় এমন অনেক কিছু
আছে যা মাতৃস্নেহের মতই খাঁটি,
যেমন শালিমারের নারকোল তেল।
গত পঞ্চাশ বছর ধরে তাই এর
এত কদর প্রত্যেক ঘরে ঘরে।

**শালিমারের**
**নারকোল তেল**
—খাঁটি জিনিষের ঘরোয়া নাম

TSPL/SCW/920/B

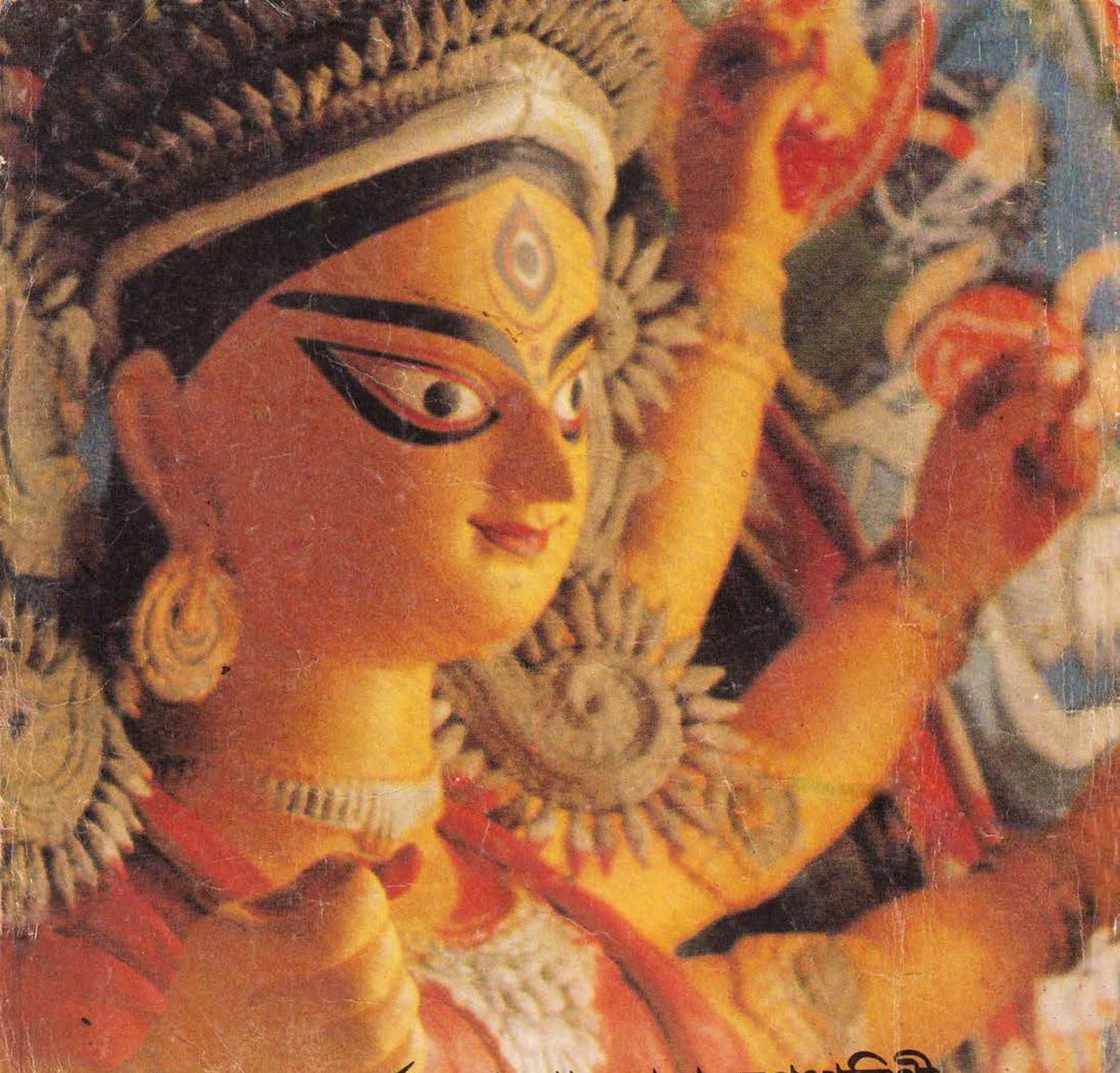

# জাগো দুর্গা, জাগো দশপ্রহরণধারিণী...

বর্ষার ধূসর পর্দা স'রে গিয়ে আশ্বিন ঝলমল। প্রকৃতির শরীরে নতুন নতুন রঙ। পিতৃপক্ষ শেষ, দেবীপক্ষ শুরু। কুমোরপাড়ায় রঙতুলির কাজ এখন শেষ পর্যায়ে। খড়িমাটির ওপর পড়ছে রঙের প্রলেপ। প্রতিমার গায়ের রঙ কাঁচা হলুদ। চোখের রঙ দীঘির কালো জল। ঠোঁট দু'খানি টুকটুকে লাল। আলতারাঙা পায়ে মা এসে দাঁড়াবেন বর্ণিল প্রকৃতির মাঝখানে। কুমোরের তুলিতে, রোদঝরা শিউলির হাসিতে উজ্জ্বল শারদপ্রতিমা। জাগো দুর্গা, জাগো দশপ্রহরণধারিণী...

শারদ শুভকামনায় সবার সাথী বঙ্গজীবনের অঙ্গ বোরোলিন